কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের
বাণিজ্যিক স্নাতক শ্রেণীর সম্মুখে বাংলা ভাষার নতুন দিগন্ত।

বাণিজ্য বিচিন্তা

পি. আচার্য

অধ্যাপক, হেরম্বচন্দ্র কলেজ (সিটি কলেজ বাণিজ্য বিভাগের দক্ষিণ কলিকাতা
দিবা শাখা) ও উমেশচন্দ্র কলেজ (সিটি কলেজ বাণিজ্য বিভাগের
সূর্য সেন স্ট্রীটের প্রভাতী শাখা) এবং পরীক্ষক, কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়।

● রবীন্দ্র লাইব্রেরী ●

১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা : ১২

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা : ১২

প্রথম মুদ্রণ :
১৫ই আগষ্ট, ১৯৬৪

প্রচ্ছদ :
শ্রীপ্রভাত কর্মকার

মুদ্রাকর :
শ্রীগঙ্গারাম পাল
মহাবিদ্যা প্রেস
১৫৬, তারক প্রামাণিক রোড
কলিকাতা : ৬

মূল্য : আট টাকা মাত্র

অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার সেন

এবং

অধ্যক্ষ শ্রীঅরুণকুমার সেন

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

'গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।'

এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ঃ

● কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠসূচী অনুযায়ী লিখিত।

● **'একষট্টিটি সুলিখিত প্রবন্ধ** সন্নিবেশিত হয়েছে, অতি-সাম্প্রতিক বিষয়াবলী যার অন্তর্ভুক্ত। যেমন : **ভারতের জাতীয় সংকট, ভারতের ইউনিট ট্রাস্ট, ভারতের ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, ভারতে খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়, ভারতের ভাষা-সমস্যা, ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা, ভারতে ক্রেতাসমবায় ও তাহার ভবিষ্যৎ, ভারতের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য, হলদিয়া বন্দর ও তাহার ভবিষ্যৎ, বৃহত্তর কলকাতার সমস্যা ও মহানাগরিক পরিকল্পনা, ভারতের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপরেখা, ভারতের বৈদেশিক মুদ্রাসংকট, বিশ্বশান্তি স্থাপনে ভারতের ভূমিকা, ভারতের জাতীয় সংহতি, সাম্প্রতিক পণ্যমূল্যবৃদ্ধি ও গণজীবন, ভারতে সাম্প্রতিক খাদ্য-সংকট, ভারতের জন-সমস্যা ও পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক প্রগতি** ইত্যাদি।

● প্রতিটি প্রবন্ধের শীর্ষে স্থাপিত **'প্রবন্ধ-সূত্র'** এবং **'পাদটীকায় অনুসরণী'** ত্বরিত পরীক্ষা-প্রস্তুতিব সহায়ক হবে।

● **বাণিজ্যিক পত্র-বিনিময়** বিভাগে **৫০টি সুলিখিত পত্রাদর্শ** এবং তৎসহ **সুচিন্তিত অনুসরণী** পরিবেশিত।

● **অনুবাদ** বিভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ইংরেজি ও বাংলা সকল অনুচ্ছেদের অনুবাদ প্রদত্ত হয়েছে ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এবং বর্ধমান ও গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত সকল অনুচ্ছেদের সংকেত প্রদত্ত হয়েছে। স্বয়ং-অনুশীলনের জন্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক সুনির্বাচিত ও গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ বিশেষ সংকেতসহ সন্নিবেশিত হয়েছে।

● **পরিভাষা** বিভাগেও আধুনিকতম পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।

● গ্রন্থশেষে **পরিভাষা পরিচিতি** পরিবেশিত হয়েছে। তাতে প্রায় দেড়শো পরিভাষিক শব্দ ও শব্দগুচ্ছের **সংজ্ঞা ও পরিচিতি** প্রদত্ত হয়েছে। এর সাহায্যে বহু দুর্বোধ্য পারিভাষিক শব্দের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের আত্মিক পরিচয় ঘটবে।

প্রকাশক

বিশ্বাস, প্রাণ এবং আবেগের সঞ্চারে প্রবন্ধগুলি হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। বিষয়-নির্বাচনে, তথ্য-সংগ্রহে, বিষয়-বিন্যাসে এবং রূপসজ্জায় সর্বাধিক উপযোগিতা এবং আধুনিকতার প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছে। পত্র-রচনা, অনুবাদ ও পরিভাষাকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই গ্রন্থ রচনার মৌল প্রেরণা আসে বন্ধুবর অধ্যাপক শঙ্কর প্রসাদ বসুর কাছ থেকে। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-রচনায় তথ্য-সংগ্রহে ও বিষয়-বিন্যাসে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন বন্ধুবর অধ্যাপক হিতেন্দ্র মোহন মিত্র এবং অগ্রজোপম অধ্যাপক অমৃতরঞ্জন চক্রবর্তী। অধ্যাপক চক্রবর্তীর মূল্যবান পরামর্শ ও উৎসাহদান গ্রন্থটির গুরুত্ব-বৃদ্ধির বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

পরিভাষা-অংশ রচনায় স্থিতপ্রজ্ঞ অধ্যাপক মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অকুণ্ঠ সাহায্য লাভ করেছি। তেমনি পত্র-রচনায় অকুণ্ঠ সাহায্য লাভ করেছি বন্ধুবর অধ্যাপক ভাস্কর মিত্র ও অধ্যাপক শান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের কাছে। আর, সকল বিষয়ে যিনি পথ দেখিয়েছেন এবং গ্রন্থটিকে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ: উপযোগী করে তুলতে যিনি অকাতরে সাহায্য করেছেন, তিনি অগ্রজোপম অধ্যাপক অনিলেন্দু চক্রবর্তী। সিটি কলেজ বাণিজ্য শাখার পরম শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তীর আশীর্বাদ পেয়েছি, গোয়েঙ্কা কলেজের বন্ধুবর অধ্যাপক বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজের বন্ধুবর অধ্যাপক স্বরাজ শর্মা, খড়্গপুর কলেজের বন্ধুবর অধ্যাপক সমীরেশ দাশগুপ্ত, দেশবন্ধু গার্লস কলেজের উপাধ্যক্ষ নক্ষত্র রায়চৌধুরী - এঁদের কাছ থেকে আমি প্রচুর প্রেরণা লাভ করেছি। তাছাড়া আনন্দবাজার পত্রিকার "অর্থনৈতিক আলোচনা" বিভাগের সম্পাদক অধ্যাপক অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং "আর্থিক প্রসঙ্গ" পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে আমি যে সাহায্য পেয়েছি, 'তুলনা তার নেই'। এঁদের সকলের কাছে আমি ঋণী, কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে একটি কথা। গ্রন্থটিকে নিখুঁত এবং বাণিজ্যিক স্নাতক শ্রেণীর বাংলা বিষয়ে বিশেষ উপযোগী করে তোলার জন্যে যত্নের কোন ত্রুটি ছিল না। তবু যদি ত্রুটি থেকে থাকে, পরবর্তী মুদ্রণে তার সংশোধন অবশ্যই হবে। যাদের জন্যে গ্রন্থখানি লেখা, তারা উপকৃত হলে আমার সকল শ্রম সার্থক মনে করবো।

নমস্কারান্তে।

হেরম্ব চন্দ্র কলেজ
কলিকাতা-৯
১৫ই আষাঢ়, ১৩৮৩

বিনীত
গ্রন্থকার

সূচীপত্র

● প্রবন্ধ ●

বাণিজ্যিক পত্র-বিনিময়

অনুবাদ

বাণিজ্য বিচিন্তা

প্রবন্ধ

"ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী ,……
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে। এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা, ডাকিয়া বলিতে হবে—
'মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।"

—রবীন্দ্রনাথ

সংকেতের অর্থ

ক. বি.=কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ব. বি.=বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

উ. বি.=উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

গৌ. বি.=গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

বি. দ্র.—কেবল বি. কম. পরীক্ষাই বুঝতে হবে।

বাণিজ্য বিচিন্তা

"সাহিত্যের বিচার করিবার সময় দুইটা জিনিস দেখিতে হয়। প্রথম, বিশ্বের উপর সাহিত্যকারের হৃদয়ের অধিকার কতখানি; দ্বিতীয়, তাহা স্থায়ী আকারে ব্যক্ত হইয়াছে কতটা।" —রবীন্দ্রনাথ

প্রস্তাবনা

প্রবন্ধও সাহিত্যের অন্তর্গত এবং সেইজন্যে শিল্প-পদবাচ্য। প্রথমেই প্রবন্ধের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এই রকমই হওয়া উচিত। শৈল্পিক আবেদনের গুণে প্রবন্ধ হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠবে। অর্থাৎ বাচনভঙ্গির গুণে যেমন সব নীরস বস্তুও সরস হয়ে ওঠে, তেমনি শিল্প-সুষমার গৌরবে প্রবন্ধের নীরস তথ্যপুঞ্জও সরস সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করতে পারে। শিল্পে ও সাহিত্যে বাহিরের সামগ্রী অন্তরচারী হয়ে শিল্পী-সাহিত্যিকের 'মনের মাধুরী'র স্পর্শে রসোত্তীর্ণ শিল্প-সাহিত্যের রূপ লাভ করে। তেমনি বাহিরের জগৎ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য চয়ন করে প্রাবন্ধিক তাকে মনের রসে জারিয়ে আপন বাচনভঙ্গির অনুকরণে সুষ্ঠু বাণী-বিন্যাসযোগে রূপময় করে তোলেন। সকল সাহিত্যের মতো প্রবন্ধও এক রকমের সাহিত্য এবং সকল শিল্পের মতো প্রবন্ধও এক প্রকারের উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম।

প্রবন্ধের শিল্প-সুষমা

শিল্পসম্মত পরিবেশনের গুণে যে-কোন বিষয়ই রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পারে। পৃথিবীর এমন কোন বিষয় নেই, যাকে রসোত্তীর্ণ সাহিত্যের মর্যাদা দান করা যায় না। বিষয় যতই দুরূহ হোক, তাকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলা যায়। তার জন্যে বিষয়টির ওপরে চাই নিখুঁত কর্তৃত্ব এবং প্রকাশের জন্যে চাই একটা নিজস্ব ভঙ্গি। এই দু'য়ের সমাহারেই রসোত্তীর্ণ সাহিত্য রচিত হয়ে উঠতে পারে।

বিষয় ও রসোত্তীর্ণ সাহিত্য

'প্রবন্ধ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো 'প্রকৃষ্ট বন্ধন'। কিন্তু কিসের বন্ধন? —ভাবের বন্ধন, চিন্তার বন্ধন, উপযুক্ত ভাষার বন্ধন। প্রবন্ধ বলতে, কেবল ভাবের অদম্য উচ্ছ্বাস নয়, এলোমেলো চিন্তার বিহ্বলতা নয় বা শব্দাড়ম্বরের ঢক্কা-নিনাদও নয়। প্রবন্ধের জন্যে চাই ভাবের উচ্ছলতার নিয়ন্ত্রণ, চিন্তার যুক্তি-শৃঙ্খলিত পারম্পর্য এবং ভাষার জীবন্ত রূপ। কিন্তু 'এহো বাহ্য'। প্রবন্ধের অন্তর্নিহিত ধর্মই হলো সুমিতিবোধ। কত পরিমাণ চিন্তা বা কত পরিমাণ ভাষার শিল্পরূপ পরিবেশিত হবে, তা নির্ভর করে প্রাবন্ধিকের সুমিতিবোধের ওপর। কাজেই, লেখকের সুমিতিবোধই প্রবন্ধকে সুষম নিটোল মূর্তি দান করবে—যাকে বলা হয় রচনা-সৌষ্ঠব। 'প্রবন্ধ' কথাটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Essay'। 'Essay' কথাটির মৌলিক অর্থ হলো 'প্রয়াস'। বাহিরের অভিজ্ঞতা অন্তরে সঞ্চিত হয়ে একটি ছায়ামূর্তি ধারণ করে। সেই ছায়ামূর্তি কায়া পরিগ্রহ করে বাহিরে প্রকাশের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাইই প্রবন্ধ-রচনার প্রেরণা। অন্যান্য সৃষ্টিমূলক রচনার মতো প্রবন্ধের জন্ম-লগ্নেও আছে সেই আত্ম-প্রকাশের প্রেরণা, আছে রূপদানের ব্যাকুলতা। প্রকাশ-লগ্নে লেখকের ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করে প্রবন্ধ আলোকে অবতীর্ণ হয়। প্রবন্ধে এই-যে ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন, এই-যে Style, তা একদিনে গড়ে ওঠে না, বহু অনুশীলন ও বহু সাধনায় তাকে লাভ করা যায়। সবাই তা পারে না, কিন্তু 'যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে।'

প্রবন্ধ—সুমিতিবোধ —Essay—Style

সাহিত্য, মাথ্যু আরনল্ডের (Matthew Arnold) মতে, দ্বিবিধ: শক্তি-ভিত্তিক সাহিত্য (Literature of Power) ও জ্ঞান-ভিত্তিক সাহিত্য (Literature of Knowledge)। প্রবন্ধ জ্ঞান-ভিত্তিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। কোন বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করলে—সেই জ্ঞান অধ্যয়ন, অধ্যবসায় দিয়ে হোক অথবা ব্যক্তিগত উপলব্ধি থেকেই হোক—প্রবন্ধ রচনা করা সম্ভব হয়। প্রবন্ধের মূল ভিত্তি তাই মননশীলতা। এবং প্রবন্ধ হলো মননশীল সাহিত্য। ব্যক্তি-মনীষায় আহৃত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকেই প্রবন্ধের সৃষ্টি। কিন্তু সৃষ্টি-লগ্নে লেখকের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বা মতবাদের দ্বারা অভিসিঞ্চিত হয়ে প্রবন্ধ লাভ করে অপরূপ বাণীমূর্তি।

প্রবন্ধ—মননশীল সাহিত্য

মননশীলতায় প্রবন্ধের জন্ম; কিন্তু শেষ নয়। কেবল মননশীলতায় প্রবন্ধ যদি নিঃশেষিত হয়, তবে প্রবন্ধ-রচনা হয় ব্যর্থ। মননশীলতার সঙ্গে হৃদয়ের সংশ্লেষও প্রয়োজন। মননশীলতার শুষ্ক প্রান্তরে আবেগের বারিবর্ষণও প্রয়োজন। তবেই সোনার ফসলের লগ্ন সমাগত হয়। কিন্তু ভাবাবেগের অতিবর্ষণ শস্যের পক্ষে অনেক সময় হানিকর, তাও সেই সঙ্গে স্মরণীয়। উদ্বেল ভাবের বন্যায় প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য যেন ভেসে না যায়, সেদিকে প্রাবন্ধিকের সতর্ক

হৃদয় ও মনের সুষ্ঠু সমাহার

দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। কাজেই, উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে হৃদয় ও মনের সুষ্ঠু সমাহারে।

বিষয় যতই ভিন্ন হউক, প্রবন্ধ তো বটেই। বিষয়-বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে প্রবন্ধ সাহিত্য-বিষয়ক বা বিজ্ঞান-বিষয়ক বা বাণিজ্য-বিষয়ক হতে পারে। কিন্তু তাই বলে প্রবন্ধের মূল চরিত্র ব্যাহত হবে কোন্ যুক্তিতে? প্রবন্ধের বিষয় যতই ভিন্ন হোক, যেন প্রবন্ধ-সাহিত্য বা প্রবন্ধ-শিল্প হয়ে ওঠে, সেদিকে প্রবন্ধ-লেখককে অবহিত থাকতে হবে। বাণিজ্য-বিষয়ক প্রবন্ধও প্রবন্ধ হওয়া উচিত। এবং সেজন্যে শিল্পসম্মত রূপদানের জন্যে প্রাবন্ধিককে অগ্রসর হতে হবে।

বাণিজ্য-বিষয়ক প্রবন্ধও প্রবন্ধ

অনেকের ধারণা, এবং ভুল ধারণা, বাণিজ্য-বিষয়ক প্রবন্ধ তথ্যবাহুল্যে পূর্ণ হওয়া উচিত। তাহলে কেবল তথ্যপঞ্জীই কি উৎকৃষ্ট বাণিজ্যিক প্রবন্ধ? বাণিজ্যিক প্রাবন্ধিকের মনে রাখা প্রয়োজন যে, তিনি অর্থনীতির গ্রন্থরচনা করছেন না বা পরিসংখ্যান্ বিদ্যায়তনের বিবরণ (Report of the Statistical Institute) প্রস্তুতও করছেন না। তাঁর ওপর দায়িত্ব আরো বেশি। প্রধান প্রধান তথ্যগুলি তিনি অবশ্যই পরিবেশন করবেন, কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ যাতে তথ্য-সর্বস্ব হয়ে না ওঠে, সেদিকে মনোযোগী হবেন। তথ্যের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রবন্ধের ইমারৎ গড়ে উঠবে এবং তা হবে সুচারু শিল্পমণ্ডিত। মনে রাখতে হবে যে, বাণিজ্যিক প্রবন্ধ তথ্যনিষ্ঠ হবে, কিন্তু তাই বলে তথ্য-সর্বস্ব হবে না।

বাণিজ্যিক প্রবন্ধ তথ্যনিষ্ঠ, কিন্তু তথ্য-সর্বস্ব নয়

তথ্য হচ্ছে প্রবন্ধের কাঠামো—প্রবন্ধের কংকাল। তার সঙ্গে মেদ, মাংস, প্রাণ যোগ করে তাকে শিল্প-সুন্দর রূপদান করতে হবে। প্রবন্ধ-রচনার সূচনায় একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা চাই। সেই পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্যে যতখানি তথ্যের প্রয়োজন, তার অতিরিক্ত গ্রহণ করা উচিত নয়। উক্ত পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণই লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্যের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু সবার আগে তথ্যপুঞ্জের মধ্য থেকে একটি সুস্পষ্ট ধারণা প্রস্তুত করা চাই। তার ওপর একটি নিজস্ব মতামত গঠন করতে হবে। সেই মতামত সমগ্র প্রবন্ধে থাকবে প্রতিফলিত। কিন্তু সেই মতামতটি এমন বাচনভঙ্গিতে রূপায়িত হওয়া উচিত, যাতে বক্তব্য জোরালো হয় এবং পাঠককে স্বমতে আনতে সাহায্য করে। সেইজন্যেই বিশেষ করে প্রবন্ধের পরিকল্পনার প্রাথমিক প্রয়োজন। বক্তব্য-বিষয়ের পারম্পর্য রক্ষা করে প্রবন্ধের স্তর-বিন্যাস ও তার শিল্প-সম্মত বাণীরূপ-রচনা প্রবন্ধের লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দিতে সাহায্য করে।

প্রবন্ধের লক্ষ্য

প্রবন্ধের মতামত ও স্তর-বিন্যাস

প্রবন্ধ-রচনার অর্ধেক সাফল্য তার পরিবেশন-নৈপুণ্যে। পরিবেশন-নৈপুণ্য আনতে হলে কোথাও গুরুগম্ভীর তত্ত্বের লঘু হাস্যরসাশ্রিত প্রকাশভঙ্গি অনুসরণ করতে হবে, কোথাও বিদ্রূপ-বক্রোক্তির তির্যক কশাঘাত হানতে হবে, কোথাও বা মনস্বী মহাপুরুষগণের সুভাষিত বাণী-মঞ্জরীর দু'একটি চয়ন করে উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশ করতে হবে। বাণিজ্যিক প্রবন্ধে থাকবে আলোচ্য বিষয়ের নিবিড় পরিচয়, মত-বিশেষের উপস্থাপনা ও পর্যালোচনা, চিন্তাশক্তির অনন্যতা ও লেখনী-চালনার তীক্ষ্ণ শানিত ভঙ্গি। প্রবন্ধের বিষয়ের পারম্পর্য-অনুসারে উপকরণ-সজ্জা যে প্রবন্ধ-রচনার মৌলিক প্রয়োজন, তা বলাবাহুল্য। তাছাড়া প্রারম্ভিক বাক্য ও সমাপ্তি-বাক্য রচনায় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সমগ্র বিষয়টির মর্ম-গ্রহণ সম্ভব না হলে এবং গভীর চিন্তাশক্তি ও সংক্ষেপ-ভাষণ না থাকলে প্রারম্ভিক বাক্য ও সমাপ্তি-বাক্য রচনায় সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। এই দুটি বাক্য-রচনার সাফল্য সামগ্রিক সাফল্যের দুয়ার খুলে দেবে। বাক্য দুটি ঘনপিনদ্ধ, বহুব্যঞ্জক, ক্রিয়াপদবিহীন ও সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেই সঙ্গে স্মরণীয় যে, প্রবন্ধের ভাষা আদ্যন্ত হয় সাধু অথবা চলিত ভাষা হওয়া উচিত। দু'য়ের সংমিশ্রণে 'গুরুচণ্ডালী' দোষে সমস্ত প্রবন্ধটি দুষ্ট হতে পারে। সর্বোপরি মনে রাখতে হবে, সকল সাহিত্যের মতো বাণিজ্যিক প্রবন্ধও এক রকমের সাহিত্য এবং সকল শিল্পের মতো বাণিজ্যিক প্রবন্ধও এক প্রকারের উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম।

পরিবেশন-নৈপুণ্য

১. বিশ্বশান্তি-স্থাপনে ভারতের ভূমিকা

Role of India in the Achievement of World Peace.

প্রবন্ধ-সূত্র :—অবতরণিকা—বিশ্বশান্তি ও ভারত—ভগবান বুদ্ধ—মহামতি অশোক—স্বাধীন ভারত—শান্তিস্থাপনে ভারত—প্রতিবেশী রাষ্ট্র-সম্পর্ক : পাকিস্তান—চীন—আণবিক শক্তি-চক্রের মাঝখানে শান্তিকামী ভারত—ভারতের নিরস্ত্রীকরণ ও নিরপেক্ষতা-নীতি—উপসংহার।

"দারুণ বিপ্লব-মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে,
সংকটদুঃখত্রাতা !"
—রবীন্দ্রনাথ

এই শতাব্দীর পূর্বার্ধে দুটি মহাযুদ্ধের 'দারুণ বিপ্লব-মাঝে' দেখেছিলাম নরমেধ যজ্ঞের কী বিশাল আয়োজন! সেদিন সত্যই পঙ্কশয্যা হতে 'প্রলয়-মন্থন-ক্ষোভে ভদ্রবেশী বর্বরতা' জেগে উঠেছিল। বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন-প্রহরে মহাযুদ্ধের রুদ্রাগ্নি-শিখায় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি মানবাত্মার কী দুঃসহ অবমাননা, প্রত্যক্ষ করেছি মৃত্যুপথযাত্রী অজস্র নরনারীর করুণ-বিকৃত মুখচ্ছবি, প্রত্যক্ষ করেছি হিরোসিমা-নাগাসাকির আণবিক হত্যালীলায় মানবতার কী বিস্তীর্ণ চিতাশয্যা! প্রথম মহাযুদ্ধের ধ্বংসের মহাপ্রান্তরে শান্তির ক্ষীণ দীপশিখা-হাতে যুদ্ধের সম্ভাবনাকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্যে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল জাতিসংঘ (League of Nations)। কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যে শান্তির সেই দুর্বল প্রদীপ-শিখাকে রক্ত-পিপাসু যুদ্ধবাজের দল শতহস্তে গলা টিপে হত্যা করবার জন্যে এগিয়ে এলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তমসাবৃত মহাশ্মশানে আবার পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষেরা পাঠ করলো শান্তির অভয়-মন্ত্র। ঘৃণিত যুদ্ধবাজদের সমর-তৃষ্ণা নিশ্চিহ্নরূপে মুছে ফেলবার জন্যে এবার ভূমিষ্ঠ হলো সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ (U. N. O.)। কিন্তু তারপরেও চলেছে মানবতার বিরুদ্ধে গোপন চক্রান্ত, আণবিক যুদ্ধের ভয়াবহ আয়োজন, চলেছে স্নায়ু-যুদ্ধের উৎকট মহড়া।

অবতরণিকা

তবু 'অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে'। অশান্তির ঘূর্ণি-ঝড়ে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রজ্বলিত প্রদীপ-শিখা বারে বারে হয়েছে নির্বাণোন্মুখ। আর শান্তিকামী ভারত তাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে, তাকে অনির্বাণ রাখবার জন্যে সমস্ত ত্যাগ স্বীকার করে নির্ভীকভাবে এগিয়ে গেছে। ভারত জানে, যদি রাষ্ট্রসংঘের মৃত্যু হয়,

তবে পৃথিবীর লক্ষ-কোটি শান্তিকামী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষারও ঘটবে চির-সমাধি।

বিশ্বশান্তি ও ভারত

বিশ্ব-শান্তি স্থাপনে ভারতের এই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা নতুন নয়। প্রাচীন ইতিহাসেও রয়েছে তার বিশ্বশান্তি-কামনার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী যখনই রক্তস্নান করে উঠেছে, তখনই ভারতের অন্তরাত্মা শান্তির শঙ্খনিনাদ করে পৃথিবীকে করেছে কলঙ্কশূন্য। করুণাঘন

ভগবান বুদ্ধ

ভগবান বুদ্ধ বিশ্বময় যে অমৃত-বাণী বিতরণ করেছিলেন, চিরস্থায়ী শান্তিই ছিল তার মর্ম-সত্য। মহামতি অশোক ধরণীতল থেকে রক্তচিহ্ন নিঃশেষে মুছে ফেলার জন্যে করেছিলেন বিপুল আয়োজন। ইতিহাস সসম্মানে স্বীকার করেছে রাজসন্ন্যাসী অশোকের সেই অমূল্য অবদানের কথা। এদেশের

মহামতি অশোক

নানক-কবীর-শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ বিশ্বময় প্রেম-মৈত্রী-সদিচ্ছার বাণী প্রচার করে গেছেন। যুগে যুগে ভারত শান্তি-মৈত্রী-অহিংসার মন্ত্রে করেছে মহামানবতার পূজার আয়োজন। ভারতের জাতীয় সঙ্গীতে রয়েছে তার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা—

"পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী
হে চির-সারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি
দারুণ বিপ্লব-মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে,
সংকটদুঃখত্রাতা।"

স্বাধীনতা-লাভের পর ভারত তার দুর্বল বিকলাঙ্গ, সর্বস্বান্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনে সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছে; সংগ্রাম ঘোষণা করেছে দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও অশিক্ষার বিরুদ্ধে। নতুন জাতি-গঠনের দুশ্চর তপস্যায় মগ্ন ভারত তার অর্থনীতির পুনর্বিন্যাসের স্বার্থে, তার নয়া-সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আন্তরিক ভাবেই শান্তি কামনা করেছে। তার হাতে আণবিক শক্তির প্রাচুর্য সত্ত্বেও সে তাকে যুদ্ধাভিমুখীন না করে, তাকে শান্তিপূর্ণ সংগঠনের অভিমুখীন করে তুলেছে। পৃথিবীর যুদ্ধবাজেরা কিছু চায় না, চায় শুধু একটা 'এ্যাটম্ বোম্'। কিন্তু ভারত চায় তার দেশকে গড়ে তুলতে, চায় জীবনযাত্রার উন্নত মান এবং একটি সুখী বলিষ্ঠ সমাজ। স্বাধীনতা-লাভের

স্বাধীন ভারত

পর অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা এসেছে, কিন্তু ভারত তার ঐতিহ্যানুসারী মহান্ আদর্শে অবিচল থেকে সেই সব অগ্নি-পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েছে। "আমরা যখন বিশ্বের স্বাধীন রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে প্রথম আসন নিলাম, তখন শুধু পরবশ্যতা থেকেই নয়, জাতিবৈরী, রাজ্যগ্রাসী উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে মুক্ত মনে পৃথিবীর যাবতীয় দেশ ও রাষ্ট্রের সঙ্গেই বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক

স্থাপনে আগ্রহী হলাম।”—শ্রীনেহরু (এপ্রিল, ১৯৬৩)। বাস্তবিকই, পৃথিবীতে যখনই কোন অশান্তির দাবানল জ্বলে উঠেছে, ভারত সেখানে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে যুদ্ধবাজদের প্রতি ধিক্কার-বাণী উচ্চারণ করেছে এবং শান্তি-প্রতিষ্ঠার দৃঢ় মনোবল নিয়ে এগিয়ে গেছে। ভারতের শান্তি-কামনা সফল হয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জের মর্যাদা। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতি মানুষের বিশ্বাস হয়েছে গভীরতর এবং সেই বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপিত হয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জের শক্ত বনিয়াদ। কি কোরিয়ায়, কি মিশরে, কি কঙ্গোয়, কি লাওসে—সর্বত্র জয়যুক্ত হয়েছে ভারতের শান্তি ও সদিচ্ছার বাণী। কিন্তু ১৯৬৫ সালে ভিয়েৎনামে আমেরিকার বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার ইতিহাসের একটি কলঙ্কময় ঘটনা বলে চিরকাল চিহ্নিত থাকবে। হিরোসিমা-নাগাসাকির পর এত বড় অমানবিক ঘটনা পৃথিবীতে আর ঘটেনি। ভারতের লোকসভা আমেরিকার এই বিবেচনাহীন নীতির নিন্দা করেছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। ভিয়েৎনামে যে রক্তক্ষয়ী সংঘাত চলেছে, জ্বলছে যে হিংসার দাবানল, ভারত সেখানেও শান্তিপূর্ণ সমাধানের অনুরোধ জানিয়েছে দুই বিবদমান পক্ষের কাছে। ভারত আশা করে, সেখানেও অচিরে শান্তির কল্যাণ-প্রদীপ জ্বলে উঠবে, মুখে হাসি ফুটবে ভিয়েৎনামীদের, হাসি ফুটবে পৃথিবীর মুখে।

শান্তি-স্থাপনে ভারত

কিন্তু কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে এবং সীমান্ত নিয়ে চীনের সঙ্গে ভারতের যে বিরোধ চলেছে, পাকিস্তান ও চীনের অনমনীয় মনোভাবের জন্যে তার অবসান আজও সম্ভব হয় নি। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট—আমাদের বহু-প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা এলো, কিন্তু তার সঙ্গে এলো দেশ-বিভাগ এবং অব্যবহিত পরে দুই রাষ্ট্র-সীমার উভয় প্রান্তে শুরু হলো বীভৎস নরহত্যা; দেখা দিল লক্ষ-লক্ষ বাস্তুহারা। আশা ছিল, দেশ-বিভাগের পর দুটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশীরূপে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। কারণ, ভৌগোলিক সংস্থানই শুধু নয়; ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষা এবং অন্যান্য বহু বন্ধনেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ। কিন্তু যা হওয়া উচিত ছিল, তা হলো না। দেশ-বিভাগের পরবর্তী ঘটনাগুলিতে কেবল বিদ্বেষ ও তিক্ততাই সৃষ্টি হলো। দেশ-বিভাগের ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই পাকিস্তান কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণ করে বসলো এবং দেখা দিল নবতর সংঘর্ষ।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র সম্পর্ক : পাকিস্তান

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও শান্তি-প্রতিষ্ঠার নীতি অনুসরণে ভারত তার প্রতিবেশী চীনে গৃহযুদ্ধের অবসান এবং ১৯৪৯ সালে ‘পিপল্‌স্ রিপাবলিক’ প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু চীন ভারতের বন্ধুত্বকে অস্বীকার করে তার সঙ্গে সীমান্ত-বিরোধ সৃষ্টি করে। ভারতের ওপর চীনা-আগ্রাসনের মূলে যে কেবল চীনের সীমান্ত

নির্ধারণের তাগিদই রয়েছে, তা বিশ্বাস করা শক্ত। চীন যে কেন দীর্ঘকাল তার ভৌগোলিক দাবী সম্পূর্ণ অনুচ্চারিত বা গোপন রেখে পরে দু' হাজার মাইল বিস্তৃত দীর্ঘ সীমারেখা বরাবর সুপরিকল্পিত সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করে, কেনই বা এই সামরিক পটভূমিকায় দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ছাড়া বোঝাপড়ার অন্য কোন পথই গ্রহণ করতে রাজী নয়, তা একান্তই দুর্বোধ্য। চীনের ধারণা, সম্ভবতঃ রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রগতি ও প্রতিক্রিয়া এই দুই বিবদমান অতি-বিরোধী গোষ্ঠীতে সম্পূর্ণ বিভক্ত হতে বাধ্য এবং এর মধ্যে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতার কোন স্থান থাকতে পারে না। ভারত গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ দেশগুলির অন্যতম বলে তাকেই আঘাত করে, আক্রমণ করে চীন প্রমাণ করতে চায় যে, বিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে শান্তি ও সহযোগিতার নীতি ভ্রান্ত। কাজেই চীনের ভারত-আক্রমণ কেবল ভারতের বৈদেশিক নীতির ওপর, গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা নীতির ওপরই আক্রমণ নয়, ভারতের চিরাচরিত, পরিকল্পিত, ঈপ্সিত নীতিবোধ ও জীবনধারার ওপরই চরম আক্রমণ। ইতিহাসের সূচনা থেকে ভারত যে শান্তি, ন্যায়, সহনশীলতা, বন্ধুত্ব, সৌভ্রাত্র, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও আপোষের নীতিতে দীক্ষিত হয়েছে, তার মর্যাদা সে রক্ষা করবেই।

চীন

ইতিমধ্যে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটেছে। চীন আণবিক বোমার অধিকারী হয়েছে এবং পাকিস্তানও চীনের সহযোগিতায় আণবিক অস্ত্র-নির্মাণে প্রয়াসী। পাকিস্তানের এই মনোভাবে আমরা বিস্মিত হইনি। কারণ জন্মলগ্ন থেকেই সে বিভিন্ন আণবিক শক্তি-সম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে জোটবদ্ধ হয়ে ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতিকে চ্যালেঞ্জ করে আসছে। সে তার ক্ষুধার্ত, নিরক্ষর দেশবাসীর হাতে ভারতের বিরুদ্ধে আণবিক অস্ত্র তুলে দিয়ে পবিত্র কর্তব্য উদ্‌যাপন করবে। কিন্তু ভারত তাতে বিচলিত নয়। বিভিন্ন আণবিক শক্তি-চক্রের মাঝখানে শান্তি ও সদিচ্ছার প্রদীপ-শিখাটিকে অক্ষত রাখবার জন্যে সে করবে প্রাণপণ প্রয়াস। সে জন্যে সে চিরকাল থাকবে জোট-নিরপেক্ষ এবং নিরস্ত্রীকরণ-নীতিতে অবিচল।

আণবিক শক্তি-চক্রের মাঝখানে শান্তিকামী ভারত

ভারত ও অন্যান্য জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও শক্তিসাম্য রক্ষায় যে সত্যই একটি সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে, তা আজ বিশ্ববিশ্রুত। পারমাণবিক যুদ্ধের প্রেতচ্ছায়া এখনও মানব-সমাজের ওপর ব্যাপ্ত। সেই প্রেতকে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত মানুষের স্বস্তি নেই। ভারতের শান্তি-নীতি জয়লাভ করলে তা ভবিষ্যতের মানব-সভ্যতারই জয় বলে ইতিহাসে লিখিত হবে। কারণ, নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব প্রথম উত্থাপন করে ভারত বর্তমান ও আগামীকালের পৃথিবীর কাছে শ্রদ্ধেয় হয়ে থাকবে। এবং পূর্ণ

ভারতের নিরস্ত্রীকরণ ও নিরপেক্ষতা-নীতি

নিরস্ত্রীকরণ ও জোট-মুক্তি ছাড়া পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি আসবে না।—এই হলো ভারতের সুস্পষ্ট অভিমত।

আশার কথা, পৃথিবী এখন ভারতের সেই অভিমতের পূর্ণ মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়েছে, সক্ষম হয়েছে নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে প্রেরণার সুমহান্ উৎস শ্রীনেহরুর আদর্শের যথার্থ অনুধাবনে। তাই শ্রীনেহরুর আকস্মিক মৃত্যুতে সমগ্র মানবজাতি বিশ্বশান্তির মহান্ দূতকে হারিয়ে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। ভারতের নেহরু-পরবর্তী মন্ত্রিসভাও বিশ্বশান্তি ও পররাষ্ট্র-নীতিতে নেহরু-ঐতিহ্যের ধারাবাহী। আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতের জোট-নিরপেক্ষতা ও নিরস্ত্রীকরণ-নীতি থাকবে অটুট। আগামীকালের যুদ্ধের বীভৎসতা সম্বন্ধে আমাদের মনে আর কোন সন্দেহ নেই। শ্রীনেহরু বলেছিলেন—"লজ্জার কথা! এতদূর এগিয়ে এসেও আমরা মাটির নিচে ঘর খুঁজছি, বিষবাষ্প থেকে বাঁচবার জন্যে ইঁদুরের মতো আশ্রয় গড়ছি।" শ্রীনেহরুকে আলিঙ্গন করে স্থিতপ্রজ্ঞ আইনস্টাইন বলেছিলেন—"আমাদের একমাত্র ভরসা তুমিই। তোমারই পদচিহ্ন আগামী পৃথিবীর কক্ষপথ।" শ্রীনেহরুর সেই পদচিহ্নগুলি যেন আগামী কালের পৃথিবী মুছে না ফেলে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি
- ভারত ও তাহার প্রতিবেশী রাষ্ট্র
- ভারতের নিরস্ত্রীকরণ ও জোট-নিরপেক্ষ নীতি

২. ভারতের জাতীয় সংহতি
National Integration in India.

প্রবন্ধ-সূত্র:—অবতরণিকা - দেশ-বিভাগ ও জাতীয় সংহতি -পাকিস্তান ও চীন—জাতিগঠনের উপকরণ: জাতীয় সংহতি—স্বাধীনতালাভের পূর্বে ও পরে—ভারত-সংস্কৃতি—স্বাধীন ভারতে শিক্ষার একদেশ-দর্শিতা—ভাষা-সমস্যা—সমাধান: সোভিয়েট আদর্শ—প্রাদেশিকতা—রাজনৈতিক দলাদলি—উপসংহার।

গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা এবং বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব—এই চারটি সুদৃঢ় স্তম্ভের ওপরে রচিত বিশাল ভারত-সৌধ আজকের জগতের পরম বিস্ময়। কিন্তু তার শক্ত কংক্রিটের গায়ে আজ অনেক ফাটল ধরেছে। সেই ফাটলের মধ্য দিয়ে আজ আমাদের জাতীয় জীবনে প্রবেশ করেছে এক চরম সর্বনাশের রাহু। তার অনিবার্য গ্রাস থেকে আমরা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে, জাতীয় ঐক্য-সাধনকে, এক কথায়,—আমাদের জাতীয় জীবনকে কি করে রক্ষা করবো? স্বাধীনতা-লাভের পর এত বড় দুর্যোগ আর কখনও আসে নি। আজ দিকে দিকে ভারত-ভাঙ্গার জন্যে চলেছে নানা কুটিল চক্রান্ত। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, রাজনৈতিক দলাদলি ইত্যাদি নানা বিভেদের বিষাক্ত কার্যাবলী দিকে দিকে স্ফীতকায় হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র—চীন ও পাকিস্তানের আক্রমণমুখী মনোভাব। ঘরে-বাইরে জাতির সম্মুখে আজ ঘনিয়ে এসেছে এক চরম সংকট।

অবতরণিকা

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট—ভারত ভেঙে তিন টুক্‌রো করে আমরা স্বাধীনতা লাভ করলাম। দেশ একবার ভাঙলে ভাঙ্গনের নেশায় পেয়ে বসে। শ্রীনেহরুও তাঁর Changing India প্রবন্ধে (১৯৬৩) তাই স্বীকার করেছেন, "১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে আমাদের বহু-প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা এলো বটে, কিন্তু তার সঙ্গে এলো দেশবিভাগ এবং অব্যবহিত পরে দুই রাষ্ট্র-সীমানায় উভয় দিকে শুরু হলো বীভৎস নরহত্যা; দেখা দিল লক্ষ-লক্ষ বাস্তুহারা। আমরা আশা করেছিলাম, আপোষে স্বীকৃত দেশ-বিভাগের ফলে যে দুটি পৃথক্ স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টি হলো, তারা বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী হিসাবে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। এ রকম হলেই সবচেয়ে স্বাভাবিক হতো। কারণ ভৌগোলিক সংস্থানই শুধু নয়, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষা এবং অন্যান্য বহু বন্ধনেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ। কিন্তু যা উচিত তা হলো না। দেশ-বিভাগের পরবর্তী ঘটনাগুলিতে কেবল বিদ্বেষ ও

দেশ-বিভাগ ও জাতীয় সংহতি

তিক্ততাই সৃষ্টি হলো।" ভাঙ্গন রোধ করবার উদ্দেশ্যে অশান্তির বিলুপ্তির জন্যে দেশ-বিভাগ স্বীকার করে নেওয়ার পরিণামে এখন দিকে দিকে ভাঙ্গনের চক্রান্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ-প্রচারিত দ্বি-জাতি তত্ত্বকে কোনকালে স্বীকার না করেই পাকে-চক্রে দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ-বিভাগ স্বীকার করে নিল—নীতি ও কর্মধারায় এ এক নিদারুণ অসংগতি। আগামীকালের ভারত এই দুয়ের মধ্যে সংগতি খুঁজে পাবে কি? সে যাই হোক, দেশ-বিভাগের পরবর্তীকালের কাহিনী হলো ভেদ-বিদ্বেষ এবং হিংসা-তিক্ততার কলঙ্কিত ইতিহাস। এবং 'হবে তা সহিতে মর্মে দহিতে আছে সে ভাগ্যে লিখা।' দেশ-বিভাগের ধাক্কা সাম্‌লিয়ে ওঠার আগেই পাকিস্তান কাশ্মীররাজ্য আক্রমণ করে বসলো এবং দেখা দিল নিত্য নতুন সংঘর্ষ। নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গ দীর্ঘকাল ঝুলে রইলো তার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে। বিশ্ব-রাজনীতির ঠাণ্ডা লড়াইয়ের দাবার ঘুঁটিতে পরিণত হলো কাশ্মীর। অন্যদিকে, বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীন ভারতের উত্তর-দিগন্তে জাগিয়ে তুললো সীমান্ত-সংকট। উত্তর-সীমান্তে যে অপ্রত্যাশিত আঘাত এসেছে, তা ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে, তার গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা নীতিকে আঘাত করেছে, আঘাত করেছে তার জাতীয় সংহতিকেও। কিন্তু বাইরের আঘাতে অন্তঃজ ভিতরের সংহতি-চেতনা জেগে উঠেছে। জাতীয় সংহতি ও সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ক কমিটি (Committee on National Integration and Communalism) সানন্দে ঘোষণা করেছেন—"The Chinese aggression has proved that we are a nation: let us strive to remain a nation and forget the obsolete claims of communities and castes."

পাকিস্তান ও চীন

জাতি-গঠনের জন্যে প্রয়োজন কতকগুলি মৌলিক উপাদান। প্রথমতঃ, এক এবং অবিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক ভূখণ্ড। দ্বিতীয়তঃ, তার জন-গোষ্ঠী। তৃতীয়তঃ, একটি সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় শাসন। চতুর্থতঃ, সাংস্কৃতিক ঐক্য। এই সাংস্কৃতিক ঐক্য-চেতনা থেকেই জাতির জন্ম। জাতীয় ঐক্য বা জাতীয় সংহতি একটি বিপরীত কথা। ঐক্য বা সংহতি থেকেই জাতির উদ্ভব। কাজেই জাতি-গঠনের আগে চাই সংহতি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, স্বাধীনতা-লাভের প্রায় দেড় যুগ পরে আমরা আজ বিচার-বিবেচনা করতে বসেছি—ভারতে প্রকৃত জাতীয় সংহতি-চেতনার বিকাশ হয়েছে কিনা। আসল কথা, স্বাধীনতা-লাভের পূর্বে বিদেশী শাসনের অবসানকল্পে আমরা 'এক-জাতি, এক-প্রাণ একতা'র মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতির বিভেদ, বিচ্ছেদ ও তুচ্ছতার কথা বিস্মৃত হয়েছিলাম

জাতি-গঠনের উপকরণ: জাতীয় সংহতি—স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ও পরে

জাতীয়তাবোধের প্রচণ্ড প্লাবনে সেদিন সকল ভেদবুদ্ধির সহস্র ঐরাবৎ ভেসে গিয়েছিল। আজ বন্যার জল সরে গেছে; স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধে পড়েছে ভাঁটা। আর আমাদের অজস্র তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতা পঙ্কিল কদযরূপে প্রকটিত হয়ে উঠেছে। আজ এই সব তুচ্ছতার হাত থেকে কি আমাদের মুক্তি নেই?

ভারতের মতো য়ুরোপও একই ভূখণ্ড। অথচ, য়ুরোপ জন্ম দিয়েছে বহু জাতির; আর ভারতে ভূমিষ্ঠ হয়েছে একটি মাত্র জাতি। 'নানা ভাষা, নানা দেশ, নানা পরিধান' সত্ত্বেও ভারত 'বিবিধের মাঝে' প্রত্যক্ষ করেছে 'মহান্ মিলন'কে। সে 'একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট্ হিয়া।' আকুমারিকা-হিমাচল—এই বিশাল ভূখণ্ডে বিকশিত হয়েছে একটিমাত্র জাতি। সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র থেকে কৃষ্ণা কাবেরী-গোদাবরী পর্যন্ত কেবল একটিমাত্র প্রাণ-ধারা প্রবাহিত। সেই প্রাণ-ধারাই ভারত-সংস্কৃতি। তাই-ই পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট্-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গে নানারূপে নানাভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে। ভারত-সন্ধানে যাত্রা করে এই সত্যের সন্ধান করতে হবে। এবং এই সত্যানুসন্ধান ব্যতীত সংহতি-সাধনা অসম্ভব।

ভারত-সংস্কৃতি

আজ যে ভারতব্যাপী জাতীয় অনৈক্য দেখা দিয়েছে, তার মূলে আছে বহু বিষয়ে আমাদের অদূরদর্শিতা। আমাদের অত্যধিক বস্তুমুখীনতা তার মধ্যে একটি। স্বাধীন ভারত তার বৈষয়িক ভাগ্য-পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে চেয়েছে কেবল এঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার এবং কারিগরি-বিশেষজ্ঞদের। কিন্তু সেই সঙ্গে দর্শন-চর্চা, ইতিহাস-চিন্তা এবং ভাষা ও সাহিত্যালোচনাও জাতীয় সংহতির প্রশ্নে বিশেষভাবে প্রয়োজন। তা না হলে বিবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য-চেতনার উন্মেষ হবে কিরূপে? স্বাধীন ভারতে শিক্ষা-নীতির এই একদেশদর্শিতার বিষময় পরিণামে আজ নানা ভেদবুদ্ধি লোকচক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে নানা স্থানে বারুদের স্তূপের মতো ফেটে পড়ছে।

স্বাধীন ভারতে শিক্ষার একদেশদর্শিতা

অন্যদিকে বহু ভাষা-ভাষী দেশ ভারতে একদা-ঐক্য-বিধায়ক ইংরেজিকে অপসারিত করে কেবল সংখ্যা-গরিষ্ঠতার জোরে একটিমাত্র ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে গিয়ে জাগিয়ে তোলা হয়েছে সুতীব্র ভাষা-সমস্যা। এই ভাবেই হিন্দী-সাম্রাজ্যবাদের সূচনা। ইংরেজিকে অপসারিত করে একদিকে ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণ করতে উদ্যত হলো, অন্যদিকে সাহিত্যিক ঐতিহ্য ও প্রকাশ-যোগ্যতাহীন হিন্দীকে জনগোষ্ঠীর ভোটের জোরে বহু ভাষা-ভাষী সমগ্র দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে ভারতে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করে জাতীয় সংহতির ভিত্তি-ভূমিকেও

ভাষা-সমস্যা—সমাধান: সোভিয়েট আদর্শ

শিথিল করে দেওয়া হলো। এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো বহু ভাষা-ভাষী রাষ্ট্র সোভিয়েট রাশিয়ার দৃষ্টান্তের অনুসরণে ভারতের ভাষা-সমস্যার-সমাধানে ধীর পদবিক্ষেপে অগ্রসর হওয়া। সোভিয়েট রাশিয়া তার বিশাল ভৌগোলিক সীমায়তনের মধ্যে প্রচলিত প্রতিটি উপভাষা ও আঞ্চলিক ভাষাকে গভীর সংবেদনশীলতা ও প্রযত্ন দিয়ে সুষ্ঠু বিকাশের সুযোগ দিয়েছে। সেখানে কোন একক রাষ্ট্রভাষা বা সরকারী ভাষা নেই। এমনকি, রুশভাষা পৃথিবীর একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা এবং বিপুল সংখ্যা-গরিষ্ঠের মাতৃভাষা হওয়া সত্ত্বেও তার কোন বিশেষ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নেই। অথচ ভারতে একটা অনুন্নত, অনগ্রসর ভাষাকে নিয়ে যে হৈ-চৈ করা হচ্ছে, তার তুলনা অন্য কোন দেশের ইতিহাসে আছে কি? সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধান পনেরটি ভাষাই রাষ্ট্রের সরকারী ভাষা। ভারতেরও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর নেই। ভারত সরকারের উচিত কয়েকজন ভাষা-বিশেষজ্ঞ নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে সোভিয়েট রাশিয়ায় ভাষা-পারস্থিতি সম্বন্ধে নিখুঁত ধারণালাভের জন্যে সেখানে প্রেরণ করা এবং কমিটির পরামর্শানুসারে ভারতের ভাষা-সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হওয়া।

এসব ছাড়াও রয়েছে প্রাদেশিকতা, বৈষয়িক উন্নয়নে বৈষম্য এবং রাজনৈতিক দলাদলি ইত্যাদি জাতীয় সংহতি সাধন-পথের অন্যান্য বহু গুরুতর অন্তরায়। আজ প্রাদেশিকতার লেলিহান রক্তাগ্নি-শিখায় ভারতের জাতীয় সংহতি ভস্মীভূত হতে চলেছে। বিবদমান প্রদেশগুলিকে আবার জাতীয় ঐক্য-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এবং সেজন্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে সুবিবেচনা, দূরদর্শিতা ও সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। কোন বিশেষ রাজ্যের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ প্রদর্শিত হলে অন্যান্য রাজ্যগুলির মনে পুঞ্জীভূত ঘৃণা, অবিশ্বাস ও ঈর্ষাপরায়ণতা একদিন প্রচণ্ড বিক্ষোভের আকারে ফেটে পড়তে পারে। পরিকল্পনা-রচনাকালে পরিকল্পনা কমিশনকে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতি সমদর্শিতার স্বাক্ষর রাখতে হবে। সেই সঙ্গে সর্বভারতীয় সাধারণ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের চেতনার ওপর মানস-প্রসার, পারস্পরিক সহনশীলতা এবং বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের সুযোগ-সুবিধার আয়োজন রাখতে হবে।

প্রাদেশিকতা

জাতীয় সংহতির প্রশ্নে রাজনৈতিক দলাদলির অবসানও কাম্য। শ্রীনেহরুর মতে, "ভারতবর্ষে নানা দল আছে, যাদের সংক্ষেপে দক্ষিণ ও বাম এই নামে অভিহিত করা যায়। কিন্তু দক্ষিণ ও বামের পার্থক্য অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশে ততটা স্পষ্ট বা তীব্র নয়। সকল মতবাদের উর্ধ্বে কোটি-কোটি জনসাধারণের কাছে আজ সবচেয়ে জরুরী হচ্ছে উন্নততর

রাজনৈতিক দলাদলি

অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধার দাবি, এবং তার সঙ্গে চীনা আক্রমণের পর আরো একটি দাবি সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে ; সেটি হলো সর্বশক্তি দিয়ে জাতীয় সংহতি, 'আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা।"

আজ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যবাসী, বিভিন্ন ভাষা-ভাষী, বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী, ধনী-দরিদ্র—এক কথায় ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা জাতীয় সংহতির প্রশ্নে 'মায়ের ডাকে' সম্মিলিত হয়েছে— জাতীয় জীবনের এ একটা বড়ো সুলক্ষণ। ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতা, জাতীয় সংহতি এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষাকল্পে তারা আজ কৃতসংকল্প। একসূত্রে বাঁধা সহস্র-জীবন, জননীর স্নেহধন্য পুত্র-সংঘ আজ মাতৃ-মন্দির পুণ্য অঙ্গনে অনুতপ্ত, দুঃখদীর্ণ, বেদনা-বিহ্বল কণ্ঠে প্রার্থনা করছে :

উপসংহার

"জননি, সময় নিকটবর্তী হইয়াছে···এখন বাজাও তোমার শঙ্খ, জ্বালো তোমার প্রদীপ—তোমার প্রসারিত শীতল-পাটির উপরে আমাদের ছোট বড় সকল ভাইয়ের মিলনকে তোমার অশ্রু-গদগদ আশীর্বাদের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকো।"

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :
- ভারতের ভাষা-সমস্যা
- ভারতে জাতি-সমস্যা ও জাতীয় সংহতি, ক. বি. (ত্রৈবার্ষিক) '৬৪

৩. ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন

Social and Economic Life in India.

প্রবন্ধ-সূত্র : অবতরণিকা—ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের পথে ধর্মীয় প্রভুত্ব ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার বাধাসৃষ্টি—বর্ণবিভাগ, চতুরাশ্রম, প্রথানুগত্য, জাতিভেদ ও তার পরিণাম—যাজক শ্রেণীর শোষণ : উৎসবাদির ব্যয়বহনে সমাজের নাভিশ্বাস—একান্নবর্তী পরিবার ও উত্তরাধিকার আইনের উদারতা : সমাজের অপচয় ও মূলধন-গঠনের অভাব—প্রথানুগত্য : সতীদাহ প্রথা, বৈধব্যাচরণ, কৌলিন্য প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ, নারীজাতির অবরোধ প্রথা ও সমুদ্র-যাত্রার নিষেধ—নববর্ষ, দুর্গোৎসব দেওয়ালী, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহাদির মাধ্যমে কৃষকশ্রেণীর শোষণ ও সর্বনাশ—ব্রিটিশ আমলে জমিদারী প্রথার প্রবর্তনে নতুন সমাজ-বিন্যাস—উপসংহার।

অবতরণিকা

ভারতীয় জীবনাদর্শ তার অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপন্থী। ভারতের সম্পদ-প্রাচুর্য তার অধিবাসীদের মনকে ভোগবিলাসের দিকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। ভারতের সাধনা ভোগের সাধনা নয়, ত্যাগের সাধনা। দারিদ্র্যকে তাই এই দেশের অধিবাসীরা স্বেচ্ছায় অলংকাররূপে বরণ করে নিয়েছে। শ্মশানবাসী চির-দরিদ্র শিব তাই এই দেশের অধিবাসীদের প্রাণের ঠাকুর, আরাধ্য দেবতা। ভারতের রাজপুত্র সিংহাসন ত্যাগ করে পথের ভিক্ষুক সেজেছে। আর ভারত তার নৃপতিদের শিখিয়েছে 'ত্যজিতে মুকুট, দণ্ড, সিংহাসন, ভূমি, ধরিতে দরিদ্র-বেশ।' এদেশের কবি দারিদ্র্যের প্রশস্তি রচনা করে বলেন—'হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ সম্রাট, তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান।' ভারতের কাছে বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে আধ্যাত্মিক মুক্তিই অধিক কাম্য। এদিকে তার অমেয় সম্পদের আকর্ষণে পৃথিবীর নানা শক্তিশালী জাতি দুর্বার স্রোতে ভারতের দিকে ছুটে এসেছে। কেউ এসেছে যোদ্ধবেশে, কেউ বা এসেছে বণিকের ছদ্মবেশে। ভারতকে অতি অনায়াসে করেছে পদানত, দু হাতে লুণ্ঠন করেছে তার অফুরন্ত সম্পদ। ভারতের সম্পদ ভারতবাসীর ভোগে লাগেনি, লেগেছে বিদেশীর ভোগে, ব্যয়িত হয়েছে বিদেশের সমৃদ্ধি-রচনায়। বিষয়কে বিষ মনে করে, টাকাকে মাটি জ্ঞান করে সকল সম্পদ দূরে নিক্ষেপ করেছে এদেশের মানুষ। এই বিষয়-নিরাসক্ত জীবনাদর্শেই

তার সামাজিক জীবন গড়ে উঠেছে এবং এই ভোগ-নির্লিপ্তিই তার অর্থ নৈতিক বিকাশের পথ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে।

বাহিরের বিকাশের পথ অবরুদ্ধ হওয়ায় ভারত বড বেশি আত্মমুখী হয়ে পডেছে। একদিকে তার বহির্বিকাশের পথ অবরুদ্ধ হয়েছে বহিরাগত সাম্রাজ্যবাদীদের চাপে; অন্যদিকে তার আত্মপ্রকাশের দুয়ার বন্ধ করেছে সে নিজেই। দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করা তার জীবনের সাধনা নয়, দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে আপোষ-রফা করাই হলো তার জীবন-সাধনা। সেই সাধনায় সে ধর্মকে আশ্রয় করেছে, আধ্যাত্মিকতাকে বড বেশি প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছে। এই ধর্মানুগত্য, এই আধ্যাত্মিক দাসত্ব থেকে চিত্ত-বিনোদনের জন্যে যে সব উৎসব-অনুষ্ঠান পরিকল্পিত হয়েছে, তার ওপর ধর্মীয় প্রভুত্ব অসীম। কেবল তার সামাজিক জীবনই নয়, তার অর্থ নৈতিক জীবনও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ধর্মীয় শাসনাধীনে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ ফলের মধ্যে ভারত প্রথম ও চতুর্থ ফলটিকে দিয়েছে অধিক গুরুত্ব। ফলে ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা তার অর্থ নৈতিক পূর্ণ-বিকাশের পথে সৃষ্টি করেছে এক বাধার বিন্ধ্যাচল।

ভারতের অর্থ নৈতিক বিকাশের পথে ধর্মীয় প্রভুত্ব ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার বাধা-সৃষ্টি

শেষ পর্যন্ত ভারতে ধর্মই হয়েছে জীবনের একমাত্র নিয়ামক শক্তি। ধর্ম জীবনকে এগিয়ে দিতে এসে তাকে গতিবিহীন, পঙ্গু করে তুলেছে এবং তার চারদিকে অজস্র প্রথা ও আচার-সংস্কারের দুর্ভেদ্য অচলায়তনের সৃষ্টি করে অগ্রগতির পথ চির-রুদ্ধ করে দিয়েছে। অথচ ভারতীয় জীবনের সূচনা-লগ্নে ছিল না ধর্মের এত কঠোর শাসন, ছিল না প্রথা ও আচার-সংস্কারের এত কঠিন একাধিপত্য। প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ সেদিন সমাজে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু নানা সামাজিক উত্থান-পতনের ফলে সেই মুক্তির বন্ধনহীন প্রয়াস আর বেশিদিন স্থায়ী হলো না। সমাজে এলো বর্ণ-বিভাগ। অর্থ নৈতিক কল্যাণ-কামনায় প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত হলো। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চতুরাশ্রমে জীবন হলো খণ্ডিত। বিদ্যার্জন, পরিবার গঠন ও অর্থ নৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য-লাভ সেদিন সমাজে স্বীকৃত হয়েছিল। সেই সঙ্গে গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে বর্ণ-বিভাগ সমাজে এনেছিল কর্ম-কুশলতা ও বৈষয়িক সমৃদ্ধি। কিন্তু কালক্রমে প্রথা ও সংস্কার মরুবালির মত জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশকে স্তিমিত করে তুললো। কর্মকুশলতার স্থানে এলো বংশানুক্রমিকতা, জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের স্থানে এলো প্রথানুগত্য, বৈষয়িক কল্যাণ-প্রচেষ্টার স্থানে এলো কলঙ্কময় জাতিভেদ। শ্রম-বিভাগের মূল উদ্দেশ্য পরবর্তীকালে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, তার স্থানে অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের দীর্ঘস্থায়ী কলহ

বর্ণ-বিভাগ, চতুরাশ্রম, প্রথানুগত্য, জাতি-ভেদ ও তার পরিণাম

গৃহ-বিচ্ছেদে পরিণতি লাভ করেছে। তার পূর্ণ-সুযোগ গ্রহণ করেছে সাম্রাজ্য-লিপ্সু বহিঃশত্রুর দল। আর, তার পরিণাম হয়েছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের চির-অনগ্রসরতা এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে চির-দাসত্ব।

ধর্ম সর্ব-দেশে শোষণের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ধর্মের আফিং শোষণ ও সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। তাই বোধহয় 'Religion is the opium of society' উক্তিটি একটি কঠিন সত্য। য়ুরোপে ধর্মশক্তি ও রাজশক্তির সংঘর্ষে ধর্ম পরাজিত হয়েছিল (টমাস বেকেটের হত্যা)। কিন্তু ভারতে ধর্ম তার অটুট মর্যাদায় দীর্ঘকাল রাজশক্তিকে চালিত করেছে এবং বিদেশী শক্তির শাসন-কালে সে স্থানচ্যুত হয়ে নিষ্করুণভাবে চেপে বসেছে সমাজের ঘাড়ে। যাজকশ্রেণী জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সমগ্র সমাজকে নিক্ষেপ করেছে অজ্ঞানতার সূচীভেদ্য অন্ধকারে। তারপর নানা বিধি-নিষেধের বোঝা তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে এবং নানা ব্যয়বহুল উৎসব-অনুষ্ঠানের নির্দেশ তাদের হাতে তুলে দিয়ে সমাজ সৃষ্টি করলো শোষণের এক অপূর্ব সুযোগ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিপদে যাজক শ্রেণীর অধীনে নানা ব্যয়বহুল ও নিরর্থক ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে সারা সমাজের নাভিশ্বাস উঠেছে। ধর্মের নামে, ঈশ্বরের নামে, পরলোকের কল্যাণের নামে বুদ্ধিমান যাজক-শ্রেণী ভারতে সমাজের অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণের সম্পদ আত্মসাৎ করেছে। অনেক সময় রাজশক্তি করেছে তাদের শোষণের সহায়তা। ব্রিটিশ আমলে দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি ভোগ করেছে মন্দিরের সেবাইৎ ও যাজকেরা। এখনও ভারতের নানা দেবমন্দির ও তীর্থ-দেবতার স্থানে সেই ধর্মষণ্ডদের বংশধরেরা কায়েমী আসন পাকা করে বসেছে।

যাজক শ্রেণীর শোষণ : উৎসবাদির ব্যয়-বহনে সমাজের নাভিশ্বাস

ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রাণ-কেন্দ্র ছিল তার যৌথ-পরিবার প্রথা। যৌথ পরিবারের নিশ্চিন্ত স্নেহচ্ছায়ায় অলস, কর্ম-বিমুখ ও পরশ্রমজীবী ব্যক্তিরা যাপন করতো উদ্যোগহীন, নিরুপদ্রব জীবন। ফলে, স্বল্প সংখ্যক উপার্জনশীল ব্যক্তিদের উপর পড়তো অত্যধিক অর্থনৈতিক চাপ। অন্যদিকে, আলস্যে ও কর্ম-পরাঙ্মুখতায় সমাজের হাতে জমে উঠতো বিরাট অপচয়ের অঙ্ক। পরিবারের উদ্যোগী উপার্জনশীল ব্যক্তিরা অতিরিক্ত পরিশ্রমে জীবনীশক্তির যে নিদারুণ অপচয় করতেন, সমাজের বিরাট খরচের খাতায় তা দিনে দিনে উঠতো জমে। একান্নবর্তী পরিবারের ভঙ্গুরতায় আমরা দীর্ঘ-শ্বাস ফেলি, কিন্তু সমাজের শ্রম-সম্পদের এই নিদারুণ অপচয়ের জন্যে আমরা কি কৈফিয়ৎ দেব? তারপর এলো উত্তরাধিকার আইনের অবাধ উদারতা। এই ঔদার্যের ফলে এসেছে ভারতের ভূ-সম্পত্তির ক্রমবিভাজ্যমানতা, যার চরম পরিণতি

একান্নবর্তী পরিবার ও উত্তরাধিকার আইনের উদারতা : সমাজের অপচয় ও মূলধন-গঠনের অভাব

কৃষি-উৎপাদনের নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। অন্যদিকে অনিবার্যরূপে দেখা দিয়েছে নানা অপ্রীতিকর মনোমালিন্য ও মামলা-মোকদ্দমায় প্রভূত অর্থের অপচয়। ফলে, ভারতে মূলধন-সংগঠনের সম্ভাবনা হয়েছে দূর অস্ত।

সামাজিক প্রথা এই দুর্ভাগা দেশের জনগণের বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছিল এবং দারিদ্র্যমুক্তি ও অর্থনৈতিক সচ্ছলতার পথে সৃষ্টি করেছিল এক দুর্ভেদ্য প্রতিবন্ধকতা। সতীদাহ, বৈধব্য-জীবন-যাপন, কৌলিন্য-প্রথা, বাল্য-বিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি নানা সামাজিক প্রথার নিষ্পেষণে একদিকে সমাজের জনগণের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে দিতে হয়েছে বহু গোঁজামিল। বাল্য-বিবাহ, বহুবিবাহ যখন জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারকে দ্রুততর করে তুলেছে, তখনই সতীদাহ, বৈধব্য-চর্যা, কৌলিন্য-প্রথা ইত্যাদি বিধিনিষেধের সাহায্যে জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রিত করার কঠোরতম ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। এই গোঁজামিল-দেওয়া সামাজিক পরিবেশ অর্থনৈতিক জীবনকেও স্পর্শ করেছে। আর একটি সামাজিক প্রথা দেশের অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের পথ প্রস্তুত করে দিয়েছে; তা হলো নারীজাতির অবরোধ-প্রথা। প্রাচীন ভারতে নারী পুরুষের সহকর্মিনীরূপে পরিবারের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ডেকে আনতো। পরবর্তীকালে নারী হলো অন্তঃপুরচারিণী। ফলে, সামাজিক শক্তির অর্ধাংশ অন্তঃপুরের অন্ধকারে বন্দী হয়ে অপচিত হতে লাগলো। নারী-পুরুষের দ্বৈত প্রয়াসে যেখানে অর্থনৈতিক সাফল্য আসতে পারতো, সেখানে পুরুষের একক-প্রচেষ্টায় শুধু ব্যর্থতাই সূচিত হলো। অন্যদিকে, সকল প্রকার ব্যাপ্তি বা সম্প্রসারণের পথ হলো অবরুদ্ধ। প্রাচীনকালে দক্ষিণ-পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জগুলিতে, সিংহল, মালয়, শ্যামদেশ, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশে চলতো ভারতের বাণিজ্যযাত্রা। কিন্তু মধ্যযুগে ভারতে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হওয়ায় উল্লিখিত দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য-সূত্র গেল ছিন্ন হয়ে। বহির্জগৎ থেকে এদেশে অর্থের প্রবাহ চির-রুদ্ধ হয়ে গেল। এমনি ভাবে প্রথানুগত্যের চরম পরিণামে দেশের সম্পদ-বৃদ্ধির একটি বিপুল সম্ভাবনার হলো অকাল-মৃত্যু।

প্রথানুগত্য: সতীদাহ প্রথা, বৈধব্যাচরণ, কৌলিন্য-প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, নারীজাতির অবরোধ-প্রথা ও সমুদ্রযাত্রা নিষেধ

অন্যদিকে, ভারতের শ্রেষ্ঠ ঋতু-উৎসবগুলি ফসলের মরশুমের অব্যবহিত পরেই পরিকল্পিত হয়েছে। নববর্ষ, দুর্গোৎসব, দেওয়ালী ইত্যাদি উৎসবের পেছনে রয়েছে কৃষি-প্রধান ভারতের অর্থনৈতিক পটভূমি। যাজকশ্রেণী, জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী, দালাল ইত্যাদি মধ্যবর্তী শ্রেণীই এই সব উৎসবের রচয়িতা। ভারতীয় কৃষকদের খামারে বাৎসরিক ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের আয়োজন সুরু হয়ে যায়। আর দরিদ্র, ঋণগ্রস্ত কৃষকেরা সেই উৎসবে যোগদান করবার জন্যে জলের দামে তাদের হাড়ভাঙা

পরিশ্রমের ফসল বিক্রি করে ফেলে। এইভাবে দুর্বহ সামাজিক অনুষ্ঠানের চাপে তারা তাদের উৎপন্ন পণ্যের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। তাছাড়া শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি ব্যয়বহুল উৎসবানুষ্ঠান তো সারা বছর লেগে আছে। এই সব ব্যয়বহুল উৎসবের অনুষ্ঠান করতে গিয়ে ভারতের দরিদ্র কৃষকসমাজ ক্রমাগত ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই দুর্জয় ঋণভার বছরের পর বছর বেড়ে চলে চক্রবৃদ্ধি-হার সুদে। তারপর একদিন সাতপুরুষের বাস্তুভিটে ও জোত-জমি বিক্রি করে ঋণ শোধ করে দিয়ে ভাগ্যহত কৃষকের দল সপরিবারে বাহির হয়ে পড়ে পথে। উৎসব এমনি করে ভারতের হতভাগ্য কৃষকদের শোষণের সুযোগ এনে দিয়েছে মধ্যবর্তী শ্রেণীর হাতে।

নববর্ষ, দুর্গোৎসব, দেওয়ালী, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষকদের শোষণ ও সর্বনাশ

এই শোষণের চিত্র ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ আমলে লর্ড কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে। রাজস্ব-সংক্রান্ত নিশ্চয়তার জন্যে প্রবর্তিত এই অর্থনৈতিক বিধান সমাজের একটি দুরপনেয় কলঙ্ক জমিদারী প্রথার সৃষ্টি করলো, যা কৃষি-ভিত্তিক ভারতের কৃষক-সমাজের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা নিয়ে প্রায় দু'শতাব্দী ধরে ছিনিমিনি খেলেছে। জমিদার, মহাজন ও ব্রাহ্মণের ত্র্যহস্পর্শে কৃষকেরা উৎখাত হয়ে কারখানার শ্রমিক-জীবন গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। পরিণামে পল্লী-অর্থনীতি তথা ভারতের অর্থনীতি নির্মমভাবে ভেঙে পড়েছে।

ব্রিটিশ আমলে জমিদারী প্রথার প্রবর্তনে নতুন সমাজ-বিন্যাস

নানা সামাজিক আন্দোলন ও সংস্কার-সাধনের ফলে বর্তমান ভারতে প্রথানুগত্যের কঠোরতা ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসছে। স্বাধীন ভারতে ব্যয়বহুল উৎসব অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা হচ্ছে। কিন্তু মাঝে মাঝে নানা সার্বজনীন পূজা, অন্নপ্রাশন ও বিবাহাদি অনুষ্ঠানে এমন ব্যয়-বাহুল্য করা হয়, তাতে বিস্মিত ও আশঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। দেশের অর্থের এই অপচয় দেশের ভাগ্যবিধাতা ক্ষমা করবেন না। ধর্মীয় শাসন-মুক্ত, সামাজিক বন্ধন-মুক্ত অর্থনীতি উৎসবের ব্যয়-সংকোচের মাধ্যমে মূলধন-সংগঠন ও উৎপাদন-প্রাচুর্যের দিকে দেশের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবে এবং খুলে দেবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্যের রুদ্ধ দুয়ার। তবেই সফল হবে ভারতের অর্থনীতি, সচ্ছল হবে ভারতবাসীর জীবন-যাত্রা।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- বাঙালীর অর্থনৈতিক জীবন ও বাঙালীর উৎসব ক. বি. '৫৫
- ভারতের উৎসব ও তাহার সামাজিক পটভূমি

৪. অর্ধোন্নত দেশের অর্থ নৈতিক পুনর্গঠন
Economic Reconstruction of an Under-developed Country.

প্রবন্ধ-সূত্র ঃ— অবতরণিকা—সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে অশিক্ষা ও দারিদ্র্য-মুক্তি—অর্ধোন্নত দেশ : ভারত—মাথাপিছু জাতীয় আয়ের নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি—ক্রমবর্ধমান ধন-বৈষম্য—শিল্প ও কৃষি—বেকারত্ব ও প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব—কারিগরী দক্ষতার অভাব মূলধন-গঠনের অভাব—খাদ্যাভাব—চিকিৎসার অভাব—শিক্ষার অভাব—দুর্নীতির দৌরাত্ম্য—বাণিজ্যের দুরবস্থা—অর্থ নৈতিক পুনর্গঠনের প্রয়াস সূত্র—উপসংহার।

অবতরণিকা

ভারতের জাতীয় জীবনের প্রতিটি পর্বে আজ সূচিত হয়েছে নব-নব কর্মোদ্যোগ। সেই কর্মোদ্যোগের স্বাক্ষর আজ মুদ্রিত হচ্ছে তার সামাজিক জীবনে, তার রাষ্ট্রীয় জীবনে এবং তার অর্থ নৈতিক জীবনে। দীর্ঘকাল ধরে পরদেশীর শাসনে ও শোষণে নিঃস্ব ভারত আজ সুরু করেছে তার নানা সম্ভাবনাময় কর্মোদ্যোগ। তার কর্ম-চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে কাশ্মীর থেকে কুমারিকা পর্যন্ত। দিকে দিকে নব নব কর্মধারার চলেছে দ্বারোদ্ঘাটন। এক কথায়, আজ তার বৈষয়িক উন্নতির রুদ্ধ দুয়ারগুলি একে একে খুলে যাচ্ছে। বিদেশী কায়েমী স্বার্থের কূট-চক্রান্তে এতদিন যা সম্ভব হয়নি, আজ দেখি জাতীয় সরকারের হাতে তারই সম্ভাবনার সকল লক্ষণ ভারতের সর্বাঙ্গে প্রকটিত হতে চলেছে। বিদেশী শাসক-সম্প্রদায় ভারতকে কামধেনুর মত দোহন করে তার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে জাহাজে ভরে চালান দিয়েছে য়ুরোপে ; আর তার বিনিময়ে ভারতকে দিয়েছে অবর্ণনীয় দারিদ্র্য, সর্বস্বান্ত কৃষি, শিল্পে অনগ্রসরতা, দেশবাসীর স্বাস্থ্যহীনতা এবং অকালমৃত্যুর দীর্ঘতম খতিয়ান্। অথচ ভারতের মাটি, তার খনি, তার অরণ্যানী, তার জল, তার ক্ষেত-খামার আদৌ সম্পদহীন নয়। কিন্তু বিদেশী শাসনের কুটিল রাহু-গ্রাসে নিপতিত হয়ে সে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে শোচনীয়রূপে অনগ্রসর হয়ে পড়েছে এবং তার হতভাগ্য অধিবাসীরা হয়েছে পেটের জ্বালায় মৃত্যু-পথযাত্রী। অতীতের সেই গৌরবোন্নত সোনার ভারত আজ অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটি অর্ধোন্নত দেশ। এর চেয়ে পরিতাপের আর কি হতে পারে ?

অথচ এদিকে পৃথিবীতে এসেছে নবযুগ, যুগান্তর ঘটে গেছে পৃথিবীর রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক দুনিয়ায়। দারিদ্র্য-জর্জর দেশগুলিতে আজ নয়া-অর্থনীতির বান ডেকেছে।

নতুন সমাজাদর্শের নিশান উড়িয়ে মানব-মুক্তির দিন এসেছে সোভিয়েট রাশিয়ায় ও চীনে। জার-রাজত্বের দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট রাশিয়ানরা আজ নয়া সমাজ-ব্যবস্থায় এনেছে আশাতীত অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য। আফিম্‌-খোর চীন আজ তার বহুযুগের আফিমের নেশা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে মেরুদণ্ড সোজা করে। সেখানে চলেছে অশিক্ষা ও দারিদ্র্য-বিজয়ের আপোষহীন সংগ্রাম। আর "ভারত কেবলি ঘুমায়ে রয়।"

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে অশিক্ষা ও দারিদ্র্য-মুক্তি

তারপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড বা জার্মানীর দিকে যখন দৃষ্টি ক্ষেপণ করি, তখন দেখতে পাই, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা আজ কতো অগ্রসর, তাদের মাথা-পিছু জাতীয় আয় কতো অধিক এবং তাদের অধিবাসীদের মধ্যে ধন-বৈষম্যের পরিমাণ কতো স্বল্প। তারা নিঃসন্দেহে অতি-অগ্রসর দেশ। তারপর যখন ইতালী, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন দেখতে পাই, তাদেরও অর্থনীতি বেশ উন্নত। অর্থনৈতিক উন্নতির চরম শিখরে তারা আজও অবশ্য উপনীত হতে পারেনি, কিন্তু তাদের মাথাপিছু জাতীয় আয় ভারতের চেয়ে অনেক—অনেক বেশি। আর ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ব্রহ্মদেশ, মালয় প্রভৃতি হতভাগ্য দেশ আজ পড়ে রয়েছে 'সবার পিছে, সবার নিচে…'। এদের অধিবাসীদের মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার মান শোচনীয় রূপে নিম্নবর্তী। রাষ্ট্রসংঘের অর্থনীতি-বিশারদদের মতে এরা অর্ধোন্নত দেশ। অথচ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি লোক এই অর্ধোন্নত দেশগুলির অধিবাসী। কাজেই, এদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সমস্যা বৈকি!

অর্ধোন্নত দেশ: ভারত

ভারতের কথাই ধরা যাক্‌। ১৯৫৬ সালে মার্কিন মুলুকে মাথাপিছু জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ৯, ৭৩১ টাকা, কানাডায় ৬,৭৪২ টাকা, ইংলণ্ডে ৪,২৮৭ টাকা আর ভারতে মাত্র ২৬৮ টাকা। ১৯৬২-৬৩ সালে এই পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ২৯৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে। বর্তমান মূল্যমানে এই আয়ের পরিমাণ অবশ্য ৩৩৯ টাকা। আবার এই মাথাপিছু জাতীয় আয় একজন ধন-কুবেরের বার্ষিক আয়ের সঙ্গে একজন পথ-ভিক্ষুকের বার্ষিক আয় যোগ করে গড়পড়তা হারে নির্ণয় করা হয়ে থাকে। ভারতে যে বিপুল ধনবৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে এই স্বাধীনতার কয় বৎসরে, ভারতের লোকসভার অধিবেশনে তার চমকপ্রদ সব বিবরণ মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়ে আমাদের স্তম্ভিত করে। কাজেই ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যে কতখানি নৈরাশ্যব্যঞ্জক, তা উল্লিখিত তথ্যচিত্রে সুপরিস্ফুট।

মাথাপিছু জাতীয় আয়ের নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি

এই বর্ণনাতীত লক্ষ্মীশ্রীহীনতাই অর্ধোন্নত দেশগুলির সবচেয়ে বড়ো পরিচয়। তাদের অধিবাসীদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে সীমাহীন দারিদ্র্য এবং সর্বক্ষেত্রে অবারিত শোষণ।

ক্রমবর্ধমান ধন-বৈষম্য

ফলে, মাথাপিছু জাতীয় আয় ক্রম-উর্ধ্বমুখী হলেও ধন-বৈষম্য ক্রমবর্ধমান। মুষ্টিমেয় ধন-কুবেররা ক্রমাগত আরো ধনী হয়ে উঠেছে এবং দেশের অগণিত জনসাধারণ ধনবণ্টনগত বৈষম্য ও তদুপরি শোষণের অনিবার্যতায় নিঃস্ব, ক্লান্ত ও সর্বহারা। কতিপয় ধনিকের ভোগবিলাসের খেসারৎ দিতে গিয়ে তাদের সারা জীবন দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে কাটাতে হবে—এই হ'লো তাদের নির্মম ভাগ্যলিপি। কাজেই, জাতীয় আয়ের ক্রমবর্ধমান চিত্র দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি ভারত-ভাগ্য-বিধাতার একটি নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া অন্য কিছু নয়।

ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি মূলতঃ এই। তার এই চরম দারিদ্র্যের মূলে রয়েছে তার শিল্পে অনগ্রসরতা ও অতিভারগ্রস্ত কৃষি-পরিস্থিতি। এতদিন বিদেশী শাসকেরা তাদের স্বার্থের খাতিরে ভারতে শিল্প-সম্প্রসারণ সংঘটিত হতে দেয়নি। সারা দেশকে তারা করে রেখেছে কৃষি-নির্ভর। ভারতের শিল্পবিকাশের ফলে ভারতের কৃষিজ ও খনিজ কাঁচামাল ভারতেই আটক হয়ে যাবে—এবং তা হবে তাদের স্বার্থের পরিপন্থী।

শিল্প ও কৃষি

তাই দেখা যায়, প্রায় দু'শতাব্দী ধরে শিল্প-বিপ্লবের দেশের লোক ভারত-শাসন করে গেল; কিন্তু ভারতের মাথায় শিল্প-বিপ্লবের আশীর্বাদ ঝরে পড়তে তারা দেয়নি। আর, কৃষিকে তারা তাদের শোষণের সুবিধার জন্যে তুলে দিয়েছে মুষ্টিমেয় বংশবদ মধ্যস্বত্বভোগী জমিদারদের হাতে। ওদিকে, দরিদ্র, নিরক্ষর, স্বাস্থ্যহীন কৃষকেরা অসংবদ্ধ ও ক্রমবিভাজ্যমান ভূমিজোত, রুগ্ন হাল-বলদ এবং স্বত্বভোগের অনিশ্চয়তা নিয়ে মান্ধাতার আমলের কৃষি-প্রকরণ অনুসরণ করে পোড়ামাটি থেকে ফলিয়েছে অতি সামান্যতম পরিমাণ শস্য। না ছিল উন্নত ধরনের কোন সেচ-পদ্ধতি, না ছিল উৎকৃষ্ট জাতের সার ও বীজ সরবরাহের কোন উন্নত ব্যবস্থা। অন্যদিকে, বিদেশীদের চক্রান্তে এ দেশের কুটিরশিল্প ধ্বংস হওয়ায় কৃষির উপর পড়লো অত্যধিক চাপ। ফলে অতিভারগ্রস্ত কৃষি সৃষ্টি করলো নিম্নতম উৎপাদনের দুঃখজনক নজির।

এদিকে, বিদেশী শিল্পের প্রবল আঘাতে এদেশের কুটির শিল্প ও গ্রামীণ শিল্প ধ্বংস হওয়ায় বহু লোক বরণ করলো দুঃসহ বেকারত্ব। কৃষিতে শস্যাবর্তন (rotation of crops) না থাকায় সাময়িক বেকারত্ব তো আছেই; অন্যদিকে, শিল্প-প্রসারের অভাবে লোকসংখ্যার একটা বিরাট অংশ কর্মাভাবে রইলো বেকার। আবার ভাবমূলক শিক্ষার মোহে মুগ্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই ভারাক্রান্ত করে তুললো শিক্ষিত বেকারের ক্রমবর্ধমান তালিকা।

বেকারত্ব ও প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব

জনসংখ্যার বিচারে ভারতের মানব-শক্তির (human power) অভাব নেই। কিন্তু সেই মানব-শক্তিকে সম্পদ-সৃষ্টির জন্যে উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োজিত করবার ছিল না কোন অর্থনৈতিক প্রয়াস। দেশের প্রকৃত মূলধন সৃষ্টি না হওয়ায় দারিদ্র্য গেল বেড়ে। পরে যখন নতুন-নতুন অর্থনৈতিক প্রয়াস সূচিত হলো, তখন দক্ষ কারিগরের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হলো। মানব-শক্তি আছে প্রচুর অথচ কারিগরী দক্ষতার অভাবে তা অকর্মণ্য হয়ে রইলো। অর্থাৎ, দেশকে তাদের বোঝা বয়ে নিয়ে চলতে হবে।

কারিগরী দক্ষতার অভাব

দেশের দারিদ্র্য উঠলো চরমে। দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট মানুষের সঞ্চয়-ক্ষমতা একেবারে দেউলে হয়ে গেল। সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে যে রুজি-রোজগার ভাগ্যে জোটে, তা রুটির দামেই হয়ে যায় নিঃশেষিত। সঞ্চয় করবে কি? ঋণের বোঝাই দিনের পর দিন চলে বেড়ে। কাজেই, অর্ধোন্নত দেশে মূলধন সংগঠন এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। ফলে, খাদ্যাভাবে শুরু হয়ে যায় অপুষ্টিজনিত নানা ব্যাধির উপসর্গ। চিকিৎসা নেই, শিক্ষা নেই, চারদিকে হতাশার নীরন্ধ্র অন্ধকার। এদিকে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা স্বল্পায়ু ও অকাল মৃত্যুর তালিকা বৃদ্ধি করে চলে এবং খাদ্য-সমস্যাকে করে তোলে অতি-প্রকট। সুযোগ বুঝে অধিক মুনাফা-শিকারীরা সজাগ হয়ে ওঠে। আইনের সুড়ঙ্গ পথে অবাধে চলতে থাকে চোরাকারবার, মজুতদারী, খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ ইত্যাদি দুর্নীতিপূর্ণ কার্যকলাপ। দেশীয় বাণিজ্যের এই তো হাল। তার ওপর বহির্বাণিজ্য হয়ে ওঠে ঠিক ঔপনিবেশিক প্রকৃতির। দেশ থেকে সস্তা দরে শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে কাঁচামাল প্রবাহিত হয়ে যায় এবং বিদেশ থেকে শিল্পজাত ভোগ্যপণ্য উচ্চ মূল্যে আমদানি হয়ে আসে স্বদেশে। এইভাবে চারদিক থেকে দেশের সর্বনাশ ঘনিয়ে আসে।

মূলধন গঠনের অভাব, খাদ্যাভাব, চিকিৎসার অভাব, শিক্ষার অভাব, দুর্নীতি, বাণিজ্যের দুরবস্থা

এই সর্বনাশের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন অর্থনৈতিক পুনর্গঠন। অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পথে অগ্রসর হবার জন্যে চাই একটি সুপরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা। সেই সুপরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় কৃষি-উন্নয়নই হবে প্রাথমিক সোপান। জলসেচ-ব্যবস্থা, উৎকৃষ্ট সার, বীজ ও কৃষি-যন্ত্রপাতির প্রয়োগের মাধ্যমে বৃদ্ধি করতে হবে কৃষি-উৎপাদন। সেই সঙ্গে বনিয়াদি শিল্প-প্রতিষ্ঠার প্রতি মনোযোগী হতে হবে এবং মুক্ত করে দিতে হবে শিল্প-বিস্তারের অবরুদ্ধ যত পথ। অধিক মূলধন যাতে সংগঠিত হয়, সেদিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। এ অবস্থায় জনসাধারণের ভোগের

অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রয়াস-সূত্র

পরিমাণ হ্রাস করতে হবে। মানব-শক্তির সুষ্ঠু ব্যবহারের দ্বারা শ্রমের অপচয় দূর করতে হবে। ফট্‌কাবাজি, চোরা-কারবার থেকে মূলধনকে সরিয়ে এনে অধিক উৎপাদনকার্যে বিনিয়োগ করতে হবে। অন্যদিকে, জনসংখ্যা-বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে গড়ে তুলতে হবে আন্দোলন। এক কথায়, ভারতের মতো অর্ধোন্নত দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্যে সুরু করতে হবে এক বিরাট্‌ কর্মোদ্যোগ। দেশব্যাপী একটা অভূতপূর্ব সামাজিক উৎসাহ সৃষ্টি করে সমবায়ের ভিত্তিতে সকল উন্নয়ন-প্রয়াসকে গতিশীল ও সার্থক করে তুলতে হবে।

উপসংহার

ভারতে সেই বিশাল কর্মকাণ্ডের শুভ সূচনা হয়েছে। ভারতের কৃষি-প্রান্তরে, ক্ষেতে-খামারে, কলকারখানায় আজ এক আশ্চর্য কর্ম-চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেছে। ইতিমধ্যে দুটি-কর্মপ্রবাহের ঢেউ দেশের বুকের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে, দেশের অর্থনীতিতে প্রথম ও দ্বিতীয় যোজনায় প্রচুর পলিমাটি সঞ্চিত হয়েছে। তৃতীয় যোজনার কার্যকালও দ্রুত সমাপ্তির পথে। ইতিমধ্যে চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত হয়ে গেছে। তার আয়তন বিশালতর, আয়োজন বিস্ময়কর। এদিকে, দেশের জনগণের মধ্যে ধনবৈষম্য হ্রাস করে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে ভারত দ্রুত অগ্রসর হয়ে চলেছে। দেশের অর্থনীতির মরাগাঙে এতদিন পরে আজ সত্যিই বান ডেকেছে।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- অনগ্রসর দেশে শিল্প-প্রসারের উপযোগিতা ক. বি. (ত্রৈবার্ষিক) '৬২

৫. ভারতে বাণিজ্য-বিদ্যা
Commerce Education in India.

প্রবন্ধ-সূত্র ঃ অবতরণিকা—বাণিজ্য বিদ্যার শুভ সূচনা ও তার অধ্যয়ন-সূচী—ভারতে বাণিজ্য-বিদ্যার ইতিহাস ও ইংরেজ শাসিত ভারতে বাণিজ্য-বিদ্যা—স্বাধীন ভারতে বাণিজ্য-বিদ্যার নববিধান ও তরুণ সমাজের ভবিষ্যৎ—নবযুগের শিক্ষা : বাণিজ্য-শিক্ষা—বিজ্ঞানসম্মত বাণিজ্য-বিদ্যার স্বরূপ কি হওয়া উচিত?—ভারতে বাণিজ্য-বিদ্যার হাল—মানবিকতা বাণিজ্য বিদ্যার অঙ্গ : আর্থিক ও আত্মিক বিকাশ—উপসংহার।

"চাকরি করে কোন জাত বড় হয় নি, হতে পারে নি, হতে পারবেও না। কেবল চাকরি করে জাত বাঁচে নি, বাঁচতে পারে না, বাঁচতে পারবেও না।"

—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

অবতরণিকা

কেবল চাকরি-শিকারের মধ্যে ভারতেরও মুক্তি নেই। ভারতবাসীকে কালবিলম্ব না করে আজ ব্যবসা-বাণিজ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এই লক্ষ্মীছাড়া দেশে লক্ষ্মীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে তা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। এদিকে ভারত পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে দ্রুত শিল্পায়নের পথে যাত্রা করেছে। তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর আজ মুদ্রিত হচ্ছে দুর্গাপুরে, রাউরকেলায়, ভিলাই ও বোকারোয়। রচিত হচ্ছে ভবিষ্যৎ ভারত গঠনের জনপথ, শিল্পায়নের প্রারম্ভিক ভূমিকা। আজ ভারতীয় বাণিজ্যের নব-নব সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যাচ্ছে। ভারতবাসীকে সেই সম্ভাবনার ফসল ঘরে তুলতে হবে। তার জন্যে প্রয়োজন সার্বিক প্রস্তুতি। বাণিজ্য-লক্ষ্মীর প্রসাদ ঘরে তোলার বোধন-মন্ত্রই হলো বাণিজ্য বিদ্যা।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে য়ুরোপের উৎপাদন-ব্যবস্থায় এসেছিল এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ-পদ্ধতির মাধ্যমে স্বল্পব্যয়ে ও স্বল্পকালে পণ্য-উৎপাদন ও বিশ্বের বাজার অধিকারের জন্যে য়ুরোপীয় দেশগুলির মধ্যে দেখা দিল প্রবল প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতায় জয়লাভের প্রস্তুতি হিসাবে কাঁচামাল, প্রাকৃতিক শক্তি, পরিবহণ, শ্রমিক ও বাজার ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলো সাগর-পারের সেই দেশগুলিতে। এইভাবে যে বিশেষ বিদ্যা গড়ে উঠলো য়ুরোপে, তাই পরবর্তীকালে চিহ্নিত হলো বাণিজ্য-বিদ্যারূপে। য়ুরোপের শিল্প-বিপ্লবের মূলে ছিল বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও তার অভূতপূর্ব সাফল্য। তার ব্যাপক ব্যবহার ও

প্রয়োগ-সিদ্ধিতেই বিজ্ঞানের চরম চরিতার্থতা। তার জন্যে প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা। বাণিজ্য-বিদ্যাই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে সুষ্ঠু উৎপাদন-প্রকরণ ও বণ্টন-ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করতে পারে। কালক্রমে বাণিজ্যে প্রবেশ করলো নানা জটিলতা। সেই জটিলতার সমাধানকল্পে বাণিজ্যে উদ্ভব হলো নানা শাখা-প্রশাখার। সেগুলি হলো: এক, উৎপাদনের উপযুক্ত স্থান-নির্বাচন—সুলভ কাঁচামাল, প্রাকৃতিক শক্তি, পরিবহণ সুবিধা, সস্তা শ্রমিক ও ব্যাপক বাজারের সম্ভাবনাময় সমৃদ্ধি যার ওপর নির্ভরশীল; দুই, উৎপাদন-সংগঠন—মূলধন-সংগ্রহ, প্রয়োগ-নিপুণ কৃতী কর্মী সংগ্রহ যার অন্তর্ভুক্ত; তিন, অর্থ-বিনিয়োগ—প্রয়োজন-অনুসারে বিভাগ-বিন্যাস, হিসাবরক্ষণ, হিসাব-নিরীক্ষা, শ্রমিকের পারিশ্রমিক নির্ধারণ ইত্যাদি যে বিভাগের অন্তর্গত; চার, শ্রমিক-কল্যাণ—শ্রমিক-অসন্তোষের অবসান, শ্রমিকের স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা যে বিভাগের অন্তর্ভুক্ত; পাঁচ, বাজার-সংগ্রহ—প্রচার, সরকারী বিধি-ব্যবস্থা ও উৎপাদন-নীতির সঙ্গে সংযোগ-রক্ষা যে বিভাগের কার্যসূচী। বাণিজ্যের প্রয়োগগত দিকের উদ্ভূত এই জটিলতা-সমূহের গবেষণা, স্বরূপ-বিশ্লেষণ ও সমাধানের পথ-নির্দেশ ইত্যাদি হলো বাণিজ্য বিদ্যার অধ্যয়ন-সূচী।

বাণিজ্য বিদ্যার শুভ সূচনা ও তার অধ্যয়ন-সূচী

প্রাচীন ভারতের উৎপাদন-রীতি ও বাণিজ্য প্রকরণ ছিল মূলতঃ অবৈজ্ঞানিক। তার বাণিজ্যে না ছিল কোন জটিলতা, না ছিল কোন ব্যস্ততা। অন্যান্য বৃত্তি-বিদ্যার ন্যায় বাণিজ্য-বিদ্যাও ছিল নিতান্তই বংশানুক্রমিক। বণিক-সদাগর-পুত্র পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে বাণিজ্য-বিদ্যা প্রাপ্ত হতো। বলা বাহুল্য, প্রাচীন ভারতে শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে সমাজ বিন্যস্ত হয়েছিল বলে বাজার-চাহিদার স্বরূপ বণিক-সদাগরেরা স্বাধীন শিল্পী-কারিগরের কাছে পৌঁছিয়ে দিতেন। সেইমতো উৎপন্ন পণ্য সম্ভারে নৌবহর সাজিয়ে তাঁরা করতেন বাণিজ্য-যাত্রা। তারপর এলো যুগান্তর; ইংলণ্ডের পণ্যবাহী নৌবহর স্পর্শ করলো ভারতের উপকূল। এদেশে ইংরেজদের বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য—দুই বিস্তৃত হলো। কিন্তু শিক্ষা-প্রবর্তনে ইংরেজদের মনে দেখা দিল দ্বিধা। দ্বিধা কাটিয়ে যে শিক্ষার প্রবর্তন তারা এদেশে করলো, তা য়ুরোপে প্রচলিত শিক্ষারীতির শতবর্ষের পশ্চাদ্বর্তী। তারা সেক্সপীয়র, শেলী, বায়রন শিক্ষা দিয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষকে তাদের শিল্প-বিপ্লবের অংশীদার হবার উপযোগী বাণিজ্য-বিদ্যা শিক্ষা দেয়নি। কারণ তাহলে ভারতেই গ্লাসগো, ম্যাঞ্চেস্টারের প্রতিস্পর্ধী কল-কারখানা গড়ে উঠবে। ভারতের কাঁচামাল ভারতেই আটক হয়ে যাবে। আমেরিকার

ভারতের বাণিজ্য-বিদ্যার ইতিহাস ও ইংরেজ-শাসিত ভারতে বাণিজ্য-বিদ্যা

মতো ভারতও ইংলণ্ডের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। তাই এই হতভাগ্য পরাধীন দেশের কচ পাশ্চাত্যের শুক্রাচার্যের ঘর থেকে আত্মরক্ষার সেই সঞ্জীবনী-মন্ত্র আয়ত্ত করতে পারেনি। আর এদিকে বিজাতীয় শাসকগোষ্ঠী এদেশে তাদের বাণিজ্য আর শাসনযন্ত্রের চাকা সচল রাখবার জন্মে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি দিয়ে একদল দক্ষ কেরানী গড়ে তোলার জন্যে করেছিল এক গোপন চক্রান্ত এবং আমরাও সেই ফাঁদে পা দিয়ে একটা পরাধীন কেরানীর জাতিতে পরিণত হয়েছিলাম।

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়, তাই ভাবি মনে।" ভারতে ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষার বাহিরের জলুসে আকৃষ্ট হয়ে এদেশের তরুণেরা সেদিন ভারতীয় বা প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের মরীচিকার ছলনায় উদ্‌ভ্রান্তভাবে ধাবিত হয়েছিল। আর আমরাও দেশের ব্যবসায়ী বা কৃষিজীবীদের চেয়ে সরকারী চাকুরেদের বেশি সম্ভ্রম দিয়েছি। আজ এই মিথ্যা মোহের আবরণ খুলে ফেলবার দিন এসেছে। দেশের শিল্পায়নের সঙ্গে সংগতি রেখে বাণিজ্য-বিদ্যার গণ্ডী প্রসারিত করে দিতে হবে। বাণিজ্য-সাধনার দিকে দেশের তরুণদের শক্তি ও সামর্থ্যকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। এ পর্যন্ত বাণিজ্যের স্নাতক শ্রেণীতে হিসাব-নিরীক্ষা, অর্থশাস্ত্র, ব্যবসায়-সংগঠন, অর্থনৈতিক ভূগোল ইত্যাদি পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ছিল। বাণিজ্য-বিদ্যার নববিধানে সংযোজিত হয়েছে একান্ত সচিবের কার্যাবলী। এই নববিধান রচনার পশ্চাতে যে মনোভাব রয়েছে, তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এবার থেকে জাতির তরুণ সম্প্রদায়ের একটা বিরাট্‌ অংশ ধন নয়, মান নয়, শুধু একান্ত সচিব হবার স্বপ্ন দেখবে। এ হচ্ছে আর এক ধরনের হরিপদ কেরানী সৃষ্টির অপকৌশল মাত্র। পরীক্ষাপাসের পর চাকরির দরখাস্ত হাতে, তালিমারা জামা গায়ে, ছেঁড়া চটিজুতো পায়ে, রুক্ষ মাথায় গ্রীষ্ম-দুপুরের প্রখর রোদ তুচ্ছ করে ক্লান্ত হতাশভাবে তাদের ডালহৌসীর অফিস পাড়ায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যাবে। তারপর তারা স্থান পাবে কর্ম-বিনিময় কেন্দ্রের সুদীর্ঘ বেকার তালিকায়। আর কোথাও তাদের স্থান হবে না। 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী।' একটা অশিক্ষিত অথচ অর্থবান অসৎ লোকের অধীনে কোনমতে একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়ে সারাদিন তার হুকুম মতো কলম পিষে দুশো টাকা মাইনে পেলেই তারা খুশি। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পোৎপাদন ইত্যাদি পরিচালনার দ্বারা দেশের বিপুল সম্ভাবনাময় দিকটিকে যদি সফল করে তোলা যায়, তবে জাতির মহৎ সেবা করা হবে, বহু দেশবাসীর কর্মসংস্থান করা যাবে এবং নিজেরও আত্মলাঞ্ছনার অবসান হবে—একথা ভাববার কেউ অবকাশ পায় না। হাজার টাকার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে তারা অনায়াসেই দেড়শো কি দুশো টাকায় দেয় বিকিয়ে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় একান্ত সচিবের কার্যাবলী শিক্ষাদানের

স্বাধীন ভারতে বাণিজ্য-বিদ্যার নববিধান ও তরুণ সমাজের ভবিষ্যৎ

জন্যে নতুন পাঠ-সূচী প্রবর্তন করেন। বলাবাহুল্য, বিশ্ববিদ্যালয় তাদের যে পথে চলার ইঙ্গিত দেন, সে পথে গেছে কত সহস্র কুব্জ-পৃষ্ঠ, ন্যুব্জ-দেহ, ছিন্নবাস-পরিহিত হতভাগ্য হরিপদ কেরানীর দল।

কাজেই পরাধীন যুগের শিক্ষা-ধারার সঙ্গে আজ আর আপোষ-রফা নয়, নবযুগের চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে আজ সেই কলঙ্কিত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে ঢেলে সাজাতে হবে। তা নইলে ভারতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারীকরণ কখনই সম্ভব হবে না, ভারতের অত্যাবশ্যক চাহিদা মেটাবার জন্যে বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করতে হবে এবং ভারতের বেকারের সংখ্যা চলবে ক্রমাগত বেড়ে। এই প্রকৃত শিক্ষাহীন দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হবে ভয়াবহ। তাই তো আজ দেশের বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে সংগতি রেখে শিক্ষা-সংস্কার জরুরী দরকার। বাণিজ্য-বিদ্যা হবে নবযুগের শিক্ষার প্রধান আকর্ষণ।

নবযুগের শিক্ষা: বাণিজ্য-বিদ্যা

বাণিজ্য-বিদ্যার আছে দুটি দিক: একটি তাত্ত্বিক দিক, অন্যটি ব্যবহারিক দিক। ভারতে বাণিজ্য-বিদ্যার কেবল তাত্ত্বিক দিকটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু বাণিজ্য-বিদ্যার ব্যবহারিক শিক্ষা ছাড়া বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির বাণিজ্য-শিক্ষায়তনগুলিতে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকের একটা সামঞ্জস্য-বিধানের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। ভারতে এ বিষয়ে একটা কঠিন ঔদাসীন্য লক্ষিত হয়। বাণিজ্য-বিদ্যায় কেবল তাত্ত্বিক শিক্ষায় অর্ধ-শিক্ষিতই উৎপন্ন হয়ে থাকে। বর্তমানে কতিপয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশীর সুযোগ আছে, কিন্তু তাতে প্রয়োজন পূরণ হয় না। কাজেই, সরকারকে আরও ব্যাপকভাবে সুযোগসৃষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া প্রত্যেক বাণিজ্য-শিক্ষায়তনের একটি বাধ্যতামূলক ব্যবহারিক বিভাগ থাকা উচিত, যার সঙ্গে সরকারী শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান-সমূহের থাকবে ঘনিষ্ঠ সংযোগ। তাতে থাকবে একটা ব্যবসায় বিভাগ, যেখানে বিক্রয়-শিল্প, চাহিদার স্বরূপ-নির্ধারণ, মূল্য-নিরূপণ ইত্যাদি হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া যাবে। একটা কারিগরী শাখা ও একটি বৃত্তিমূলক শাখা থাকবে এই বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও অনুত্তীর্ণদের এই দুটি বিভাগে শিক্ষা দিয়ে দেশের বেকার-সমস্যার তীব্রতা লাঘব করা যেতে পারে। জনসাধারণ ছাড়া এই বিভাগের উৎপন্ন দ্রব্য রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা ও সকল সরকারী প্রতিষ্ঠান নৈতিকভাবে ক্রয় করতে বাধ্য থাকবে।

বিজ্ঞানসম্মত বাণিজ্য-বিদ্যার স্বরূপ কি হওয়া উচিত?

কেবল ভারতে বাণিজ্য-বিদ্যার যে এই হাল, তা নয়। আফ্রো-এশীয় দেশগুলির বাণিজ্য-বিদ্যার হাল প্রায় এই রকম। এর পশ্চাতে রয়েছে অনুন্নত উৎপাদন

ব্যবস্থা ও বাণিজ্যের স্বল্পতার অভিশাপ। এতদিন এই দেশগুলির সঙ্গে প্রাগ্রসর দেশগুলির বাণিজ্য প্রায় একতরফাভাবেই চলে এসেছে। অগ্রসর দেশগুলি বাণিজ্য-বিদ্যা ও উৎপাদন-কৌশল আয়ত্ত করবার সুযোগ দেয় নি এই হতভাগ্য দেশগুলিকে।

ভারতে বাণিজ্য-বিদ্যার হাল

স্বাধীনতালাভের পরেও ভারতে বাণিজ্য-বিদ্যা বৃহৎ শহরের প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ইদানীং সেই প্রাচীর ডিঙিয়ে কয়েকটি মফঃস্বল শহরে বাণিজ্য-বিদ্যার প্রসার হয়েছে। অন্যদিকে শহরে, চাকরি ও অন্যান্য নানাকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্যে কয়েকটি কলেজের সান্ধ্যবিভাগে বাণিজ্য-বিদ্যা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাগুলি এই বাণিজ্যহীন ও বিদ্যাহীন দেশের পক্ষে অত্যন্ত শুভ, সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে বাণিজ্য-বিদ্যার পঠন-পাঠনের উন্নতিকল্পে কতকগুলি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আবশ্যিক। উচ্চমানের বাণিজ্য-শিক্ষার বিষয়গুলি এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ার বহির্ভূত। দেশের বাণিজ্য-শিক্ষার সঙ্গে বণিক-সংঘগুলির কোন যোগাযোগ নেই। বাণিজ্য-শিক্ষায়তনগুলিতে ব্যবহারিক শিক্ষার কোন আয়োজন নেই। তাছাড়া উপযুক্ত শিক্ষক, পুস্তক ও গবেষণাগারের অভাব তো আছেই। ভারতে বাণিজ্য-বিদ্যার এই ত্রুটিগুলির নিরসন না হলে ও উচ্চতর গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত না হলে সামান্য গোষ্পদের মতো বাণিজ্য-বিদ্যা অকালে যাবে শুকিয়ে, তাতে সন্দেহ কি?

ভারতে শিল্প-বাণিজ্য-বিকাশের প্রাক্কালে বাণিজ্য-বিদ্যার এই দুরবস্থা, সত্যই বেদনাদায়ক। ইতিমধ্যেই ভারতীয় বাণিজ্য দুর্নীতির রাহুগ্রাসে নিপতিত হয়ে অকাল মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। একদিকে, শাসন-কর্তৃপক্ষের নিদারুণ ঔদাসীন্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একদেশদর্শিতায় বাণিজ্য-বিদ্যার উঠেছে নাভিশ্বাস; অন্যদিকে, অশিক্ষিত, মুনাফালোভী, মানবতা-বোধহীন ধূর্ত ব্যবসায়ী-কতিপয়ের পাকে-চক্রে ভারতীয় বাণিজ্যের মৃত্যুলগ্ন ঘনিয়ে এসেছে। খাদ্যে ভেজাল-মিশ্রণ, সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে আয়কর

মানবিকতা বাণিজ্য-বিদ্যার অঙ্গ: আর্থিক ও আত্মিক বিকাশ

ফাঁকি, মাল মজুত রেখে বা উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস করে মূল্যবৃদ্ধি—দুর্নীতির এই রাহুগ্রাস থেকে ভারতীয় বাণিজ্যকে রক্ষা করতে হবে। এবং তাকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হলো বাণিজ্য-বিদ্যায় মানবিকতা (humanity) শিক্ষা দেওয়া। মানুষের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করতে হবে। সেই জাগ্রত মনুষ্যত্ব-বোধই বাণিজ্যকে দুর্নীতির কবলমুক্ত করে ভারতকে আর্থিক ও আত্মিক বিকাশের দিকে নিয়ে যাবে।

সর্ববিষয়ে ছাত্র ও তরুণদের নিন্দিত করবার একটা সহজ প্রবণতা সকলেরই আছে। গৃহে তারা নিন্দিত, সমাজে তারা নিন্দিত, বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা নিন্দিত, সরকার

কর্তৃক তারা নিন্দিত ও ধিকৃত। তাদের ভ্রষ্টাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য তারা অবশ্যই নিন্দার যোগ্য। কিন্তু তাদের বিষয়টা এতখানি অবজ্ঞাভরে বিচার না করে কিছুটা সহানুভূতির সঙ্গে দেখলে সমস্যার সমাধান সহজ হবে। যাকে আমরা ভ্রষ্টাচার উচ্ছৃঙ্খলতা বলি, তা আসলে বিদ্রোহ, এবং সেই বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে সামাজিক জড়তা ও অর্থনৈতিক স্থবিরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। যদি দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে দেশময় একটা কর্ম-চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা যেত, তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বর্তমানের দিশাহারা ভাব কেটে গিয়ে কর্তব্যবোধ ও দায়িত্ববোধ বিকশিত হয়ে উঠতে পারতো। কিন্তু তা আমরা পারিনি। তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে গতির আবেগ, অথচ সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে বার্ধক্যের স্থবিরতা। তাই এত সংঘাত ও সংঘর্ষ। দেশব্যাপী যে বিরাট কর্মযজ্ঞের আয়োজন করা হচ্ছে, তাতে দেশের সকল গতির উৎস তরুণ সম্প্রদায়কে আহ্বান করা উচিত। একজনও যেন বাইরে দাঁড়িয়ে না থাকে। সকলে আসুক, নিজ নিজ সাধ্যমতো অংশ গ্রহণ করুক ভারত-গঠনের বিশাল উদ্যোগে। বাণিজ্য বিদ্যা সেই উদ্যোগে প্রবেশাধিকারের চাবি-কাঠি। তবেই ভারতের অর্থনীতিতে বহুযুগের সঞ্চিত জড়তা ঘুচবে, গতির দোলায় দুলে উঠবে সমগ্র জাতীয় জীবন।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- সাধারণ শিক্ষায় বাণিজ্য-বিদ্যার উপযোগিতা ক. বি. '৬৩
- ব্যবসায়ে বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতা ক. বি. (ত্রৈবার্ষিক) '৬৩
- মধ্যবিত্ত বাঙালী যুবকের বাণিজ্যশিক্ষার সার্থকতা ব বি. (ত্রৈবার্ষিক) '৬৩

৬. বাঙালীর বাণিজ্য-চর্চা
Trade and Commerce of the Bengalees.

প্রবন্ধ-সূত্র: অবতরণিকা—বাঙালীর বাণিজ্য-সম্ভাবনার অপমৃত্যু—বাঙালীর শিল্প-বাণিজ্যের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস—বাণিজ্যে বাঙালীর পরাভবের কারণ: ব্যবসাবুদ্ধির অভাব, শ্রমবিমুখতা, শিক্ষার ত্রুটি—কৃষির অবনতিতে কুটির শিল্পের অধঃপতন—বিজ্ঞান চর্চার অভাব, বাণিজ্যিক দুঃসাহসিকতার অভাব, মূলধনের অভাব, স্বাস্থ্যহীনতা, ভাবপ্রবণতা—দেশবিভাগ—বাণিজ্যে বাঙালীর জয়লাভের শুভ ইংগিত ও উপায়—আলোর পশ্চাতে অন্ধকার—উপসংহার।

অবতরণিকা

"আজ পৃথিবীতে যে সমস্ত দেশ সম্পদশালী হয়েছে তাদের মূলে রয়েছে ব্যবসা। আজ যে আমেরিকা জগতের মধ্যে সব চেয়ে ধনী দেশ বলে গণ্য হয়েছে, তার মূলে রয়েছে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য। বেশি কথায় কাজ কি, আমাদের দেশে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন হবার গোড়ায় রয়েছে পণ্যের আদান প্রদান।···জগতে অর্থের দিক দিয়ে প্রাধান্য লাভ করতে হলে ঘরের আর বাইরের বাণিজ্যকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে ফেলতে হবে। ঘরের পয়সা ঘরে রাখতে হবে, আবার বাইরেরও পয়সা কুড়িয়ে আনতে হবে; দেশের ভিতরকার ব্যবসাগুলোকে সতেজ রাখতে হবেই, অধিকন্তু বাইরে ব্যবসা করবার মত উপযুক্ত সামর্থ্য ও শিক্ষা সঞ্চয় করতে হবে। বাংলার ব্যবসার ইতিহাস ওল্টালে দেখতে পাই, আগে বাংলা দেশে বাঙালীর দুই রকম বাণিজ্যেই হাত-যশ ছিল। কিন্তু আজ বাংলার লক্ষ্মী-শ্রী বড়বাজারে; অন্তর্বাণিজ্যই বলুন, আর বহির্বাণিজ্যই বলুন, একে একে বাঙালীর হাত থেকে সব চলে গেছে বা যাচ্ছে।"

—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়: ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাঙালীর অন্নসমস্যা

বাঙালীর বাণিজ্য-সম্ভাবনার অপমৃত্যু

অথচ বাংলাদেশ বহু-বিচিত্র শিল্প ও বাণিজ্য-সম্ভাবনাময়। বঙ্গলক্ষ্মী অকৃপণ হাতে নানা প্রাকৃতিক সম্পদ উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন তার মাথায়। ছোটনাগপুর থেকে উদ্ভূত বাংলার প্রখর-স্রোতা নদীগুলিতে প্রচুর জলবিদ্যুতের সম্ভাবনা, রানীগঞ্জ-আসানসোলে কয়লার প্রাচুর্য, সন্নিহিত লৌহখনি, ধান-পাট-চা ইত্যাদি অফুরন্ত কাঁচামালের অবারিত দাক্ষিণ্য সত্ত্বেও বাংলা একটি শিল্পে অনগ্রসর দেশ এবং বাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্যে পশ্চাৎপদ

একটি জাতি। বাঙালীর কর্মবিমুখতা ও নিদারুণ নৈষ্কর্ম্যের পরিণামে সে আজ সকল প্রকার বাণিজ্য থেকে বিতাড়িত। পাট, চা, কয়লা, লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা, কাগজ ও কাপড়ের কল—সবই আজ প্রধানতঃ অবাঙালী মালিকদের হাতে। তাছাড়া এই সমস্ত শিল্প-প্রয়াসে যারা শ্রমিক-মজুরের কাজে নিযুক্ত, তারাও এসেছে বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ ও সাঁওতাল পরগনা থেকে। আর শিল্প-বাণিজ্যে সকল অধিকার খুইয়ে বাঙালী জাতির একটি শ্রেণী সর্বরিক্ত কৃষিকে আশ্রয় করেছে, আর একটি শ্রেণী চাকরির ধান্ধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে দুয়ারে দুয়ারে।

বাঙালীর শিল্প-বাণিজ্যের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস

কিন্তু চিরকাল বাঙালী শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ ছিল না। ধনপতি-চাঁদসদাগর-শ্রীমন্ত সদাগর-বিহারী দত্তের বাংলাদেশ কোন কালেই বাণিজ্যে অনগ্রসর ছিল না। অতি প্রাচীনকালেই বাঙালীর বাণিজ্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ বন্দররূপে গড়ে উঠেছিল তাম্রলিপ্ত। সমুদ্রের সান্নিধ্য হারিয়ে তাম্রলিপ্তের পতন হলে বাঙালীর বাণিজ্য-চর্চার প্রাণ-কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠলো সরস্বতী-তীরবর্তী সপ্তগ্রাম। কালক্রমে সরস্বতী এলো মজে এবং সপ্তগ্রামের পতন হলো। সেদিন বাংলার উর্বর মৃত্তিকায় সোনার ধান ফলেছে, বাঙালী শিল্পীর প্রতিভা কুটির-শিল্পকে করেছে সমৃদ্ধ, ধনপতি-চাঁদ সদাগরেরা তাম্রলিপ্ত-সপ্তগ্রাম থেকে দেশ-দেশান্তর অভিমুখে ভাসিয়েছে তাদের পণ্যবাহী নৌ-বহর—মধুকর-সপ্তডিঙা। বাংলার ধন-ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উঠেছে অফুরন্ত ঐশ্বর্য-সম্ভারে। স্থলপথ ও জলপথ—উভয় পথেই চলতো বাংলার বহির্বাণিজ্য। তারপর বাংলার সমৃদ্ধির আকর্ষণে এলো শক্তিমদগর্বী বিদেশীরা। তারা বাংলার কুটির-শিল্পকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল, তারপর বস্ত্রশিল্পের পীঠস্থান ঢাকা, শান্তিপুর, ফরাসডাঙা, ধনেখালি, চন্দ্রকোণা বিধ্বস্ত হলো। এদিকে বৈদেশিক জলদস্যুদের দৌরাত্ম্যে তার সামুদ্রিক বাণিজ্য-যাত্রা নিষিদ্ধ হলো। বাঙালীর বাণিজ্যের গৌরব-সূর্য সপ্তগ্রামও হলো অস্তমিত। তারপর পর্তুগীজদের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠলো হুগলি বন্দর। বাঙালী বণিকেরা হুগলি বন্দরেও ভিড় করলো। শক্তি-সংঘর্ষে পর্তুগীজদের পরাজয়ে ও হুগলি নদীর স্রোত-কার্পণ্যে হুগলি বন্দরেরও আয়ুষ্কাল গেল ফুরিয়ে। তারপর কলকাতা। কলকাতা বন্দর গড়ে ওঠার পেছনে বাঙালী বণিকদের অবদান ছিল যথেষ্ট। কিন্তু য়ুরোপীয় বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়ে তাদের মধ্যে কেউ গেল কৃষিতে ফিরে, কেউ ডিগ্রির মোহে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে চাকরির অন্বেষণে পড়লো বেরিয়ে। নিজভূমে পরবাসীর মতো বাঙালী কলকাতার মাটি আঁকড়ে পড়ে রইলো সামান্যতম জীবিকার আশায়। তারপর এলো পার্শী, মাড়োয়ারী, চীনা এবং পাঞ্জাবী ভাগ্যান্বেষীর দল। কলকাতার ব্যবসা ইতিপূর্বে বাঙালীর হাতছাড়া হয়েছিল।

হাতে ছিল কলকাতার মাটি। এবার তাও চলে গেল পার্শী-মাড়োয়ারীদের হাতে। বড়বাজার, চৌরঙ্গী, পার্ক সার্কাসের দিকে তাকালে আসল চিত্রটি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

বাংলার টাকা আজ স্রোতের বেগে বাংলার বাইরে চলে যাচ্ছে। আর "আমরা কেবল চন্দনবাহী গাধার মতো চন্দন কাঠের ভারটুকুই অনুভব করছি।" বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাঙালীর এই যে পরাভব, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেছিলেন, তার মূলে আছে তার ব্যবসাবুদ্ধির অভাব, তার শ্রমবিমুখতা এবং তার শিক্ষার ত্রুটি। এই ত্রিবিধ ত্রুটির ত্র্যহস্পর্শে বাঙালীর বাণিজ্য তার হস্তচ্যুত হয়ে গেছে। কিন্তু আরও কারণ আছে। যেমন—কৃষির অবনতি, কুটির শিল্পের অধঃপতন, বাণিজ্যিক দুঃসাহসিকতার অভাব, বিজ্ঞানচর্চার অভাব, মূলধনের অভাব, স্বাস্থ্যহীনতা, ভাব-প্রাধান্য ইত্যাদি। একথা সত্য যে, বাঙালী যে শিক্ষার জলুসে অন্ধ হয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে চলেছে, সে শিক্ষায় তার ব্যবসা-বুদ্ধি উদ্বোধিত হয়ে উঠবে না; পক্ষান্তরে, তাকে শ্রমবিমুখ ও পঙ্গু করে তুলবে। দীর্ঘকাল অনুশীলনের অভাবে বাঙালীর ব্যবসা-বুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে। এককালে বাঙালী সদাগর-পুত্র উত্তরাধিকার-সূত্রে যে বাণিজ্য-জ্ঞান লাভ করতো, আজ তার পথ চিরদিনের মতো রুদ্ধ হয়ে গেছে। ফলে, সমগ্র জাতি আধুনিক শিক্ষার প্রলোভনে হরিপদ কেরানীর উত্তরাধিকার লাভ করেছে। অতি আধুনিককালে বাণিজ্য-শিক্ষার শুভ মহরৎ হয়ে গেছে এবং বাঙালী তরুণেরা বাণিজ্য-শিক্ষা লাভের জন্যে অত্যন্ত উৎসাহ প্রদর্শন করছে। কিন্তু সেই উৎসাহ স্বাধীন বাণিজ্য সাধনার জন্যে নয়, সেই উৎসাহ নিতান্তই হরিপদ কেরানীর মতো স্বল্প বেতনের একটি কেরানীগিরি সংগ্রহ করবার জন্যে। একটি জাতির ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা যদি শুধুমাত্র হরিপদ কেরানী হবার জন্যে ফুরিয়ে যায়, তবে তার কাছ থেকে আশা করবার আর রইলো কি?

বাণিজ্যে বাঙালীর পরাভবের কারণ: ব্যবসাবুদ্ধির অভাব, শ্রমবিমুখতা ও শিক্ষার ত্রুটি

কৃষির অবনতি বাণিজ্যে বাঙালীর পরাভবের অন্যতম কারণ। বৈদেশিক শক্তির সংঘাতে তার কুটির-শিল্প যেদিন বিধ্বস্ত হলো, সেদিন দিশেহারা হয়ে বাঙালী শিল্পীরা কৃষিতে গেল ফিরে। দেখতে দেখতে কৃষি হয়ে পড়লো অতি-জনতার (over-population) চাপে জর্জরিত। অন্যদিকে, বিদেশী কল-কারখানার রাক্ষুসে ক্ষুধা মেটাতে তাকে যে পরিমাণ কাঁচামাল সরবরাহে বাধ্য করা হলো, তাতে তার উর্বরতা, উৎপাদন-ক্ষমতা দিনে দিনে হয়ে এলো নিঃশেষিত। অথচ ভূমিক্ষয় দূর করে উর্বরতা বৃদ্ধি করতে বা জলসেচের ব্যবস্থা করে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে কৃষিকে রক্ষা করতে বিন্দুমাত্র প্রয়াস দেখা গেল না। বাংলার যে কৃষি ছিল ভারতের স্বর্ণভাণ্ডার, এই অবারিত শোষণে তা নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত ও দেউলে হয়ে পড়ে রইলো। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার কুটির-শিল্প হারালো তার দীপ্ত

কৃষির অবনতিতে কুটির-শিল্পের অধঃপতন

গরিমা। কৃষির মতো বাংলার কুটির-শিল্পও আধুনিকীকরণের অভাবে অবলুপ্তির পথে গেল নিঃশেষ হয়ে। কুটির-শিল্পের সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর শোনা গেল বাঙালী কবির ব্যথাহত দীর্ঘশ্বাস :

"বাংলার মসলিন বোগদাদ রোম চীন
কাঞ্চন-তৌলেই কিনতেন একদিন।"

কুটির-শিল্পের সেই গৌরবময় দিন আজ অস্তমিত।

বাঙালীর বিজ্ঞান-চর্চাও লুপ্ত হলো। যে সময়ে ইংলণ্ড মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্করণে ব্যাপৃত, তখন বাংলাদেশ কোন্ বারে কিংবা কোন্ তিথিতে যাত্রা শুভ কিংবা অশুভ—এ চিন্তায় লিপ্ত। বিজ্ঞান বাণিজ্যকে সমৃদ্ধ ও গতিশীল করে তোলে। কিন্তু বাঙালীর প্রতি বিজ্ঞান-লক্ষ্মী ও বাণিজ্য-লক্ষ্মী —উভয়েই হলেন বিমুখ। দীর্ঘকাল অনভ্যাস ও নিরুৎসাহের ফলে বাঙালী জাতি তার বাণিজ্যিক দুঃসাহসিকতা হারালো। যে জাতি বাণিজ্যের সেই অনিশ্চয়তার পথে দুঃসাহসিক পদ-বিক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারে না, সে জাতি কখনই বাণিজ্যে জয়লাভ করতে পারে না। বাঙালীর ভাগ্যে ঘটেছে সেই পরাজয়। তার মূলধন নেই, স্বাস্থ্য নেই—সে আজ সর্বরিক্ত। একদিকে বাঙালীর আয়ের স্বল্পতা, অন্যদিকে নানা সামাজিক কারণে তার ব্যয়বাহুল্য—এই দুয়ের টানাপোড়েনে তার হাতে মূলধন সংগঠিত হবার সকল সম্ভাবনা লুপ্ত। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদে ক্ষতিপূরণের অর্থও ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে প্রবাহিত হতে পারলো না। কিন্তু 'টাকার পুঁজি না থাকলেও শরীরের শক্তিকে মূলধন করে'ও বাণিজ্যের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। বাঙালীর তাও নেই। বাঙালীর খাদ্য-তালিকা অত্যন্ত দীর্ঘ হলেও তাতে খাদ্য-প্রাণ নিতান্তই স্বল্প। খাদ্য-প্রাণের অভাবে বাঙালী আজ স্বাস্থ্যহীন, দুর্বল। ব্যবসা-বাণিজ্য তার কাছে বিভীষিকা। অন্যদিকে বাঙালী আবার অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ও উৎসব-প্রিয় জাতি। তার এই ভাবপ্রবণতা ও উৎসব-প্রিয়তা তাকে বাণিজ্য-বিমুখ করে তুলেছে। কিন্তু কেবল ভাবালুতায় ও উৎসব-মত্ততায় কোন দিন কোন জাতি টিকে থাকতে পারে না। রোম, গ্রীস, ব্যাবিলন বৈষয়িকতার শক্ত বনিয়াদ হারিয়ে যেদিন প্রমোদ-উৎসবের মত্ততায় আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লো, সেইদিনই সূচিত হলো তাদের অবলুপ্তির অশুভ লক্ষণ। অতএব উৎসব-উচ্ছ্বাস নয়, ভাবপ্রবণতা নয়, বাঙালী জাতির সর্বাগ্রে চাই বাণিজ্যের প্রতি একটা অনুকূল মনোভাব।

বিজ্ঞান চর্চার অভাব, বাণিজ্যিক দুঃসাহসিকতার অভাব, মূলধনের অভাব, স্বাস্থ্যহীনতা, ভাবপ্রবণতা

ওদিকে দেশ-বিভাগের শাণিত খড়্গ নিপতিত হলো বাংলাদেশের ওপরেই। পাঞ্জাবও বিভক্ত হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশের মতো সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়

পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত হয়নি। বাংলার অর্থনৈতিক গৌরব—ধান ও পাট পড়লো পূর্ববঙ্গের ভাগে। আর হতভাগ্য ছিন্নমূল উদ্বাস্তুর দল সর্বরিক্ত অবস্থায় এসে দাঁড়ালো পশ্চিমবঙ্গের দুয়ারে। পশ্চিমবঙ্গ হয়ে পড়লো অতি-জনতার ভারে জর্জরিত। তার অর্থব্যবস্থাও পড়লো ভেঙে। এইভাবে স্বাধীনতার বলি বাংলাদেশের সকল বাণিজ্য-সম্ভাবনার অপমৃত্যু হয়েছে। বাঙালী কি আর কখনো জাগতে পারবে? স্বাধীনতার মূল্য দিতে গিয়ে তার যে মেরুদণ্ড ভেঙে দু-টুকরো হয়ে গেছে, তা কি সোজা করে সে কখনো দাঁড়াতে পারবে?

দেশবিভাগ

তবু বাণিজ্যে বাঙালীকে আবার জাগতে হবে। তা ছাড়া তার অন্য উপায় নেই। তার জন্যে আজ তার অদম্য কর্মনিষ্ঠার প্রয়োজন। দারিদ্র্য, দুর্ভাগ্য ও প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করে সে আজ লাভ করেছে দুর্জয় আত্মশক্তি ও দুর্বার দুঃসাহস। বাণিজ্যে আজ কেউ তাকে রুখতে পারবে না। কবিগুরু বঙ্গমাতার কাছে অভিযোগ করেছিলেন—

> "সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
> রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করোনি।"

আনন্দের কথা বাঙালী আজ 'মানুষ' হয়েছে। আজ তার ঘর ভেঙে গেছে, দেশ ভেঙে গেছে; আজ তাকে দণ্ডকারণ্য ডাকছে, আন্দামান-নিকোবর ডাকছে, বিশ্ব-জগৎ তাকে ডাকছে। তার কাছে দণ্ডকারণ্য, আন্দামান-নিকোবর—কোন কিছুই সুদূর নয়। সে আজ সেই ডাকে সাড়া দেবে। আর এদিকে সামান্য অর্থ এবং কায়িক শ্রমকে মূলধন করে বাঙালী যুবকেরা ফুটপাতে নেমে পড়েছে। না, কোন কিছুই আজ তার কাছে অসম্মানের নয়। কারণ সে যে আজ 'মানুষ' হয়েছে। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে নবজন্ম লাভ করেছে নতুন যুগের বাঙালী। তার এই নবজন্মলাভ সার্থক হোক। কৃষি ও শিল্পের আধুনিকীকরণে, বিজ্ঞানচর্চার নবারম্ভে ও সর্বোপরি বাণিজ্যিক সচেতনতায় তার নবজন্মলাভ সার্থক হয়ে উঠবে। শিল্পীয় অর্থ-সংস্থান সংস্থার আনুকূল্যে ও সমবায় শক্তির দাক্ষিণ্যে তার পুঁজির অভাব দূরীভূত হবে। আর বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক জ্ঞান করবে সরবরাহ।

বাণিজ্যে বাঙালীর জয়লাভের শুভ ইঙ্গিত ও উপায়

কিন্তু আলোর পশ্চাতে অন্ধকারের মতো এই সুলক্ষণের পশ্চাতে উঁকি মারছে এক ভয়াবহ দুর্লক্ষণ। যখন বিহারের খনিগুলিতে কেবলমাত্র বিহারীদের কর্মদানের নির্দেশ দিয়েছেন বিহার সরকার, তখন পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে নিযুক্ত বাঙালী শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। এই ঘটনায় বাঙালী মাত্রেরই আশঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। ১৯৬২ সালে বাঙালী শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা

যেখানে ছিল শতকরা ৫১·৭২ ভাগ, ১৯৬৩ সালে সেখানে দাঁড়িয়েছে ৪৮·৪১ ভাগে। তার কারণ, রাজ্য সরকার বাঙালী যুবকদের কর্ম-সংস্থানের প্রতি এখনও উদাসীন। সরকারী প্রশাসনিক কাজেও বহু অবাঙালী রয়েছেন। বাঙালীকে সুবিধাজনক মূল্যে ও সুবিধাজনক শর্তে লরি সরবরাহ করলে এবং বাঙালী যুবকেরা মোটর-চালনা শিক্ষা করলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে ও শহরের পথ পরিবহণ-শিল্প অবাঙালীদের একচেটিয়া হয়ে যেতে পারে না। অন্যদিকে কাঁচা মাল, মূলধন এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের সুবন্দোবস্তের অভাবে রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প আজ সংকটের সম্মুখীন। অবাঙালী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় বাঙালী-পরিচালিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলির পক্ষে সরকারী সাহায্য ছাড়া টিকে থাকা অসম্ভব। আসল কথা, বাঙালীর শিল্প-বাণিজ্যের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আরো সহানুভূতি-সম্পন্ন হতে হবে।

আলোর পশ্চাতে অন্ধকার

এদিকে ভারতের শিল্প ও কৃষিতে এসেছে নবজাগৃতি। তাতে বাঙালীকেও অংশ-গ্রহণ করতে হবে। উনিশ শতকের ভাবমূলক ও জ্ঞানমূলক নবজাগৃতির নেতৃত্ব বাঙালী গ্রহণ করেছিল। আজ ভারতে যে কর্মমূলক নবজাগৃতি এসেছে, লক্ষ্মীছাড়া বাঙালী কি তাতে সরে থাকবে? আজ আর গোলামির স্বপ্ন নয়, হরিপদ কেরানীর আকাঙ্ক্ষা নয়, চাকরির উমেদারি নয়; নবজাগ্রত বাঙালীকে আজ আর কাল-বিলম্ব না করে ব্যবসা-বাণিজ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কারণ, "চাকরি করে কোন জাত বড় হয় নি, হতে পারে নি, পারবেও না। কেবল চাকরি করে জাত বাঁচে নি, বাঁচতে পারে না, বাঁচতে পারবেও না।"

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালী ক. বি. '৫৯
- বাণিজ্যে বাঙালী
- বাংলার বাণিজ্য ও তাহার ভবিষ্যৎ
- বাংলার আর্থিক উন্নতির অন্তরায়
- বাংলার অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ ক. বি. '৬২
- বাণিজ্যে ঝুঁকি ক. বি. (ত্রৈবার্ষিক) '৬৫
- ব্যবসায়ের মূলধন—অর্থ ও অধ্যবসায় ক. বি. '৬৫

৭. ভারতের বাণিজ্য ও কলকাতা
India's Trade and Calcutta.

প্রবন্ধ-সূত্র : অবতরণিকা—ভারতের শিল্প-বাণিজ্যে কলকাতার ভূমিকা—কলকাতার আবির্ভাব—কলকাতা-সৃষ্টির মূলে : হুগলির পতন, শেঠ-বসাকেরা, জব চার্নকের কুঠি-স্থাপন—রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি—কলকাতা-সৃষ্টির মূলে : প্রাকৃতিক অবস্থান—পশ্চাদ্‌ভূমি, বিশ্ব-বিজ্ঞান ও বিশ্ব-বাণিজ্য, বাষ্পীয় পোত ও রেলপথ—কলকাতায় স্বাধীন বাণিজ্য ও শিল্প-বিপ্লবের প্রথম তরঙ্গ—নবযুগের জ্ঞানভূমি, কর্মভূমি কলকাতা : সকল নিন্দাবাদ উপেক্ষা—সহযোগিতার পর প্রতিযোগিতা : বাঙালীর চির-পরাজয়—ভারতের নব-শিল্পায়নের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা—কলকাতা মেট্রোপলিটন্ পরিকল্পনা সংস্থা—উপসংহার।

"ভাগীরথীর পশ্চিমে সরস্বতী নদীর তীরে সূর্য অস্ত গেল। একটা যুগের সূর্য। তার নাম মধ্যযুগ। ভাগীরথীর পূবে নতুন যুগের সূর্যোদয় হল কলকাতা শহরে। নবযুগের জ্যোতির কনকপদ্ম কলকাতা।" —বিনয় ঘোষ

অবতরণিকা

মধ্যযুগের তিমিরাবগুণ্ঠন থেকে জন্মলাভ করলো কলকাতা—আধুনিক ভারতের প্রাণকেন্দ্র। তারপর এসেছে কত উত্থান-পতন, কত ভাঙাগড়া। কলকাতা শহর তার মূক সাক্ষীরূপে দাঁড়িয়ে আছে। বিগত দু'শতাব্দী ধরে সে তার ইট-কাঠ-পাথরের পাতায় পাতায় লিখেছে আধুনিক ভারতের ইতিহাস। কলকাতা শহর নব ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ইতিহাসের হৃৎপিণ্ড। দু'শো বছর ধরে কলকাতাই ভারতের সকল সামাজিক, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এসেছে। তারপর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা ভাগ্যের অন্বেষণে এসে ভিড় করেছে এই বাণিজ্য-মহানগরী কলকাতায়। আর এই কলকাতাই সর্বপ্রথমে ভারতের তিমিরাবগুণ্ঠন অপসারিত করে বিশ্বের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিল তার বাণিজ্যিক গাঁটছড়া।

ভারতের শিল্প-বাণিজ্যে কলকাতার ভূমিকা

পাশ্চাত্য-সভ্যতার সংস্পর্শে ক্রমে ভারত যে কৃষি-যুগ থেকে শিল্পযুগে পদার্পণ করেছিল, তার স্বপ্ন দেখেছিল এই কলকাতাই। আবার ইতিহাসের গতি-পরিবর্তনের মুখে সে-ই সমগ্র ভারতকে বিলাতি পণ্য-বর্জনের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। তার ফলে, ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যে ঘনিয়ে এসেছিল যুগান্তর। সে কথা স্মরণ করতে ভারত আজ লজ্জা পেতে পারে। কিন্তু

ইতিহাস ভুলবে না যে কলকাতাই সারা ভারতের চিন্তাভূমি, ভাবভূমি, কর্মভূমি, শিল্পভূমি, বাণিজ্যভূমি, তথা নিখিল মানবের মিলনভূমি।

বন্দরকে কেন্দ্র করে নগর গড়ে ওঠে, বন্দরের অবনতির সঙ্গে নগরও ধ্বংস হয়ে যায়। বঙ্গোপসাগরের অপ্রসন্নতায় তাম্রলিপ্তের পতন হয়েছিল। তারপর সরস্বতী নদীর দাক্ষিণ্যে গড়ে উঠলো সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধিতে ভাঁটা পড়বার আগেই পর্তুগীজেরা এদেশে এসেছিল বাণিজ্যের লোভে। কালক্রমে সরস্বতীর প্রাণ-প্রবাহ এলো শুকিয়ে এবং সপ্তগ্রামেরও হলো পতন। আকবরের রাজত্বকালেই পর্তুগীজেরা হুগলিতে বন্দর ও বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করেছিল।

কলকাতার আবির্ভাব

তারপর ভারতের ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছে ইংরেজ। এদেশে বাণিজ্যের ছাড়পত্র পেয়ে ১৬৫১ সালে হুগলিতে (পর্তুগীজ শব্দ 'ওগ্‌লি'র অর্থ গুদাম) তারা বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করেছে এবং ১৬৯৮ সালে তারা জমিদার হয়েছে কলকাতা-গোবিন্দপুর-সুতানুটির। ১৭০২ সালে প্রথম ব্রিটিশ পতাকা ওড়ে কলকাতার দুর্গ-শিখরে। ১৭৫৭ সালে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দিল এবং ১৭৫৮ সালে গোবিন্দপুর অঞ্চলে জঙ্গল পরিষ্কার করে স্থাপিত হলো নতুন দুর্গের ভিত্তি। আর ভাগীরথীর পূর্ব তীরে চোখ মেলে তাকালো কলকাতা, উদিত হলো নতুন যুগের সূর্য। তাম্রলিপ্তের পর সপ্তগ্রাম, সপ্তগ্রামের পর হুগলি, হুগলির পর কলকাতা।

সুচন্দালগ্নে অস্বাস্থ্যকর জলাভূমি ও 'রেতে মশা, দিনে মাছি' নিয়ে কলকাতা ছিল একটি গণ্ডগ্রাম মাত্র। তবু আর্থিক ভারতের নব-জাগৃতির ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো এই কলকাতায়। ভাগ্যচক্রের অমোঘ বিধানে ইংরেজরা হুগলি থেকে বিতাড়িত হলো। জব চার্নক হুগলি থেকে বাণিজ্য-কুঠি তুলে নিয়ে এবং বাংলা দেশে তাঁদের কুঠি স্থাপনের সম্ভাবনা নেই ভেবে ভাগীরথীর স্রোতে ভাসলেন। উদ্দেশ্য,—উড়িষ্যা অথবা মাদ্রাজের উপকূলে স্থানান্বেষণ। কিন্তু সুতানুটির সমৃদ্ধি তাঁকে সিদ্ধান্ত-পরিবর্তনে প্রলুব্ধ করলো। তিনি স্থির করে ফেললেন—'এ ঘাটে বাঁধিব মোর তরণী।' ওদিকে শক্তি-সংঘর্ষে পর্তুগীজেরা কোণঠাসা হয়ে পড়ায় এবং ইংরেজ জাতি প্রাধান্য বিস্তার করায় হুগলি বন্দরের আয়ুষ্কাল এলো ফুরিয়ে। ১৬৯০ সালে চার্নক তৃতীয় বার 'হল্ট' করেন সুতানুটিতে এবং কলকাতায় কুঠি স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু য়ুরোপীয়দের কলকাতায় আবির্ভাবের পূর্বেই বাঙালী ব্যবসায়ী শেঠ-বসাকরা বাণিজ্যের সুবিধার জন্যে হুগলি ছেড়ে ভাগীরথীর পূর্ব তীরে সুতানুটিতে সুতোর হাট স্থাপন করেছিলেন। তাম্রলিপ্ত-সপ্তগ্রামের ঐতিহ্যে তাঁরা মানুষ, তাম্রলিপ্ত-সপ্তগ্রামের স্বপ্ন তখনও তাঁদের চোখে। হুগলি থেকে বিতাড়িত জব চার্নকের সুতানুটিতে কুঠি-স্থাপনের পেছনে শেঠ-বসাকদের সমৃদ্ধির যে পরোক্ষ প্রেরণা ছিল, তা বলাবাহুল্য। অবশ্য একথাও

সত্য যে, কলকাতা কখনও মহানগরীর রূপ লাভ করতো না, যদি ইংরেজ-শাসকদের রাজধানী ও ইংরেজ বণিকদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র না হতো। ১৭৭৪ সালে বাংলার গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল হলেন। কলকাতার অর্থনৈতিক গুরুত্বের সঙ্গে রাজনৈতিক গুরুত্ব যুক্ত হলো। কেবল সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেই নয়, ভারতের সঙ্গে য়ুরোপের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সংযোগের একটি অদৃশ্য সেতুবন্ধন সেই প্রথম স্থাপিত হলো, যার এক প্রান্তে কলকাতা, অন্য প্রান্তে লণ্ডন।

কলকাতা সৃষ্টির মূলে : হুগলির পতন, শেঠ-বসাকেরা, জব চার্নকের কুঠি-স্থাপন, রাজনৈতিক গুরুত্ব-বৃদ্ধি

প্রকৃতিও কলকাতাকে বন্দর রূপে গড়ে তুলতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেনি। প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্যরূপে বাংলার দিগন্তশায়ী কৃষি প্রান্তরের ধান, পাট, নীল, চা, সিঙ্কোনা ; আসামের চা, কমলালেবু, পেট্রোলিয়ম ও কাঠ ; বিহার ও উড়িষ্যার মূল্যবান খনিজ ও কৃষিজ সম্পদ ; উত্তর প্রদেশের সরষের তেল, চামড়া ইত্যাদি কলকাতার সমৃদ্ধ পশ্চাৎ-পটভূমি রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এদিকে পুরাতন বাণিজ্য-রীতির দিন গত হলো। গো-শকট বা পালতোলা জাহাজ অতীতের ধূসর দিগন্তে বিলীন হয়ে গেল। পৃথিবীতে এলো গতির উল্লাস, বাণিজ্যে এলো যুগান্তর। ১৭৮৭ সালে নির্মিত হয়েছিল প্রথম লৌহপোত, ১৮২১ সালে জলে ভাসলো প্রথম বাষ্পীয় লৌহপোত। ১৮২৪ সালে কলকাতা বন্দর প্রথম বাষ্পীয়-পোতের মুখ দেখলো। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৫৩ সালে ভারতে স্থাপিত হলো রেলপথ। বিশ্বের বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের ইতিহাস কলকাতার ইতিহাস রচনায় এলো এগিয়ে। ভারতের সমৃদ্ধ কৃষি ও খনি অঞ্চলের সঙ্গে রেলপথের নিবিড় জালে কলকাতার গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেল। ভাগীরথীর জলরাশি তোলপাড় করে ১৮২৬ সালে সালকিয়া থেকে দেশীয় কারিগর-নির্মিত একখানি চারশো-টনী জাহাজ ভেসে চললো। ভারতের ঔপকূলিক বাণিজ্য ও বিশ্ব-বাণিজ্যের মধ্যমণি হয়ে উঠলো কলকাতা। ভারতের গতিহীন অনড় অচলায়তনে কলকাতা এনে দিল গতির আবেগ।

কলকাতা-সৃষ্টির মূলে : প্রাকৃতিক অবস্থান—পশ্চাদ্‌ভূমি, বিশ্ব-বিজ্ঞান ও বিশ্ব-বাণিজ্য, বাষ্পীয় পোত ও রেলপথ

১৮২০ সালের ১২ই আগস্ট তারিখে কলকাতা বন্দরের জাহাজ-সংখ্যা ছিল মোট ৯৬ খানি। চীনা জাহাজ ২ খানা, বিলাতী সওদাগরী জাহাজ ১৫খানা, ইংলণ্ডগামী দেশী জাহাজ ৪খানা, চীনদেশগামী দেশী জাহাজ ৫খানা, অন্যত্র গমনাগমনের জন্য দেশী জাহাজ ২৯খানা, বিক্রয় ও ভাড়ার উদ্দেশ্যে খালি জাহাজ ৩৪খানা, ফরাসী জাহাজ ২খানা, মার্কিন জাহাজ ২খানা, পর্তুগীজ জাহাজ ৩ খানা। এই তথ্য

থেকে তদানীন্তন কলকাতা বন্দরের কর্ম-ব্যস্ততার একটি চিত্র সহজলভ্য। তাছাড়া ১৮২০ সালে স্বাধীন বাণিজ্য-নীতি স্বীকৃত হওয়ায় ইংলণ্ডে উৎপাদন-যন্ত্র-নির্মাণের সূত্রপাত হলো, শুরু হলো শিল্প-বিপ্লবের জয়যাত্রা। পৃথিবীর পশ্চিম ভূখণ্ডে অনুষ্ঠিত শিল্প-বিপ্লবের প্রথম তরঙ্গ এসে পূর্ব ভূখণ্ডের উপকূল স্পর্শ করলো এবং তা এই কলকাতা বন্দরেই। ১৮১৮ সালে কলকাতায় স্থাপিত হয়েছিল প্রথম সুতার কল। ১৮১৯ সালে কলকাতার কাছেই শ্রীরামপুরে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হলো, ১৮২৪ সালে স্থাপিত হলো কলকাতা ব্যাঙ্ক। ঐ বছরেই কলকাতায় টাকশাল প্রতিষ্ঠিত হলো, এবং ১৮৩৬ সালে বিনা-মাশুলে মাল গুদামজাতকরণের জন্যে শুল্কাধীন পণ্যাগার নির্মিত হলো। চটকল স্থাপিত হয় কলকাতার কাছেই শ্রীরামপুরে ১৮৫৫ সালে। কলকাতাই এইভাবে প্রস্তুত করে দিল ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের জয়যাত্রাপথ।

কলকাতায় স্বাধীন বাণিজ্য ও শিল্প-বিপ্লবের প্রথম তরঙ্গ

শিল্প-বাণিজ্যের নবযুগ-প্রভাব সঞ্চারিত হলো ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে। নবযুগের জ্ঞানভূমি ও কর্মভূমি হয়ে উঠলো কলকাতা শহর। নতুন যুগের ভাগ্য শিকারীর দল কলকাতা অভিমুখে যাত্রা শুরু করলো। তারাই পরবর্তীকালে গঠন করলো কলকাতার অভিজাত সম্প্রদায়। ভারতের শিল্প, বাণিজ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ ও শিক্ষা-আন্দোলনে তারাই হলো অগ্রণী। কলকাতাই হলো এসব বিষয়ে ভারতের প্রথম পথ-প্রদর্শক। কলকাতার ইতিহাসই হলো সমগ্র ভারতের ইতিহাস। আজ সে 'পচা শহর', 'মিছিল শহর', 'গন্ধা শহর' বলে ধিকৃত হচ্ছে এবং সেই ধিক্কার-বাক্যকে বাণিজ্য-নগরী কলকাতা বৃদ্ধা প্রপিতামহীর মতো উপেক্ষা করে চলেছে। কিন্তু কলকাতাই যে সারা ভারতকে আধুনিক যুগের আলোকিত জগতে বয়ে এনেছে, সে কথা কেউ কি অস্বীকার করতে পারবে?

নবযুগের জ্ঞানভূমি, কর্মভূমি কলকাতা: সকল নিন্দাবাদ উপেক্ষা

কলকাতায় সেদিন প্রথম ভারতীয় কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একদিন বাঙালীর সহযোগিতায় বিদেশীরা অর্থবল, শাসনবল ও বুদ্ধিবলের দ্বারা মুনাফার বিরাট্ অংশ করায়ত্ত করছিল। মুনাফার কড়ি স্বর্ণে রূপান্তরিত হয়ে চালান যেত য়ুরোপে। বাঙালীই সেই সহযোগিতার যোগসূত্র ছিন্ন করে অবতীর্ণ হলো প্রতিযোগিতায়। সেই সব প্রতিযোগিতায় বাঙালী যে সব সময় জয়লাভ করেছে, তা নয়। তবু ব্যর্থতাই সাফল্যের জননী হয়েছে। পরবর্তী কাল এসে তাদের ব্যর্থতার ওপরে স্বদেশের শিল্প-বাণিজ্যের সফলতাকে স্থাপন করে জয়ধ্বনি ঘোষণা করেছে। এদিকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মোহে চাকরি ও সিভিল সার্ভিসের মিথ্যা মরীচিকায় আকৃষ্ট

সহযোগিতার পর প্রতিযোগিতা: বাঙালীর চির-পরাজয়

হয়ে বাঙালী শিল্প-বাণিজ্যের জগৎ থেকে অপসৃত হলো। আর তাদের স্থান অধিকার করলো পার্শী, মাড়োয়ারী, চীনা, পাঞ্জাবী ভাগ্যান্বেষীর দল। নিজভূমে পরবাসীর মতো বাঙালী কলকাতার মাটি কামড়ে পড়ে রইলো সুদিনের আশায়। সেই সুদিন তার ভাগ্যে আর এলো না। কলকাতার ব্যবসা বহু পূর্বেই সে হারিয়েছিল। হাতে ছিল কলকাতার মাটি। এবার তাও হাতছাড়া হয়ে গেল। বড়বাজার, চৌরঙ্গী, পার্ক সার্কাসের দিকে তাকালে বাঙালীর এই পরাভব স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

স্বাধীনতালাভের পর কলকাতার বাণিজ্য ভারতীয় ধনপতিদের হাতে চলে গেছে। বাঙালী সেখানে নেই। অবাঙালীরা কলকাতার আভ্যন্তর ও বহির্বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে দখল করে বসেছে। ইতিমধ্যে দুর্গাপুর, রাউরকেলা, ভিলাই, বোকারো ইত্যাদি গড়ে উঠছে। কলকাতাই হলো সেই শিল্প-সমৃদ্ধ অঞ্চলের প্রাণ-কেন্দ্র। পূর্ববঙ্গের ধান-পাটের বাজার হাত-ছাড়া হলেও কলকাতা বন্দরের বা রেল-ইয়ার্ডের কর্মব্যস্ততা কিন্তু ক্রমবর্ধমান। তৃতীয় ও চতুর্থ যোজনায় উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে আগামী দশবছরে কলকাতা বন্দর দিয়ে মাল চলাচলের পরিমাণ হবে দ্বিগুণ। কাজেই ১৯৭০-৭১ সালের মধ্যে কলকাতা বন্দরকে দু'কোটি টন মাল চলাচলের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে।

ভারতের নব শিল্পায়নের প্রাণ-কেন্দ্র কলকাতা

কারণ সমগ্র আসাম, নেপাল, ভুটান, সিকিম, ও পূর্ব-পাকিস্তানের ব্যবসা-বাণিজ্য কলকাতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। নেপালের কাঠ, পশমজাত দ্রব্য ও মনুষ্য-শক্তি কলকাতা আমদানি করে, বিনিময়ে রপ্তানি করে যন্ত্রপাতি, ঔষধ, বিলাসদ্রব্য, কয়লা, কার্পাসজাত দ্রব্য ও যানবাহন। পূর্ব-পাকিস্তান কলকাতায় রপ্তানি করে মাছ, সুপারি, নারিকেল, ডিম ও পাট এবং আমদানি করে কাচ, চিনি, বস্ত্রজাত দ্রব্য, ইস্পাত ও কয়লা। আসাম থেকে চা, কেরোসিন, পেট্রোল, রেশম ও কাঠ কলকাতায় আসে, আর কলকাতা থেকে যায় ডাল, পাটজাত দ্রব্য, ধুতি, শাড়ি, বিলাসদ্রব্য, ইস্পাত, কয়লা ও লবণ। একমাত্র বিহার রাজ্যে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে মাসে প্রায় দু'কোটি টাকার মনি অর্ডার প্রেরিত হয়।

বাণিজ্য-মহানগরী কলকাতা আজ অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে জর্জরিত। প্রায় ৬০ লক্ষ লোকের বাসগৃহ, পরিস্রুত জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা আজ তার স্বল্প পরিসরে একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কলকাতার সম্প্রসারণ আজ জরুরী প্রয়োজন। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'কলকাতা মেট্রোপলিটন্ পরিকল্পনা সংস্থা' গঠন করেছেন এবং ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ও রাষ্ট্রপুঞ্জ বিশেষজ্ঞগণের সাহায্যে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করার দায়িত্ব

কলকাতা মেট্রোপলিটন্ পরিকল্পনা সংস্থা

অর্পণ করেছেন এই সংস্থার হাতে। আগামী বছরের মধ্যেই কলকাতা মেট্রোপলিটন্ জেলার জল সরবরাহ, জল নিষ্কাশন এবং ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর সর্বাত্মক উন্নয়ন প্রকল্প রচনা শেষ হবে। উলুবেড়িয়া থেকে বাঁশবেড়িয়া এবং কল্যাণী থেকে বজবজ ও বারুইপুর এই সাড়ে চার শ বর্গমাইল এলাকার নামই কলকাতা মেট্রোপলিটন্ জেলা। কলকাতায় গঙ্গার ওপর দ্বিতীয় সেতু নির্মাণের জন্যে প্রয়োজনীয় ১৬ কোটি টাকার মুদ্রা দিতে বিশ্বব্যাঙ্ক স্বীকৃত। সেতুর কাজ ত্বরান্বিত করার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রের কাছে দরবার করছেন। এই পরিকল্পনার রূপায়ণে ২২০ কোটি টাকার প্রয়োজন। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার চতুর্থ যোজনায় বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়নের জন্যে ১০১ কোটি টাকার কার্যসূচী গ্রহণ করেছেন।

একদিকে যেমন কলকাতা মহানগরীর নবরূপায়ণের পরিকল্পনা গৃহীত হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি কলকাতা বন্দরের নাভিশ্বাস শুরু হয়ে গেছে। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার রূপায়ণের ফলে দামোদর, রূপনারায়ণ ইত্যাদি নদী আর আগেকার মতো ভাগীরথীকে প্রচুর পরিমাণে জলদান করতে পারছে না। গঙ্গার মূল জলধারাও ভাগীরথী-বক্ষ পরিহার করে পদ্মাবক্ষ আশ্রয় করেছে। ফলে, আর ভারি জাহাজের মুখ কলকাতা বন্দর দেখতে পায় না। কলকাতা বন্দরকে বাঁচাবার জন্যে একদিকে জাপানের ইয়াকোহামার

উপসংহার

মতো সহযোগী হলদিয়া বন্দর গড়ে তোলা হচ্ছে, অন্যদিকে গঙ্গার মূল প্রবাহের জলধারা ভাগীরথী-বক্ষে প্রবাহিত করাবার জন্যে 'ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা' গৃহীত হয়েছে। কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষও ভাগীরথী-গর্ভ পলিমুক্ত করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তা সত্ত্বেও মনে প্রশ্ন জাগে, কলকাতা-মহানগরী বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে তো? তাম্রলিপ্তের পর সপ্তগ্রাম, সপ্তগ্রামের পর হুগলি, হুগলির পর কলকাতা। কলকাতার পর কি?—সে কি হলদিয়া?—যার পরিবর্তিত নাম তাম্রলিপ্ত?

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- বাণিজ্য-নগরী কলকাতা
- শিল্প-নগরী কলকাতা

৮. ভারতের শিল্প-বিপ্লব
Industrial Revolution in India.

প্রবন্ধ-সূত্র : অবতরণিকা—শিল্প-বিপ্লবের অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তি—পৃথিবীর শিল্প-বিপ্লবের সূর্যোদয়—ভারতের শিল্প-বিপ্লবের ইতিহাসের দুই অধ্যায়—এক, পরিকল্পনাহীন শিল্পায়োজন ১৮১৮-১৯৪৭—দুই, পরিকল্পিত শিল্প-বিপ্লব : প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনা—লৌহ-ইস্পাত, ভারি যন্ত্রপাতি, রেল, জাহাজ, বিমান—বস্ত্র, কাগজ, চিনি, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধপত্র-উৎপাদন, ক্ষুদ্র-শিল্প ও কুটির-শিল্প—সরকারী শিল্পনীতি—উপসংহার।

অবতরণিকা

এতদিনে ভারতে প্রকৃত শিল্প-বিপ্লব সূচিত হয়েছে। এতদিনে এসেছে ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে যথার্থ যুগান্তর। শিল্প-বিপ্লবের আশীর্বাদপুষ্ট ইংরেজ জাতি দীর্ঘ দু' শতাব্দী ধরে শাসন করে গেল এই দেশ। কিন্তু যতদিন তারা এদেশ শাসন করেছে, ততদিন ভারতের ভাগ্যে শিল্প-বিপ্লবের আশীর্বাদ নয়, অভিসম্পাতই জুটেছে। আর ইংরেজজাতি এদেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর এদেশে এলো শিল্প-বিপ্লবের ঢেউ। এ ঘটনা ইতিহাসের পরিহাস ছাড়া আর কি? স্বার্থ-সন্ধ ইংরেজ শিল্প-বিপ্লবের অমৃত ভাগ পুরোপুরি ভোগ করবার জন্যে ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যমণ্ডিত কুটির-শিল্পকে ধ্বংস করে তাকে কৃষি-নির্ভরতার দিকে ঠেলে দিয়েছে।—একথা কি ইতিহাস কোনদিন ভুলতে পারবে?

শিল্প-বিপ্লবের অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তি

দুশো বছরে ইংরেজ-শাসনে ভারতে শিল্প-বিপ্লব বিলম্বিত হয়েছে। কিন্তু ভারতের কৃষি-সৌভাগ্যও তার শিল্পায়নের পথে একটি প্রধান অন্তরায়। ভারতের লক্ষ-লক্ষ একর কর্ষণযোগ্য ভূমি, বিন্ধ্য-হিমাচল-বিগলিত করুণাধারায় অপর্যাপ্ত উর্বরতা ও মৌসুমী প্রবাহের দাক্ষিণ্যে তার অফুরন্ত কৃষি-সৌভাগ্য—তার দেশবাসীকে একদিকে করেছে কৃষি-নির্ভর, অন্যদিকে করেছে শিল্পবিমুখ। অর্থাৎ কিনা, শিল্প-বিপ্লবের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল উপকরণই ছিল ভারতের ঘরে প্রস্তুত। তার ক্ষেতে ও খামারে অফুরন্ত কৃষি-সম্পদ, অরণ্যে ও ভূগর্ভে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ, জনপদে-লোকালয়ে সুলভ শ্রমশক্তি এবং নদীস্রোতে ও ভূগর্ভস্থ কয়লা-পেট্রোলিয়ামে রয়েছে অফুরন্ত শক্তির সম্ভাবনা। ভারতের ঘরে ছিল সবই; ছিল না কেবল তিনটি জিনিস : এক, শিল্পের অনুকূল মানসিকতা (mentality); দুই, শিল্পায়নের অনুকূল শিক্ষাশৈলী; তিন, শিল্পায়নের কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা। তাই তার শিল্প-বিপ্লব এতদিন বিলম্বিত হয়েছে।

(অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইংলণ্ডে নবযুগের সূর্যোদয় হয়। জেম্‌স্ ওয়াট্ ও স্টিভেন্‌সন্ বাষ্প-শক্তিকে বশীভূত করবার কৌশল আবিষ্কার করলেন। জলে ভাসলো বাষ্পীয় জাহাজ, ডাঙায় ছুটলো রেলগাড়ি আর কারখানায় আপন ছন্দে ঘুরতে লাগলো কলের চাকা।) পাল-তোলা জাহাজের পালগুলোকে নামিয়ে ফেলা হলো, তার মাস্তুল বিলীন হয়ে গেল বিগত শতাব্দীর দিগন্তরালে। এদিকে পৃথিবীর উৎপাদনের ইতিহাসের পাতা গেল উল্‌টিয়ে। কুটির-শিল্পের সীমিত উৎপাদনের স্বল্প উপকরণগুলিকে তুলে রাখা হলো। দেখতে দেখতে ইংলণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলি সুসজ্জিত হয়ে উঠলো আধুনিক শিল্প-সম্ভারে এবং এশিয়া-আফ্রিকার কাঁচামাল লুণ্ঠনের আশায় ভাসলো তাদের যুদ্ধ-জাহাজ।

পৃথিবীর শিল্প-বিপ্লবের সূর্যোদয়

(ভারতের শিল্প-বিপ্লবের ইতিহাসের দুটি অধ্যায় : এক, পরিকল্পনাহীন শিল্পায়োজন ; দুই, পরিকল্পনাযুক্ত শিল্প-বিপ্লব। বলাবাহুল্য, প্রথম অধ্যায়ের অপরিকল্পিত শিল্পায়োজন ভারতের অর্থনীতির মূল বনিয়াদটাকে ধরে নাড়া দিতে পারেনি। তবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিল্পায়নের প্রাথমিক সোপান রচনার কাজ বনিয়াদী শিল্প-স্থাপনের মাধ্যমে দিকে দিকে শুরু হয়ে গেছে। দুর্গাপুর, রৌরকেলা, ভিলাই ও বোকারো—ভারতের শিল্প-বিপ্লবের এই চার দিগন্ত আজ কর্মব্যস্ততায় মুখর হয়ে উঠেছে। নতুন প্রভাত এসে আজ দাঁড়িয়েছে ভারতের দুয়ারে।)

ভারতের শিল্প-বিপ্লবের ইতিহাসের দুই অধ্যায়

(অপরিকল্পিত শিল্পায়োজনের যুগ সূচিত হয় ইংরেজ-আমলেই—'সাঁঝ বেলার পিদিম জ্বালার আগে সকাল বেলার সল্‌তে পাকানো'র মতো। ১৮১৮ সালে কলকাতার কাছেই প্রতিষ্ঠিত হলো কাপড়ের কল ; ভারতীয় পুঁজি ও প্রয়াসে ১৮৫৪ সালে দেখা গেল বোম্বাই-এ বস্ত্র-শিল্পের নতুনতম আয়োজন। বিদেশী পুঁজি ও পরিচালনায় ১৮৫৫ সালে কলকাতার কাছে শ্রীরামপুরে স্থাপিত হলো চটকল। ইতিমধ্যে অসূর্যম্পশ্যা কয়লার খনিগুলিতে কাজ শুরু হয়েছিল। ১৮২৪ সালে কলকাতা বন্দর প্রথম বাষ্পীয় পোতের মুখ দেখলো ; অন্যদিকে, ১৮৫৩ সালে রেলপথ বিস্তৃত হলো ভারতে। এগুলি পুরোপুরি শিল্প-বিপ্লব নয়, শিল্প-বিপ্লবের ভূমিকা মাত্র।) তারপর সিপাহী বিদ্রোহের দশ বছর পর ১৮৬৭ সালে বেলগাছিয়া হিন্দুমেলায় ভারতীয় কুটির-শিল্পের লুপ্ত ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণ প্রয়াস সূচিত হয়। অবশেষে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিতে বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের পথে পথে ম্যাঞ্চেস্টার-বাকিংহাম পুড়তে লাগলো এবং দেশবাসী স্বাদেশিকতার সেই শুভলগ্নে বিলিতি কাপড়ের পরিবর্তে কুটির-শিল্পজাত 'মায়ের

এক, পরিকল্পনাহীন শিল্পায়োজন : ১৮১৮-১৯৪৭

দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে' নিয়েছিল। বিদেশী পণ্য-বর্জন ও স্বদেশী পণ্য-গ্রহণ—এই ছিল সেদিনের প্রতিশ্রুতি। এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিকায় ১৯০৭ সালের ২৬শে আগস্ট বিহারের সাক্‌চীতে টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা রচনা করলো স্বদেশী শিল্পের নতুন ইতিহাস। তারপর ভারতীয় শিল্পকে অভূতপূর্ব গতিদান করবার জন্য এগিয়ে এলো প্রথম মহাযুদ্ধ। তার অগ্রগতির গভীর স্বাক্ষর মুদ্রিত হলো বস্ত্রশিল্প, পাটশিল্প ও চর্মশিল্পে। ১৯১৬ সালে নেতৃবৃন্দের চাপে শিল্প কমিশন (Industrial Commission) গঠিত হয়েছিল ভারতীয় শিল্প-প্রগতির একটা আমূল জরীপ করবার জন্যে। সেই শিল্প কমিশন ভারতীয় শিল্পের উন্নয়নের জন্যে যে মূল্যবান সুপারিশগুলি করেছিল, হৃদয়হীন বিদেশী সরকার তা পদদলিত করলো। অবশ্য ইতিমধ্যে ভারতীয় ফিস্‌ক্যাল কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ১৯২২ সালে বিভেদাত্মক সংরক্ষণ নীতি অনুসৃত হওয়ায় ১৯২২ সাল থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে বস্ত্রোৎপাদন দ্বিগুণিত হয়, লৌহ ও ইস্পাত-উৎপাদন বৃদ্ধি পায় আট গুণ এবং কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় আড়াই গুণ। ১৯২৯ সালের শ্রমিক বিক্ষোভ এবং ১৯২৯-১৯৩৩ সালের মধ্যে যখন আন্তর্জাতিক মন্দাবাজারে বিশ্ব-বাণিজ্যের দুঃসময় সূচিত হয়েছিল তখনই ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে এই ঘটনা কম আশ্চর্যের কথা নয়। ভারতীয় শিল্পের সম্ভাবনা কত সুদূর-প্রসারী, তা এতেই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। অন্যদিকে, সংরক্ষিত চিনি-শিল্পের অভাবিতপূর্ব উন্নতিতে ভারত চিনি-উৎপাদনে স্বয়ংভরতা লাভ করে। একই সময়ে সিমেণ্ট-শিল্প বিকাশলাভ করে এবং ১৯৩৫-৩৬ সালে দেশের চাহিদার শতকরা ৯০ ভাগ সিমেণ্ট উৎপাদনে সক্ষম হয়। তাছাড়া এই সময়ের মধ্যে দেশলাই, কাচ, সাবান, বনস্পতি ও কোন কোন যন্ত্রশিল্পে ভারত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করে। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম-নির্মাণে ইত্যবসরে ভারতের স্মরণীয় সাফল্য পরিলক্ষিত হয়। এই অবস্থায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসে পড়ায় তাতে ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলো। আমদানি-রপ্তানির সেই সংকটপূর্ণ পরিবেশে ভারতীয় শিল্প দেশীয় চাহিদা মেটাবার জন্যে মাথা তুলে দাঁড়ালো। কিন্তু ১৯১৬ সালের শিল্প কমিশনের যে সোচ্চার মন্তব্য—'ভারতের শিল্পোন্নয়ন তার সম্পদ ও চাহিদার সমানুপাতিক নয়'—তার কঠিন সত্যতা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অগ্নিশিখার আলোকে আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করলাম।

স্বাধীনতালাভের পর আমরা এই ত্রুটি-মোচনে একটি বলিষ্ঠ সর্বমুখী জাতীয় পরিকল্পনার অভাব বোধ করি। জাতীয় সরকার নানা বিশেষজ্ঞ-সমাবেশে একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন। ১৯৫১ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিশাল কর্মযজ্ঞে ভারতে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেল। এতদিন পরে ভারতে প্রকৃত শিল্প-বিপ্লব

শুরু হলো। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি, সেচ এবং শক্তি উৎপাদনের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হয়। কৃষিই শিল্প-বিকাশের প্রাথমিক সোপান রচনা করে দেবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তাই শিল্প-বিপ্লবের শক্ত গাঁথুনির কাজ শুরু হয়ে যায়। এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় বনিয়াদী শিল্প ও ভোগ্য পণ্য-শিল্প প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সমধিক। সেই সঙ্গে যন্ত্র নির্মাণ প্রকল্প ও কারিগরী দক্ষতাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ-সরবরাহ, রাস্তাঘাট-পরিবহণ ইত্যাদি ছাড়াও বস্ত্রশিল্প, শর্করা-শিল্প, বনস্পতি, সিমেণ্ট, কাগজ, কস্টিক সোডা, রেয়ন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, বাই-সাইকেল, খনিজ তৈল-উৎপাদন ইত্যাদিতে ভারত যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করে। বলা যায়, প্রথম পরিকল্পনাকাল ভারতের শিল্প-বিপ্লবের প্রস্তুতি-পর্ব এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্প-বিপ্লবের প্রকৃত যাত্রারম্ভ। এই সময়েই টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানীর উৎপাদন ৮ লক্ষ টন থেকে ১৫ লক্ষ টন এবং ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানীর উৎপাদন ৩ লক্ষ টন থেকে ৮ লক্ষ টন বৃদ্ধি করা হয়। অন্যদিকে, সরকারী পরিচালনায় প্রত্যেকটি ১০ লক্ষ টন উৎপাদনক্ষম তিনটি নতুন শিল্পায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারাই শিল্প-যুগের নতুনতম বার্তাবহ। ভারতের নব শিল্পায়নের প্রতীক হলো পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর, উড়িষ্যার রৌরকেলা আর মধ্যপ্রদেশের ভিলাই। তাদের অনুসরণে গড়ে উঠছে বার্ষিক ৪০ লক্ষ টন উৎপাদনক্ষম বোকারো। কেন্দ্রীয় ইস্পাত ও খনি মন্ত্রী শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী আশা প্রকাশ করেন ১৯৭০-৭১ সালে বোকারোয় ইস্পাত উৎপাদন শুরু হয়ে যাবে। এবং চতুর্থ যোজনায় দেশের ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনের লক্ষ্য পূর্ণ হবে। তাছাড়া হিমাচল প্রদেশের নাহান ফাউণ্ড্রি, পশ্চিমবঙ্গের রূপনারায়ণপুরের হিন্দুস্থান কেবল্ ফ্যাক্টরী, কলিকাতার ন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেণ্টস্ ফ্যাক্টরী, ভূপালের হেভি ইলেকট্রিক্যাল্স্ (প্রাইভেট) লিমিটেড-এ আজ অনুভূত হচ্ছে নতুন প্রাণের স্পন্দন। ১৯৫৫ সালে জাতীয় শিল্পোন্নয়ন সংস্থা (National Industrial Development Corporation) এবং ১৯৫৮ সালে ভারি যন্ত্রপাতি নির্মাণ সংস্থা (Heavy Engineering Corporation) গঠিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল যেখানে ৪৩ লক্ষ টন, সেখানে উৎপাদন হয়েছে মাত্র ২২ লক্ষ টন। সিমেণ্টের উৎপাদন লক্ষ্য ছিল ১·৩ কোটি টন, সেখানে উৎপাদন হয়েছে মাত্র ৮০ লক্ষ টন। অনভিজ্ঞতা, কারিগরী দক্ষতার অভাব ও বৈদেশিক মুদ্রা সংকট মূলতঃ এই ব্যর্থতার জন্যে দায়ী। তৃতীয় পরিকল্পনায় লৌহ ও ইস্পাত, ভারি যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক সার উৎপাদনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত

দুই, পরিকল্পিত শিল্প-বিপ্লব: প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনা

লৌহ ও ইস্পাত, ভারি যন্ত্রপাতি, রেল, জাহাজ, বিমান

হয়েছে। এই পরিকল্পনায় 'বোকারো'য় চতুর্থ ইস্পাত কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। ভারত এখন রেল-ইঞ্জিন, ওয়াগন ও কোচ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করেছে। শুধু তাই নয়, বিদেশে রেল-ইঞ্জিন, ওয়াগন ও কোচ রপ্তানির সামর্থ্যও সে অর্জন করেছে। চিত্তরঞ্জনে রেল ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানা এবং টাটা ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্ এই সাফল্যের বিশেষ অংশীদার। হিন্দুস্থান শিপ্ইয়ার্ড লিমিটেড নামে জাহাজ নির্মাণ সংস্থাটি বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে সরকারের ক্ষমতাধীন। এই সংস্থা বিশাখাপত্তম জাহাজ নির্মাণ কারখানায় বিশেষ সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। সেই সঙ্গে কোচিনে চলেছে নতুন কারখানা স্থাপনের আয়োজন। অন্যদিকে হিন্দুস্থান এয়ার ক্র্যাফ্ট লিমিটেড বিমান-নির্মাণে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছে।

বস্ত্র, কাগজ, চিনি

বস্ত্রশিল্প, কাগজ-শিল্প ও চিনি-শিল্পে ভারত স্বয়ংভরতা লাভ করেছে। শিল্পায়নের এই পর্বে ভারত রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধপত্রাদি নির্মাণে স্মরণীয় অগ্রগতি লাভ করেছে। ভারত সরকার দিল্লীতে ডি. ডি. টি. কারখানা, পুনার সন্নিকটে পিম্প্রি-তে পেনিসিলিন কারখানা ও স্ট্রেপ্টোমাইসিন্ কারখানা স্থাপন করেছেন। সিন্ধ্রি সার-উৎপাদন কারখানা নানা গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনে সাফল্যলাভ করেছে।

রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধপত্র-উৎপাদন

শুধু তাই নয়, ভারত এখন পারমাণবিক যুগে প্রবেশ করেছে। পারমাণবিক শক্তিকে সে অবশ্য কল্যাণমূলক কর্মে নিয়োজিত করে চলেছে। কেবল বৃহদায়তন শিল্পই নয়, ভারত কুটির-শিল্প ও ক্ষুদ্র-শিল্পকেও তার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেনি। যেখানে কাঁচামাল আছে, আছে ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও শিল্প স্থাপনের উদ্যম, সেইখানেই করা হয়েছে গ্রামীণ শিল্পায়নের সুপারিশ। এইভাবে ৪০টি গ্রামীণ-শিল্প প্রকল্পের কাজ চালু হয়েছে। তাদের রূপায়ণে তৃতীয় যোজনায় বরাদ্দ ছিল ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। চতুর্থ যোজনায় তার পরিমাণ হবে ৭ কোটি টাকা। এইভাবে বৃহৎ শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের সুষম গাঁটছড়া বেঁধে দিয়ে ভারত এগিয়ে চলেছে তার শিল্পায়নের সার্বিক সাফল্যের পথে।

ক্ষুদ্র-শিল্প ও কুটির-শিল্প

ভারতীয় শিল্পের এই জয়যাত্রার পেছনে রয়েছে যে বলিষ্ঠ সরকারী শিল্পনীতি, তাও এই প্রসঙ্গে অবশ্য আলোচিতব্য। প্রথম শিল্পনীতি বিঘোষিত হয় ১৯৪৮ সালে। তার সাথে সংগতি রেখে সংবিধানের সংশোধন করা হয় এবং ১৯৫১ সালের শিল্প আইন (Industries Act, 1951) কার্যকরী করা হয়। দ্বিতীয় শিল্পনীতি বিঘোষিত হয় ১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিল। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজগঠনের দিকে দৃষ্টি রেখে এই নীতি গঠিত হয়েছিল। এই নীতির অনুসরণে সমস্ত শিল্পকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় এবং ক-শ্রেণীকে সরকারী

সরকারী শিল্পনীতি

নিয়ন্ত্রণাধীন ও খ-শ্রেণীকে বে-সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়। রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় শিল্পসমূহ, খনি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলি ক-শ্রেণীভুক্ত, এবং অবশিষ্ট শিল্পগুলি খ-শ্রেণীভুক্ত। শিল্পোন্নয়নে উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে ১৯৬৫ সালের অর্থাবলে কোম্পানী সংক্রান্ত কর ব্যবস্থার কিছু হেরফের ঘটিয়ে ১৯৫১ সালের শিল্প আইনের ক শ্রেণীভুক্ত যৌথ কোম্পানীগুলিকে কিছু সুবিধার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ট্যাক্স ক্রেডিট সার্টিফিকেটের প্রবর্তন সেই সুবিধাগুলির অন্যতম।

কাজেই ইংরেজ এদেশ থেকে বিতাড়িত হবার পর এদেশে প্রকৃত শিল্পবিপ্লব এলো। আজ দিকে দিকে দেখা দিয়েছে শিল্প-বিপ্লবের বিপুল আয়োজন। সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত শিল্প-সম্প্রসারণের মাধ্যমে ভারতের শিল্পবিপ্লবের জয়যাত্রা সূচিত হয়েছে। কিন্তু

উপসংহার

এখনও সবকিছুই সূচনামাত্র। ভারতীয় শিল্পের যাত্রাপথ দিগন্ত বিস্তৃত। এখন চলেছে শুধুমাত্র মূল শিল্প-গঠনের আয়োজন। ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে এখনও অনেক বাকি। যেদিন সেই ভোগ্যপণ্য-উৎপাদন শুরু হবে, সেদিন ভারতীয় গণজীবনে শিল্প-বিপ্লবের প্রথম স্পন্দন অনুভূত হবে। এখন শুধু আমাদের প্রত্যাশা—'অযমারম্ভঃ শুভায় ভবতু'।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- ভারতের মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা, ক. বি. '৬৬
- বৃহৎ-শিল্পে সরকারী বে-সরকারী ভাগাভাগি, ক. বি, (ত্রৈবার্ষিক) '৬২
- ভারতের নব শিল্পায়ন

৯. ভারতের কৃষি-বিপ্লব
Agricultural Revolution in India.

প্রবন্ধ-সূত্র : অবতরণিকা—ভারতের কৃষি ও কৃষিজীবীর সমস্যা—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনা : মধ্যস্বত্ব বিলোপ ও প্রজা-স্বত্বের প্রতিষ্ঠা-ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমান্ত রচনা—জমির চকবন্দীকরণ—ইজারা ও উত্তরাধিকার আইনের সংশোধন—নদী-পরিকল্পনা ও জল-সেচ-উৎকৃষ্ট সার প্রয়োগ ও উৎকৃষ্ট শস্যবীজ—ফসলের ব্যাধি-নিরাময় ও পঙ্গপাল-বিতাড়ন—ফসল ফলন অভিযান ও নিবিড় কৃষির জেলা-কার্যসূচী—উন্নত পণ্যের কৃষি-বাজারি ও তার কার্যসূচী—উপসংহার।

অবতরণিকা

ভারতের কৃষি-লক্ষ্মী একদিন গ্রহণ করেছিল ক্ষুধার্ত বিশ্বের ক্ষুধাহরণের ব্রত। আর আজ ভারতের কৃষি ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে দেউলে, সর্বস্বান্ত। শতাব্দীর উপেক্ষিতা কৃষি সাম্রাজ্যবাদীর কায়েমী স্বার্থের ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে আজ ক্লান্ত, অবসন্ন। শিল্প-বিপ্লবের আশীর্বাদ-পুষ্ট ইংলণ্ডের কলকারখানার রসদ সংগ্রহ করতে স্বার্থান্ধ ইংরেজ ভারতের কৃষিকে কামধেনুর মতো দোহন করে নিয়ে গেছে। আর ভারতের লক্ষ-কোটি জনতা মন্বন্তরের সঙ্গে মিতালি করে বেঁধেছে তাদের দুঃখের ঘর। এলো অন্নপূর্ণার দেশে অন্নাভাব। দুর্ভিক্ষ হলো তার নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। অথচ কৃষিই ভারতীয় অর্থনীতির মূল উৎস। এখনও ভারতের জনসংখ্যার সত্তর শতাংশের জীবিকার সংস্থান কৃষি-নির্ভর এবং জাতীয় আয়ের অর্ধাংশ আসে কৃষির আনুকূল্য থেকে। ভারতীয় কৃষির ভূমিকা এত গুরুত্বপূর্ণ এবং তার সম্ভাবনা এত প্রতিশ্রুতিময় হওয়া সত্ত্বেও অবহেলা, ঔদাসীন্য এবং শোষণের চাপে সে তিলে তিলে এগিয়ে চলেছে নিদারুণ অবক্ষয়ের পথে। ভারতের কৃষিকে সেই অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। নইলে ভারতের বৈষয়িক উন্নয়নের স্বপ্ন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। সকল উন্নয়নের প্রারম্ভিক ভূমিকারূপে তাই চাই ভারতের কৃষি-বিপ্লব।

বিংশ শতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক যুগেও ভারতের কৃষি-প্রকরণ অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক। বিদেশী কায়েমী স্বার্থের চক্রান্তে, কৃষক-সমাজের নিদারুণ দারিদ্র্য ও নানা দুরূহ সমস্যার পরিণামে ভারতের কৃষি মূলতঃ অনুন্নত ও অনগ্রসর। বিদেশী কলকারখানাজাত পণ্যসম্ভারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতের কুটিরশিল্প ইতিপূর্বেই ধ্বংস হয়েছিল।

কুটিরশিল্প থেকে উৎখাত শিল্পী-শ্রমিক দলে দলে কৃষির করুণার দুয়ারে এসে ভিড় করেছিল। এইভাবে অতি-জনতার ভারে জর্জরিত ভারতের কৃষি বিদেশী স্বার্থ-গোষ্ঠীর ক্ষুধা মেটাতে হলো সর্বস্বান্ত। দারিদ্র্যপিষ্ট, ঋণভারে জর্জরিত কৃষক-সমাজ, অনুন্নত কৃষি-শৈলী (technique), নিরবচ্ছিন্ন ভূমিক্ষয়, অসহায় দৈব-নির্ভরতা ইত্যাদি নানা সমস্যার গুরুভার স্কন্ধে নিয়ে এদেশের কৃষি এগিয়ে চলেছিল চরম সর্বনাশের পথে।

ভারতের কৃষি ও কৃষিজীবীর সমস্যা

উত্তরাধিকার আইনের অসীম উদারতা, ভূমির ক্রম বিভাজ্যমানতা, কৃষক-সমাজের অন্তর্কলহ, ভূমি-বুভুক্ষা, জমিদার-মহাজন-দালাল-ফড়িয়া ইত্যাদি মধ্যবর্তী শ্রেণীর দয়াহীন শোষণ এবং সরকারের ঔদাসীন্য ও অশিক্ষা-অস্বাস্থ্য ইত্যাদি নানা জটিল সমস্যার চাপে ভারতের কৃষি এতদিন লাভ করতে পারেনি বিকাশের সুযোগ। এইভাবে পর্বত-প্রমাণ কৃষি-সমস্যার গুরুভার স্কন্ধে নিয়ে ভারত স্বাধীন হলো। কঙ্কালসার কৃষকসমাজ, রুগ্ন হাল-বলদ, ক্ষয়িষ্ণু ভূমি, উৎপাদনের নিম্নমুখীমান, জমিদারী প্রথার বিষব্রনের দুষ্ট ক্ষত ও দুর্জয় ঋণভার উপঢৌকন দিয়ে ইংরেজ এদেশ থেকে বিদায় গ্রহণ করলো। ভূমি-সমস্যা, কৃষি-সমস্যা ও কৃষক সমাজের সমস্যা—সমস্যার এই ত্র্যহস্পর্শে ভারতের কৃষি গুনছিল তার চরম বিনষ্টির দিন।

ভবিষ্যৎ-কর্মসূচী রচনার জন্যে স্বাধীন ভারতের চারটি মূল্যবান বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। তারপর প্রচুর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে প্রথম পরিকল্পনার উদাত্ত শঙ্খধ্বনির মধ্যে ভারত কৃষি-প্রগতির পথে করলো যাত্রা-শুরু। তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় তাই সম্প্রসারিত ও সুবিন্যস্ত হয়েছে। যোজনা কমিশন প্রচলিত ভূমি-মালিকানা, চাষাবাদ-পদ্ধতি এবং কৃষক-সমাজের নানামুখী সমস্যাকে প্রথম পরিকল্পনায় স্বীকৃতি দান করে এবং শোষণ-ভিত্তিক জমি-ব্যবস্থার অবসানকল্পে করে কতকগুলি মূল্যবান সুপারিশ। সেই সঙ্গে গুরুত্ব আরোপিত হয় কৃষির উৎপাদন-বৃদ্ধি ও কৃষকের শ্রমের সর্বাধিক মূল্য-প্রাপ্তির ওপর।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পরিকল্পনা : মধ্যস্বত্ব বিলোপ ও প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠা

দ্বি-শতাব্দীর অবিচার ও শোষণের হাত থেকে কৃষক-সমাজের মুক্তির বাণী এই প্রথম বিঘোষিত হলো। উচ্ছিন্ন হলো পরশ্রমজীবী মধ্যবর্তীশ্রেণী, কৃষক-সমাজ হলো সরাসরি রাষ্ট্রের অধীন। সামান্য কয়েকটি অঞ্চল-বিশেষ ছাড়া ভারতের প্রায় সকল রাজ্যেই মধ্যস্বত্বের বিলোপ ও প্রজাস্বত্বের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সেই সঙ্গে যোজনা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে সংরক্ষিত হয়েছে প্রজাস্বত্বের কয়েকটি মৌল বৈশিষ্ট্য। সেগুলি হলো: ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস, প্রজাস্বত্বের নিরাপত্তা-বিধান এবং প্রজাস্বত্বের অটুট মালিকানা। তার ফলে, ভারতের কৃষি প্রাচীন-যুগের শোষণের

নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিক যুগে পদার্পণ করলো, যা ভারতের অর্থনীতির ইতিহাসে একটি অভাবিতপূর্ব ঘটনা।

ভূমি-সংস্কারের দ্বিতীয় পর্বে ভূমি-মালিকানার সর্বোচ্চ সীমান্ত নির্দিষ্ট হলো। ভূমি-মালিকানার অতি-গৃধ্নুতা রোধ করতে না পারলে নতুন ভূম্যধিকারী শ্রেণীর সৃষ্টি হবে, যা ভারতের গৃহীত সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পরিপন্থী। ভূমি-মালিকানার সর্বোচ্চ সীমান্ত-রচনা দ্বিবিধ: বর্তমান ভূমি-জোতের সর্বোচ্চ সীমান্ত-রচনা এবং ভবিষ্যৎ ভূমি-সংগ্রহের সর্বোচ্চ সীমানা-নির্দেশ। ভারতের সকল রাজ্যেই এই বিধান বলবৎ করা হয়েছে। ভূমি-সংস্কারের তৃতীয় কার্যক্রম হলো জোত-জমির চকবন্দীকরণ (consolidation of holdings)। জোত-জমির উপরিভাগ ও খণ্ডীকরণ এবং ক্রম-বিভাজ্যমানতাই বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রযুক্তির পথে প্রধান অন্তরায়। কাজেই জোত-জমির চকবন্দীকরণ উৎপাদন-বৃদ্ধির প্রাথমিক সোপান। এ পর্যন্ত চার কোটি চল্লিশ লক্ষ একর জমিতে চকবন্দীকরণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় চকবন্দীকরণের কাজ আরো তিন কোটি দশ লক্ষ একর জমিতে সম্প্রসারিত হবে। কিন্তু ভারতীয় কৃষি-জমির ক্রম-বিভাজ্যমানতা রোধ করতে হলে এই সমস্যার মূলোচ্ছেদ প্রয়োজন। উত্তরাধিকার আইনের ঔদার্য, অনিয়ন্ত্রিত জমি-হস্তান্তর এবং ইজারা ইত্যাদিই জমির উপরিভাগ ও খণ্ডীকরণের জন্যে দায়ী, যা কৃষি-উৎপাদন-বৃদ্ধির পথে প্রধান অন্তরায়। বর্তমানে সরকারী নীতিই হলো হস্তান্তর, উপবিভাগ ও ইজারা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত করে জমির এই খণ্ডীকরণের প্রবণতা রোধ করা। অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহীশূর ছাড়া ভারতের সকল রাজ্যেই ইজারা ও উত্তরাধিকার আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে কৃষি-প্রগতির নব-ইতিহাস রচিত হয়েছে।

ভূমি-মালিকানা: সর্বোচ্চ সীমান্ত-রচনা, জমির চকবন্দীকরণ, ইজারা ও উত্তরাধিকার আইনের সংশোধন

ভূমি-সংস্কার কৃষি-প্রগতির পথ রচনা করে দিয়েছে, আর উৎপাদন-শৈলীর আধুনিকীকরণ করেছে কৃষি-বিপ্লবের শুভ সূচনা। ভারতীয় কৃষির দৈব-নির্ভরতা দূর করে উৎপাদনের নিশ্চয়তা আনবার জন্যে বন্যা-নিয়ন্ত্রণের সুদৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন—এই ত্রিধারা কার্যসূচী রূপায়িত হওয়ার ফলে ভারতীয় কৃষি অগ্রগতির পথে জয়যাত্রা শুরু করে। পুরাতন কূপ, জলাশয়, ক্ষুদ্রবাঁধ, খাল, নলকূপ ইত্যাদির সংস্কার ও নতুন কূপ, জলাশয়, বাঁধ, খাল, নলকূপ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা, পাম্পের সাহায্যে জলতোলার যন্ত্র স্থাপন এবং পতিত জমির উদ্ধার—এ সব হলো সেই কার্যসূচীর অন্তর্গত। এতদিনে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি মৌসুমীর জুয়াখেলার হাত থেকে ভারতের বাজেট নিষ্কৃতি লাভ করে স্বপ্রতিষ্ঠ হলো।

নদী পরিকল্পনা ও জলসেচ

বিদেশী কায়েমী স্বার্থের দ্বি-শতাব্দীর ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে ভারতের কৃষি-ভূমির সকল উর্বরতা নিঃশেষিত হয়ে গেছে। আজ নতুন উর্বরতাশক্তি সংযোজিত না হলে ভারতে সূচিত এই কৃষি-বিপ্লব ব্যর্থ হবে। তাই সারপ্রয়োগকে পরিবর্তন-বিমুখ ভারতীয় কৃষক-সমাজের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে করা হয়েছে এক ব্যাপক আয়োজন; মিশ্রসার, নাইট্রোজেন্‌যুক্ত সার, সুপার ফস্‌ফেট্‌ সার-প্রযুক্তি ইতিমধ্যেই তাদের সাফল্যের নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। স্বল্পকালীন ঋণের ভিত্তিতে সার-বিলিবণ্টনের ব্যবস্থায় এদেশের দরিদ্র কৃষক-সমাজ বিশেষ উপকৃত হচ্ছে।

উৎকৃষ্ট সার-প্রয়োগ : উৎকৃষ্ট শস্য-বীজ

উৎকৃষ্ট সার-প্রয়োগের সাফল্যকে আরও সফলতা দান করবার জন্যে উৎকৃষ্ট বীজের ব্যবহার আবশ্যিক। উন্নত শ্রেণীর বীজের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও উৎপাদনকল্পে দ্বিতীয় যোজনায় ৪,০০০টি বীজ-গুণন খামার (Seed Multiplication Farm) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া জাতীয় বীজ সংস্থার (National Seeds Corporation) কাজ ১৯৬৩-৬৪ সালে শুরু হয়ে গেছে এবং তার উৎপন্ন ভুট্টার সংকর-বীজ ১,৫০০ একরেরও বেশি জমিতে সম্প্রসারিত হয়েছে। এই সংস্থা নীরোগ সংকর-বীজ (hybrids) উৎপাদন ও বণ্টনের দেশব্যাপী একটি সংগঠন গড়ে তুলবে। এই সংস্থার লক্ষ্য হলো, তৃতীয় পরিকল্পনায় ১৪.৮ কোটি একর জমিতে সংকর-বীজের প্রয়োগ সম্প্রসারিত করা।

ফসলের ব্যাধি-প্রতিকার এবং পঙ্গপাল-বিতাড়ন কৃষি-বিপ্লবের বিশেষ অঙ্গ। ফসলের ব্যধি-নিরাময়ের জন্যে ফসল-সংরক্ষণ অধিকারের (Directorate of Plant Protection) অধীনে ১৪টি ফসল-সংরক্ষণ কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্র এবং কর্মচারী ইত্যাদি সরবরাহ করতে প্রস্তুত রয়েছে। এর কার্য-পরিধি গ্রাম পঞ্চায়েৎ অঞ্চলেও বিস্তৃতিলাভ করেছে। ১৯৬৩-৬৪ সালে পঙ্গপালের তিনটি বিশাল ঝাঁক ভারতে অনুপ্রবেশ করে। সময়মত কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করে তাদের ধ্বংস করা হয়েছে। সেই থেকে ভারতীয় কৃষি পঙ্গপালের আক্রমণ থেকে মুক্ত রয়েছে। পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রগুলি শস্য-চিকিৎসায় যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে, তাদের কাছে ভারতের শিক্ষা গ্রহণের অনেক কিছুই আছে। কৃষিমেলার মাধ্যমে যদি সেই শিক্ষা ভারতের কৃষি-বিভাগ কৃষিক্ষেত্রে সঞ্চারিত করতে পারে, তবেই সার্থক হবে কৃষি-বিপ্লবের সকল আয়োজন।

ফসলের ব্যাধি-নিরাময় ও পঙ্গপাল বিতাড়ন

ইতিমধ্যে 'অনেক ফসল ফলাও' আন্দোলন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর অভাবে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। ১৯৬০-৬১ সালের খরিফ মরশুমে নিবিড় খাদ্যোৎপাদন ও দেশব্যাপী

রবি-শস্যোৎপাদন অভিযান পরিচালিত হয়। গ্রাম পঞ্চায়েৎ ও সমবায় খামারের সহযোগিতায় একটি সুনির্দিষ্ট কার্যসূচীর রূপায়ণে তার স্মরণীয় সাফল্য কৃষি-অগ্রগতির পথে স্থাপন করলো এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কৃষি-যন্ত্রপাতির প্রয়োগে ১৯৫৬ সালে রাজস্থানের সুরতগড নামক স্থানে ৩০,০০০ একর জমিতে রাষ্ট্রীয় খামার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৩-৬৪ সালে ১৭,৫৯০ একরে রবিশস্য এবং ৮,১৮৭ একরে খরিফ শস্যের চাষ হয়। রাজস্থান খাল এলাকার জেতসর নামক স্থানে ১৯৬৪-৬৫ সালের খরিফ মরসুমে অনুরূপ ধরনের রাষ্ট্রীয় খামার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা। রাষ্ট্রীয় খামার ছাড়াও গৃহীত হয়েছে নিবিড় কৃষির জেলা-কার্যসূচী (Intensive Agricultural District Programme)। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের আর্থিক সাহায্যে ১৯৬১-৬২ সালে এই কার্যসূচীর যাত্রা-শুরু। এই কার্যসূচীর দ্বৈত উদ্দেশ্য : এক, খাদ্যের উনতা দূর করে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের বনিয়াদ রচনার জন্যে খাদ্যশস্যের ফলন-বৃদ্ধি এবং দুই, মানুষ ও উপকরণ—উভয়বিধ সম্পদের নিবিড় ব্যবহারের মাধ্যমে জলসেচের অনুকূল অঞ্চলে নিবিড় কৃষি-কার্যসূচীর সম্প্রসারণ।

ফসল-ফলন অভিযান ও নিবিড় কৃষির জেলা-কার্যসূচী

এই কৃষি-বিপ্লবের যারা পুরোহিত, সেই কৃষকদের নানামুখী সমস্যার সমাধান করতে না পারলে তারা এতে যোগদান করতে পারবে না এবং তা হলে ভারতের এই কৃষি-বিপ্লব পরিণত হবে এক শিবহীন যজ্ঞে। ফড়িয়া, দালাল, মহাজন ও নানা মুনাফাবাজদের শোষণে ভারতের হতভাগ্য কৃষকেরা এতদিন তাদের প্রাণপাত পরিশ্রমের ন্যায্যমূল্য থেকে হয়েছে বঞ্চিত। সারা বছর রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, আধ-পেটা খেয়ে তারা যে ফসল উৎপাদন করতো, তা নানা স্বার্থান্বেষীর চক্রান্তে জলের দামে যেত বিকিয়ে। ফলে দরিদ্র কৃষক-সমাজের দারিদ্র্য দিন-দিন যেত বেড়ে আর তাদের শ্রমের কড়ি শোষণ করে অতিরিক্ত ধনী হয়ে উঠতো নানা মধ্যবর্তী শ্রেণী। সেই শোষণের হাত থেকে এদেশের চির-দরিদ্র কৃষক সমাজের মুক্তির আশ্বাস নিয়ে এসেছে উচ্চমানের কৃষি-বাজার পদ্ধতি। কৃষি-পণন পরিদর্শন অধিকার সেই উদ্দেশ্যে পাঁচ-দফা কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে : এক, কৃষি-পণ্যের শ্রেণীবিভাগ ও মাননির্ধারণ; দুই, বাজার-পদ্ধতি সম্পর্কে বিবিধ বিধি-নিষেধ-প্রবর্তন; তিন, বাজার সম্পর্কে অনুসন্ধান ও জরীপ; চার, কৃষি-বাজার বিষয়ে প্রশিক্ষণ; এবং পাঁচ, ১৯৫৫ সালে গৃহীত ফল-ফলন বিধির কার্যকারিতা। অশুভ বাজার-পদ্ধতির অপসারণ এবং কৃষক-স্বার্থে বাজার-জাতকরণের ব্যয়-হ্রাস ও উৎকর্ষ-নিয়ন্ত্রণ এই কার্যসূচীর অন্যতম।

উন্নতপণ্যের কৃষি-বাজার ও তার কার্য-সূচী

তথাপি তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি-উন্নয়ন নৈরাশ্যজনক। তার জন্যে প্রধানত দায়ী কৃষির বিবিধ কার্যক্রমের মধ্যে অগ্রাধিকার-সম্পর্কিত নানা বিভ্রান্তি, প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং কৃষির সঙ্গে গ্রামীণ উন্নয়ন বিষয়ক সংগঠনগুলির যোগাযোগের অভাব। কৃষি-দপ্তরকে তার লাল-ফিতের বজ্র-আঁটুনি একটু শিথিল করতে হবে। সেই সঙ্গে তাকে কৃষি ও কৃষক-সমাজের প্রতি দরদী ও সংবেদনশীল হতে হবে এবং ভারতীয় কৃষির সকল দুর্বলতার মূলে কুঠারাঘাত করতে হবে ও তার স্থানে আহ্বান করতে হবে সংঘবদ্ধ কৃষি-প্রয়াসকে। ভূমি রাষ্ট্রায়ত্তকরণ না হোক, সমবায় কৃষি-পদ্ধতিকে ভারতে অবশ্যই বরণ করে নিতে হবে। ভারতের কৃষি-প্রগতির শুভ সম্ভাবনাময় ইংগিত রয়েছে এই সমবায়-কৃষির মধ্যে। কাজেই সমবায়-কৃষির প্রবর্তন আর কোন মতেই বিলম্বিত হওয়া উচিত নয়। কৃষি-সমবায়ের সার্থক রূপায়ণ ভিন্ন ভারতের কৃষি-বিপ্লবের সোচ্চার ঘোষণা বাতাসেই যাবে হারিয়ে। ইতিমধ্যে আবার যৌথ কৃষি-কোম্পানীর কথা শোনা যাচ্ছে। যৌথ কৃষি-কোম্পানী মার্কিনী কৃষি-পদ্ধতিরই অনুকরণ ছাড়া অন্য কিছু নয়। সমবায়-কৃষিতে আশঙ্কিত প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী এতে আনন্দিত হবে, সন্দেহ নেই। তাহলে ভারতের কৃষি-বিপ্লব কি গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের খাত বদল করে আবার ধনতান্ত্রিক খাতে প্রবাহিত হবে?

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- বাঙ্গালী কৃষিজীবীর সমস্যা, ক. বি. '৫৫
- ভারতবর্ষে কৃষি-সমস্যা, ক. বি. '৬০
- তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি, ক. বি. (ত্রৈবার্ষিক) '৬২
- ভারতের কৃষি-ঋণ
- ভারতের কৃষি-প্রগতি
- ভারতে ভূমি-সংস্কার

১০. সাম্প্রতিক পণ্যমূল্য-বৃদ্ধি ও গণজীবন

Recent Rise in Prices and Public Life.

প্রবন্ধ-সূত্র : অবতরণিকা—পণ্যমূল্য-রেখা ও ক্রয়শক্তি—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন পণ্যমূল্য-বৃদ্ধির খতিয়ান্—মহাযুদ্ধকালীন পণ্য-মূল্য-রেখার ঊর্ধ্বগতি—শান্তিকালীন অর্থনীতি ও পণ্যমূল্য-রেখা—প্রথম যোজনা : পণ্যমূল্য-রেখা—দ্বিতীয় যোজনা : পণ্যমূল্য-রেখা—তৃতীয় যোজনা : করভার ও পণ্যমূল্য-রেখা—উপসংহার।

অবতরণিকা

মূল্য-রেখার অবাধ ঊর্ধ্বগতিতে ভারতের গণজীবন আজ দিশাহারা। মূল্য-রেখার এই 'বাধা-বন্ধ-হারা' ঊর্ধ্বযাত্রা শুরু হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মৃত্যুলগ্ন থেকে। যুদ্ধ থেমেছে। কিন্তু তার অশুভ অভিশাপ আজও আমরা বহন করে চলেছি। পণ্যমূল্যবৃদ্ধি ও তার সর্বাত্মক প্রতিক্রিয়া সেই অশুভ অভিশাপের অন্যতম উত্তরাধিকার। দেশে খাদ্য-সংকট, বেকার সমস্যা, মুদ্রাস্ফীতি ও কালো-বাজারী পণ্যমূল্য-রেখাকে সাহায্য করেছে আরো ঊর্ধ্বমুখী হতে। তাছাড়া, যুদ্ধোত্তরকালীন শ্রমিক-বিক্ষোভ, কোরিয়ার যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা, বাস্তহারা সমস্যা, পাক-ভারত সম্পর্কের ক্রমাবনতি, পরিকল্পনাকালীন মুদ্রাস্ফীতি ও কর-পীড়ন মূল্য-রেখাকে করেছে ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী। অতি-সাম্প্রতিক কালে সংকট আরো ঘনীভূত হয়েছে। কাগজে-কলমে দেখা যাচ্ছে মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু জাতীয় আয়ের কারচুপি আজ আর কারো অজানা নয়। দেশের সম্পদের বিরাট্ অংশ আজ মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীর হাতে কুক্ষিগত। জনসাধারণের ভাগ্যে জুটেছে দুর্বহ কর-ভার এবং অনিবার্য অর্থ-সংকট। একদিকে, আকাশস্পর্শী মূল্যরেখা; অন্যদিকে, জনগণের ক্রয়শক্তির সীমাবদ্ধতা। আজ তাদের ক্রয়-শক্তির নাগালের বাইরে মূল্য-রেখার অবস্থিতি। উভয়ের বিচ্ছেদের মধ্যে সংগতি-স্থাপনের চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু তাতে হাতে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে ব্যর্থতারই অঙ্ক। তার পরিণামে গণজীবনে ঘনিয়ে এসেছে যে চরম সংকট, তার হাত থেকে কি এই দুর্ভাগা দেশের মুক্তি নেই?

জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে; অর্থাৎ, টাকার দাম কমেছে। স্বল্প রোজগারের ফাঁপা টাকায় আজ সাধারণ মানুষের সংসার চলে না। তাদের অধিকাংশের ভাগ্যে আজ অনাহার কিংবা অর্ধাহার। এই আর্থিক সংকটের অমারাত্রির মধ্যে থেকেও আমরা এক উজ্জ্বল ভারতের স্বপ্ন দেখছি। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমূহের সার্থক রূপায়ণের মাধ্যমে কল্পনা করছি এমন এক সমৃদ্ধ ভারতের, যেখানে মানুষের ক্রয়শক্তি

ও পণ্যমূল্য-রেখার মধ্যে একটা স্থায়ী সংগতি স্থাপিত হতে পারে। ভবিষ্যতের সেই আলোকিত দিগন্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ভারতবাসী সহস্র দুঃখ-দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে পথ হাঁটছে। কিন্তু এই সংকটময় পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে মুনাফাবাজ, মজুতদার ও কালো বাজারীরা। তারা যোগানের রাশ টেনে ধরে বাজারে কৃত্রিম পণ্যাভাব সৃষ্টি করে চাহিদার পরিমাণকে দেয় আনুপাতিক ভাবে বাড়িয়ে। যোগানের স্বল্পতা ও চাহিদার প্রাচুর্যে পণ্যমূল্য-রেখা হয় ঊর্ধ্বগামী। এই অবস্থায় টাকার চিরাগত মূল্য অবিশ্বাস্য রকম হ্রাস পায়। অত্যল্প পণ্যের পেছনে ছুটে বেড়ায় অত্যধিক টাকা। বাজারে মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি পায় বটে। কিন্তু যারা রোজ আনে রোজ খায়, তাদের ঋণের বোঝা ক্রমাগত স্ফীত হয়ে ওঠে। শ্রমিক-সমাজ বেতন-বৃদ্ধির দাবি রাখে মালিকের দুয়ারে। ফলে, মাগ্‌গি ভাতা ইত্যাদি বৃদ্ধিও করা হয়। কিন্তু সেই বৃদ্ধির অঙ্ক পণ্যমূল্যের ওপর বন্টিত হয়ে পণ্যমূল্য-রেখাকে করে আরো ঊর্ধ্বগামী।

পণ্যমূল্য-রেখা ও ক্রয়শক্তি

এই অশুভ পরিস্থিতির সূচনা ১৯৪৩ সাল থেকে। মুনাফালোভী মজুতদারেরা যুদ্ধের বাজারে সেদিন কৃত্রিম পণ্যাভাব সৃষ্টি করে পণ্যমূল্য-রেখাকে আকাশস্পর্শী করে তুলেছিল। মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীদের দিন সেদিন মন্দ কাটেনি। কিন্তু যারা বিপুল সংখ্যক জনসাধারণ, তাদের ভাগ্যে সেদিন নেমে এসেছিল দুঃস্বপ্নের অমারাত্রি। দ্রুত-অপসয়মাণ পণ্যমূল্য-রেখা অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের ক্রয়শক্তির সীমান্ত অতিক্রম করে গেল; আর তারা নিরুপায় অসহায়ের মতো আত্মসমর্পণ করলো কৃত্রিম ঘটনা-চক্রের কাছে। সেদিন 'প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে' বিচারের মূক প্রার্থনা এইভাবে নীরবে নিভৃতে কেঁদে ফিরেছিল। সেই কৃত্রিম পণ্যাভাব ও মূল্যরেখার ঊর্ধ্ব-বিহার প্রতিরোধ করবার জন্যে সরকারকে পণ্যনিয়ন্ত্রণে অগ্রসর হতে হলো। কিন্তু ফট্‌কাবাজদের দৌরাত্ম্যে, মুনাফাবাজদের হৃদয়হীন চক্রান্তে এবং সরকারী কর্মচারীদের ঔদাসীন্যে ও দুর্নীতি-পরায়ণতায় সেই পণ্য-নিয়ন্ত্রণের গুপ্তদ্বারপথে প্রচুর পরিমাণ পণ্য পাচার হয়ে গেল কালোবাজারে। সেখানে রাত্রির অন্ধকারে জনগণের ক্রয়শক্তির নাগালের বাইরে চললো পণ্য ক্রয়-বিক্রয়। মহাযুদ্ধের দেশব্যাপী কৃত্রিম অর্থনীতির পাকে-চক্রে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো। তার সঙ্গে অভাবনীয় মুদ্রাস্ফীতি এবং তার সার্বিক প্রতিক্রিয়া মৃত্যু-যন্ত্রণাকে তীব্রতর করে তুললো। মহাযুদ্ধের সেই দুঃসহ মৃত্যু-যন্ত্রণার এক প্রান্তে ছিল সামরিক ব্যয়বহনের ত্রুটিপূর্ণ নীতির অনুসরণে কাগজী মুদ্রার প্রাচুর্য-বৃদ্ধি, অন্যপ্রান্তে ছিল উৎপাদনের একটি বৃহৎ অংশের যুদ্ধাভিমুখীনতা, শ্রমিক-বিক্ষোভ, যন্ত্রপাতির অভাব, আমদানির স্বল্পতা, পরিবহণ-সমস্যা,

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন পণ্যমূল্য-বৃদ্ধির খতিয়ান

মুনাফাবাজি, মজুতদারী, কালোবাজারী ইত্যাদির আত্যন্তিক তৎপরতা। সামগ্রিকভাবে সরকারী নীতির শোচনীয় ভোগ্যপণ্যের ব্যর্থতায় খোলাবাজার থেকে রাতারাতি কালোবাজারে অন্তর্ধানে পণ্যমূল্য-রেখা জনগণের সর্বোচ্চ ক্রয়শক্তির নাগালের বাইরে অতি দ্রুত অপসৃত হলো। এইভাবে জার্মান বোমার আক্রমণ থেকে লণ্ডন শহরকে বাঁচাতে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে একমাত্র বাংলা দেশকেই ১৫ লক্ষ প্রাণের মৃত্যুমূল্যে তার চরম খেসারত দিতে হয়েছিল।

একদিকে কাগজী-মুদ্রার অস্বাভাবিক যোগান-বৃদ্ধি, অন্যদিকে ভোগ্যপণ্যের অভূতপূর্ব যোগান-হ্রাস—এই দুই দানবের দ্বিমুখী আক্রমণে পণ্যের বাজারে দেখা দিয়েছিল অগ্নিমূল্য। ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে প্রচলিত নোটের পরিমাণ যেখানে ছিল ১৬৯ কোটি টাকার মতো, ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সেখানে দেখা গেল নোটের পরিমাণ ১,১৪২ কোটি টাকা। তার প্রতিক্রিয়ায় পণ্যমূল্য বিদ্যুৎগতিতে হলো

মহাযুদ্ধকালীন পণ্যমূল্যরেখার ঊর্ধ্বগতি

ঊর্ধ্বমুখী। পাইকারী দামের সূচক-সংখ্যা ১৯৩৯ সালে যেখানে ছিল ১০০, ১৯৪৫ সালে সেখানে হলো ৩৮২.২। দ্রব্যমূল্যের এই ঊর্ধ্বগতি ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ছিল অব্যাহত। ১৯৪৮ সালে সাধারণ সূচক ৩৯০-এ আরোহণ করে, ১৯৪৯ সালে ৩৭০-এ অবতরণ করে। জনগণ আশা করলো, এবার বুঝি দুর্দিনের অবসান হলো। কিন্তু তাদের সে আশা পূর্ণ হয়নি। অর্থাৎ সেদিন অত্যল্প পরিমাণ পণ্যের পেছনে ছুটে ছিল অত্যধিক পরিমাণ টাকা।

আশা ছিল, যুদ্ধকালীন কৃত্রিম অর্থনীতি শান্তিকালীন স্বাভাবিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হবে এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রাবল্য ক্রমশ হ্রাস পেয়ে পণ্য-মূল্যরেখা অবনমিত হবে। কিন্তু শ্রমিক-বিক্ষোভ, যন্ত্রপাতির অভাব, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ, পরিবহণের অব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন অনিবার্য কারণে কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য সরবরাহ

শান্তিকালীন অর্থনীতি ও পণ্যমূল্য-রেখা

এবং উৎপাদনে অস্বাভাবিক ঘাটতির ফলে যুদ্ধোত্তরকালীন অর্থনীতি এক চরম সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। ১৯৪৭ সালে তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী রফি আহম্মদ কিদোয়াই পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নিলেন এবং ১৯৪৮ সালে মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে বিঘোষিত হলো পরিকল্পিত অভিযান। ভারতের একশ্রেণীর ধূর্ত ব্যবসায়ীদের সামনে সেদিন দুর্দিন এলো ঘনিয়ে। আয়কর-ফাঁকি, মজুতদারী—এই সব রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের অবসানকল্পে কর্তৃপক্ষ দৃঢ় পদবিক্ষেপে অগ্রসর হলেন। কিন্তু যে ভূত সরিষার মধ্যে বাস করে, তাকে বিতাড়িত করা যাবে কি করে? ওদিকে, ১৯৫০ সালে কোরিয়ার যুদ্ধের সুযোগে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা তৎপর হয়ে উঠলো এবং সাময়িক স্থিতিশীলতা থেকে পণ্যমূল্য হলো আবার ঊর্ধ্বমুখী।

এই ঊর্ধ্বমুখী মূল্য-রেখা নিয়ে প্রথম পরিকল্পনার যাত্রা-শুরু। ঋণ-সংকোচের ব্যবস্থা, উৎপাদন-বৃদ্ধি ও সরবরাহ-ব্যবস্থার স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদির মাধ্যমে পণ্যমূল্য-বৃদ্ধির প্রতিরোধ-প্রয়াস সূচিত হলেও নানা ঘটনা-স্রোতের প্রতিক্রিয়ায় তা সফল হয় নি। প্রথম যোজনায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সার্বিক আয়োজনে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। দেশের এই সচ্ছলতায় মুনাফালোভী মজুতদারেরা বিপন্ন বোধ করে মজুত মাল খোলা-বাজারে ছাড়তে আরম্ভ করে। ফলে, পণ্যমূল্য নিম্নাভিমুখী হয়। কিন্তু প্রথম যোজনার রূপায়ণে বিনিয়োগ-বৃদ্ধি, ৩৩৩ কোটি টাকার ঘাটতি-ব্যয়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনাবৃষ্টি হেতু উৎপাদন-হ্রাস, আন্তর্জাতিক পণ্যমূল্য-বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির ফলে পণ্যমূল্য-রেখার ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত থাকে। সরকার মূল্যরেখার ঊর্ধ্বগতি প্রতিরোধ-কল্পে কতকগুলো ধারালো অস্ত্র প্রয়োগ করেন। ফলে, ১৯৫২-৫৩ সালের ১০০-এর ভিত্তিতে রচিত মূল্য-সূচক ১৯৫৫ সালে ১১০ থেকে হ্রাস পেয়ে ৯০-এ দাঁড়ায়। আবার দ্বিতীয় যোজনায় স্বেচ্ছাবৃত্ত সঞ্চয়ের পরিমাণ স্বল্প হওয়ায় পরিকল্পনার ব্যয়-বহনের উদ্দেশ্যে ৯৪৮ কোটি টাকার ঘাটতি-ব্যয়ের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। ঘাটতি-ব্যয়ের সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি ও পণ্যমূল্য-বৃদ্ধির সম্পর্ক অতি নিবিড়। মুনাফা-লোভী মজুতদারেরা এই সুযোগে কৃত্রিম পণ্যাভাব সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে, পণ্যমূল্য আবার ঊর্ধ্বমুখী হলো। বিদেশ থেকে খাদ্য-শস্যের আমদানি ও উৎপাদনবৃদ্ধির নবতর প্রয়াস, সুষম বণ্টনের ভিত্তিতে ন্যায্য মূল্যের বিক্রয়-বিপণি স্থাপন ইত্যাদি মূল্য-হ্রাসের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি অবরুদ্ধ হয় নি। এবং মূল্য-সূচক ৯০ থেকে ১০৫·৬ এ দাঁড়ায়। নিরুপায় হয়ে সরকার ঐ বছরই খাদ্যশস্য-অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন। কমিটির সুপারিশ-ক্রমে গঠিত হলো একটি মূল্য-স্থায়িত্ব পর্ষদ। পর্ষদের পরামর্শ-অনুসারে সরকার দ্বিতীয় যোজনার অন্তিম-পর্বে অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি, দেশব্যাপী খাদ্যশস্য-সংগ্রহ ও ন্যায্য মূল্যের বিক্রয়-বিপণির মাধ্যমে খাদ্যশস্যের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা, মাল মজুত ও অতিরিক্ত মুনাফা-শিকার নিষিদ্ধকরণ, সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি অমোঘ অস্ত্রকে মূল্যবৃদ্ধিরোধের প্রতিকল্পরূপে ব্যবহার করেন। তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের (State trading) উদ্বোধন করা হয়। কিন্তু সবই নিষ্ফল হলো। এত প্রতিকার ও প্রতিবিধান-প্রয়াস সত্ত্বেও পণ্যমূল্যের সাধারণ সূচক ১১৮-তে গিয়ে দাঁড়ালো।

প্রথম যোজনা : পণ্যমূল্য-রেখা

দ্বিতীয় যোজনা : পণ্যমূল্য-রেখা

পণ্যমূল্য-বৃদ্ধির এই প্রবণতা, বৈদেশিক মুদ্রা-সংকট ও ব্যয়বৃদ্ধির খড়্গাঘাতে দ্বিতীয় যোজনা অনেকাংশে বিকলাঙ্গ হলো। সেই অবস্থায় তৃতীয় যোজনার খসড়া এলো

দেশবাসীর হাতে। ধরা হলো, যোজনার মোট ১১,২৫০ কোটি টাকার ব্যয়-বরাদ্দের মধ্যে ক্ষুদ্র-সঞ্চয় থেকে ৬০০ কোটি টাকা এবং অতিরিক্ত কর-বিন্যাস থেকে ১,৭১০ কোটি টাকা সংগৃহীত হবে। যোজনার মোট ২,৩১০ কোটি টাকার ব্যয়-বহনের দায়িত্ব ছিল জনগণের কাঁধে। তার সঙ্গে ছিল ৫৫০ কোটি টাকার ঘাটতি-ব্যয়ের ব্যবস্থা। ওদিকে আবার জাতীয় সংকটের দরুন প্রতিরক্ষা, সীমান্তবর্তী রাস্তা-নির্মাণ এবং স্বল্প-বেতনের কর্মচারীদের বেতন-ক্রমের পুনর্বিন্যাসের জন্যে ৮৬০ কোটি টাকার অতিরিক্ত করভার জনগণের কাঁধে চাপলো। ১৯৬৩-৬৪ সালের প্রতিরক্ষার ব্যয়-নির্বাহের জন্যে বাজেটে বেশ মোটা ধরনের করভার জনগণকে বহন করতে হয়। রাজ্য সরকার যোজনার প্রথম বর্ষে ২০ কোটি টাকার এবং দ্বিতীয় বর্ষে ৭৩ কোটি টাকার অতিরিক্ত করারোপ করেন। বলাবাহুল্য, এই করের বলি জনসাধারণ। ব্যবসায়ীদের স্কন্ধে বিন্যস্ত করভার উৎপন্ন পণ্যের ওপর বন্টিত হবে এবং তাও বহন করতে হবে জনগণকে। এই পরিস্থিতির প্রতিফলন পণ্যমূল্যে অবশ্যম্ভাবী। তাছাড়া, ১৯৬৩ সালে খাদ্যপণ্যের উৎপাদন-হ্রাস এবং সীমান্ত-সংঘর্ষের সুযোগে ব্যবসায়ীরা পণ্যমূল্যকে ঊর্ধ্বগতি দান করলো। ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চালের দাম ১৯৪৩-এর মন্বন্তরকে লজ্জা দিয়ে মণ-প্রতি ৫০৲ টাকায় উঠে গেল। ১৯৬২-৬৩ সালের সাধারণ সূচক ১২৭·৯-এ উঠেছিল। ১৯৬৩-৬৪ সালে সাধারণ সূচক হয়েছে আরো ঊর্ধ্বমুখী। ১৯৬৪-৬৫ সালই ভারতের ব্যবসায়ীদের অত্যন্ত সুবৎসর। এই বছরে তাদের মুনাফার কোন দিক্‌দিগন্ত ছিল না। ফলে পণ্যমূল্যও হয়েছিল গগনচুম্বী। এবং গণজীবন এসে দাঁড়িয়েছিল মৃত্যুর মুখোমুখি। তবে ১৯৬৫-৬৬ সাল যোজনার অন্তিম বর্ষ হওয়া সত্ত্বেও আগামী নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে কোন অতিরিক্ত করারোপ না হওয়ায় এবং অবশ্য-সঞ্চয় পরিকল্পনাদি পরিত্যক্ত হওয়ায় মূল্য-মানের স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে বলে আশা করা যায়।

তৃতীয় যোজনা: কর-ভার ও পণ্যমূল্য-রেখা

তৃতীয় যোজনায় আশা করা হয়েছিল, খাদ্য-শস্যে ভারতের স্বয়ংসম্পূর্ণতা আসবে এবং তাতে পণ্যমূল্য-রেখা কিছুটা অবনমিত হয়ে একটা স্থায়িত্ব লাভ করবে ও জন-জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আসবে। কিন্তু খাদ্যশস্য-উৎপাদনে তৃতীয় যোজনা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই এখন পণ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিরোধকল্পে একদিকে জনবৃদ্ধি-নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যদিকে কৃষি ও শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। তারপর মুনাফাবাজ মজুতদারদের চক্রান্তকে বানচাল করে দেবার জন্যে দেশে প্রচুর সংখ্যক ক্রেতা-সমবায় বিপণি প্রতিষ্ঠার দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। ন্যায্যমূল্যে যাতে পণ্য-ক্রয়বিক্রয় হয়, তার জন্যে সতর্ক দৃষ্টি রাখা

পণ্যমূল্য-বৃদ্ধি প্রতিরোধ

হচ্ছে। সরকার খাদ্যশস্য ব্যবসায়ে দুর্নীতি-দমনের জন্যে ভারতরক্ষা বিধি প্রয়োগে কৃতসংকল্প। তাতেও কি পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি অবরুদ্ধ হবে না ?

'ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।' জনগণ নৈরাশ্যের অন্ধকারে আজ দুর্বহ করভার স্কন্ধে বহন করে 'মূঢ় মূক ম্লান মুখে' গুনছে মুক্তির দিন। কবে তাদের এ দুঃখ-রজনীর অবসান হবে ? আজ কেবল অন্নবস্ত্র সংগ্রহেই তাদের মাসান্তের রুজি-রোজগার ব্যয়িত হয়ে যাচ্ছে। তার ওপর, দিনের পর দিন ঋণের অঙ্ক চলেছে বেড়ে।

উপসংহার

গত দুটি পরিকল্পনার মতো তৃতীয় পরিকল্পনায়ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের কথা সোচ্চার-কণ্ঠে বিঘোষিত হয়েছে; কিন্তু এই অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন দেশে, এই চোরাকারবারী, মজুতদার ও মুনাফা-শিকারীদের দেশে আকাশস্পর্শী পণ্যমূল্য মিটিয়ে যেখানে জনসাধারণ সর্বস্বান্ত, সেখানে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ঘোষণা তাদের সাম্‌নে কোন আশার আলো তুলে ধরতে পারে কি? সত্যকথা, আমেরিকার মতো সমৃদ্ধ দেশগুলিতে পণ্যমূল্য অত্যন্ত বেশি। কিন্তু ভারতের মতো অর্ধোন্নত দেশের হতভাগ্য জনসাধারণের নগণ্য ক্রয়শক্তিকে মার্কিন মুলুকের জনসাধারণের ক্রয়শক্তির সমান মনে করা একদিকে যেমন অযৌক্তিক, অন্যদিকে তেমনি হৃদয়হীন। সরকার অবশ্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দোহাই দিয়ে বর্তমানের দুঃখ-সহনের বহু মূল্যবান কথামৃত দান করছেন। কিন্তু যেখানে সাধারণ মানুষ মোটাভাত-কাপড়ের সংস্থান করতেই দিশাহারা, সেখানে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্যে বর্তমানকে বাঁধা দিয়ে তারা আর কতোদিন কাটাবে ?

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- ভারতে পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি : তাহার কারণ ও প্রতিকার, ক. বি. '৫৭
- পণ্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার যৌক্তিকতা, ক. বি. '৫৩
- প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ও তাহার প্রতিকার, ক. বি, '৬১

১১. ভারতের সাম্প্রতিক খাদ্য-সংকট
Recent Food Crisis in India.

প্রবন্ধ-সূত্র:—অবতরণিকা—ভারতের খাদ্য-সংকট ও নিয়ন্ত্রিত অর্থ-ব্যবস্থা—খাদ্য-সংকটের মূলগত রূপ—খাদ্য-সংকটের ঐতিহাসিক পটভূমি—ভারতের খাদ্য-সংকট: চতুরাঙ্গিক সমস্যা—সরকারী খাদ্যনীতি, ১৯৫২—ক্ষুধাহরণ-ব্রতে কৃষি—ক্ষুধাহরণ-ব্রতে শিল্প—ক্ষুধাহরণ-ব্রতে পরিবহণ—ক্ষুধাহরণ-ব্রতে জনগণ—খাদ্য-বণ্টনে ত্রুটি-সংশোধন ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপের প্রতিরোধ—পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-সংকট—উপসংহার।

অবতরণিকা

অন্নপূর্ণা এই দেশ। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার রিক্ত হয়নি কোন দিন। সেই অন্নপূর্ণার দেশের সন্তানদল আজ অন্নের অভাবে পরের দুয়ারে ভিক্ষুক—ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! ক্ষুধার তাড়নায় বিদেশীর দ্বারে এই যে আমাদের ভিক্ষাবৃত্তি, তা নিতান্তই এ কালের ইতিহাস। বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকে এই দুর্ভাগ্যজনক ইতিহাসের সূত্রপাত। প্রথম যুদ্ধের ধ্বংসলীলার মধ্যে যে বিকলাঙ্গ অর্থনীতির উদ্ভব হয়েছিল, আমাদের খাদ্য-সংকট তন্মধ্যে অন্যতম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ লাভ করলো তার অভিশপ্ত উত্তরাধিকার। অতীতের খাদ্যাভাব ছিল নিতান্তই স্থানীয় ও সাময়িক ঘটনা। সেই ঘটনার পটভূমিতে থাকতো কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় অথবা পরিবহণগত ত্রুটি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মহাযুদ্ধকালীন যে খাদ্য-সমস্যা, তার সৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে মানুষেরই কারসাজিতে। মানুষের কারসাজিতে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশেই মরেছিল ১৫ লক্ষ প্রাণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ওপর যবনিকা নেমে এলো। কিন্তু আমরা এখনও বহন করে চলেছি সেই সংকটের অবাঞ্ছিত উত্তরাধিকার।

ভারতের খাদ্য-সংকট ও নিয়ন্ত্রিত অর্থ-ব্যবস্থা

সেই সংকটের হাত থেকে মুক্তি-কামনায় প্রবর্তিত হলো খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ। নিয়ন্ত্রণের নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভ করেও আমরা খাদ্যে স্বয়ংভরতা লাভ করতে পারিনি। তাই ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে আবার বৃহৎ শহরে ও শিল্পাঞ্চলগুলিতে প্রবর্তিত হয়েছে খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ। সত্যকথা, জন-বৃদ্ধি ও খাদ্য-সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা বর্তমানে এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। জন-সংখ্যা যেখানে দ্রুত-বর্ধমান, তার সাথে সরবরাহ-ব্যবস্থার

সংগতি সাধনের জন্যে প্রয়োজন সমাধানের একটি জঙ্গম কার্যক্রম। সেই কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে অতি-বিলম্বে এবং তার রূপায়ণও চলেছে অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতার অভাবে নিতান্তই ঢিমে-তেতালা ছন্দে। ফলে, যা হবার তাই হচ্ছে। স্বাধীনতা-লাভের পর দু দুটি দশক পার হতে চললো। খাদ্য-সংকটের আর অবসান হলো না। 'এখনো খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়' আমাদের দিন কাটে—এ দুঃখ রাখবো কোথায় ?

অর্থনীতির আধুনিক বেপারীদের বিচার-বিশ্লেষণে খাদ্য-সংকটের দুটি রূপ—পরিমাণগত রূপ ও গুণগত রূপ। প্রথমটি প্রাচীন ভারতে ছিল না, কিন্তু আধুনিক ভারতে আছে। দ্বিতীয়টি অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় জনপিছু ৪,০০০ থেকে ৫০০০ ক্যালোরি খাদ্য-প্রাণ গ্রহণ করতে পায়; অন্যান্য দেশে গড়ে মাথাপিছু ৩,০০০—৪,০০০ ক্যালোরি খাদ্য-প্রাণ পায়। আর ভারতে পায় মাত্র ১২০০—১৫০০ ক্যালোরি খাদ্য-প্রাণ। কাজেই, এমনিতেই এদেশের বহু লোক অর্ধভুক্ত থাকে। যারা ভুক্ত, তাদের অধিকাংশই খাদ্যের পরিমাণগত ও গুণগত অসদ্ভাবে, প্রকৃতপক্ষে, অর্ধভুক্তই থাকে। খাদ্য-সংগ্রহের ব্যাপারে দেশের এই দীনতার চিত্র আজ সর্বব্যাপী। এই দৈন্যের হাত থেকে মুক্তির উপায় কি ?

খাদ্য-সংকটের মূলগত রূপ

উপায়-উদ্ভাবনের পূর্বে এই সংকটের ঐতিহাসিক পটভূমিটি জানা চাই। যে ভারত একদিন তার খাদ্যে স্বয়ংভরতাকে ছাড়িয়ে বিদেশে খাদ্য রপ্তানি করতো, আজ তাকে বিদেশীর দুয়ারে ভিক্ষাপাত্র পাত্‌তে হয় কেন ? সংকটের গভীরে প্রবেশ করার পূর্বে সংকটের বহিরঙ্গটিও অবশ্য আলোচ্য। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর চক্রান্তে শস্যসমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি মূল ভারত-ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ১৯৩৬ সাল—খাদ্য-শস্যে সমৃদ্ধ ব্রহ্মদেশ ভারত-অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হলো। ফলে, খাদ্য-ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ালো ১০ লক্ষ টন। ১৯৪৭ সাল—আবার ভারত-বিভাগ। খাদ্য-শস্যে সমৃদ্ধ সিন্ধু-উপত্যকা ও পূর্ববঙ্গ ভারত-অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো পাকিস্তানের ভাগে। ফলে, খাদ্য-ঘাটতির অতিরিক্ত পরিমাণ হলো ৭ লক্ষ টন। এই দুই ব্যবচ্ছেদের মাঝখানে ঘটে গেল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও আনুষঙ্গিক পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং তার সর্বব্যাপী প্রবল প্রতিক্রিয়া। একদিকে, জনসংখ্যার ঊর্ধ্বগতি; অন্যদিকে, স্থায়ী খাদ্য-ঘাটতির নিদারুণ চিত্র। দেশের এই দুই বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার জন্যে বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য-শস্য আমদানি করতে হয়। প্রতিপদে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনার সঙ্গে চলে ভীতি দুর্বল সংগ্রাম। এই দুঃখজনক পরিস্থিতির রূপান্তর-সাধনের জন্যে খাদ্যোৎপাদনে ভারতকে স্বয়ম্ভর হতে হবে। তার জন্যে সুচিন্তিত পরিকল্পনার রূপায়ণ অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন।

খাদ্য-সংকটের ঐতিহাসিক পটভূমি

ভাবতেব খাদ্য-সংকট : চতুবাঙ্গিক সমস্যা

ভারতের খাদ্য-সংকট একটি চতুরাঙ্গিক সমস্যা। কৃষি, শিল্প, পরিবহণ ও জনসংখ্যা—এই চতুর্বিধ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে আসবে খাদ্য-সংকটের হাত থেকে চির-মুক্তি। সুখের কথা, স্বাধীন ভারতের অর্থনীতি এই চতুর্বিধ সমস্যার সমাধানে প্রয়াসী হয়েছে; কিন্তু পরস্পরের মধ্যে সংগতি না থাকায় জাতির ভাগ্যে ব্যর্থতার অঙ্কই জমছে বেশি করে। সর্বোপরি রয়েছে যে বণ্টনগত ত্রুটি, ভারতের অর্থনীতির সেই কলঙ্ক মোচন কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। নানা দুর্নীতির রাহুগ্রাসে ভারতের বণ্টন-পদ্ধতি আজ বিপর্যস্ত।

সরকারী খাদ্য-নীতি, ১৯৫২

একথা সত্য যে, বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করে আমাদের খাদ্য-সংকটের সঙ্গে মোকাবিলা করা যাবে না। এই বৈদেশিক মুদ্রা-সংকটের দিনে প্রভূত পরিমাণ বিদেশী মুদ্রাকে জঠরাগ্নিতে আহুতি দিলে পরিকল্পনার রূপায়ণ কি করে সম্ভব হবে? কাজেই, খাদ্য সংকটের সমাধানে বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে চলবে না, দেশের মাটিতেই খুঁজতে হবে সমাধানের সঠিক চাবিকাঠি। ১৯৪৩ সালের পর "অধিক খাদ্য ফলাও" অভিযান সূচিত হয়েছিল। কিন্তু জনগণের উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাবে এবং সরকারী কার্যের সংহতি-শৃঙ্খলার দৈন্যে সেই অভিযান ব্যর্থ হয়। তারপর ১৯৪৭ সালের পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসের নেতৃত্বে খাদ্য-শস্য কমিটির সুপারিশসমূহ ও ১৯৪৯ সালের বিশ্ববিশ্রুত বিশেষজ্ঞ লর্ড বয়েড্-ওর (Lord Boyd-Orr)-এর মূল্যবান পরামর্শগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে ১৯৫২ সালের সরকারী খাদ্য-নীতি সংগঠিত হলো। বুভুক্ষা-মুক্তির জন্যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যোৎপাদন পরিকল্পনাগুলির মধ্যে দৃঢ় সংহতি-সাধন প্রয়াসের পদধ্বনি প্রথম অনুভূত হলো প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়।

ক্ষুধাহরণ-ব্রতে কৃষি

ভারতীয় কৃষি বহু-কলঙ্কযুক্ত। জোত-জমির ক্রম-বিভাজ্যমানতা, অসংবদ্ধ হস্তান্তর, ভূমিস্বত্বের অনিয়ন্ত্রিত উত্তরাধিকার, স্বাস্থ্যহীন কৃষক, রুগ্ন অকর্মণ্য হাল-বলদ, মান্ধাতার আমলের কৃষি-প্রকরণ, অবৈজ্ঞানিক কৃষি-যন্ত্রপাতি, অপ্রতুল ও দুর্লভ কৃষি-ঋণ, জমিদার-মহাজন-ফড়িয়া ইত্যাদি মধ্যবর্তী শ্রেণীর অবাধ শোষণ, কৃষক-সমাজের উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব এবং সরকারী কৃষি-নীতিতে অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতার অভাব ইত্যাদি ভারতের কৃষি-কলঙ্কের বহু-নিন্দিত ক্ষত-চিহ্ন। প্রথম ও দ্বিতীয় যোজনায় কৃষি-প্রগতির জয়যাত্রা সূচিত হয়েছে। ভারতের অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যেই ইতিমধ্যে মধ্যস্বত্বের বিলোপ ও প্রজাস্বত্বের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, ভূমি-জোতের সর্বোচ্চ-সীমান্ত নির্দিষ্ট হয়েছে, জোত-জমির চকবন্দীকরণের কাজ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে, জমির ক্রম বিভাজ্যমানতা প্রতিরুদ্ধ হয়েছে, অনিয়ন্ত্রিত ইজারা ও উত্তরাধিকার আইনের সংশোধন ত্বরান্বিত করা হচ্ছে, সেই সঙ্গে ভূমি-পুনরুদ্ধারের

কাজেও সক্রিয় হাত লাগানো হয়েছে। ভূমি-সংস্কার ছাড়া উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্যেও গৃহীত হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কৃষি-পরিকল্পনা। উর্বরতা-বৃদ্ধিকল্পে সার-প্রয়োগ, ফসলের ব্যাধি-নিরাময়, পঙ্গপাল-বিতাড়ন ও কীট-বিনাশন ইত্যাদি দ্রুত রূপায়িত হচ্ছে। ১৯৬০-৬১ সালে খরিফ মরসুমে নিবিড়-খাদ্যোৎপাদন অভিযান পরিচালিত হয়। জাপানী কৃষি-পদ্ধতিকেও জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা চলেছে। অন্যদিকে, নিবিড় কৃষি-প্রকল্প রূপায়ণের জন্যে গৃহীত হয়েছে নিবিড়-কৃষির জেলা-কার্যসূচী। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, যে শুভ সম্ভাবনাময় বৈপ্লবিক পদক্ষেপে কৃষি-সমবায় পদ্ধতির যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং জাতির বুভুক্ষা-হরণের মহান্ প্রতিশ্রুতি যে সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করেছিল, কোন্ যাদুমন্ত্রবলে তার অপমৃত্যু ঘটলো? বর্তমানকাল সে সম্পর্কে একেবারে নিরুত্তর। ইতিমধ্যে আবার যৌথ কৃষি-কোম্পানী গঠনের কথা চিন্তা করা হচ্ছে। সমবায়-কৃষির গৃহীত প্রস্তাবনাকে একপাশে সরিয়ে রেখে যৌথ কৃষি-কোম্পানীর কথা চিন্তা করার অর্থ হলো, সমবায়-কৃষির প্রতি আস্থার অভাব। সরকারী নীতির এই খামখেয়ালীপনা ভারতের কৃষি-লক্ষ্মী বেশিদিন সহ্য করবেন না।

আবার কৃষি ও শিল্পোন্নয়ন পরস্পর-নির্ভর-সাপেক্ষ। শিল্পোন্নয়ন যেমন কৃষি-উন্নয়ন ছাড়া সম্ভব নয়, তেমনি শিল্পোন্নয়ন ছাড়া কৃষি-উন্নয়নও অসম্ভব। কৃষি-প্রগতির জন্যে যে কৃষি-যন্ত্রপাতির প্রয়োজন, তা শিল্পক্ষেত্র থেকেই আসে। শুধু তাই নয়, শিল্প-বিকাশের মাধ্যমে সমাজে কর্মসংস্থানে বহুতর সুযোগের সৃষ্টি হয়। ফলে জনগণের হাতে আসে পর্যাপ্ত ক্রয়-ক্ষমতা, যা খাদ্য-সংকট সমাধানের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। তাছাড়া, হাতে ক্রয়-ক্ষমতা আসার অর্থ, দারিদ্র্যমুক্তি এবং জীবন-ধারণের উন্নত মান; তার ফলে, জনসংখ্যাবৃদ্ধি স্তিমিত হয়ে পড়বে। তখন পরিস্থিতি এমন হবে যে, কৃষি-লক্ষ্মী দেশের ক্ষুধার্ত সন্তানদের মুখে অন্ন তুলে দিতে আর অপারগ হবেন না।

ক্ষুধাহরণ-ব্রতে শিল্প

সঙ্গে সঙ্গে চাই পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি। প্রাকৃতিক কারণে যদি কোথাও খাদ্যশস্যের উৎপাদন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোতে না পারে, সেজন্যে পূর্বাহ্নেই পরিবহণ-ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হয়। চতুর ব্যবসায়ীরা পরিবহণ-সম্পর্কিত অব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে খাদ্যশস্যের কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধির জন্যে তৎপর হয়ে ওঠে। তাদের সকল তৎপরতার অবসান ঘটিয়ে তাদের অধিক মুনাফার আশায় আগুন দিতে হবে। সেজন্যে স্বাধীনতালাভের পর ২,৫৯০ কিলোমিটার রেলপথ নতুন বিস্তৃত হয়েছে। তাছাড়া, দেড় হাজার মাইল রাজপথ নির্মিত হয়েছে, আট হাজার মাইল রাজপথের সংস্কার সাধিত হয়েছে, বৃহদাকার সেতু নির্মিত হয়েছে একশোটি। তৃতীয় পরিকল্পনার

ক্ষুধাহরণ-ব্রতে পরিবহণ

আরম্ভকালে ২০ বছরের জন্যে একটি সড়ক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। তাতে ১৯৮১ সালে ভারতের সড়কের দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে ৬,৫৭,০০০ মাইল। তখন ভারতের সকল গ্রামই পাকা সড়কের চার মাইলের মধ্যে এবং সাধারণ সড়কের দেড় মাইলের মধ্যে এসে যাবে। রাজ্য-সরকারের উদ্যোগে ২২,০০০ মাইল পথ নির্মিত হয়েছে এবং তৃতীয় যোজনায় ২৫,০০০ মাইল পথ-প্রস্তুতির কার্যসূচী হাতে আছে। বর্তমানে অন্তর্দেশীয় ৫,০০০ মাইল নাব্য জলপথের মধ্যে ১,৫৫৭ মাইলে স্টীমার, জাহাজ ইত্যাদি চলাচল করতে পারে এবং ৩,৫৮৭ মাইল দেশীয় নৌকাযোগে নাব্য। ১৯৬৩ সালেই ভারতীয় বিমানপোত প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি কিলোমিটার পথ পরিভ্রমণ করেছিল, বহন করেছিল প্রায় সাত কোটি কিলোগ্রাম বাণিজ্য-পণ্য। ভারতের পথ ও পরিবহণের বর্তমান চিত্র নিঃসন্দেহে আশাপ্রদ।

ক্ষুধাহরণ-ব্রতে জনগণ

ক্ষুধাহরণ-ব্রতানুষ্ঠানে জনগণের দায়িত্বও অসীম। খাদ্য-সংকট সমাধান-প্রয়াসের পাশাপাশি যদি জনসংখ্যা দ্রুত হারে পাল্লা দিয়ে চলে, তবে সরকার অসহায় এবং সকল যোজনার ব্যর্থতাও অবশ্যম্ভাবী। জনগণকে জনসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণে সজাগ করে তুলতে হবে। দারিদ্র্য-মুক্তি ও শিক্ষা-বিস্তারের মাধ্যমে তাদের জন্ম-সংযমে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। পরিবার-পরিকল্পনাকে আরও ব্যাপক ও গভীর রূপদান করতে না পারলে খাদ্য-সংকটের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। জনগণকে বাদ দিয়ে এই পরিকল্পনার রূপায়ণ হবে শিবহীন যজ্ঞের তুল্য। কেবল জন্ম-সংযমই যথেষ্ট নয়, জনগণের খাদ্য-স্বভাবের পরিবর্তন আনবার দিনও আজ এসেছে। ভাত বা রুটির সুলভ পরিবর্ত খাদ্য-গ্রহণের জন্যে জনগণকে এখন থেকেই প্রস্তুত হতে হবে।

খাদ্য-বণ্টনে ত্রুটি-সংশোধন ও সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিরোধ

চতুরাঙ্গিক সমস্যা আলোচনার শেষ-প্রান্তে একটি কথা বলতেই হয়। তা হচ্ছে, ভারতের বণ্টন-ব্যবস্থা ও ভারতের কুখ্যাত ব্যবসায়ী-সমাজ। ভারতের খাদ্যশস্যের বণ্টনগত ত্রুটি চিরাচরিত। ভারতে যে পরিমাণ খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হয়, তার সমগ্রটাই বিক্রয়ের জন্যে বাজারে আনীত হয় না এবং বিক্রয়-ব্যবস্থাতে উৎপাদনকারী কৃষকের ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য। ফড়িয়া-বেপারী-মহাজনের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের চলে ক্রয়-বিক্রয়। ফলে, লাভের কড়ি ওঠে মধ্যবর্তীদের ট্যাঁকে; হতভাগ্য কৃষক তা থেকে হয় বঞ্চিত। এরূপ অবস্থায় সরকারের কর্তব্য হলো, ন্যায্য বণ্টনের ব্যবস্থা করা এবং খাদ্য-শস্যের মূল্যে স্থায়িত্ব আনা। অন্যদিকে, মজুতদারী, মুনাফাবাজি ও কালোবাজার ধ্বংস করতে সরকারকে সম্ভাব্য সকল প্রকার কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে। তারা রক্তপায়ী সমাজ-বিরোধীর দল। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে, আইনের উদ্যত তর্জনীকে

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে তারা দিনের পর দিন এই পাপানুষ্ঠান করে চলে। সমাজের কর্ণধারগণ তাদেরই কৃপাপুষ্ট। তাই সরকারের বজ্র-আঁটুনি সকল ক্ষেত্রেই ফস্কা-গেরোতে পরিণত হয়। ১৯৬৩ সালে একটি বিবৃতির পরিণামে এক সপ্তাহের মধ্যেই চালের মণ ৪০৲ টাকা থেকে ৫০৲ টাকায় চড়ে যায়। দেশে খাদ্য-শস্য মজুত ছিল, কিন্তু বাজার শূন্য। সে কাদের চক্রান্ত? সেই নাটের গুরু কে? তাহলে জিজ্ঞাস্য, পরিকল্পনা ও আইন রচনার কেন এই পরিহাস? ক্ষুধার্ত দেশবাসীর মুখে পরিকল্পনা কিংবা আইনের নথিপত্র গুঁজে দিলে তো আর ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে না!

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-সংকট

ভারতের সব রাজ্যেই খাদ্য-সংকট রয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালার মতো খাদ্য-সংকট কোথাও এমন তীব্র নয়। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-সংকটের মূলে রয়েছে কতকগুলি সর্বভারতীয় সিদ্ধান্ত। সেই সর্বভারতীয় সিদ্ধান্তের ফলে এ রাজ্যের প্রয়োজনমতো খাদ্য-উৎপাদন বাড়ে নি। যেমন, রপ্তানি-বাণিজ্যে বিদেশী-মুদ্রার আয় বাড়াতে গিয়ে পাট ও চা চাষ সম্প্রসারিত করতে হয়েছে। ধান-চাষের হাজার-হাজার একর জমি পাট-চাষে চলে গেছে। তাছাড়া, আশে-পাশের রাজ্যগুলি থেকে এ রাজ্যে আসছে লক্ষ-লক্ষ লোক। তারা এক-কণা খাবার সঙ্গে আনে না, এক-কণা খাদ্যও এখানে উৎপাদন করে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অন্ন ধ্বংস করে যায়। এদিকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে দেশ-বিভাগের ফলে এখনও আসছে হাজার-হাজার উদ্বাস্তু। তাই রাজ্যসরকার অনন্যোপায় হয়ে বৃহত্তর-কলকাতায় রেশন-ব্যবস্থা চালু করেছেন, এবং গ্রামাঞ্চলেও চালু করেছেন সংশোধিত রেশন-ব্যবস্থা।

উপসংহার

আসল কথা, দেশব্যাপী এই মহাক্ষুধার প্রতিনিবৃত্তির জন্যে সরকারকে সহৃদয় হতে হবে। পরিকল্পনা ও আইনসমূহের সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্যে সহানুভূতিশীল আন্তরিকতা ও বলিষ্ঠ কর্মোদ্দীপনা প্রয়োজন। সেই কর্মোদ্দীপনার ঢেউ লাগুক সরকারী দপ্তরে, লাগুক গ্রামে-গ্রামে,—কুটিরে-কুটিরে, লাগুক মৌন-মুখর শস্য-প্রান্তরে। তাতে কৃষি-লক্ষ্মী সাড়া দিক্ স্বর্ণালী শস্য-সম্ভারে, কৃষি-লক্ষ্মীর বুভুক্ষাহরণের ব্রত সফল হোক, দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা বিলীন হয়ে যাক দূর-দিগন্তে। সকলের আন্তরিক ও সমবায়ী প্রচেষ্টায় 'দূর হবে দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা' এবং বুভুক্ষার হাত থেকে চির-মুক্তি ঘটবে ভারতের।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- ভারতের খাদ্য-পরিস্থিতি ও তাহার উন্নতি
- ভারতে খাদ্য-সংকট সমাধানের অন্তরায়
- পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-সংকট

১২. বাণিজ্য ও মানবতাবোধ
Commerce and Humanity

প্রবন্ধ-সূত্র : অবতরণিকা—বাণিজ্যের মৌল উদ্দেশ্য : সমাজের সামগ্রিক সম্পদবৃদ্ধি, দুর্নীতির সাহায্যে ব্যক্তিগত সম্পদবৃদ্ধি নয়—দুর্নীতির মূলে দুটি বিশ্ব মহাযুদ্ধ—ধর্ম ও ঈশ্বর-বিশ্বাসের পরিবর্তন—দুর্নীতির জন্ম : দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি, ধন-বণ্টনে অসাম্য, বাণিজ্যে দুর্নীতির রূপ-রূপান্তর : মজুতদারী, চোরাকারবার, ভেজাল-মিশ্রণ—আয়কর ও বৈদেশিক মুদ্রা ফাঁকি পরবর্তী কালের সংযোজন—বাণিজ্যে আয়কর ও বৈদেশিক মুদ্রা ফাঁকির প্রবণতা—খাদ্যে ভেজাল নিবারণী বিধি, ১৯৫৪ ও তাহার নিষ্ক্রিয়তা—বাণিজ্যে দুর্নীতির প্রতিরোধ : ক্রেতা-সমবায়—সদাচার সমিতি—উপসংহার।

ভারতের বাণিজ্য আজ দুর্নীতির নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে। মানবিকতা, নীতিবোধ, জাতিপ্রেম, দেশপ্রেম আজ বাণিজ্য-জগৎ থেকে নির্বাসিত। অথচ বাণিজ্যে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান—লক্ষ্মী কল্যাণের দেবতা। কিন্তু বর্তমানকালের বাণিজ্য থেকে ব্যবসায়ীরা লক্ষ্মীকে নির্বাসিত করে সেখানে তৃষ্ণা-দানবীর প্রতিষ্ঠা করেছে। সেই তৃষ্ণা অর্থ-তৃষ্ণা, স্বার্থ-তৃষ্ণা। সেই তৃষ্ণার চরিতার্থতার জন্যে কত ব্যবসায়ীরা লক্ষ-কোটি ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে অবলীলায় বিষপাত্র তুলে দিতে পারে! মানুষের ক্ষুধার অন্নকে রাতারাতি অন্ধকার চোরা-গহ্বরে নিক্ষেপ করতে পারে! অতি দ্রুত মুনাফার অঙ্ক বাড়িয়ে তোলার প্রয়াসে মূল্যরেখাকে আশ্চর্য কৌশলে তুলে নিয়ে যেতে পারে মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার অতি ঊর্ধ্বে! এইভাবে মুষ্টিমেয় মুনাফাবাজ ব্যবসায়ীরা কোটি-কোটি মানুষকে প্রতারিত করে দিনের পর দিন তাদের মোটা পেট আরো মোটা করে চলেছে। কোন্ অদৃশ্য যাদু-কৌশলে তারা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালায়, আইন সেখানে হয়ে যায় পঙ্গু, সরকারী নিয়ন্ত্রণ অসহায়। এদিকে দেশের অসংখ্য মানুষের আয়ুষ্কাল যাচ্ছে কমে, অপমৃত্যুর তালিকা দিন-দিন চলেছে বেড়ে। মধ্যযুগের বর্বরতার বিচারে তৈমুরলঙ্গ, চেঙ্গিস্‌খাঁ, সুলতান মামুদ প্রভৃতি ইতিহাসের জঘন্যতম খুনীদের আমরা ক্ষমা করতে পারি। এমন-কি আইখ্‌ম্যানের প্রকাশ্য নৃশংসতাকেও ক্ষমা করা যায়। কিন্তু বিশ শতকের মধ্যাহ্নে যখন মানব-সভ্যতার চরম সমুন্নতি, তখনই বাণিজ্য-জগতের এই প্রচ্ছন্ন নরঘাতকদের

ক্ষমা করবো কি করে? আমরা ক্ষমা করলেও ইতিহাস কখনও কি তাদের ক্ষমা করতে পারবে?

বাণিজ্যে আজ যে সর্বব্যাপী দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে, বাণিজ্যের মৌল উদ্দেশ্য ও ভূমিকার সঙ্গে তা কি সঙ্গতিপূর্ণ? বাণিজ্যের মৌল উদ্দেশ্যই হলো সমাজের সামগ্রিক সম্পদ-বৃদ্ধি। অথচ ভারতের বাণিজ্যের অধিকাংশই আজ লোভী ধনকুবেরদের হস্তগত। তারা সমাজের সামগ্রিক স্বার্থকে পদদলিত করে ব্যক্তিগত মুনাফার অঙ্ক দিনের পর দিন চলেছে বাড়িয়ে। তারা কখনও দেশকে ভালোবাসে না, দেশের মানুষদের ভালোবাসে না, তারা ভালোবাসে অপর্যাপ্ত মুনাফাকে। আর আশ্চর্য, আমরাও তাদের হাতে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল দায়িত্ব তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি। যাদের মতে, ব্যবসায়ে নীতিবোধের স্থান নেই, নেই মানব-হিতৈষণা; যাদের মতে, ব্যবসায় শুধু প্রতারণা, বঞ্চনা ও ফাঁকি; যারা লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্ধকারের সুড়ঙ্গ-পথে সমাজের সম্পদকে, সমাজের কল্যাণকে চুরি করে নিজেদের ঘরে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের হাতে ভারতের মতো কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের বাণিজ্য ভার কতোদিন চলবে?

বাণিজ্যের মৌল উদ্দেশ্য: সমাজের সামগ্রিক সম্পদবৃদ্ধি, দুর্নীতির সাহায্যে ব্যক্তিগত সম্পদ-বৃদ্ধি নয়

ভারতীয় বাণিজ্য যে দুর্নীতির রাহুগ্রাসে আজ নিপতিত, সেই দুর্নীতির শিকড় কতো গভীরে, তার অনুসন্ধান প্রয়োজন। বিগত শতাব্দীতে মানুষের মনে ছিল প্রবল ধর্মবোধ, ছিল অনড় ঈশ্বর-বিশ্বাস। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে সংঘটিত দুটি বিশ্ব-মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড আঘাতে মানুষের সেই ধর্মবোধ, ঈশ্বর-বিশ্বাস একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। ঈশ্বর-বিশ্বাস গেছে, কিন্তু তার শূন্যস্থানে আমরা নতুন কোন কিছুর প্রতিষ্ঠা করে উঠতে পারি নি। সেই শূন্য আসনে আজ সুযোগ বুঝে এসে বসেছে নরকের শয়তান। আজ চারদিক তাই শয়তানের দুরন্ত উল্লাসে শিউরে উঠছে বারে-বারে। ভারতে দুর্নীতির প্রথম আবির্ভাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সর্বাত্মক প্রবল প্রতিক্রিয়ায় সকল ভোগ্যপণ্যের মূল্যরেখা অতি দ্রুতগতিতে হলো ঊর্ধ্বমুখী। কৃত্রিম অভাব-সৃষ্টির জন্যে সক্রিয় হয়ে উঠলো মজুতদার ও চোরাকারবারীদের গোপন তৎপরতা। লক্ষ-কোটি অসহায় মানুষের মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে ছুটে এল পঞ্চাশের মন্বন্তর আর তার আনুষঙ্গিক ভেজাল ও নানা দুর্নীতি। গ্রামের পথে-প্রান্তরে, শহরের ফুটপাতে-ফুটপাতে যখন খাদ্যাভাবে মুমূর্ষু মানুষের কাতর কাতরানি উঠছে, তখনই ভারতের হৃদয়হীন ব্যবসায়ীরা মুনাফার অঙ্ক দ্রুত বাড়িয়ে তোলার জন্যে খাদ্য-পণ্য

দুর্নীতির মূলে—দুটি বিশ্ব মহাযুদ্ধ, ধর্ম ও ঈশ্বর-বিশ্বাসের পরিবর্তন, দুর্নীতির জন্ম: দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, ধন-বণ্টনে অসাম্য

নিয়ে মেতে উঠেছে মজুতদারীতে, চোরাকারবারে ও ভেজাল-মিশ্রণে এবং দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট কোটি-কোটি জনসাধারণের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। বিশেষ করে, বাংলা দেশের দুর্ভিক্ষে ১৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল। সেদিন কোথায় গেল মানুষের ধর্মবোধ? কোথায় গেল মানুষের ঈশ্বর-বিশ্বাস? কোথায় গেল পাপ-পুণ্যের অতীত সংস্কার? সব আমরা ফেলে এসেছি গত শতাব্দীর দিগন্তরালে। আর এদিকে দুর্ভিক্ষের মৃত্যুৎসবে মজুতদারী, চোরাকারবার ও ভেজাল-মিশ্রণে সাফল্য লাভ করে ভারতের লুব্ধ ব্যবসায়ীদের সাহস, ক্ষুধা ও মুনাফার লালসা আরো বেড়ে গেছে। তার চরিতার্থতার পূর্ণ সুযোগ এনে দিল সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, লোকসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ, খাদ্য-সমস্যা এবং ধনবণ্টনের সুতীব্র অসাম্য। তার ফলে দেখি, আজ খাদ্যে ভেজাল, ঔষধে ভেজাল, নিত্য-ব্যবহার্য সকল পণ্যেই ভেজাল।

বাণিজ্যে দুর্নীতি হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরই একটি বিকলাঙ্গ সন্তান। মজুতদারী, চোরাকারবার এবং খাদ্যে ও ঔষধে ভেজাল-মিশ্রণ সেই দুর্নীতিরই রূপভেদ মাত্র। আর আয়কর-ফাঁকি, বৈদেশিক মুদ্রা-ফাঁকি—এসব হলো পরবর্তীকালের সংযোজন। মজুতদারী ও চোরাকারবার যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সন্তান, তেমনি নিয়ন্ত্রণ প্রথা ও বরাদ্দ-প্রথার সহোদর। দেশে নিয়ন্ত্রণ-প্রথা চালু থাকলে অনিবার্যরূপে দেখা দেবে মজুতদারী ও চোরাকারবার। নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ-প্রথার সম্ভাবনার ইংগিতে মজুতদার ও চোরাকারবারীরা অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে খোলা-বাজারের পণ্য অদৃশ্য সুড়ঙ্গ-পথে পাচার হয়ে যায় কালোবাজারে। তার ফলে, বাজারে কৃত্রিম চাহিদা বা কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি হয়ে যায়। এদিকে বরাদ্দের পণ্য নিকৃষ্ট-মানের হওয়ায় এবং তার পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত স্বল্প হওয়ায় সাধারণ মানুষ বাধ্য হয়ে কালোবাজারের দ্বারস্থ হয়। এই অবস্থায় দেশে খাদ্য থাকে, কিন্তু তা থাকে মজুতদারদের গুদাম-ঘরে; খাদ্য পাওয়াও যায়, কিন্তু খোলা-বাজারে নয়, কালোবাজারে—আশাতিরিক্ত উচ্চমূল্যে। এই অন্ধকার গলিপথেই আজ ভারতীয় বাণিজ্যের একটি বিরাট্ অংশ চলেছে। সেই গতিপথ হলো কালোবাজারের পথ, চোরাবাজারের পথ, মুনাফা-শিকারের পথ। স্বাধীনতা-লাভের পর এই যখন ভারতের বাণিজ্যের হালচাল, তখন তদানীন্তন কেন্দ্রীয় খাদ্য-মন্ত্রী রফি আহম্মদ্ কিদোয়াই কায়েমী স্বার্থের সকল চক্রান্তের—দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির ভীতি প্রদর্শন অগ্রাহ্য করে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ-প্রথা দৃঢ়তার সঙ্গে তুলে দিলেন। ফলে অবস্থা আয়ত্তে ফিরে এলো। ইতিমধ্যে আবার বাণিজ্যের সেই অশুভ শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে জেগে

বাণিজ্যে দুর্নীতির রূপ-রূপান্তর: মজুতদারী, চোরাকারবার, ভেজাল মিশ্রণ—আয়কর ও বৈদেশিক মুদ্রা-ফাঁকি পরবর্তীকালের সংযোজন

উঠেছে দেশে জরুরী অবস্থা ও নানা অর্থনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অন্তরালে। বর্তমানে কালোবাজারের গলিপথ মুনাফা-শিকারের প্রশস্ত রাজপথে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সকল দুর্নীতির মধ্যে খাদ্যে ও ঔষধে ভেজাল মিশ্রণ সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুরতম, তথা নৃশংসতম। আজ রন্ধন-তৈলে ভেজাল, খাদ্যপণ্যে ভেজাল, দুধ-মাখন-ঘি-তে ভেজাল, চায়ে ভেজাল, ঔষধপত্রে ভেজাল, বেবীফুডে ভেজাল। সবেতেই ভেজাল। এই অবাধ ভেজালের কলঙ্কময় কাহিনী নিতান্তই বিশ শতকের শেষার্ধের। মানবতার প্রতি এরূপ জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পচনশীল পৃথিবীর নতুন অভিজ্ঞতা। পুলিশ ইতিমধ্যে কয়েকটি ভেজাল তৈরির কারখানা ও গুদাম আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে এই পাপ-ব্যবসায়ের বহু দুর্ভেদ্য ঘাঁটি এখনও অনাবিষ্কৃত রয়েছে। আয়কর ফাঁকি দেওয়ার অদ্ভুত সব কলাকৌশল ব্যবসায়ীরা আয়ত্ত করে নিতে পেরেছে। আয়কর প্রবর্তনের মৌল উদ্দেশ্যই হলো ধন-বৈষম্য হ্রাস করে একটা ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়া। কিন্তু ধূর্ত ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে আয়করের সেই মৌল উদ্দেশ্য আজ পদদলিত। দুই প্রকারের হিসাব-রক্ষা, হিসাবের কারচুপি, বেনামীতে সম্পত্তি হস্তান্তর, বিলাসিতাপূর্ণ স্থাপন-ব্যয়, অভিসন্ধিমূলক সম্প্রসারণ-ব্যয়, মিথ্যা চিরকুটে অর্থগ্রহণ ইত্যাদি নানা প্রবঞ্চনামূলক প্রক্রিয়ায় ধুরন্ধর ব্যবসায়ীরা আয়কর ফাঁকি দিয়ে সমাজের বহু অর্থ আত্মসাৎ করে। ইদানীং বৈদেশিক মুদ্রা ফাঁকি দেওয়ার কতকগুলি প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতের সম্পদ বিদেশের বাজারে বিক্রি করে বিদেশেই মুদ্রা সঞ্চিত রাখবার একটা ঘৃণিত প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় ব্যবসায়ী মহলে। এই সব রাঘব বোয়ালের দল সমাজের ওপর-তলায় বেশ স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করে। তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করবার ক্ষমতা সরকারের নেই।

বাণিজ্যে আয়কর ও বৈদেশিক মুদ্রা-ফাঁকির প্রবণতা

খাদ্যে ভেজাল নিবারণী বিধি, ১৯৫৪ (Prevention of Food Adulteration Act, 1954) ও তার আনুষঙ্গিক ধারাগুলি জম্মু-কাশ্মীর ছাড়া সমগ্র ভারতে প্রবর্তিত হয়েছে। খাদ্যে ভেজাল ও ভেজাল-সৃষ্টির পাপ-ব্যবসায় দূর করবার জন্যে এই সরকারী প্রয়াস প্রশংসনীয়। কিন্তু এই বিধিকে কেবলমাত্র তেল, ঘি, চা, ঔষধ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সংকুচিত রাখলে চলবে না। ভেজাল-ব্যবসায় যেমন ব্যাপক, তেমনি ব্যাপক হওয়া উচিত এই বিধির প্রয়োগ-বিস্তার। তাছাড়া এই বিধির ক্লীবত্ব অনেক ক্ষেত্রে বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে হলে এই বিধির আমূল সংস্কার প্রয়োজন। যারা স্বার্থের তাড়নায় সমাজের সঙ্গে শত্রুতা করে, মানবতার সঙ্গে করে বিশ্বাসঘাতকতা, তাদের মৃত্যুদণ্ড কেন হবে না? সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ কেন

হবে না? বেনামীতে ব্যবসায় পরিচালনা করতে কিংবা বেনামীতে সম্পত্তি হস্তান্তর করতে কেন তাদের দেওয়া হবে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা আইনকে ফাঁকি দিতে পারে। যেখানে পারে না, সেখানে তারা পাপার্জিত অর্থের সামান্য অংশ জরিমানা দিয়ে বেকসুর রেহাই পায় এবং পূর্ণোদ্যমে তার বহু গুণ অর্থ উপার্জনের কার্যে লিপ্ত হয়। যেখানে শাস্তির পরিমাণ অসাধু উপায়ে অর্জিত অর্থের তুলনায় নগণ্য, সেখানে আইন প্রহসনে পরিণত হয়। বহুক্ষেত্রে ভেজাল-নির্ণয়ের জন্যে পরীক্ষা-ব্যবস্থাদির দৈন্যে সাক্ষ্য-প্রমাণাদির অভাবে অসাধু ব্যবসায়ীরা benefit of doubt বা সংশয়ের সুযোগ লাভ করে বেকসুর রেহাই পায়। তাছাড়া, নানা অজুহাতে কালহরণ করে এবং পাপার্জিত অর্থের কিয়দংশ ব্যয় করে সেই ব্যবসায়ীরা আদালতের বিচারে বাধা সৃষ্টি করে থাকে। ইতিমধ্যে সাক্ষ্য-প্রমাণ হারিয়ে যাবে, কাগজপত্র যাবে চুরি আর অসাধু ব্যবসায়ীরা লাভ করবে অনায়াস-মুক্তি। আয়কর ও বৈদেশিক মুদ্রা ফাঁকির ব্যাপারেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এই সমস্ত ব্যাপারে আইনের সংশোধন ও কঠোরতর প্রয়োগ একান্ত কাম্য। ১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত আলোচনা-চক্র ১৯৫৪ সালের খাদ্যে ভেজাল নিবারণী বিধিকে আরো শক্তিশালী করে তোলার সুপারিশ করেছে।

খাদ্যে ভেজাল নিবারণী বিধি, ১৯৫৪ ও তাহার নিষ্ক্রিয়তা

এই দুর্নীতির রাহুগ্রাস থেকে দেশের নিরীহ জনসাধারণকে রক্ষা করার উপায় কি? প্রথমত, সরকারকে এই পাপ-গোষ্ঠীর আওতা-মুক্ত হতে হবে। এই পাপ-ব্যবসায়ী-গোষ্ঠী যাতে সরকারের কোনও মহলকে প্রভাবিত করতে না পারে, সেজন্যে গোয়েন্দা বিভাগ, সংবাদপত্র ও জনসাধারণকে সজাগ থাকতে হবে। দুর্নীতি-দমন বিভাগের হাতে আরো ক্ষমতা তুলে দিতে হবে এবং তাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাহিরে রাখতে হবে। ভেজাল-নির্ণয়ের পরীক্ষাগারের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করতে হবে। অন্যদিকে, দুর্নীতি-দমন আইনের আমূল সংশোধন প্রয়োজন। সর্বোপরি, ক্রেতা সাধারণকে অত্যন্ত সচেতন হতে হবে। নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যে তাদের সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। বাণিজ্যের দুর্নীতির অক্টোপাস বন্ধন থেকে তাদের আত্মরক্ষার একমাত্র কার্যকরী কবচ হলো ক্রেতা-সমবায় গঠন। ক্রেতা-সমবায়ের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের বাহিরে দুর্নীতিকে প্রতিরোধ করে রাখতে হবে। ধর্মের কাহিনী শুনিয়ে, পাপ-পুণ্যের ভয় দেখিয়ে ব্যবসায়ী শ্রেণীর চিত্ত-শুদ্ধি বর্তমান কালে আর সম্ভব নয়। সেদিন বিগত হয়েছে। আজ ধূর্ত ব্যবসায়ীদের শায়েস্তা করার জন্যে প্রয়োজন হলে ভারতরক্ষা আইনের আশ্রয় নিতে হবে।

বাণিজ্যে দুর্নীতির প্রতিরোধ : ক্রেতা সমবায়

ভারতীয় বাণিজ্যের যখন এই রকম হাল, তখন ভারতের কয়েকজন রাজনীতি-ধুরন্ধর গঠন করেছেন সদাচার সমিতি। এখন এই সদাচার সমিতির পক্ষপুটে দুর্নীতি-বিশারদেরা অনায়াসে আত্মগোপন করতে পারবে। ভণ্ডের দল গায়ে নামাবলী জড়ায় প্রতারণার সুবিধে হবে বলে। কিন্তু জনসাধারণ তাদের হাতেই প্রতারিত হয় বেশি করে।

সদাচার সমিতি

আজ এই ধর্মহীন সমাজে শুভবুদ্ধিহীন ব্যবসায়ীরা যেভাবে স্ফীত হয়ে উঠেছে, তাদের নিয়ন্ত্রিত করা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, বর্তমানকালের বাণিজ্য চলেছে এক ভ্রান্তি-বিলাসের মধ্য দিয়ে। মুনাফাবাজ ধূর্ত ব্যবসায়ীদের হাতে সাম্প্রতিক কালের বাণিজ্য সমষ্টির কল্যাণ ছেড়ে ব্যষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত হয়েছে। কারণ বর্তমানের ব্যবসায়ী-গোষ্ঠীতে সেই শিক্ষা নেই, যে শিক্ষায় অন্তরলোকে স্বদেশ-প্রেম, সমাজ-প্রীতি সর্বোপরি মানব-হিতৈষণার উদ্বোধন হতে পারে। যাদের হাতে থাকবে আগামী-কালের বাণিজ্য-জগতের নেতৃত্ব-ভার, তাদের সেই শিক্ষা দিতে হবে আজ। সেই শিক্ষায় শিক্ষিত অনাগত কালের ব্যবসায়ীরা শুভ-বুদ্ধির আলোকে হৃদয়ের গভীর অনুভবে উপলব্ধি করবে : ব্যবসা-বাণিজ্য ও নীতিবোধ বা মানবতাবোধের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নেই। মানুষের জন্যেই বাণিজ্য—মানুষের জন্যেই নীতিবোধ।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- নৈতিকবোধ বনাম ব্যবসায় বুদ্ধি, ক. বি. '৬০
- কালোবাজার ও তাহার প্রতিকারের উপায়, ক. বি. '৪৯
- মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ও চোরা-কারবার

১৩. বাণিজ্যে বিজ্ঞাপনের স্থান
Place of Advertisement in Commerce.

প্রবন্ধ-সূত্র: অবতরণিকা – বিজ্ঞাপনের কর্ম-প্রক্রিয়া: বিজ্ঞাপন বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় জয়লাভের হাতিয়ার—বিজ্ঞাপন ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করে তোলে—বিজ্ঞাপনের রূপ-বৈচিত্র্য ও প্রকরণ-বৈচিত্র্য—পণ্যের রূপ-সজ্জা ও বিজ্ঞাপন বনাম গুণগত উৎকর্ষ – প্রচার-যন্ত্রে ব্যয়িত অর্থ কি অপব্যয়? – ক্রেতার কাছে অপব্যয় – সবখানি অপব্যয় নয়—বিজ্ঞাপনে ব্যয়িত অর্থ ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হওয়া উচিত – অশ্লীল বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে জনমত ও সরকারী ব্যবস্থা – বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ—উপসংহার।

বিজ্ঞাপন বাণিজ্যের প্রসাধন। প্রসাধন-শিল্পের সাহায্যে মানুষ নিজেকে সুন্দর করে প্রকাশ করে, বিজ্ঞাপন তেমনি বাণিজ্যকে সুশোভন, শিল্পসম্মত রূপদান করে ক্রেতা-সাধারণের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে মানুষের প্রয়োজনেই এসেছে, শিল্পকলাও এসেছে মানুষের জন্যে—কিছুটা প্রয়োজনে, কিছুটা অপ্রয়োজনে। সৌন্দর্য-সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজনের পাশাপাশি অপ্রয়োজনেরও দরকার। প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের আশ্চর্য সমাহারে শিল্পকলা ধরণীর ধূলিময় রুক্ষ জীবনে এনেছে সৌন্দর্যের মধুর প্রলেপ, তাই পৃথিবী হয়ে উঠেছে রূপমাধুরীর বর্ণ-বিলসিত অপরূপ রংমহল। আধুনিক যুগ ও জীবনের প্রশস্ত রাজপথে বাণিজ্য ও শিল্পকলা পরস্পর সম্মিলিত হলো। প্রাচীনকালের বাণিজ্য ছিল সীমিত, সহজ ও সর্ব-জটিলতামুক্ত। আধুনিক কালের বাণিজ্য প্রাচীনকালের সংকীর্ণ পরিধি-বন্ধন ছিন্ন করে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়। এসেছে নানা দুরূহ থিওরির জটিল মারপ্যাচ, আর এসেছে রুদ্ধশ্বাস প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করতে হবে পণ্যের গুণগত উৎকর্ষ প্রচারের মাধ্যমে। বিজ্ঞাপন তাই পণ্যের উৎকর্ষ-প্রচার ও ক্রেতা আকর্ষণের অনবদ্য শিল্প-কৌশল।

অবতরণিকা

তীব্র প্রতিযোগিতাই আধুনিক কালের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ চরিত্র। প্রত্যেক উৎপাদকই চায় সেই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে বাণিজ্যে একাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে এবং মুনাফার অঙ্ক বৃদ্ধি করতে। তাদের উদ্দেশ্যকে সাফল্য দান করবার একমাত্র হাতিয়ার হলো বিজ্ঞাপন। বাণিজ্য-জগতে বিজ্ঞাপনের কর্ম-প্রক্রিয়া দ্বিবিধ: এক,

পণ্যের উপযোগিতাগত সার্থকতার সঙ্গে শিল্প-সুষমার সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করে তার চাহিদা বৃদ্ধি করা। দুই, ক্রেতা-সাধারণের কাছে কোন পণ্যের অস্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব—দুই প্রতিপন্ন করে এক শিল্পসম্মত ও মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে উক্ত পণ্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা অর্থাৎ চাহিদা সৃষ্টি করা ও চাহিদা বৃদ্ধি করা। শিল্পের প্রতি, সুন্দরের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণবশেই মানুষের মন বিশেষ-বিশেষ পণ্যের স্পর্শ-কাতর শৈল্পিক আবেদনে মুগ্ধ হয় এবং তার বাণী-বিন্যাস ও বর্ণ-বাহারের জলুসময় চাকচিক্যে হয় আকৃষ্ট। ফলে চাহিদার সৃষ্টিও বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদক প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে তার মুনাফার অঙ্ক চলে বাড়িয়ে। লক্ষণীয় যে, জনপ্রিয় পণ্য-সম্ভারের জনপ্রিয়তার মূলে শিল্পকলার অবদান অসীম। অভাববোধ ও শিল্প-চেতনা—মানব-মনের এই আদিম প্রবণতাগুলির উদ্দীপন ও তার চরিতার্থতার আয়োজন ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম লক্ষ্য। আসল কথা, শিল্প-সুষমার সমাহারে পণ্যের সামগ্রিক উপযোগিতাকে দ্বিগুণিত করে তোলা হয়, মুনাফার অঙ্কও তাতে হয় ক্রমবর্ধিষ্ণু।

বিজ্ঞাপনের কর্ম-প্রক্রিয়া: বিজ্ঞাপন বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় জয়-লাভের হাতিয়ার

বর্তমান বাণিজ্য-জগতে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিত্য-নতুন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে বাজারে নব-নব পণ্যের অভ্যুদয় ও পুরাতন পণ্যের নব-রূপায়ণ সম্ভব হয়ে উঠছে। সেই সংবাদ এবং পণ্যের রূপ-বৈচিত্র্যের আকর্ষণীয়তা ক্রেতা-সাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করার দায়িত্ব বিজ্ঞাপন গ্রহণ করেছে। মনোহারী বিজ্ঞাপনগুলি শিল্প-সৌকর্যের সাহায্যে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মানুষের মন ও সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। প্রথমত, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে থাকে অপরিচয়ের ব্যবধান, থাকে হাজার-হাজার মাইলের দূরত্ব। কিন্তু বিজ্ঞাপন সেই ব্যবধান ও দূরত্বের অবসান ঘটিয়ে স্থাপন করে সংযোগের সেতু-বন্ধন। বিজ্ঞাপনের মধ্যস্থতায় ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং প্রতিলাভ করে লেনদেন। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞাপন নব-নব পণ্যের সংবাদ ও তার ব্যবহারের কৃতিত্বের কথা বহন করে এনে উন্নীত করে জনসাধারণের রুচি ও জীবনধারণের মান। আবার অন্যদিকে, পণ্যের উৎপাদনকারীকে নব-নব সাফল্যের বাণীতে অভিষিক্ত করে নব-নব সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে। এইভাবে ক্রেতা ও বিক্রেতা—উভয় শ্রেণীর ইচ্ছাপূরণ করে বিজ্ঞাপন দেশের অর্থ নৈতিক ভবিষ্যৎকে করে তোলে উজ্জ্বল।

বিজ্ঞাপন ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে দেশের অর্থ নৈতিক ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করে তোলে

দিনে-দিনে বিজ্ঞাপনের শিল্প-কৌশল বহু বিচিত্র হয়ে উঠছে। বিজ্ঞাপনের প্রাথমিক যুগে ছিল গলাবাজি। তারপর নিত্য-নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্করণের ফলে

বিজ্ঞাপনের প্রকরণ-বৈচিত্র্য দেখা দিল; মুদ্রাযন্ত্রের উদার হস্ত থেকে ছড়িয়ে পড়লো ইস্তাহার, প্রচার-পত্র, প্রচার-পুস্তিকা। তারপর এলো নানা-রূপময় প্রাচীর-পত্র। পাশ্চাত্য দেশগুলির অনুকরণে এখন আবার সুন্দরী মহিলা-কর্মীদের পণ্য-প্রচারের উদ্দেশ্যে গৃহে-গৃহে প্রেরণ করা হয়। তাতে গৃহস্থের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হয় এবং পণ্য-প্রচার বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, গলাবাজিকে উচ্চতম পর্দায় পৌঁছিয়ে দেবার জন্যে এসেছে মাইক্রোফোন বা লাউড্‌স্পীকার। সিনেমা-থিয়েটার-বায়োস্কোপ ইত্যাদি প্রদর্শনীর ফাঁকে-ফাঁকে রূপালী পর্দায় স্লাইড্ ও নাটকীয়তাপূর্ণ চলন্ত কাহিনীর সাহায্যে পণ্যের রূপ-বৈচিত্র্যকে মূর্ত করে তোলা হয়। শহরের রাজপথে আলোকিত বাতি-স্তম্ভগুলি নানা পণ্যের রঙ-বেরঙের বিজ্ঞাপন বক্ষে ধারণ করে অপরূপ হয়ে উঠে। তাছাড়া, দৈনিক পত্রিকা, সাময়িক পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক স্মারক-পত্র তো আছেই। অতি-আধুনিককালে এসেছে বেতার ও টেলিভিশন বিজ্ঞাপনের সক্রিয় মাধ্যম-রূপে। সভাসমিতিতে, খেলার মাঠে, গানের আসরে পণ্যের নমুনা ও নানা আকর্ষণীয় উপহার বিলি করে বিজ্ঞাপন করা হয়। লটারীর পুরস্কার ঘোষণা করে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের মধ্যে বৃত্তি দান করে বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হয়। ইদানীং কালে আবার এসেছে ফ্যাশন্ প্যারেড্ বা সৌন্দর্য-শিল্প-প্রদর্শনী। নানাভাবে পণ্য-ক্রয়ের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করার নতুন-নতুন কৌশল এখন বাণিজ্যে গৃহীত হচ্ছে।

বিজ্ঞাপনের রূপ-বৈচিত্র্য ও প্রকরণ-বৈচিত্র্য

এ-যুগের ক্রেতা-সাধারণও অত্যন্ত সতর্ক হয়ে উঠেছে। বাহিরের চাক্‌চিক্যে আর তারা প্রতারিত হতে রাজী নয়। কারণ পণ্যের অঙ্গসজ্জায় ও প্রচার-শিল্পে ব্যয়িত অর্থ পণ্য-মূল্যের ওপর পড়ে ও পণ্য-মূল্যকে প্রভাবিত করে। কাজেই, কোন দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষ-বৃদ্ধির জন্যে তার মূল্য-বৃদ্ধি সব সময় হয় না, প্রচ্ছদ-প্রসাধনের ব্যয়-বাহুল্যের জন্যে অনেক সময় পণ্য-মূল্য বৃদ্ধি পায়। কাজেই পণ্যের উপযোগিতার অতিরিক্ত এই ব্যয়-বাহুল্য ক্রেতার স্বার্থের প্রতিকূল। উৎপাদনকারীকে তাই পণ্যের রূপসজ্জায় বা বিজ্ঞাপন-সৌকর্যে ব্যয়-সঙ্কোচ করে পণ্যের গুণগত উৎকর্ষ-বৃদ্ধির জন্যে অধিকতর প্রয়াসী হতে হবে।

পণ্যের রূপসজ্জা ও বিজ্ঞাপন বনাম গুণগত উৎকর্ষ

অনেকের মতে, পণ্যের প্রচার-কার্যে ব্যয়িত অর্থ সামূহিক অপচয় ছাড়া অন্য কিছু নয়। ক্রেতা-সাধারণের স্বার্থের দিক থেকে বিচার করলে অনুরূপ অভিমতের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পণ্যের অঙ্গ-সজ্জা ও বিজ্ঞাপন-খাতে ব্যয়িত বিরাট্ অঙ্ক ক্রেতাকে বহন করতে হয়। এই চরম অর্থ-সংকটের দিনে তাদের কাছে এই অঙ্ক নিতান্তই

অপব্যয়। পণ্যের অভিহিত মূল্য ও নিহিত মূল্যের ব্যবধান অযথা বহন করতে হয় ক্রেতাকে। গুণগত মূল্য বা নিহিত মূল্যের অতিরিক্ত তাদের কাছে অপব্যয় ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। সেই সঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে, উক্ত পণ্যের সংবাদ বা তার অভাববোধ বিজ্ঞাপন ছাড়া ক্রেতার কাছে অজ্ঞাত ছিল। প্রচার-শিল্পের মনস্তাত্ত্বিক ও শৈল্পিক আবেদনে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাছাড়া, বাজারে প্রচলিত বহু পণ্যের প্রতিযোগিতায় বিজ্ঞাপন ক্রেতাকে পণ্য-নির্বাচনের সুযোগ দান করে। এদিক দিয়ে ক্রেতার কাছে প্রচার-শিল্পেরও মূল্য আছে।

প্রচার-যন্ত্রে ব্যয়িত অর্থ কি অপব্যয়? ক্রেতার কাছে অপব্যয়—সবখানি অপব্যয় নয়

কিন্তু বিক্রেতাকে মনে রাখতে হবে যে, বিজ্ঞাপনে ক্রেতার স্বার্থের চেয়ে বিক্রেতার স্বার্থ অধিক জড়িত। ক্রেতার ভোগ; কিন্তু বিক্রেতার মুনাফা। ক্রেতা যদি তার ভোগের অংশ থেকে কিছুটা ত্যাগ-স্বীকারে প্রস্তুত থাকে, তবে বিক্রেতা তার মুনাফার বখরা থেকে কিছুটা ত্যাগ-স্বীকারে রাজী হবে না কেন? আমাদের বক্তব্য হলো, বিজ্ঞাপন বা প্রচার খাতে ব্যয়িত অর্থ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের ওপরে সমভাবে বণ্টিত হওয়া উচিত। প্রত্যেক বিক্রেতারই উচিত, ক্রেতার স্বার্থ-রক্ষা করা। এবং ব্যবসায়ে মৌল লক্ষ্য হলো, সমাজের সামগ্রিক সম্পদ বৃদ্ধি; কেবলমাত্র বিক্রেতার মুনাফা বৃদ্ধি নয়।

বিজ্ঞাপনে ব্যয়িত অর্থ ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হওয়া উচিত

পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ে বিজ্ঞাপনের গৌরবজনক ভূমিকা আছে স্বীকার করি; কিন্তু বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে রুচি-বিকৃতিকে প্রশ্রয় দান একেবারে সমর্থন-যোগ্য নয়। অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপনের যেরূপ ছড়াছড়ি আজকাল পথে-প্রান্তরে ও পত্র-পত্রিকায় লক্ষ্য করা যায়, তাতে অতি-প্রগতিশীল ব্যক্তিরও আতঙ্কিত হবার কারণ আছে। যৌন উত্তেজনাপূর্ণ রুচি-বিগর্হিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পণ্য-ক্রয়ে ক্রেতাকে প্রলুব্ধ করার পশ্চাতে যে মনোভাব প্রচ্ছন্ন থাকে, তা অবশ্যই নিন্দনীয়। বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করার অধিকার সকল ব্যবসায়ীর আছে। কিন্তু অশালীন চিত্র ও বাক্য-বিন্যাসের সাহায্যে দেশের জনগণের নৈতিক মানকে অবনমিত করে জাতীয় চরিত্রের সর্বনাশ সাধন করার অধিকার কে ব্যবসায়ীদের দিয়েছে? এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা এই অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন বন্ধ করার বিরোধী। কিন্তু তাঁরা যে কায়েমী স্বার্থের দালাল, তাদের চিনতে এতটুকু ভুল হয় না। কুরুচিপূর্ণ জঘন্য বিজ্ঞাপন প্রচারের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত সংগঠিত হওয়া উচিত। এবং তার প্রতিফলনে সরকারকেও অনুরূপ বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্যে সচেষ্ট হতে হবে।

অশ্লীল বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে জনমত ও সরকারী ব্যবস্থা

ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ধূর্ততা সর্বজন-বিদিত। তারা আয়কর ফাঁকি দেবার জন্যে বিজ্ঞাপন-খাতে প্রচুর ব্যয় করে তাকে স্থাপন-ব্যয় বা সম্প্রসারণ-ব্যয় হিসেবে দেখায়। তাতে রাষ্ট্র তার প্রাপ্য অর্থ থেকে বঞ্চিত হয়। তাই ব্যবসায়ীরা যাতে বিজ্ঞাপনখাতে

বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ

যথেচ্ছ অর্থ ব্যয় করে সরকারকে ফাঁকি দিতে না পারে, তার জন্যে বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ বিধি রচনায় সরকার অগ্রসর হয়েছিলেন ১৯৬৫ সালে। কিন্তু, ব্যবসায়ী-গোষ্ঠীর চাপে সরকারকে পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছে। ব্যবসায়ী-গোষ্ঠীর মতে, বিজ্ঞাপন-নিয়ন্ত্রণের ফলে বিজ্ঞাপন-শিল্পে নিয়োজিত অনেক শিল্পী বেকার হবে; সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা, যারা বিজ্ঞাপনের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে সরকার, বলা বাহুল্য, কায়েমী স্বার্থের হাতে আত্মসমর্পণ করতে চলেছেন।

বিজ্ঞাপনে মানবিক কল্যাণ-ব্রতী বাণিজ্য ও শিল্প-সুন্দরের সমন্বয়। সেখানে অসুন্দরের স্থান নেই, স্থান নেই প্রতারণার। উন্নত নীতিবোধের অভাবে বাণিজ্যে আজ অসুন্দরের আবির্ভাব ঘটেছে। নিকৃষ্ট মানের পণ্যকে উৎকৃষ্ট রূপে বিজ্ঞাপিত করে জন-মানসে তার অভাববোধ জাগ্রত করে জনগণের স্বাস্থ্য, শ্রী ও সম্পদ অপহরণ

উপসংহার

করার দুর্নীতি থেকে ব্যবসায়ী মহলকে বিরত হতে হবে। এ বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করতে হবে প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায়ীদের। স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় বাণিজ্য-দপ্তর এবং বাণিজ্য-জগৎকে অগ্রণী হতে হবে এ বিষয়ে। প্রচার-শিল্পীদেরও বিবেক-বুদ্ধি ও সৌন্দর্য-বোধকে জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো থেকে বিরত হতে হবে। তাহলে বিজ্ঞাপনের মৌল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, বাণিজ্যও শিল্প-সুষমার হাত ধরে তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছুতে পারবে।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- ব্যবসায় ক্ষেত্রে শিল্প-কলার স্থান, ক. বি. '৫৮
- ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা, ক. বি. '৬০
- বাণিজ্য ও শিল্প-কলা

১৪. যন্ত্র বনাম মানুষ
Man Versus Machine.

প্রবন্ধ-সূত্র :—অবতরণিকা—যন্ত্রের জন্ম ও তার প্রতিশ্রুতি—যন্ত্রের শক্তি ও মানব-সেবা—মানুষের বিরোধী ভূমিকায় যন্ত্র : সভ্যতার অভিশাপ ও অর্থ নৈতিক শোষণ—যন্ত্র-জটিলতা ও শ্রেণী-সংঘাতের তীব্রতা—যন্ত্র দোষী নয় : মুষ্টিমেয় ক্ষমতা-লোভীদের হাতে যন্ত্রের অপব্যবহার—যন্ত্র-বিচ্ছেদ অসম্ভব : সকল বৈষয়িক উন্নয়নের মূলে যন্ত্র—যন্ত্রের আশীর্বাদ লাভের উপায় : ধন বণ্টনের সাম্য, যন্ত্রের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, যন্ত্র-কর্তৃত্বের অবসান, কুটির-শিল্পের সহাবস্থান—উপসংহার।

"মানুষ যেদিন প্রথম চাকা আবিষ্কার করেছিল সেদিন তার এক মহাদিন। অচল জড়কে চক্রাকৃতি দিয়ে তার সচলতা বাড়িয়ে দেবামাত্র যে বোঝা সম্পূর্ণ মানুষের নিজের কাঁধে ছিল, তার অধিকাংশই পড়ল জড়ের কাঁধে।"
—রবীন্দ্রনাথ

যন্ত্র এলো পৃথিবীতে মানুষের কাঁধের বোঝার ভার লাঘব করবার জন্যে। কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে মানুষ যেমন তার স্রষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিল, যন্ত্রও তেমনি আজ আকণ্ঠ মানুষের রক্ত পান করে তার স্রষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। মানুষ সেদিন মনে প্রাণে চেয়েছিল যন্ত্রের জোরে দেবতার পদ সে নিজেই গ্রহণ করবে; যন্ত্র-দানবের সাহায্য নিয়ে সে লড়াই করেছে দৈব-শক্তির সঙ্গে। সেই সংগ্রামে মানুষ

অবতরণিকা

যন্ত্রকে বড় বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছে, নিজের অজ্ঞাতে মানুষ জড় হৃদয়হীন যন্ত্রের হাতে করেছে আত্মসমর্পণ। সেই যন্ত্র আজ মানুষের নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। যা ছিল পাশাপাশি, আজ তা দাঁড়িয়েছে মুখোমুখি। মানুষ বনাম যন্ত্রের সংগ্রামে যন্ত্রই হয়েছে জয়ী। মানুষকে অপসারিত করে তার স্থান অধিকার করে নিয়েছে যন্ত্র, মানুষের জীবিকান্নের সংস্থান যা ছিল, তাও আজ যন্ত্রের অধিকারভুক্ত। সর্বোপরি, মানুষের আত্মিক সম্মান অপহরণ করে যন্ত্র মানুষের এই প্রাণময় পৃথিবীকে প্রাণহীন শুষ্ক যান্ত্রিকতায় পরিণত করেছে। সভ্যতার রথের বাহন হয়েছিল যন্ত্র। কিন্তু আজ সেই বাহন শক্তির উন্মত্ত দম্ভে হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠে সভ্যতার বুকের ওপর দিয়ে চালিয়ে দিয়েছে তার সদর্প নৃশংস অভিযান। রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীজী প্রমুখ ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা, ঋষি-মহাপুরুষেরা যন্ত্রের এই সর্বনাশা ছিন্নমস্তারূপ দেখতে পেয়েছিলেন। মানব-জাতির

উদ্দেশ্যে তাঁরা সতর্কতা-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে, মানুষকে এই যন্ত্র-নির্ভরতার জন্যে একদিন নয় একদিন চরম মূল্য দিয়ে যেতে হবে; কিন্তু সেদিন ঘনিয়ে আসবে মানব-সভ্যতার চরম সন্ধিক্ষণ। সেদিন মানুষকে সভ্যতার শেষ কানাকড়ি দিয়ে তার অতিরিক্ত যন্ত্রানুগত্যের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করে যেতে হবে।

কিন্তু যন্ত্রের জন্মক্ষণে ছিল মানুষের সামগ্রিক মঙ্গল-চেতনা। মানুষের ভোগ-বাসনায় পরিতৃপ্তির আশ্বাস ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিল যন্ত্র। বিপুলা এ পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার চাহিদাও যখন ক্রমবর্ধিষ্ণু, অন্যদিকে খনির অন্ধকারে যখন পৃথিবীর মূল্যবান সম্পদগুলি কঠিন ঘুমে অচেতন, মানুষের ক্ষুধাহরণের জন্যে কৃষিভূমি যখন মানুষেরই করস্পর্শ-প্রত্যাশায় পাষাণী অহল্যার মতো প্রতীক্ষা-ব্যাকুল, মানুষের শ্রমের উৎপাদনশক্তি যখন সুষ্ঠু ব্যবহারের অভাবে নিম্নমুখী, তখনই মানুষ প্রয়োজন বোধ করেছিল এমন একটি শক্তির, যা পৃথিবীর সম্পদ ও মানুষের শ্রমের সুষ্ঠু ব্যবহারীকরণের মাধ্যমে মানুষের হাতে এনে দেবে বহুল উৎপাদনের অফুরন্ত সুযোগ, মানুষের ভোগাকাঙ্ক্ষার চাহিদা মিটিয়ে আনবে সুখ, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য। এই প্রয়োজনবোধ থেকে যন্ত্রের জন্ম। তারপর খনির অন্ধকার গহ্বর হলো আলোকিত, বাষ্পীয় শক্তিকে করায়ত্ত করে মানুষ নির্মাণ করলো বাষ্পীয় এঞ্জিন, এলো যন্ত্র, এলো যন্ত্রযুগ।

যন্ত্রের জন্ম ও তার প্রতিশ্রুতি

য়ুরোপে শিল্প-বিপ্লবের সময় থেকে যন্ত্রযুগের সূত্রপাত বলে মনে করা হয়। কিন্তু যন্ত্রের জন্ম আরো বহু পূর্বে। মানুষ যেদিন তার শ্রম লাঘব করবার জন্যে অস্ত্রের অধিকারী হলো, সেদিনই যন্ত্রের জন্মদিন। যুগে-যুগে যন্ত্রের উপকরণের পরিবর্তন হয়েছে, এসেছে তার রূপ-রূপান্তর, জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে তার গঠন। তার চালকশক্তিও হয়েছে পরিবর্তিত। তার চালক-শক্তির স্থান কখনো নিয়েছে পশু, কখনো বায়ু, কখনো বাষ্প। তারপর এসেছে বৈদ্যুতিক শক্তি, সর্বশেষে পারমাণবিক শক্তি। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের সেই দুর্বার দৈত্যের মতো যন্ত্র তার দুর্জয় শক্তিবলে পাহাড় ভেঙে রাস্তা বানিয়েছে, নদীর তট-যুগলকে বেঁধেছে শক্ত কংক্রিটের সেতু-বন্ধনে, জল-স্থল-অন্তরীক্ষ জয় করে এনে দিয়েছে মানুষের পায়ের কাছে, 'দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবারের' সীমাহীন ব্যবধান ঘুচিয়ে পৃথিবীর দূরের মানুষকে করেছে নিকটতম প্রতিবেশী। আর সেই যন্ত্রদানব তার মঙ্গল-শক্তির সামর্থ্যে কৃষিকে করেছে শস্যশালিনী, শিল্পকে করেছে অধিক উৎপাদনশীল, পথ ও পরিবহণকে করেছে সুদূরাভিসারী। যন্ত্রের শক্তিতে শক্তিমান মানুষ শীত, গ্রীষ্ম, বন্যা, ঝড়-ঝঞ্ঝা ইত্যাদি দুর্জয় প্রাকৃতিক উপদ্রবের

যন্ত্রের শক্তি ও মানব-সেবা

সঙ্গে আজ পাল্লা লড়তে পারে ; আর পারে পৃথিবীর দূর-দূরান্তের আর্ত, পীড়িত, রোগ-দীর্ণ মানুষের কাছে সেবা, সাহায্য ও আরোগ্যের কল্যাণ-হস্ত প্রসারিত করে দিতে।

এ পর্যন্ত ছিল মানুষের সঙ্গে যন্ত্রের মিতালি। তারপর দেখা গেল সংঘর্ষ। যন্ত্র অবতীর্ণ হলো মানুষের বিরোধী ভূমিকায়। আঘাতে আঘাতে সে মানুষকে, মানুষের জীবনকে ক্ষত-বিক্ষত করে তুললো। মানুষ অতিরিক্ত যন্ত্রানুগত্যের ফলে হারিয়েছে তার নিজস্ব কর্মশক্তি, হারিয়েছে তার নিজস্ব চলচ্ছক্তি। তার জীবনের গতি-স্পন্দন আজ স্তিমিত, তার প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ আজ স্তব্ধ। যন্ত্র-দানব তার ধূমময় নিশ্বাসে মানব-জীবনের শ্যামলিমাকে বিধ্বস্ত করে প্রসারিত করে দিয়েছে মরুভূমির কঠোর ধূসরতা। যান্ত্রিকতার গতানুগতিক একঘেয়েমি তার জীবনের বৈচিত্র্যের আস্বাদকে হরণ করে তার হাতে তুলে দিয়েছে অপমৃত্যুর পরোয়ানা। এই নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী যন্ত্র-নির্ভর নব-সভ্যতা মানুষকে রজ্জুবদ্ধ পশুর মতো তিলে-তিলে মহাধ্বংসের যূপকাষ্ঠের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে।

মানুষের বিরোধী ভূমিকায় যন্ত্র : সভ্যতার অভিশাপ ও অর্থ নৈতিক শোষণ

আজ যন্ত্র এসে মানুষের হাতের কাজ কেড়ে নিয়েছে, হরণ করে নিয়েছে তার জীবন-কাঠি। কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হলো, সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ-লক্ষ তাঁতীর তাঁত গেল বন্ধ হয়ে। যন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়ে বেকার হতভাগ্য শিল্পী কৃষিতে কিংবা গোলামিতে ফিরে যেতে বাধ্য হলো। এইভাবে প্রাচীন, সুন্দর, সনাতন জীবন-ছন্দের তার গেল ছিঁড়ে। তেলের কল কেড়ে নিল কলুর হাতের কাজ, ধানের কল বেকার করে দিল ধান-ভাঙ্গানী গ্রাম্য মেয়েদের। যন্ত্র-দানব তার মিতালির ছদ্মবেশ খুলে মানুষের হাতের কাজ কেড়ে নিয়ে, মানুষের জীবন-কাঠি অপহরণ করে তার জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে ধ্বংস করেছে, জীবন-ধারণের স্বল্পতম উপকরণ সংগ্রহের জন্যে মানুষকে প্রাণান্তকর পরিশ্রমের দিকে দিয়েছে ঠেলে। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বড় বড় কল-কারখানা। আজ উৎপাদন-রীতিতে এসেছে নতুনত্ব ; উৎপাদনের পরিমাণও ক্রমবর্ধমান। কিন্তু আকাশ-চুম্বী মুনাফার ন্যায়সঙ্গত অংশ থেকে শিল্প-শ্রমিকদের বঞ্চিত করে পশুদের পর্যায়ে ঠেলে রাখা হয়েছে। যে যন্ত্র ধনিকের ধন-বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি এনেছে, শ্রমিকের ভাগ্যে এনেছে কেবল দুঃসহ দুঃখ ও নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনা, যে যন্ত্র সমাজের একদল মানুষের সুখ-সম্ভোগের পঙ্কিল কাহিনী রচনা করে এবং আর একদল মানুষকে ঠেলে দেয় অসহ দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে, যে যন্ত্র একদলকে করে লোভী, মত্ত, মেদপুষ্ট, ভোগ-সর্বস্ব পশু, অন্য একদলকে করে খাদ্যান্বেষী, প্রাণধারণ-সর্বস্ব, বুভুক্ষু জানোয়ার, সেই যন্ত্রে কাজ কি ? সেই যন্ত্রের দৌরাত্ম্য থেকে মানবজাতি আজ চায় মুক্তি।

যন্ত্র-জটিলতা ও শ্রেণী সংঘাতের তীব্রতা

কিন্তু দোষ কার ? যন্ত্রের, না যন্ত্র-মালিকের ? যন্ত্রের জন্মলগ্নে ছিল মানব-জাতির সামগ্রিক কল্যাণের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু একদল স্বার্থপর লোভী মানুষের চক্রান্তে সে আজ তার মূল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে বাধ্য হয়েছে। শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদের হাতে পড়ে যন্ত্র আজ জনসাধারণের শান্তি-সংহারে মেতে উঠেছে। আজ যন্ত্র বিশ্বের মুষ্টিমেয় ক্ষমতালোভী দুর্বৃত্তদের হাতে পড়ে মানব-সভ্যতার অন্তিম মুহূর্ত ডেকে এনেছে, ডেকে এনেছে কোটি-কোটি মানুষের চরম লাঞ্ছনা ও তীব্র জীবন-সংকট। সেই অর্থনৈতিক স্বৈরাচারীদের হাতে যতদিন যন্ত্র বশীভূত থাকবে, ততদিন ভ্রষ্টাচারের মাধ্যমে প্রাণহীন, বিচার-বিবেচনাহীন যন্ত্র বারে-বারে করবে নরমেধ যজ্ঞের বিশ্বব্যাপী আয়োজন, মানব-জীবনের শান্তি-সুখকে দেবে বিধ্বস্ত করে, বারে-বারে পৃথিবীর মানুষের ভাগ্যে বহন করে-আনবে শারীরিক ও মানসিক নিগ্রহ।

যন্ত্র দোষী নয় : মুষ্টিমেয় ক্ষমতা-লোভীদের হাতে যন্ত্রের অপব্যবহার

তবু যন্ত্র-দাসত্বের হাত থেকে আজ মানব-সভ্যতার মুক্তির উপায় নেই। বিংশ-শতাব্দীর মানব-সভ্যতার এই যে চরম সমুন্নতি, তার মূলে রয়েছে যন্ত্র। যান্ত্রিক বিস্ময়ের অনবদ্য প্রকাশ বর্তমান সভ্যতার বিলাসী রূপ। তাই আজ যন্ত্রের অপ-ব্যবহারের ফলে মানুষের চরম লাঞ্ছনার প্রতিবাদে বর্তমান সভ্যতার সকল বন্ধন ছিন্ন করে অতীতের আরণ্যক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পথে দাঁড়িয়ে আছে বাধার বিন্ধ্যাচল। চলমান দুনিয়ার গতিচ্ছন্দের সঙ্গে সমতালে চলতে হবে। সেই প্রগতিকে অস্বীকার করে অতীতের অন্ধকারময় জীবনে প্রত্যাবর্তনের অর্থ মৃত্যু। পক্ষান্তরে, সভ্যতার আলোকিত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে হলে যন্ত্রকে স্বীকার করতেই হবে; যন্ত্রই আনবে অনুন্নত, অর্ধোন্নত দেশের সমৃদ্ধি। যন্ত্রই কৃষিজ, খনিজ, বনজ, মানবিক, অর্থনৈতিক—সকল শক্তি-সম্পদের সম্প্রসারণের মূল চাবিকাঠি। যন্ত্রই দেশকে বহু শতাব্দীর অন্ধকার, জড়তা ও অনগ্রসরতার বন্ধন থেকে মুক্ত করে চলমান জগতের গতিচ্ছন্দের সঙ্গে যুক্ত করে দেবে, জাতির মর্মমূলে যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত স্থবিরতাকে তুলবে জঙ্গম করে।

যন্ত্র-বিচ্ছেদ অসম্ভব : সকল বৈষয়িক উন্নয়নের মূলে যন্ত্র

যন্ত্র তাই বর্তমান যুগে অপরিহার্য। যন্ত্র চাই, কিন্তু মুক্তি চাই যান্ত্রিকতার হাত থেকে, মুক্তি চাই যন্ত্রের অভিশাপের হাত থেকে। যন্ত্র-দাসত্বের যে পাপ, আমাদের তার প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। যন্ত্রকে যদি রাষ্ট্রায়ত্ত করা যায় এবং সমাজের ধনবণ্টনে যদি সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায়, তবে মুষ্টিমেয়ের নিষ্ঠুর শোষণের হাত থেকে বিশ্বের কোটি-কোটি মানুষকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। আর বৃহদায়তন শিল্পের চেয়ে ক্ষুদ্রায়তন ও মাঝারি আয়তনের শিল্প-বিকাশে উদ্যোগী হতে হবে।

জাপানে প্রকৃতপক্ষে তাই হয়েছে। তাতে বেকার-সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধানও হয়। যে পরিমাণ পুঁজির বিনিয়োগে বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তাতে যত সংখ্যক মানুষের কর্ম-সংস্থান হয়, সেই পরিমাণ পুঁজি ক্ষুদ্র ও মাঝারি আয়তনের শিল্পে বিনিয়োজিত হলে অনেক বেশি সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান হয়। ভারতের মতো দেশে যন্ত্র-প্রাধান্যকে অস্বীকার করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আয়তনের শিল্পের প্রতি মনোযোগ দিলে ফল যে শুভ হবে, তা বলাবাহুল্য।

যন্ত্রের আশীর্বাদ লাভের উপায়: ধন-বণ্টনের সাম্য, যন্ত্রের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, যন্ত্র-কর্তৃত্বের অবসান, কুটির-শিল্পের সহাবস্থান

যন্ত্রের কল্যাণপূত হস্তের স্পর্শে মানুষের বহু যুগের সঞ্চিত- দুঃখভার লাঘব করতে হবে, অবাঞ্ছিত পচন ও অবক্ষয়ের হাত থেকে বিশ্বের হতভাগ্য মানুষকে রক্ষা করতে হবে। তা যদি না হয়, যন্ত্র-সর্বস্বতার পরিণামে একদিন ঘনিয়ে আসবে মানব-জাতির চরম দুর্ভাগ্য। যন্ত্র-শিল্প ও কুটির-শিল্পের সহাবস্থানের মাধ্যমে যন্ত্র-কর্তৃত্বের পরিমাণ হ্রাস না করলে মানব-ভাগ্যের সংকটময় দিন সমাগত হবেই। এবং যন্ত্রের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ও সমাজের সম্পদ-বণ্টনে সাম্য ত্বরান্বিত না হলে সাধারণ মানুষের বোবা-দুঃখ ঘুচবে না, দূর হবে না তার নিরুপায় বেকারত্ব। তাহলে মানুষের বুকের রক্ত পান করে যন্ত্র-দানবের বিভীষিকাময় কাপালিক রূপ অট্টহাস্য করে উঠবে। আর যন্ত্রের শক্তিমত্ততায় উন্মত্ত মানুষ সেদিন নিজের মৃত্যুর সীমা-রেখায় দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো তার ভুল স্বীকার করে যাবে। নিজের মৃত্যু-মূল্যে এবং সভ্যতার শেষ কানাকড়ি দিয়ে সেদিন তাকে তার কৃত-কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করে যেতেই হবে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- মানুষ বনাম কল, ক. বি. '৫৮
- বিজ্ঞানের উন্নতি ও মানব জাতির ভবিষ্যৎ, ক. বি. '৫৯
- চরকা বনাম কাপড়ের কল, ক. বি. '৬৫

১৫. ভারতের জন-সমস্যা
Population Problem of India.

প্রবন্ধ-সূত্র :— অবতরণিকা—প্রাচীন ভারতের জনসংখ্যা—অতিক্রান্ত সময়—ভারতের জনবৃদ্ধি ও ম্যালথুসীয় তত্ত্বের প্রয়োগ—ভারতের জনসংখ্যা ও কাম্য জনসংখ্যা-তত্ত্বের প্রয়োগ—মধ্যপন্থীগণের মতের আলোকে ভারতের জনসংখ্যা—ভারতের সাম্প্রতিক জন-সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ—জনবৃদ্ধি-সমস্যার প্রতিরোধ—উপসংহার।

অতি-জনতার ভারে জর্জরিত ভারতের দুচোখে আজ দুঃস্বপ্নের প্রেতচ্ছায়া। দারিদ্র্য ও অশিক্ষা—এই দুই দানবের দৌরাত্ম্যে ভারতের জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। নিদারুণ দারিদ্র্য ও অশিক্ষার অভিশাপ মাথায় তুলে দিয়ে ইংরেজ এদেশ থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে। আর পেছনে রেখে গেছে নিষ্ঠুর শোষণের নগ্ন ইতিহাস।

অবতরণিকা

শোষণের দ্বার অবারিত রাখবার জন্যে ইংরেজ এদেশে দারিদ্র্য ও অশিক্ষার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে রেখেছিল। এ কথা সত্য যে, ভারতবাসীরা সমৃদ্ধ দেশের দরিদ্র অধিবাসী। ভারতের ঘরে রয়েছে অফুরন্ত সম্পদ—তার মৃত্তিকায়, খনি-গহ্বরে, নদীস্রোতে, সমুদ্রের বালুকণায় সম্পদের ছড়াছড়ি; আর রয়েছে তার সম্পদ ব্যবহারীকরণের সমুজ্জ্বল সম্ভাবনা। সেই সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারীকরণের জন্যে যে জনশক্তি দরকার, তাও রয়েছে ভারতের হাতে। ছিল না কেবল তার প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তির মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়-সাধনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন বলিষ্ঠ পরিকল্পনা। দেশের সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারীকরণের অভাবে অনিবার্যরূপে দেখা দিয়েছে বেকার সমস্যা ও দুর্নিবার দারিদ্র্য। তাদের সঙ্গে এসে হাত মিলিয়েছে শিক্ষার অভাব। তার ভয়াবহ পরিণতি হলো অতিরিক্ত জনবৃদ্ধি।

প্রাচীন ভারতে নানা সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় জনসংখ্যার একটা স্থিতাবস্থা বজায় থাকতো। বাল্য-বিবাহ, বহুবিবাহ যখন জন-বৃদ্ধির হারকে দ্রুততর করে তুলেছে, তখন অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে সতীদাহ, বৈধব্য-চর্যা, কৌলিন্য প্রথা ইত্যাদি নানা নৃশংস ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে। তাছাড়া, নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রক্ষিত হতো। এখন সেই সামাজিক প্রথাগুলি অবলুপ্ত এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনাও বহুল পরিমাণে তিরোহিত। জনসংখ্যা আজ তাই স্বাভাবিক কারণেই উর্ধ্বমুখী।

প্রাচীন ভারতের জনসংখ্যা

বর্তমানে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপায়ণে হাত লাগানো হয়েছে। কিন্তু বড়ো দেরি হয়ে গেছে। স্বাধীন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষমতা যখন ভারতের হাতে এলো, তখন বড়ো দেরি হয়ে গেছে। যাত্রা-শুরুর এই বিলম্বের জন্যে অর্থনীতি-বিশারদ যদি বলেন—"The time spent in lamenting the inordinate increase in the population of the poor would be far better spent in arranging effective measures for the removal of their destitution."—তাতে কোন রকম অতিশয়োক্তি নেই। এখনো দেখি কান্নাকাটিতেই বেশি সময় নষ্ট হয়ে যায়, কাজের কাজ হয় কতটুকু? এমন এক সময় ছিল, যখন জনবৃদ্ধির হারকে চ্যালেঞ্জ করে বৈষয়িক উন্নয়নে হাত লাগালে জনবৃদ্ধির হারকে জব্দ করা যেত। কিন্তু এখন হয়েছে বিপরীত। জনবৃদ্ধির হার প্রতিনিয়ত বৈষয়িক উন্নয়নকে চ্যালেঞ্জ করে একেবারে নাজেহাল করে দিচ্ছে। তাইতো দেখি, এক-একটি বৈষয়িক উন্নয়ন প্রকল্প অতি-জনতার চাপে বানচাল হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রকল্পে মঞ্জুরীকৃত অর্থের বৃহদংশ খাদ্যপণ্য আমদানি করতেই ব্যয়িত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আমরা ঋষি ম্যাল্থাসের নীতির আর্ষ প্রয়োগও অন্তত করতে পারি। জনসংখ্যার জ্যামিতিক বৃদ্ধিহার এবং খাদ্যোৎপাদনের গাণিতিক বৃদ্ধিহারের মধ্যে আজ আর সমীকরণ সম্ভব নয়। সম্ভব নয় কেন? নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মহামারী, অকালমৃত্যু, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির সহযোগে একটা বেদনাময় সমীকরণ তো মাঝে মাঝে হয়ে যায়। কিন্তু ভয় হয়, না জানি সেই শেষের দিন কেমন ভয়ঙ্কর হবে, যেদিন মাতা ধরিত্রী তাঁর সংখ্যাতীত সন্তানের মুখে আর অন্ন তুলে দিতে পারবেন না! ভারতীয় অর্থবিজ্ঞানীরা সেই ধারায় চিন্তা করতে বসেছেন এবং তাঁদের কপালে ভয়ের বলিরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, পি. কে. ওয়াটাল, অধ্যাপক জ্ঞানচাঁদ প্রমুখ অর্থবিজ্ঞানীরা সেই দলভুক্ত। ডাঃ মুখোপাধ্যায় তো বলেন, দেশের মুখমণ্ডলে অতি-জনতার স্বাক্ষর অত্যন্ত স্পষ্ট। ১৯৪৯ সালে খাদ্যশস্য-অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান লর্ড বয়েড-ওরের মন্তব্যেও পূর্বোক্ত অভিমতের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

অতিক্রান্ত সময়

ভারতের জনবৃদ্ধি ও ম্যালথুসীয় তত্ত্বের প্রয়োগ

সে যাই হোক, ঋষি ম্যালথাসের আপ্ত বাক্য আজ বিগত শতাব্দীর দূর-দিগন্তে বিলীয়মান। একমাত্র খাদ্যোৎপাদনের কোণ থেকে জনসংখ্যার বিচার করাটা একদেশদর্শিতার নামান্তর বলে প্রমাণিত হয়েছে। তার স্থলে বর্তমান শতকে এসেছে কাম্য জনসংখ্যাতত্ত্ব (Optimum population theory)। কোন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, তার পূর্ণ-ব্যবহারীকরণ, ন্যায়সঙ্গত সুষম বণ্টনব্যবস্থা, মাথাপিছু জাতীয় আয়

এবং জনসংখ্যা—এই নবাগত তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। তাহলে এই তত্ত্বানুসারে ভারত কি অতি-জনতাগ্রস্ত? প্রথমত, ভারত অমেয় প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী। দ্বিতীয়ত, জাতীয় স্বার্থে তার পূর্ণ-ব্যবহারীকরণ হয়নি। ইংরেজ রাজত্বে তা বিজাতীয় স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং পূর্ণ-ব্যবহারীকরণ এখনও দূর অস্ত্। তৃতীয়ত, ন্যায়সঙ্গত সুষম বণ্টন এখনও বক্তৃতা ও কাগজ-কলমের গণ্ডী থেকে বাস্তব ক্ষেত্রে বেরিয়ে আসতে পারে নি। চতুর্থত, যা হবার তাই হয়েছে। টাটা-বিড়লা-ডালমিয়ার বার্ষিক আয়ের সঙ্গে সাধারণ শ্রমিক-মজদুরের বার্ষিক আয় যোগ করে বার্ষিক জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়ে যায়। তার ফলে, ভারতের মাথা-পিছু জাতীয় আয় বর্তমান মুদ্রামানে ৩৩৯'৪ টাকা (১৯৬২-৬৩ সালের প্রাথমিক হিসাবে) দাঁড়ায়। পঞ্চমত, ১৯৬১ সালের আদমসুমারি অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা ৪৩, ৯০, ৭২, ৮৯৩। অর্থাৎ বর্তমানে প্রায় ৪৬ কোটি। ভারত সরকার জনসংখ্যার এই বিশালতাকে অতিপ্রজতা (over population) বলেন না। India-1965 গ্রন্থে ভারত সরকারের অভিমত হলো—"India is a country with a developing economy, rich in natural resources and man-power. Her resources, human as well as material, are capable of fuller exploitation and more intensive utilisation." তার অর্থ হলো, ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণতর শোষণ এবং গভীরতর ব্যবহারীকরণের জন্যে যে মানব-শক্তির প্রয়োজন, তা ভারতের আছে। তবে ভারত অতিপ্রজ কি নাতিপ্রজ—তার চুল-চেরা বিচারে না গিয়ে স্বীকার করা ভালো যে, ভারতের জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান এবং সেই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মুখের দিকে চেয়ে ভারতে কৃষি-বিপ্লব ও শিল্প-বিপ্লব ত্বরান্বিত করতে হবে। সেই উন্নততর উৎপাদন-রীতির সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত সুষম বণ্টন-নীতির গাঁটছড়া বেঁধে দিতে হবে। তাই বোধ হয় অর্থবিজ্ঞানী বলেন—"The problem of population is not one of mere number but of efficient production and equitable distribution."

ভারতের জনসংখ্যা ও কাম্য জনসংখ্যা-তত্ত্বের প্রয়োগ

ভারতের ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার অনুপাতে উৎপাদন-রীতি ও বণ্টন-পদ্ধতি এতই দুর্বল যে অদূর ভবিষ্যতে অশুভ আশঙ্কা আছে। তাই ম্যালথুসীয় ও কাম্য জনসংখ্যা—এই তত্ত্বযুগলের তর্ক-বিতর্কের ঝড়ের ভেতর মধ্যপন্থীগণের মতের আবির্ভাব। তাঁদের মতে, কি ম্যালথুসীয়, কি কাম্য জনসংখ্যা—কোনটিই ভারতে প্রযোজ্য নয়। ভারতে জনবৃদ্ধির হার এত দ্রুত যে জনসংখ্যা, উৎপাদন-বৃদ্ধি ও সুষম বণ্টন—এই তিনের মধ্যে অতি শীঘ্র ভারসাম্য স্থাপিত না হলে ভারতের অর্থনীতি একেবারে ভেঙে পড়তে পারে।

মধ্যপন্থীগণের মতের আলোকে ভারতের জনসংখ্যা

ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এই অর্ধোন্নত দেশের পক্ষে যে আশঙ্কাজনক, তা ইকাফে (ECAFE) তার সাম্প্রতিকতম বিবৃতিতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন। আদমসুমারি কমিশনারের মতে ১৯৬৬ সালের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৫০ কোটি। ডাঃ চন্দ্রশেখরের অভিমত আরো ভীতিপ্রদ। তাঁর মতে, ভারতের এই জনসংখ্যা-বৃদ্ধিহার অব্যাহত থাকলে ১৯৯৯ সালে ভারতের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১০০ কোটি।

কাজেই ভারতের জনসমস্যা শিল্পোন্নয়নের স্বল্পতা ও মন্থরতার সমস্যা, অসম বণ্টনের সমস্যা ও সামাজিক কাঠামোর সমস্যা। সাম্প্রতিক কালে বিবাহ-ব্যাপারে সামাজিক উদারতার প্রশ্রয় বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বৈষয়িক উন্নয়নের প্রাথমিক কল্যাণে জন্মহার বৃদ্ধি ও মৃত্যুহার হ্রাসের ফলে জনসংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। ডাঃ নবগোপাল দাশের মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক অবস্থায় জনসংখ্যা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে থাকে। ভারতে প্রকৃতপক্ষে তাই হয়েছে। দেশে এখন বন্যা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা দূরীভূত হয়েছে, ম্যালেরিয়া-কলেরা-বসন্ত ইত্যাদি সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ অনেকটা প্রশমিত হয়েছে। চিকিৎসার সহজ-লভ্যতার ফলে অকাল-মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। ভারতে অকাল-মৃত্যুকে ঠেকাতে গিয়ে জনসংখ্যা হয়েছে ঊর্ধ্বমুখী। কিন্তু এতে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। ভারতে দারিদ্র্য-মুক্তির যে শুভ প্রয়াস সূচিত হয়েছে, তাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি-হার অবশ্যই হ্রাস পাবে। গ্রাম্যতার হাত থেকে ক্রমমুক্তি, শিক্ষা-প্রসার, অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে বিবাহ, পরিবার-পরিকল্পনা, অদূরদর্শী মাতৃত্ব-পরিহার ইত্যাদির মাধ্যমে জনসংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হবে। সম্প্রতি জনসংখ্যা যে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে, তার কারণ ভারতের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ পল্লী-অঞ্চলে বাস করে। সেখানে এখনো দারিদ্র্য ও অশিক্ষা বাসা বেঁধে আছে। সেখানে তাই উল্লিখিত প্রতিষেধ-মূলক নিয়ন্ত্রণ এখনও জনপ্রিয়তা অর্জন করে নি।

ভারতের সাম্প্রতিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

কিন্তু পরিবার-পরিকল্পনার সাফল্য সময়-সাপেক্ষ। অর্থনৈতিক উন্নয়নই হলো জরুরী সমাধান। কাজেই, জনবৃদ্ধি-সমস্যার প্রতিরোধের জন্য দ্বিমুখী কার্যসূচী গৃহীত হওয়া উচিত। একদিকে, ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণতর শোষণ ও গভীরতর ব্যবহারীকরণ ত্বরান্বিত করতে হবে; অন্যদিকে, জনবৃদ্ধি-নিয়ন্ত্রণের সকল সম্ভাব্য পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। ভারতের কি কৃষির, কি কুটির-শিল্পের, কি বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদন-প্রকরণ অত্যন্ত গতানুগতিক ও সেকেলে এবং সমবণ্টনের প্রতিশ্রুতি অত্যন্ত অস্পষ্ট ও ক্ষীণ। তার ফলে, সমস্যার সমাধান যদি বিলম্বিত হয় কিংবা সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর

জনবৃদ্ধি-সমস্যার প্রতিরোধ

হয়, বিস্মিত হবার কারণ নেই। 'হবে তা সহিতে মর্মে দহিতে, আছে সে ভাগ্যে লিখা।' অন্যদিকে, জন্ম-সংযমের জন্যে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দারিদ্র্য-মুক্তি ও শিক্ষা-প্রসারে জন্ম-সংযমের প্রবণতা পরিলক্ষিত হবে। পরিবার-পরিকল্পনার সাফল্যের জন্যে তাকে সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। পল্লী ও শহরাঞ্চলের নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে এর যথোচিত প্রচার-কার্য পরিচালিত হওয়া উচিত। প্রতি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে এবং শহরের প্রত্যেক পল্লীতে একাধিক পরিবার-পরিকল্পনা কেন্দ্র স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত কর্মীর অভাব যেন সেখানে না হয়। এ বিষয়ে গণ-স্বাস্থ্য ও গণ-সংযোগ বিভাগের সহযোগিতা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। সেই সঙ্গে করতে হবে বয়স্ক-শিক্ষা-বিস্তারের দেশব্যাপী আয়োজন।

দারিদ্র্য-মুক্তি ও শিক্ষা-বিস্তার—ভারতের এই দুই সাধনার সিদ্ধির ওপর নির্ভর করছে ভারতের ভবিষ্যৎ। জনবৃদ্ধি-সমস্যা প্রতিরোধের মূল চাবিকাঠি এই দুটিই। পরিবার পরিকল্পনা কার্যসূচী আনুষঙ্গিক উপায় মাত্র। এই তিনটি আয়োজনকে ভারতবাসীর জীবনে সফল করে তুলতে হবে। বহুযুগের অশিক্ষা ও কুসংস্কারের অচল পাথরটাকে জন-জীবনের বুকের ওপর থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

উপসংহার

দুঃখ-দুর্দশার অভিশাপে অভিশপ্ত জীবন-যাপনের চেয়ে অবিবাহিত কিংবা নিঃসন্তান জীবন যে সহস্র গুণে শ্রেয়—এ কথা উপলব্ধি করার দিন এখন এসেছে। বিবাহকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত রাখার আজ আর কোন সার্থকতা নেই। ভারতে কোন কোন সম্প্রদায়ে এখনও একাধিক বিবাহ-রীতি প্রচলিত আছে। জনভারে ভারতের জর্জরিত বৈষয়িক উন্নয়নের প্রতি এটা কি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন নয়? এক হাকিমের দুই হুকুম কেন? সমগ্র ভারতে হিন্দু কোড্ বিলের মতো একই আইন প্রবর্তিত হওয়া উচিত। নইলে জটিলতর সমস্যার উদ্ভব হবে এবং ভারতের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক আকাশে ঘনিয়ে আসবে দুর্যোগের ঘন কালো মেঘ। তা ছাড়া, যে জনসংখ্যা বর্তমান ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কাঠামোয় জনাধিক্য বলে মনে হচ্ছে, সেই জনসংখ্যাই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কাঠামোয় আর জনাধিক্য বলে মনে হবে না। কাজেই ভারতের জনসংখ্যার দিকে তাকিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লগ্নকে ত্বরান্বিত করতে হবে।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- ভারতের জনবৃদ্ধি সমস্যা, ক. বি. '৬১
- লোক-বৃদ্ধি সমস্যা, ক. বি. (ত্রৈবার্ষিকী) '৬৩
- ভারতের বৈষয়িক উন্নতি ও জনবৃদ্ধি সমস্যা

১৬. ভারতের বেকার সমস্যা

ক. বি. '৫৪

Unemployment Problem in India.

প্রবন্ধ-সূত্র :—অবতরণিকা—ভারতের বেকার সমস্যার কারণ : ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি ও সমাজ-ব্যবস্থা—পল্লী অর্থনীতির দুর্বলতা : কৃষি ও কুটির-শিল্প—নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মুখে ভারতীয় শিল্প-শিক্ষার ত্রুটি : শিক্ষা-সংস্কারের দ্বারা কি সমস্যার সমাধান সম্ভব—পরিকল্পনাকালীন নিয়োগ-সমস্যা ও তার সমাধান-প্রয়াস—পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যার রূপচিত্র—প্রতিকার ও প্রতিরোধ—উপসংহার।

অবতরণিকা

আজ বেকার সমস্যার নিদারুণ অভিসম্পাত ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র ভারতে। এই অভিশাপের দারুণ রাহু যে কেবলমাত্র ভারতকেই গ্রাস করেছে, তা নয় ; সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি বাদে সমগ্র পৃথিবীই আজ এই রাহুগ্রাসে নিপতিত। কিন্তু ভারতের মতো এমন তীব্র ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা অন্য কোন দেশের নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে বিশ্বের যুব-মানস স্বপ্ন দেখেছিল এক নয়া দুনিয়ার। সে স্বপ্ন তাদের ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। কর্মহীন বেকার যুব-সমাজ নিদারুণ অপচয়ে আজ দেউলে হয়ে গেছে। সৃজনশীল যে কর্মশক্তি সৃষ্টির নব-নব প্রেরণায় মেতে উঠতে পারতো, আজ তা অপচয় ও অবক্ষয়ের শোচনীয় পরিণামে ক্লান্ত, অবসন্ন ও দিশাহারা। অথচ প্রাণশক্তির অফুরন্ত উৎস এই যুব-সমাজ কত ব্যর্থ সাধনাকে সার্থক করে তুলতে পারতো। বিশ্বের এই নৈরাশ্যের পট-ভূমিকায় ভারতের বেকার সমস্যা সত্যিই ভয়াবহ। দ্বি-শতাব্দীর বিদেশী শাসনে ক্লান্ত অবসন্ন ভারতকে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আঘাতে সর্বস্বান্ত ভারতকে, স্বাধীনতার অভিশাপে দ্বিখণ্ডিত ভারতকে ইংরেজ 'লক্ষ্মী-ছাড়া দীনতার আবর্জনারস্তূপ' রূপে পরিত্যাগ করে গেল। আর ভারতবাসীর হাতে উপঢৌকন দিয়ে গেল শতাব্দী-লালিত বেকার সমস্যা।

ইংরেজ শাসক-সম্প্রদায় এদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে ধ্বংস করে বেকার সমস্যার প্রাথমিক অবস্থার সৃষ্টি করে। ভারতে ও ভারতের বাইরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সস্তায় শ্রমিক সহজলভ্য করে রাখার জন্যে ইংরেজ এদেশে বেকার সমস্যা সৃষ্টি করেছিল এবং তাকে জীইয়ে রেখেছিল গত দু' শতাব্দী ধরে। তারপর বৃটিশ শাসনের অনুগ্রহে মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে উঠলো ধনতন্ত্রের শক্ত ইমারত। সমাজ-ব্যবস্থার একাধিপত্য ছিল সামন্তদের হাতে, এবার তা এলো মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর হাতে। কল-কারখানা ইত্যাদি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান কতিপয় পুঁজিপতিদের

অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হতে লাগলো এবং তারা রাষ্ট্রকে পীড়নের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করতে সুরু করে দিল। ভারতের গণতন্ত্রও ছদ্মবেশী ধনতন্ত্র ছাড়া অন্য কিছু নয় এবং ন্যায়সঙ্গত সমবণ্টন বর্তমান অর্থ নৈতিক কাঠামোয় অসম্ভব। ব্যক্তিগত শিল্পায়তনের মালিকেরা ব্যক্তিগত লাভের দিকেই যত্নশীল। অর্থবিজ্ঞানীদের মতে, এরূপ সমাজে জনগণের পূর্ণ-নিয়োগ একেবারেই অসম্ভব। ধনপতি-গোষ্ঠী বেকার সমস্যার সমাধানকল্পে দেশের মানবিক শক্তির ব্যবহারীকরণের দিকে নজর না দিয়ে, মুনাফার অঙ্ক বাড়াবার জন্যে যন্ত্রশক্তি ব্যবহারের দিকে মন দেবে। তাই যন্ত্র এসে মানুষের হাতের কাজ কেড়ে নিল, হরণ করে নিল তার জীবন-কাঠি। কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হলো একটা, শত শত তাঁতীর তাঁত বন্ধ হয়ে গেল, বেকার তাঁতী হলো মৃত্যু-পথযাত্রী। তেলের কল কেড়ে নিল শত শত কলুর হাতের কাজ, ধানের কল বেকার করে দিল ধান-ভাঙানী গ্রামীণ মেয়েদের।

ভারতের বেকার সমস্যার কারণ: ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি ও সমাজ-ব্যবস্থা

পশ্চিমী দেশগুলিতে বেকার-সমস্যা শিল্পজাত, কিন্তু ভারতে তা বিশেষভাবে কৃষিগত। চাষাবাদ এদেশের ঋতুগত পেশা। তাই ঋতুকালীন চাষাবাদের কাজ মিটে গেলে বছরের অর্ধেক সময় ওদের বেকার হয়ে বসে থাকতে হয়। ভারতের ঐতিহ্যময় কুটির-শিল্প বিধ্বস্ত হওয়ায় এবং শস্যাবর্তন ও অনুপূরক জীবিকান্তরের ব্যবস্থা না থাকায় তাদের আলস্যে দীর্ঘ সময় কাটাতে হয়। আবার চাষাবাদের যে কাজ স্বল্প-সংখ্যক কৃষকদের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে যায়, তা অধিক সংখ্যক কৃষকদের হাতে অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়। ফলে, কর্মহীনতার কাল-পরিমাণ যায় বেড়ে। কাজেই, পল্লী-অঞ্চলের বেকারত্বের স্বরূপ হলো, সাময়িক কর্মহীনতা এবং উপযুক্ত কর্মাভাব। এই প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের অভিশাপ শহরাঞ্চল কিংবা শিল্পাঞ্চলকেও স্পর্শ করে। কর্মহীন কৃষক এবং কৃষি-শ্রমিক কর্মের সন্ধানে শিল্পাঞ্চলে এসে ভিড় করে এবং মজুরের সহজলভ্যতার ফলে সেখানেও মজুরী হ্রাস পায়। শিল্পাঞ্চলে আবার বেকার-সমস্যা তীব্ররূপ ধারণ করলে শিল্প-শ্রমিকেরা দল বেঁধে কৃষিতে প্রত্যাবর্তন করে। গ্রামাঞ্চলের এই অর্ধ-নিয়োগ সমস্যা ও প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের মৌল কারণ হলো দুটি: গ্রামাঞ্চলে দ্রুতহারে জনবৃদ্ধি এবং কৃষির অনগ্রসরতা। সেজন্যে পল্লী-অঞ্চলে জন্ম-সংযমের প্রবর্তন আশু প্রয়োজন এবং কৃষির উন্নয়নের জন্যে অল্প-স্বল্প কৃষি যন্ত্রপাতির প্রয়োগ, জলসেচের সুব্যবস্থা, উন্নত ধরনের শস্যবীজ ও সারের ব্যবহার, শস্যাবর্তন, খণ্ড-বিখণ্ড ভূমিজোতের সংহতি-সাধন, শস্য-ব্যাধি ও পঙ্গপাল বিতাড়ন এবং আধুনিক বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে মূল্যের স্থায়িত্ব রক্ষায় ব্যবস্থা ত্বরান্বিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পল্লী-অর্থনীতির দুর্বলতা: কৃষি ও কুটির শিল্প

সেই সঙ্গে গ্রামীণ কুটির-শিল্পের পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে অনুপূরক জীবিকান্তরের সংস্থান থাকা চাই।

ভারতের শিল্প-সম্পর্কিত বেকার-সমস্যার রূপ কিছু কাল আগেও ছিল তীব্র ও ব্যাপক। প্রাগাধুনিক কাল পর্যন্ত কল-কারখানার শিল্প-শ্রমিক সংগ্রহই ছিল এক দুরূহ সমস্যা। প্রাক্-স্বাধীনতা কালে বিদেশী পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করবার জন্যে দেশীয় পুঁজিপতিদের কলকারখানায় শ্রমিকদের স্বল্প মজুরীর বিনিময়ে অধিক শ্রম করানো হতো। ফলে বহু ব্যক্তির কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাকে জোর করে চেপে রাখা হতো। যুদ্ধের চাহিদা মেটাবার জন্যে দেশে বহু কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বহু লোকের কর্ম-সংস্থান হয়েছিল; কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালে তাদের অনেকগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বহু ব্যক্তিকে বেকারত্ব বরণ করতে হয়। ভারতের স্বাধীনতালাভের পর বহু বিদেশী শিল্পপতি এদেশ থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে চলে যায় এবং দেশ-বিভাগের ফলে পাট এলাকা পূর্ববঙ্গ হাতছাড়া হয়ে যায়। তাতে ভারতের চটকলগুলির ভাগ্যে চরম দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। ফলে, অসংখ্য শিল্প-শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়ে। আবার, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যোজনায় বিশেষ বিশেষ ভারতীয় শিল্পের সংবদ্ধ সংস্কারের ফলে এবং বিকল্প নিয়োগ-ব্যবস্থার অভাবের দরুন বেকারত্ব অনিবার্য রূপে দেখা দেয়। অবশ্য বিপরীত চিত্রও দুর্লভ নয়। নব-নব শিল্পায়তনের দ্বারোদ্ঘাটনের ফলে শিল্পে অধিক সংখ্যক কর্মের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এবং এ চিত্র ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকদের পক্ষে মোটামুটি আশাপ্রদ।

নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মুখে ভারতীয় শিল্প

বর্তমান ভারতে শিক্ষিত বেকারের কর্ম-সংস্থান সমস্যা আরো ভয়াবহ। নানা মহল থেকে সেজন্যে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি নানা ধিক্কার-বাণী উচ্চারিত হয়ে থাকে। অবশ্য, বিজাতীয় শাসক-গোষ্ঠী এদেশে বাণিজ্য আর শাসন-যন্ত্রের চাকা সচল রাখবার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি দিয়ে একদল দক্ষ কেরানী গড়ে তুলতে চেয়েছিল এবং তাতে তারা সফলও হয়েছিল। এবং আমরাও চুয়াল্লিশ কোটি জনগণের ভেতর থেকে মাত্র হাজার কয়েক শিক্ষিত ব্যক্তি পেয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি। পূর্বে শ' পিছু দশ জন ছিল শিক্ষিত; এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে শ' পিছু কুড়ি। হাজারে-হাজারে শিক্ষিতও সৃষ্টি হচ্ছে; কিন্তু তাদের কর্ম-সংস্থান হবে কোথায়? তাহলে কি শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তনে এই বেদনাদায় চিত্রের অবসান হবে? আপাতত: তাই মনে হতে পারে। কিন্তু সমাধানের প্রকৃত পথ রয়েছে ব্যাপক শিল্পায়নের মধ্যে। বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি দেখিয়ে

শিক্ষার ত্রুটি: শিক্ষা-সংস্কারের দ্বারা কি সমস্যার সমাধান সম্ভব?

ব্যাপকভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার প্রবর্তনের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করা হয়। দেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা প্রবর্তিত হলো। কিন্তু তবুও বৃত্তি-শিক্ষায় শিক্ষিত বা কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত বহু যুবক বেকার কেন? দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে আঠারো হাজার ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত কারিগর প্রয়োজন ছিল, অথচ অভাব থাকা সত্ত্বেও, কৃষ্ণমাচারির ভাষায় 'অনেক কারিগরী-প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত যুবক এদেশে বেকার।'[১] কাজেই কেবল শিক্ষার পুনর্বিন্যাসেই দেশের শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থান হবে না, সমস্যার প্রকৃত সমাধান নিহিত রয়েছে দেশের শিল্প-প্রগতি ও পর্যাপ্ত সংখ্যক সুযোগ-সৃষ্টির মধ্যে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় শিল্প-সম্প্রসারণের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ-সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল। স্থির হয়েছিল, দ্বিতীয় যোজনায় এক কোটি নতুন শ্রমিক শিল্পাভিমুখীন হবে। গ্রামাঞ্চল থেকে নবাগত ৬২ লক্ষ শ্রমিক এবং শহরাঞ্চল থেকে নবাগত ৩৮ লক্ষ শ্রমিক এই হিসেবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তাছাড়া ছিল নতুন কর্মপ্রার্থী শ্রমিক-সংখ্যা ৫৩ লক্ষ। এই ১ কোটি ৫৩ লক্ষ শ্রমিকের কর্ম-সংস্থান সমস্যা হাতে নিয়ে দ্বিতীয় যোজনার যাত্রা-সুরু।

পরিকল্পনাকালীন নিয়োগ-সমস্যা ও তার সমাধান-প্রয়াস

দ্বিতীয় যোজনা এত অধিক লোকের কর্মসংস্থান করতে পারে নি। সরকারী হিসেব মতে, দ্বিতীয় যোজনান্তে প্রায় ৯০ লক্ষ কর্মপ্রার্থী কর্মহীন ছিল। আবার তৃতীয় যোজনার কার্যকালে বর্ধিত জনসংখ্যার ভেতর থেকে অন্তত ১ কোটি ৪০ লক্ষ নবাগত কর্মপ্রার্থী এসে যুক্ত হয়। কাজেই তৃতীয় যোজনার হাতে প্রায় ২ কোটি ৩০ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান-সমস্যা জমা হয়। অবশ্য তৃতীয় যোজনায় নিয়মিত সুযোগ-সৃষ্টির মাধ্যমে বড়জোর ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে। কাজেই অতিরিক্ত ১ কোটি ৩০ লক্ষ লোকের নিয়োগ-সমস্যার কথা তৃতীয় যোজনাকে বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে। তাছাড়া অব-নিয়োগ (under-employment) সমস্যার সমাধান-চিন্তা তো আছেই। শহরাঞ্চল থেকে গ্রামাঞ্চলেই এই সমস্যার তীব্রতা বেশি। শহরাঞ্চলে কর্ম-নিযুক্ত জনসংখ্যার আট/নয় শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চলে কর্ম-নিযুক্ত জনসংখ্যার দশ/বারো শতাংশ সপ্তাহে গড়ে ৪২ ঘণ্টারও কম কাজ পায়। এই ভিত্তিতে পরিকল্পনা কমিশনের রচিত হিসেব মতো দেশে অবনিয়োগ সমস্যার বিস্তৃতি ১·৫ কোটি থেকে ১·৮ কোটি পর্যন্ত।

ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বেকার-সমস্যা অত্যন্ত তীব্র। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ১৯৬৪ সালের সরকারী হিসেব মতে ১,৩৭, ৩২৫। তার মধ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ১৮,২৪১। ইঞ্জিনিয়ার ৫৬৬ এবং চিকিৎসক ১০৩। মহিলা বেকার সংখ্যা ২০১০ জন স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর সহ ১৫,১৩৩। গত ১৯৬৩ সালে

কর্ম-বিনিময় কেন্দ্রে তালিকাভুক্ত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ছিল ১,২২,৫৫৩। গত ১৯৬৪ সালে ১২.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্য সরকার মনে করেন, শিক্ষিতদের যোগ্য চাকরি দেওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। আবার শিক্ষিত পুরুষ এবং মহিলা বেকারের এই পরিসংখ্যানও সম্পূর্ণ নয়। এই পরিসংখ্যানের বাহিরে রয়েছেন বহু শিক্ষিত বেকার। সরকারও স্বীকার করেন, এই পরিসংখ্যান আংশিক মাত্র। পশ্চিমবঙ্গের বেকার পরিস্থিতি এই রকম ভয়াবহ। যুদ্ধোত্তরকালীন ছাঁটাই, দেশবিভাগ-জনিত উদ্বাস্তু সমস্যা, চটকলগুলির দুরবস্থা, জমিদারী উচ্ছেদ, খাদ্য ও দূরভাষ (telephone) বিভাগে ছাঁটাইর ফলে অসংখ্য কর্মচারী আজ অন্নের তাগিদে ও কর্মহীনতার শোচনীয় পরিণামে পথের কাঙাল। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকার যুবক, অর্ধ-বেকার যুবক, প্রৌঢ় বয়স্ক উপার্জনক্ষম ব্যক্তি, শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত ও আক্ষরিক জ্ঞানসম্পন্ন গৃহস্থ বধূরা পর্যন্ত আজ পারিবারিক অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার সমাধান-কল্পে কর্মপ্রার্থিনী। পশ্চিমবঙ্গের পল্লী-অঞ্চলের কর্মহীনতার চিত্র অত্যন্ত মর্মান্তিক। কর্মাভাবে, খাদ্যাভাবে সম্ভাবনাপূর্ণ বহু পরিবার আত্মহননের পথ বেছে নেয়। বাস্তবিকই, ক্রমবর্ধমান উৎকট দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার প্রতিচ্ছবি পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় ভারতের অন্য কোন অঙ্গরাজ্যেই এত ভয়াবহ নয়।

পশ্চিমবঙ্গে বেকার-সমস্যার রূপচিত্র

বেকার-সমস্যার অর্থ হলো, দেশের বিপুল সম্ভাবনার অপমৃত্যু। মানুষের যে শক্তি ও সামর্থ্য দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ-ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের সম্পদ-বৃদ্ধিতে নিয়োজিত হতে পারতো, তার অব্যবহারের ফলে বেকারের উদ্ভব। বেকার ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। বেকারত্ব কর্মহীন ব্যক্তির উৎপাদন-নৈপুণ্যকে বিনষ্ট করে এনে দেয় জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে এক গভীর নৈরাশ্যবোধ।

প্রতিকার ও প্রতিরোধ

কাজেই, বেকার-সমস্যার সমাধান প্রয়াস ত্বরান্বিত না হলে জাতীয় জীবন পঙ্গু ও স্থাণু হয়ে পড়বে। সমাজের সতেজ শক্তির এই দুঃসহ অপচয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে অনুপস্থিত। সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহারীকরণের মাধ্যমে সেখানে বহু কর্ম-সংস্থানের সুযোগ রয়েছে। সমাজের সকল ব্যক্তির কর্মসংস্থান সেখানে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। ভারতে সেই নীতি স্বীকৃত হলেও বহু সরকারী নীতির ব্যর্থতার মতো তা সাফল্যলাভ করে নি। তাই সরকারী ব্যর্থতার খেসারত-স্বরূপ বেকার-ভাতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি বিঘোষিত হওয়া উচিত। এবং প্রচ্ছন্ন ধনতন্ত্র নয়, প্রকৃত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে জনশক্তির এই অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে। তাছাড়া, দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এই সমস্যা সমাধানের পথে অগ্রসর হতে হবে। স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে বেকার-সমস্যার

উপসংহার

চাপ হ্রাস করা যাবে এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের বিস্তৃত ক্ষেত্র রচনা করে ও জন্ম-সংযমের মাধ্যমে জনসংখ্যাবৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করে ভারতের জনশক্তির এই অপচয় রোধ করা সম্ভবপর হবে। সেই সঙ্গে বৃহদায়তন শিল্পের চেয়ে ক্ষুদ্রায়তন ও মাঝারি-আয়তনের শিল্প-বিকাশে উদ্যোগী হতে হবে। জাপানে প্রকৃতপক্ষে তাই হয়েছে। জাপানের যে শিল্প-বিপ্লব, তা ক্ষুদ্র ও মাঝারি-আয়তনের শিল্প-কেন্দ্রিক। তাতে সেখানে বেকার সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান হয়েছে। যে পুঁজির বিনিয়োগে বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তাতে যত সংখ্যক মানুষের কর্ম-সংস্থান হয়, সেই পরিমাণ পুঁজি ক্ষুদ্র ও মাঝারি আয়তনের শিল্পে নিয়োজিত হলে অনেক বেশি সংখ্যক লোকের কর্ম-সংস্থান সম্ভব হয়। ভারতের মতো দেশে যন্ত্র-প্রাধান্যকে অস্বীকার করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি-আয়তনের শিল্পের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হলে ফল যে শুভ হবে, তা বলা বাহুল্য। তাহলে এই কর্মহীনতা ও দুঃখ-দুর্দশার দুঃসহ নিশার অবসানে এক বিশাল প্রাণ জন্মলাভ করবে। প্রাণশক্তির সেই স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে সমৃদ্ধিময় ভারত-রচনার স্বপ্ন সার্থক হবে।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- বেকার-সমস্যা ও তাহার সমাধান
- পশ্চিমবঙ্গের বেকার-সমস্যা
- পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত বেকার-সমস্যা

১৭. ভারতে মধ্যবিত্ত সমাজের সংকট

Problems of the Middle Class People in India.

প্রবন্ধ-সূত্র ঃ—অবতরণিকা—মধ্যবিত্ত সমাজের ইতিহাস : উদ্ভব ও ক্রমপরিণাম—সমাজের নববিন্যাস ও মধ্যবিত্ত সমাজ—মধ্যবিত্ত সমাজের গতি কোন্ দিকে?—মধ্যবিত্ত সমাজে সংকটের সূচনা ও ক্রম পরিণাম—মধ্যবিত্ত সমাজের পুনর্জীবনায়নের পথ—পথ-নির্দেশ : সুচিন্তিত অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা—শিক্ষার ধারা পরিবর্তন—উপসংহার।

অবতরণিকা

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে মধ্যবিত্ত সমাজের জ্ঞান-সাধনা, কর্ম-সাধনা ও ভাব-সাধনার গৌরবে রচিত হয়েছে আধুনিক ভারতের উজ্জ্বল ইতিহাস। ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি—সকল বিষয়ে জাতির সার্বিক মুক্তি-আন্দোলনের পুরোহিত ছিল এই মধ্যবিত্ত সমাজ। জ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে এই সমাজ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে রচনা করেছিল সম্মিলনের সেতুবন্ধন। আর উনিশ শতকীয় রেনেসাঁস এই সমাজেরই চিন্তা ও ভাব-বিপ্লবের প্রত্যক্ষ পরিণাম। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস-অর্থনীতি—সর্ববিষয়ে মুদ্রিত রয়েছে মধ্যবিত্ত-মনীষার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একদিন যারা ছিল জন-জাগরণের মহান্ পুরোহিত, যাদের অতন্দ্র তপস্যায় সমগ্র জাতির মরা-গাঙে প্রাণের প্লাবন ছুটেছিল, আজ তারা চরম অবক্ষয়ের পথে দ্রুত চলেছে এগিয়ে, নিয়তির নির্মম পরিহাসে তারা আজ চরম সংকটের সম্মুখীন্। কে তাদের এই সংকটের হাত থেকে বাঁচাবে? কে তাদের শোনাবে অভ্যুদয়ের বাণী? কে তাদের হাতে তুলে দেবে নব-জীবনায়নের নিশ্চিত চাবিকাঠি?

মধ্যবিত্ত সমাজের ইতিহাস : উদ্ভব ও ক্রমপরিণাম

মধ্যবিত্ত সমাজ ব্রিটিশ শাসনযন্ত্রের সৃষ্টি। সাম্রাজ্যবাদের দৃঢ় সমর্থক লর্ড মেকলের পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় ব্রিটিশ বাণিজ্য ও শাসনচক্রের সপক্ষে একদল প্রভাবশালী যুবক-সৃষ্টির মাধ্যমে এই সমাজের উদ্ভব। অন্যদিকে, ব্রিটিশ বাণিজ্য ও অর্থনীতির আক্রমণে ভারতের ঐতিহ্যময় কৃষি ও কুটির-শিল্পের ধ্বংস-স্তূপের ওপর লর্ড কর্নওয়ালিসের কৃতিত্বে প্রবর্তিত হলো বহু-কলঙ্কিত জমিদারী-তন্ত্র। নব্য-তন্ত্রের জমিদারী-পরিচালন, হিসাবপত্র রক্ষা ও আইন সংক্রান্ত দিকের অভিভাবকত্ব সেদিন গ্রহণ করেছিল এই মধ্যবিত্ত সমাজ। অতএব, রাজানুগ্রহেই এদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা। সমাজ ও স্বদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং ইংরেজানুগত্য ছিল এই সমাজের মজ্জাগত চরিত্র।

প্রাথমিক পর্যায়ে এরা ইংরেজানুগ্রহের গৌরবে এদেশের কৃষিজীবীদের ঘৃণা করেছে, তাদের সঙ্গে সকল সম্পর্কসূত্র ছিন্ন করে বিজাতীয় সভ্যতার 'আশার ছলনে ভুলে' ধাবিত হয়েছে কিন্তু রাজশক্তির অবাধ অনুগ্রহ তাদের ভাগ্যে দীর্ঘস্থায়ী হলো না। হলো না,—তার কারণ ইংরেজী-শিক্ষার মধ্যস্থতায় তাদের অন্তরে জাগ্রত হলো দুর্জয় আত্মসম্ভ্রমবোধ। এই নবজাগ্রত আত্মসম্ভ্রমবোধই তাদের ইংরেজ-বিদ্বেষী করে তুললো; নেতৃত্বের মুকুট পরিয়ে তাদের এনে দাঁড় করালো জাতির সকল মুক্তি-আন্দোলনের পুরোধায়। স্বদেশের, সমাজের সঙ্গে তাদের আবার নাড়ীর সম্পর্ক স্থাপিত হলো। কিন্তু মাঝখানে প্রচ্ছন্ন রইলো ঘৃণা এবং অবিশ্বাস। ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনে ইংরেজকে এদেশ থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হলো। আশা ছিল, জাতীয় সরকারের অনুগ্রহে তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে। কিন্তু নিদারুণ নৈরাশ্যের হাহাকারে আজ সমগ্র মধ্যবিত্ত সমাজ ক্লান্ত, অবসন্ন।

ভারতে নতুনতর সমাজ-বিন্যাসের কাজ আরম্ভ হয়েছে প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা থেকেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় সমাজে দেখা দিয়েছে অভূতপূর্ব উত্থান-পতন। এই যুদ্ধের রাক্ষুসে ক্ষুধার দাবিতে শিল্প-বাণিজ্যের নানা সম্ভাবনার দুয়ার একে-একে খুলে যায়। ফলে, শিল্প-বাণিজ্যের মাধ্যমে কেউ হয়েছে ধনী, কেউ হয়েছে দরিদ্র। অসম ধন-বণ্টনের এরূপ প্রতিক্রিয়া সমাজ-শরীরে এত প্রকটরূপে কখনও প্রতিফলিত হয়নি। উৎকট ধন-বৈষম্যের ফলে সমাজ আজ দ্বিধা-বিভক্ত : একদিকে শ্রমিক-সমাজ, অন্যদিকে পরশ্রমজীবীর দল—একদিকে সর্বহারা, অন্যদিকে ধনিক সমাজ। একদল হলো মেহনতী মানুষ, অন্যদল তাদের শ্রম-শোষণে পুষ্ট বিলাসী ধনিক—এই দ্বিধা-বিভক্ত সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্থান কোথায়? এরা ধনিক শ্রেণীভুক্ত নয়। তবে কি এরা শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত? হ্যাঁ—তাই। এরা পরশ্রমজীবী নয়, এরা আত্মশ্রমে 'আপনাতে আপনি বিকশিত' হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই শ্রম কোন দৈহিক শ্রম নয়—মানসিক শ্রম। এরা তাই, বলা চলে, মস্তিষ্কজীবী, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়।

সমাজের নববিন্যাস ও মধ্যবিত্ত সমাজ

সমাজের যে রূপান্তর প্রথম মহাযুদ্ধের কাল থেকে ক্রিয়াশীল ছিল, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের পর তা আরও স্পষ্ট রূপ ধারণ করলো। এই নবতর সামাজিক বিন্যাস মধ্যবিত্ত সমাজের সম্মুখে এনেছে চরম জিজ্ঞাসা। সে বিত্তবান শিল্পপতি-ব্যবসায়ী শ্রেণীভুক্ত হবে, না বিত্তহীন শ্রমিক-শ্রেণীভুক্ত হবে? শতাব্দীর ঐতিহ্য ও ইতিহাস-স্রষ্টা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আজ আর কোন নতুন স্বতন্ত্র স্বীকৃতি নেই। রাষ্ট্র উদাসীন; বর্তমান যুগও তার প্রতিকূল। একদিন এদের হাতেই ছিল সমাজ-রথের রশিগাছি। আজ যুগ-পরিবর্তনের ফলে সেই সমাজ রথের রশিগাছি হাত-বদল হয়ে গেছে।

ডাক্তার, আইনজীবী, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, অধ্যাপক, সাধারণ ব্যবসায়ী, দোকানদার—আজ সমাজের অবহেলার পাত্র। যুগ-প্রবণতার প্রতিক্রিয়ায় তারা আজ ধনিক সমাজের সমর্থক হতে পারে না। বরং তাদের শিক্ষা, দীক্ষা, সহানুভূতি শ্রমিক শ্রেণীর দিকে। নেতৃত্বহীন শ্রমিক-সমাজের পুরোধায় ভবিষ্যতে তাই তারাই এসে দাঁড়াবে। সকল আন্দোলনের মতো শ্রমিক আন্দোলনেরও নেতৃত্ব তারাই গ্রহণ করবে। উনিশ শতকে তারা সর্ববন্ধন-মুক্তির যে জয়ভেরী নিনাদ করেছিল, দধীচির মতো নিঃশেষে আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে তারা সেই আদর্শকে চরম রূপদান করে যাবে।

মধ্যবিত্ত সমাজের গতি কোন্ দিকে ?

মধ্যবিত্ত সমাজের এই ভাগ্য-বিপর্যয়ের সূচনা হয়েছে প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা-কাল থেকে। কেউ বুঝতে পারে নি, কখন এই সমাজের হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করেছে দুরারোগ্য অবক্ষয়ের কীট। দেশের কৃষি-সভ্যতার বনিয়াদ ইতিমধ্যেই ভেঙে পড়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের দাক্ষিণ্যে শিল্পের বিকাশ ও যান্ত্রিকতার সম্প্রসারণে উদ্ভব হলো শ্রমিক শ্রেণীর। অতি স্ফীত হয়ে উঠলো ধনপতি-গোষ্ঠী। অন্যদিকে, শ্রমিক সমাজের হাতে এলো কাঁচা টাকা। বাজার দর হলো উর্ধ্বমুখী। সেই চড়া বাজারে মধ্যবিত্ত সমাজ প্রবেশ করতেই পারলো না। মধ্যবিত্ত সমাজের মাসিক বেতন, সরকারী বৃত্তি বা মাসিক রোজগারের সঙ্গে ত মূল্য-বৃদ্ধির ফারাক্ হলো আসমান-জমিন্। আয়ব্যয়ের এই বিরাট্ ব্যবধানের মধ্যে গোঁজামিল দিতে গিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজ ধ্বংসের ঘূর্ণির মধ্যে দিশাহারা হয়ে পড়লো। সেই ঘনীভূত সংকটের ফাঁকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসে পড়লো। দেশব্যাপী পণ্যাভাব ও মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি যুদ্ধের যাবতীয় প্রতিক্রিয়া মধ্যবিত্ত সমাজের ভিত্তিমূল দিল বিধ্বস্ত করে। গত শতাব্দীর নিশ্চিত জীবন-যাত্রা আজ অবলুপ্ত, তার স্থানে এসেছে নিদারুণ অর্থ-সংকট, এসেছে চিত্ত-চমৎকারা অন্ন-চিন্তা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশবিভাগ মধ্যবিত্ত সমাজের মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙে দিয়েছে। আর যে-স্বাধীনতার জন্যে তাদের শতাব্দীব্যাপী অতন্দ্র সাধনা, সেই স্বাধীনতাই তাদের প্রবঞ্চিত করেছে সবচেয়ে বেশি। পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত সমাজ ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হয়ে পথে এসে দাঁড়ালো রিক্ত, নিঃস্ব বেশে। চোরা-কারবার, মজুতদারী, ভেজাল মিশ্রণ ইত্যাদি দুর্নীতির মূষিক-বৃত্তিতে সমগ্র ভারতের অর্থনীতি ভেঙে পড়ার উপক্রম করলো। ধনপতি ব্যবসায়ীরা আরো স্ফীত হলো। যারা কখনো দেশকে ভালোবাসে নি, যারা শুধু টাকাকেই ভালোবেসে এসেছে, স্বাধীনতার আশীর্বাদ তাদেরই মাথায় ঝরে পড়লো। দেশ-গঠনের বিরাট্ আয়োজনে আজ মধ্যবিত্ত সমাজ অনুপস্থিত। প্রতিকূল অবস্থার মরু-নিশ্বাসে সে কোনমতে

মধ্যবিত্ত সমাজে সংকটের সূচনা ও ক্রম-পরিণাম

তার অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে আজ প্রাণপণ চেষ্টায় রত। আজ তার মাথা গুঁজবার স্থান নেই, স্বাস্থ্য নেই, অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, শিক্ষা নেই, ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নেই—কিছুই নেই। তার শিক্ষা-সংস্কৃতি, তার মনন-মনীষা, তার চিত্ত-চেতনা একেবারে দেউলে হয়ে গেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তার মাথার ওপর নেমে এলো জাতীয় সংকট। তার মুখে আজ ভাষা নেই, বুকে নেই আশা। এক সূচীভেদ্য অন্ধকার গ্রাস করেছে তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে।

মধ্যবিত্ত সমাজের পুনর্জীবনায়নের পথ

এই বিপুল সম্ভাবনাময় মধ্যবিত্ত সমাজকে তিলে তিলে মরতে দেওয়া যেতে পারে না। পূর্ব শতাব্দীর ইতিহাসে তার ঐতিহ্য-গৌরবের কথা স্মরণ করে তার পুনর্জীবনায়নের সঞ্জীবন-মন্ত্র অবশ্যই রচনা করতে হবে। রাষ্ট্র যেখানে বিমুখ, তখন আত্মরক্ষার উপায় নিজেকেই আবিষ্কার করতে হবে। যার বুদ্ধি-মনীষায় সমগ্র ভারতের মুক্তির পথ অঙ্কিত হয়েছিল, আজ তাকে অন্যের বুদ্ধি-মনীষার ওপর ভর করে বাঁচতে হবে—এই আত্ম-ধিক্কারের হাত থেকে তার মুক্তি কোথায়? তার চেয়ে আপন প্রাণ-প্রাচুর্যের গৌরব, মনন-মনীষার দীপ্ত গরিমায় সে আবিষ্কার করবে তার 'জড়ত্বনাশা মৃত্যুঞ্জয়ী আশা'র সংকেত। অবশ্য সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের সংবেদনশীল দৌত্যকর্মও প্রয়োজন।

পথ-নির্দেশ: সুচিন্তিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

মধ্যবিত্ত সমাজের যে সংকট, তা মূলতঃ অর্থনৈতিক। কাজেই মধ্যবিত্ত সমাজের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্যে পরিকল্পনা রচিত হওয়া উচিত। প্রথমত, মধ্যবিত্ত সমাজের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে দ্রব্যমূল্যকে সীমাবদ্ধ রাখবার জন্যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কর্তৃক ক্রেতা-সমবায় বিপণি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কৃষি, শিল্প,ব্যবসা-বাণিজ্য এইভাবে সমবায়িক ভিত্তিতে পরিচালনা করতে পারলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় উপকৃত হবেন। দ্বিতীয়ত, পরিশ্রমের প্রতি মধ্যবিত্ত সমাজের অভ্যস্ত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করবার দিন এসেছে। পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল দেশগুলিতে শ্রম-বৈষম্যের তিক্ত রূপ নেই। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের দৃষ্টান্ত এদেশের মধ্যবিত্ত সমাজের পক্ষে অনুকরণীয়। তৃতীয়ত, বর্তমান প্রগতিশীল যুগে নারী-সমাজকে অন্তঃপুরচারিণী রাখার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। সংসার-পরিচালনের ব্যাপারে মধ্যবিত্ত সমাজের অর্ধাংশ জীবন-সংগ্রামে হবে ক্লান্ত, অবসন্ন; বাকি অর্ধাংশ নৈষ্কর্ম্য ও উদ্যোগ-হীনতার মধ্যে কাল কাটাবে—এই যুক্তিহীন অপচয় আর বেশিদিন সহ্য করা উচিত নয়। চতুর্থত, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি নানা সামাজিক অনুষ্ঠানের অসারতা ও অর্থনৈতিক অপচয় উপলব্ধির সময় কি এখনো মধ্যবিত্ত সমাজের আসে নি? সাধ্যাতীত ব্যয়-বাহুল্যের ফলে ঋণবদ্ধ হওয়ার চেয়ে এই মূল্যহীন অচল সামাজিক রীতিনীতি পরিত্যাগ করা কি বাঞ্ছনীয় নয়? পঞ্চমত, মধ্যবিত্ত সমাজের

প্রতি সরকারী দাক্ষিণ্যও কিছু প্রয়োজন। সমাজের কর-বিন্যাস এমনভাবে হওয়া উচিত, যাতে অতিরিক্ত কর-ভারের হাত থেকে মধ্যবিত্ত সমাজ অব্যাহতি লাভ করতে পারে। তাছাড়া, ব্যবসা-বাণিজ্যে মধ্যবিত্ত সমাজকে উৎসাহিত করবার জন্যে স্বল্প-মেয়াদী ও দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণদানের ব্যবস্থা নিয়ে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। কখনো সেই ঋণ হবে বিনা সুদে, কখনো স্বল্প সুদে। ষষ্ঠত, ইংলণ্ডের মতো মানুষকে আজীবন আর্থিক সাহায্যদানে সক্ষম সামাজিক বীমা পরিকল্পনার বহুল প্রচলনে মধ্যবিত্ত সমাজ খুবই উপকৃত হবেন।

শিক্ষার ধারা পরিবর্তন

কিন্তু সর্বব্যাপী সংকটের হাত থেকে মধ্যবিত্ত সমাজকে রক্ষা করতে হলে আজ ফিরে তাকাতে হবে তার উদ্ভব-ভূমির দিকে। ইংরেজানুগত্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাধারা তার উদ্ভব-ভূমিটি রচনা করে দিয়েছিল। আজ ইংরেজও নেই, মধ্যবিত্ত সমাজের সেই ইংরেজানুগত্যও নেই। কিন্তু শিক্ষাধারার 'সেই tradition সমানে চলেছে'। যে শিক্ষা তাকে রুজি-রোজগারের সন্ধান দিতে পারে না, যে শিক্ষা কোন কর্মের যোগ্যতা দান করে না, সেই অচল শিক্ষাকেই বা সরকার চালু রেখেছেন কেন, বুঝি না। আসল কথা, মধ্যবিত্ত সমাজকে আজ সেই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, যা তাকে রুজি-রোজগারের সন্ধান দিতে পারে। উনিশ শতকীয় পাশ্চাত্য শিক্ষার দিন আজ অস্তমিত।

উপসংহার

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্থান নেই। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তো নেই-ই। মধ্যবিত্ত সমাজ সমগ্র পৃথিবীতে তাই আজ অবক্ষয়ের মুখোমুখি। কিন্তু তাই বলে হাল ছেড়ে দিলে তো চলবে না। ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে পুনর্জীবনায়নের শেষমন্ত্র রচনা করতে হবে। যেখানে সমাজ নির্মম, রাষ্ট্র হৃদয়হীন যন্ত্রমাত্র, সেখানে আত্মরক্ষার জিয়নকাঠি নিজেকেই আবিষ্কার করতে হবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী শ্রমবিমুখ, একথা আর সত্য নয়। বুকে আশা জাগে, যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকদের বাস ড্রাইভার, কণ্ডাক্টার, হকার ও কারখানার শ্রমসাধ্য কাজে আত্মনিয়োগ করতে দেখি! দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পথিকৃৎ মধ্যবিত্ত সমাজ আজ বাঁচার জন্যে সত্যাই সংগ্রামশীল। তথাপি প্রশ্ন জাগে মনে, মধ্যবিত্ত সমাজের এই জীবন-সংকট তার যে আসন্ন বিলোপের দুর্লক্ষণ বহন করে এনেছে, তার হাত থেকে কি তার সত্যাই মুক্তি নেই? ভারতের মধ্যবিত্ত সমাজ তাহলে কি সত্যাই স্থান গ্রহণ করবে ইতিহাসের যাদুঘরে?

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- বর্তমান সময়ে মধ্যবিত্ত সংসারে কৃচ্ছ্রতা, ক. বি. '৬২
- ভারতে শিক্ষিত সমাজের সমস্যা।

১৮. সভ্যতার বিকাশে বাণিজ্যের ভূমিকা

Role of Commerce in the Progress of Civilisation.

প্রবন্ধ-সূত্র ঃ— অবতরণিকা—সভ্যতা ও বাণিজ্য—পারস্পরিক সহযোগিতা, শ্রমবিভাগ ও বাণিজ্য - প্রয়োজনের সৃষ্টি বাণিজ্য, অপ্রয়োজনের সৃষ্টি সংস্কৃতি : সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিচিত্র সমাবেশ—বাণিজ্য সভ্যতার বাস্তব বনিয়াদ—বাণিজ্য শিল্প, বিজ্ঞান ও জনগণের মধ্যে সংযোগের সেতু—সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে এবং বিশ্বমৈত্রী ও সৌভ্রাত্র-স্থাপনে বাণিজ্য—বাণিজ্য, সাম্রাজ্যবাদ ও ধন-বৈষম্য—উপসংহার।

যুগ-যুগান্তর-পানে ছুটে চলেছে সভ্যতার বিজয়-রথ। 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা' বেয়ে সভ্যতার সেই রথ অনাশ্বস্ত রবে ছুটে চলেছে। মানুষ তার যুগ-যুগান্তরের স্বপ্ন ও সাধনার অনবদ্য ফসল তাতে তুলে দিয়েছে। আপনার প্রাণশক্তি তিলে তিলে দান করে, বুকের রক্ত বিন্দু বিন্দু ঢেলে দিয়ে মানুষ রচনা করেছে তার সভ্যতার তিলোত্তমা মূর্তি। কত দুঃখ-দহন, কত কৃচ্ছ্র-সহন তার ওপর দিয়ে চলে গেছে। তবু মানুষ বিরত হয়নি তার সাধনার দান দিয়ে, তার সৃষ্টির নব-নব প্রেরণা দিয়ে সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে তুলতে। সে সভ্যতার বেদীমূলে দিয়েছে তার বাহুর শক্তি, মস্তিষ্কের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি এবং হৃদয়ের ভালোবাসা। মানুষের অদম্য প্রাণশক্তি, অফুরন্ত কর্ম-প্রেরণা এবং অসীম সৃজন-ক্ষমতায় সভ্যতা পরিগ্রহ করে চলেছে নিত্য-নতুন রূপ। সভ্যতা মানুষের যুগ-যুগান্তের সাধনার সম্মিলিত যোগফল, সভ্যতা মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, সভ্যতাই নিখিল মানবের অক্ষয় সঞ্চয়।

অবতরণিকা

বাণিজ্যের স্রষ্টাও মানুষ। সুদূর কোন্ অজ্ঞাত অতীতে উদ্ভব হয়েছিল বাণিজ্যের। আজও সেই বাণিজ্যের ধারা নিত্য বহমান। মানুষের আরণ্যক জীবন যখন শেষ হয় নি, যখন মানুষ আদিম, বর্বর এবং সভ্যতার সর্বপ্রকার আলোক-বর্জিত, তখনই সে তার প্রতিবেশীর সঙ্গে সংগ্রাম থেকে বিরত হয়ে পরস্পরের সংগৃহীত খাদ্য-বস্তু পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করে রসনার বৈচিত্র্য-সম্পাদনে প্রণোদিত হয়েছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যেও সেই ক্ষণটি বাণিজ্যের জন্মলগ্ন-রূপে চিরকালের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। পারস্পরিক বিনিময়ই বাণিজ্যের মূল সূত্র। তারপর পৃথিবীর ইতিহাসে কতো উত্থান-পতন, কতো

সভ্যতা ও বাণিজ্য

রাজ্য-ভাঙা-গড়া ঘটে গেল। কিন্তু বাণিজ্যের সেই মূলধারা আজও প্রাণবন্ত। অতি প্রাচীনকালেই মানুষ একথা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, এই পৃথিবীতে তার অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে পারস্পরিক লেনদেন চাই। তাছাড়া 'নান্যপন্থাঃ'।

কাজেই, মানব-সমাজে বাণিজ্য এসেছে নিতান্তই প্রয়োজনের তাগিদে। আরণ্যক জীবনের ক্লান্তিকর রক্তপাত থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার তাগিদ অনুভব করেছিল, সেই অনুভব থেকেই মানব-সমাজে এলো পারস্পরিক সহযোগিতা-বোধ: যে কোন কর্মে সহযোগিতা, যে-কোন উদ্যমে সহযোগিতা, যে-কোন বিপদে সহযোগিতা। এই পারস্পরিক সহযোগিতাই বর্তমান বাণিজ্যের মূল কথা। তারপর ক্রমে সমাজের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় দেখা দিল নানা জটিলতা। তখন এলো গুণ ও কর্মানুসারে সমাজে শ্রম-বিভাগ। এই শ্রম-বিভাগ বর্তমান বাণিজ্য ও অর্থনীতির অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তারই ওপরে ভর দিয়ে সমাজের বাণিজ্য দ্রুতগতিতে চলেছে এগিয়ে। আর তারই উপরে ভর দিয়ে সমাজে এসেছে শান্তি ও শৃঙ্খলা, এসেছে শক্তি, সামর্থ্য ও প্রতিভার সদ্ব্যবহার।

পারস্পরিক সহযোগিতা, শ্রম-বিভাগ ও বাণিজ্য

কিন্তু প্রয়োজনের পরিধি-বন্ধন থেকে মুক্তি চাইলো মানুষ। একদা অপ্রয়োজনের সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে মেতে উঠলো সে। আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সে সৃষ্টি করলো সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও দর্শন। যুগ-যুগ ধরে এইরূপে বহু সংস্কৃতির বিচিত্র সমাবেশে গড়ে উঠেছে মানব-সভ্যতার বিশাল মর্মর-সৌধ। মানব-সভ্যতার এই গগনচুম্বী ইমারতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হই; কিন্তু এই সভ্যতার ভিত্তি-ভূমি রচনায় বাণিজ্যের কী অসীম অবদান, তা আমরা বিস্মৃত হয়ে যাই। বাণিজ্যের সাহায্যে মানুষ শান্তি-সুখময় নিরুদ্বিগ্ন জীবনের সন্ধান পেয়েছিল বলেই নিরবচ্ছিন্ন শিল্প-সংস্কৃতি-রচনায় আত্মনিয়োগ করতে পেরেছিল। বাণিজ্য জীবন-যাত্রাকে করেছে সহজ, আর মানুষ তার ফলে জীবনকে করে তুলেছে সুন্দর। তিল তিল করে সেই সৌন্দর্যের উপকরণ দিয়ে রচিত হয়েছে বর্তমান সভ্যতার রূপময়ী তিলোত্তমা মূর্তি।

প্রয়োজনের সৃষ্টি বাণিজ্য ও অপ্রয়োজনের সৃষ্টি সংস্কৃতি: সভ্যতা সংস্কৃতির বিচিত্র সমাবেশ

বাণিজ্যই সভ্যতার বাস্তব বনিয়াদ। সমাজের গ্রাসাচ্ছাদনের সকল সমস্যার সমাধান করে বাণিজ্য সভ্যতার সুদৃঢ় বনিয়াদ রচনা করে দিয়েছে। প্রাচীন পৃথিবীর দিকে যখন আমরা দৃষ্টি ক্ষেপণ করি, তখন প্রতিভাত হয়ে ওঠে, 'দুর্গম গিরি, কান্তার মরু' ও দুর্ভেদ্য অরণ্যানী অতিক্রম করে দেশদেশান্তরের পথে এগিয়ে চলেছে দুর্বার বণিক সম্প্রদায়। অশ্ব, গর্দভ, উট প্রভৃতি ভারবাহী পশুদের পিঠে চলেছে তাদের বাণিজ্যিক

পণ্য। সেই পশুকণ্ঠের ঘণ্টাধ্বনিতে মুখরিত সুদূরের পথ। পথে হিংস্র জন্তু-জানোয়ার ও বর্বর মানুষের আক্রমণ-ভীতি, প্রাকৃতিক দৈব-দুর্বিপাক, চরণ-তলে বিশাল উত্তপ্ত মরুভূমি, সম্মুখে দুর্ভেদ্য গিরিসংকট ও দুস্তর নদ-নদী লঙ্ঘন করে তারা এগিয়ে চলেছে। কিংবা অকূল সমুদ্রে পাল তুলে দিয়ে ভেসে চলেছে তাদের পণ্য-নৌবহর। দেশ-দেশান্তর থেকে বাণিজ্য-লব্ধ অর্থ-সম্পদ নিয়ে এসে তারা স্বদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। গ্রীস, রোম, ব্যাবিলন, মিশর, মহেন্‌জোদড়ো ও হরপ্পায় সভ্যতার আশ্চর্য নিদর্শনে আমরা মুগ্ধ হই; কিন্তু তার বিকাশের মূলে বাণিজ্যের যে কী দুশ্চর তপস্যা ছিল, সে কথা আমাদের মনে পড়ে না।

বাণিজ্য সভ্যতার বাস্তব বনিয়াদ

তারপর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আশ্চর্য সাফল্য এসেছে মানুষের হাতে। এবং প্রয়োগ-সিদ্ধিতে উৎপন্ন হয়ে চলেছে নিত্য-নতুন ভোগ্যপণ্য। বৈজ্ঞানিকের গবেষণালব্ধ সাফল্যকে বাণিজ্য পৌঁছিয়ে দিল বিশ্ব-মানবের দুয়ারে। এইভাবে বাণিজ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও জনগণের মধ্যে রচনা করেছে সংযোগের সেতু। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এলো পণ্য-বৈচিত্র্য, এলো রুচির পরিবর্তন, এলো সভ্যতার চরম সমুন্নতি। বাণিজ্য কেবল বৈজ্ঞানিককেই পুরস্কার দেয় না, শিল্পীকেও করে পুরস্কৃত। শিল্পীর নতুন নতুন রুচি-মণ্ডিত, চোখ-ঝলসানো পণ্য-সম্ভার দেশ-দেশান্তরে প্রচারিত ও বিক্রীত হয়ে গণ-মানসের রুচি ও শিল্পবোধকে তোলে জাগিয়ে। সভ্যতায় লাগে উন্নত রুচির ছোঁয়াচ, লাগে নবাগত শিল্পবোধের সৌকর্যময় স্পর্শ। বাণিজ্য এইভাবে শিল্পীর সৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারকে সমগ্র মানবজাতির ভোগে নিয়োজিত করার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করেছে। প্রকারান্তরে, শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক তাঁদের পারিশ্রমিক ও সামাজিক মর্যাদা লাভ করে নিত্য-নতুন সৃষ্টি ও আবিষ্করণের উল্লাসে মেতে উঠেছেন। ফলে সভ্যতার মণিকোঠায় সঞ্চিত হয়েছে শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আশ্চর্য সাফল্য।

বাণিজ্য শিল্প, বিজ্ঞান ও জনগণের মধ্যে সংযোগের সেতু

বিজ্ঞানের দানে ক্রমে পৃথিবীর পথ ও পরিবহণের উন্নতি হয়েছে। এসেছে বাষ্পীয় শকট, বাষ্পীয় পোত ও বিমান-পোত। প্রাচীনকালের ধীর-মন্থর বাণিজ্যে সংযোজিত হলো গতির আবেগ। বাণিজ্যের সীমানা সম্প্রসারিত হয়ে গেল পৃথিবীর দূর-দূরান্তে। এই সুযোগে বাণিজ্য গ্রহণ করলো দেশ-দেশান্তরের মধ্যে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে আদান-প্রদানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। পৃথিবীর কতো অনুন্নত জাতিকে উন্নত জাতির সংস্পর্শে এনে সে দিল উন্নতির পথ-নির্দেশ, নাম-গোত্রহীন কতো সভ্যতা ও

সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে এবং বিশ্বমৈত্রী ও সৌভ্রাত্র-স্থাপনে বাণিজ্য

সংস্কৃতির বিকাশকে সম্ভব করে তুললো। আর বিভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বাণিজ্য বহু দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অবসান ঘটিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমিত করে বিশ্বমৈত্রী ও সৌভ্রাত্রের স্বপ্নকে সফলতা দান করতে এগিয়ে চলেছে।

সভ্যতার অগ্রগতিতে তবু দেখা যায় সংঘাত, দেখা যায় সংঘর্ষ। পৃথিবী বারে-বারে মানুষের শোণিত-ধারায় রক্ত স্নান করে ওঠে। সেই সংঘাত ও সংঘর্ষের মূলে বহু কার্য-কারণ সক্রিয় থাকে। বাণিজ্যের অশুভ শক্তি তাদের মধ্যে অন্যতম। বাণিজ্যের ছলনায় কত শক্তিশালী জাতি পৃথিবীর শক্তিহীন জাতিগুলিকে পদানত করেছে। 'বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে।' হতভাগ্য জাতির বুকের ওপর দিয়ে বলদর্পী জাতির পৈশাচিকতার নিষ্ঠুর অভিনয় চলেছে দিনের পর দিন। তাছাড়া, বাণিজ্য মানুষের মধ্যে আনে ধন-বৈষম্যের অতি প্রকট রূপ, যা পর্যবসিত হয় রক্তক্ষয়ী শ্রেণী-সংগ্রামে। কিন্তু তার জন্যে বাণিজ্যের অশুভ শক্তি দায়ী নয়, দায়ী মানব-মনের লোভ, স্বার্থবুদ্ধি ও শোষণ-তৃষ্ণা।

বাণিজ্য, সাম্রাজ্যবাদ ও ধন-বৈষম্য

বস্তুতপক্ষে, বাণিজ্যই সভ্যতার প্রাণ-প্রবাহ। গ্রীস, রোম, ব্যাবিলন, মিশর ততদিন সভ্যতার জয়ধ্বজা পৃথিবীর আকাশে উড্ডীন রাখতে সমর্থ হয়েছিল, যতদিন বাণিজ্যের দ্বারা সেই সব সভ্যতার প্রাণ-প্রবাহ গতিশীল ছিল। কিন্তু কালক্রমে তারা বাণিজ্যের স্রোত রুদ্ধ করে দিয়ে যখন বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল, তখন শুষ্ক হয়ে গেল সেই প্রাণ-প্রবাহ। জাতি হয়ে পড়ল দুর্বল। সেই সুযোগে বহিঃশত্রুর দল পড়লো ঝাঁপিয়ে, লুণ্ঠন করলো তার ধন-সম্পদ, ধ্বংস করলো তার সভ্যতার মূল্যবান্ নিদর্শনগুলিকে। বাণিজ্যের বৃন্ত শুকিয়ে গেলে সভ্যতার ফুলও ঝরে পড়বে। বাণিজ্যের বৃন্তকে তাই সতেজ, সজীব রাখতে হবে সভ্যতা-সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়োজনে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- বাণিজ্য ও মানব-সভ্যতা
- বণিক-বুদ্ধি ও সভ্যতার ক্রম-বিবর্তন
- সভ্যতার বিকাশে বাণিজ্যের অবদান

১৯. বাণিজ্যের উপর বিজ্ঞানের প্রভাব
Influence of Science on Commerce.

প্রবন্ধ-সূত্র :—অবতরণিকা—বৈজ্ঞানিক সাফল্য ও বাণিজ্যের জয়যাত্রা—বিজ্ঞান-সাধনার সিদ্ধিতে সমৃদ্ধ হয়েছে বাণিজ্য—বিজ্ঞানের অবদান : শিল্প-বিপ্লব ও কৃষি-বিপ্লব—সভ্যতার যন্ত্রসিদ্ধ কাপালিক রূপ ও বাণিজ্য—বিজ্ঞানপুষ্ট বাণিজ্য—ধন-বৈষম্যের ছিন্নমস্তা রূপ—দোষ কার?—বিজ্ঞান বা বাণিজ্যের, না প্রয়োগ-পদ্ধতির?—উপসংহার।

বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের এই চরম সমুন্নতির মূলে রয়েছে বিজ্ঞানের অসীম বিস্ময়। বিজ্ঞান বাণিজ্যকে গতিদান করেছে, দাক্ষিণ্যের দক্ষিণবাহু প্রসারিত করে দিয়ে বাণিজ্যকে সে পৌঁছিয়ে দিয়েছে সমৃদ্ধির স্বর্ণ-দুয়ারে। প্রাচীনকালের বাণিজ্যের সেই অলস-মন্থর গতি, ভারবাহী পশুকণ্ঠের ধীর-লয়ে ছন্দিত ঘণ্টাধ্বনি, বণিক-সম্প্রদায়ের সেই দুঃখ-বেদনাকীর্ণ বাণিজ্য-যাত্রা আর আধুনিক কালের বাণিজ্যের এই ত্বরিত বিদ্যুৎ-গতি, মোটর, বাষ্পীয় শকট, বাষ্পীয় পোত ও বিমানপোতের সুদূরাভিসারের বিজয় নির্ঘোষ এবং ব্যবসায়ী-সম্প্রদায়ের নিস্তরঙ্গ বিলাসী জীবন—এই উভয়বিধ চিত্রের যে দুস্তর ব্যবধান, তা সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানের অবারিত দাক্ষিণ্যবলেই। প্রাচীনকালের সংকীর্ণ পরিধি-বেষ্টন থেকে বাণিজ্যকে মুক্ত করে এনেছে বিজ্ঞান এবং দিয়েছে 'তারে বিশ্বময় ছড়ায়ে'। তার ফলে প্রাচীনকালের সংকুচিত ধীর-মন্থর জীবন আজ গতির আবেগে চঞ্চল, সাবলীল ও ছন্দোময়। বিজ্ঞান-দেবতার এই অবারিত করুণায় বাণিজ্য-লক্ষ্মী আজ হাস্যমুখর।

অবতরণিকা

আজ বিজ্ঞানের বিশ্ববিজয় বিস্ময়কর হলেও বিজ্ঞান-সাধনার সূচনা হয়েছিল অত্যন্ত দীনভাবে। বহু মানবের যুগ-যুগান্তের সাধনায় ও সর্বত্যাগী জ্ঞান-তপস্বীদের দুশ্চর তপস্যায় বিজ্ঞান লাভ করেছে অভূতপূর্ব সাফল্য। রূপকথার দৈত্যপুরী থেকে বিজ্ঞান মানুষের জন্যে এনেছে সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি। তা হস্তগত করে সভ্যতার প্রত্যুষ-লগ্নের সেই অসহায় মানুষ আজ অসীম শক্তিধর। সে মানব-জাতির সেবায় নিয়োজিত করেছে বৈজ্ঞানিক সাফল্যকে। বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান্ মানুষ খনির নিবিড় অন্ধকারে আলো জ্বেলেছে, ঘুম ভাঙিয়েছে পাতালপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যার, দৈত্যপুরীর বন্দীশালা থেকে মুক্ত করে এনে তাকে পরিকল্পনা-অনুসারে সাজিয়েছে মনের মতন করে, উদ্ভাবন করেছে উৎপাদনের নব-নব প্রকরণ, পৃথিবীর শৈশবের জড়তা কাটিয়ে এনে দিয়েছে যৌবনের

বৈজ্ঞানিক সাফল্য ও বাণিজ্যের জয়যাত্রা

অফুরন্ত কর্মশক্তি ও গতির উল্লাস। অন্যদিকে, বিজ্ঞানের ঐন্দ্রজালিক শক্তিবলে মানুষ উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল নদীস্রোতকে বশীভূত করে উর্বর মরুপ্রান্তরকে করেছে জলসিক্ত, ভূ-গর্ভে সঞ্চিত শস্য-সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে, অভিশপ্তা পাষাণী-কন্যা অহল্যা-ধরিত্রীর সর্বদেহে সঞ্চারিত করেছে অপূর্ব প্রাণ-স্পন্দন। বিজ্ঞান আজ তাকে শস্যবতী করে তুলছে, শিল্প-শৈলীর নব-নব প্রবর্তনে আনছে সে উৎপাদন-যুগান্তর, সুদূরকে করছে নিকটতম; বাণিজ্যের অভূতপূর্ব প্রাণ-চাঞ্চল্যে জীবধাত্রী বসুধা আজ অপরূপা।

বিজ্ঞান-সাধনার সিদ্ধিতে সমৃদ্ধ হয়েছে বাণিজ্য

প্রাগৈতিহাসিক মানবের অগ্নি-প্রজ্বলন কৌশল আয়ত্ত করার দিন থেকে আধুনিক রকেট-স্পুটনিক-মহাকাশযানের যুগ পর্যন্ত মানুষের অতন্দ্র সাধনা বিজ্ঞানকে করেছে সমৃদ্ধ এবং সভ্যতাকে করেছে জঙ্গম। বাষ্পীয় শক্তিকে সে করেছে বশীভূত, আকাশের বিদ্যুৎকে সে করেছে করায়ত্ত এবং মুঠোয় পুরে নিয়েছে আণবিক, পারমাণবিক শক্তিকে। পৃথিবীর দূর-দূরান্তর আজ তার সন্নিহিত হয়েছে। ডাঙায় ছুটেছে মোটর-ট্রেন, সমুদ্রে 'ঢেউএর ঝুঁটি ঝাপটে ধরে' ভারি জাহাজ ছুটে চলেছে, আকাশ তোলপাড় করে উড়ে চলেছে অতি-আধুনিক বিমান-পোত, মহাশূন্যে পাড়ি দিয়েছে রকেট-স্পুটনিক্-মহাকাশযান। অন্যদিকে, বিজ্ঞান মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে জীবনকে বাঁচিয়ে তোলার প্রতিশ্রুতিও এনেছে। সাবিত্রীর মতো সে সত্যবানের প্রাণহীন দেহে সঞ্চারিত করতে পারে জীবনের আশ্চর্য স্পন্দন। বাণিজ্য সমস্ত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধিকে পৌঁছিয়ে দিয়েছে বিশ্ব-মানবের দুয়ারে।

বিজ্ঞানের অবদান : শিল্প-বিপ্লব ও কৃষি-বিপ্লব

এদিকে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সিদ্ধিতে যেদিন শিল্প-উৎপাদন-শৈলীতে যুগান্তর এলো, সেদিন বাণিজ্যের ইতিহাসে সূচিত হলো নবতম দিন। পূর্বে ছিল কুটির-শিল্প, যা মানুষের হাতের কৌশলে এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বল্প উৎপাদনের সংকীর্ণ ধারাটিকে কোনমতে বজায় রেখেছিল; ব্যবসা-বাণিজ্যে ছিল না গতির আবেগ, ছিল না প্রাণের চাঞ্চল্য। ধীর-মন্থর, বিলম্বিত লয়ে চলতো সেদিনের ব্যবসা-বাণিজ্য। উট, গো-শকট, পালের জাহাজ—এ সবই সেদিনের বাণিজ্য-জগতের প্রতীক-চিহ্নস্বরূপ। তারপর মানুষ পেল শক্তির সন্ধান। এলো যন্ত্র, সূচিত হলো বাণিজ্য-জগতের গৌরবময় শিল্প-বিপ্লব। দিকে দিকে কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হলো, পথ ও পরিবহণের অভূতপূর্ব উন্নতিতে বাণিজ্য সমাপ্ত করলো বিশ্ব-বিজয়। এলো নব-নব উৎপাদন-বৈচিত্র্য। শিল্পের বিপুল চাহিদা মেটাতে কৃষি-জগতেও সাড়া পড়ে গেল, সেখানেও বিজ্ঞানের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে সূচিত হলো বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এলো কৃষি-বিপ্লব।

এ হলো বিজ্ঞান-নির্ভর বাণিজ্যের গৌরবময় দিগন্ত। অন্য দিগন্তে জমেছে অনেক অন্ধকার, অনেক দুঃখ, অনেক প্রবঞ্চনা। পূর্বে যারা ছিল কৃষি ও কুটির-শিল্পের একমাত্র উদ্যোগী, সেই স্বাধীন উৎপাদক চাষী-শিল্পী-মজদুরের হাতে ছিল উৎপাদনের চাবি-কাঠি। কিন্তু যন্ত্র-শাসনের নতুন সংবিধানে রূপান্তর ঘটলো উৎপাদন-জগতের। যন্ত্র এসে মানুষের হাতের কাজ কেড়ে নিল, অপহরণ করলো তার জীবন-কাঠি। একটি কাপড়ের কল স্থাপিত হলো, আর সঙ্গে সঙ্গে শত শত তাঁতির তাঁত গেল বন্ধ হয়ে, যন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাজিত, কর্মচ্যুত তাঁতি আত্মনিয়োগ করলো চাষে কিংবা কারখানার চাকরিতে। প্রাচীন শান্ত-সুন্দর, সনাতন জীবনছন্দের তার গেল ছিঁড়ে। অনুরূপভাবে তেলের কল কেড়ে নিল কলুর হাতের কাজ, ধানের কল বেকার করে দিল ধান-ভাণ্ডানী গ্রাম্য মেয়েদের। মানুষের হাতের কাজ কেড়ে নিয়ে যন্ত্রদানব তাদের জীবিকার—তাদের মরণ-বাঁচনের—জীবন-কাঠিটুকু অপহরণ করে নিল। সাধারণ মানুষের এই বোবা-দুঃখ, এই নিঃসহায় নৈষ্কর্ম্য পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি করেছে এক দুরপনেয় ক্ষত। সভ্যতার এই যন্ত্রসিদ্ধ কাপালিকরূপের বিভীষিকা থেকে মানুষের কি মুক্তি নেই? মুক্তি নেই শোষণের এই সর্বনাশা পরিণাম থেকে?

সভ্যতার যন্ত্র-সিদ্ধ কাপালিক রূপ ও বাণিজ্য

বিজ্ঞানের প্রথম প্রতিশ্রুতি ছিল সর্বমানবিক কল্যাণ। কিন্তু পরবর্তীকালে বিজ্ঞান লক্ষ-কোটি মানুষের অকল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞান প্রাচীন পৃথিবীর স্বাধীন উৎপাদকের জীবিকার কড়ি কেড়ে নিয়ে, তার পরিশ্রমের পুঁজি চুরি করে, তার ক্ষুধার অন্ন কেড়ে নিয়ে ধন-কুবেরের হাতে তুলে দিচ্ছে। কোটি-কোটি ক্ষুধিত মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে বিজ্ঞান মুষ্টিমেয় ধনপতিদের ভোগ-বিলাসকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। একদিকে, এই সীমাহীন দারিদ্র্য ও অন্যদিকে, নির্লজ্জ ভোগ-বিলাস—আধুনিক বিজ্ঞান-সর্বস্ব দুনিয়ার সার্বিক অবক্ষয় ও পচনের এই হলো সর্বনাশা পরিণতি। বিজ্ঞান-নির্ভর বাণিজ্য ধনিককে আরো ধনিক এবং দরিদ্রকে আরো দরিদ্র করেছে। কাজেই, বিজ্ঞান-নির্ভর বাণিজ্য, যা একদল মানুষকে লোভী, লালসামত্ত ভোগসর্বস্ব পশুতে পরিণত করে এবং আর এক দলকে করে তোলে আহারান্বেষী, প্রাণধারণ-সর্বস্ব বুভুক্ষু জানোয়ারে—সেই বাণিজ্যে কাজ কি? শুধু তাই নয়, সামাজিক ধন-বৈষম্যের রূপকে তীব্রতর করে তা শ্রেণী-সংঘাতের মাধ্যমে প্রস্তুত করেছে আসন্ন রক্ত-বিপ্লবের পথ। এইভাবে বিজ্ঞানের দাক্ষিণ্য-পুষ্ট বাণিজ্য রজ্জুবদ্ধ পশুর মতো সমাজকে, সমাজের মানুষকে রক্তাক্ত যূপকাষ্ঠের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে।

বিজ্ঞানপুষ্ট বাণিজ্য ও ধন-বৈষম্যের ছিন্নমস্তা রূপ

কিন্তু কার পাপে আজ বিজ্ঞানপুষ্ট বাণিজ্যের এই ছিন্নমস্তা রূপ? দোষ বিজ্ঞানের নয়, বিজ্ঞান পুষ্ট বাণিজ্যেরও নয়। দোষ সেই সব মানুষের, যারা বিজ্ঞান-শাসিত বাণিজ্যকে নিষ্ঠুর শোষণ-যন্ত্রে পরিণত করেছে, যারা ব্যক্তিগত ভোগ-সুখ-সর্বস্বতার খাতিরে আধুনিক বাণিজ্যকে নর-নিগ্রহের নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করেছে। দোষী তারাই।

দোষ কার?—
বিজ্ঞান বা বাণিজ্যের,
না প্রয়োগ-পদ্ধতির?

সেই মুষ্টিমেয় মানুষের দয়াহীন লোভ, লালসাপূর্ণ অর্থ-অধিকার ও ভোগ-লিপ্সা আজ বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের সাহায্যে গগনস্পর্শী হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাণিজ্যের মূল মন্ত্রই সমাজের সামগ্রিক সম্পদসৃষ্টি, ব্যক্তিগত মুনাফার অঙ্কবৃদ্ধি নয়। মুষ্টিমেয় স্বার্থপর ধনকুবেরের দল আত্মসুখ-সর্বস্বতা ও ভোগ-বিলাসের চরিতার্থতার জন্য সেই মূল মন্ত্রকে পদদলিত করেছে। কাজেই, দোষ বিজ্ঞানের নয়, বাণিজ্যেরও নয়, দোষ বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের প্রয়োগ-পদ্ধতির।

অসীম সম্ভাবনা ও শক্তিময় বিজ্ঞানকে মুষ্টিমেয় স্বার্থপর মানুষের হাতে তুলে দিলে সমাজের সার্বিক দুঃখের রূপ প্রকট হয়ে উঠবে। কথা হচ্ছে, আর কতোদিন বিজ্ঞানলক্ষ্মী ও বাণিজ্যলক্ষ্মী সেই মুনাফাশিকারীদের গৃহে দাসীবৃত্তি

উপসংহার

করবেন? যাঁরা কল্যাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাঁরা কি মানব-কল্যাণের উন্মুক্ত আকাশতলে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যে তাঁদের কল্যাণপূত দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করে দেবেন না? তাহলে রাষ্ট্রকে হতে হবে অগ্রণী। বিজ্ঞান ও বাণিজ্য সকল কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের করায়ত্ত হলে মানুষের দুঃখ-রজনীর অবসান হবে, রক্ত-বিপ্লবের হাত থেকে রক্ষা পাবে এই জীবধাত্রী বসুধা।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- বিজ্ঞানের প্রসারে বাণিজ্যের সুবিধা, ক. বি. '৬৩
- বিজ্ঞান ও বাণিজ্য

২০. ভারতে জলসেচ ও নদী-পরিকল্পনা

Irrigation and River Projects in India.

প্রবন্ধ-সূত্র :—অবতরণিকা—প্রাচীন ভারতের সেচ-ব্যবস্থার রূপরেখা—ইংরেজ-রাজত্বে ভারতের সেচ-ব্যবস্থা—ভারতের সেচ-ব্যবস্থার আধুনিক অধ্যায়: বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা—ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা, বিপাশা পরিকল্পনা, সিন্ধু-নদের জলচুক্তি: ১৯৬০—হীরাকুদ বাঁধ পরিকল্পনা—রাজস্থান খাল পরিকল্পনা—দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা—তুঙ্গভদ্রা, নাগার্জুন সাগর, কৈনা, ভদ্রা জলসংরক্ষণ, কাকড়াপাড়া, মচকুন্দ, তাওয়া ও মালাপ্রভা পরিকল্পনা—চম্বল পরিকল্পনা—কুশী, রিহন্দ্ বাঁধ ও গণ্ডক ও রামগঙ্গা পরিকল্পনা—ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা—ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা—উপসংহার।

"এস এস হে তৃষ্ণার জল—"

—রবীন্দ্রনাথ

ভারতের তৃষ্ণার্ত কৃষি-প্রান্তর প্রার্থনা করেছে আকণ্ঠ তৃষ্ণার জল। কিন্তু পায় নি। বৈচিত্র্য-মণ্ডিত ভারতে কোথাও নদী-জলধারার অন্তহীন প্রাচুর্য, কোথাও বৃষ্টির অফুরন্ত আশীর্বাদ; কোথাও তৃষ্ণার্ত প্রান্তর কাতরকণ্ঠে আমন্ত্রণ করেছে নদী-প্রবাহকে, আহ্বান জানিয়েছে বৃষ্টি-বারি-ধারাকে। কিন্তু নিষ্করুণ নদী মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেছে, মৌসুমী-মেঘও চলে গেছে ভেসে। এই মৌসুমী-মেঘ কোন বছর দিল বন্যা, কোন বছর দিল অনাবৃষ্টি। কৃষি-নির্ভর ভারতের বাজেট নিয়ে মৌসুমী-মেঘ শুরু করলো সর্বনাশা জুয়াখেলা। চরম অনিশ্চয়তার হাতে ভারতের অর্থনীতি অগ্রগতির পথ খুঁজে পায় নি।

অবতরণিকা

কিন্তু ভারতের আছে তরঙ্গময়ী নদী, আছে কর্ষণযোগ্য ভূমি আর আছে ভূমির অফুরন্ত উর্বরতা। তবু ভারতের কৃষি ছিল একান্তভাবে দৈবাধীন। তার কারণ, সেদিন ছিল না এমন কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা, এমন কোন উদ্যোগ-আয়োজন, যা নদীর জলধারাকে তৃষ্ণার্ত শস্য-প্রান্তরে পৌঁছিয়ে দিয়ে ঘটাতে পারে তার যুগ-সঞ্চিত তৃষ্ণার মুক্তি কিংবা বন্যার সামূহিক সর্বনাশ থেকে রক্ষা করতে পারে তার সোনার শস্যসম্ভারকে।

কিন্তু এককালে ভারতের নদনদীগুলি তৃষ্ণার্ত কৃষিক্ষেত্রের পাণ্ডুর মুখে শ্যামল হাসি ফুটিয়ে তুলতে বহন করে আনতো অফুরন্ত তৃষ্ণার বারি; অতিরিক্ত

জল-নিষ্কাশন ও যাতায়াত-পরিবহণেরও ছিল তারা বড়ো অবলম্বন। রাজা-মহারাজারা সেই দেশের হিতৈষী নদীগুলির পলি-মোচন করতেন। তাছাড়া, নানা উপলক্ষে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করতেন অসংখ্য বিশালাকার জলাশয় ও কূপ এবং খনন করে দিতেন বহু শাখা-প্রশাখাযুক্ত খাল। ভারতের কৃষি-প্রসিদ্ধির মূলে ছিল সেই উন্নত সেচ-ব্যবস্থা। কিন্তু ইংরেজ-রাজত্বের হৃদয়হীন শাসনে তা পড়ে রইলো অবহেলিত। সংস্কারের অভাবে নদীগুলি পলিপূর্ণ হয়ে হারালো জলবহন-ক্ষমতা, জলাশয়গুলো এলো মজে, কূপগুলো হারালো জলধারণ-শক্তি আর খালগুলো ভরাট হয়ে একমুখো মরা-নদীরূপে টিকে রইলো মৌন মূক অতীতের করুণ সাক্ষী-রূপে। নদনদীর আশীর্বাদ-ধারা আর শস্যক্ষেত্রে পৌঁছোলো না, বন্যার তাণ্ডবে মেতে তারা ধারণ করলো মূর্তিমতী সর্বনাশা রূপ। অনাবৃষ্টির বছরে মরুভূমির উষরতা এবং অতিবৃষ্টির বছরে প্রলয়ঙ্করী বন্যা—এই হলো ভারতের কৃষি-জমির ভাগ্যলিপি। যে সব অঞ্চল ছিল ভারতের শস্যভাণ্ডার, সেইখানেই নেমে এলো দুর্নিবার দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা। এইভাবে অন্নপূর্ণার দেশ হলো অন্নহীন।

প্রাচীন ভারতের সেচ-ব্যবস্থার রূপরেখা

ইংরেজ-রাজত্বের প্রথমার্ধে ভারতের সনাতন সেচ-ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে; দ্বিতীয়ার্ধে সাম্রাজ্যবাদীর কপট-নিদ্রা তিরোহিত হলো, সেচব্যবস্থার নবতর বিন্যাসের জন্যে তাকে এগিয়ে আসতে হলো। ভারতীয় সেচ-কমিশনের (১৯০১-১৯০৩) সুপারিশক্রমে কয়েকটি বড় বড় সেচ পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ইংরেজ-রাজত্বে সেচকার্যের উদ্দেশ্যে মোট ৮০ হাজার মাইল খাল কাটা হয়েছিল এবং তাতে বছরে ৭ কোটি একর জমি জলসিক্ত হতো। জল-সেচে আমেরিকার সুনামকে ম্লান করে দিয়ে ভারতের সেচ-পরিমাণ দাঁড়ালো তার প্রায় তিনগুণ। একমাত্র পাঞ্জাবেই ৪০ লক্ষ একর মরুভূমি শস্যশ্যামল হয়ে উঠেছিল। সিন্ধু প্রদেশের সুক্কুরে সারা পৃথিবীর বৃহত্তম 'লয়েড' বাঁধ ব্রিটিশ ভারতের জলসেচের সর্বশেষ স্বাক্ষর। এ ছাড়া পাঞ্জাবের শতদ্রু উপত্যকা পরিকল্পনা, উত্তর প্রদেশের সারদাখাল পরিকল্পনা এবং মাদ্রাজের কাবেরী বাঁধ পরিকল্পনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দেশ-বিভাগের ফলে সেচ-ব্যবস্থার অধিকাংশই পড়লো পাকিস্তানের ভাগে; আর ভারতের ভাগ্যে পড়লো সেচব্যবস্থাহীন বৃষ্টিহীন বিস্তীর্ণ মরু-অঞ্চল।

ইংরেজ-রাজত্বে ভারতের সেচ-ব্যবস্থা

বৃষ্টিহীন বিস্তীর্ণ মরু-অঞ্চল, বন্যাবিক্ষুব্ধ নদনদী এবং জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের অফুরন্ত সম্ভাবনা নিয়ে ভারত স্বাধীন হলো। স্বাধীনতালাভের পর ভারত তার অর্থনীতির বিন্যাস, নবতর কর্মকাণ্ডের উদ্যোগ-আয়োজনে হাত দিয়েছে,

সুরু করেছে নব-শিল্পায়নের পথে যাত্রা। তার প্রারম্ভিক ভূমিকারূপে সূচিত হয়েছে সকল জলবিদ্যুৎ উৎসকে সক্রিয় করে তোলার কঠোর প্রয়াস। বন্যার উচ্ছৃঙ্খল জলধারাকে শক্ত কংক্রিটের বাঁধনে নিয়ন্ত্রিত করে শস্যোৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে; অন্যদিকে, শিল্পাঞ্চলে সস্তায় যোগান দিতে হবে দুর্লভ বিদ্যুৎশক্তি। ভারতের অর্থনীতির সূচিত হলো এক নতুন অধ্যায়। এই সার্বিক উন্নয়নের পটভূমিকায় গৃহীত হলো ভারতের নদী প্রকল্পগুলি।

ভারতের সেচ-ব্যবস্থার আধুনিক অধ্যায়: বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা

পাঞ্জাব এবং রাজস্থানের প্রাণহীন মরু-অঞ্চলকে প্রাণবন্ত করে তোলার জন্যে প্রতিশ্রুত ভারতের বৃহত্তম ভাকরা-নাঙ্গাল বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা ১৯৬৩ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহরু জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দিয়ে গেছেন। ভাকরায় শতদ্রু নদীর ওপরে ৭৪০ ফুট উঁচু বাঁধ এবং ৯০ ফুট উঁচু নাঙ্গাল বাঁধ শতদ্রুর জলধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে। তারপর ৪০ মাইল দীর্ঘ নাঙ্গাল হাইডেল চ্যানেল, ৬৫২ মাইল দীর্ঘ ক্যানেল ও ২,২০০ মাইল দীর্ঘ বণ্টনকারী খালের মারফৎ পাঞ্জাব ও রাজস্থানের ৫৮·৬ লক্ষ একর জমির শস্য-সম্ভাবনাকে পূর্ণ বিকশিত করে তোলা হয়েছে। ভাকরা, গাঙ্গুয়াল ও কোটলায়—তিনটি শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে; শতদ্রু নদীর দক্ষিণ তীরে আরও একটি শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হবে। দ্বি-পার্বিক বিপাশা পরিকল্পনার রূপায়ণে হাত দিয়েছেন পাঞ্জাব ও রাজস্থান সরকার। বিপাশা-শতদ্রু-সংযোজক খাল এবং বিপাশা বাঁধ—এই দুই পর্যায়ে পরিকল্পনাটি বিভক্ত। প্রথমটিতে ১৩ লক্ষ একর এবং দ্বিতীয়টিতে ৫০ লক্ষ একর জমির তৃষ্ণা দূর হবে। ওদিকে, দেশ-বিভাগের পর সিন্ধুনদের খালগুলির দ্বারা জল-সিঞ্চিত ২১০ লক্ষ একর জমি পড়ে পাকিস্তানে, ভারতে পড়ে ৫০ লক্ষ একরের মতো। বারো বছরের আলোচনায় এবং আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় ১৯৬০ সালে সিন্ধুনদের জলচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা, বিপাশা পরিকল্পনা, সিন্ধু নদের জলচুক্তি, ১৯৬০

উড়িষ্যার বিষণ্নমুখে হাসি ফোটাতে পরিকল্পিত হয় হীরাকুদ বাঁধ পরিকল্পনা। ১৫,৭৪৮ ফুট দীর্ঘ এই হীরাকুদ বাঁধ পৃথিবীর দীর্ঘতম বাঁধ। মহানদীর উভয় তীরে ১৩ মাইল দীর্ঘ বাঁধ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত ৬৬ লক্ষ একর-ফুট জলধারায় উড়িষ্যার ৩·৮ লক্ষ একর জমি জলসিক্ত হবে। ভারতের এতাবৎ কাল অনগ্রসর অঙ্গরাজ্য উড়িষ্যার শস্য ও শিল্পসমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে এই হীরাকুদ পরিকল্পনা। বাঁধের পাদদেশে স্থাপিত প্রধান শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্র হীরাকুদ, রাজগাঙপুর, রাউরকেলা, জোদা, ব্রজরাজনগর ইত্যাদি শিল্পাঞ্চলগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে এবং পুরী, কটক, সম্বলপুর, সুন্দরগড় প্রভৃতি

হীরাকুদ বাঁধ পরিকল্পনা

শহরকে করছে আলোকিত। মহানদী বদ্বীপ-সেচ-সূচী এই প্রকল্পের একটি অঙ্গরূপে গৃহীত। তাতে অতিরিক্ত ১৬·০৮ লক্ষ একর জমির জলতৃষ্ণা দূর হবে। উড়িষ্যার কৃষি ও শিল্প-বিকাশ এতদিনে সত্যই গতিলাভ করতে চলেছে। ১৮৪·০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে শতদ্রু নদীর ওপর নির্মিত 'হ্যারিকে বাঁধ' থেকে খাল কেটে আনীত হয়েছে রাজস্থানের মরুতৃষ্ণার জল। এই খালের বিস্তার-বিন্যাসকে দু'ভাগে ভাগ করে পাঞ্জাবের মধ্যে 'রাজস্থান ফীডার' এবং 'রাজস্থান খাল' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিকানীর, যশল্মীর, শ্রীনগর জেলায় প্রায় ১৭ লক্ষ একর মরু-প্রান্তর জলসিক্ত হবে। ১৯৬৯-৭০ সালে 'রাজস্থান ফীডার' ও 'রাজস্থান খালে'র কাজ সমাপ্ত হবে এবং তার জলবণ্টন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হবে ১৯৭৭-৭৮ সালে।

রাজস্থান খাল পরিকল্পনা

তারপর দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা। কয়েক বছর আগেও দামোদর আমেরিকার টেনেসি নদীর মতো ছিল বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের অভিশাপ-স্বরূপ। টেনেসি পরিকল্পনার প্রোজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার মি. ডব্লিউ. এল. ভুরডুইন ভারত সরকারের আমন্ত্রণক্রমে টেনেসি পরিকল্পনার অনুসরণে রচনা করে দেন এই দামোদর পরিকল্পনা। তিলাইয়া, কোনার, মাইথন, পাঞ্চেৎ হিল—এই চারিটি বাঁধের সাহায্যে সঞ্চিত জলাধারে ১১·৪১ লক্ষ একর জমি জলসিক্ত হবে, অতিরিক্ত খাদ্যশস্য জন্মাবে ৩·৪৯ লক্ষ টন। আর উৎপন্ন হবে ১০৪ লক্ষ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি। বোকারো, দুর্গাপুর, চন্দ্রপুরার শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্র বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চল ও শহরগুলিতে সরবরাহ করবে বিদ্যুৎশক্তি। তাতে পূর্বাঞ্চলীয় রেলপথ-সমূহের বৈদ্যুতিকীকরণ ত্বরান্বিত হবে। কলকাতা থেকে রানীগঞ্জের কয়লাখনি-অঞ্চল পর্যন্ত পরিবহণের বিকল্প ব্যবস্থা-স্বরূপ প্রায় ৮৫ মাইল দীর্ঘ একটি নাব্য খাল কাটা হয়েছে। এতদিনে উচ্ছৃঙ্খল দামোদর বশীভূত হয়েছে; বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে সে এখন অভিশাপ না হয়ে হয়েছে আশীর্বাদ।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা

তারপর আসে দক্ষিণ ভারতের নদী-প্রকল্পগুলির কথা। প্রায় ৫,৭১২, ফুট দীর্ঘ এবং ১৬২ ফুট উঁচু বাঁধ, ৪৭৭ মাইল খাল ও তিনটি শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্র নিয়ে রচিত হয় তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা। এতে অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহীশূর রাজ্যের প্রায় ৮·৩ লক্ষ একর জমি জলসিক্ত হবে। তাছাড়া, অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে নাগার্জুন সাগর পরিকল্পনায় কৃষ্ণা নদীর ওপর নির্মিত পাকা বাঁধের সাহায্যে ২০ লক্ষ একর জমিতে তৃষ্ণার জল নিয়ে যাওয়া হবে। তাতে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে প্রায় ৮ লক্ষ টনের মতো। প্রকল্পটি ১৯৬৮-৬৯ সালে সমাপ্ত হবে, আশা করা যায়। ওদিকে কৈনা নদীর ওপর নির্মিত হয়েছে একটা বাঁধ এবং একটা সুড়ঙ্গ। এই সুড়ঙ্গের মধ্য

দিয়ে ১,৫৭০ ফুট নিচে বয়ে যাবে প্রচুর জলধারা এবং ভূ-নিম্নে স্থাপিত শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্র বোম্বাই, পুনা ও মহারাষ্ট্রের শিল্পাঞ্চলগুলিতে করবে বিদ্যুৎ সরবরাহ। মহীশূর রাজ্যসরকারের উদ্যোগে রূপায়িত ভদ্রা সংরক্ষণ পরিকল্পনায় ১৯৬১ সালে প্রায় আড়াই লক্ষ একর নিরম্বু জমি জলস্পর্শ করলো। তার উৎপন্ন জলবিদ্যুৎশক্তি কর্মচাঞ্চল্য এনেছে সন্নিহিত অঞ্চলে। ওদিকে কাকড়াপাড়া পরিকল্পনা তাপী উপত্যকার ঘুম ভাঙালো। সুরাট জেলার সাড়ে ছয় লক্ষ একর জমি এর দ্বারা হলো জল-সিঞ্চিত। উড়িষ্যা ও মহীশূর সরকার উভয় রাজ্যের সীমান্তবর্তী মচকুন্দ নদীতে বাঁধ তৈরী করে উভয় রাজ্যের সন্নিহিত অঞ্চলে জল সরবরাহ ও বিদ্যুৎ প্রেরণ সম্ভব করে তুলছেন। তাছাড়া তাওয়া বহুমুখী প্রকল্প ও মালাপ্রভা প্রকল্প যথাক্রমে ৭·৮০ লক্ষ ও ৩ লক্ষ একর জমিতে জলদানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে।

তুঙ্গভদ্রা, নাগার্জুন সাগর, কৈনা, ভদ্রা জল সংরক্ষণ, কাকড়াপাড়া, মচকুন্দ, তাওয়া, মালাপ্রভা পরিকল্পনা

অভিশপ্ত চম্বলের শাপ-মোচন করেছে চম্বল পরিকল্পনা। মধ্যপ্রদেশ আর রাজস্থান সরকার একযোগে গান্ধীসাগর বাঁধ, গান্ধীসাগর শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্র এবং কোটা বাঁধ নির্মাণ করেছেন। খালের জাল বিছিয়ে দিয়ে উভয় রাজ্যের প্রায় ১১ লক্ষ একর জমির তৃষ্ণা মেটাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর গান্ধীসাগর শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্র ও অতিরিক্ত তিনটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র সন্নিহিত শিল্পাঞ্চলগুলিকে কর্ম-চঞ্চল করে তুলবে।

চম্বল পরিকল্পনা

বিহার ও উত্তর প্রদেশে কুশী, রিহন্দ্ বাঁধ ও গণ্ডক পরিকল্পনার রূপায়ণ সমাপ্তির পথে। ত্রি-পার্বিক কুশী পরিকল্পনায় বিহারের ১৪·০৫ লক্ষ একর জমি জলসিক্ত হবে। উত্তর প্রদেশের রিহন্দ্ বাঁধ পরিকল্পনায় তিন হাজার ফুট দীর্ঘ এবং প্রায় তিনশো ফুট উঁচু কংক্রিটের বাঁধ নির্মিত হয়েছে। তাছাড়া রামগঙ্গা নদী প্রকল্প চতুর্থ যোজনায় সমাপ্ত হলে ১৭·০৬ লক্ষ একর জমি হবে জলসিঞ্চিত। গণ্ডক পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্যে ভারত সরকার ও নেপাল সরকারের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। বাঁধ-নির্মাণ, খাল-খনন এবং শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কাজ।

কুশী, রিহন্দ্ বাঁধ, গণ্ডক ও রামগঙ্গা পরিকল্পনা

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা হলো পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নদী-পরিকল্পনা। সিউড়ির কাছে তিলপাড়া বাঁধ নির্মিত হয়। ১৯৫৫ সালে শেষ হয় মাসানজোড় বাঁধের কাজ, যার বর্তমান নাম কানাডা বাঁধ; পশ্চিমবঙ্গের শুষ্ক অঞ্চলে যা জলসেচ ছাড়া বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ জেলায় ও বিহারের সাঁওতাল পরগনায়।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা

অন্যদিকে হুগলি নদীগর্ভ ভরে আসায় কলকাতা বন্দরের আয়ুষ্কাল আসছে ফুরিয়ে। যেখানে গঙ্গা পদ্মা ও ভাগীরথীতে বিভক্ত হয়েছে, সেই অঞ্চলটি পড়েছে পাকিস্তানের ভাগে এবং গঙ্গার মূল জলধারা পদ্মাগর্ভকে আশ্রয় করেছে; ভাগীরথী হয়েছে গঙ্গার দাক্ষিণ্য-বঞ্চিত। অবিলম্বে উচ্চ স্রোতের জলধারা না পেলে হুগলি যাবে মজে, কলকাতা বন্দরের মৃত্যুলগ্ন আসবে ঘনিয়ে। কলকাতা বন্দরের সমস্যা ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনার জন্ম দিয়েছে। এই পরিকল্পনার তিনটি অঙ্গ। প্রথমতঃ, গঙ্গার ওপরে ফরাক্কায় একটি বাঁধ নির্মাণ করতে হবে; দ্বিতীয়তঃ, ২৬½ মাইল দীর্ঘ একটি ফীডার খাল ফরাক্কার গঙ্গাবাঁধ থেকে জঙ্গীপুর পর্যন্ত খনন করা হবে, যা গঙ্গার উচ্চ স্রোতের জলধারা বহন করে এনে জঙ্গীপুরের সন্নিকটে নিম্ন স্রোতকে পুষ্ট করে রাখবে। তৃতীয়তঃ, জঙ্গীপুরে ভাগীরথীর সঙ্গে খালের মিলনস্থলের উচ্চে ভাগীরথীর ওপরে অন্য একটি বাঁধ নির্মিত হবে। এই পরিকল্পনার সাফল্যে কলকাতা বন্দর অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। কলকাতার উন্নয়ন, জল সরবরাহ ও জল নিষ্কাশনের সুবিধা হবে। জলপথে যাতায়াত ও পরিবহণের উন্নতি হবে। ১৯৭০-৭১ সালেই পরিকল্পনার কাজ সমাপ্ত হবে। প্রারম্ভে ৬৮৫৯ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ব্যয় হবে এর প্রায় দ্বিগুণ।

ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা

অবিভক্ত ভারতে জলসেচ ৭ কোটি একর জমিতে সীমাবদ্ধ ছিল। দেশ-বিভাগের পর অধিকাংশ জলসিক্ত অঞ্চল পাকিস্তানের ভাগে পড়ে কিন্তু জলসেচের বিভিন্ন পরিকল্পনার রূপায়ণের ফলে ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত ৭ কোটি একর জমি জলসিঞ্চিত হয় এবং ১৯৬৫-৬৬ সালের মধ্যে ৯ কোটি একর ভূমি জলসিক্ত হবে। আজ আর ভারতের বৃষ্টিবিহীন অঞ্চলের বিস্তীর্ণ বুক মরু-তৃষ্ণায় ফেটে যাবে না। তার মরুবক্ষে আজ তৃষ্ণার জল যথাসময়ে পৌঁছে যাচ্ছে। তার পাণ্ডুর বিষণ্ণ মুখে ফুটে উঠছে শ্যামল হাসির ঢেউ। দুর্ভিক্ষকে জয় করতে চলেছে ভারত, সেই সঙ্গে শস্য-সমৃদ্ধি ও শক্তি-উৎপাদনের মাধ্যমে সে জয় করতে চলেছে তার চিরায়ত দারিদ্র্যকে। ভারতের সুখ-সমৃদ্ধির স্বপ্ন সার্থক হোক, সার্থক হোক ভারতের মাটি, ভারতের জল, সফল হোক ভারতের নদীসমূহের পুণ্য জলধারা।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- ভারতের বন্যা নিয়ন্ত্রণ
- ভারতের বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা সমূহ
- দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা
- ভারতের জলসেচ ব্যবস্থা

২১. সমবায়-কৃষি ও ভারত
Co-operative Farming and India.

প্রবন্ধ-সূত্র ঃ—অবতরণিকা—দেশ-দেশান্তরের কৃষি-প্রগতি ঃ সোভিয়েট রাশিয়া, আমেরিকা, কানাডা, নয়াচীন, জাপান—ভারতের কৃষি ও কৃষকদের ভাগ্য-লিখন—ভারতে সমবায় কৃষির প্রতিশ্রুতি ঃ কৃষি-অর্থনীতির দশ দিগন্ত—ভারতে সমবায়-কৃষির ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য—বিরুদ্ধবাদী গোষ্ঠী ঃ রাজাগোপালাচারী, কে. এম. মুন্সী, ডি. গোরেওয়ালা, সুব্রহ্মনিয়ম, ওটা শিলার, এস. চন্দ্রশেখর—সমবায় কৃষির অগ্রগতি—উপসংহার।

"I will have millions of revolutions in this country rather than have millions of our peasantry living on the verge of starvation." —প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু

সমবায় কৃষি ভারতের অর্থনৈতিক বিপ্লবের পথে একটি স্মরণীয় পদক্ষেপ। ভারত যে কৃষি-বিপ্লবের সোচ্চার ঘোষণা করেছে, এই কৃষি-পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তা সফল হবে, আসবে কৃষির সেই বহু-প্রতীক্ষিত গৌরব-লগ্ন। কৃষি-সমবায় মানুষের শ্রম ও সম্পদের সুষ্ঠু সমবায়িক বিনিয়োগ ও বণ্টনের মাধ্যমে কৃষি-জগতে আনবে অভূতপূর্ব যুগান্তর এবং কৃষিকে দান করবে বুভুক্ষু ভারতের বুভুক্ষা-হরণের সুমহান্ শক্তি।

অবতরণিকা

আজ বিভক্ত ভারতের ছেচল্লিশ কোটি মানুষের জনতা ভারতের অতিভারগ্রস্ত, অনগ্রসর কৃষির কাছে ক্ষুধার অন্ন-প্রার্থী, হাজার-হাজার ভারতীয় কল-কারখানা আজ পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচামাল-প্রার্থী। নব যুগের এই চাহিদা পূরণের জন্যে কৃষি সংগঠনকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। বলাবাহুল্য, সমবায়-কৃষি বহন করে এনেছে সেই শক্তিশালী কৃষি-সংগঠনের বাণী।

আজ পৃথিবীর দেশে-দেশে কৃষি-সংস্কার ও কৃষি-প্রগতির জয়ধ্বনি বিঘোষিত হচ্ছে। কৃষি-ভূমির নবতর বিন্যাসে, বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ-প্রযুক্তিতে এবং সংঘবদ্ধ কৃষি-প্রয়াসে ক্ষুধাহরণ ও দারিদ্র্য-মোচনের মহাতপস্যায় সেই সব দেশের কৃষি লাভ করেছে চরম সিদ্ধি। সোভিয়েট রাশিয়ায় ভূমির রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ও যৌথ কৃষি-খামারের (Collective Farming) প্রবর্তন কৃষি-উৎপাদনে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। প্রয়োজনীয় মূলধন, সার ও যন্ত্রপাতি-সরবরাহ সেখানে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। কৃষক তার শ্রমের গুণগত ও পরিমাণগত মূল্য পায়। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে যে, যৌথ কৃষি-খামার প্রথায় রাশিয়ার কৃষি-উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে এবং নেতৃবর্গ নতুন কোন পদ্ধতি গ্রহণের

কথা চিন্তা করছেন। মার্কিন মুলুকে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন যৌথ-খামার প্রথা (Corporate Farming) প্রচলিত। মার্কিনী যৌথ-খামার প্রথা যৌথ কারবারেরই সমগোত্রীয়। বৎসরান্তে কৃষিলব্ধ মুনাফা অংশীদারদের মধ্যে শেয়ারের আনুপাতিক হারে বন্টিত হয়। ৫০০ একর থেকে ৫০,০০০ একর পর্যন্ত জমি যৌথ-খামার-চক্রের অধীন হওয়ায় বহুল উৎপাদনের অনিবার্য কার্যসূচীতে কৃষি-যান্ত্রিকতার প্রয়োগ-প্রাচুর্য মার্কিন কৃষি-ব্যবস্থার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কানাডা সমবায়-কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল, কিন্তু সেখানকার কৃষক-সমাজের আলস্য, ঔদাসীন্য ও পরমুখাপেক্ষিতার জন্যে তা ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে, লালচীন 'কমিউন' প্রথায় সমগ্র দেশের কৃষি-ভূমিকে এক একটি 'কমিউনে' বিভক্ত করে সংঘবদ্ধভাবে আধুনিক কৃষি-প্রকরণ অনুসরণ করে চলেছে। আর জাপান তো বিশ্বের কৃষি উৎপাদনের আদর্শ স্থানীয়। সেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রচলিত থাকলেও যার জমির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, এমন ব্যক্তি জমির মালিক নয়। সরকার থেকে প্রত্যেক কৃষককে ৭ একর করে জমি দেওয়া হয়েছে। শিল্প-সাফল্য সেখানে কৃষি-সাফল্যের দুয়ার খুলে দিয়েছে। জাপানে কৃষি-ভূমির স্বল্পতাই সেখানকার কৃষিকে ব্যাপক কৃষি থেকে নিবিড় কৃষির দিকে পরিচালিত করেছে।

দেশ-দেশান্তরের কৃষি-প্রগতি : সোভিয়েট রাশিয়া, আমেরিকা, কানাডা, নয়াচীন, জাপান

বিশ্বের কৃষি আজ বলিষ্ঠ পদবিক্ষেপে এগিয়ে চলেছে অগ্রগতির পথে। আর 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।' তার কৃষি-পদ্ধতি মান্ধাতার আমলের। ঋণগ্রস্ত, রোগ-জর্জর, উপবাস-ক্ষীণ কৃষক-সমাজ, ততোধিক অস্থিচর্মসার হাল-বলদ, ভোঁতা লাঙ্গল, বৃষ্টিপাতে দৈব-নির্ভরতা, অবারিত ভূমিক্ষয়, ভূমির ক্রমবিভাজ্যমানতা, মহাজন-বর্গাদার-দালাল-ফড়িয়া ইত্যাদি মধ্যবর্তী শ্রেণীর শোষণ—ভারতের কৃষির চিরাগত ব্যাধি। তার ওপর নিরক্ষর কৃষক, প্রাচীন কৃষি-পদ্ধতি, নিদারুণ দারিদ্র্য, আলস্য, পরিবর্তন-বিমুখতা ইত্যাদি ভারতের কৃষিকে শত শতাব্দী পিছিয়ে রেখেছে। ভারতের জমিদারশ্রেণী এদেশের হতভাগ্য কৃষকদের প্রতি ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করেছে, তাদের বেগার খাটিয়ে মেরেছে, নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। যারা 'অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র নদীর ঘাটে ঘাটে বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে', জমি তাদের নয়, পাকা ধানও তাদের নয়; বিদ্রোহী কবির ভাষায় 'মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ মাটির মালিক তাঁহারাই হন।' আর 'সন্তানসম পালে যারা জমি, তারা জমি-দার নয়।' ইতিহাস সাক্ষী, ভারতের এই সর্বংসহ কৃষক-সমাজ কোনদিন কৃষক-বিদ্রোহের আকারে ফেটে পড়ে নি, কোনদিন কোন আন্দোলনের কথা কল্পনাও করে নি। 'শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কষ্ট-ক্লিষ্ট প্রাণ রেখে দেয় বাঁচাইয়া।'

ভারতের কৃষি ও কৃষক-সমাজের ভাগ্য-লিখন

ভারতীয় কৃষির এই নৈরাশ্য ও দুঃখ-দৈন্যের মাঝখানে সমবায়-কৃষির ঘোষণা যেন দৈববাণীর মতো এলো। বাস্তবিকই, এই কৃষি-কুণ্ঠিত দেশে ১৯৫৯ সালে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে গৃহীত সমবায়-কৃষির প্রস্তাবটিকে কৃষি-প্রগতির পথে এক বলিষ্ঠ ও বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। ছেচল্লিশ কোটি বুভুক্ষু মানুষের বুভুক্ষা-হরণের নির্দ্বিধ আশ্বাস নিয়ে কৃষি-সমস্যার সপ্তসিন্ধু মন্থন করে অর্থনৈতিক সমাধানের দশদিগন্ত উন্মোচিত করে দিয়েছে সমবায়-কৃষি। সন্নিহিত জোত-জমি একত্রিত হয়ে সমবায়-প্রথায় চাষাবাদ হলে, পরিকল্পনা কমিশনের অন্যতম সদস্য শ্রীমন্ নারায়ণের মতে, অন্ততঃপক্ষে দশটি অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ করা যাবে। সেগুলি হলো: এক, পশু ও মানুষের কায়িক শ্রমের সুষ্ঠু ও সংগত প্রয়োগ সম্ভব হবে; দুই, সেচের জল ও উন্নত যন্ত্রপাতি-সংগ্রহের জন্যে সকল পুঁজি একত্রিত করে প্রয়োজনীয় মূলধনের ব্যবস্থা করা যাবে; তিন, বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতিতে—বিশেষতঃ জাপানী প্রথায়—উন্নত বীজ, সবুজ ও পচাই সার, কীট-বিনাশক দ্রব্য ইত্যাদি আরো কার্যকরীভাবে ব্যবহৃত হতে পারবে; চার, সুষ্ঠু বিপণন-পদ্ধতির মাধ্যমে দালাল-ফড়িয়া ইত্যাদির শোষণ-সম্ভাবনা তিরোহিত হবে; পাঁচ, সরকারী কৃষি-ঋণের সুযোগ আরও সম্প্রসারিত হবে; ছয়, সরকারের পক্ষে উন্নত বীজ, সার, কৃষি-যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং কারিগরী জ্ঞান-দান ইত্যাদি সহজসাধ্য হবে; সাত, কৃষির পরিপূরকরূপে নানা গ্রামীণ ও আনুষঙ্গিক শিল্পের বিকাশে পল্লী-অর্থনীতির পুনর্বিন্যাস সম্ভব হবে; আট, গ্রামেই বহু শিক্ষিত তরুণের কর্মসংস্থান হবে এবং শহরের অর্থনীতি অনেকটা ভারমুক্ত হবে; নয়, পল্লীসমাজে প্রগতিশীল সমাজ-নেতার অভ্যুদয় হবে, এবং দশ, বিজ্ঞানসম্মত কৃষি-পরিসংখ্যান্ সংগ্রহ সহজ হবে এবং বিভিন্ন পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণও সম্ভব হবে।

ভারতে সমবায়-কৃষির প্রতিশ্রুতি: কৃষি-অর্থনীতির দশদিগন্ত

ভারত যে সমবায়-কৃষি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তার তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কথা বিঘোষিত হয়েছে। প্রথমতঃ, ভারতের সমবায়-কৃষি স্বেচ্ছামূলক। এতে যোগদানের কোনরূপ বাধ্যবাধকতা নেই। ভারতের যে কোন কৃষক স্বেচ্ছায় এতে যোগদান করতে পারে এবং স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের সমবায়-কৃষি খামারের পরিধি একান্তভাবে সীমাবদ্ধ। কমপক্ষে, পঞ্চাশ একর থেকে দু'শো একর পর্যন্ত জমিন সমবায়-কৃষি খামারের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এবং তৃতীয়তঃ, সমবায়-কৃষি খামারে যথাসম্ভব স্বল্প পরিমাণ কৃষি-যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হবে। অতি-যান্ত্রিকতা বহু কৃষককে কর্মচ্যুত করবে। তাই গ্রামীণ বেকারত্বের সম্ভাবনাকে অবলুপ্ত করবার জন্যে কৃষি-যন্ত্রপাতি প্রয়োগে এই সীমারেখা টেনে দেওয়া হয়েছে।

ভারতের সমবায় কৃষির ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য

সমবায়-কৃষি প্রস্তাবের জন্ম ১৯৫৯ সালে। কিন্তু তার জন্মলগ্নে বহু নেতাই তার প্রতি অতি-অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। সেই নবজাত প্রস্তাবটির কণ্ঠরোধ করবার জন্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল অনেক গোপন চক্রান্ত। প্রবীণ কংগ্রেসী নেতা শ্রীরাজাগোপালাচারী এই প্রস্তাবকে চ্যালেঞ্জ করে স্বতন্ত্র দল গঠন করেন। তাঁর মতে, এর দ্বারা ভারতে কমিউনিজ্‌মের প্রসার ত্বরান্বিত হবে, কারণ এক-একটি সমবায়-খামার নাকি হয়ে উঠবে কমিউনিজ্‌ম্ প্রচারের শক্তিশালী ঘাঁটি। কিন্তু দারিদ্র্যই কমিউনিজ্‌ম্ প্রসারের পটভূমি; আর সমবায়-কৃষি দারিদ্র্য-জয়ের শানিত অস্ত্র। কাজেই সমবায়-কৃষিই হবে কমিউনিজ্‌ম্-প্রতিরোধের শক্ত প্রাচীর। শ্রীরাজাগোপালাচারীর ভক্ত শ্রীকে. এম. মুন্সী বলেন, "State-run, state-controlled and state-financed···the beginning of enslavement." কিন্তু রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং রাষ্ট্রীয় অর্থ-মঞ্জুরী ছাড়া দেশের ধনব্যবস্থা যে মাথাভারী হয়ে পড়বে, ধন-বৈষম্যের ব্যবধান যে অসীম হয়ে উঠবে এবং এক অর্থনৈতিক অচলাবস্থার সৃষ্টি করবে, শ্রীমুন্সী তার কোন জবাব দিতে পারেন নি। অন্যতর বিরুদ্ধবাদী শ্রী ডি. গোরেওয়ালা তার সাথে যোগ করেন, "অত্যন্ত বিশেষ অবস্থা ছাড়া জমির মালিকেরা সমবায়-কৃষি খামারে স্বেচ্ছায় যোগদান করবে না।" "অত্যন্ত বিশেষ অবস্থা" অর্থে আইনের বাধ্য-বাধ্যকতার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এবং তাতে হবে গণতান্ত্রিক নীতি ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অপমৃত্যু। আবার জার্মানীর স্টুটগার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ওটা শিলার (Dr. Otta Schiller) বলেন, কৃষকেরা জমি-স্বত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। ভূমি-স্বত্বের হস্তান্তর তাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ। "It would be unrealistic to expect that this would happen in India on a large scale within a few years." ভারত সরকারের কার্যকরী সংস্থা (Working Group) স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে, কয়েকটি রাজ্যে এমন আইন আছে, যার সাহায্যে সংখ্যা-গরিষ্ঠ কৃষক সম্প্রদায় অনিচ্ছুক সংখ্যালঘু কৃষকদের সমবায় খামারে যোগদানে বাধ্য করতে পারে। সমবায়-কৃষি প্রস্তাবের অন্যতম রচয়িতা শ্রীসুব্রহ্মনিয়মের অভিমত হলো, সমবায় খামারের কৃষকদের ভূমিস্বত্ব আপাততঃ অক্ষুণ্ণ থাকবে; "but ultimately the ownership of land must vest in the community." আবার ভারতীয় গণসংখ্যা গবেষণা মন্দিরের পরিচালক ডঃ এস. চন্দ্রশেখরের মতে, ভারতীয় কৃষক-সমাজের আলস্য ও কর্মবিমুখতায় কানাডার মতো ভারতের সমবায়-কৃষিও ব্যর্থ হবে।

বিরুদ্ধবাদী-গোষ্ঠী : শ্রীরাজাগোপালাচারী, শ্রীকে. এম. মুন্সী, শ্রীডি. গোরেওয়ালা, শ্রীসুব্রহ্মনিয়ম, ডঃ ওটা শিলার, ডঃ এস. চন্দ্রশেখর

এত বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে সমবায়-কৃষির যাত্রা-সুরু। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্তিম বর্ষ পর্যন্ত ১,১৫টি

খামার রেজেষ্ট্রীভুক্ত হয়েছিল এবং সারা ভারতে সর্বমোট ৩২০টি পাইলট প্রোজেক্ট স্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছিল। প্রতিটি জেলায় অন্ততঃ পক্ষে একটি পাইলট প্রোজেক্ট থাকবে এবং একটি পাইলট প্রোজেক্টের অধীনে থাকবে অন্ততঃ দশটি সমবায়-খামার। তৃতীয় পরিকল্পনায় ৩২০টি পাইলট প্রোজেক্টের মধ্যে ১৮০টির কাজ শুরু হয়েছে। ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত পাইলট প্রোজেক্টের অন্তর্ভূত ও বহির্ভূত খামার সংখ্যা

সমবায়-কৃষির অগ্রগতি

২,৩৫০, ভূমির পরিমাণ ৩,০১,০০০ একর এবং সদস্য সংখ্যা ৪৬,৮০০। তৃতীয় পরিকল্পনায় সমবায় কৃষি-ব্যবস্থাকে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পঞ্চায়েৎ-রাজ সংস্থার সঙ্গে একত্র করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া নির্বাচিত সম্প্রসারণ-শিক্ষণ-কেন্দ্রে ১২টি সমবায়-খামার-অঞ্চল (wings) স্থাপিত হয়েছে। সেখানে এ পর্যন্ত ৭০০ জন সেক্রেটারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আবার সরকার পুনরুদ্ধৃত কর্ষণযোগ্য পতিত জমিসমূহকে সমবায়-খামারে দান করারও আশ্বাস দিয়েছেন। দণ্ডকারণ্য প্রকল্প অধিকারও উদ্বাস্তুগণের জন্যে সমবায়-খামার-স্থাপনে কৃত-সংকল্প।

এই কয়েক বছরের মধ্যেই সমবায়-কৃষি সম্পর্কে ভারতের উৎসাহ-উদ্দীপনায় যেন ভাঁটা পড়েছে। তার কারণ ভারতের বহু-কলঙ্কিত সনাতন ভূমি-প্রথার মূলে কুঠারাঘাত পড়ায় বহু কায়েমী স্বার্থ ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় তৎপর হয়ে রাজনৈতিক

উপসংহার

ছদ্মবেশ ধারণ করে আজ সমবায়-কৃষির বিরুদ্ধে ভারতময় বিষ ছড়াচ্ছে। তাদের বিশ্বাস, সমবায়-কৃষি ভূমির রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ও সাম্যবাদের পথ উন্মুক্ত করে দেবে। সেই আশঙ্কায় শিহরিত শক্তিশালী কায়েমী স্বার্থ আজ সাধারণ কৃষককে সমবায়-খামার থেকে প্রতিনিবৃত্ত করছে। তারা কিন্তু কৃষকদের স্বার্থের কথা, ভারতের জাতীয় স্বার্থের কথা ভাবে না ; তারা ভাবে নিজের স্বার্থ, শ্রেণী-স্বার্থের কথা। যে কারণেই হোক, সমবায়-কৃষির পথে ভারতের অগ্রগতি আজ স্তিমিত হয়ে পড়েছে। সরকারও আজ কোন্ অদৃশ্য যাদুবলে দ্বিধা-দুর্বল। এই দ্বিধা-দুর্বল মুহূর্তে আজ বড় বেশি মনে পড়ে শ্রীনেহরুর সেই পরম আশ্বাসভরা বাণী, "I will have millions of revolutions in this country, rather than have millions of our peasantry living on the verge of starvation." আজ শ্রীনেহরুর কণ্ঠস্বরও চির-নীরব। সমবায়-কৃষির অগ্রগতিও আজ সন্দেহ-ক্লিষ্ট, দ্বিধান্বিত। তাহলে উপবাসই কি ভারতের লক্ষ-কোটি হতভাগ্য কৃষকের বিধিলিপি হবে ? ভারতের ভবিতব্যের কাছে এ আমাদের কাতর জিজ্ঞাসা।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- ভারতে কৃষি-সমবায়ের অগ্রগতি
- ভারতে সমবায় কৃষি-খামার
- ভারতীয় কৃষির পুনর্বিন্যাস তোমার মতে কিরূপ হওয়া উচিত ?

২২. প্রগতির পথে আসাম

Assam on Way to Progress.

প্রবন্ধ-সূত্র :—অবতরণিকা—সমস্যা-সঙ্কুল রাজ্য (Problem State) আসাম—জাগরণের সূত্রপাত—আসামের কৃষি-সম্পদ—আসামের আরণ্য সম্পদ—সম্ভাবনাময় অথচ অবহেলিত কুটির-শিল্প—কুটির-শিল্পের পুনর্জাগরণে সরকারী উদ্যোগ—আসামের বৃহৎ শিল্প: চা, পেট্রোলিয়াম, কয়লা—পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি—প্রথম পরিকল্পনা—দ্বিতীয় পরিকল্পনা—তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বছর—উপসংহার।

মাটি ও পাথরের সংমিশ্রণে রচিত ভারতের অঙ্গরাজ্য—আসাম। একদিকে তার কোমল মাটি, অন্যদিকে কঠোর পার্বত্য ভূমি। কোমলতা ও কঠোরতার সংমিশ্রণে এই রাজ্যের ভূ-প্রকৃতি গঠিত। তাই তার প্রকৃতির একদিকে শ্যামলতা, অন্যদিকে পার্বত্য কঠোরতা। প্রকৃতি এই রাজ্যের সন্তানদের জন্যে তার উদার দাক্ষিণ্য-ভরা হাত উজাড় করে দিয়েছে। প্রকৃতির সেই অবারিত দাক্ষিণ্য ছড়িয়ে আছে তার কৃষি-প্রান্তরে, তার খনিতে-খনিতে, তার অরণ্য-কান্তারে, এমনকি পর্বতের সানুদেশেও।

অবতরণিকা

তার কুটির-শিল্পের খ্যাতিও জগৎ-জোড়া। তবু আসাম ভারতের অনগ্রসরতম রাজ্য। তার সন্তানদের জীবনযাত্রার মান নিম্নতম। শিক্ষা, শিল্প ও সভ্যতার আধুনিকতম আলো এখনও তাদের ভাগ্যে জোটে নি। আবহমান কাল ধরে আসামের কৃষক লাঙল ঠেলেছে, ধরিত্রীর বুক চিরে ফলিয়েছে অফুরন্ত সোনার ফসল। আসামের কুটির-শিল্পীরা চরকা কেটেছে, তাঁত বুনেছে, তৈরী করেছে নানা সূক্ষ্ম কারুকাজময় পণ্য-সম্ভার। অন্যদিকে, প্রকৃতি মেতে উঠেছে তার নিষ্ঠুর খেলায়। তাই সর্বধ্বংসী ভূমিকম্প, প্রলয়ঙ্কর ঝড়, পাহাড়ী ধ্বস্, সর্বনাশা বন্যা—আসামের নিত্য-সঙ্গী। প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর আঘাতে তার দৈনন্দিন জীবনই শুধু নয়, তার অর্থনীতিও বারে-বারে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। কিন্তু অপরিমেয় প্রাণ-প্রাচুর্যের বলে সে পুনরায় তার অর্থনীতিকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। এইভাবে বারে-বারে তার অগ্রগতির ধারা ব্যাহত হয়েছে। তবু সে ভেঙে পড়ে নি।

কেবল প্রকৃতিই আসামের অগ্রগতিকে বিঘ্নিত করে নি, বিদেশী ইংরেজ সরকারও তার অগ্রগতির প্রতি ছিল নির্মমভাবে উদাসীন। তাদের মতে, আসাম একটি Problem State—সমস্যা-সঙ্কুল রাজ্য। স্বাধীন জাতীয় সরকারের দৃষ্টিতে, আসাম

এখনো তাই। বিদেশী সরকার আসামের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোনদিন আগ্রহ প্রকাশ করে নি। তবু নিজেদের স্বার্থে যেটুকু সে করেছে, প্রকৃতি নির্দয়ভাবে নিজের হাতে তা মুছে ফেলেছে। তাছাড়া আসামবাসীরা একান্তভাবে পরিবর্তন-বিমুখ। তারা এই বিংশ শতাব্দীর অপরাহ্নেও মান্ধাতার আমলের জীবন-ধারা, কৃষি ও শিল্প-প্রকরণ অনুশীলন করে চলেছে। কিন্তু ১৯৬২ সালে চৈনিক আক্রমণের ফলে আসামের দিকে সমগ্র ভারতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। নেফা-সমেত আসামের সাধারণ অনগ্রসরতা ও যোগাযোগ-ব্যস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে আমাদের নেফায় যে খেসারত দিতে হয়েছে, তার মূল্য নিতান্ত কম নয়। নেফা-বিপর্যয়ের পর স্বভাবতঃই আসামে উন্নয়নের জোয়ার এসেছে। এতদিনে সেখানে আজ নবজীবনের ঢেউ লেগেছে। আজ আসাম জাগছে, সহস্র যুগের তিমির-গুণ্ঠন অপসারিত করে আধুনিক জগতের উদ্ভাসিত আলোয় সে জাগছে।

সমস্যা-সঙ্কুল রাজ্য—আসাম

জাগরণের সূত্রপাত

কৃষিই আসামের অর্থনীতির মূল উৎস। প্রায় সাড়ে আটাত্তর হাজার বর্গমাইল এলাকা ও ১ কোটি ২২ লক্ষ লোকসংখ্যা নিয়ে আসাম রাজ্য গঠিত। এখনও তার মোট জনসংখ্যার ৭৪ শতাংশ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। নিম্ন-আসামের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু পূর্ববঙ্গেরই অনুরূপ। এই আর্দ্র, বর্ষণ-বহুল নিম্ন-আসাম কিংবা গিরি-উপত্যকা কৃষির পক্ষে সমধিক উপযোগী। ধান-উৎপাদনে কামরূপ শ্রেষ্ঠ। তাছাড়া শিবসাগর, গোয়ালপাড়া, লখিমপুর, দরঙ্গ ও নওগাঁতেও ধান উৎপন্ন হয়। নিচু জলাজমিতে হয় শালিধানের চাষ। অতি-বর্ষণে ফলে 'বাও' ধান, বসন্তকালে উচ্চ আসাম-অঞ্চলে ফলে 'আহু' ধান। ধানের দিক থেকে আসাম স্ব-নির্ভর। বর্ষাকালে আসামে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই অতি-বর্ষণ পাট-চাসের বিশেষ উপযোগী। পাট-উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ অঞ্চল পূর্ববঙ্গ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর এখন আসামই ভারতের প্রধান আশা-ভরসার স্থল। আসামে প্রতি বছর ৭৫৩,৫৪৫ গাঁইট পাট উৎপন্ন হয়। কিন্তু আসামে কোন চটকল নেই। কাঁচামাল হিসেবে আসামের পাট কলকাতা বা বোম্বাইতে অতি সস্তায় চালান হয়ে যায়। ধান ও পাট ছাড়া আসামের অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য হলো আখ, তামাক, আলু, তৈলবীজ, ডাল, কমলালেবু ও চা ইত্যাদি। আসামের কৃষিতে বৈজ্ঞানিক প্রকরণ প্রবর্তনের প্রচুর সুযোগ আছে। কিন্তু এতদিন সরকারী ঔদাসীন্যে এবং কৃষক-সমাজের পরিবর্তন-বিমুখতায় তা প্রবর্তিত হতে পারে নি। অথচ ট্রাক্টার ব্যবহার করে, উৎকৃষ্ট সার প্রয়োগ করে আসামের মাটি থেকে প্রচুর ফসল উৎপন্ন করা সম্ভব। সুখের বিষয়, আসাম সরকার কৃষি-উন্নয়নের প্রতি অধিক আগ্রহশীল। ১৯৬৩-৬৪ সালে ২ কোটি

আসামের কৃষি-সম্পদ

সাড়ে ৭৮ লক্ষ টাকা কৃষি-খাতে ব্যয়িত হয়েছে ; ১৯৬৪-৬৫ সালে ৩ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছিল। অনুমান, উক্ত আর্থিক বর্ষে এই খাতে ব্যয় বরাদ্দের অঙ্ক ছাড়িয়ে গেছে।

আসাম অরণ্য-সম্পদে সমৃদ্ধ একটি রাজ্য। আসামের অরণ্য-অঞ্চল যুগ যুগ ধরে সমগ্র ভারতকে দিয়ে এসেছে কত মূল্যবান সব কাঠ। কিন্তু পরিবহণগত অসুবিধের জন্যে আসামের আরণ্যক সম্পদ তার পুরোপুরি মূল্য পায় নি। আসামে রেলপথ বিস্তৃত হবার পর তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে বিদেশীরা। আসলে, আরণ্য সম্পদই আসামের চা ও পেট্রোলিয়াম আবিষ্করণে পথ প্রস্তুত করে দেয়। পশুপৃষ্ঠে, নদীস্রোতে এবং রেলপথে আসামের কাঠ বাহিত হয়ে বিদেশীদের ঘর সমৃদ্ধ করেছে। এখনও আসামের রাজস্বের একটা বড়ো অংশ আসে অরণ্য থেকে। এবং সেই আয়ের পরিমাণও ক্রমবর্ধমান। ১৯৬৩-৬৪ সালে ২ কোটি সাড়ে ১৭ লক্ষ টাকার স্থলে ১৯৬৪-৬৫ সালে ২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার রাজস্ব অরণ্য থেকে আসে। অরণ্যের পূর্ণ আশীর্বাদ পেতে হলে আসামবাসীদের সমবায় সূত্রে আবদ্ধ হতে হবে। এক্ষেত্রে সমবায়ের প্রচুর সম্ভাবনা আছে।

আসামের আরণ্য সম্পদ

আসামের কুটির-শিল্প ছিল বিশ্ববিশ্রুত, কিন্তু আজ তা 'স্মৃতির অতলে'। অথচ একদিন আসামের কুটির-শিল্পজাত দ্রব্য-সম্ভার বিশ্বের রুচিশীল জাতিগুলির মনোরঞ্জন করে ঘরে নিয়ে আসতো প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা। একদিন হর্ষবর্ধনের কাছে উপহাররূপে প্রেরিত আসামের সিল্কের শাড়ি চাঁদের আলো বলে বিভ্রম জাগিয়েছিল দর্শকদের মনে। সেই কুটির-শিল্প এতকাল সরকারী ঔদাসীন্যে বিকাশের সুযোগ লাভ করতে পারে নি। তবু সেই অবহেলা ও উপেক্ষা মাথায় নিয়ে এখনও আসামে ৫,০০,০০০ তাঁত সক্রিয় রয়েছে। তাতে ১২'৫ লক্ষ লোকের পূর্ণ বা আংশিক জীবিকার সংস্থান হয়। রঞ্জন-শিল্প আসামের একটি উৎকৃষ্ট শিল্প। কিন্তু সহানুভূতির অভাবে তা পাহাড়িয়া উপজাতীয়দের মধ্যে আজ সীমাবদ্ধ। তাছাড়া কাঠ, বাঁশ, বেত, মাটি ইত্যাদির তৈরী জিনিসপত্র প্রশংসার দাবী রাখে। গত যুদ্ধের সময় এগুলির চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় এই শিল্প বিকাশের যথেষ্ট সুযোগ পায়। কিন্তু যুদ্ধের অবসানে তারা কোনমতে রইলো টিকে।

সম্ভাবনাপূর্ণ অথচ অবহেলিত কুটির-শিল্প

স্বাধীনতা-লাভের পর রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার একযোগে আসামের জীবন্মৃত কুটির-শিল্পে প্রাণ সঞ্চারিত করবার কাজে হাত লাগিয়েছেন। কুটির-শিল্পে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের জন্যে সরকার বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশে উৎসাহী তরুণদের প্রেরণ করছেন। ক্ষুদ্র-শিল্পগুলিকে বিকশিত করে তোলার জন্যে অর্থ মঞ্জুর করা হচ্ছে উদার হাতে। গৌহাটিতে [illegible] হয়েছে সাবানের কারখানা। তাছাড়া সরকার গুটিপোকার চাষ ও বয়নশিল্পের

কুটির-শিল্পের পুনর্গঠনে সরকারী উদ্যোগ

উন্নয়নে মনোনিবেশ করেছেন। গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'বোয়াকাটা' বা বয়ন-সমবায় সমিতি। এই সমিতি সদস্য-শিল্পীদের হাতে তাদের উৎপন্ন পণ্যের ন্যায্যমূল্য পৌঁছিয়ে দেবার জন্যে ক্রয়-বিক্রয় বিপণীর ব্যবস্থা করেছে। সেই সঙ্গে আসাম অর্থ মঞ্জুর সংস্থা (Assam Financial Corporation) আসামের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার জন্যে সংগঠিত হয়েছে।

চা-শিল্পই আসামের অর্থনীতির মূল বনিয়াদ। ১৮২৩ সালে লোহিত উপত্যকায় এর আকস্মিক আত্মপ্রকাশ। তারপর সে আসামের অর্থনীতির সংগঠনে গ্রহণ করেছে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। প্রায় চার লক্ষ একর জমিতে সে প্রায় ৩২ কোটি পাউণ্ড চা উৎপাদন করে বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। চা-এর পর পেট্রোলিয়াম। পেট্রোলিয়াম উৎপাদনে আসামের ডিগবয় স্বাধীন ভারতের, বলা যায়, 'সবেধন নীলমণি'। ১৮৮৯ সালে ডিগবয়ে তৈল উত্তোলনের কাজ সুরু হয়। তারপর শিবসাগর অঞ্চলেও তৈলখনির সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ডিগবয়ে আসাম তৈল কোম্পানীর শোধনাগারের উৎপাদন ছিল সমগ্র ভারতের মোট প্রয়োজনের পাঁচ শতাংশের সামান্য বেশি। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ১৭·৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে গৌহাটির কাছে নুনমাটিতে ৭·৫ লক্ষ টন তৈল পরিশোধনক্ষম একটি পরিশোধনাগার স্থাপিত হয়েছে। আসামে প্রতি বৎসর সাড়ে তিন লক্ষ টন কয়লা উত্তোলিত হয়। গারো পাহাড়েও কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু পরিবহণের অনগ্রসরতা ও ত্রুটি-বাহুল্যের জন্যে কয়লা-শিল্পের বিকাশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। তাছাড়া চামড়া-শিল্প, দারু-শিল্প, পাত-গালা, তার্পিন শিল্পের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে।

আসামের বৃহৎ শিল্প : চা, পেট্রোলিয়াম, কয়লা

আসামের পরিবহণ ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সেই শোচনীয়তা প্রমাণিত হয়েছে ১৯৬২ সালের চৈনিক আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে। আসামের পরিবহণ ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নয়ন কয়েকটি প্রয়োজনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ: এক, রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিদ্রোহী নাগাদের বিদ্রোহ দমনের জন্যে ; দুই, বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার প্রয়োজনে ; তিন, জাতীয় সংহতির খাতিরে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির আদান-প্রদানের জন্যে। দেশবিভাগের পর আসাম ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কাজেই প্রায় ৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪২৫ মাইল মিটার-গেজের 'আসাম লিঙ্ক' রেলপথ প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু তাও এত দীর্ঘ এবং বর্ষাকালে এত বিপজ্জনক যে, তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য নয়। চতুর্থ পরিকল্পনায় ফরাক্কা বাঁধ নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে কলকাতার সঙ্গে আসামের যোগসূত্র সংশ্লেষিত এবং দৃঢ় হবে। কিন্তু রেলকর্তৃপক্ষ

পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি

কলকাতার চেয়ে দিল্লীর সঙ্গে আসামের দৃঢ় যোগসূত্র স্থাপনের পক্ষপাতী। কিন্তু চরম বিপদের মুহূর্তে কলকাতাই হবে আসামের নিকটতম সাহায্য প্রেরণের ঘাঁটি। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে উচ্চ আসাম ও নেফায় কয়েকটি সড়ক প্রস্তুত করা হয়েছে। সেগুলি উচ্চ আসামের অর্থনীতির বিকাশেরও সহায়ক হয়েছে।

ব্রিটিশ রাজত্বকালে আসামের উন্নতি হয়েছিল নামেমাত্র। যেটুকু উন্নতি হয়েছিল তাও শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থে। চা, পেট্রোলিয়াম প্রধানতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেছিল। আর যোগাযোগ বা পরিবহণ-ব্যবস্থার যে উন্নতি হয়েছিল তাও সেই মূল্যবান সামগ্রীগুলির শোষণেব জন্যে। তবু আসামবাসীরা সেই অভিশাপকে আশীর্বাদে রূপান্তরিত করে দেশেব অর্থনীতির সেবায় লাগিয়েছিল। আসামের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রকৃত যাত্রা-সুরু প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনাকাল থেকেই। প্রথম পরিকল্পনায় আসামের কৃষির ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল। সেই সঙ্গে দৃষ্টি ছিল পরিবহণ ও যোগাযোগ-ব্যবস্থাব উন্নতির দিকে। প্রথম পরিকল্পনা শিল্পায়নের বনিয়াদ রচনা করেছিল এইভাবে। মঙ্গলদই, শিলচব, গারোপাহাড, গোয়াল-পাড়া, গোলাঘাট ও মিকিরপাহাড় পরিকল্পনা সেদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিব পাশাপাশি শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া উচিত ছিল। তাই উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও শিল্পায়নেব অভাবে জীবনযাত্রার মান উন্নীত হয় নি। সমাজ উন্নয়নও প্রথম পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। কিন্তু দেশ থেকে অনাহার, অশিক্ষা, অকালমৃত্যু দূব করে শিল্প-বিজ্ঞানে উন্নত আসাম সংগঠিত হতে পারে নি।

প্রথম পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পরিকল্পনায়ও দ্রুত শিল্পায়নের দিকে নজর দেওয়া হয় নি। তবু উমক্রু হাইড্রো-ইলেকট্রিক পরিকল্পনা ১৯৫৭ সাল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সুরু করে সমগ্র জাতিকে বিস্মিত করে দিয়েছে। এই পরিকল্পনার রূপায়ণে ব্যয় হয়েছে ২·০৫ কোটি টাকা। কিন্তু কৃষি ও শিল্পের বিকাশ সমান্তরালভাবে সাধিত না হলে জাতির মুক্তি নেই। শিল্পবিকাশ অযথা বিলম্বিত হয়েছে বলেই আসামের এই অর্থনৈতিক দুর্গতি। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আসামের মোট ব্যয়-বরাদ্দ ২৯০ কোটি টাকার মধ্যে ৫০ কোটি টাকাই শ্রমিক-কল্যাণ ও গণস্বাস্থ্য উন্নয়নে ব্যয়িত হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা

তৃতীয় পরিকল্পনায় আসামের শিল্পায়নের দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে কৃষিতে প্রায় ৭·১৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, শিল্পে ব্যয়িত হয়েছে প্রায় ৩·৩৬ কোটি টাকা। কল্পিত ১৯৬৩-৬৪ সালে ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার স্থলে ১৯৬৪-৬৫ সালে ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে। সেই তুলনায়

শিল্পে ব্যয়িত হয়েছে কম। ১৯৬৩-৬৪ সালে সাড়ে ৯৫ লক্ষ টাকা এবং ১৯৬৪-৬৫ সালে ১ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা। শিল্পে আরও অধিক বিনিয়োগ প্রয়োজন। তৃতীয় পরিকল্পনায় সর্বাপেক্ষা অধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে শিক্ষাকে। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে প্রায় ২৬.৭৫ কোটি টাকা শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়েছে এবং স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-বিভাগে ব্যয়িত হয়েছে প্রায় ১২ কোটি টাকা। কেবলমাত্র ১৯৬৪-৬৫ সালেই শিক্ষাখাতে ব্যয়িত হয়েছে প্রায় ১২ কোটি টাকা, যা মোট ব্যয়-বরাদ্দের প্রায় এক পঞ্চমাংশ। তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্রহ্মপুত্র সেতু-বাঁধের উদ্বোধন আসামের অর্থনৈতিক ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এর দ্বারা দুর্বিনীত ব্রহ্মপুত্রের উচ্ছৃঙ্খল জলধারাকে শাসন করে কৃষি-উন্নয়নের কাজে ও শিল্পের প্রয়োজনে জল বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করা সম্ভব হয়েছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বছর

স্বাধীনতালাভের পর দেড় যুগ কেটে গেছে। এতদিনে আসামের অর্থনৈতিক অগ্রগতি যতখানি হওয়া উচিত ছিল, ততখানি সম্ভব হয় নি। তার কারণ, একদিকে প্রকৃতির বিরোধিতা, অন্যদিকে নানা রাজনৈতিক ঘূর্ণিবাত্যা। আসামের আভ্যন্তরীণ সমস্যা বহু। তা সত্ত্বেও বাহির থেকে তিন দিক থেকে সে সমস্যাগ্রস্ত। চীনের সঙ্গে সীমান্ত-বিরোধ, পাকিস্তানের চিরাচরিত আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ এবং নাগা-সমস্যা—সমস্যার এই ত্র্যহস্পর্শে আসামের অর্থনৈতিক প্রগতি বারেবারেই বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। অন্যদিকে, পাকিস্থানী অনুপ্রবেশ সর্বাপেক্ষা বেশি ঘটেছে আসামেই। তার ফলে গত দশ বৎসরে আসামের মুসলমান জনসংখ্যা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আসাম তাই এখনও সমস্যা-সঙ্কুল রাজ্য। তবে আসামের জাগরণ বাইরের দিক থেকে আসবে না, তার জাগরণ আসবে দেশের মধ্য থেকেই। তাই শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে সরকার বিচক্ষণতার স্বাক্ষর রেখেছেন। আসামের জাগরণ আসবে শিক্ষার মাধ্যমে আত্মশক্তির বিকাশের মধ্য দিয়ে। কবে হবে আসামের সেই আত্মশক্তির বিকাশ? সে আর কতো দেরি?

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- আসামের নবজাগরণ
- আসামের উন্নয়ন কোন্ পথে সম্ভব? কৃষিতে, না শিল্পে?
- সমস্যা-সঙ্কুল রাজ্য (Problem State)—আসাম
- অগ্রগতির পথে আসাম

২৩. পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক প্রগতি

Economic Progress of West Bengal.

প্রবন্ধ-সূত্র :—অবতরণিকা—সমস্যা-জর্জর রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ—পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-সমৃদ্ধির স্বপ্ন রচনা—কৃষি : নদী-পরিকল্পনাসমূহ : দামোদর উপত্যকা, ময়ূরাক্ষী, জলঢাকা, কংসাবতী ও ফরাক্কা বাঁধ—শক্তি সম্পদের উন্নয়ন—দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ—তৃতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি—ইস্পাতের স্বাক্ষর : পশ্চিমবঙ্গের রূঢ় দুর্গাপুর—দুর্গাপুরের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা—গবেষণা, মান-উন্নয়ন ও কর্মী প্রশিক্ষণ—উপসংহার।

অবতরণিকা

পশ্চিমবঙ্গই ভারতের সর্বাপেক্ষা সমস্যা-জর্জর রাজ্য। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল থেকে চলেছে তার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম। প্রকৃতি তার প্রতি অপ্রসন্ন, ইতিহাস-দেবতা তার প্রতি প্রতিকূল এবং স্বাধীনতা, যার জন্যে তার শতাব্দী-ব্যাপী অক্লান্ত সংগ্রাম, সেই স্বাধীনতাই তার প্রতি খড়্গহস্ত। স্বাধীনতার খড়্গ পশ্চিমবঙ্গের মতো এত নিষ্ঠুরভাবে অন্য কোন রাজ্যের ওপর পড়ে নি। ভারতের স্বাধীনতার জন্মভূমি বাংলাদেশ আজ স্বাধীনতার খড়্গাঘাতেই দ্বিধা-বিভক্ত। বাংলাদেশের মতো পাঞ্জাবও দ্বি-খণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে স্বেচ্ছাবৃত্ত লোক-বিনিময় এবং সম্পত্তি-বিনিময়ের মাধ্যমে সমস্যার একটা মোটামুটি সমাধান হয়ে গেছে। কিন্তু বাংলাদেশে তা হয় নি। লক্ষ-লক্ষ একর স্বর্ণপ্রসূ জমি পড়ে রইলো পাকিস্তানে, পড়ে রইলো কোটি-কোটি টাকার সম্পত্তি। রিক্ত হাতে দীনতম বেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে দাঁড়ালো পশ্চিমবঙ্গের দুয়ারে। দেশ-বিভাগ তার অর্থনীতিকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। তবু উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে সে তার ভাঙা অর্থনীতিতে জোড়াতালি দিয়ে তাকে গতিদান করবার চেষ্টা করে আসছে। স্বাধীনতালাভের এই দু' দশকের মধ্যেও হলো না তার সৌভাগ্যের সূর্যোদয়। তার সৌভাগ্যের সূর্যোদয় কোনদিন হবে কি?

তার দুর্ভাগ্যের অমারাত্রির সূচনা স্বাধীনতালাভের পর থেকে। কৃষি-সমৃদ্ধ পূর্ববঙ্গ তার অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অন্যদিকে, পূর্ববঙ্গ থেকে উচ্ছিন্ন বাস্তুহারার দল এসে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যাকে তুলেছে অতিরিক্তহারে বাড়িয়ে। পূর্ববঙ্গ থেকে লক্ষ-লক্ষ মানুষ এলো, এখনো প্রত্যহ আসছে হাজারে-হাজারে; অথচ তাদের জমি-জায়গা পড়ে রইলো পূর্ববঙ্গে। এদিকে, পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী-তীরের চটকলগুলি

দাঁড়িয়ে রইলো কর্মহীন হয়ে। তাদেরও রসদ রইলো পড়ে পূর্ববঙ্গে। তাদের চালু রাখবার জন্যে এবং ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা-সংকট দূর করবার জন্যে রপ্তানি-বাণিজ্য বাড়াতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে পাট ও চা চাষ সম্প্রসারিত করতে হয়েছে। ধান-চাষের হাজার-হাজার একর জমি চলে গেছে পাট-চাষে। দেশ-বিভাগের ফলে যে খাদ্য ঘাটতির সুরু, তা আরো বৃদ্ধি পেল ধানী-জমির পাট-জমিনে রূপান্তরিত হওয়ার জন্যে। অন্যদিকে, রাজস্বের বিশাল অংশ পূর্ববঙ্গের হাতে গিয়ে পড়লো আর পশ্চিমবঙ্গের ঘাড়ে চাপলো অতিরিক্ত লোক-সংখ্যার খাদ্য-সংস্থান, বাসস্থান, ও কর্ম-সংস্থানের দায়িত্ব। আবার ভাগ্যান্বেষণে পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যহ আসছে লক্ষ-লক্ষ বহিরাগতের দল। তারা একমুঠো খাদ্য সঙ্গে আনে না, বা এখানে উৎপাদন করে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গকে তাদেরও খাদ্য যোগাতে হয়। আর রয়েছে সমস্যা-জর্জর শহর কলকাতা। সারা ভারতের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের খাতিরে বাণিজ্য-নগরী কলকাতার অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু তার উন্নয়নের দায়-দায়িত্ব কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের স্কন্ধে। সেই সঙ্গে রয়েছে হাজার-হাজার মাইল বিস্তৃত সীমান্ত-রক্ষার দায়িত্ব। কেন্দ্রও আজ তার প্রতি বিমুখ। কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণগত দিক থেকে ১৯৫২-৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ ছিল দ্বিতীয়; ১৯৫৭-৫৮ সালে ছিল তৃতীয় এবং ১৯৬২-৬৩ সালে নবম। আর এক দিক দিয়েও কেন্দ্রীয়-বিমুখতা স্পষ্ট। ১৯৬২-৬৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিটি লোক-পিছু উড়িষ্যায় দিয়েছেন ১৩·৯ টাকা, আসামে দিয়েছেন ১৩ টাকা; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে দিয়েছেন ৫·৮ টাকা। ফলে, বিপুল করভার চেপেছে পশ্চিমবঙ্গবাসীদের মাথায়। স্বাধীনতালাভের সময় পশ্চিমবঙ্গের রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৩২ কোটি টাকা। বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ১৫২ কোটি টাকা। তবুও হয় না অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কর্মের সংস্থান। আরো দুশ্চিন্তার বিষয় হলো, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঘাড়ে ঝুলছে ৪১৭ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার পর্বত-প্রমাণ ঋণ। এইভাবে চারদিক থেকে সহস্র সমস্যা তার কণ্ঠরোধ করে আছে। এই সব দুরূহ সমস্যার গুরুভার নিয়ে সে অর্থ নৈতিক প্রগতির পথে যাত্রা করবে কি করে?

সমস্যা-জর্জর রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ

এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে বৈষয়িক অগ্রগতির পথে যাত্রা সুরু করা এক কঠিনতম কাজ। তবু পশ্চিমবঙ্গ অদৃষ্টের সেই নিষ্ঠুর পরিহাস মাথায় বহন করে এক বলিষ্ঠ ভবিষ্যৎ-রচনার কাজে হাত লাগিয়েছে। যুদ্ধোত্তর-কালীন ব্যাপক বেকার-সমস্যায় পশ্চিমবঙ্গের নাভিশ্বাস উঠেছিল। তারপর সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ইত্যাদি সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপের ফলে বহু শিল্পায়তন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে, বেকার-সমস্যা তীব্র উৎকট রূপ পরিগ্রহ করে। সেই অগণিত কর্মহীন জনতার কর্মসংস্থানের

আয়োজন সূচনাতেই করা দরকার। সেই জন্যে শিল্পায়নের দিকে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির অগ্রসরণ একান্তভাবে প্রয়োজন। পূর্ববঙ্গের কৃষি-প্রান্তর হাত-ছাড়া হয়ে গেছে, কিন্তু আছে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলের খনিজ সম্পদ। যা হাত-ছাড়া হয়ে গেছে, তার জন্যে অশ্রুমোচন না করে, যা হাতে আছে তাই দিয়েই কর্মযোজনা শুরু করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ তার দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করে শিল্প-সমৃদ্ধির স্বপ্ন রচনা করতে লাগলো। সেই সঙ্গে গ্রহণ করলো আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। তার চিত্তরঞ্জন, তার কল্যাণী, তার হরিণঘাটা, তার রাষ্ট্রীয় পরিবহণ—সর্বত্র নবযুগের স্বাক্ষর গভীরভাবে মুদ্রিত। কিন্তু এই বৃহদায়তন শিল্প-প্রকল্পগুলির রূপায়ণে তাকে ক্ষতির মাশুল কম দিতে হয় নি। এই প্রকল্পগুলিতে যে পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োজিত হয়েছে, সে পরিমাণ কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা হয় নি। অথচ ক্ষুদ্রায়তন ও মাঝারি আয়তনের শিল্পে সম-পরিমাণ পুঁজি-বিনিয়োজিত হলে বহুগুণ বেশি ব্যক্তির কর্ম-সংস্থান হতো। কাজেই পশ্চিমবঙ্গে জাপানের মতো ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে শিল্প-উপনিবেশ (Industrial Colony) গড়ে উঠলে তা ক্রমবর্ধমান বেকার-সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট সহায়ক হবে। কিন্তু পুঁজি কোথায়? পুঁজি সরবরাহের দায়িত্ব রয়েছে যে ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনের হাতে, তারও তো ভাণ্ডার শূন্য। সরকারের উচিত, ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনের হাতে উপযুক্ত পুঁজি তুলে দেওয়া। এদিকে, বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সমৃদ্ধির উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিয়ে গড়ে উঠছে হলদিয়া বন্দর। হলদিয়ার অবাধ বন্দরে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-বিকাশের রয়েছে সোচ্চার প্রতিশ্রুতি।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-সমৃদ্ধির স্বপ্ন-রচনা

দুর্ভাগ্যকে জয় করে তার ওপর সমৃদ্ধির ইমারত রচনা এক দুঃসাধ্য সাধনা। পশ্চিমবঙ্গ সেই সাধনাই করেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্প—এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় উভয়ের মধ্যে নিবিড় গাঁটছড়া বেঁধে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে সে যাত্রা করেছে। শিল্প-প্রগতির পথে যাত্রার প্রাক্কালে তাকে মনোযোগ সহকারে কৃষি-বিন্যাসের কথা চিন্তা করতে হয়েছে। কারণ তাকে তার বিশাল জনসংখ্যার মুখে ক্ষুধার অন্ন যোগাতে হবে, যোগাতে হবে কারখানার প্রয়োজনীয় রসদ। বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তার হাত থেকে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিকে রক্ষা করবার জন্যে প্রথম পরিকল্পনায় দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা ও ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা—দুটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যসূচীর রূপায়ণে বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষি প্রচুর পরিমাণে উপকৃত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের জলঢাকা নদী [illegible] এবং মেদিনীপুর জেলায় কংসাবতী প্রকল্পের কাজে হাত লাগানো হয়েছে।

কৃষি: নদী পরিকল্পনা সমূহ: দামোদর উপত্যকা

ময়ূরাক্ষী, জলঢাকা কংসাবতী ও ফরাক্কা বাঁধ

১৯৬৫-৬৬ সালের বাজেট-ভাষণে রাজ্যপাল ঘোষণা করেছেন, কংসাবতী জলধারা প্রকল্পের অগ্রগতিতে আগামী খরিফ মরশুমে ২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের সম্ভাবনা আছে। এদিকে কলকাতা বন্দরকে রক্ষা করবার জন্যে এবং নতুন নতুন শিল্প-সম্ভাবনাকে বিকশিত করে তোলার জন্যে ফরাক্কা বাঁধের কাজও চলেছে দ্রুত গতিতে এগিয়ে।

এই নদী-পরিকল্পনাসমূহ পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নে গ্রহণ করেছে নানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্যে এই নদী প্রকল্পগুলির ভূমিকা অনবদ্য। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনায় উৎপন্ন বিদ্যুৎ পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলগুলিকে আলোকিত এবং কর্মমুখর করে তুলেছে। বিশেষতঃ, দুর্গাপুর ও কলকাতার সন্নিহিত শিল্পাঞ্চলকে শক্তি সরবরাহ করেছে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা। জলঢাকা প্রকল্পের বিদ্যুৎ-শক্তি কল্যাণীর শিল্পায়তনগুলিকে সমৃদ্ধ করবে। কংসাবতী প্রকল্প মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলাকে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করবে।

শক্তি-সম্পদের উন্নয়ন

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ শিল্প-প্রগতির পথে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছে। দুর্গাপুর থার্মাল প্রোজেক্ট, দুর্গাপুর কোক-ওভেন্ প্রোজেক্ট, হরিণঘাটা ডেয়ারী ফার্ম, কংসাবতী প্রোজেক্ট, জলঢাকা প্রোজেক্ট এবং কল্যাণী স্পিনিং মিল— দ্বিতীয় পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের জন্যে মোট ১৫৮·২ কোটি টাকা বিনিযুক্ত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় ৩৪১ কোটি টাকা ব্যয়িত হবে বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোট ৩০১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছে; তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ১৫৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হয়েছেন এবং অবশিষ্ট ১৪৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করবার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গের ওপর। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনায় সামগ্রিক ব্যয় হবে ৩০৯ কোটি টাকা। ইতিমধ্যে চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া হাতে এসেছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় ৬১৮ কোটি টাকা ব্যয়িত হবে বলে স্থির হয়েছে। তার মধ্যে ১০১ কোটি টাকার ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছে বৃহত্তর কলকাতার রাজধানিক পরিকল্পনার রূপায়ণে। তাতে রয়েছে স্টেডিয়াম নির্মাণ, হাওড়ার দ্বিতীয় সেতু নির্মাণ ইত্যাদি নানা গুরুত্বপূর্ণ কার্যসূচী।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ

তৃতীয় পরিকল্পনায় অতি সঙ্গত কারণেই কৃষি ও শক্তি উৎপাদন-সম্পর্কিত কার্যসূচীকে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কৃষি-উৎপাদন-কার্যসূচীর রূপায়ণের মাধ্যমে খাদ্যশস্য ও শিল্প-সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদন-বৃদ্ধি সম্ভব হবে বলে আশা করা হয়েছিল। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় নি। বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদনের ওপরও গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। কারণ বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদনে শিল্প-সম্প্রসারণের

তৃতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি

গতি ত্বরান্বিত হবে। তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যয়-বরাদ্দের অধিকাংশই কৃষি, সেচ ও শক্তি-উৎপাদনে ব্যয়িত হয়েছে। গৃহ সংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কলকাতা নগরীর সংস্কার ও সম্প্রসারণের কার্যাবলীও তৃতীয় পরিকল্পনায় গুরুত্ব পেয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এ সব বিষয়ে, কোন লক্ষণীয় অগ্রগতি সাধিত হয় নি।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইস্পাতের স্বাক্ষর সবচেয়ে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়েছে দুর্গাপুরে। পশ্চিমবঙ্গের রূঢ় দুর্গাপুর। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে স্থাপিত ভারতের তিনটি ইস্পাত শিল্পোদ্যোগের মধ্যে দুর্গাপুরই সর্বাপেক্ষা নবীন। যদিও এর সূচনা হয়েছে সকলের শেষে, তথাপি এরই মধ্যে ব্রিটিশ ও ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের পরিকল্পিত এই শিল্পোদ্যোগ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি নিয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে দ্রুতগতিতে চলেছে এগিয়ে। দুর্গাপুর শিল্পোদ্যোগে একদিকে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর একদিকে তেমনি এখানকার উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর বিদেশে রপ্তানির পরিমাণও ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। বিশেষতঃ দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া এবং দূর প্রাচ্যের দেশগুলিতে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় তৈরী পণ্য-সম্ভারের বাজার ক্রমশঃ গড়ে উঠছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনাম আমদানি করছে এই কারখানায় তৈরী 'জয়েস্ট' আর 'চ্যানেল', সিংহল এবং নিউজিল্যাণ্ড রেলের জন্যে 'বিয়ারিং প্লেট', নেপাল ইস্পাতের 'বিলেট'। এ ছাড়া গ্রেট ব্রিটেন দুর্গাপুরে-তৈরী 'বেঞ্জিন' এবং 'ন্যাপথলিনে'র নিয়মিত ক্রেতা। জাপানেও দুর্গাপুরের 'ন্যাপথলিনে'র চাহিদা আছে। ১৯৬১-৬২ সালে দুর্গাপুর থেকে বিদেশে রপ্তানি হয়েছে ৯,৬৫৩ টন লৌহপিণ্ড, ৯,০৮২ টন 'বিলেট'। 'বেঞ্জিন' রপ্তানি হয়েছে ১৯৬১-৬২ সালে ৯৩৪ কিলোলিটার, ১৯৬২-৬৩ সালে ১০৬৪ কিলোলিটার এবং ১৯৬৩-৬৪ সালের প্রথম আট মাসে ৮৮১ কিলোলিটার।

ইস্পাতের স্বাক্ষর : পশ্চিমবঙ্গের রূঢ় দুর্গাপুর

ইতিমধ্যে দুর্গাপুরকে সম্প্রসারিত করবার জন্যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। সম্প্রসারণ পরিকল্পনার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো : এক, চতুর্থ কোক চুল্লী ও নতুন একটি সার্ভিস্ ব্যাঙ্কার স্থাপন এবং সম্প্রসারিত 'স্টক ইয়ার্ড' নির্মাণ ও উপজাত সামগ্রীর কারখানার সম্প্রসারণ, দুই, চতুর্থ 'ব্লাস্ট ফার্নেস' স্থাপন; তিন, আরও একটি 'ওপনহার্থ ফার্নেস', ছয়টি অতিরিক্ত 'সোকিং পিট' এবং একটি 'সিণ্টারিং' কারখানা স্থাপন; এবং চার, অক্সিজেন কারখানার সম্প্রসারণ। সম্প্রসারণ পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্যে ইতিমধ্যেই কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। দুর্গাপুরের বর্তমান কোক চুল্লীকে দ্বিগুণিত করার কাজ ১৯৬৫-৬৬ সালের শেষের দিকে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। তাছাড়া দুর্গাপুরে একটি রাসায়নিক সার কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে এবং এই

দুর্গাপুরের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা

কারখানাটি হবে এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম রাসায়নিক সারের কারখানা। এদিকে সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতায় একটি চশমার কাচের কারখানা স্থাপিত হয়েছে। তার সামগ্রিক রূপায়ণ বর্তমানে দ্রুত অগ্রগতির পথে।

আধুনিক উৎপাদন-পরিকল্পনায় পরিমাণগত উৎপাদন-বৃদ্ধিই একমাত্র লক্ষ্য নয়, গুণগত মান-উন্নয়নও চাই। দুর্গাপুর কর্তৃপক্ষ সে বিষয়ে সচেতন। বিভিন্ন কারখানায় কাজের বিভিন্ন স্তরে তাঁরা গবেষণা এবং উৎপাদনের মান নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক ব্যবস্থা করেছেন। উৎপাদনের উন্নত মান এবং অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে হলে একদিকে যেমন প্রয়োজন আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের ব্যাপক সংস্থান, তেমনি অন্যদিকে প্রয়োজন আধুনিক প্রয়োগবিদ্যায় অভিজ্ঞ সুদক্ষ কর্মী ও এঞ্জিনিয়ার। এঞ্জিনিয়ার ও কর্মীদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের জন্যে কর্তৃপক্ষ একটি সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে ৫৫০ জন গ্রাজুয়েট এঞ্জিনিয়ার বিদেশ থেকে শিক্ষালাভ করে এসেছেন। তাছাড়া, ১,১৪৪ জন দক্ষ কর্মীকে উন্নততর করণ-কৌশল সম্পর্কে শিক্ষা দান করা হয়েছে। দুর্গাপুরই পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র আশা-ভরসা।

গবেষণা, মান-উন্নয়ন ও কর্মী প্রশিক্ষণ

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টির খাদ্য, পরিচ্ছদ, বাসগৃহ, পানীয় জল, পরিবহণ ইত্যাদি এক দুরূহ সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। জনসমষ্টির শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান ইত্যাদির সুযোগ-সৃষ্টিও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অপরিহার্য দায়িত্ব। কিন্তু এই সব কার্যসূচীর রূপায়ণের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষমতার অতীত। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটেছে; কিন্তু তা ঘটেছে উঁচু সড়ক এবং রাজপথ ধরে। দরিদ্র জনসাধারণের নিচু গলিপথে পৌঁছে নি সেই অগ্রগতির স্বাক্ষর। এখনো সেই স্বাক্ষর পৌঁছাতে বহু-বিলম্ব। তাই এত কর-পীড়ন রাজস্ববৃদ্ধি ও ঋণ-গ্রহণ সত্ত্বেও যদি এই অভিশপ্ত রাজ্যের অধিবাসীদের এখনও অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কর্ম-সংস্থান ইত্যাদি মরণ-বাঁচনের প্রশ্নগুলির কোন সমাধান না হয়, তবে কেবল পরিকল্পনা-গুলির উত্তরোত্তর ব্যয়-বরাদ্দের অঙ্ক-বৃদ্ধির সংবাদে এ রাজ্যের জনসাধারণ কোন সান্ত্বনা পাবে কি? চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়াও তাই পশ্চিমবঙ্গবাসীদের মনে কোন আশার আলো জ্বেলে ধরতে পারে নি।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ
- শিল্পকেন্দ্র দুর্গাপুর, ক. বি. (ত্রৈবার্ষিক) '৬৪
- অগ্রগতির পথে পশ্চিমবঙ্গ

২৪. পশ্চিমবঙ্গের সরকারী ভাষা : বাংলা

State Language of West Bengal : Bengali.

প্রবন্ধ-সূত্র :—অবতরণিকা—গণতন্ত্র ও মাতৃ-ভাষা—রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী ও বাংলাভাষার সরকারী ভাষার মর্যাদালাভ—পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষা-বিতর্কের ঝড়—বাংলাভাষার যোগ্যতা ও পরিভাষা কোষ—ফারসী শব্দ—বাংলা ও সংস্কৃত শব্দ—ইংরেজি শব্দ ও ভাষাগত গোঁড়ামি—উপসংহার।

অবতরণিকা

মাতৃভাষার মাধ্যম ছাড়া জাতির ক্রমমুক্তি নেই। এতকাল আমরা বিদেশী ভাষার দাসত্ব গ্রহণ করেছিলাম। দেশের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মানুষ সেই ইংরেজি ভাষায় প্রবন্ধ লিখেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন, আইনের খসড়া রচনা করেছেন এবং ইংরেজি ভাষায় হৈ চৈ সুরু করেছেন। ইংরেজি ভাষার সেই দুর্বোধ্য সাইক্লোনে দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ সেই মুক্তি-যজ্ঞে জনসাধারণের আমন্ত্রণ ছিল না। যারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিরাট্ মানবগোষ্ঠী, তাদের ইংরেজি ভাষার কৃত্রিম একটা গণ্ডির বাইরে নির্বাসিত রেখে আমরা শিক্ষায়-দীক্ষায়, বিজ্ঞানে-ব্যবসায়ে, রাজনীতিতে-অর্থনীতিতে এক নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি। সেই চেষ্টার মধ্যে ছিল একটা দাস-সুলভ মনোভাব। বলা বাহুল্য, দেশের মাটির সঙ্গে, জলহাওয়ার সঙ্গে তার কোন যোগসূত্র ছিল না। দেশের আপামর জনসাধারণ তাতে অংশও গ্রহণ করতে পারে নি।

তারপর দেশ স্বাধীন হলো। জাতির অবরুদ্ধ আশা-আকাঙ্ক্ষার মুক্তি-লগ্ন হলো সমাগত। নব-জীবনের প্রভাতে আমাদের দ্বারে এসে দাঁড়ালো গণতন্ত্রের রথ, রচিত হলো গণ-দেবতার পূজার অর্ঘ্য। সেই অর্ঘ্য-রচনায় জনগণকেও হাত লাগাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। তা নইলে ব্যর্থ হবে গণতন্ত্রের এই আয়োজন।

গণতন্ত্র ও মাতৃভাষা

অর্থাৎ, শিক্ষায়-দীক্ষায়, বিজ্ঞানে-ব্যবসায়ে, রাজনীতিতে-অর্থনীতিতে মাতৃ-ভাষার চর্চা প্রয়োজন। কারণ, মাতৃ-ভাষার মাধ্যম ছাড়া জাতির ক্রমমুক্তি নেই। পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরা যাক্। বাংলা ভাষা পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের ভাষা। তাদের অধিকাংশই ইংরেজি বোঝে না, হিন্দীও বোঝে না। অথচ জোর করেই এতদিন তাদের ঘাড়ে ইংরেজি এবং হিন্দীর বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে; এবং তার ফলে তাদের ভাব-প্রকাশের জন্মগত অধিকারকে খর্ব করা হয়েছে। তাছাড়া, বাংলা ভাষা বর্তমান বিশ্বের সমৃদ্ধ ভাষাগুলির অন্যতম। তার সাহিত্য বিশ্ব-সভায় সম্মানিত। এই ভাষায় মধুসূদন,

বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যের দিক্‌পালগণ তাঁদের প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ উপচার দিয়ে নৈবেদ্য রচনা করে গিয়েছেন। এই ভাষাতেই এ যুগের কবি-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ মানবজাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপদান করেছেন।

তাই, ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধানিবেদনের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থারূপে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলা ভাষাকে সরকারী ভাষার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে জনগণের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। আসল কথা, তাঁরা জনগণের জাগ্রত ইচ্ছাকেই কার্যে রূপায়িত করেছেন। তারপর থেকে সমস্ত সরকারী কাজ বাংলা ভাষার মাধ্যমেই সম্পাদিত হবে, এই প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হয়েছে। সরকারী দপ্তরে-দপ্তরে বাংলা ভাষায় নামাঙ্কিত পরিচয়-ফলক স্থাপিত হয়েছে। অফিসারগণকে বাংলায় 'নোট' দিতে অনুরোধ করা হয়েছে। এবং মন্ত্রিগণও বাংলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা কার্য-নির্দেশনা দেবার প্রতিশ্রুতি রেখেছেন। এতদিন পরে বাংলা ভাষা যে বাঙালীর জীবনে সত্য হতে চলেছে, এ আশার কথা। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কাজে ও প্রয়োজনে বাংলা ভাষার ব্যবহার ক্রমবর্ধমান। ইংরেজিতে রচিত 'বিলে'র বাংলা রূপ আজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বিধান পরিষদে শোক-প্রস্তাব এবং বিভিন্ন ঘটনাও বাংলা ভাষায় শোনা যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালও ধন্যবাদ-প্রস্তাবের উত্তর বাংলা ভাষায় দিচ্ছেন। এই সমস্ত ঘটনা বাংলা ভাষার একটি নতুন শুভযাত্রার স্মরণীয় সূচনা।

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী ও বাংলা ভাষার সরকারী ভাষার মর্যাদালাভ

দীর্ঘদিন বাংলা ভাষায় পঠন-পাঠন সুরু হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার উত্তর রচনার ক্ষেত্রে ইংরেজি মাধ্যমের পাশাপাশি বাংলা মাধ্যমকে স্বীকার করে নিয়েছেন। জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুও দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন : মাতৃভাষাই শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত। কিন্তু সরকারী-কাযে বাংলা ভাষা তার যোগ্য সম্মান এতদিন পায় নি। অথচ পূর্ব-পাকিস্তানে আমরা কি দেখেছি? উর্দুকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে সেখানে জনগণের ক্রোধ প্রচণ্ড বিক্ষোভের আকারে ফেটে পড়লো : 'বাংলা ভাষার কণ্ঠরোধ করা চলবে না।' শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করা হলো। সেখানে উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষা তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। সেদিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ পশ্চাদ্বর্তী, একথা অস্বীকার করা যাবে না। সীমান্তের অপর পারে পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা ভাষায় শুধু নয়, বাংলা হরফে তার-বার্তা প্রেরণের যে ব্যবস্থা হয়েছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গবাসীদের মনে আনন্দ ও বিষাদ—দুই হবে। বাংলা ভাষার এই সাফল্যে বাংলা ভাষার শরিক হিসেবে তার মতো আনন্দিত আর কে হবে? কিন্তু বাংলা ভাষার তার-বার্তা প্রেরণ পশ্চিমবঙ্গে সম্ভব

পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা

হলেও বাংলা হরফে যে তাকে আমরা আজও সম্ভব করে তুলতে পারি নি, সে দুঃখ আমরা কোথায় রাখবো ? তার-বার্তা প্রেরণের ব্যাপাবে এখনো পশ্চিমবঙ্গের কাঁধে ইংরেজি চেপে বসে আছে। এ ব্যাপারে সীমান্তের ওপারে যা ঘটেছে, তা আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত।

বাংলা ভাষাকে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী ভাষা কবা হয়েছে বটে, কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে বহু বিতর্কেব ঝড উঠেছে। একদলের মতে, সরকারী ভাষা থেকে ইংরেজি ভাষার অপসারণে পশ্চিমবঙ্গ একটি উন্নত ভাষাব সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণ করলো। কিন্তু বিদেশী ভাষা ব্যবহার না করেও অনেক দেশও তো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। জাপানের শিল্প-সমৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য কবলেই তা প্রমাণিত হবে। তাছাড়া, বাংলা ভাষা ইংরেজির স্থলাভিষিক্ত হয়ে যে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করলো, তার পরিণাম ভয়াবহ। এর পর প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষা রাজ্যেব সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতি লাভ করবে এবং তার ফলে ভাষাগত গোঁডামি (Linguistic fanaticism) মাথা চাডা দিয়ে জেগে উঠবে, যা বহু ভাষা-ভাষী ভারতে সৃষ্টি করবে এক তীব্র, উৎকট ভাষা-সমস্যা এবং জাতীয় সংহতিকে পুডিয়ে ভস্মীভূত করবে। অন্য দলের মতে, বাংলা ভাষা রাজ্যেব সবকারী ভাষারূপে স্বীকৃত হলেও ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষণীয় বিষয়রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ভাষারূপে ইংরেজি তো থাকছেই। কাজেই, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চাদপসরণের প্রশ্নই ওঠে না। দ্বিতীয় যুক্তিটিও অনুরূপভাবে দুর্বল। জাতীয় সংহতিব মূলে যে ভারতেব সংস্কৃতিগত ঐক্য-চেতনা, তার উদ্বোধন মাতৃভাষার মাধ্যমেই সম্ভব হবে, কোন বিদেশী ভাষার মাধ্যমে নয। তাছাড়া, মাতৃ-ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা বা আনুগত্য ভাষাগত গোঁডামি নয়। তাকে ভাষাগত গোঁড়ামি বলাটাই অশ্রদ্ধেয় ; বরং একের ভাষা অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়াই ভাষাগত গোঁডামির বিকৃত প্রকাশ। আমাদের সেই গোঁড়ামির উগ্র আক্রমণ থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

বিতর্কের ঝড়

সত্য কথা, ইংরেজি দীর্ঘদিন শাসনকার্যে অধিষ্ঠিত ছিল। কাজেই, এখন বাংলা তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ায় সরকারী-কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কিছু অসুবিধা হবে। কিন্তু সেই অসুবিধার ভয়ে নতুনকে আহ্বান না করার যে ভীরুতা, তার কলঙ্কের হাত থেকে কি আমাদের মুক্তি নেই ? সরকারী-কার্যে ব্যবহৃত হবার যোগ্যতা বাংলা ভাষার আছে কিনা, সে বিষয়েও প্রশ্ন উঠেছে কোন কোন মহলে। কিন্তু সে প্রশ্নও অবান্তর। প্রথমতঃ, সরকারী-কার্যে ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দ বা শব্দগুচ্ছের উপযুক্ত প্রতিশব্দ সংগ্রহ করতে

বাংলা ভাষার যোগ্যতা ও পরিভাষা-কোষ

হবে। ফারসী ভাষা দীর্ঘকাল রাজভাষার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। এবং বহু ফারসী শব্দও বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। সেই দিক থেকে বহু ইংরেজি শব্দের ফারসী প্রতিশব্দ সংগ্রহ করা যেতে পারে। ওপরের তলায় ইংরেজি ভাষায় কাজ-কারবার চললেও দেশের পল্লী-অঞ্চলে এবং সমাজের নিচের তলায় কিন্তু 'সেই tradition সমানে চলেছে'। সেই সমস্ত ফারসী শব্দ বা ব্যবসায়-জগতে সুপ্রচলিত বাংলা শব্দকে সংগ্রহ করে উপযুক্ত পরিভাষা-কোষ প্রণয়ন করা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও কয়েকজন বিদ্বান ও ভাষা বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি পরিভাষা কমিটিও গঠন করেছেন। সেই পরিভাষা-কোষ সরকারী-কার্যে বাংলাভাষা ব্যবহারের পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করবে।

ফারসী শব্দ

পরিভাষা ব্যবহারের দিক থেকে গোঁড়ামি অবশ্যই পরিহার্য। দুঃখের বিষয়, সেই গোঁড়ামি পশ্চিমবঙ্গ পরিভাষা কমিটির আছে। বাংলা ভাষায় পরিভাষা গ্রন্থ প্রণয়ন করতে গিয়ে তাঁরা বহু অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ সংগ্রহ করেছেন কিংবা উপসর্গ ও প্রত্যয় যোগ করে বহু দুরূহ কিম্ভূতকিমাকার শব্দও গঠন করেছেন। সেক্ষেত্রে গোড়ায় গলদ রয়ে গেছে। সরকারী-কার্যে ব্যবহৃত ভাষা যে কেবলমাত্র শিক্ষিত তথা সংস্কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্যে নয়, আপামর জনসাধারণের জন্যে, সে কথা গোড়াতেই তাঁরা ভুলে গেছেন। তাছাড়া, সংস্কৃতকে ভিত্তি করে তাঁরা ভুলের পরিমাণকে তুলেছেন বাড়িয়ে। সংস্কৃত বর্তমানে অপ্রচলিত ভাষা। সে ভাষায় বর্তমানকালের জটিলতর শাসনকার্য চলে না। অবশ্য, একথায় আমরা সংস্কৃতের গৌরবময় ঐতিহ্যকে অস্বীকার করছি না। বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা থেকেই উদ্ভূত। তাই যেটুকু তার স্বভাবসুলভ ঐতিহ্য বহন করে সংস্কৃত থেকে এসেছে, সেটুকু অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু সংস্কৃত শব্দাতিশয্য বরদাস্ত করা ঠিক হবে না। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, জনসাধারণের ঘাড়ে তাঁদের মাতৃভাষার নামে অজস্র সংস্কৃত শব্দের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় হবে। তা যদি না হবে, তবে ইংরেজি ভাষা অপসারণ অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলা ও সংস্কৃত শব্দ

ফারসী ভাষার মতো ইংরেজিও বহুদিন শাসনকার্যে অধিষ্ঠিত থাকায় বহু ইংরেজি শব্দ জনসাধারণের কাছে অতি পরিচিত হয়ে আছে। আত্যন্তিক গোঁড়ামি-বশে তাদের অপসারিত করে দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করলে একদিকে ভাষাবিজ্ঞানের প্রতি, অন্যদিকে জনসাধারণের প্রতি অবিচার করা হবে। 'পুলিশ' কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ যদি 'নগরপাল' করা হয়, তবে গোঁড়ামি বশে পরিভাষাকে দুর্বোধ্য করে তোলা হবে। আসল কথা, জনসাধারণের কাছে অতি-পরিচিত ইংরেজি শব্দকেও প্রয়োজনবোধে

ইংরেজি শব্দ ও ভাষাগত গোঁড়ামি

গ্রহণ করতে হবে। তাতে বাংলা ভাষার একদিকে যেমন গৌরব বৃদ্ধি হবে, অন্যদিকে তেমনি সমৃদ্ধি সূচিত হবে।

এইভাবে ধীরে ধীরে বাংলা ভাষাও সরকারী-কার্যে তার প্রকাশযোগ্যতা প্রমাণিত করতে পারবে। বাংলা ভাষার এই প্রকাশযোগ্যতা নিয়ে আর একবার বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অন্তর্ভুক্ত হতে পারে কিনা—এই প্রশ্নে বাঙ্গালী মনীষা সেদিন দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষার পক্ষসমর্থনে সেই বিতর্কের অবসান ঘটেছিল। আজও সরকারী-কার্যে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হওয়ার প্রাক্কালে যখন নানা বিরুদ্ধ সমালোচনার ঝড় উঠচে, তখন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, জগতের এমন কোন ভাব নেই, এমন কোন চিন্তা নেই, যা বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না। অতএব

উপসংহার

> "বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা—
> সত্য হউক, সত্য হউক সত্য হউক, হে ভগবান!"

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- দরবারী ভাষা হিসাবে বাংলার আবশ্যকতা, ক. বি. '৫২
- সরকারী ভাষারূপে বাংলা

২৫. ভারতে শ্রমিক সংঘ আন্দোলন
Trade Union Movement in India.

প্রবন্ধ-সূত্র :—অবতরণিকা—শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের জন্ম ইতিহাস—ভারতে শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের সূচনাপর্ব—বিকাশ-পর্ব—বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব—প্রাক্-স্বাধীনতাকালীন শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের সমীক্ষা—শ্রমিক সংঘের সংখ্যাবাহুল্য ও পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা—পারস্পরিক সংঘাত দূরীকরণের শুভ প্রয়াস—জাতীয় সংকট ও Industrial Truce Resolution—উপসংহার।

অবতরণিকা

উৎপাদনের চতুরাঙ্গিক উপকরণের মধ্যে শ্রমই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। অথচ উৎপাদনের এই দিকটি চিরকাল নির্মমভাবে উপেক্ষিত। উৎপাদনের যে বিশাল কর্মোদ্যোগ বিশ্বময় চলেছে, শ্রমিক-সাধারণই তার পুরোহিত। তারাই তাদের শক্ত মুঠিতে কলের চাকা ঘোরায়, মাংসপেশীর জোরে যন্ত্র-দানবের বুক চিরে তারাই উৎপন্ন করে সমাজের প্রয়োজনীয় পণ্যসম্ভার। তাদের পরিশ্রমের জোরে শিল্পপতির মুনাফার অঙ্ক ফুলে ফেঁপে ওঠে। যুগ-যুগ ধরে তারাই সমাজের উৎপাদনের কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। সমাজ-রথের রশি তাদেরই হাতে। কিন্তু তাদের অন্ন-বস্ত্র-বাসগৃহের সংকট কোনকালে ঘোচেনি। জীবনধারণের যেটুকু সামান্যতম প্রয়োজন, তা কোনকালেই তাদের ভাগ্যে জোটেনি। এমন কি, জীবিকার নিরাপত্তাও তাদের নেই। বিশ্বের শ্রমিক-সমাজের এই হলো শাশ্বত জীবন-কাহিনী। এই দুঃখক্লিষ্ট, বেদনাময় অবস্থার হাত থেকে কি তাদের মুক্তি নেই? সেই মুক্তির বাণী বহন করে নিয়ে এসেছে শ্রমিক সংঘ আন্দোলন।

শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের জন্ম ইতিহাস

ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় কিছু-সংখ্যক লোকের কর্মস্থান হয়, কিছু-সংখ্যক সব সময় বেকার থাকে। যাদের কর্মসংস্থান হয়, তারা ধনপতি-গোষ্ঠীর নিদারুণ অবহেলায় পশুর মতো জীবনযাপনে বাধ্য হয়। শিল্পপতি শ্রেণী সেই শ্রমিক-সাধারণের মানসিক অনগ্রসরতার দিকে ফিরেও তাকায় না। তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসগৃহ ইত্যাদি সম্পর্কে নিষ্করুণ ঔদাসীন্যে তাদের জীবনীশক্তি তিলে-তিলে নিঃশেষিত হয়ে এলো। শ্রমিক-জীবনের সেই নিদারুণ অবস্থা-দৈন্যের মধ্যে এলো সংঘশক্তির অমূল্য উপলব্ধি। তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতিষ্ঠাকল্পে মালিক-শ্রেণীর নির্লজ্জ অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিক-শ্রেণীর সাধারণ

স্বার্থে তারা সম্মিলিত হলো শ্রমিক সংঘের পতাকামূলে। মালিক শ্রেণীকে সেই সংঘশক্তির সম্মুখে নেমে আসতে হলো, স্বীকার করতে হলো তাদের মৌলিক দাবিগুলিকে। নিখিল বিশ্বে সমস্বরে সেই সংঘশক্তির জয়ধ্বনি বিঘোষিত হলো—

"জয় নিপীড়িত জনগণ জয়, জয় নব উত্থান।"

ধনপতি-শ্রেণীর নির্লজ্জ শোষণেব প্রতিবোধে শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের সূত্রপাত।

বর্তমানে ভারতের শ্রমিক-সাধারণের অবস্থার যে উন্নতি হযেছে, তা সম্ভব হয়েছে শ্রমিক সংঘ আন্দোলনেরই শুভ পরিণামে। ভারতের শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের এই সাফল্য আসতে যুগ যুগ কেটে গেছে। ১৮৯০ সাল। বোম্বাই-এব শিল্প-শ্রমিকেরা গঠন কবে 'বোম্বে মিল হ্যাণ্ডস্ এসোসিয়েশন'। ভাবতের শ্রমিক-স্বার্থ প্রতিষ্ঠাকল্পে এটিই হলো প্রাথমিক প্রয়াস। তাবপর ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিতে জাতীয় স্বার্থে শ্রমিক সমাজ সংঘবদ্ধ হয়। শ্রমিক-স্বার্থের চেয়ে সেদিন জাতীয় স্বার্থ-প্রতিষ্ঠাব আকাঙ্ক্ষাই ছিল প্রবলতর। ১৯০৮ সালে যখন লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের কাবাদণ্ডের আদেশ হলো, তখন তার তীব্র প্রতিবাদে বোম্বাই-এর শ্রমিকেরা প্রচণ্ড বিক্ষোভে যেন ফেটে পডলো। প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনায় এই আন্দোলন সাম্রাজ্যিক স্বার্থের খাতিরে সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়। তারপর যুদ্ধোত্তব মুদ্রাস্ফীতি, রুশ-বিপ্লব, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘেব প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনা ভারতের শ্রমিক সংঘ আন্দোলনে প্রেবণা যোগায়। এলো রাউলাট বিল, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। বিক্ষুব্ধ হযে উঠলো ভারতের শ্রমিক-সমাজ। আব দেরী নয়—এবার ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো সর্ব-ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। এই শ্রমিক সংঘ ভারতের শ্রমিক-সমাজের সম্মুখে বাখলো নতুন পথের নিশানা। তার প্রদর্শিত পথেই পরবর্তীকালে ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের জয়যাত্রা শুরু। অচিরেই সারা ভারতে বহু শ্রমিক সংঘ গডে উঠলো। এই আন্দোলনকে একটা কেন্দ্রীয় সুসংহত রূপদানেব জন্যে ১৯২২ সালে বোম্বাই এ প্রতিষ্ঠিত হয় 'কেন্দ্রীয শ্রমিক বোর্ড'। ঐ বছরেই বাংলা দেশে 'ট্রেড ইউনিয়ন ফেডাবেশন' ও 'সর্ব ভারতীয় রেলকর্মী ফেডারেশন' গড়ে ওঠে। তার অল্পকালের মধ্যেই কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে 'ডাক ও তার কর্মচারী সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতেব শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের সে হলো সূচনা-পর্ব।

ভারতে শ্রমিক সংঘ আন্দোলনেব সূচনা-পর্ব

শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের সেই সূচনা-লগ্নে তদানীন্তন সরকার তার প্রতি কেবল যে হৃদয়হীন ছিল, তাই নয়; তার কণ্ঠরোধ করবার জন্যে সকল চেষ্টাই সে করেছে। বিজাতীয় সরকার শিল্পপতি-গোষ্ঠীর স্বার্থের দিকে চেয়ে শ্রমিক সংঘগুলিকে স্বীকৃতি দান করে নি। অন্যদিকে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শ্রমিক সংঘের সংগ্রামের

প্রতিক্রিয়ায় ক্ষমতামদমত্ত শিল্পপতি-শ্রেণী আন্দোলনে যুক্ত শ্রমিকদের কর্মচ্যুতি ও শাস্তি-দানের জন্যে খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে। সরকারও শিল্পপতিদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। ফলে প্রবল প্রতিবাদে শ্রমিক সংঘ আন্দোলন প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সংঘবদ্ধ শ্রমিক-সমাজের দাবীতে সরকার ১৯২৬ সালে ভারতীয় শ্রমিক সংঘ আইন রচনায় বাধ্য হন। শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের ইতিহাসে এই আইনটি স্বমহিমায় স্মরণীয় হয়ে আছে।

বিকাশ-পর্ব

এতদিন, ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি গভীর আগ্রহের সঙ্গে আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি এবং সরকারের ভূমিকাকে লক্ষ্য করছিল। শ্রমিক সংঘ আইনসিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা এই আন্দোলনের সম্প্রসারণে গ্রহণ করলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বিশেষতঃ, ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক সংঘ আন্দোলন যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয়। তারপর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল এই আন্দোলনের বিকাশ ও সম্প্রসারণে কাঁধ লাগালেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে প্রকটিত হয়ে উঠলো নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া। রাজনৈতিক মতভেদের জন্যে শ্রমিক সংঘ আন্দোলনে নানা ফাটল দেখা দিল। ফলে, ব্যাহত হলো আন্দোলনের দুর্বার গতি। ১৯৩৮ সালে বিভিন্ন শ্রমিক সংঘের সম্মিলিত সমাবেশে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তার কিছুকালের মধ্যেই স্বর্গীয় মানবেন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে ভারতীয় শ্রমিক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, আচার্য কৃপালনী, গুলজারীলাল নন্দ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গড়ে তোলেন জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। বর্তমান ভারতে সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, হিন্দ্ মজদুর সভা ও সম্মিলিত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস—এই চারটি শ্রমিক সংঘই সক্রিয় সংঘগুলির অন্যতম।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব

স্বাধীনতা-লাভের পূর্বে মালিক ও শ্রমিক-সমাজের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও শুভেচ্ছাপূর্ণ পরিবেশ রচনায় যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ঘটে, তাদের মধ্যে পরিচালন-ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ (Labour Participation in Management), শিল্পে শৃঙ্খলা আইন (Code of Discipline in Industry) এবং দক্ষতা ও কল্যাণ বিধি (Code of Efficiency and Welfare) অন্যতম। পারস্পরিক সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা স্থাপনে এই ঘটনাগুলি সফল হলেও মালিক ও শ্রমিক পক্ষের আন্তরিকতার অভাবে মূলতঃ ওগুলির ব্যর্থতাই সূচিত হয়। সেই অবাঞ্ছিত পরিবেশের আমূল

প্রাক-স্বাধীনতাকালীন শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের সমীক্ষা

পরিবর্তন সাধনের জন্যে প্রয়োজন ছিল একটি শক্তিশালী, সুসংহত, আত্মনির্ভর শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের দ্রুত অগ্রগতি সত্বেও এই আন্দোলন, বলা যায়, এখনো শৈশবাবস্থা অতিক্রম করতে পারে নি। ভারতের শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ত্রুটিই হলো, শ্রমিক সংঘগুলির সংখ্যা-বাহুল্য ও পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। একই শিল্পায়তনের শ্রমিকেরা বহু বিবদমান ও প্রতিদ্বন্দ্বী সংঘের সদস্য। যে শ্রমিক-ঐক্য শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের মূল-মন্ত্র, তা থেকে এই বিচ্যুতি সমগ্র আন্দোলনকে দুর্বল করে দিয়েছে। শ্রমিক সংঘের এই সংখ্যা-বাহুল্য ও পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূলে আছে কতকগুলি কারণ। সেগুলি হলো: এক, শ্রমিক-সমাজের মধ্য থেকে সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে বহিরাগত নেতৃত্বের প্রাধান্য। দুই, ভারতে শ্রমিক সংঘ আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনেরই অংশ, একথা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু স্বাধীনতা-লাভের পর রাজনৈতিক দলগুলির বিচ্ছিন্নতার ফলে শ্রমিক সংঘের নেতৃত্ব ও সংগঠনে এসেছে অনিবার্য বিচ্ছিন্নতা। তিন, ত্রুটিপূর্ণ শ্রমিক সংঘ এই আন্দোলনকে বহুধা-বিভক্ত হতে সাহায্য করেছে। চার, শ্রমিক সংঘগুলিকে দুর্বল করে তোলার জন্যে সুচতুর মালিকেরা প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রমিক সংঘ গঠনে উস্কানি ও উৎসাহ দিয়ে থাকে। বর্তমানে শ্রমিক সংঘ আন্দোলনে বহিরাগত নেতৃত্বের অবসানকল্পে সরকার আইন রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। কিন্তু বিভিন্ন মহলে তার প্রতিক্রিয়া সুরু হয়ে গেছে।

শ্রমিক সংঘের সংখ্যা-বাহুল্য ও পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা

ফলে যা হবার তাই হয়েছে। দায়িত্বশীল মহলের অভিমত হলো—"The energy that should have gone up to build up the strength and solidarity of workers' organisations has been dissipated in internecine quarrels."

সম্প্রতি শ্রমিক সংঘগুলির পারস্পরিক সংঘাত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দূর করবার জন্যে শুভ প্রয়াস পরিলক্ষিত হচ্ছে। ১৯৫৮ সালের মে মাসে প্রধান চারটি শ্রমিক সংঘের প্রতিনিধি দল পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি সাধনের জন্যে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাতে স্বীকৃত হয় যে, কোন শ্রমিক স্বেচ্ছায় একটি মাত্র শ্রমিক সংঘে যোগদান করতে পারে। শ্রমিক সংঘগুলি কার্যধারায় ও নির্বাচনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করবে। অজ্ঞতা ও অনগ্রসরতার জন্যে কোন শ্রমিক যেন কোন শ্রমিক সংঘ কর্তৃক শোষিত না হয়। শ্রমিক সংঘগুলির পারস্পরিক আচরণে যেন হিংসা, বলপ্রয়োগ, ভীতি-প্রদর্শন, ব্যক্তিগত কুৎসা-রটনা ইত্যাদি নিষিদ্ধ হয়।

পারস্পরিক সংঘাত দূরীকরণে শুভ প্রয়াস

১৯৬২ সালের অন্তিমকালে জাতীয় সংকট বিঘোষিত হওয়ায় শিল্পক্ষেত্রে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের উন্নতিকল্পে সরকার পক্ষ থেকে শুভ প্রয়াস সূচিত হয়। রাষ্ট্রপতির ঘোষণা অনুসারে সকল ধর্মঘট, কর্মবিরতি ইত্যাদি যেমন নিষিদ্ধ হয়, তেমনি শ্রমিক সংঘগুলি তাদের সম্মিলিত ঘোষণায় সমরকালীন উৎপাদন-গতিকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রতিশ্রুতি দান করে। সে ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল মূল্য-রেখাকে অবিচলিত রাখা। জাতীয় সংকট বা জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মালিক, শ্রমিক ও সরকার—এই ত্রি-পাক্ষিক বৈঠকে (৩রা নভেম্বর, ১৯৬২) সাময়িক আন্দোলন-বিরতি সংকল্প (Industrial Truce Resolution) স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু মূল্য-রেখাকে অবিচল রাখার সরকারী অসামর্থ্যের ফলে শ্রমিক সংঘের পক্ষে সর্বত্র এই সংকল্পের মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। গগনচুম্বী মূল্যরেখার প্রক্রিয়ায় কয়েক ক্ষেত্রে শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা দেয়। কিন্তু শ্রমমন্ত্রী সমীপে অন্ততঃ একটা টেলিগ্রাফিক্ নোটিশ না দিয়ে কোথাও কর্ম-বিরতি ঘোষিত হয় নি। এবং তাতে প্রায় মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্বের ৮০ শতাংশের মীমাংসা সম্ভব হয়েছে।

জাতীয় সংকট ও Industrial Truce Resolution, 1962

এই আঘাত, সংঘাত ও অন্তর্কলহের বিষময় পরিণামে ভারতে শ্রমিক সংঘ আন্দোলন এক নিদারুণ অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলেছে। মালিক পক্ষের হৃদয়হীন মনোভাব, সরকারের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মালিকপক্ষ সমর্থন এবং শ্রমিক সংঘগুলির অন্তর্কলহ—এই বিরুদ্ধ শক্তির ত্র্যহস্পর্শে ভারতে শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের অগ্রগতি আজ বিপর্যস্ত। নানা বিপর্যয়ের রাহু আজ এই আন্দোলনকে গ্রাস করেছে। ভারতের মতো পৃথিবীর অন্য কোন দেশে শ্রমিক সংঘ আন্দোলন এত দুর্বল, এত বহুধা-বিভক্ত নয়। কবে ভারতের শ্রমিক সংঘ আন্দোলন এই রাহুমুক্ত হবে? বহিরাগত নেতৃত্বের যতদিন অবসান না হয়, ততদিন তার রাহুমুক্তি নেই। সেই মেহনতী শ্রমিক-সমাজের মধ্য থেকে সুযোগ্য নেতৃত্বের আবির্ভাব চাই। কিন্তু সেই আবির্ভাব কবে হবে?

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- ভারতের শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের ভবিষ্যৎ
- ভারতের শ্রমিক বিক্ষোভ ও তাহার মীমাংসা প্রয়াস
- ভারতের ধনিক-শ্রমিক সম্পর্ক
- ধনিক-শ্রমিক বিরোধ সমস্যা, ক. বি. (ত্রৈবার্ষিক) '৬৩

২৬. ভারতে সমবায় আন্দোলন
Co-operative Movement in India.

প্রবন্ধ-সূত্র :— অবতরণিকা—সমবায়ের মৌল নীতি—সমবায় সমিতির গোড়ার কথা : রাইফিজেন্—ভারতে সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত—সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতির ইতিহাস—সমবায় পরিকল্পনা কমিটি—উপদেষ্টা কমিটি—জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত ও সমবায় আন্দোলন—তৃতীয় পরিকল্পনা ও সমবায় আন্দোলন—সমবায় কৃষি—মিশ্র অর্থনীতি ও সমবায় এবং চতুর্থ পরিকল্পনা—অগ্রগতির সমীক্ষা—উপসংহার।

"If Co operative fails, then will fail the best hope of rural India."

—Royal Commission of Agriculture, 1926

অবতরণিকা

গ্রাম-ভারতের দারিদ্র্য-বিজয় ও শোষণ-মুক্তির বাণী বহন করে সমবায় আন্দোলনের আবির্ভাব। আবহমান কাল ধরে গ্রাম-ভারতের লক্ষ-কোটি মানুষ কায়েমী স্বার্থের নিষ্ঠুর শোষণে শোষিত হয়ে এসেছে। তাদের অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে সেই স্বার্থান্ধ শ্রেণী যুগ যুগ ধরে বিস্তার করে এসেছে শোষণের কুটিল জাল। কালের চক্র আবর্তিত হয়েছে, কিন্তু সেই ভাগ্যহত অসহায় মূক নরনারীদের অবস্থার কোন পরিবর্তন সূচিত হয় নি। তাদের দারিদ্র্য-মুক্তির শুভ শঙ্খধ্বনি শোনা যায় নি, শোনা যায় নি শোষণ-মুক্তির উদাত্ত উচ্চারণ। উনিশ শতকের অন্তিম মুহূর্তে ও বিংশ শতাব্দীর সূচনা-লগ্নে ভারতে শোনা গেল সেই পরম আশ্বাসের বাণী, সূচিত হলো সমবায় আন্দোলনের জয়যাত্রা।

সমবায়ের মৌল নীতি

সমবায়ের নীতির মধ্যে রয়েছে স্ব-নির্ভরতা, পারস্পরিক সহযোগিতা, সমস্বার্থে সংঘবদ্ধতা, স্বেচ্ছাধীনতা ও আত্ম-প্রত্যয়ের মূল-মন্ত্র। কাজেই সমবায় আন্দোলনের সংগঠন ও সম্প্রসারণের মৌল দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে জনসাধারণের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কর্মোদ্যোগের ওপর। বস্তুতপক্ষে, মানব-সভ্যতার বিকাশ ও মানব-সমাজের চরম সমুন্নতির মূলে রয়েছে সহযোগিতা ও সংঘশক্তির অমূল্য অবদান। সমবায় সেই সহযোগিতা ও সংঘশক্তিরই আধুনিক রূপায়ণ।

সমবায়-নীতির আদি জন্মভূমি জার্মানী। সেখানেও কৃষকেরা মহাজন-শ্রেণী কর্তৃক নির্মমভাবে শোষিত হয়েছে দীর্ঘকাল। গ্রামাঞ্চলের কৃষক-সমাজের অবর্ণনীয়

দুঃখ-দারিদ্র্যের মূলে রয়েছে স্বল্প সুদে সহজলভ্য ঋণের অভাব এবং অভাবের দরুন মহাজনদের কাছে তাদের উচ্চহার সুদে চির-ঋণগ্রস্ততা। গ্রামীণ সমাজের এই চিরায়ত দারিদ্র্য ও শোষণের নিরসনকল্পে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে দরদী সমাজ-সংস্কারক রাইফিজেন্ সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে সেই মনীষীর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সমবায় সমিতির গোড়ার কথা : রাইফিজেন্

এবার ভারতবর্ষের কথায় আসা যাক। গ্রাম-ভারতের কৃষক সমাজের দুঃখ-দারিদ্র্য চিরন্তন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর অন্তিমকালে ভারতের কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা চরমে ওঠে। মহাজন-শ্রেণীর উচ্চহার সুদের দায়ে সেদিন গ্রাম-ভারতের নাভিশ্বাস উঠেছিল। সেই হৃদয়হীন, নগ্ন শোষণে কৃষক-সমাজ দ্রুতগতিতে চলেছিল নিশ্চিত ধ্বংসের পথে। ভগবানকে ধন্যবাদ, বিদেশী সরকার কৃষক-সমাজকে সেই নিদারুণ ঋণের নাগপাশ থেকে মুক্ত করবার জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন। বিদেশী সরকার সিভিলিয়ান ফ্রেডারিককে রাইফিজেন্ সমিতির কর্মপদ্ধতির তথ্য-সংগ্রহের জন্যে জার্মানীতে প্রেরণ করেন। ১৮৯৫ সালে তিনি জার্মানী থেকে ফিরে এসে রাইফিজেন্ সমিতির অনুসরণে এদেশের দরিদ্র ও ঋণভারে জর্জরিত কৃষক-সমাজকে স্বল্পহার সুদে ঋণদানের জন্য জমিবন্ধকী ও কৃষি ঋণদান ব্যাঙ্ক স্থাপনের সুপারিশ করেন। সেই সময়োপযোগী মূল্যবান সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯০৪ সালের সমবায় ঋণদান সমিতি আইন বিধিবদ্ধ হলো।

ভারতে সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত

গ্রাম-ভারতের কৃষক, কারিগর ও স্বল্প উপাজনশীল ব্যক্তিদের মধ্যে মিতব্যয়িতা, স্ব-নির্ভরতা ও সমবায় শক্তির সুফল উপলব্ধির সম্প্রসারণই ছিল এই আইনের মৌল উদ্দেশ্য। ধীরে ধীরে ভারতের জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত হলো সেই উপলব্ধি; সেই উপলব্ধি ভারতের দিকে দিকে সম্প্রসারিত করে দিল দারিদ্র্য-বিজয় ও শোষণ-মুক্তির অভিযান। ধীরে ধীরে সমবায় সমিতির কার্যক্ষেত্রও সম্প্রসারিত হলো। দারিদ্র্য-বিজয় ও শোষণ-মুক্তিতে সমবায় সমিতির সাফল্যে স্বাস্থ্য, বীমা, শিক্ষা, পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, পল্লী উন্নয়ন, বীজধান ঋণ প্রদান ও জলসেচের ব্যবস্থা ইত্যাদি দায়িত্বভারও তার ওপর অর্পিত হলো। ১৯০৪ সালে ভারতে সমবায় আন্দোলন সূচিত হলেও ১৯১২ সাল থেকে তার প্রকৃত অগ্রগতির সূত্রপাত। এই আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি অনুসন্ধান করবার জন্যে ১৯১৪ সালে ভারত সরকার 'ম্যাক্‌লাগান' কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করলেন। ১৯১৫ সালে সেই কমিটি তার রিপোর্টে রাখলেন কতকগুলি মূল্যবান সুপারিশ। অতঃপর ১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কার আইনে সমবায় আন্দোলনের দায়িত্বভার প্রাদে

সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতির ইতিহাস

হলো প্রাদেশিক সরকারের হাতে। ফলে অভূতপূর্ব অগ্রগতি পরিলক্ষিত হলো সমবায় আন্দোলনের।

এইবার সমবায় আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দরিদ্র, ঋণ-জর্জর গ্রাম-ভারতের বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা পুঞ্জীভূত হতে থাকে। এদিকে, ১৯৩৫ সালে ভারত সরকারের উদ্যোগে স্থাপিত হলো রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিঋণ বিভাগ। তারপর ১৯৪৫ সালে নিযুক্ত হয় সমবায় পরিকল্পনা কমিটি। এই কমিটি প্রাথমিক সমিতিগুলির বহুমুখী সমিতিতে রূপান্তর এবং পরবর্তী দশ বছরে সমিতিগুলির পরিধির মধ্যে গ্রামসমূহের পঞ্চাশ-শতাংশ ও গ্রামীণ জনসংখ্যার ত্রিশ-শতাংশের অন্তর্ভুক্ত সুপারিশ করে। সেই সঙ্গে সমবায় সমিতিগুলিকে অধিকতর সাহায্য দানের জন্যেও সুপারিশ করা হয়। ভারতের মতো দীর্ঘ শোষিত অর্ধোন্নত দেশে সমবায়ের ভূমিকার গুরুত্ব স্বীকৃত হয়। কিন্তু কমিটির সুপারিশসমূহের রূপায়ণের পূর্বেই এসে পড়লো দেশ-বিভাগ ও জাতির বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

সমবায় পরিকল্পনা কমিটি

স্বাধীনতা ভারতের সমবায় আন্দোলনকে বিপুল গতিদান করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ওপর সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি সম্পর্কে সমীক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। ১৯৫১ সালে নিযুক্ত হয় উপদেষ্টা কমিটি (Committee of Direction)। ১৯৫৪ সালে তার প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয় যে, কৃষক-সমাজের ঋণের মাত্র তিন-শতাংশ বহন করে সমবায় সমিতিগুলি, সরকারের গৃহীত অংশ নগণ্য। এই কমিটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে দেয় দেশব্যাপী ঋণ-সংগঠনের একটা সুসংহত পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো: এক, সকল সমবায় সমিতিতে রাষ্ট্রীয় অংশ, দুই, সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কার্যাবলীর সঙ্গে ঋণ-সংগঠনের সংযোগ স্থাপন; তিন, প্রাথমিক কৃষি-ঋণ সমিতিগুলির উন্নয়ন, চার, পর্যাপ্ত সংখ্যক পণ্যাগার-স্থাপন এবং পাঁচ, সমবায়-কর্মীদের প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থা। এই কমিটি আরো সুপারিশ করে যে, কেবল ঋণ-সংগঠনের অংশ গ্রহণেই রাষ্ট্রীয় কর্তব্য নিঃশেষিত হয় না; সেই সঙ্গে উৎপাদন, প্রকরণ, বাজার জাতকরণ, গুদাম-জাতকরণ ইত্যাদি সমবায়িক কার্যাবলীতে অংশ গ্রহণ করতে হবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে।

উপদেষ্টা কমিটি

এতদিন সমবায় আন্দোলনের কার্যাবলী সীমিত ছিল ঋণ দান ব্যবস্থার মধ্যে। কিন্তু গ্রাম-ভারতের সমস্যা অন্তহীন। কেবল ঋণদানের সাহায্যে গ্রাম-ভারতের সমস্যা-মুক্তি সম্ভব নয়। জীবনের সমস্যাকীর্ণ সকল দিকেই সমবায় আন্দোলনকে আহ্বান করা উচিত। কারণ সমবায় আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সকল সমস্যা-সমাধানের যুগোপযোগী চাবি-কাঠি। গ্রামীণ ঋণদান, বাজার-জাতকরণ, শস্যের শ্রেণীবিভাগ, শস্য-ভাণ্ডার স্থাপন, বাজার-জাতকরণ ইত্যাদি সমবায়িক কার্যসূচীর ব্যাপক সম্প্রসারণ

চাই। ১৯৫৮ সালের জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রাথমিক একক-রূপে গ্রামীণ সমাজের ভিত্তিতে সংগঠিত হবে সমবায় সমিতি এবং গ্রাম-পর্যায়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব ও কর্মোদ্যোগ ন্যস্ত থাকবে গ্রাম-সমবায় ও গ্রাম-পঞ্চায়েতের হাতে। ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে কেন্দ্রীয় শস্যাগার প্রতিষ্ঠান দশ কোটি টাকার বিলিযোগ্য শেয়ার মূলধন নিয়ে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোট ২৭টি শস্যাগার স্থাপন করে। ১৪টি রাজ্য শস্যাগার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপন করেছে ১৮১টি শস্যাগার।

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত ও সমবায় আন্দোলন

সমবায় আন্দোলনের পূর্ণতর বিকাশের জন্যে ১৯৫৯ সালে অনুষ্ঠিত রাজ্য সমবায়-মন্ত্রী-সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের রূপায়ণকল্পে শ্রী ভি এল মেহতার নেতৃত্বে সমবায় ঋণ-সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠিত হয়। ১৯৬০ সালে প্রকাশিত কমিটির রিপোর্টটি আবার ঐ বছর জুন মাসে সমবায়মন্ত্রীগণের শ্রীনগর অধিবেশনে পুনরালোচিত হয়। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে সকল রাজ্যের সমবায়-নীতি। সমবায় সমিতিগুলির দীর্ঘ-স্থায়িত্ব, স্বেচ্ছামূলকতা, নিবিড় সংস্পর্শ, সামাজিক ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনার অন্তিম বর্ষের মধ্যে সমবায় আন্দোলনকে এমন রূপদান করতে হবে, যাতে ভারতের সকল গ্রামীণ পরিবার সমবায় সমিতির আওতার মধ্যে আসে। তাছাড়া ৬০০টি প্রাথমিক বিপণন সমিতি, ৯,২০০টি গ্রামীণ গুদাম এবং বাজার কেন্দ্রে আরো ৯৮০টি গুদাম স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিকল্পনা ও সমবায় আন্দোলন

এদিকে ১৯৫৯ সালে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে কৃষি-সমবায় ও সেবা-সমবায় প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। কৃষি-সমবায় ভারতের কৃষি-বিপ্লবের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছে। এই বুভুক্ষু দেশের দুর্ভিক্ষের বুভুক্ষাহরণের সুমহান্ ব্রত গ্রহণ করেছে সমবায় কৃষি। গ্রামাঞ্চলেও সুলভ শক্তি ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার হবে সমবায়-কৃষির মাধ্যমে এবং তার সার্থক রূপায়ণে রাষ্ট্রীয় দাক্ষিণ্যের অভাব হবে না।

সমবায়-কৃষি

ভারতে যে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে, সমবায় হলো সেই মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার বনিয়াদ। বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সেবার মনোভাব নিয়ে তাই এই সমবায় আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে, যাতে দেশের মাটিতে এই আন্দোলন দৃঢ়ভাবে শিকড় চালিয়ে বসতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে-গ্রামে অন্ততঃ পঁচিশ হাজার ক্রেতা-সমবায় স্থাপন করা রাজ্য সরকারের সংকল্প। তাছাড়া, চতুর্থ যোজনায় পশ্চিমবঙ্গের শিল্পবাণিজ্যে

মিশ্র অর্থনীতি ও সমবায় এবং চতুর্থ পরিকল্পনা

মূলধনের অভাব হবে। সমবায় সেই মূলধনের অভাব মোচনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্র গঠনের মূল লক্ষ্য হলো অর্থ ও ক্ষমতা যাতে কোথাও পুঞ্জীভূত না হয়। সমবায় সেই লক্ষ্যে পৌঁছুবার একমাত্র পথ।

কিন্তু অর্ধশতাব্দী পূর্বে সমবায় আন্দোলনের শুভ-সূচনা হলেও সাংগঠনিক দুর্বলতা ও পরিচালনাগত ত্রুটির জন্য আজও তা ব্যাপক জন-প্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি।

অগ্রগতির সমীক্ষা

এই অসাফল্যের পশ্চাতে আছে দক্ষতার অভাব, অভিজ্ঞতার দৈন্য। অন্যদিকে সমবায় আন্দোলনে রাষ্ট্রীয় অর্থ-সাহায্যের আতিশয্য ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ইত্যাদি তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে। স্বতন্ত্র-দল নেতা শ্রী কে. এম মুন্সীর মতে, 'State-run State-controlled and State-financed...... beginning of enslavement" স্যার ম্যালকম্ ডার্লিংও বৃহদায়তন সমিতির বিষময় পরিণামের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করেছিলেন। তাছাড়া বৃহদায়তন সমিতি স্থাপন, রাষ্ট্রীয় সাহায্যের আতিশয্য এবং রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব রাইফিজেন্ আদর্শেরও বিরোধী।

বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে সমবায় আন্দোলনের যাত্রা সুরু। নানা সমস্যা-কণ্টকিত গ্রাম-ভারতের দারিদ্র্য-বিজয় ও শোষণ-মুক্তির যে শুভ সম্ভাবনাময় বাণী নিয়ে সমবায় আন্দোলনের আবির্ভাব, তা সফল হোক, সার্থক হোক প্রতিটি ভারতবাসীর জীবনে। যদি রাজনৈতিক দলাদলি কিংবা গ্রাম্যকলহ বা ব্যক্তিগত অবিশ্বাস এই আন্দোলনের গতিরোধ করে, যদি সমবায় আদর্শের কণ্ঠরোধ করে, তবে গ্রাম-ভারতের সর্বনাশের আর বাকি কিছুই থাকবে না। বাস্তবিকই সমবায় আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে গ্রাম-ভারতের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার ঘটবে চরম অপমৃত্যু।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- 'জাতীয় উন্নয়নে সমবায়ের স্থান, ক. বি. '৫০
- ভারতের গ্রামীণ [illegible] ও সমবায় আন্দোলন

২৭. ভারতে মূলধন-সমস্যা
Problem of Capital in India.

প্রবন্ধ-সূত্র :—অবতরণিকা—ভারতের মূলধন-সমস্যার বর্তমান রূপ—ভারতে বিদেশী মূলধন-সমস্যা—দেশব্যাপী মূলধন-সংগঠনের প্রয়াস : মূলধন-গঠনের সংজ্ঞা—মূলধন-গঠনের মূলসূত্র ও প্রধান অন্তরায়—বর্তমান ভারতে মূলধন-গঠনের ক্ষমতা ও তার ব্যবহার—শিল্পীর অর্থমঞ্জুরী সংস্থা—জাতীয় শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন লিঃ এবং শিল্পঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন লিঃ—পল্লী অঞ্চলের প্রয়োজনীয় মূলধন—উপসংহার।

অবতরণিকা

১৯৩৫ সালে দেশবরেণ্য সমাজ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার ভারতের মূলধন-সমস্যার প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করে বলেছিলেন : 'পুঁজি-নীতি, পুঁজি-সংগঠন, স্বদেশী পুঁজির সঙ্গে বিদেশী পুঁজির সম্বন্ধ ইত্যাদি তথ্য লইয়া মাথা খেলাইবার দিকে ভারতীয় ধন-বিজ্ঞান-সেবীদিগকে শীঘ্রই অগ্রসর হইতে হইবে।' এই মন্তব্যের এক দশক পরেই ভারতকে মূলধন-সমস্যার সম্মুখীন হতে হলো এবং তার সমাধানকল্পে সতর্ক পদপাতে অগ্রসর হতে হলো দেশের চিন্তানায়কদের। দারিদ্র্যের আবর্জনাস্তূপের মধ্যে ভারতকে ফেলে রেখে ইংরেজ স্বদেশে ফিরে গেল। ভারতের নেতৃবৃন্দ ভারত-গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করে দারিদ্র্য-মুক্তির জন্যে প্রণয়ন করলেন পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্যে প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণ পুঁজি। ভারতের মতো দরিদ্র দেশে কোথায় সেই পুঁজির সংস্থান? বহু-শতাব্দীর জড়তার বন্ধন থেকে জাতির ভাগ্যকে মুক্ত করতে হলে প্রয়োজন শক্তি। সেই কর্মশক্তির ও অর্থশক্তির সম্মিলিত আয়োজনে গঠিত হবে জাতির ভাগ্য। ভারতে কর্মশক্তির অভাব নেই। কিন্তু অর্থশক্তি কোথায়? কোথায় সেই মূলধনের পর্যাপ্তি, যা জাতির অর্থনীতির পুনর্বিন্যাস সাধন করে দেশের জনগণের হাতে এনে দেবে প্রভূত অর্থ নৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য?

মূলধন-সমস্যার সমাধান-দায়িত্ব সমাজতান্ত্রিক দেশে থাকে রাষ্ট্রের হাতে; কিন্তু ভারতে সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসস্তূপের ওপর সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ রচনার স্বপ্ন দেখা সুরু হয়েছে; এবং সেই কল্পিত সমাজতন্ত্রের শিথিল রন্ধ্রের ভেতর দিয়ে ধনতন্ত্রের মহীরুহই শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে বেড়ে উঠেছে। সাড়ম্বরে তারই নাম দেওয়া হয়েছে মিশ্র-অর্থনীতি। দেশে শিল্পোদ্যোগ, মূলধন-সংগ্রহ, মূলধন-বিনিয়োগ সরকারী ও বেসরকারী হস্তে ন্যস্ত। ইংরেজ-আমলে শিল্পোদ্যোগ ও মূলধন-বিনিয়োগ ছিল

বেসরকারী কর্তৃত্বাধীন। সুতরাং পূর্বে মূলধন-সংগঠন ব্যাপারটিকে দেখা হতো বেসরকারী দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু, বর্তমানে পরিকল্পনার রূপায়ণে বেসরকারী শিল্পায়োজনের পাশাপাশি সরকারী শিল্পায়োজনের ধারা সমান্তরালভাবে প্রবহমান।

ভারতের মূলধন-সমস্যার বর্তমান রূপ

কাজেই, মূলধন-সমস্যার রূপ পূর্বাপেক্ষা তীব্রতর। একদিকে, দরিদ্র ভারতবাসীর হাতে মূলধন সংগঠনের সম্ভাবনা কম; অন্যদিকে, এদেশে পুঁজিপতিদের সংখ্যাও নিতান্তই সীমাবদ্ধ এবং সংখ্যাল্প পুঁজিপতিদের হাতে পুঁজির পরিমাণও অল্প। তদুপরি, রাষ্ট্রায়ত্তকরণের মাধ্যমে হাত-ছাড়া হয়ে যাবার আশঙ্কায় বহু পুঁজিপতির পুঁজির একটা বিরাট্ অংশ বিলাস-বাহুল্যে কিংবা অনুৎপাদকপুঁজি রূপে নিয়োজিত থাকে। তাছাড়া আর এক বিরাট্ অংশ সঞ্চিত থাকে কোন বিদেশী ব্যাঙ্কে। এই অবস্থায় ভারতে মূলধন-সমস্যা অত্যন্ত প্রকট রূপ ধারণ করেছে।

মূলধন-সমস্যার একটা সহজ সমাধান হতে পারে দেশে, প্রভূত পরিমাণে বৈদেশিক মূলধন আমন্ত্রণে। কিন্তু বৈদেশিক মূলধন আমন্ত্রণের বিপদ আছে অনেক। ভারতের হাতে আছে বিদেশী মূলধনের বহু তিক্ত অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। কাজেই, ভারত

ভারতে বিদেশী মূলধন-সমস্যা

নিঃসর্তভাবে বৈদেশিক মূলধন আমন্ত্রণ করতে পারে না। সর্ত-সাপেক্ষে যে পরিমাণ বিদেশী পুঁজি ভারতে প্রবাহিত হয়ে আসে, তা খুব আশাপ্রদ নয়। অন্যদিকে, সমাজতান্ত্রিক শ্লোগানের ভয়ে বহু বিদেশী পুঁজি সংকুচিত। তাছাড়া এদেশের স্বার্থের চক্রান্তে বহু বিদেশী পুঁজি ভারতে প্রবাহিত হবার পূর্বেই জমাট বেঁধে যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বোকারো পরিকল্পনায় মার্কিন পুঁজির আড়ষ্টতার উল্লেখ করা যেতে পারে।

বৈদেশিক মূলধনের এই পরিস্থিতিতে তৃতীয় পরিকল্পনায় স্ব-নির্ভর অর্থনীতি গঠনের ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। ফলে, দেশব্যাপী বিপুল কর্মায়োজনের

দেশব্যাপী মূলধন-সংগঠনের প্রয়াস: মূলধন-গঠনের সংজ্ঞা

পাশাপাশি দেশব্যাপী মূলধন-গঠনের একটি সুসংবদ্ধ প্রয়াস অপরিহার্যরূপে দেখা দিয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিতে মূলধন গঠন অর্থ-সঞ্চয় বা অর্থ-সংগ্রহকেই বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতির বিচারে মূলধন-গঠন বিনিযুক্ত অর্থের সাহায্যে মূলধন দ্রব্য (Capital goods) উৎপাদন বা সংগ্রহ করা বুঝায়। এখন ভারতে বিদেশ থেকে ভারি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে এনে মূল শিল্প (Key industry) স্থাপন করে মূলধন-সংগঠনের প্রয়াস দ্রুত-ক্রিয়াশীল। যাই হোক, মূলধন-সংগঠনের তিনটি মৌলিক স্তর রয়েছে: প্রথমতঃ, সঞ্চয়-সৃষ্টি; দ্বিতীয়তঃ, সঞ্চিত পুঁজিকে বিনিয়োগ-তহবিলে রূপান্তরীকরণ; তৃতীয়তঃ, বিনিযুক্ত অর্থের সাহায্যে ভবিষ্যতের উৎপাদনক্ষম মূলধন-দ্রব্য সৃষ্টি বা সংগ্রহ করা।

সঞ্চয়-বাসনা হলো মূলধন-গঠনের প্রাথমিক সোপান। সঞ্চয়-ক্ষমতা না থাকলে সঞ্চয়-বাসনা নিরর্থক; আবার সঞ্চয়-ক্ষমতা আয়-ব্যয়ের ব্যবধানের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু আয়ের চেয়ে ব্যয়ের পরিমাণ বেশী হলে ঋণের অঙ্ক যায় বেড়ে, সঞ্চয়-বাসনার ঘটে অপমৃত্যু। আবার যে দেশে আয়-ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান নেই, সেখানে জমার খাতায় ওঠে শূন্য, মূলধন-গঠন হয়ে যায় আকাশ-কুসুম কল্পনা। ভারতে হয়েছে ঠিক তাই। কিন্তু কানাডায় কিংবা মার্কিন মুলুকে দেখা যায় বিপরীত চিত্র। সেখানে ব্যক্তিগত সঞ্চয় মূলধন-সংগঠনের কাজে লাগাবার প্রয়োজন হয় না। তাই ব্যক্তিগত সঞ্চয় প্রবাহিত হয় জীবন-বীমা ইত্যাদি চুক্তিতে। ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, কৃষক শ্রেণী, শ্রমিক শ্রেণী নিদারুণ জীবন-সংকটের মধ্য দিয়ে দিন কাটায়। মূলধন-সংগঠনের সম্ভাবনা তাদের হাতে নেই। তদুপরি, মূল্যাধিক্য ও কর-পীড়ন সকল প্রকার সঞ্চয়-সম্ভাবনার কণ্ঠরোধ করেছে। এই হতাশার অন্ধকারের মধ্যে জীবন-বীমা ও অন্যান্য বীমা স্বল্প আলোর শিখার মতো কোনক্রমে টিকে আছে। আশার কথা, ভারতে জীবন-বীমা ক্রমাগত জনপ্রিয়তা লাভ করছে এবং ১৯৬৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ভারতের জীবন-বীমা কর্পোরেশন ৬৭৮·৮১ কোটি টাকা বিভিন্ন ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেছে। বীমা কর্পোরেশন ছাড়া আছে অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান, ম্যানেজিং এজেন্টগণ, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, শিল্পীয় অর্থমঞ্জুরী সংস্থা, জাতীয় শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন, শিল্পঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন, রাজ্য অর্থ-সংস্থান কর্পোরেশন সমূহ, পুনঃ অর্থ-সংস্থান কর্পোরেশন, জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন, ইউনিট ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া, ভারতের শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, ফিল্ম অর্থ-সংস্থান কর্পোরেশন এবং সরকারী সাহায্য। তাছাড়া আছে ঋণ-শোধের নিশ্চয়তাদানের সংগঠন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

মূলধন-গঠনের মূল সূত্র ও প্রধান অন্তরায়

স্বাধীনতালাভের পর ভারত শিল্পায়ন ও কৃষি-প্রগতির পথে যাত্রা করেছে। ফলে ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ভারতের জনগণের মাথাপিছু আয় বারো-শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উৎসাহ স্বল্প হলেও ক্রমবর্ধমান। দ্বিতীয় পরিকল্পনার অবসানে বিনিয়োগের অঙ্ক দাঁড়ায় জাতীয় আয়ের এগারো-শতাংশ। জাতীয় নমুনা-জরীপের (National Sample Survey) তথ্যানুসারে ভারতে সাম্প্রতিক মূলধন-গঠনের হার জাতীয় আয়ের ছয়-শতাংশ মাত্র বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় এই পরিমাণ যে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, তা বলা বাহুল্য। শিল্পপতি ও ঠিকাদারদের হাতে জাতীয় আয়ের অধিকাংশই সঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু মূলধন সদ্ব্যবহারের সুযোগের অভাবে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, ঠিকাদার ইত্যাদি শ্রেণীকে সঞ্চিত অর্থের অপচয় করতে দেখা যায় ফটকা বাজারে, আগাম কারবারে ও

বর্তমান ভারতে মূলধন-গঠনের ক্ষমতা ও তার ব্যবহার

অনুরূপ অনুৎপাদক উপায়ে। বলা বাহুল্য, এই সব পথ বন্ধ্যা, কানাগলির মতো অন্ধ এবং মূলধন-গঠনেব প্রতিকূল। তাছাড়া, পুঁজিপতিদের হাতে সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ-সুযোগের অভাবে ধাতু সঞ্চয়ে ব্যয়িত হয়। ব্যক্তিগত সঞ্চয় হিসেবে ভারতে মজুত স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্য ১,৮৫০ কোটি টাকার মত। স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ বিধি এদের কতটুকু স্পর্শ করতে পেরেছে ?

ভারতেব শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে মূলধন সরবরাহ করার জন্যে ১৯৪৮ সালে শিল্পীয় অর্থ-মঞ্জুরী সংস্থা (Industrial Finance Corporation) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৬৪ সালের জুন মাস পযন্ত—এই ষোল বছরে এই সংস্থা ১৯৬ ৭৮ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, প্রদত্ত হয়েছে ১২৪'৫ কোটি টাকা। লালফিতাব দৌরাত্ম্য এখানে অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। স্বজনপোষণ এবং বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলিব প্রতি আত্যন্তিক পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি বহু গুরুতব অভিযোগ এই সংস্থার বিরুদ্ধে এসেছে। তাছাডা এই সংস্থাব দরখাস্ত মঞ্জুরীতে ও ঋণ প্রদানে অত্যন্ত বিলম্ব ঘটে। পরে অবশ্য এই সংস্থাব সংস্কাব সাধিত হয়েছে। বর্তমানে এই সংস্থা খুব সফল না হলেও ভবিষ্যতে এই সংস্থা ভারতেব অর্থনীতিতে গৌরবজনক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

শিল্পীয় অর্থ মঞ্জুরী সংস্থা

তাছাড়া, সংগঠিত হয়েছে জাতীয় শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড এবং শিল্পঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন লিমিটেড নামে দুটি অর্থ-বিনিয়োগ সংস্থা। প্রথম সংস্থাটি ১৯৬৪ সালেব মার্চ মাস পর্যন্ত বস্ত্র-শিল্প ও পাট-শিল্পকে ২৮ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে এবং যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার-নির্মাণ শিল্পকে ঋণ মঞ্জুর করেছে ২ কোটি টাকা। দ্বিতীয় সংস্থাটি প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৬৩ সাল পযন্ত এগারো—এই বছরে ২৪৮টি বে-সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে ৮৩ ২ কোটি টাকা আর্থিক সাহায্য ও ঋণ দান করেছে। কিন্তু শিল্প-উন্নয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ায় এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহ ও আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন লিঃ এবং শিল্পঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন লিঃ

অন্যদিকে, পল্লী-অঞ্চলই ভারতের অর্থনীতিব হৃৎপিণ্ড। আবার পল্লী-অঞ্চলেব অর্থনীতির মূল উৎস হলো কৃষি এবং কুটির-শিল্প। বিদেশী কায়েমী-স্বার্থের চক্রান্তে ভারতের পল্লী-অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আজ আবার সেখানে অর্থ নৈতিক পুনর্বিন্যাসের কাজ সুরু হয়েছে। ভারতের সুপ্ত গ্রামগুলির ঘুম ভাঙাতে হবে। কিন্তু সেখানে আজ বহু গোপন কায়েমী-চক্রের শোষণের নতুন জাল বিস্তৃত হচ্ছে। সেই সব নব-বিস্তৃত শোষণের চক্রান্ত থেকে পল্লী-অর্থনীতিকে রক্ষা করতে হবে। তাই ১৯৫৬ সালে

পল্লী-অঞ্চলের প্রয়োজনীয় মূলধন

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাতীয় কৃষি-ঋণ তহবিল (National Agricultural Credit Fund), কৃষি-ঋণ দানের জন্যে রাজ্য সরকার ও রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে সাহায্য করার মানসে প্রারম্ভিক ১০ কোটি টাকা এবং বার্ষিক অতিরিক্ত ৫ কোটি টাকার মূলধনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এই তহবিল কার্য সুরু করে। কৃষি-মূলধনের সংকটের অন্ধকার কেটে গিয়ে আলোকময় প্রভাত আজ উদিত হচ্ছে ভারতের পল্লীগুলির বুকে। কৃষির পর আসে কুটির-শিল্পের মূলধন যোগানের প্রশ্ন। তার জন্যে স্থাপিত হয়েছে রাজ্য অর্থ কর্পোরেশন (State Finance Corporation), রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যার মূলধনের শতকরা দশ থেকে বারো ভাগ যোগানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তাছাড়া আছে ১৯৫৫ সালে স্থাপিত জাতীয় ক্ষুদ্র-শিল্প কর্পোরেশন লিমিটেড (National Small Industries Corporation Ltd.); এই সংস্থা ক্ষুদ্র-শিল্প-সমূহের মূলধন-সমস্যার সমাধানের শপথ গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে, ক্ষুদ্র-শিল্পগুলিকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে এসেছে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক (State Bank of India)। গ্রামীণ শিল্প ও ক্ষুদ্র-শিল্পের আর্থিক সচ্ছলতা সাধনের উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র-শিল্পজাত দ্রব্যাদির ক্রয় কমিটি (Stores Purchase Committee) স্থাপিত হয়েছে। এই সব ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ায় ভারতের পল্লী-অর্থনীতিতে এতদিন পরে নতুন উদ্যম ও নতুন উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

উপসংহার

তৃতীয় পরিকল্পনায় বিদেশী মূলধনের যে প্রত্যাশা ছিল, তা ব্যর্থ হয়েছে। অতএব এখন রাষ্ট্রের কর্তব্যই হলো মূলধন-সংগ্রহ ও মূলধন-সংগঠন। প্রাইজ বণ্ড, গোল্ড বণ্ড, প্রতিরক্ষা-সার্টিফিকেট ইত্যাদি ক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন-সংগঠন প্রয়াস অনেকাংশে সফলতা লাভ করেছে। ভারতের ঘরে যত পুঁজি আছে, তা একত্রিত হয়ে আজ ভারতের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি-রচনায় বিনিয়োজিত হোক; কিন্তু সেই সঙ্গে ধনিক এবং দরিদ্রের মধ্যে অবস্থার ব্যবধান ধীরে ধীরে সংকীর্ণ হয়ে আসুক এবং প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক পদবিক্ষেপে ভারত তার ঈপ্সিত জাতীয় লক্ষ্যে উপনীত হোক; এই প্রত্যাশা আমাদের কবে সফল হবে?

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- ভারতে মূলধন-গঠনের সমস্যা ও তাহার প্রতিকার
- পল্লী-[illegible] প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ, ক. বি. '৫৬

২৮. ভারতে বিদেশী মূলধন
Foreign Capital in India.

প্রবন্ধ-সূত্র :— অবতরণিকা—স্বাধীন ভারতে বিদেশী পুঁজি নীতি—ভারতে বিদেশী পুঁজির প্রয়োজনীয়তা—ভারতে বিদেশী পুঁজির ভূমিকা—বিদেশী পুঁজি আমন্ত্রণের বিপক্ষে যুক্তি—বিদেশী পুঁজি সম্পর্কে সরকারী নীতি—প্রথম শিল্পনীতি (১৯৪৮) এবং প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতি (১৯৪৯)—প্রতিক্রিয়া : দ্বিতীয় শিল্পনীতি : পরবর্তীকালে সরকারী মনোভাব—ভারতে বিদেশী পুঁজির উৎস ও পরিমাণ—উপসংহার।

ভারতের শিল্প-বাণিজ্যে বিদেশী পুঁজির কর্তৃত্ব আর কতোকাল চলবে? আসল কথা, ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজির একটি ভূমিকা বহু-বিতর্কিত অধ্যায়। তার কারণ, বিদেশী পুঁজি সম্পর্কে আমাদের হাতে রয়েছে বহু তিক্ত অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। ইংরেজদের ভারত-বিজয় তাদের সঙ্গে মোগল বাদশাদের বাণিজ্য-চুক্তিরই একটি বিষময় পরিণাম। তারপর থেকে এদেশে রাজনৈতিক নিশ্চয়তার সুযোগে প্রচুর ব্রিটিশ পুঁজি প্রবাহিত হয়ে আসে। পরে সেই ব্রিটিশ বণিকেরা যে রাজার জাত, যে-কোন সুযোগে তারা আমাদের তা বুঝিয়ে দিতে ছাড়তো না। এবং যখন এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, সেই বিদেশী পুঁজিগুলির বিরোধী ভূমিকা রাজার জাতের প্রকৃত পরিচয় আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। ব্রিটিশ ভারতে ব্রিটিশ পুঁজির ছিল একাধিপত্য। সেই-যে প্রবল প্রতাপান্বিত বিদেশী পুঁজি, তার জন্ম-ঠিকুজীর পরিচয় দিয়েছেন মনীষী কার্ল মার্ক্স্। তিনি বলেছেন—"The treasure captured outside Europe by undisguised looting, enslavement and murder flowed back to the mother country and transformed themselves into Capital" ভারতের সম্পদ ইংলণ্ডের মাটি ছুঁয়ে বিদেশী মূলধন হয়ে আবার ভারতে ফিরে এসেছে। অদৃষ্টের কী নিষ্ঠুর পরিহাস!

অবতরণিকা

তারপর পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থার অনুসরণে পাতা ওল্টালো ইতিহাসের, স্বাধীন হলো ভারত। ভারতে বিদেশী পুঁজির দাপটের দিন গেল ফুরিয়ে। তখন দেশের অর্থনীতির পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করতে হলে আমাদের। দেশের এই নতুন পটভূমিতে বিদেশী পুঁজির ভূমিকা কি হবে?—এই চরম প্রশ্ন মাথা তুলে দাঁড়ালো আমাদের সামনে। ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে অতীতের বহু অভিজ্ঞতার নিকষে আমরা সেই প্রশ্নটিকে যাচাই করতে

স্বাধীন ভারতের বিদেশী পুঁজির নীতি

বসলাম। বর্তমান ভারতে বিদেশী পুঁজির কোন প্রয়োজন আছে কিনা? যদি থাকে, তার ভূমিকা কি হবে?

ভারতে বিদেশী পুঁজির প্রয়োজনীয়তা

সত্য কথা, ভারতের ন্যায় সকল অর্ধোন্নত দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে বিদেশী পুঁজির প্রয়োজন আছে। অন্যদিক দিয়ে বিচার করলে, এই অর্ধোন্নত দেশগুলির সম্পদ শোষণ করে প্রভু জাতিগুলি ধনী হয়ে উঠেছে। আজ সেই ধনী জাতিগুলির পুঁজি যদি এই হৃতভাগ্য দেশগুলিতে প্রবাহিত হয়ে না আসে, তবে এই দেশগুলির বৈবয়িক উন্নয়ন কেমন করে সম্ভব হবে? এতদিন এদেশ শোষণ করে যে পাপ তারা করেছে, তার পাপ-স্কালনও তো দরকার। তাছাড়া দেশীয় সঞ্চয় হার বৃদ্ধিতে উৎসাহের সঞ্চার, শিল্প-বাণিজ্যের দুঃসাহসিক পথে ঝুঁকি-গ্রহণের প্রেরণা, কারিগরী ও সাংগঠনিক জ্ঞান, প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের সমাধানে বিদেশী মুদ্রার ব্যবহার এবং বিদেশী পুঁজির সাহায্যে মুদ্রাস্ফীতি পরিহার—ইত্যাদি সুবিধাগুলির দিকে চেয়ে বিদেশী পুঁজি আমন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অবশ্য-স্বীকার্য। কিন্তু তাই বলে, এদেশে বিদেশী পুঁজি ব্যবহারের ও বিচরণের অবাধ অধিকার দান কি যুক্তিযুক্ত হবে? আমাদের এই দুর্ভাগা দেশের অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগকে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থের জিম্মায় তুলে দেওয়া কি ঠিক হবে?

ভারতে বিদেশী পুঁজির অতীত ভূমিকা

ব্রিটিশ ভারতে ব্রিটিশ পুঁজি ছিল একচ্ছত্র এবং উনবিংশ শতাব্দী সেই একচ্ছত্র ব্রিটিশ পুঁজির স্বর্ণযুগ। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে ব্রিটিশ পুঁজির দ্বারা আধুনিক ব্যাঙ্কিং, রেল পরিবহণ এবং আধুনিক যন্ত্রশিল্প প্রবর্তিত হয়েছিল। চা, রবার ও কফি-বাগিচা-শিল্প ব্রিটিশ পুঁজিরই অবদান। ১৯১৪ সালে ভারতে বিনিযুক্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রিটিশ পুঁজির পরিমাণ ছিল প্রায় ৫০ কোটি পাউণ্ড। ১৯৩৩ সালে সেই পুঁজির পরিমাণ দাঁড়ায় ১০০ কোটি পাউণ্ড। ১৯৪৮ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব অনুসারে বিদেশী পুঁজির পরিমাণ ছিল ৩২০·৪২ কোটি টাকা। তার মধ্যে একমাত্র ব্রিটিশ পুঁজির পরিমাণই ছিল ২৩০ কোটি টাকা। অতীতে বিদেশী পুঁজির সেই বিপুল স্রোত প্রবাহিত হয়ে আসতো এমন সমস্ত শিল্পে, যার দ্রব্য-সম্ভারকে তারা স্বদেশে কাঁচামালরূপে রপ্তানি করতে পারে। ভারতের খনি ও কৃষি-প্রান্তরকে তারা নির্মমভাবে স্বদেশের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। ফলে, যা হবার তাই হয়েছে। ভারতের সম্পদকে তারা যথেচ্ছভাবে শোষণ করে এদেশে প্রতিষ্ঠা করেছে এক ভারসাম্যহীন অর্থনীতি। তাইতো ভারতের রাজনৈতিক অধিকার লাভের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে বিদেশী পুঁজির বিরোধী ভূমিকার কাহিনী ১৯২৪ সালের বৈদেশিক মূলধন কমিটি কর্তৃক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দিত হয়েছিল।

সে কয়েক যুগ আগের কথা। তখন বিদেশী পুঁজি এদেশের অবস্থা বা ভাগ্য সম্বন্ধে ছিল সম্পূর্ণভাবে নিরাসক্ত। তারা এদেশের রাজনৈতিক স্বার্থকে পদদলিত করে স্বদেশের স্বার্থ-চিন্তাই করেছে। তাই ভারতে খনিজ উত্তোলন ও বাগিচা-শিল্পে অধিক পরিমাণে বিদেশী পুঁজি আকৃষ্ট হয়েছে। তাতে তারা দেশীয় সম্পদের যথেচ্ছ অপব্যবহার করেছে। দেশীয় পুঁজির সঙ্গে করেছে তীব্র প্রতিযোগিতা। অভিজ্ঞতা, আর্থিক শক্তি ও নৈপুণ্যের শক্তিতে দেশীয় পুঁজিকে তারা পর্যুদস্ত করেছে এবং দেশের শিল্পায়নকে করে তুলেছে সুদূরপরাহত। বিদেশী পুঁজির দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলি ঋণ, বীমা, পরিবহণ ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে দেশীয় প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রদর্শন করেছে জঘন্যতম পক্ষপাত। অন্যদিকে, বিদেশী পুঁজির লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতো দ্রুত মুনাফাপ্রাপ্তির দিকে। তাছাড়া বিদেশী পুঁজি বড়ো অনিশ্চিত; যে কোন সময়ে দেশত্যাগের সম্ভাবনা থাকতো। দেশত্যাগী বিদেশী পুঁজি পরিকল্পিত অযত্ন ও অবহেলায় দেশী শিল্পের করতো চরম সর্বনাশ। বনিয়াদী বা মূল শিল্পে বিদেশী পুঁজির কর্তৃত্ব দেশের নিরাপত্তার বিরোধী। আবার, যে কারিগরী নৈপুণ্যের যুক্তিতে বিদেশী পুঁজি আমন্ত্রণ করা হয়, তা অমূলক প্রতিপন্ন হতে বিলম্ব হয় না। কারণ উৎপাদন-সংক্রান্ত গোপন তথ্য বিদেশী পুঁজি অপ্রকাশিতই রাখে। ফলে অর্ধোন্নত দেশগুলি অনগ্রসরতার 'যেই তিমিরে সেই তিমিরেই' থেকে যায়। তদুপরি, বিদেশী পুঁজি একচেটিয়া বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে শিল্প নির্বাচনে যে চতুরতার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাতে দেশীয় স্বার্থ হয় বিঘ্নিত। তাছাড়া, বিদেশী মুদ্রা তহবিলের ওপর চাপবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের আশঙ্কা তো থাকেই।

বিদেশী পুঁজি আমন্ত্রণের বিপক্ষে যুক্তি

স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের নীতি ছিল ভারতে বিদেশী (ব্রিটিশ) পুঁজির সর্তবিহীন অনিয়ন্ত্রিত আগমন। কিন্তু ভারতে শিল্পে, বাহির্বাণিজ্যে ও ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে বিদেশী পুঁজির আধিপত্য এবং বিদেশী শাসক শক্তি কর্তৃক বিদেশী পুঁজির প্রতি আনুকূল্য ও দেশীয় পুঁজির বিরোধিতা – এই সমস্ত তিক্ত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বিদেশী পুঁজি সম্পর্কে স্বাধীন ভারত-সরকারের নীতি গঠনে যে সহায়ক হয়েছে, তা বলাবাহুল্য। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে বিঘোষিত প্রথম শিল্প-নীতি ও ১৯৪৯ সালে প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতি বিদেশী পুঁজি সম্পর্কে সরকারী নীতির সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি।

বিদেশী পুঁজি সম্পর্কে সরকারী নীতি

প্রথম শিল্প-নীতিতে বলা হয়: এক, ভারতীয় শিল্পে বিদেশী পুঁজি নিয়োগে সতর্কতা প্রয়োজন; দুই, বিদেশী পুঁজি কর্তৃক গঠিত প্রতিষ্ঠানের গরিষ্ঠ মালিকানা ও নীতির নিয়ন্ত্রণভার ভারতীয়দের হাতে থাকা আবশ্যক; তিন, বিদেশী

বিশেষজ্ঞগণের স্থান ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পূরণ করবার জন্যে উপযুক্ত কারিগরী-নৈপুণ্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থায় যথোচিত গুরুত্বদান করতে হবে। অন্যদিকে, ১৯৪৯ সালের ৬ই এপ্রিল ভারতের প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতিতে এই শিল্পনীতি আরো সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে। তিনি বলেন, অতীতে যে পরিবেশে বিদেশী পুঁজি নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্ব আরোপিত হতো, স্বাধীনতা লাভের পর তার রূপান্তর ঘটেছে। শুধু ভারতের সঞ্চয়-স্বল্পতার জন্যেই নয়, বিদেশী বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী-জ্ঞান এবং যন্ত্রপাতির সুবিধার জন্যে বিদেশী পুঁজির রয়েছে প্রভূত প্রয়োজন। প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতির সার-সংক্ষেপ হলো: এক, দেশী-বিদেশী সকল প্রতিষ্ঠানই সরকারী শিল্প-নীতি মান্য করে চলবে; দুই, দেশী-বিদেশী পুঁজির মধ্যে কোন তারতম্য করা হবে না; তিন, সাধারণ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার মধ্যেই বিদেশী পুঁজিকে মুনাফা অর্জন করতে হবে; চার, কোন বিদেশী প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত হলে ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে; এবং পাঁচ, বিদেশী পুঁজির ও মুনাফা স্বদেশে প্রেরণের স্বাধীনতা থাকবে।

প্রথম শিল্প-নীতি (১৯৪৮) এবং প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতি (১৯৪৯)

তা সত্ত্বেও প্রথম পরিকল্পনায় বিদেশী পুঁজির আগম আশানুরূপ হয় নি। তার ওপর, দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্যে ভারত সরকার কর্তৃক সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা গঠনের উদ্যোগ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের প্রাধান্য ঘোষণায় ভারতে বিদেশী পুঁজির প্রবাহে ভাঁটা দেখা দেয়। ১৯৫৬ সালে প্রথম শিল্প-নীতিকে অক্ষুন্ন রেখে দ্বিতীয় শিল্প-নীতি বিঘোষিত হলো। তারপর থেকে যাতে ভারতে বিদেশী পুঁজি অব্যাহত ধারায় প্রবাহিত হয়ে আসতে পারে, তার জন্যে অনুকূল পরিবেশ রচনা করা হচ্ছে। বিদেশী পুঁজির ওপর ভারতে ও স্বদেশে যাতে দুবার আয়কর ধার্য করা না হয়, তার জন্যে ভারত সরকারের উৎকণ্ঠা এবং ১৯৫৭ সালে মার্কিন পুঁজি ও মুনাফার প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে ভারত-সরকারের ঔদার্য-প্রদর্শন—বিদেশী পুঁজির অব্যাহত প্রবাহের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

প্রতিক্রিয়া: দ্বিতীয় শিল্প-নীতি ও পরবর্তী-কালে সরকারী মনোভাব

১৯৬০ সালে বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত বিদেশী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৬৯০ কোটি টাকা। তাছাড়া ঐ বছরে সরকারের নীট বিদেশী ঋণের দায় ছিল ৬০৯ কোটি টাকা। ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারত মোট ৩,৯২১·৮০ কোটি টাকা বিদেশী সাহায্য লাভ করে। তার মধ্যে প্রথম যোজনার জন্যে ৩৯৪·২২ কোটি টাকা, দ্বিতীয় যোজনায় ২,৩৩৩·৫৬ কোটি টাকা এবং তৃতীয় যোজনায় ১,১৯৪ কোটি টাকা। ১৯৬০ সালে ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত বেসরকারী বিদেশী পুঁজি-প্রবাহের উৎস ছিল: বৃটেন ৪৪৬ কোটি

ভারতে বিদেশী পুঁজির উৎস ও পরিমাণ

টাকা, আমেরিকা ১১৩ কোটি টাকা, বিশ্বব্যাঙ্ক ৭৮ কোটি টাকা এবং অন্যান্য ৫৩ কোটি টাকা। সম্প্রতি ভারতে বিনিয়োজিত আমেরিকা ও পশ্চিম জার্মানীর পুঁজির পরিমাণ ক্রমবর্ধমান।

বিদেশী পুঁজি ভারতের বহু সর্বনাশ সাধন করেছে, ভারতের ইতিহাসে রয়েছে তার কলঙ্কিত সাক্ষ্য। ভারতের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যকে ধ্বংস করে, তার রাজনৈতিক অভিব্যক্তির কণ্ঠরোধ করে, তার স্বয়ংসিদ্ধ অর্থনীতি-সংগঠনের পথে বাধা সৃষ্টি করে বিদেশী পুঁজি এতদিন ভারতকে করেছে চরম আঘাত। কিন্তু তাই বলে, সকল ক্ষেত্রে ও সকল অবস্থায় যে বিদেশী পুঁজি অস্পৃশ্য ও বর্জনীয়—এরূপ গোঁড়ামিও জাতীয় স্বার্থের বিরোধী। আজ এক দেশের পুঁজি অন্যদেশে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বিদেশী পুঁজির সাহায্যে দুর্বল দেশগুলির ভগ্নদশাগ্রস্ত অর্থনৈতিক বনিয়াদ ধীরে ধীরে সুদৃঢ়রূপে সংগঠিত হয়ে উঠছে। এ যে একটি সুলক্ষণ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বিদেশী পুঁজির বিপদও আছে। অর্থনৈতিক সাহায্যের অনুষঙ্গরূপে রাজনৈতিক দাসত্ব এসে পড়তে পারে। কাজেই বিদেশী পুঁজির অনিয়ন্ত্রিত যথেচ্ছাচার সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই সতর্কতার প্রয়োজন। এবং ভারত সরকার যে জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিদেশী পুঁজির নিয়ন্ত্রণে কৃতসংকল্প, তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- জাতীয় অর্থনীতিতে বৈদেশিক মূলধন নিয়োগের প্রভাব. ক. বি. '৫৪
- ভারতে বিদেশী মূলধন, ক. বি. (ত্রৈ-বার্ষিক) '৬২
- ভারতে বিদেশী মূলধনের প্রয়োজনীয়তা

২৯. ভারতের পরিবহণ-ব্যবস্থা : জলে, স্থলে ও আকাশে

ক. বি. '৬৩

Transport System of India : Land, Water and Air.

প্রবন্ধ-সূত্র :—অবতরণিকা—ভারতের পথ ও পরিবহণের শ্রেণীবিন্যাস—জল-পরিবহণ : নদীপথ ও সমুদ্রপথ—স্থল-পরিবহণ : রেলপথ—সড়ক -বিমান-পরিবহণ : বেসামরিক বিমান পরিবহণ—উপসংহার।

অবতরণিকা

সামাজিক সমৃদ্ধি-রচনায় পরিবহণের ভূমিকা অনবদ্য। দেশের অর্থ-ব্যবস্থার মর্মস্থলে পুঞ্জীভূত শতযুগের জড়তাকে দূর করে গতির আবেগ আনে পরিবহণ, বার্ধক্যের নৈষ্কর্ম্য ঘুচিয়ে দিয়ে রচনা করে যৌবনের জয়গান। গ্রাম ও শহর, কৃষি ও শিল্প, জনবহুল অঞ্চল ও জনবিরল অঞ্চল, উদ্বৃত্ত এলাকা ও ঘাটতি এলাকা—এই বিপরীত চিত্রগুলির মধ্যে পথ ও পরিবহণ বেঁধে দেয় মিলনের গাঁটছড়া। আনে সংগতি, আনে সামঞ্জস্য; সমাজের অর্থনৈতিক সিদ্ধিও আসে পরিবহণের মধ্যস্থতায়। আর দেশের প্রতিরক্ষা, দুর্ভিক্ষও মহামারী ইত্যাদি বিপর্যয়-রোধে এবং তার প্রতিকার-সাধনে পথ ও পরিবহণ প্রসারিত করে দেয় তার কল্যাণপূত হস্ত। কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে সে খুলে দেয় সকল সম্ভাবনার রুদ্ধ দুয়ার। পথ ও পরিবহণ তাই সমগ্র দেশের অপরিহার্য স্নায়ুতন্ত্র।

ভারতের পথ ও পরিবহণের শ্রেণী-বিন্যাস

বিশেষতঃ, ভারতের মতো যে দেশ সুদূর ভৌগোলিক বিস্তারের অধিকারী এবং যে দেশ পরিকল্পিত অর্থনীতির দ্রুত রূপায়ণের শপথ গ্রহণ করেছে, তার পরিবহণ ও সংসরণের গুরুত্ব অসীম। ভারতের পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রসার জলে, স্থলে ও আকাশে : এক, নদীপথ ও সমুদ্রপথ—জল-পরিবহণের অন্তর্গত; দুই, রেলপথ ও সড়ক—স্থল-পরিবহণের অন্তর্ভুক্ত; এবং তিন, বিমান-চলাচল—আকাশ-পরিবহণের আধুনিকতম ভরসা।

জল পরিবহণ : নদীপথ ও সমুদ্রপথ

ভারতের জল-পরিবহণ-ব্যবস্থা নদীপথ ও সমুদ্রপথের সমাহারে রচিত। সুদূর অতীতকাল থেকে ভারত এই দুই পথেই প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। দাঁড়-সাজানো, গুন-টানা ও পালতোলা নৌবহর ছিল তার প্রধান অবলম্বন। মধ্যযুগে তার সমুদ্র-পথযাত্রা রুদ্ধ হলেও নদীপথ-যাত্রা খোলা ছিল। তারপর য়ুরোপের শিল্প-বিপ্লবের ঢেউ এসে তার উপকূল স্পর্শ করলো। তার জলপথে ভাসলো স্টীমার ও জাহাজ। বর্তমান ভারতের আভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথের দৈর্ঘ্য ৫০০০ মাইলেরও বেশি। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এর উন্নয়ন-খাতে

প্রায় এক কোটি টাকার মতো অর্থ ব্যয়িত হলেও কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়নি। ১৯৫২ সালে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের পরিবহণ-সমন্বয়-সংস্থা (Ganga Brahmaputra Transport Co-ordination Board) সংগঠিত হয়। আভ্যন্তরীণ জল-পরিবহণ কমিটির (Inland Water Transport Committee) পরামর্শকে রূপদান করবার জন্যে তৃতীয় পরিকল্পনায় আভ্যন্তরীণ জলপথ-উন্নয়ন-কার্যসূচী রচিত হয় এবং সেইখাতে ব্যয়-বরাদ্দ হয় ৭·৫ কোটি টাকা। অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যে নদী-পরিবহণের গুরুত্ব যেমন অপরিসীম, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সমুদ্র-পরিবহণের ভূমিকা তেমনি অনস্বীকার্য। অথচ, দেশীয় সমুদ্র-পরিবহণের অভাবের পরিণামে বিদেশী জাহাজের মুখাপেক্ষিতায় ভারতীয় বাণিজ্যকে মাশুল দিতে হয় বেশি। তাতে ভারতীয় পণ্যের প্রতিযোগিতা-শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং বিদেশী মুদ্রার হয় যথেষ্ট অপচয়। এই দুর্বলতার নিরাময়কল্পে প্রথম পরিকল্পনায় সমুদ্র-পরিবহণ-শক্তিকে ৩ লক্ষ ৯০ হাজার টন থেকে ৭ লক্ষ ৮০ হাজার টনে বর্ধিত করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪৫ কোটি টাকা হাতে নিয়ে অতিরিক্ত ৩ লক্ষ টন সমুদ্র-পরিবহণ-শক্তি বৃদ্ধির উদ্যোগ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে অতিরিক্ত ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টন সমুদ্র-পরিবহণ-শক্তি বৃদ্ধির উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত অর্থ-সংগ্রহের জন্যে সমুদ্র-পরিবহণ উন্নয়ন তহবিল (Shipping Development Fund) সংগঠিত হয়। ইতিপূর্বে সমুদ্র-পরিবহণ নীতি-নির্ধারণ কমিটির (Shipping Policy Committee) সুপারিশক্রমে দেশীয় সমুদ্র-পরিবহণকে ঔপকূলিক বাণিজ্যে একাধিকার দেওয়া হয়েছে। মোটকথা, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ভারতের সমুদ্র-পরিবহণ-শক্তিকে ১৪·২ লক্ষ টনে উন্নীত করাই হলো জাতীয় সমুদ্র-পরিবহণ পর্ষদের (National Shipping Board) লক্ষ্য।

ভারতের স্থল-পরিবহণের দুটি অঙ্গ: রেলপথ ও সড়ক। ১৮৪৯ সালে লর্ড ডালহৌসির আমলে কলকাতার কাছে পরীক্ষামূলকভাবে রেলপথ স্থাপনের পর ১৮৫৩ সালের ১৬ই এপ্রিল বোম্বাই থেকে থানা পর্যন্ত যাত্রীবহনের জন্য ২০ মাইল দীর্ঘ রেলপথের উদ্বোধন হয়। ভারতের রেল-পরিবহণের জন্মলগ্নরূপে ঐ তারিখটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে; কিন্তু সূচনা-লগ্নে ভারতীয় রেলপথ ভারতীয় জনগণের মনোজগৎ জয় করতে পারেনি।

স্থল পরিবহণ: রেলপথ

—"They are the most unpopular institutions in India." সেদিনের রেলপথ ছিল, লর্ড ডালহৌসির একখানি কূটনৈতিক পত্রের মর্মানুসারে, বিলেতে ভারতের কাঁচামাল প্রেরণ ও এ-দেশে বিলিতি পণ্য-বিক্রয়ের প্রধান অবলম্বন এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ-নির্ভর। পুঁজিখাতে বেপরোয়া ব্যয় ও ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার দরুন যে ক্ষতি হয়েছিল, ব্রিটিশ ভারত-সরকার এ-দেশের জনসাধারণের ওপর করারোপ করে তা পূরণ

করে। তারপর দেশ স্বাধীন হলো। অবিভক্ত ভারতের ৪০.৫ হাজার মাইল দীর্ঘ রেলপথের মধ্যে ৩৩ হাজার মাইল দীর্ঘ রেলপথ ভারতের ভাগে পড়ে। ১৯৪৮ সালে বিঘোষিত শিল্প-নীতি অনুসারে রাষ্ট্রায়ত্ত হলো ভারতের রেলপথ। দেশ-বিভাগজনিত ভারতীয় রেলপথের বিচ্ছিন্ন কয়েকটি অংশের মধ্যে সংযোগ-স্থাপনকল্পে কিছু কিছু নতুন রেলপথ স্থাপন অনিবার্যরূপে দেখা দেয়। দেশ-বিভাগ থেকে দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্তিম-পর্ব পর্যন্ত মোট প্রায় ১,২০০ মাইল নতুন রেলপথ স্থাপিত হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যসূচী হলো: চিত্তরঞ্জন কারখানায় বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন নির্মাণ, ১,৬০০ মাইল দীর্ঘ রেলপথ ডবল করা, ১,১০০ মাইল রেলপথের বৈদ্যুতীকরণ, ৫,০০০ মাইল দীর্ঘ পুরাতন রেলপথের পুনর্বিন্যাস এবং ২৫০০ মাইল পুরাতনের স্থানে নতুন রেল-লাইন স্থাপন। তাতে ব্যয় হবে ১,৩২৫ কোটি টাকা। ১৯৬২-৬৩ সালে ভারতীয় রেলপথের দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ৫৭,৪০৪ কিলোমিটার। তাছাড়া উক্ত আর্থিক বর্ষে তার প্রাত্যহিক যাত্রীবহন ক্ষমতা দাঁড়ায় ৮৮ লক্ষ এবং প্রাত্যহিক পণ্য-বহন ক্ষমতা দাঁড়ায় ৫ লক্ষ টন।

ভারতের সড়ক-পরিবহণের ইতিহাস সূচিত হয় সম্রাট শেরশাহের রাজত্বকাল থেকে। তার নির্মিত বিভিন্ন সড়কগুলির দৈর্ঘ্য শুধু সে-যুগের পক্ষেই নয়, এ-যুগের পক্ষেও বিস্ময়কর! কিন্তু ব্রিটিশ আমলে ভারতের সড়ক-পরিবহণ অবহেলিত হয়ে পড়েছিল। বস্তুতপক্ষে, ব্রিটিশ সরকার রেলপথ প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্যে যে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেছে, তার বিন্দুমাত্রও যদি সড়ক-পরিবহণের ভাগ্যে বর্ষিত হতো, তাহলে ভারতের সড়ক-পরিবহণের এই দুর্দশা হতো না। এই অবহেলার পরিণামে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকারকে আত্ম-ধিক্কার দিতে হয়েছিল। সে যাই হোক, স্বাধীনতা-লাভের পর ভারত দেশ-গঠনের ব্রতে আত্ম-নিয়োগ করে সড়ক-পরিবহণের অভাবে পদে পদে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে এবং নানা প্রকল্পের রূপায়ণে আনুষঙ্গিক সড়ক-নির্মাণে তাকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে অগ্রসর হতে হয়েছে। স্মরণীয় যে, ১৯৪৩ সালে সড়ক সম্পর্কে নাগপুর পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। তাতে কুড়ি বছরের মধ্যে যে কোন উন্নত কৃষি-অঞ্চলকে সড়ক-পরিবহণের পাঁচ মাইলের মধ্যে আনার প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হয়। নাগপুর সম্মেলন ভারতের সড়কগুলিকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে: এক, জাতীয় সড়ক (National High Ways); দুই, রাজ্য সড়ক (State High Ways); তিন, জেলার প্রধান ও অপ্রধান সড়ক (District High ways) এবং চার, গ্রাম্য সড়ক (Village High Ways)। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নাগপুর পরিকল্পনার লক্ষ্যের (৩,৩১,০০০ মাইল সড়ক) চেয়ে ৬৩,০০০ মাইল বেশি সড়ক নির্মিত হয়েছে। কিন্তু বহু স্থানে সেতু-নির্মাণ এখনও বাকি। অধিকাংশ সড়কই অপ্রশস্ত এবং মোট সড়কের ৬০

সড়ক

শতাংশই কাঁচা। তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, ১৯৮১ সালের মধ্যে ভারতের সড়কের দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে ৬,৫৭,০০০ মাইল এবং সকল গ্রামকেই পাকা সড়কের ৪ মাইলের মধ্যে ও কাঁচা সড়কের দেড় মাইলের মধ্যে আনা হবে।

বিমান পরিবহণ : বেসামরিক বিমান পরিবহণ

ভারতের বিমান-পরিবহণের ইতিহাস নিতান্তই আধুনিক। ১৯১১ সালে কয়েকটি স্থানে বিমান-ভ্রমণ প্রদর্শনী দিয়ে ভারতের আকাশে বিমানের আবির্ভাব সূচিত হয়। কিন্তু বেসামরিক বিমান-পরিবহণের সূত্রপাত ১৯২৭ সালের আগে হয় নি। বিমান-পরিবহণের প্রকৃত অগ্রগতির সূচনা ১৯৪৭ সাল থেকে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে বিমান-পরিবহণের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্যে ৬'৬ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যয়িত হয় ২৪ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ রয়েছে ২৫'৫ কোটি টাকা। এখন ভারত বিমান-পরিবহণে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করে বৈদেশিক চাহিদা মেটাতেও অগ্রসর হয়েছে। ভারতের বেসামরিক বিমান-পরিবহণ দপ্তর ৮৫টি বিমান-বন্দরের রক্ষণাবেক্ষণ করে। অদূর ভবিষ্যতে আরও চারটি বিমান-বন্দরের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। অতিরিক্ত চারটি বিমান-বন্দর নির্মিত হচ্ছে। ১৯৫১ সালে রাজাধ্যক্ষ কমিটির সুপারিশক্রমে ১৯৫৩ সালে ভারতের বেসামরিক বিমান রাষ্ট্রায়ত্ত হয় এবং বিমান কর্পোরেশন আইন বিধিবদ্ধ হয়। ভারতের বিমান-পরিবহণের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সাধিত হচ্ছে।

উপসংহার

স্বাধীনতা-লাভের পর ভারতের ত্রিবিধ পরিবহণ-ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ হয়েছে, এ কথা অনস্বীকার্য। যুগের সঙ্গে সমতালে আধুনিকীকরণের ব্যবস্থাও চলেছে সমান্তরালভাবে। ভারতের পরিবহণ-ব্যবস্থার সবই আছে ; নেই কেবল ত্রয়ীর উপযুক্ত সমন্বয়। তিনটি দপ্তর তিনজন পৃথক পৃথক মন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত। এই দপ্তর পৃথকীকরণই সমন্বয়ের অভাবের মৌলিক ত্রুটি। এই দপ্তর-ত্রয়ের একীকরণ হয়তো সম্ভব নয় ; কিন্তু একই মন্ত্রকের অধীনস্থ করার পথে নিশ্চয়ই কোন বাধা নেই। ভারতের পরিবহণ-ব্যবস্থার এই ত্রি-ধারার মধ্যে সমন্বয় সাধিত হলে বৈষয়িক উন্নতির এক-লক্ষ্যে উপনীত হওয়া আরও সহজ হবে।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- স্থলপথে ও জলপথে পরিবহণ-সমস্যা, ক. বি. '৬২
- ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে রেলওয়ের সহায়তা, ক. বি. (ত্রৈবার্ষিক) '৬২

৩০. ভারতে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র
Democratic Socialism in India.

প্রবন্ধ-সূত্র :—অবতরণিকা—ভারতীয় কংগ্রেসে সমাজতন্ত্রবাদ ধারণায় বিকাশ—গণতান্ত্রিক পথে সমাজতন্ত্রের বিকাশ—সাম্যবাদ ও গণতান্ত্রিক সমাজবাদ—গণতান্ত্রিক সমাজবাদের লক্ষ্য—কৃষি ও শিল্প—কর্মে ও আচরণে বৈষম্য সমাজতন্ত্রের আদর্শ-বিরোধী—সমাজতন্ত্রের পথে পদক্ষেপ—ধানকল ও ব্যাঙ্কসমূহের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ—উপসংহার।

"অনেকে মনে করবেন, ব্যক্তিগত বা দলগত একনায়কতন্ত্র ছাড়া সমাজবাদ লাভ করা যায় না। কিন্তু আমরা আশা করি, শ্রেণী-সংঘষ ছাড়াই আমরা সমাজতন্ত্রবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারবো এবং এই ভ্রান্ত বিশ্বাসও ভাঙতে পারবো যে কোন সমাজবাদী রাষ্ট্রে মানুষের স্বাভাবিক স্বাধীনতা হারাতে হয়।"

—শ্রীকামরাজ

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের আদর্শ আমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং পরিকল্পনার প্রাণ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। দারিদ্র্য ও বৈষম্য জয়ের যে মহান্ আদর্শের কথা বিঘোষিত হয়েছে, তার জন্যে জাতীয় কংগ্রেসের ভুবনেশ্বর অধিবেশন (১৯৬৪) স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অবতরণিকা। বিশ্বের অন্যান্য বহু দেশের মতো ভারতেরও লক্ষ্য-বিন্দু সমাজবাদ। কিন্তু সেই সমাজবাদ শ্রেণী-সংঘর্ষ বা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নয়, গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে, সংসদীয় নিয়মতন্ত্রের অনুসরণে। সেই সমাজতন্ত্রের নাম গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র। ইতিপূর্বে সমাজতন্ত্রবাদের কথা ভারতের দরিদ্র ও বুভুক্ষু জনসাধারণের কানে শোনানো হয়েছিল। কেবলমাত্র কাগজে-কলমে ও কেতাবে ছাড়া বাস্তব ক্ষেত্রে তার কোন অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় নি। আবার নতুন গণতান্ত্রিক 'সমাজবাদ' প্রতিষ্ঠার কথা জনসাধারণের মনে কোন আশার বাণী সঞ্চারিত করতে পেরেছে কিনা তা গবেষণার বিষয়। এ কি নতুন কোন কর্মপদ্ধতির আন্তরিক আয়োজন? অথবা, পুরাতন কর্মধারারই নতুনতর অঙ্গসজ্জা?

১৯২৯ সালের অধিবেশনে শ্রীনেহরু বলেছিলেন: "সমাজতন্ত্রের ভাবধারা সমগ্র বিশ্বে সমাজের সমগ্র কাঠামোর মধ্যে ধীরে ধীরে অনুসৃত হচ্ছে এবং এ সম্পর্কে যে একটি মাত্র বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে, তা হচ্ছে পূর্ণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রগতির গতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে। ভারত যদি দারিদ্র্য ও বৈষম্যের অবসান ঘটাতে চায়, তবে তাকেও ঐ পথে চলতে হবে। তবে ভারত তাকে তার নিজস্ব পদ্ধতিতে রূপদান

করতে পারে এবং তার জাতির প্রতিভার সঙ্গে ঐ আদর্শকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।" তারপর ১৯৩১ সালে কংগ্রেসের বিখ্যাত করাচী প্রস্তাব থেকেই এ সত্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে, জনগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে সত্যকার অর্থ নৈতিক স্বাধীনতাকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে "আবাদী প্রস্তাবে"র সূত্র করাচী কংগ্রেসের প্রস্তাব থেকেই সংগৃহীত হয়েছে। ভারত সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে এই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

ভারতীয় কংগ্রেসে সমাজতন্ত্রবাদ ধারণার বিকাশ

জয়পুরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত হয়েছে সমাজতন্ত্রের দীক্ষা। আবাদী কংগ্রেসে যে বক্তব্য অস্পষ্ট ছিল, জয়পুরে তার যেন এক পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখা গেল। গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রই আজ আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার আদর্শ হিসেবে গৃহীত। এই উপলক্ষে এক ভাষণে শ্রীনেহরু বলেছিলেন, "অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা না এলে রাজনৈতিক গণতন্ত্র সম্পূর্ণ অর্থহীন। এরই জন্য ভারত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে।"

সোভিয়েট দেশ বা চীন যে পথে সিদ্ধিলাভ করেছে, আমরা সে পথকে কোন-ক্রমেই কাম্য বলে মনে করি না। আমরা অর্থ-সর্বস্ব যান্ত্রিক-প্রাণশূন্যতাকে প্রত্যাখ্যান করে আর্থিক উন্নতির সঙ্গে চাই মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ। কিন্তু গণতন্ত্রকে বাঁচিয়েই সব কিছু করতে হবে।

গণতান্ত্রিক পথে সমাজতন্ত্রের বিকাশ

গণতান্ত্রিক সমাজবাদ হলো কোনরূপ সামাজিক বিপর্যয় না ঘটিয়ে বিপ্লব। প্রকৃত-পক্ষে, সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয় না। তা তো বিকল্প সামাজিক স্থিতাবস্থা মাত্র। সশস্ত্র অভ্যুত্থানও বিপ্লব নয়। তাতে জীবন, কর্ম ও সংস্কৃতির অবস্থান্তর ঘটে না। একমাত্র জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার পথেই ঘটতে পারে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। বিপ্লব চাই; কিন্তু বিপ্লব শুধু আশা-আকাঙ্ক্ষার দিক থেকে নয়, দৈনন্দিন অভিব্যক্তির দিক থেকেও তা গণতান্ত্রিক হওয়া উচিত। শত-বর্ষব্যাপী সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম ও তা থেকে প্রসূত চিন্তাধারায় এই শিক্ষাই ভারত লাভ করেছে। সেই জন্যেই ভারতের কর্মসিদ্ধির পথ গণতান্ত্রিক সমাজবাদ।

পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রচলিত সাম্যবাদ ও ভারতের গণতান্ত্রিক সমাজবাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। সাম্যবাদে মুষ্টিমেয়ের আদর্শ জনসাধারণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়; কাজেই বলা যায় যে, সাম্যবাদে জনসাধারণের সহযোগিতা নেই। কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজবাদে মূল সমাজতন্ত্রের সঙ্গে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের গাঁটছড়া বাঁধা। সমাজতন্ত্র লক্ষ্য-বিন্দু; কিন্তু কর্মধারা হলো গণতান্ত্রিক। এই কর্মধারার মধ্যেই ভারতের সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর মুদ্রিত।

সাম্যবাদ ও গণতান্ত্রিক সমাজবাদ

গণতান্ত্রিক সমাজবাদের লক্ষ্য হলো: এক, জনসাধারণের দারিদ্র্যের অভিশাপ দূর করতে হবে; দুই, শিক্ষা ও বিভিন্ন বৃত্তিতে যোগদান সকলের পক্ষে সুগম করে তুলতে হবে; তিন, সকলে সকল প্রকার কর্ম-প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণে সমানাধিকারের সুযোগ পাবে। সমাজের সকল সুযোগ-সুবিধাতেই থাকবে জনগণের সম-অধিকার। বৃত্তি-নির্বিশেষে সম-মর্যাদা এই ব্যবস্থায় স্বীকৃত। গণতান্ত্রিক সমাজবাদের এগুলি হলো অপরিহার্য অঙ্গ।

গণতান্ত্রিক সমাজবাদের লক্ষ্য

সমাজতান্ত্রিক অবস্থান্তর ঘটানোর মূলে যে গণতান্ত্রিক কর্ম-পদ্ধতি আছে, তা উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হবে। তার জন্যে এক স্বাধীন, ব্যাপক ও আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং আমাদের কৃষিকে সত্বর আধুনিক কারিগরী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্প্রসারিত উৎপাদনের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে ভারী-শিল্পের সাহায্যে ধাতু, যন্ত্রপাতি এবং জ্বালানি উৎপাদন করতে হবে। জাতীয় অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে কারিগরী অবস্থান্তর ঘটাতে হবে। কৃষি যাতে বিদ্যুৎ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও শক্তি-চালিত যন্ত্রপাতির সাহায্য পায়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তাহলেই ভূমি, জল ও মনুষ্যশক্তির সমবেত মিলনে পাওয়া যাবে সর্বোত্তম ফল।

শিল্প ও কৃষি

অনেকের ধারণা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র—দুটি পৃথক কর্মধারা। কিন্তু মূলতঃ দুই এক। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র পরস্পর-অবিভাজ্য। যে লক্ষ-লক্ষ কৃষক ভারতের ক্ষেতে-খামারে পরিশ্রম করে, যেসব শ্রমিক কল-কারখানায় নিত্য নব-নব উৎপাদনে থাকে নিযুক্ত, তাদের ক্ষেত্রে এ তাৎপর্য স্পষ্ট। কৃষির ব্যাপারে ভারতের সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে কতকগুলি নীতি নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু শিল্প-সংস্থাগুলিতে একেবারে বিপরীত চিত্র প্রতিভাত হয়। বেসরকারী শিল্পোদ্যোগের প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও সরকারী শিল্পোদ্যোগগুলিতেও অফিসার ও শ্রমিকের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক বিরাট্ বৈষম্যের প্রাচীর। কেবল বেতনের ক্ষেত্রেই নয়, শ্রমিকদের প্রতি যে আচরণ করা হয়, তাও অত্যন্ত বৈষম্যপূর্ণ। কাজেই, স্বীকার করতেই হবে যে, সমাজতান্ত্রিক আদর্শ থেকে ভারত এখনও বহুদূরে। এখনও সে কলঙ্কজনক সামাজিক বৈষম্য লালন করে চলেছে।

কর্মে ও আচরণে বৈষম্য সমাজতন্ত্রের আদর্শ বিরোধী

কংগ্রেসের ভুবনেশ্বর অধিবেশনে বলা হয়েছে যে, জনসাধারণের যেটুকু ন্যূনতম প্রয়োজন, তা ১৯৭৫ সালের মধ্যেই মেটাতে হবে। ঐ প্রস্তাবে ধনসম্পদের বিকেন্দ্রী-করণ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের মধ্যে অর্থগত বৈষম্য হ্রাসের জন্যে কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করা হয়েছে। যেমন—এক, আয়ের বৈষম্য হ্রাস; দুই, আয়

ও সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ; তিন, অনুপার্জিত আয়ের ওপর বর্ধিত কর; চার, খাদ্য-শিল্পের জাতীয়করণ এবং পাঁচ; চাষীদের জন্যে অধিকতর ঋণদান ইত্যাদি।

সমাজতন্ত্রের পথে পদক্ষেপ

ভুবনেশ্বর অধিবেশন সমাজতান্ত্রিক আদর্শ-বিরোধী কতকগুলি উদ্বেগজনক প্রবণতার বিরুদ্ধে সতর্কতাবাণী উচ্চারণ করেছে। মুষ্টিমেয়ের হাতে ধন-সম্পদ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন, কতকগুলি শিল্পের উপর একাধিকার, কর-ফাঁকির প্রবণতা, অত্যাবশ্যক পণ্যগুলির কালোবাজারী ইত্যাদির অতি সত্বর অবসান ঘটাতে হবে। নইলে ধনীদের আরো ধনী এবং দরিদ্রদের আরো দরিদ্র হওয়ার সম্ভাবনা।

ভুবনেশ্বর প্রস্তাবের পটভূমিতে ধানকল ও ব্যাঙ্কগুলির রাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে প্রবল বিতর্কের ঝড় ওঠে। খাদ্য-পণ্য নিয়ে যে চোরা কারবার ও মুনাফাবাজি চলেছে, তার নিরসন-কল্পে ধানকলগুলির রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ত্বরান্বিত হওয়া উচিত। অন্যদিকে, জনগণের শেয়ার ও সঞ্চিত তহবিলের দ্বারা পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলি মুনাফাবাজি ও চোরা কারবারকে উৎসাহিত করবার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দেয় এবং অত্যাবশ্যক পণ্য-সামগ্রী গোপনে গুদামজাত করে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কাজে সাহায্য করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সব ব্যাঙ্কগুলিকে শায়েস্তা করতে পারে নি। দেশ যখন সমাজতন্ত্রী হবে, তখন ব্যাঙ্কগুলিকে তো রাষ্ট্রায়ত্ত করতেই হবে। তবে এই অযথা কালহরণ কেন?

ধানকল ও ব্যাঙ্কসমূহের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের পটভূমিতে চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, এই পরিকল্পনা সমস্যার প্রাচীর না ভেঙে যদি সমস্যার পর সমস্যার দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে তোলে, তবে ব্যর্থতার অঙ্কই জমবে হাতে। জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত মানুষের মনে এই প্রস্তাব শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিতে পারবে তো? যদি কাগজে-কলমে কিংবা বক্তৃতার সভামঞ্চেই এই প্রস্তাবের জীবন-সমাধি ঘটে, তবে জনসাধারণ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? অর্থনৈতিক উন্নয়নের উজ্জ্বল দিগন্তে পৌঁছোবার পথ হিসেবে আজ ভারত গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বস্তুনিষ্ঠ মিলন ঘটাতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু আমাদের ক্রমবিধ্বস্ত সমাজ-জীবনে এই প্রতিশ্রুত যেন কেবলমাত্র বৎসরান্তিক সান্ত্বনা-বাক্যে পরিণত না হয়। ছেচল্লিশ কোটি মানুষের জীবন-মরণ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, এই সোচ্চার ঘোষণা যেন শুধুমাত্র স্বপ্ন-বিলাসে পরিণতি লাভ না করে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- চতুর্থ পরিকল্পনা ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র
- ধানকল ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ

৩১. ভারতের প্রতিরক্ষা ও পরিকল্পনা
Defence and Development of India.

প্রবন্ধ-সূত্র :— অবতরণিকা—চ্যালেঞ্জ ও তার প্রতিরোধ—চৈনিক আক্রমণ : 'ছদ্মবেশী আশীর্বাদ'—প্রতিরক্ষা ও পরিকল্পনা—উৎপাদন বৃদ্ধি, ভোগ-সংযম, সঞ্চয়শীলতা ও প্রতিরক্ষা তহবিলে দান—কৃষি, শিল্প, বিনিয়োগ ও পুঁজি সংগ্রহ—আমদানি ও রপ্তানি—মুদ্রাস্ফীতি ও পণ্যমূল্য—উপসংহার।

নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে ভারতের দুঃখলব্ধ স্বাধীনতা আজ বিপন্ন। স্বাধীনতা-লাভে বীরের রক্তস্রোত এবং মাতার অশ্রুধারার মূল্য কখনই অর্থহীন হতে পারে না। প্রতিটি শোণিত-বিন্দু দিয়ে ভারতবাসী তাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা রক্ষায় আজ কৃত-সংকল্প। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে স্বল্পোন্নত এই দেশ যখন সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে মিশ্র অর্থনীতির ফসল ঘরে তোলার আয়োজনে ব্যস্ত এবং তার প্রথম ও দ্বিতীয় যোজনার সাফল্যের ওপর তৃতীয় যোজনার ভিত্তি রচনায় নিমগ্ন, তখনই—ঠিক তখনই প্রতিস্পর্ধী চ্যালেঞ্জ রূপে ছুটে এলো সীমান্ত সংকটের দুঃসহ সংবাদ। ভারতের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী সেদিন অবিচলিত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, এই চ্যালেঞ্জ ভারত-ভাগ্যে ঘনীভূত একটি 'ছদ্মবেশী আশীর্বাদ'।

অবতরণিকা

এই চ্যালেঞ্জ ভারতের গণতান্ত্রিক সাফল্যকে চ্যালেঞ্জ ;—ভারতের অর্থ নৈতিক জঙ্গমতাকে চ্যালেঞ্জ ;—ভারতের সামরিক প্রস্তুতিকে চ্যালেঞ্জ। সত্যকথা, ভারত শান্তির পথে তার ভবিষ্যৎ অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি রচনার স্বার্থে নিরপেক্ষতা ও সহাবস্থান-নীতির ওপর গভীর আস্থাশীল। অতি সংগত কারণেই ভারত সামরিক প্রস্তুতিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে নি। সে জন্যে তাকে তার উত্তর সীমান্তে যথেষ্ট ভুলের মাশুল দিতে হয়েছে। কিন্তু তা পরাজয় নয়, অনাগত জয়েরই বনিয়াদ রচনা। তাই তার প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের জন্যে হাত লাগাতে হয়েছে এবং তাতে প্রয়োজন পর্যাপ্ত পুঁজির। কিন্তু কোথা থেকে আসবে সেই পুঁজি? পরিকল্পনার রূপায়ণে যেখানে পুঁজির ঘাটতি লেগেই আছে, সেখানে প্রতিরক্ষার নবরূপায়ণে অনুরূপ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

চ্যালেঞ্জ ও তার প্রতিরোধ

তবে কি প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে তোলার জন্যে পরিকল্পনাকে বিকলাঙ্গ করতে হবে? আপাততঃ তাই মনে হতে পারে। কিন্তু ওপথে সমস্যার সমাধান নেই। প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করে তোলার জন্যে পরিকল্পনাকে

আরো জোরদার করে তুলতে হবে। সেদিন ভারত স্বাধীন হয়েছে। এরই মধ্যে বার্ধক্যের জড়তা তার পরিকল্পনাকে স্পর্শ করেছিল। সেখানে নব-যৌবনের গতি-চাঞ্চল্য সঞ্চারিত করবার জন্যে প্রয়োজন ছিল এরূপ একটা আকস্মিক বিপৎপাতের। উত্তর সীমান্ত আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে যে, আমাদের আরো সম্পদশালী হতে হবে; হতে হবে আরো আত্মবিশ্বাসী, কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে আরো উৎপাদনশীল। ত্রিশ বছরের বৈষয়িক সফলতাকে দশ বছরের মধ্যে সম্ভব করে তুলতে হবে।

চৈনিক আক্রমণ 'ছদ্মবেশী আশীর্বাদ'

ইতিহাসের শিক্ষাই হলো এই যে, যুদ্ধ শিল্প-প্রগতিতে সঞ্চারিত করে অভূতপূর্ব গতির উচ্ছ্বাস। শান্তি-ব্রতী রাষ্ট্র হিসেবে, সমস্যা-জর্জরিত রাষ্ট্র হিসেবে ভারতকে তার সম্পদকে প্রতিরক্ষা ও পরিকল্পনা—এই দুই ধারায় প্রবহমান করে তুলতে হবে। এবং তার প্রতিরক্ষা-প্রয়াসই হবে তার শিল্পায়ন গতির উৎস। আধুনিক কালের যুদ্ধ হলো সামগ্রিক জাতীয় প্রয়াসের সঙ্গে যুদ্ধ। কাজেই, আমাদের প্রতিরক্ষার স্বার্থে আমাদের সামগ্রিক জাতীয় প্রয়াসকে আরো শক্তিশালী করে তুলতে হবে। যে যুদ্ধ আজ আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে আমাদের অবশ্যই মোকাবিলা করতে হবে। সেই মোকাবিলা হবে রণাঙ্গনে, শিল্পায়নে এবং খামারে-খামারে। মোদ্দা কথা হলো, প্রতিরক্ষার খাতিরে আজ কারিগরী ও শিল্প-শৈলীর ত্বরিত উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ রচনা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

প্রতিরক্ষা ও পরিকল্পনা

আজ আমাদের সকল শক্তি দিয়ে উৎপাদন-পদ্ধতিতে গতির সঞ্চার করতে হবে; সেই সঙ্গে আমাদের সকল পণ্যের উপভোগ হ্রাস করতে হবে। অর্থাৎ কিনা, একদিকে উৎপাদন-বৃদ্ধি, অন্যদিকে ভোগ-সংযম। তাহলে আমাদের প্রতিরক্ষা-প্রয়াস দ্বিগুণিত হবে। প্রতিরক্ষা ও পরিকল্পনা-খাতে বিনিয়োগ-বৃদ্ধির ফলে কর্ম-সংস্থান ও আয়ের সুযোগ-বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের হাতে আসবে কাঁচা টাকা। তার ফলে, পণ্য-মূল্য-বৃদ্ধি ইত্যাদি নানা অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় আমাদের প্রতিরক্ষা-প্রয়াস বানচাল হয়ে যেতে পারে। তাই ভোগ-বিরতি নয়, আজ ভোগ-সংযম একান্তভাবে প্রয়োজন; প্রয়োজন সঞ্চয়-অভ্যাস। প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট ইত্যাদি কিনে একসঙ্গে প্রতিরক্ষা ও সঞ্চয়শীলতাকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে।

উৎপাদন-বৃদ্ধি, ভোগ-সংযম, সঞ্চয়শীলতা ও প্রতিরক্ষা তহবিলে দান

আধুনিক সংগ্রাম কেবল রণাঙ্গনেই নয়, কৃষি-খামারেও তার বিস্তার। যুদ্ধকালে সৈন্যবাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি পায়। তার রসদের প্রয়োজন এবং দেশের জনসাধারণের খাদ্যের প্রয়োজন মেটাতে খামারে ফসলের বান ডাকাতে হবে। সেই সঙ্গে কর্ম-চঞ্চল

কলকারখানাগুলির ক্ষুধা মেটাতে হবে কৃষিকে। বিদেশ থেকে খাদ্য বা কাঁচামালের আমদানি হ্রাস করতেই হবে। কারণ যুদ্ধকালে পর-নির্ভরতা বিপজ্জনক এবং সেই জন্যে পরিহার্য। অন্যদিকে, জাতীয় সংকটের গুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে শিল্প-ক্ষেত্রে জাগবে নতুন কর্মোদ্দীপনা। আমাদের প্রথম সীমান্ত ভৌগোলিক সীমান্তেই; দ্বিতীয় সীমান্ত শিল্প-ক্ষেত্রে; কৃষি-ক্ষেত্র আমাদের তৃতীয় সীমান্ত। সেইভাবে আমাদের সৈন্য সমাবেশ করতে হবে। ভৌগোলিক সীমান্তে কেবল জওয়ানরাই যুদ্ধ করবে না, আমাদের শিল্প-সীমান্তে ও কৃষি-সীমান্তে যারা ব্যূহ রচনা করে দাঁড়িয়েছে, তারাও যুদ্ধ করবে। শান্তিকালীন শিল্পনীতি তাই সমরকালীন শিল্পনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রতিরক্ষা-শিল্প ও প্রতিরক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পের দিকে বিনিয়োগের মোড ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিল্প-সীমান্তে নবতর কর্মোদ্যম-সৃষ্টি-কল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা-সংগ্রহের জন্যে নানা পর্যায়ে চেষ্টা চলেছে; অন্যদিকে, দেশের অভ্যন্তর থেকে প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহের দিকেও মনোনিবেশ করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা-তহবিলে সাহায্য সংগ্রহ, প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট ও প্রতিরক্ষা বণ্ড বিক্রয়, নানারূপ কর-পীড়ন এবং কাঞ্চন পত্র বিক্রয় ইত্যাদির মাধ্যমে অন্তর্দেশীয় পুঁজি-সংগ্রহ-প্রয়াস পূর্ণদমে চলেছে। প্রতিরক্ষা-খাতে ৫০০ কোটি টাকা, শিল্প-ক্ষেত্রে ২০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ প্রয়োজন। অর্থ-সংকুলানের জন্যে শিক্ষা ও সমষ্টি উন্নয়ন খাতে ব্যয় সংকোচ করা হবে। তা সত্ত্বেও দেশবাসীকে ৩০০/৪০০ কোটি টাকার মতো করভার বহনের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ শ্রমিক সংঘগুলি ঘোষণা করেছে যে, জাতীয় সংকটকালে তারা কোনরূপ ধর্মঘটে যোগদান করবে না।

কৃষি, শিল্প, বিনিয়োগ ও পুঁজি সংগ্রহ

আমদানি হ্রাস করে রপ্তানি বৃদ্ধি করাই সমরকালীন অর্থনীতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সেই বৈশিষ্ট্যে আমাদের অনুপ্রাণিত হতে হবে। উৎপাদন-বৃদ্ধি ও ভোগ-সংযমের মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্যকে সম্প্রসারিত করতে হবে। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে বিদেশ থেকে সমরোপকরণ ক্রয় করতে হতে পারে। সে জন্যে বিদেশী মুদ্রার সাচ্ছল্য অপরিহার্য।

আমদানি ও রপ্তানি

যুদ্ধের যে সব অশুভ প্রতিক্রিয়া আমাদের আতঙ্কিত করবে, তা হলো মুদ্রাস্ফীতি, পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, মজুতদারী, চোরাকারবার ইত্যাদি। অতিরিক্ত কর্ম-সংস্থান ও আয়ের সুযোগ-সৃষ্টির ফলে জনগণের হাতে যে অতিরিক্ত ক্রয়-ক্ষমতা আসবে, তা মুদ্রাস্ফীতি ও পণ্যমূল্য-বৃদ্ধিকে সাহায্য করবে। তাই জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা-বৃদ্ধির পাশাপাশি সৃষ্টি করতে হবে সঞ্চয়-বৃদ্ধির সুযোগ-সুবিধা। তাতে যদি অতিরিক্ত ক্রয়-শক্তিকে কেড়ে নেওয়া সম্ভব না হয়,

মুদ্রাস্ফীতি ও পণ্যমূল্য

কর-পীড়নের দ্বারা তা শোষণ করে নিতে হবে। তা না হলে মজুতদারী ও চোরাকারবার ইত্যাদি অশুভ শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠতে পারে।

বাস্তবিকই, যুদ্ধ বা জাতীয়-সংকট ভারত-ভাগ্যে অভিসম্পাতই বহন করে এনেছে। আশা ছিল, আমরা তাকে ভাগ্য-দেবতার আশীর্বাদে রূপান্তরিত করতে পারবো। কিন্তু জাতীয় সংকটের দু বছর প্রমাণিত করেছে, আমরা তা পারি নি। তা যে পারি নি, তার সকল দুর্লক্ষণ আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ভয়াবহরূপে প্রকটিত। প্রথমতঃ, এই যুদ্ধ সংঘর্ষের চেয়ে স্থিতাবস্থায় সীমিত থাকায় তার ক্রিয়াশীলতার চেয়ে নিষ্ক্রিয়তার প্রবণতা অধিক। সীমান্ত-সংঘর্ষের নিষ্ক্রিয়তা শিল্প এবং কৃষি-সীমান্তে সঞ্চারিত হয়েছে। কাজেই, প্রত্যাশিত কর্মোদ্দীপনা আসে নি ভারতের জাতীয় ও অর্থ নৈতিক জীবনে। দ্বিতীয়তঃ, কর্ম ও আয়ের সংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে শ্রেণী-বিশেষের, সর্বসাধারণের নয়। বিশেষ প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত শিল্প-শ্রমিকের আয়বৃদ্ধি হয়েছে, শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই পণ্যমূল্য উর্ধ্বমুখী হয়েছে। কিন্তু তার পীড়ন সহ্য করতে হচ্ছে সর্বসাধারণকে। জনসাধারণ অতিরিক্ত কর-পীড়নে ও পণ্যমূল্য-বৃদ্ধির চাপে আজ তাই রুদ্ধকণ্ঠে প্রার্থনা করছে: কবে এই দুঃসহ রজনীর অবসান হবে? সংকট মুক্ত হয়ে কবে শান্তির সূর্যালোকে স্নান করে উঠবে এই বুদ্ধ-গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের ভারত-ভূমি? প্রচ্ছন্ন ধনতন্ত্র নয়, প্রকৃত সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা আর কত দূর? 'নূতন-উষার স্বর্ণদ্বার খুলিতে বিলম্ব কত আর?'

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- শান্তিকালীন অর্থনীতি ও যুদ্ধকালীন অর্থনীতি
- ভারতের জাতীয় সংকট

৩২. য়ুরোপীয় বারোয়ারী বাজার ও ভারত
European Common Market and India.

প্রবন্ধ-সূত্র :—অবতরণিকা—য়ুরোপীয় বারোয়ারী বাজারের পূর্ব-সূত্র—য়ুরোপীয় বাজারের উদ্ভবের ইতিহাস—য়ুরোপীয় বারোয়ারী বাজারে ব্রিটেনের যোগদান প্রসঙ্গ—ব্রিটেনের যোগদানে সম্মতির কারণ—ভারতীয় বাণিজ্যে সংকট—ব্রিটেনের আবেদন নাকচ—সংকট-উত্তরণের উপায়—উপসংহার।

অবতরণিকা

য়ুরোপের শক্তি-সামর্থ্যের প্রধান উৎস ছিল সমৃদ্ধ আফ্রো-এশীয় উপনিবেশগুলি। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুর্জয় আঘাতে তারা য়ুরোপের হাতছাড়া হয়ে গেল। ওদিকে যুদ্ধের চরম মূল্য দিতে গিয়ে তার শেষ কাণাকড়িটি পর্যন্ত ব্যয়িত হয়ে গেছে। তাই যুদ্ধোত্তরকালীন অর্থনীতির পুনর্গঠনের সংকল্প গ্রহণ করে য়ুরোপীয় দেশগুলি দেখলো, তাদের অর্থনীতি দেউলে হয়ে গেছে এবং আফ্রো-এশীয় উপনিবেশগুলি থেকে সম্পদ-প্রবাহের ধারা-স্রোতও অবরুদ্ধ। শুধু তাই নয়, দক্ষিণ ও পূর্ব দিগন্ত থেকে বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে বৈষয়িক উন্নয়নের প্রবল ঝড় উঠছে এশিয়া ও আফ্রিকায়। সর্বস্বান্ত, ভীত য়ুরোপ আজ তার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবে কি করে? য়ুরোপীয় অবাধ বাণিজ্য সংস্থা (EFTA) ও য়ুরোপীয় বারোয়ারী বাজার (ECM) য়ুরোপের সেই আত্মরক্ষার নবাবিষ্কৃত কবচ।

য়ুরোপীয় বারোয়ারী বাজারের পূর্ব সূত্র

বিশ্বের দুই শক্তি-সীমান্তে আজ দাঁড়িয়ে আছে দুই দুর্জয় শক্তি: সোভিয়েট রাশিয়া ও আমেরিকা। তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবার মতো তৃতীয় কোন শক্তি আজ নেই। তবু এই দুই শক্তি-সীমান্তের মাঝখানে য়ুরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র নামে তৃতীয় একটি শক্তি-চক্র সংগঠনের স্বপ্ন প্রথমে এসেছিল ফরাসী রাষ্ট্র-ধুরন্ধরদের মগজে। কমিউনিজ্‌ম-আতঙ্ক এবং সোভিয়েট-বিরোধিতা হেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রসারিত করে দিয়েছে তার সমর্থনের বন্ধুত্ব-বিলাসী হাত। কিন্তু ফরাসী নেতৃবৃন্দের আত্যন্তিক য়ুরোপীয় ঐতিহ্য-প্রীতির ফলে এই মার্কিনী অনুপ্রবেশ সম্ভব হয় নি। তাই সম্পূর্ণরূপে য়ুরোপীয় শক্তি-সমবায়ে সংগঠিত হলো একটি তৃতীয় শক্তি-চক্র। নাকি এ য়ুরোপের বহু-শ্রুত সেই শক্তির ভারসাম্য-নীতির (Policy of Balance of Power) পুনরাবৃত্তি?

১৯৫৯ সালের প্রথম দিকে রোম-চুক্তির (Treaty of Rome) দ্বারা ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইতালি, বেলজিয়াম ও লাক্সেমবার্গ—য়ুরোপের এই রাষ্ট্র-ষষ্টক গ্রহণ করে ধাপে ধাপে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংহতি-সাধনের সংকল্প। চুক্তিবদ্ধ এই

রাষ্ট্র-ষষ্ঠক য়ুরোপীয় অর্থনৈতিক সমাজ (European Economic Community) নামে পরিচিত হয়। প্রাথমিক ব্যবস্থারূপে চৌদ্দ বছরের মধ্যে এরা পরস্পরের মধ্যে শুল্ক-বিহীন অবাধ বাণিজ্য এবং চুক্তি-বহির্ভূত দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য-ব্যাপারে একটি শুল্ক-প্রাচীর স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। চতুর্দিকে এই প্রাচীরের সীমা-বেষ্টনীর মাঝখানে যে শুল্ক-বিহীন বাজার ভূমিষ্ঠ হলো, তার নাম য়ুরোপীয় বারোয়ারী বাজার (European Common Market)। ছয়টি প্রাথমিক সদস্য-রাষ্ট্রকে বলা হয় আভ্যন্তরীণ ষষ্ঠক (Inner Six)। তারা বারোয়ারী বাজার পরিচালনার জন্যে একটি কমিশন (Common Market Commission) বসিয়েছে, ছয় দেশের আইনসভার সদস্যদের নিয়ে একটি সংসদীয় সদস্য সমিতি (Assembly of Parliamentarians) গঠন করেছে, একটি যুক্ত মন্ত্রী-পরিষদ (Council of Ministers) স্থাপন করেছে এবং সংগঠিত করেছে একটি যুক্ত আদালত (Court of Justice)।

য়ুরোপীয় বারোয়ারী বাজার উদ্ভবের ইতিহাস

১৯৫৯ সালের শেষ দিকে ব্রিটেন, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া, পর্তুগাল, সুইজারল্যাণ্ড—এই সাতটি দেশ ধাপে ধাপে য়ুরোপীয় বারোয়ারী দেশগুলির সঙ্গে সমতালে শুল্ক হ্রাস করে শুল্ক-বিহীন অবাধ-বাণিজ্য স্থাপনের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই সাতটি রাষ্ট্র বহিঃস্থ সপ্তক (Outer Seven) নামে পরিচিত। এই বহিঃস্থ সপ্তক রাষ্ট্র-গোষ্ঠী ইতিপূর্বে ব্রিটেনের নেতৃত্বে য়ুরোপীয় অবাধ বাণিজ্য সংস্থা (European Free Trade Association) গঠন করেছিল। ব্রিটেন সেই সংস্থার স্বার্থের খাতিরে য়ুরোপীয় বারোয়ারী বাজারে যোগদানের সম্মতি-দানে বিরত ছিল। কিন্তু অন্তর্বিরোধের ফলে য়ুরোপীয় বাণিজ্য-সংস্থার চিরসমাধি রচিত হওয়ায় ব্রিটেনকে তার অতীত সিদ্ধান্তটির পুনর্বিবেচনা করতে হলো। শেষ পর্যন্ত ১৯৬১ সালে ব্রিটেন য়ুরোপীয় বারোয়ারী বাজারে যোগদানের সম্মতি দান করে।

য়ুরোপীয় বারোয়ারী বাজারে ব্রিটেনের যোগদান প্রসঙ্গ

ব্রিটেনের এই যোগদানের পেছনে কতকগুলি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ ছিল। সেগুলি হলো: এক, পরস্পর-বিরোধী বাণিজ্য-গোষ্ঠীর অস্তিত্বে অতলান্তিক চুক্তির (NATO) ছত্রচ্ছায়ায় কমিউনিজমের প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে পড়েছিল; দুই, সম্প্রসারণশীল য়ুরোপীয় বারোয়ারী বাজারের বাইরে থাকলে ব্রিটেনকে পণ্য-বিক্রয়ের সম্ভাবনাপূর্ণ বাজার হারাতে হবে; তিন, ব্রিটেনের যুদ্ধোত্তর অর্থনীতির পুনর্গঠনে বারোয়ারী বাজারের সদস্য-রাষ্ট্রের সহযোগিতা প্রয়োজন; চার, উপনিবেশ ও কমনওয়েল্‌থ্‌ভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে তার বাণিজ্য ক্রমাগত নিম্নমুখী; পাঁচ, সতের কোটি

ব্রিটেনের যোগদানে সম্মতির কারণ

লোকের জনসংখ্যার য়ুরোপীয় বারোয়ারী বাজারের সুবিধা লাভে ব্রিটেন বঞ্চিত হয়েছিল; ছয়, শুল্ক-প্রাচীরের বাইরে ব্রিটেনের অবস্থিতির ফলে ব্রিটেনকে শুল্ক-বৈষম্যজনিত নিদারুণ পরাজয় বরণ করতে হচ্ছিল; সাত, ব্রিটেন শক্তি-সংঘর্ষে সোভিয়েট রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশে তার স্থান করে নিতে অত্যন্ত প্রয়াসী; আট, নব নব শিল্প-শৈলী করায়ত্ত করবার জন্যে ব্রিটেনের বারোয়ারী বাজারে যোগদান প্রয়োজন; এবং নয়, ব্রিটেন বারোয়ারী বাজারে যোগদান করলে কমনওয়েল্‌থ্‌ভুক্ত দেশগুলির বৈষয়িক সমৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত হবে।

ব্রিটেনের য়ুরোপীয় বারোয়ারী বাজারে যোগদানের সিদ্ধান্তটি ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কে এনেছিল গভীর পরিবর্তনের সম্ভাবনা, এনেছিল ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে ভয়াবহ সংকটের আশঙ্কা। ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক দীর্ঘকালের। ব্রিটেন ভারতের চা, কফি, পাটজাত দ্রব্য, কার্পাস বস্ত্র, উদ্ভিজ্জ তৈল ইত্যাদির একজন পুরাতন ক্রেতা। ব্রিটেন বারোয়ারী বাজারে যোগদান করলে ভারতকে এই ব্যাপক রপ্তানি-সংকটের সম্মুখীন হতে হতো। তামাক ছাড়া ভারতের সকল পণ্যই কমনওয়েল্‌থ্‌-পক্ষপাতের সুযোগ সুবিধাজনক শর্তে এখনও বিনা শুল্কে ব্রিটেনে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু বারোয়ারী বাজারের শুল্ক-প্রাচীরের অন্তরালে ব্রিটেন অবস্থান করলে ভারতকে প্রচুর শুল্কের সেলামী দিয়ে তবে ব্রিটেনে প্রবেশ করতে হতো। ভারতীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি হতো অনিবার্য এবং বারোয়ারী বাজারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাজয় হতো তার ভাগ্যলিপি। ভারতের সুতী বস্ত্রের প্রবল প্রতিযোগী হতো ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানী; পাট-পণ্যের সঙ্গে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হতো বেলজিয়াম। মোট কথা, ভারতের পরিকল্পিত অর্থনীতির সংগঠনের প্রাক্কালে ব্রিটেনের এই বিশ্বাসঘাতকতা ভারতের বাণিজ্যে এক কঠিন আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছিল।

ভারতীয় বাণিজ্যে সংকট

সুখের কথা, ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাসে ব্রিটেনের সদস্য-পদের আবেদন য়ুরোপীয় বারোয়ারী বাজারের সদস্যগোষ্ঠী কর্তৃক নাকচ হয়ে গেছে। কাজেই, ভারত-ব্রিটেনের বাণিজ্যিক সম্পর্কের কোন অবনতি ঘটেনি। তবে ভবিষ্যতে বৃটেনের সদস্যপদ লাভের সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কাজেই, বর্তমানে সংকটের মেঘ কেটে গেছে বলে আবার যে তা ভবিষ্যতে ভারত-ভাগ্যে ঘনিয়ে আসবে না, তার ভরসাই বা কোথায়?

ব্রিটেনের আবেদন নাকচ

ভারতের বাণিজ্য-নীতির পুনর্বিবেচনা ও পুনর্বিন্যাসের সময় আজ এসেছে। ভারতের ক্রম-সম্প্রসারণশীল অর্থনীতির বিকাশে ব্রিটেন আশঙ্কিত হচ্ছে। সে ভারতের হাতে দীর্ঘদিন কমনওয়েল্‌থ্‌-পক্ষপাত তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে না। কাজেই,

ভারতকে আপন ভাগ্য-রচনার সমূহ দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে। য়ুরোপীয় বারোয়ারী বাজারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাকে একদিন নয় একদিন অবতীর্ণ হতেই হবে। সেজন্তে তাকে পণ্যের উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস এবং পণ্য-মানের উৎকর্ষ-বৃদ্ধির দিকে এখনই মনোযোগী হতে হবে। সেই সঙ্গে পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক গাঁটছড়া বেঁধে দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হবে। এদিকে আফ্রো-এশীয় দেশগুলির বাজারও ভারতীয় পণ্যের পক্ষে অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। য়ুরোপীয় বারোয়ারী বাজারকে চ্যালেঞ্জ করে আফ্রো-এশীয় বারোয়ারী বাজার গঠনের দিকে মন দেবার দিন আজ এসেছে।

সংকট উত্তরণের উপায়

ব্রিটেনের য়ুরোপীয় বারোয়ারী বাজারে যোগদানের বাসনা একদিক দিয়ে ভারতের পক্ষে শুভ হয়েছে। ভারত আর ব্রিটেনের বাণিজ্যিক ও অর্থ নৈতিক প্রতিশ্রুতির ওপর গভীর আস্থা স্থাপন করতে পারবে না। পরনির্ভরতার হাত থেকে মুক্ত হয়ে সে স্ব-নির্ভর বাণিজ্য এবং অর্থনীতি গড়ে তোলায় তাই প্রয়াসী হয়েছে। ব্রিটেন ভবিষ্যতে য়ুরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগদান করলেও ভারতের বিশেষ ক্ষতি হবে না, যদি ভারত এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে তার বাণিজ্যিক সীমানা প্রসারিত করে দিতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, চীনের পঁয়ষট্টি কোটি মানুষের বাজার ইতিমধ্যে ব্রিটেন ও ফ্রান্স দখল করতে সুরু করেছে। চীন-ভারত সম্পর্কের উন্নতি হলে ভবিষ্যতে ভারত লাভবান হবে। তখন ভারত-ব্রিটেনের সম্পর্কের অবনতি হলেও অন্তদিক থেকে তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- ব্রিটেনের য়ুরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগদান বনাম ভারতীয় অর্থনীতি, ক. বি. (ত্রৈবার্ষিক) '৬২
- য়ুরোপীয় সাধারণ বাজার ও ভারতের অর্থ নৈতিক স্বার্থ

প্রবন্ধ-সূত্র :—অবতরণিকা—মেলার তিনটি মৌলিক দিক : মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক—শিল্পী ও ক্রেতার মধ্যে সংযোগ-সাধন—কৃষি ও শিল্প-মেলা : ভারতে—বিদেশে ভারতীয় পণ্যের প্রদর্শনী—প্রাচীন কালের মেলার সাফল্য—আধুনিক কৃষি-মেলার সাফল্য—আধুনিক শিল্প-মেলার সাফল্য—উপসংহার।

৩৩. কৃষি ও শিল্প-মেলায় ভারত

India in Agricultural and Industrial fair.

"যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম, তেমনি বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেলা। মেলা ভারতের পল্লীর সর্বজনীন উৎসব। কোন উৎসব প্রাঙ্গণের মুক্ত অঙ্গনে সরল গ্রামবাসীর মনের উচ্ছ্বসিত মিলনস্থল হইল মেলা।" —রবীন্দ্রনাথ

অবতরণিকা

অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারত বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন উপলক্ষে করেছে বহুতর মেলার আয়োজন। বহু মানবের সমাগমে তার মেলা পরিণত হয়েছে মহান্ মিলন তীর্থে। সে উন্মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে দুই বাহু প্রসারিত করে ডেকেছে দেশবিদেশের মানুষকে। কেবল স্বদেশকে আহ্বান করে সে ক্ষান্ত হয়নি, সেই সঙ্গে সে ডেকেছে বহির্বিশ্বকে। 'আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের জগতের রক্ত চলাচল অনুভব করবার' জন্যে তার যে আকুল আগ্রহ, তারই উদ্যোগ আয়োজন হলো গ্রামীণ মেলা। সেই মেলাকে কেন্দ্র করে তার সমাজ, তার অর্থব্যবস্থা, তার কৃষ্টি-সংস্কৃতি, তার সভ্যতা ও সমৃদ্ধি বিকশিত হয়ে উঠেছে।

মেলার তিনটি মৌলিক দিক : মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক

'মেলা' কথাটির আক্ষরিক অর্থ হলো 'মিলন'। মেলার আছে তিনটি মৌলিক দিক : মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক। মনস্তাত্ত্বিক দিক হলো ভাব, চিন্তা ও আদর্শের লেনদেনগত ব্যাপার; সামাজিক দিক হলো পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলন ও সৌহার্দ্যের আহ্বান; অর্থনৈতিক দিকটি হলো, গ্রামীণ পণ্য-সম্ভারের ক্রয়-বিক্রয়। সারাবছর কৃষক রোদে পুড়ে, জলে ভিজে তার সংক্ষিপ্ত জোত-জমিনের সীমায়তনের মধ্যে ফসল ফলাবার কাজে ডুবে থাকে; গ্রামীণ শিল্পী শিল্প-দ্রব্য উৎপাদনের ব্রতে তার শিল্পোপকরণের মধ্যে থাকে নিমগ্ন। ক্ষুদ্রায়তন কুটিরের সীমাবেষ্টনীর মধ্যে নানা তুচ্ছতা, নানা ক্ষুদ্রতা নিয়ে জীবন-ধারণের দুঃখ-দহনের জ্বালায় সে পড়ে হাঁপিয়ে। 'সহেনা সহেনা আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।' সেই গতানুগতিকতার

কর্ম-ক্লান্তির হাত থেকে সে চায় সাময়িক মুক্তি, চায় বৃহৎ-জীবনের আস্বাদ। তাই তো মেলার পরিকল্পনা। বহুদিন থেকে কৃষক, শিল্পী ও কারিগর তাদের প্রতিভা ও পরিশ্রমের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনকে মেলার জন্যে নির্বাচিত করে সঞ্চয় করে রাখে। দালাল-ফড়িয়া ইত্যাদির চেয়ে মেলায় অনেক বেশি মূল্য ও মর্যাদা পাবে তাদের পণ্য; অধীর আগ্রহে গ্রামবাসিগণ এবং দূর-দূরান্তরের সৌখিন ক্রেতারা পথ চেয়ে থাকে।— কবে মেলা বসবে? সে আর কতো দেরি?

শিল্পী ও ক্রেতার মধ্যে সংযোগ-সাধন

মেলার মাধ্যমে শিল্পীর প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব হয়। তাদের পণ্য-সম্ভারে প্রতিভার যে স্বাক্ষর মুদ্রিত হয়, বহুজনসমাবেশে তার উৎকর্ষ প্রমাণিত হয় এবং পুরস্কৃত হয়। তাছাড়া, সুস্থ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হয়, তা শিল্পীর জীবনে ব্যর্থ হয় না। ফলে শিল্পীর পণ্যের খ্যাতি স্বদেশে ও বিদেশে সম্প্রসারিত হয় এবং দেশের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। মেলা সহৃদয় ক্রেতা ও প্রতিভাবান শিল্পীর মধ্যে রচনা করে দেয় লেনদেনের অদৃশ্য সেতু।

কৃষি ও শিল্প-মেলা: ভারতে

আধুনিক কালে মেলারও আধুনিকীকরণ সাধিত হয়েছে। এই আধুনিকীকরণ কাজে মেলার সঙ্গে প্রদর্শনীর নিবিড় গাঁটছড়া বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এবং তার প্রয়োজনও আছে; প্রয়োজন আছে পণ্য-উৎপাদন ও পণ্য-বিকিকিনির জলুসময় আবেদনের। পূর্বে ভারতের শিল্পায়োজন ছিল কুটির-কেন্দ্রিক তথা গ্রাম-কেন্দ্রিক। এখন নব-শিল্পায়নের দৌলতে বৃহদায়তন শিল্পোদ্যোগ গড়ে উঠছে ভারতের দিকে দিকে। আর তার পাশে পাশে শিল্পোৎকর্ষের নিশ্চিত স্বাক্ষর নিয়ে এগিয়ে চলেছে কুটির-শিল্প ও ক্ষুদ্র-শিল্প। এই সব মেলা একদিকে যেমন ভৌগোলিক বিস্তৃতি লাভ করেছে, অন্যদিকে তেমনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রচিত হয়েছে এদের পরিকল্পনা। কৃষি মেলা বা শিল্প-মেলার ভৌগোলিক বিস্তৃতি আজ কেবল রাজ্যমাত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। সমগ্র ভারত, এমনকি সমগ্র পৃথিবী আজ তাদের পটভূমি। ইতিমধ্যে নয়াদিল্লীতে ও কলকাতায় কৃষি-মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। মাদ্রাজে ভারতের পরবর্তী কৃষি-মেলা অনুষ্ঠানের আয়োজন চলেছে। কলকাতায় দুটি শিল্প-মেলা হয়ে গেছে। ভারত সরকার ও রাজ্যসরকারের সম্মিলিত উদ্যোগে এবং বিশ্বের সমৃদ্ধ রাষ্ট্র-সমূহের অকুণ্ঠ যোগদানে মেলাগুলি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

বিদেশে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা-সৃষ্টি ও চাহিদা-বৃদ্ধি-কল্পে ভারতে প্রদর্শনী অধিকার (Directorate of Exhibitions) স্থাপিত হয়েছে। বিদেশে ভারতের পণ্যোৎকর্ষ সপ্রমাণ করে রপ্তানি-বৃদ্ধির দায়িত্ব এই দপ্তরের হাতে ন্যস্ত। আনন্দের কথা, ভারতীয়

পণ্যের প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক প্রচার আজ বিদেশে সাফল্য লাভ করছে। ইতিমধ্যে ভারতীয় প্রদর্শনী অধিকারের নেতৃত্বে ১৯৬২-৬৩ সালে সিঅ্যাটল্ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র), লিপ্‌জিগ্ (পূর্ব জার্মানী), জাগ্রীব্, বেলগ্রেড্ (যুগোশ্লাভিয়া), পজ্‌নন (পোল্যাণ্ড), দামাস্কাস (সিরিয়া), মিলান্ (ইতালি), ইজ্‌মীর (তুর্কী), হ্যানোভার (পশ্চিম জার্মানী), সিড্‌নি (অষ্ট্রেলিয়া), তিউনিস্ (তিউনিসিয়া), ল্যাগোস্ (নাইজেরিয়া) এবং ত্রিপোলী (লিবিয়া)—এই স্থানগুলিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-মেলা ও প্রদর্শনীতে ভারত সাফল্যের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেছে। ১৯৬৩-৬৪ সালে বুডাপেস্ট (হাঙ্গেরী), পজ্‌নন্ (পোল্যাণ্ড), লিপ্‌জিগ্ (পূর্ব জার্মানী) ও কুয়ায়েত (পারস্য উপসাগর) প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-মেলা ও প্রদর্শনীতে এবং ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক এবং পশ্চিম বার্লিনে অনুষ্ঠিত গ্রন্থ-মেলায় ভারত সাফল্যের সঙ্গে যোগদান করেছে। ১৯৬৩ সালে মস্কোতে ভারতীয় পণ্যের বিপুল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় এবং তাতে ভারতীয় পণ্য যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। তাছাড়া ১৯৬৪-৬৫ সালে নিউইয়র্কে যে বিশ্ব-মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, তাতেও ভারত সাফল্যের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেছে। এবং সেখানে দর্শকদের মনে ভারতীয় পণ্য গভীর স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বিদেশে ভারতীয় পণ্যের প্রদর্শনী

প্রাগাধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতে গতানুগতিক রীতিতে মেলা বসেছে, ভেঙে গেছে; কিন্তু ভারতীয় কৃষি বিশেষ উপকৃত হয়নি। ভারতের নিরক্ষর, পরিবর্তন-বিমুখ, দারিদ্র্য-নিপীড়িত ভারতীয় কৃষক-সমাজের কাছ থেকে এমন কিছু নবলব্ধ অভিজ্ঞতার কথা প্রত্যাশা করা যায় না, যা কৃষি-জগতে একটা বিস্ময়কর পরিবর্তন আনতে পারে। তবে শিল্প-জগতে মেলার অবদান ছিল যথেষ্ট। শিল্পীরা পরস্পরের চেয়ে উৎকৃষ্টতর পণ্য-উৎপাদনের সুস্থ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতো; তাতে যে সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী সুফল ফলতো, তা বলা বাহুল্য। তাতে পণ্যোৎকর্ষ-সাধন সম্ভব হয়েছে এবং ভারতের রপ্তানির অংশও দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রাচীন কালের মেলার সাফল্য

আধুনিক কালের মেলা সেই বিচারে সফলতর। কৃষি মানুষের ক্ষুধা-হরণের ব্রত গ্রহণ করেছে। কৃষি মানুষকে কত বিচিত্র সম্ভাবনার ঐশ্বর্য দিয়ে সুখী করতে পেরেছে, তার আন্তর্জাতিক কৃতিত্বের বিস্ময়কর রূপ কৃষি-মেলা তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে। বিভিন্ন দেশের কৃষি-প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন তুলে ধরে কৃষি-মেলা আমাদের গতানুগতিক কৃষি-পুনর্জীবনায়নের উৎসাহ কতোখানি সঞ্চারিত করতে পেরেছে, তা অবশ্যই আলোচিতব্য।

আধুনিক কৃষি-মেলার সাফল্য

ভারতের কৃষক-সমাজকে সর্বাধিক চমৎকৃত করেছে আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার কৃষি-মণ্ডপ। আমেরিকার গম, ভুট্টা, আলু, বাদাম, ফল, সব্জি, গাভী ও মুরগীর বিস্ময়কর পুষ্টি তাদের চোখে এনেছে ঐন্দ্রজালিক বিস্ময়। আমেরিকা শস্যকে রোগ-প্রতিরোধক্ষম স্বাস্থ্য দিয়ে, হাইব্রিড তথা সংকর-শস্য দিয়ে, আণবিক প্রয়োগ-পদ্ধতি দিয়ে কৃষিকে করে তুলেছে প্রাচুর্যের প্রসূতি। কৃষি-চিকিৎসা, কৃষি-পরিচর্যা, কৃষি-গবেষণা ও তেজস্ক্রিয় কোবল্ট থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মির রেডিয়েশন দ্বারা শস্য-প্রকৃতির যে পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে, তার কৃতিত্ব আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার অবশ্যই প্রাপ্য। শস্য-জীবনের হেরিডিটি বা বংশানুক্রমিকতা আজ অতীতের বস্তু। কিন্তু কথা হচ্ছে, আমেরিকা ও রাশিয়ার কৃষি-সাফল্য ভারতীয় কৃষক-সমাজে কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে? এ পর্যন্ত ভারতে দুটি কৃষি-মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে: একটি নয়াদিল্লীতে, অন্যটি কলকাতায়। ভারতের দরিদ্র কৃষক-সমাজের কয়জন ভাগ্যবানের তা পরিদর্শনের সৌভাগ্য হয়েছে? লাখেও একজন নয়। কৃষি-মেলা কি তবে কেবল শহরবাসীদের সান্ধ্য-বিহারের আলোকময় বিলাসী আয়োজন?

ইতিমধ্যে ভারতে একাধিক শিল্প-মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের বাইরে অনুষ্ঠিত বহু শিল্প-মেলায় ভারত অংশ গ্রহণও করেছে। তাতে সাফল্য ও অসাফল্য দুইই—ভারতের ভাগ্যে জুটেছে। ভারতে যে শিল্পবিপ্লব সূচিত হয়েছে, তাতে শিল্পমেলার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নবতর উৎপাদন-শৈলী, আধুনিক যন্ত্র-প্রকরণ, শ্রম-নৈপুণ্য, উৎপাদনের উৎকর্ষ—সমস্তই শিল্প-মেলার দ্বারা গতিচ্ছন্দ লাভ করবে। শিল্পের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, সেই শিল্পপতি, শিল্প-শ্রমিক, ক্রেতা-সাধারণ, কৃষক-সমাজ—তাঁরা শিল্প-মেলা পরিদর্শনে উপকৃত হবেন। শিল্পপতি নবতর শিল্প-স্থাপনে, শিল্পের পুনর্বিন্যাসে এবং উৎপাদন-শৈলীর আধুনিকীকরণে প্রবৃত্ত হবেন। শিল্প-শ্রমিক লাভ করবে আধুনিকতম কারিগরী জ্ঞান। ক্রেতা-সাধারণও পণ্যদ্রব্যের ব্যবহার ও উৎকর্ষ-অপকর্ষ সম্বন্ধে অবহিত হবেন। আর কৃষক-সমাজ শিল্পের প্রয়োজনে অধিক কাঁচামাল উৎপাদনে হবে প্রয়াসী। তাছাড়া শিল্প-মেলায় বহু বিদেশীর সমাগম ঘটে, যারা এদেশের শিল্প-সামগ্রীর সঙ্গে পরিচিত হয়। তাতে পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় ও রপ্তানির পরিমাণ বাড়ে।

আধুনিক শিল্প-মেলার সাফল্য

শিল্প-মেলা শহরে অনুষ্ঠিত হলে ক্ষতি নেই। কারণ আধুনিক শিল্প-প্রয়াস শহর-কেন্দ্রিক। তবু গ্রামাঞ্চলে শিল্প-মেলা অনুষ্ঠিত হবারও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কিন্তু কৃষি-মেলাকে শহর থেকে গ্রামে গ্রামে নিয়ে যেতে হবে। দরিদ্র ভারতের দরিদ্র কৃষক-সমাজের কজনের ভাগ্যে শহরদর্শন ঘটে? তাতে বৃহত্তর শহরগুলিতে কৃষি-মেলার অনুষ্ঠান করলে কৃষকদের বাদ দিয়েই তা করতে হয়। কৃষকহীন কৃষি-মেলা শিবহীন

যজ্ঞেরই নামান্তর। প্রকৃতপক্ষে, ভারতের কৃষি-মেলায় তাই হয়েছে। কৃষি-মেলার মাধ্যমে কৃষির যাবতীয় আধুনিকতা কৃষকের নাগালের মধ্যে পৌঁছিয়ে দিতে হবে।

উপসংহার

কিন্তু ভারতের নগর-কেন্দ্রিক কৃষি-মেলা সেই সাফল্যের বিচারে কতখানি সার্থক হয়েছে, তা অবশ্যই বিচার্য। ভারতের কৃষিকে যদি ক্ষুধার্ত ভারতের ক্ষুধাহরণ-ব্রত-গ্রহণে সক্ষম করে তুলতে হয়, যদি ভারতের নব শিল্পায়নকে সফল করে তুলতে হয়, তবে কৃষি-মেলায় কৃষকদের অবাধ প্রবেশের সুযোগ দিতে হবে। তা যদি না হয়, যদি শহর-কেন্দ্রিক আলোকোজ্জ্বল কৃষি-মণ্ডপের সুসজ্জিত তোরণের বাইরে লক্ষ-কোটি কৃষক দাঁড়িয়ে থাকে, 'তবে মিছে সহকার-শাখা, তবে মিছে মঙ্গল-কলস।'

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- কৃষি-প্রদর্শনী ও তাহার সার্থকতা
- শিল্প-প্রদর্শনী ও তাহার সার্থকতা
- বিদেশে ভারতের কৃষি ও শিল্প-প্রদর্শনী
- ভারতে কৃষি ও শিল্প-মেলা

৩৪. ভারতে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পঞ্চায়েৎ-রাজ
Community Development Project in India and Panchayet Raj.

প্রবন্ধ-সূত্র :—অবতরণিকা—পল্লী-ভারতের অবক্ষয়ের চিত্র—সংগঠনের সূত্রপাত : সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা—লক্ষ্য ও অগ্রগতি—গঠন-বিন্যাস : কেন্দ্রীয় পর্যায়—রাজ্য পর্যায়—জিলা পর্যায়—ব্লক পর্যায়—সম্প্রসারণ সংগঠন—কার্যাবলী—অর্থসংস্থান—পঞ্চায়েৎ রাজ—বিরুদ্ধ সমালোচনা—উপসংহার।

ভারতের জাতীয় জীবনে যে নবজাগৃতি এসেছে, তাকে এবার শহর থেকে গ্রামে নিয়ে যাওয়া হবে। দিকে দিকে চলেছে তার উদ্যোগ আয়োজন; তার সাড়া পড়ে গেছে আকুমারিকা-হিমাচল। গ্রামে ও শহরের মধ্যে শতাব্দীব্যাপী জড়তার অচল গিরি-স্তূপকে আজ অপসারিত করতে হবে। কারণ গ্রামই হলো প্রাচীন ভারতের স্বয়ংসিদ্ধ অর্থনীতির মেরুদণ্ড। পাশ্চাত্য সভ্যতার দৌলতে ও অধুনাতম শিল্পায়নের দাক্ষিণ্যে শহর গড়ে উঠছে দিকে দিকে। ফলে গ্রাম ও শহরের মাঝখানে স্তূপাকারে জমে উঠছে ঘৃণা, অবহেলা ও ঔদাসীন্য। সেই আবর্জনার স্তূপ সরাতে হবে; গ্রাম ও শহরের মধ্যে বেঁধে দিতে হবে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার যোগবন্ধনের নিবিড় গাঁটছড়া। গ্রামে-গাঁথা ভারতের বুকে দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করে পড়ে আছে যে বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা, যে লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনা-স্তূপ, সেখানে আমাদের দুঃখলব্ধ স্বরাজকে বহন করে নিয়ে যেতে হবে। মোট কথা, সমাজ উন্নয়ন ও পঞ্চায়েৎ-রাজ স্থাপন ছাড়া ভারতের সার্বিক উন্নয়নের পথ রুদ্ধ।

অবতরণিকা

নগর-কেন্দ্রিক পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্বগ্রাসী প্রতিক্রিয়ায় আনন্দ-মুখরিত পল্লী-ভারতের হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে এলো। ভেঙে পড়লো তার ছায়া-সুনিবিড় শান্তিনিকেতন। ধ্বংস, পরিত্যক্ত হলো তার সমৃদ্ধ জনপদ, জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে উঠলো তার পথঘাট আর সেই দিগন্তশায়ী শস্য-প্রান্তর, যেখানে একদিন অফুরন্ত সোনালি ফসলের বান ডাকতো এবং সারা দেশের অর্থনৈতিক সচ্ছলতার জোয়ার আসতো যেখানে, তা পতিত বন্ধ্যা হয়ে রইল পড়ে। তার কৃষি আজ গৌরবহীনা, তার কুটির-শিল্প অবলুপ্ত, তার অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ইতিহাসের এক বিস্মৃত অধ্যায়। দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, অকাল মৃত্যু, স্বাস্থ্যহীনতা, শিক্ষা-হীনতা সেখানে স্থায়ী কায়েমী আসন পেতে বসেছে। এই তো পল্লী-ভারতের রূপকথা।

পল্লী-ভারতের অবক্ষয়ের চিত্র

স্বাধীনতালাভের পর ভারতে সূচিত হয়েছে এক বিপুল কর্মোদ্যোগ। সেই কর্মোদ্দীপনায় ঘুম ভেঙেছে ভারত-আত্মার, ঘুম ভেঙেছে ভারতের পাঁচ লক্ষ গ্রামের। এই কর্মযোজনা কেবল শিল্প ও নগর স্থাপনে নিঃশেষিত হয় নি, ভারতের গ্রামদেবতাকে অবহেলা করে আমরা যে পাপ করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যেও আজ তা নিয়োজিত হয়েছে। অর্থাৎ, তরীর তলায় যেখানে ফুটো, সেখানেই আজ হাত লাগানো হয়েছে। গ্রাম-ভারতের সংগঠনের স্বপ্ন অনেক দিনের। গান্ধীজী-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীগণ সেই স্বপ্ন দেখেছিলেন। এক বলিষ্ঠ প্রাণবন্ত, স্বচ্ছন্দ গ্রাম-ভারতই ছিল গান্ধীজীর স্বপ্নের মহাভারত। ২রা অক্টোবর, ১৯৫২ সাল। গান্ধীজীর জন্মদিবস। এই পবিত্র দিনটিতে জাতীয় সরকার গান্ধীজীর স্বপ্নের মহাভারত রচনায় হাত দিলেন। শুভ শঙ্খধ্বনি হলো ভারতের সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার ঃ

সংগঠনের সূত্রপাত ঃ সমষ্টি উন্নয়ন পবিকল্পনা

"সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোলো আজি দ্বার।"

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ এই গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ-প্রকল্প রূপায়ণের সুপারিশ করেন এবং পঞ্চায়েৎ-রাজ রূপায়ণের বিশেষ নীতি-সূত্র রচনা করে দেন। এখন অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার, গুজরাট, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েৎ-রাজ প্রকল্প দ্রুত রূপায়িত হচ্ছে। অন্য রাজ্যগুলি হয় এ বিষয়ে আইন রচনা করেছে, নয়ত আইন রচনায় এখন ব্যস্ত রয়েছে। পঞ্চায়েৎ, সমবায় ও বিদ্যালয়—এইগুলি হলো এই প্রকল্প-রূপায়ণে গ্রাম-পর্যায়ের মৌল প্রতিষ্ঠান। নির্বাচিত পঞ্চায়েৎ-মণ্ডলীর হাতেই স্থানীয় সকল উন্নয়ন-প্রকল্পের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে। সমবায় নিয়েছে অর্থনৈতিক বিকাশের দায়িত্ব এবং বিদ্যালয় নিয়েছে শিক্ষা, সংস্কৃতি, আমোদ-প্রমোদ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যাবলীর রূপায়ণের ভার।

১৯৬৪ সালের শেষ পর্যন্ত ৪,৮৭৭টি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের ব্লক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার ফলে ৪০ কোটি ৩৩ লক্ষ লোকের ৫ লক্ষ ৬৬ হাজার গ্রাম এই প্রকল্পের আওতার মধ্যে এসেছে। আগে ছিল ৩১৮টি প্রাক্-সম্প্রসারণ ব্লক (Pre-extension Block)। কিন্তু পরে ৫,২২৩টি ব্লক গঠিত হয়, যাদের মধ্যে ৫,১৯৫টি ব্লকে কাজ সুরু হয়ে গেছে। অবশিষ্ট ২৮টি ব্লককে প্রান্তীয় সংযোজনার জন্যে হাতে রাখা হয়েছে। কল্পনাটি মূলতঃ অনুদত্ত আত্ম-সাহায্য (aided self-help) নির্ভর। পরিকল্পনা রচনা ও তার রূপায়ণ গ্রামবাসীদের দায়িত্বে। সরকার দেবেন আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য।

লক্ষ্য ও অগ্রগতি

এইভাবে গণ-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজ-চিন্তা ও সংঘবদ্ধ প্রয়াসকে উৎসাহিত করে গ্রাম-ভারতে আত্মবিশ্বাস ও সমষ্টিগত কর্ম-প্রেরণার চাঞ্চল্য ঘটিয়ে আত্মনির্ভরশীল গ্রামীণ

অর্থনীতির পুনর্গঠনে সমগ্র দেশময় একটি সুপরিকল্পিত সংগঠনের জাল বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে পল্লী-পর্যায় পর্যন্ত সেই সংগঠন-জালের নীরন্ধ্র বিস্তার। এই পরিকল্পনার সর্বোচ্চ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সমষ্টি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রকের হাতে।

গঠন-বিন্যাস : কেন্দ্রীয় পর্যায়

মৌলনীতি নির্ধারণের দায়িত্ব অবশ্য রয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটির দায়িত্বে। প্রধানমন্ত্রী হলেন তার চেয়ারম্যান এবং পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, খাদ্য ও কৃষি দপ্তর, সমষ্টি উন্নয়ন ও সমবায় দপ্তরের মন্ত্রীবর্গকে নিয়ে তার গঠন-বিন্যাস। তাছাড়া আছে কয়েকটি বিশেষ কমিটি, যারা সহযোগী মন্ত্রকের সঙ্গে সহযোগিতা রক্ষার ব্যবস্থা করবে।

রাজ্য-পর্যায়

পরিকল্পনার রূপায়ণ-কার্যসূচী রাজ্য-সরকারসমূহের হাতে। এ ব্যাপারে রাজ্য-সরকারসমূহের হাতিয়ার হলো রাজ্য উন্নয়ন কমিটি সমূহ। মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এবং উন্নয়ন কমিশনারের সম্পাদকত্বে উন্নয়ন-বিভাগগুলির মন্ত্রীদের নিয়ে সংগঠিত হয়েছে রাজ্য উন্নয়ন কমিটি। উন্নয়ন কমিশনারই এই সূচীর কার্যাধ্যক্ষ ; তিনিই সকল উন্নয়ন-বিভাগের মধ্যে সংগতি রক্ষার অধিকারী।

জিলা-পর্যায়

এবার জিলা-পর্যায়। নবগঠিত সংবিধিবদ্ধ (Statutory) জিলা পরিষদের হাতেই জিলা-পর্যায়ের কার্যসূচীর রূপায়ণ-দায়িত্ব। পরিষদের সদস্যবর্গ হচ্ছেন গণ-নির্বাচিত সকল প্রতিনিধি। যেমন, ব্লক পঞ্চায়েৎ সমিতি সমূহের সভাপতিগণ, জিলার সংসদ সদস্যবৃন্দ ও বিধান সভার সদস্যবৃন্দ।

ব্লক-পর্যায়

তারপর ব্লক-পর্যায়। এই পর্যায়ে কার্যসূচীর রূপায়ণ-দায়িত্ব ব্লক-পঞ্চায়েৎ সমিতির হাতে। ব্লক-পঞ্চায়েৎ সমিতি সংগঠিত হয়েছে গ্রাম-পঞ্চায়েৎ সমূহের সভাপতিদের এবং নারী সমাজ, অনুন্নত তপশীলী শ্রেণীগুলির প্রতিনিধিরূপে সহযোজিত (Co-opted) কতিপয় সদস্য ও সদস্যার সমাহারে। ব্লক উন্নয়ন অফিসার ও আটজন সম্প্রসারণ অফিসারই (যাঁরা কৃষি, সমবায় ও পশুপালন ইত্যাদিতে বিশেষজ্ঞ) হলেন প্রশাসনিক কর্মচারী। তাঁরা সমিতির নির্দেশানুসারে করবেন ব্লক-পর্যায়ের কাজ। যুব-সংঘ, কৃষক-সমিতি, মহিলা-মণ্ডল ইত্যাদি স্বেচ্ছাবৃত্ত সহযোগী সংগঠনগুলি তাদের পঞ্চায়েতের সঙ্গে করবে সহযোগিতা। গ্রাম-পর্যায়ে সহযোগী সংগঠন সমূহের দ্বারা সহায়িত পঞ্চায়েৎই কর্মসূচীর সর্বোচ্চ নিয়ন্তা। আর গ্রাম-সেবক হলো তার দায়িত্বে দশখানি গ্রামের বহুমুখী সম্প্রসারণের প্রতিনিধি।

সম্প্রসারণ সংগঠন

তাছাড়া, গ্রাম ও ব্লক-পর্যায়ে রয়েছে সম্প্রসারণ সংগঠন। বাস্তব উপযোগিতার গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে গ্রামে-গ্রামে পৌঁছে দেবে এই সংগঠন। আবার গ্রামবাসীদের সমস্যা সমূহকে বিশেষ গবেষণা ও সমাধানের জন্য গবেষণা-সংগঠনে পাঠিয়ে দেবে। গ্রামীণ জীবনকে সমবায়, উন্নততর খামার

সংগঠন ও মহিলা মণ্ডল ইত্যাদির মাধ্যমে একটি সুন্দর, সংহত রূপদানের দায়িত্ব রয়েছে এই সংগঠনের হাতে।

সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনায় ভারতের এক-একটি গ্রাম এক-একটি এককরূপে গৃহীত। পনেরো থেকে পঁচিশটা গ্রাম-এককের সমবায়ে এক-একটি 'মণ্ডী'; চার-পাঁচটা 'মণ্ডী'র সমবায়ে এক-একটি উন্নয়ন মণ্ডল এবং তিনটি উন্নয়ন মণ্ডলের সমবায়ে গঠিত হবে এক-একটি পরিকল্পনা কেন্দ্র। গ্রাম-এককে বাস করবে অন্ততঃ পাঁচশ' লোকের একশ'টি পরিবার। সেখানে থাকবে পানীয় জলের সুব্যবস্থা, সেচ-ব্যবস্থা, গৃহ-নির্মাণের স্থান, গোচারণ-ভূমি, জ্বালানী-কাঠের বন, প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাকা-রাস্তা, কৃষির ব্যবস্থা এবং কৃষি-মজুর, কুটির-শিল্পী, গৃহ-নির্মাণ শিল্পী, বণিক, পরিবহণ-কর্মী, দোকানদার, শিক্ষক, স্বাস্থ্যরক্ষা-কর্মী, নাপিত, মুচি, শান্তিরক্ষা-কর্মী ইত্যাদি বিভিন্ন বৃত্তির পরিবার। 'মণ্ডী'তে থাকবে বাজার, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চিকিৎসা-কেন্দ্র, কৃষি-কার্যালয়, ডাকঘর, পরিবহণ-কেন্দ্র, প্রমোদ গৃহ, পশু-চিকিৎসালয় ও আদর্শ গোলাঘর। যে কোন 'মণ্ডী'-কেন্দ্রে উন্নয়ন-মণ্ডলের কাজ পরিচালিত হবে। পরিকল্পনা-কেন্দ্রের থাকবে বিচারালয়, সালিশী আদালত, হাসপাতাল, সমাজ-সেবা-শিক্ষণ কেন্দ্র, বুনিয়াদী শিক্ষা-প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র, পশুপক্ষী-পালন কেন্দ্র, মৃত্তিকা গবেষণাগার ইত্যাদি। সেখানকার লোকসংখ্যা হবে দেড় লক্ষ থেকে দু'লক্ষ।

কার্যাবলী

এই পরিকল্পনার রূপায়ণের পুঁজি আসে জনগণ ও সরকারের কাছ থেকে। জনগণ তাদের দেয় অর্থ দিতে পারে টাকায় কিংবা পণ্যে কিংবা শ্রমে। সরকারী সাহায্য আসে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ৩ : ১ আনুপাতিক দ্বৈত প্রবাহে। জলসেচ, পতিত জমির উদ্ধার ইত্যাদি কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় পুঁজি রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছ থেকে ঋণ-রূপে পেতে পারেন। তাছাড়া সমষ্টি উন্নয়ন কর্মীদের বেতনের অর্ধাংশের ব্যয়ভার বহন করেন কেন্দ্রীয় সরকার। ১৯৬২ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত জনগণের প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ হলো ১৮১·৯০ কোটি টাকা। সরকারের প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ হলো ২৮২১·২১ কোটি টাকা। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার বরাদ্দ ছিল ২৩৫·০৭ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দ হলো ৩৩৪·০৭ কোটি টাকা। তার মধ্যে রয়েছে সমষ্টি উন্নয়ন কার্যসূচীর ২৮৭·৬৭ কোটি টাকা, পঞ্চায়েৎ-রাজের ২৮·৮০ কোটি টাকা এবং কেন্দ্রীয় কার্যসূচীর ১৭·৬০ কোটি টাকা।

অর্থ-সংস্থান

এইভাবে ভারতের কষ্টলব্ধ স্বরাজকে শহর থেকে গ্রামে-গ্রামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্যে ও সমাজতন্ত্রের বিকাশের জন্যে পঞ্চায়েৎ-রাজ সংগঠনের ওপর

ধীরে ধীরে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে পঞ্চায়েৎ-রাজের বৈশিষ্ট্যই হলো সমস্ত গণতান্ত্রিক সংগঠনের সামূহিক কার্যকলাপের বিকাশ সাধন। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার গণতান্ত্রিক সাফল্যের সোপান বেয়ে তৃতীয় পরিকল্পনায় সূচিত হয়েছে নবতর সাফল্যের পদক্ষেপ। স্থানীয় মানব-শক্তি এবং সমবায়িক স্বয়ং-সাহায্য, সংঘবদ্ধ প্রয়াস, প্রাপ্ত অর্থ ও কর্মচারী ইত্যাদি অন্যান্য শক্তির ভিত্তিতে সর্বোচ্চ গতিশীল উন্নয়নই এই পঞ্চায়েৎ-রাজ পরিকল্পনার কাম্য।

পঞ্চায়েৎ-রাজ

কোন কোন সমালোচক পঞ্চায়েৎ-রাজের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারণের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, গ্রামীণ সমাজ এখনও নানা সংস্কার, অন্ধ-বিশ্বাস ও শ্রেণী-বৈষম্যে পক্ষাঘাত-গ্রস্ত। এই বিকলাঙ্গ পরিবেশ গণব্যবস্থার অনুপযোগী। তদুপরি, গ্রাম-পঞ্চায়েৎগুলির হাতে স্বয়ং-শাসনের ক্ষমতা মুক্ত-হস্তে তুলে দিলে গ্রামে-গ্রামে শ্রেণী-সংঘাত ইত্যাদি হিংসা-দ্বেষ-কলহের চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। তাতে তৃতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতি হবে ব্যাহত এবং মুষ্টিমেয়ের দৌরাত্ম্যে গ্রামীণ সমাজ দলাদলিতে সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠবে।

বিরুদ্ধ-সমালোচনা

এই যুক্তি ভীতি-বিহ্বলতা ও দ্বিধাগ্রস্ততার যুক্তি। হয়তো প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের মুখ এই মুখোশের আড়ালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। যাই হোক, নতুনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, ক্ষুরধার-নিশিত। সেই ক্ষুরধার-নিশিত পথেই আসবে ভারতের গণতন্ত্রের সাফল্য। কংগ্রেসের গোপবন্ধু নগরের অধিবেশনে গৃহীত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র রূপায়ণের প্রাথমিক কাজ গ্রাম-ভারতেই সুরু করতে হবে। গ্রামে-গ্রামে আজ স্বয়ংসিদ্ধ অর্থনীতির ভিত্তি-স্থাপন করতে হবে। সারা ভারতে তাই আজ নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেছে। আজ জেগেছেন ভারতের গ্রাম-দেবতা। সর্বস্বান্ত গ্রামগুলিকে আজ আবার তাদের সর্বস্ব ফিরিয়ে দিতে হবে। অবহেলা নয়, ঘৃণা নয়, ঔদাসীন্য নয়, শহরবাসীদের স্বার্থে—সমগ্র ভারতের স্বার্থে গ্রামকে আজ দু হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করে নিতে হবে। তবেই দূর হবে গ্রাম ও শহরের বিচ্ছেদ-ব্যবধান। তবেই আনন্দ-কলহাস্যে মুখরিত হয়ে উঠবে আকুমারিকা-হিমাচল।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- নগর ও পল্লীর ব্যবধান অপসারণ, ক. বি. '৫৭
- পল্লী-অঞ্চলের আর্থিক উন্নয়ন, ক. বি. '৫৮
- গ্রামীণ বাংলার উন্নতি কোন্ পথে? কৃষি না শিল্পে, ব. বি. '৬৩
- ভারতে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা

৩৫. বাস্তুহারা-পুনর্বাসন ও দণ্ডকারণ্য-পরিকল্পনা

Refugee-Rehabilitation and Dandakaranya Project.

প্রবন্ধ সূত্র:— অবতরণিকা—দেশ বিভাগ—চক্রান্ত ও পরিণাম—বাস্তুহারা-পুনর্বাসন : স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা—১৯৬৪ : বাস্তুহারার নতুন স্রোত—বাস্তুহারা-সমস্যা একটি সর্ব-ভারতীয় সমস্যা—অর্থ-সাহায্য দান—দণ্ডকারণ্য-পরিকল্পনা—দণ্ডকারণ্যের সম্ভাবনা—পরিকল্পনার কার্যসূচী রূপায়ণ : প্রশাসনিক গোলযোগ দূরীকরণ—উপসংহার।

মাটির কবরে লর্ড কার্জনের প্রেতাত্মা আজ নিশ্চয়ই শান্তিলাভ করেছে! দেশ-বিভাগের প্রথম চক্রান্ত-রচনার গৌরব লর্ড কার্জনেরই। লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের উদ্দেশ্যে যে শানিত ছুরিকা হাতে নিয়েছিলেন, কোটি কণ্ঠের সোচ্চার এবং সক্রিয় প্রতিরোধে তা অবশেষে পরিত্যক্ত হয়েছিল। তারপর রাজনীতির বহু তরঙ্গ দেশের বুকের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে। স্বাধীনতার স্থির লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে জাতির সকল প্রয়াস, সকল সাধনা একত্রিত হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ-প্রতিরোধ আন্দোলনের পর মাত্র বিয়াল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়েছে; এবার এলো দেশবিভাগের চরম আঘাত। যে দুর্জয় নেতৃত্ব-ভার এতকাল বাঙালীর হাতে ছিল, তা এবার দুর্বল, দ্বিধাগ্রস্ত অবাঙালী কায়েমী-স্বার্থের হাতে গিয়ে পড়লো। আর দ্বিজাতি-তত্ত্বের যে বিষবৃক্ষের বীজ লর্ড কার্জন বপন করে গিয়েছিলেন ভারতের মাটিতে, তা এতদিনে দান করলো তার সর্বনাশা ফল। সেবারে যে ছুরি ছিল লর্ড কার্জনের হাতে, এবারে তা দেখা গেল দেশবাসীর হাতে। অর্থাৎ, আমরা নিজেরাই পরস্পরের রক্তপাত ঘটিয়ে দেশটাকে দ্বিধা-বিভক্ত করে ভারত ও পাকিস্তান—এই দুই রাষ্ট্রের সৃষ্টি করলাম।

অবতরণিকা

যেদিন আমরা দেশ বিভাগকে স্বীকার করে নিয়েছি, সেইদিনই আমরা আমাদের মৃন্ময়ী দেশমাতৃকা-ধারণাকেই শুধু হত্যা করিনি, চিন্ময়ী মাতৃ-বিগ্রহকে হত্যা করেছি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে হিন্দু-মুসলমান ভারত-ভূমিতে পাশাপাশি বাস করে এসেছে, যাদের সম্মিলিত সাধনায় রচিত হয়েছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ধারা, আজ হঠাৎ তাদের এই উপলব্ধি কি করে এলো যে, তারা একজাতি নয়, তারা দুই জাতি? তাদের জন্যে চাই পৃথক্ বাসভূমি? শুধু তাই নয়, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ছুরিতে প্রচুর রক্ত-মোক্ষণের পর কায়েমী-স্বার্থের সেই চক্রান্ত সফল হলো। হিন্দুর হাতে লাগলো মুসলমানের রক্ত, মুসলমানের হাতে লাগলো হিন্দুর রক্ত, আর কায়েমী-স্বার্থের হাতে লাগলো সোনা, অফুরন্ত সোনা।

দেশ বিভাগ

দেশ বিভাগ সম্পন্ন হলো। যে কংগ্রেস দীর্ঘকাল 'একজাতি, একপ্রাণ, একতা'র পূজা করে এসেছে, অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার সাধনা করেছে, সেই কংগ্রেস গান্ধীজীর নিষেধ অমান্য করে দ্বিধা-দুর্বল চিত্তে গ্রহণ করলো দেশ বিভাগের প্রস্তাব। সেই মুহূর্তেই সর্বনাশ হলো। কতো নিরীহ প্রাণের মূল্যে, কতো বিষয়-সম্পত্তি ও বাস-ভবনের মূল্যে, কতো নারীর সতীত্বের মূল্যে আমরা এই স্বাধীনতা ক্রয় করেছি। সেদিন দিল্লীতে কয়েকজন প্রভাবশালী বৃটিশ রাজনীতি-ধুরন্ধর এবং কতিপয় দেশীয় ধনপতির আত্যন্তিক তৎপরতার কারণ একদিন নয় একদিন ভারতের ইতিহাস-দেবতা প্রকাশ করবেন। সে কথা এখন থাক্। দেশের নেতৃবৃন্দ দেশ বিভাগ স্বীকার করে নিলেন, কিন্তু তার সুদূর-ব্যাপী প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করলেন না। ফলে যা হবার, তাই হলো। স্বাধীনতালাভের এই আঠারো/উনিশ বছরের মধ্যে বাস্তহারা-সমস্যার সমাধান হলো না। এখনও লক্ষ-লক্ষ হিন্দু ও খ্রীস্ট-ধর্মাবলম্বী মানুষের স্রোত নিশ্চিত নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ভারতের অভিমুখে প্রবহমান। কিন্তু এই লক্ষ-কোটি নিরীহ অসহায় মানুষের পায়ের তলার মাটি কেড়ে নেবার অধিকার মুষ্টিমেয় ক্ষমতালিপ্সুদের হাতে কে তুলে দিয়েছিল? মহাকালের দরবারে এই আমাদের চরম জিজ্ঞাসা।"

চক্রান্ত ও পরিণাম

স্বাধীনতার আনন্দঘন মুহূর্ত বাস্তহারাদের-অশ্রুজলে অভিষিক্ত হলো। পাকিস্তান থেকে ভীতি-বিহ্বল বাস্তহারার দল ত্রি-ধারায় প্রবাহিত হয়ে এলো আশ্রয়ের সন্ধানে। একদিকে, পশ্চিম-পাকিস্তানের শরণার্থীদল পাঞ্জাবে প্রবেশ করলো, অন্যদিকে পূর্ব-পাকিস্তানের শরণার্থীদল মাথা গুঁজবার স্থান খুঁজলো পশ্চিমবঙ্গে ও আসামে। পাঞ্জাবে স্বেচ্ছাবৃত্ত লোক ও সম্পত্তি-বিনিময়ের মাধ্যমে পরিস্থিতি একটা স্থিতিস্থাপকতা লাভ করেছে। কিন্তু সমস্যা হয়েছে পূর্ব-পাকিস্তানাগত বাস্তহারাদের নিয়ে। সম্পত্তি ও লোক-বিনিময়ের যে প্রশ্ন এখানে একবার উঠেছিল, তার কণ্ঠরোধ হয়ে গেছে বঙ্গবীর শ্যামাপ্রসাদের অকাল মৃত্যুতে। নিঃস্ব, রিক্ত অবস্থায় পূর্ববঙ্গাগত বাস্তহারাদের এসে দাঁড়াতে হলো ভারতের দুয়ারে। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম প্রভৃতি সীমান্ত রাজ্যগুলিকে বাস্তহারা-পুনর্বাসন বিভাগ খুলতে হলো। স্বাধীনতার বলি এই বাস্তহারাদের জন্যে রচনা করতে হলো স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা। বাস্তহারা-শিবির স্থাপন ও নানাপ্রকার সরকারী সাহায্যদান—স্বল্পমেয়াদী কার্য-সূচীর অন্তর্গত। তাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান এবং গভীর আত্মবিশ্বাস অর্জনের ব্যবস্থা—দীর্ঘমেয়াদী কার্যসূচীর অন্তর্গত। তাতে কৃষি-জমি বিতরণ, বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান, শিল্প-ব্যবসায় ও সরকারী চাকরিতে অগ্রাধিকার এবং সমবায়িক ভিত্তিতে কুটির-শিল্পের পুনর্জাগরণ ইত্যাদির মাধ্যমে সূচিত হয়েছে পুনর্বাসনের বিপুল আয়োজন।

বাস্তহারা-পুনর্বাসন: স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা

১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে আবার পূর্ব-পাকিস্তানের খুলনা, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামে হিন্দু ও খ্রীষ্টান নিপীড়ন সুরু হলো। হাজার-হাজার অসহায় নরনারী প্রাণ দিল। লক্ষ-লক্ষ বাস্তুহারার স্রোত আবার ভারতের দিকে প্রবাহিত হয়ে এলো। পূর্বে আগত বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। আবার সুচিত হলো সেই পুরাতন সমস্যার নব-আবির্ভাব। এদিকে ১৯৬৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আবার সীমান্ত বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাহলে পূর্ববঙ্গের সেই ভাগ্যহতের দল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ? ভারত এবং পাকিস্তানকে আজ তার জবাবদিহি করতে হবে।

১৯৬৪ : বাস্তুহারার নতুন স্রোত

ভারতের অর্থনীতি বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির প্রতি এ যেন পূর্ব-পাকিস্তানের একটা চ্যালেঞ্জ! এবং সমগ্র ভারত আজ বাস্তুহারা-সমস্যাকে সর্ব-ভারতীয় সমস্যারূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। ভারতের ঘরে ঘরে আজ রুদ্ধ-দ্বার খুলে যাচ্ছে, সকলেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ভাগ্যহারা বাস্তুহারা বাঙ্গালীকে। কারণ বাঙ্গালীর অপমৃত্যুতে ঘটবে সমগ্র ভারতের অপমৃত্যু। কেন্দ্রীয় সরকারও মুক্ত-হস্তে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে এসেছেন।

বাস্তুহারা সমস্যা একটি সর্বভারতীয় সমস্যা

এ পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানাগত বাস্তুহারাদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের জন্যে ২০০ কোটি টাকা, পশ্চিম-পাকিস্তানাগত বাস্তুহারাদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের জন্যে ১৯৮ কোটি টাকা এবং ক্ষতিপূরণ হিসাবে ১৭৬·৩৩ কোটি টাকা প্রদত্ত হয়েছে। পাক-অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীর থেকে উচ্ছিন্ন বাস্তু-হারাদের জন্যে ১·২৫ কোটি টাকা বিতরিত হয়েছে।

অর্থ-সাহায্য দান

সমগ্র ভারত আজ বাস্তুহারা বাঙ্গালীকে ডাকছে। তাকে আসাম ডাকছে, বিহার-উড়িষ্যা ডাকছে, আন্দামান-নিকোবর ডাকছে, আর ডাকছে দণ্ডকারণ্য। বাঙ্গালী বাস্তুহারার দল আজ সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা পুনর্বাসনের দীর্ঘমেয়াদী কার্য-সূচীর প্রধান অঙ্গ। মধ্য প্রদেশের বস্তার জেলা এবং উড়িষ্যার কোরাপুট ও কালাহাণ্ডি জেলার নির্বাচিত অঞ্চলের প্রায় ত্রিশ হাজার বর্গমাইল অবিচ্ছিন্ন অরণ্য-এলাকা নিয়ে নতুন বঙ্গদেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা রচিত। রামায়ণের যুগে অযোধ্যায় বনবাসী রাজপুত্রের পদশব্দে দণ্ডকারণ্যের ঘুম ভেঙেছিল স্বল্পকালের জন্যে। এ যুগের বনবাসী বাস্তুহারা বঙ্গ-সন্তানের পদশব্দে তার সহস্র যুগের জমাট ঘুম ভাঙছে। দণ্ডকারণ্যের এই জাগরণ হবে স্থায়ী। নব কর্মোদ্যম ও প্রাণ-চাঞ্চল্যের ছোঁয়া লেগেছে আজ দণ্ডকারণ্যের সুপ্ত আত্মায়। গোদাবরী, ইন্দ্রাবতী, ওয়েন গঙ্গায় আজ প্রাণের সাড়া লেগেছে। পূর্ব-বাংলার কৃষি-প্রাণ মানুষ আজ দণ্ডকারণ্যে বঙ্গদেশের আধুনিক

দণ্ডকারণ্য-পরিকল্পনা

সংস্করণ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছে। ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একজন সুদক্ষ প্রশাসকের অধীনে 'দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন অধিকার' নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হয়েছে। এই সংস্থার হাতেই রয়েছে দণ্ডকারণ্য উন্নয়নের সকল প্রকার চাবি-কাঠি।

দণ্ডকারণ্য প্রচুর সম্ভাবনাপূর্ণ। তার 'নদী-জপমালা-ধৃত-প্রান্তরে' সুপ্ত রয়েছে ধান, জোয়ার, ভুট্টা, ডাল, লঙ্কা, হলুদ, গম, আখ ও তামাকের অফুরন্ত সম্ভাবনা। কালাহাণ্ডি জেলার প্রায় পঞ্চাশ হাজার একর জমিতে পাটের চাষ হয়। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনাও রয়েছে প্রচুর। কোরাপুট জেলার মচ্‌কুন্দ জলবিদ্যুৎ-পরিকল্পনায় এখনই জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। দণ্ডকারণ্য বন-সম্পদেও পরিপূর্ণ। শাল, সেগুন, বাঁশ, বেত, নানাপ্রকার শক্ত ও নরম কাঠ, শণ, মহুয়া, মধু, চামড়া, এরারুট ও মূল্যবান ভেষজ গাছ-গাছড়ায় দণ্ডকারণ্য সমৃদ্ধ। প্রকৃতি অকৃপণ হাতে দণ্ডকারণ্যকে খনিজ সম্পদও দান করেছেন। খনিজ সম্পদের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর লৌহ, বক্সাইট্, ম্যাঙ্গানিজ্, গ্রাফাইট্, চূণাপাথর ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রকৃতির অবারিত দাক্ষিণ্যে দণ্ডকারণ্যে প্রচুর শিল্প-সম্ভাবনার বীজ লুকানো রয়েছে। সুষ্ঠু পরিকল্পনা, কর্মনিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাহায্যে তা বিকশিত হয়ে উঠতে পারে।

দণ্ডকারণ্যের সম্ভাবনা

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার মৌল নীতিই হলো: এক, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অধিবাসীদের সংযোগ-সাধন ও তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দান। কিন্তু এই নীতিই যথেষ্ট নয়; যাদের জন্যে এই পরিকল্পনা, তাদের মধ্যে একটা উৎসাহ-উদ্দীপনার সাড়া জাগিয়ে তুলতে হবে। এই পরিকল্পনার প্রধান কার্যাবলী হলো: এক, ম্যালেরিয়ার ধ্বংস সাধন; দুই, সর্ব-ঋতুর উপযোগী সড়ক নির্মাণ ও রেলপথ স্থাপন; তিন, ভূমির উদ্ধার ও সদ্ব্যবহার; চার, মৃত্তিকা, জলবায়ু ও সেচের সুবিধানুযায়ী শস্য-চাষের ধারা আবিষ্কার; পাঁচ, সেচ-সম্ভাবনার রূপায়ণ; ছয়, ব্যাপকভাবে মৎস্য চাষ; সাত, শিল্প-স্থাপনের অনুকূলে বনজ ও খনিজ সম্পদের সদ্ব্যবহার; আট, পণ্য পরিবহণ ও বেচাকেনার সুব্যবস্থা; নয়, সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার প্রবর্তন; এবং দশ, খনিজ সম্পদের উন্নয়ন ও আহরণ।

পরিকল্পনার কার্যসূচী

এই উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণের মধ্যে নিহিত রয়েছে বাঙ্গালীর মরণ-বাঁচনের প্রশ্ন। এখানে সরকারী দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রশ্ন নেই, এর রূপায়ণ-দায়িত্ব সরকারের নৈতিক কর্তব্য। সমগ্র ভারতের স্বাধীনতার পূর্ণ মূল্য কেবল বাঙ্গালী দেবে কেন? তার এই ভাগ্য-বিপর্যয়ের জন্যে সে দায়ী নয়। সমগ্র ভারতের স্বাধীনতার খড়্গ তার ঘাড়ে পড়েছে। সমগ্র ভারতকেই আজ তার অংশ বহন করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ,

রূপায়ণ: প্রশাসনিক গোলযোগ দূরীকরণ

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন-মন্ত্রক কোন বাঙ্গালী মন্ত্রীর অধীনে পুনর্গঠিত হওয়া উচিত। যে বাঙ্গালীর বোবা মুখের ভাষা বোঝে না, বাঙ্গালী-বাস্তুহারার মর্মবেদনার উপলব্ধি যার নাই, তার পুনর্বাসন-মন্ত্রকের দায়িত্ব-বহনেরও যোগ্যতা তথা ক্ষমতা নেই। তৃতীয়তঃ, পুনর্বাসন বিভাগে অবাঙ্গালী মন্ত্রী-নিয়োগের পরিণামে এই প্রকল্পের জন্মলগ্ন থেকেই সূচিত হয়েছে নানা প্রশাসনিক গোলযোগ। লাল-ফিতের বজ্র আঁটুনির দৌরাত্ম্য এখানেও তাই উপস্থিত।

স্বাধীনতার শহীদ এই ভাগ্যহীন ছিন্নমূলদের জীবন নিয়ে যে নিষ্ঠুর ছিনিমিনি খেলা চলেছে, তার কি ব্যাখ্যা আমরা করবো? অব্যবস্থা দণ্ডকারণ্যে, অব্যবস্থা মানা ট্রান্‌জিট্ শিবিরে আর ক্ষমতার লড়াই দণ্ডকারণ্যের সর্বত্র। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারে এই অব্যবস্থা ও ক্ষমতার লড়াইর বীজ প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

উপসংহার

তা অবিলম্বে উৎপাটিত হওয়া উচিত এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে হৃদয়বান, সংগঠনশীল বাঙ্গালীর হাতে তুলে দেওয়া প্রয়োজন। তবেই বাঙ্গালীর নতুন উপনিবেশ দণ্ডকারণ্য বিকশিত হয়ে উঠবে, যেখানে বাস্তুহারা বাঙ্গালী পাবে বাসযোগ্য ভূমি, পাবে ভাগ্য-গঠনের সকল সুযোগ এবং পাবে জীবনের পরিপূর্ণ বিশ্বাস। দণ্ডকারণ্যের কাছে বাঙ্গালীর প্রত্যাশা সুপ্রচুর; তার সেই প্রত্যাশা পূর্ণ হবে তো?

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- ভারত-বিভাগের অভিশাপ
- ভারতের পুনর্বাসন-সমস্যার সমাধান

৩৬. সর্বোদয় আন্দোলন : ভূদান ও গ্রামদান

Sarvodaya Movement : Bhoodan and Gramadan

প্রবন্ধ-সূত্র :—অবতরণিকা—বিক্ষুব্ধ তেলেঙ্গানা : বিনোবা ভাবে : ভূদান—ভূমি ভিক্ষা নয়, দাবীই ভূদানের মূল কথা—সর্বোদয়—ভূমি-সমস্যার সমাধানে ভূদান যজ্ঞ—ভূদান আন্দোলনের অগ্রগতি—উপসংহার।

"In a just and equitable order of society, land must belong to all. That is why we do not beg for gifts but demand a share to which the poor are rightly entitled."

—Acharya Vinoba Bhave

অবতরণিকা

কৃষি-মাতৃক ভারতের দরিদ্র ভাগ্যহত কৃষক স্বপ্ন দেখেছে এক টুক্‌রো জমির। তাদের সেই স্বপ্ন কোনদিন সফল হবে কি? শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেছে। ভারতের ইতিহাসে কতবার কত উত্থান-পতন ঘটেছে। রাজচ্ছত্র ভেঙে পড়েছে; সেই ভগ্নস্তূপের ওপর ঘটেছে নতুন সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়। কিন্তু কৃষক-সমাজের ভাগ্যে আর এক টুক্‌রো জমি জোটে নি। তাদের রাজা শোষণ করেছে, জমিদার শোষণ করেছে, মহাজন শোষণ করেছে। এই হলো ভারতীয় কৃষক-সমাজের চিরকালের ইতিহাস। একদিকে, রিক্ততা ও নিদারুণ দারিদ্র্য; অন্যদিকে, প্রাচুর্য ও ভোগ-লালসার নির্লজ্জ উল্লাস। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের ধনতান্ত্রিক পচনে এই শ্রেণী-বৈষম্য তীব্রতম রূপ পরিগ্রহ করে। ইংরেজ বিদায় গ্রহণ করলো। এবার সেই শ্রেণী-বৈষম্য শ্রেণী-সংঘাতের আকারে প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ার উপক্রম করলো।

১৮ই এপ্রিল, ১৯৫১ সাল। হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানা। শ্রেণী-সংঘাতের প্রচণ্ড সম্ভাবনা তখন ধূমায়িত আকার ধারণ করেছে। সংখ্যা-গরিষ্ঠ ভূমিহীন কৃষক-সমাজ সংখ্যালঘু ভূস্বামীদের চিরাগত অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে মাথা তুলে দাঁড়ালো। তাদের চির-অবহেলিত অধিকারের প্রতিষ্ঠাকল্পে তারা গ্রহণ করেছিল শ্রেণী-সংঘর্ষের রক্ত-পিচ্ছিল পথ। জমিদার ও নিঃস্ব কৃষকের সহিংস সংঘর্ষে নরহত্যা, অগ্নি-সংযোগ ও লুঠতরাজ অবিশ্রান্ত হয়ে উঠেছিল। সংঘর্ষ দূর করে শান্তি স্থাপনে পুলিশ ও ফৌজের সমবেত প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। সরকার দিশাহারা, বিশ্ব স্তম্ভিত। সেই

বিক্ষুব্ধ তেলেঙ্গানা : বিনোবা ভাবে : ভূদান

রক্তাক্ত মুহূর্তে হিংসায় উন্মত্ত তেলেঙ্গানার দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষময় পরিবেশে এসে দাঁড়ালেন গান্ধীজীর ভাব-শিষ্য বিনোবা ভাবে। বাঁচবার প্রয়োজনে দরিদ্র কৃষকদের জমি চাই। জমি তাদের কাছে মরণ-বাঁচনের প্রশ্ন। যদি ভূস্বামীদের হাত থেকে ভূমিহীন কৃষকদের হাতে ভূমি

হস্তান্তরিত না হয় এবং তা যদি প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সম্ভব না হয়, তবে সুরু হবে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, হবে ঘৃণার প্রতিষ্ঠা, হিংসার প্রতিষ্ঠা ; পশু-শক্তির বিজয় উল্লাসে সমাজে নেমে আসবে সন্ত্রাসের রাজত্ব ; রক্তস্নান করে উঠবে সমগ্র পৃথিবী। বিনোবা ভাবে মারমুখী জনতাকে আত্ম-সংবরণ করতে অনুরোধ জানালেন। সেই সঙ্গে ভূস্বামীদের মনুষ্যত্বের কাছে দরিদ্র নারায়ণের নামে কিছু পরিমাণ জমি ভিক্ষা জানালেন। "আমাকে আপনাদের ষষ্ঠ পুত্র করুন।"—বললেন বিনোবা ভাবে। যদি পিতার ভূ-সম্পত্তির এক-পঞ্চমাংশ হিসাবে দাবী করার অধিকার পঞ্চ পুত্রের থাকে, তবে ষষ্ঠ পুত্রেরও পিতার ভূ-সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ দাবী করার ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আছে।

কাজেই ভূমি প্রার্থনা নয়, ভূমি দাবী—ভূস্বামীদের ভূ-সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ ভূমিহীন কৃষকদের দান করতে হবে। যদিও 'ভূদান' বা 'গ্রামদান' শব্দগুলির সঙ্গে 'দান' কথাটিও যুক্ত, তবু ভূদানের ভিত্তি দানের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। পৃথিবীর যা কিছু সম্পদ, তার একটা অংশের অধিকার নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে। পৃথিবীর সম্পদের একাংশ ভোগ করা তার জন্মগত অধিকার। কিন্তু এক শ্রেণীর বুদ্ধিমান শক্তিমান লোভী মানুষ বিশ্বের সম্পদের একটা বিপুল অংশ করায়ত্ত করে রেখেছে। এইভাবে পৃথিবীর লক্ষ-কোটি মানুষকে প্রবঞ্চিত করে ভূমিবান ধনবানের দল পৃথিবীতে ডেকে এনেছে দুঃসহ ধন-বৈষম্য। আজ তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ায় যে শ্রেণী-সংঘাতের ধূমায়িত বহ্নি রক্তাক্ত বিপ্লবের অগ্নি-শিখায় আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে, তার পূর্বাহ্নে সেই বিক্ষুব্ধ সর্বহারাদের যা ন্যায়সঙ্গত অধিকার, তা ফিরিয়ে দিতে হবে। তাহলে ক্ষুধার্ত মানুষ পাবে ক্ষুধার অন্ন, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে সমগ্র সমাজে। বিনোবা ভাবে তেলেঙ্গানার জমিদারদের সম্মুখে ভারতের সুমহান্ ত্যাগের আদর্শ তুলে ধরলেন। জয়যুক্ত হলো ত্যাগের বাণী, অহিংসার বাণী, মনুষ্যত্বের বাণী।

ভূমি ভিক্ষা নয়, দাবীই ভূদানের মূল কথা

'সর্বোদয়' কথাটির অর্থ আরও ব্যাপক এবং তার কর্ম-পরিধিও বিস্তৃত। 'সর্বোদয়' কথার অর্থ হলো সার্বিক বিকাশ। সমাজের সকল মানুষের অন্তর্নিহিত সকল সম্ভাবনার সুষ্ঠু বিকাশই সর্বোদয়ের লক্ষ্য। গান্ধীজী যে শোষণহীন ও শ্রেণীহীন বলিষ্ঠ সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সর্বোদয় হলো তারই আদর্শ। সেই সমাজের চালক-শক্তির স্থান গ্রহণ করবে বিবেক, বিচার ও ন্যায়ের অমোঘ বিধান। সহযোগিতা ও সমাজাধিকারের ভিত্তির ওপর রচিত হবে সেই সমাজের সৌধ। সেখানে শোষণ থাকবে না, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি ভেদাভেদ থাকবে না, দুর্নীতি থাকবে না, থাকবে না অকল্যাণ ও অসুন্দরের লেশ-মাত্র চিহ্ন। প্রতিটি মানুষের

সর্বোদয়

আত্মবিকাশের সমান সুযোগ থাকবে সেখানে। সুস্থ, সাবলীল ব্যক্তিত্ব-বিকাশের মাধ্যমে গড়ে উঠবে সুন্দর, বলিষ্ঠ সমাজ। সেই সমাজই ছিল গান্ধীজীর স্বপ্নের সমাজ, স্বপ্নের ভারত। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে স্বপ্নের ভারত-গঠনের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হলো। কিন্তু রুদ্ধ হলো না কর্মধারা। এগিয়ে এলেন গান্ধীজীর মন্ত্র-শিষ্য বিনোবা ভাবে। সর্বোদয়ের দীপশিখা হাতে এগিয়ে চললেন নির্ভীক, আদর্শনিষ্ঠ কর্মসন্ন্যাসী—প্রেম, প্রীতি, দয়া, মৈত্রী ও অহিংসার শুভ উদ্বোধন ঘটিয়ে গান্ধীজীর স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেবার জন্যে। গান্ধীজীর সর্বোদয় পরিকল্পনার ভিত্তি ছিল গ্রাম। গ্রাম থেকেই সুরু হবে সর্বোদয়ের প্রাথমিক কাজ। ভূদান আন্দোলন এই সর্বোদয় আন্দোলনেরই অংশ।

ভূমি-সমস্যার সমাধানে ভূদান-যজ্ঞ

বাস্তবিকই, ভূমি-সমস্যা একমাত্র তেলেঙ্গানারই সমস্যা নয়। ভূমি-সমস্যা একটা সর্ব-ভারতীয় সমস্যা। দীর্ঘকাল ধরে নানা কায়েমী-স্বার্থের দয়াহীন শোষণে ভূমি-সমস্যা এক তীব্র, উৎকট রূপ ধারণ করেছে। তার পরিণামে পশ্চিমবঙ্গেও গড়ে উঠেছিল 'তেভাগা আন্দোলন' ও 'লাঙ্গল যার, জমি তার' ইত্যাদি আন্দোলন। এই আন্দোলনগুলিও ধরেছিল রক্ত-পিচ্ছিল পথ। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদে অনেকের আশা ছিল, ভূমিহীন কৃষক ভূমি পাবে। কিন্তু জমিন রাতারাতি এমন আশ্চর্য কৌশলে আইনের গলিঘুঁজি দিয়ে হাত-বদল হয়ে গেল যে, শান্তিকামী মানুষদের সেই আশা সফল হলো না। বিনোবাজী সেই প্রতিকারহীন সমস্যার সমাধানে দেখালেন উজ্জ্বল আলোক-শিখা। ভূদান-যজ্ঞের রথচক্র আবর্তিত হতে সুরু করলো, সুরু হলো রক্ত-বিহীন নীরব বিপ্লবের অভিযান। বিনোবাজী ঘোষণা করলেন—"The main objective is to propagate the right thought by which social and economic maladjustments can be corrected without serious conflicts." এই শান্তিপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠবে এক নয়া সমাজ।

ভূদান আন্দোলনের অগ্রগতি

তেলেঙ্গানার এক সংকটপূর্ণ সময়ে অত্যন্ত দীনতম আয়োজনের মাধ্যমে ভূদান আন্দোলনের যাত্রা-সুরু। আর ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৪২ লক্ষ একর জমি সংগৃহীত হয়েছে। তার মধ্যে দশ লক্ষ একরেরও বেশি জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরিত হয়েছে। কিন্তু এই আন্দোলনের লক্ষ্য হলো ৫০০ লক্ষ একর জমি সংগ্রহ, যাতে ভারতের প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারকে কিছু জমি দেওয়া সম্ভব হয়। কাজেই, লক্ষ্য বহু দূরে। তবু এই আন্দোলন গ্রামদান, সম্পত্তিদান, বুদ্ধিদান, জীবনদান, সাধনদান ও গৃহদান ইত্যাদিতে সম্প্রসারিত হয়েছে। এবং ৬,৪১২টি গ্রাম যোগদান করেছে গ্রামদান আন্দোলনে। ভূদান ও গ্রামদানের ক্ষেত্রে ভূমি-হস্তান্তর ব্যাপারে আইন রচনা করে

কয়েকটি রাজ্য সহযোগিতা করেছে এই আন্দোলনের। কয়েকটি রাজ্য আবার উৎসর্গীকৃত গ্রামগুলির পরিচালন-ব্যবস্থা সমবায় সমিতি আইনের আওতায় আনার উপবিধিও (bye laws) রচনা করে দিয়েছে।

কিন্তু ১৯৫১ সালের পর এক যুগ কেটে গেছে। ভূদান আন্দোলনের অগ্রগতি তেমন আশাপ্রদ হয় নি। ভূদান-যজ্ঞে যে সব জমি প্রদত্ত হয়েছে, তার অধিকাংশই পতিত, অনুর্বর কিংবা ভাগাড় বা মরুভূমির অংশ-বিশেষ। ভূদান আন্দোলনের প্রাথমিক সাফল্য নির্ভর করছে জমিদারদের ওপর। ভূমিদান বা সম্পত্তিদানের ব্যাপারে তাদের কার্পণ্য ইতিহাস-বিশ্রুত। আর তাদের হৃদয়হীনতার দুয়ারে দয়া, ত্যাগ ইত্যাদির দোহাই দিয়ে মানবিকতার আবেদন ব্যর্থ হতে বাধ্য।

উপসংহার

বিনোবাজীর আকুল আহ্বানেও তারা স্বার্থপরতার কঠিন গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। আসল কথা, বিনোবাজী এখনও এক কল্পলোকে বাস করছেন। গান্ধীজীও সেই কল্পলোকের অধিবাসী ছিলেন। এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে তাঁর কল্পনার, তাঁর স্বপ্নের যথেষ্ট মূল্যও ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রবল প্রতিক্রিয়ায় আজ নীতিবোধ, ধর্মবোধ, পাপপুণ্যবোধ, এমন কি ঈশ্বরের সম্বন্ধে অস্তিবাদ—সমস্তই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। আজ মানুষের মাথার ওপরে নেই ঈশ্বরের অভিভাবকত্ব, পায়ের তলায় নেই বিশ্বাসের মাটি। আর আধুনিক জীবনের চারদিকে বিশাল শূন্যতার মাঝখানে মাথা তুলে উঠেছে কালোবাজারী, মুনাফাবাজী, মজুতদারী, ভেজাল মিশ্রণ—ইত্যাদি নানা কলঙ্কময় দুর্নীতি। শিল্পায়ন নিয়ে আসছে অতি-যান্ত্রিকতা। এই উগ্র যান্ত্রিকতার যুগে, এই সর্বগ্রাসী দুর্নীতির যুগে বিনোবাজীর মানবিকতার আবেদন কতখানি সফল হবে, এই চরম প্রশ্ন আজ দেখা দিয়েছে নানা দায়িত্বশীল মহলে। ছদ্মবেশী ধনতান্ত্রিক কাঠামোর প্রাচীরে প্রাচীরে ভূদান আন্দোলনের আহ্বান প্রতিহত হয়ে ফিরে ফিরে যাবে। তবু ধনতন্ত্রের রুদ্ধ-দ্বার খুলবে না।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

● **গ্রামদান আন্দোলন, ক. বি. '৫৯**

৩৭. শুভেচ্ছা-মিশন ও বাণিজ্য
Goodwill-Mission and Commerce.

প্রবন্ধ-সূত্র :—অবতরণিকা—বিশ্ব-বাণিজ্যের সার্বজনীনতা ও শুভেচ্ছা-মিশনের ভূমিকা—বিশ্বরাজনীতির দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও বাণিজ্যের দুঃসময়—উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে শুভেচ্ছার গাঁটছড়া ও শুভেচ্ছা-মিশন—'দিবে আর নিবে, মিলাবে, মিলিবে'—প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক লেনদেন—স্বাধীন-ভারতের বাণিজ্যিক শুভেচ্ছা-মিশন ও ভারতের বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি—ভারতীয় বাণিজ্য-প্রতিনিধিদল ও বাণিজ্য-প্রদর্শনীর কর্মসূচী—উপসংহার।

পৃথিবীর সকল দ্বন্দ্ব-সংঘাত, বিরোধ-অবরোধের মূলে রয়েছে পারস্পরিক ভ্রান্তি-বিলাস। সেই ভ্রান্তি-বিলাসের অবসান চাই ; তা নইলে জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, শিল্পে-বাণিজ্যে বিরোধ-অবরোধের অবসান ঘটবে না। একদিকে ক্ষমতা-বিলাস, অন্যদিকে ভ্রান্তি-বিলাস—এই দুই বিলাসের ফাঁসে পৃথিবীর লক্ষ-কোটি মানুষের শ্বাসরোধ উপস্থিত। পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় মানুষ যে নয়া দুনিয়ার স্বপ্ন দেখে, তাতে থাকবে না এই দুই বিলাসের জগদ্দলন-চক্র। পারস্পরিক ভুল-বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে ঐক্য-প্রতিষ্ঠার রুদ্ধ-দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে পারে শুভেচ্ছা-মিশন। তার ফলে অন্তরলোকে জাগ্রত হবে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব এবং তা সহানুভূতির স্নিগ্ধ স্পর্শে মানুষের শুষ্ক হৃদয়কে রসসিক্ত করে তুলবে। সেই সর্বব্যাপী সহানুভূতি বাণিজ্যিক জগতে সঞ্চারিত হয়ে পৃথিবীর নতুন উষার স্বর্ণদ্বার খুলে দেবে, উন্মুক্ত করে দেবে বিশ্বের সকল জাতির সার্বিক বিকাশের পথ। শুভেচ্ছা-মিশন বিশ্বের সেই শুভ-কামনার আশ্বাস বয়ে নিয়ে এসেছে।

অবতরণিকা

আজ বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন জাতি স্ব-স্ব সীমা-প্রাচীরের মধ্যে নিজ-নিজ শিল্প-শৈলীর অনুশীলনে নব-নব উৎপাদন-কৌশল করায়ত্ত করেছে, নিত্য-নব পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাফল্যকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করে শিল্প-বাণিজ্য-জগতে আনছে যুগান্তর, মালিক-মজদুরের মধ্যে উৎপাদনের অনুকূল সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা করে হাওয়া-বদল ঘটাচ্ছে অহরহ। সেই শিল্পধারা, সেই কর্মধারা, সেই চিন্তাধারা মানব-জগতের দেশে-দেশে দিশে-দিশে প্রবাহিত হয়ে যাক্, তাই আজকের সুস্থ-বুদ্ধি ব্যক্তি-মাত্রেরই কাম্য। মানব-প্রতিভা ও মানব-মনীষার যা শ্রেষ্ঠ, যা সর্বোৎকৃষ্ট অবদান, তাকে কোন

দেশকালের সংক্ষিপ্ত গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখলে শিল্প-বাণিজ্যের মৌল উদ্দেশ্য হবে ধূল্যবলুণ্ঠিত। মানুষের শ্রেষ্ঠদান যদি মানুষের সেবায় না লাগে, তবে ব্যর্থ হবে মানুষের বিজ্ঞান-সাধনা, ব্যর্থ হবে তার বাণিজ্য-প্রয়াস। পৃথিবীর জাতিগুলি শিল্প-বাণিজ্যের এই মৌল উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পারছে, এ বড়ো আশার কথা। পারস্পরিক বেচাকেনা, লেনদেন ও আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিশ্ব-মানবের সুখ-শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের অনুকূলে আজ বিশ্ব-বাণিজ্যের পালে লেগেছে নতুন হাওয়া। সকল বিরোধ-অবরোধের মেঘ কেটে গিয়ে শুভেচ্ছা, সম্প্রীতি ও বিশ্বমৈত্রীর সূর্যালোক প্রকাশিত হতে চলেছে—এ মানব-ভাগ্যের বড়ো সুলক্ষণ।

বিশ্ব-বাণিজ্যের সার্বজনীনতা ও শুভেচ্ছা-মিশনের ভূমিকা

বিশ্ব-বাণিজ্যের এই সাবজনীনতা আজ বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে রাজনীতির অন্ধকূপে হারিয়ে যেতে চলেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ছদ্মবেশে বহু জাতি দীর্ঘকাল ধরে অনগ্রসর দেশগুলির সম্পদ শোষণ করে কল্পনাতীত সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এ ইতিহাস নতুন নয়। বাণিজ্য রাজনীতির কাছে দাসখৎ লিখে দিয়ে বহু হতভাগ্য মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয়েছে। 'বণিকের মানদণ্ড' রাত্রি-প্রভাতে দেখা গেল 'রাজদণ্ড রূপে'। বিংশ শতাব্দীতে উগ্র জাতীয়তার বিষ-নিশ্বাস বিশ্ব-রাজনীতিকে বিষাক্ত করে তুললো। জাতিতে জাতিতে পুঞ্জীভূত ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসে পারস্পরিক সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠলো। সহজ আদান-প্রদানের সূত্র ছিন্ন করে, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের বুকে পদাঘাত করে জিঘাংসার উন্মত্ত নেশায় নগ্ন বীভৎসরূপে জেগে উঠলো ফ্যাসিজম্। তখন বিশ্বের সেই রক্তিম আকাশের দিকে চেয়ে কবি-শ্রেষ্ঠের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠলো—

বিশ্ব-রাজনীতিব দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও বাণিজ্যের দুঃসময়

"নাগিনীরা দিকে দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।"

দুটি মহাযুদ্ধের রক্তস্নানে আজ সেই ফ্যাসিজম্ শান্ত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে দেখা গেল পৃথিবী ধনতান্ত্রিক ও কম্যুনিস্ট—এই দুই বিরোধী শিবিরে পরিণত হয়েছে। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ঘূর্ণাবর্তে বাণিজ্যও দুই বিবদমান কক্ষে আবদ্ধ হয়েছে। আজকের দুনিয়ায় রাজনীতির সর্বগ্রাসী তাণ্ডবে ব্যবসা-বাণিজ্য তার মৌলিক আদর্শ বিস্মৃত হয়ে পঙ্কিল রাজনীতির ঘূর্ণায়মান চক্রে নিয়ত আবর্তিত হচ্ছে। সেখানে মানবতা-বিরোধী রাষ্ট্র-ধুরন্ধরদের হাতে এসে পড়েছে আজকের ব্যবসা-বাণিজ্যের কল-কাঠি। ব্যবসায়ী কিংবা শিল্পপতিরা কোথাও কোথাও রাষ্ট্র-নায়কদের প্রভাবিত করে রাজনীতির কলুষ-চক্রে মানব-নিষ্পেষণের পেয়ে যায় অবাধ অধিকার। তা যাই হোক, এতদিন যে

দুই শক্তি-সীমান্তে বাণিজ্য কুক্ষিগত হয়েছিল, তা আজ মুক্তি-প্রতীক্ষায় দিন গুনছে। শিল্প-বিপ্লবোত্তর দুনিয়ায় বাণিজ্যের এই দ্বি-ধারা দুই খাতে প্রবাহিত হয়ে অধুনা যুক্ত-বেণীতে পরিণত হতে চলেছে।

আজ একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, য়ুরোপের কলকারখানার ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে আফ্রো-এশীয় দেশগুলি পরাধীনতা বরণ করে সর্বস্বান্ত হয়েছিল। তাই ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে তারা এতকাল অনগ্রসর দেশরূপে পরিচিত হয়ে এসেছে। কাঁচামালে সমৃদ্ধ এই দুই মহাদেশকে কামধেনুর মতো দোহন করে প্রভুত্বকামী য়ুরোপ অত্যন্ত ফেঁপে উঠেছিল। কিন্তু দুটি বিশ্ব মহাযুদ্ধের খেসারৎ দিতে গিয়ে শক্তিমদমত্ত য়ুরোপ আজ ঘরে-বাইরে একেবারে দেউলে হয়ে গেছে। আজ 'প্রাচী ধরিত্রী' জাগছে, জাগছে এশিয়া-আফ্রিকার শৃঙ্খলিত দেশগুলি। মুক্তির আলো ছড়িয়ে পড়ছে জাপান থেকে ঘানা পর্যন্ত। মুক্তির উল্লাসে আজ মুখরিত হয়ে উঠেছে পৃথিবীর পূর্ব-দিগন্ত।

উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে শুভেচ্ছার গাঁটছড়া ও শুভেচ্ছা-মিশন

এই নবজাত রাষ্ট্রগুলি দীর্ঘকাল শিল্প-বাণিজ্যে বিদেশী-কর্তৃত্বের মধ্যে বাস করে এখন বৈষয়িক সহযোগিতা ছাড়া বৈষয়িক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে অসমর্থ। আজ অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যকল্পে তাই উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে শিল্প-প্রতিনিধি, বাণিজ্য-প্রতিনিধি বিনিময়ের প্রয়োজন অপরিহার্যরূপে দেখা দিয়েছে। অনগ্রসর দেশগুলিকে কৃষির আধুনিকীকরণ, শিল্পায়ন ও বাণিজ্য-প্রসারের স্বার্থে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতেই হবে। দেশের বলিষ্ঠ ভবিষ্যৎ-রচনায় এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ ক্ষেত্রে শুভেচ্ছা-মিশন সদ্য-জাগ্রত দেশগুলির বহু সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেবে। উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে পারস্পারিক শুভেচ্ছায় গাঁটছড়া বেঁধে দিয়ে পৃথিবীর বৈষম্য-দূরীকরণের নতুন ইতিহাস রচনা করবে শুভেচ্ছা-মিশন।

কেবল পৃথিবীর বৈষম্যই নয়, পৃথিবীর বহু রক্তাক্ত সংঘর্ষের সম্ভাবনাকে অর্থনৈতিক শুভেচ্ছা-মিশন নিঃশেষে মুছে ফেলতে পারবে। কোন দেশের রাজনৈতিক ও

"দিবে আর নিবে, মিলাবে, মিলিবে"

অর্থনৈতিক দুর্বলতার মধ্যে ভবিষ্যৎ মহাসমরের বীজ নিহিত থাকে। দুই বৃহৎ শক্তি-সীমান্তের মাঝখানে যেখানে শূন্যতা ও অসহায়তা বিরাজিত, সেখানেই প্রভুত্বকামীদের লোলুপ হাত প্রসারিত হয়ে যাবে এবং প্রভুত্ব-লালসার অগ্নিতে সেই শক্তিহীন দেশকে আত্মাহুতি দিতে হবে। পৃথিবীর সেই রক্তাক্ত যুদ্ধ-সম্ভাবনাকে নিঃশেষে মুছে ফেলবার জন্যে দুর্বল, ও অনগ্রসর দেশগুলিকে অতীতের ঘৃণা ও তিক্ততা মুছে ফেলে অগ্রসর দেশগুলির সঙ্গে মিতালি স্থাপন করতে হবে। এখানে ভাবপ্রবণতার কোন স্থান নেই। এ হচ্ছে দুর্বল

শক্তিহীন জাতিগুলির মরণ-বাঁচনের প্রশ্ন। কাজেই, প্রভুত্ব-বিলাসীরা আজ ফিরে গেলেও পরস্পর 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে'।—তাছাড়া উপায় নেই।

এবার ভারতের কথায় চলে আসি। ভারতও তার কপাল-দোষে আফ্রো-এশীয় দেশগুলির ভাগ্য-বিড়ম্বনার সমান অংশীদার। অথচ অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারত সুদূর চীন, তিব্বত, গ্রীস, পারস্য, সিংহল, মিশর, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও বৈষয়িক উন্নয়নের সোপান রচনা করেছিল। মেগাস্থিনিস, ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ, আলবেরুনী, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, ইব্‌নে বতুতা প্রমুখ শান্তিদূত ভারতের এই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার দীপশিখা দেশ-দেশান্তরে বহন করে নিয়ে গেছেন। কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যই নয়, সেদিন দর্শন, ইতিহাস, রাজনৈতিক চিন্তাদর্শ, সামাজিক আচার-বিচার, জীবনযাত্রার প্রতিটি বিষয় ভারত দেশ-দেশান্তরে প্রেরণ করে শুভেচ্ছা ও বিশ্বমৈত্রীর দ্বারোদ্ঘাটন করেছিল। তারপর মধ্যযুগের ঘূর্ণিবাত্যায় সেই শুভেচ্ছার দীপশিখা নির্বাপিত হয়ে যায়। "সেই সাধনার, সেই আরাধনার যজ্ঞশালার খোলো আজি দ্বার।"

প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক লেনদেন

আজ বিশ্ব-মৈত্রী ও শুভেচ্ছার দ্বার খুলতে হবে। মুক্তিস্নানে উজ্জ্বল ভারত পৃথিবীর ২৮টি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন-চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। ১৯৬৩ সালে রাশিয়া, চেকোশ্লাভাকিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, জর্ডান, ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানের সঙ্গে নতুন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। নতুন চুক্তির গাঁটছড়ায় বাঁধা পড়েছে চিলি, গ্রীস, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। তাছাড়া ১৯৫৩ সালে স্বাক্ষরিত ভারত-মিশর চুক্তির মেয়াদ ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভারত ও পশ্চিম য়ুরোপীয় দেশগুলির বাণিজ্য-মিশন-বিনিময়ের ফলে পশ্চিম জার্মানী সরকার ক্রয়ের জন্যে ভারতের কাপড়, সেলাই-মেশিন প্রভৃতি তালিকাবদ্ধ করলেন এবং আরো কয়েকটি পণ্যকে অনুরূপ সুবিধাদি দানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন। এদিকে ইরাক ও পোল্যাণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে এবং জার্মান সংযুক্ত প্রজাতন্ত্র, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে মিলের কাপড, তাঁত-বস্ত্র, সেলাই-মেশিন, পাটজাত দ্রব্য, নারকেল-কাতানের জিনিস প্রভৃতি বিষয়ে দ্বি-পার্বিক আলোচনা চলেছে। তা ছাড়া ব্রাজিল ও কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তির বিনিময় হয়েছে এবং অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য-সম্প্রসারণের জন্যে আরও আলোচনা চালানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে ব্রহ্মদেশ, ইরান, মেক্সিকো, যুগোশ্লাভিয়া ও রুমানিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ভিয়েৎনাম প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা

স্বাধীন ভারতে বাণিজ্যিক শুভেচ্ছা মিশন ও ভারতের বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি

হয়েছে। পাকিস্তান ও নেপালের সঙ্গে নতুন বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চীনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। অন্যদিকে, স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে একটি বাণিজ্য-প্রতিনিধিদল চুক্তিবদ্ধ দেশগুলি পরিদর্শন করে চুক্তিসমূহ সম্পর্কে তাঁদের মূল্যবান মন্তব্য রাখলেন। বাণিজ্য-সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, সোভিয়েট রাশিয়া এবং জর্ডানের বাণিজ্য-প্রতিনিধিদল ভারত পরিদর্শন করে গেছেন। ভারতের বাণিজ্য শুভেচ্ছা ও শান্তির পথে ক্রমসম্প্রসারণশীল।

ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিনিধি দল ও বাণিজ্য-প্রদর্শনীর কর্মসূচী

বিদেশে ভারতীয় পণ্যের উপযোগিতা ও চাহিদা-সৃষ্টির মানসে একটি প্রদর্শনী-কর্মসূচীও গৃহীত হয়েছে। প্রদর্শনী-অধিকর্তা বিদেশে ভারতীয় পণ্যের প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক প্রদর্শনীর (visual commercial publicity) ব্যবস্থা করেছেন। ১৯৬৩-৬৪ সালে বুডাপেস্ট, পজ্নন, লিপজিগ্, কুয়ায়েত প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-মেলা ও প্রদর্শনীতে এবং ওয়াশিংটন, ন্যুইয়র্ক এবং পশ্চিম বার্লিনে অনুষ্ঠিত গ্রন্থমেলায় ভারত সাফল্যের সঙ্গে যোগদান করেছে। ১৯৬৩ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় পণ্য-প্রদর্শনী আশাতিরিক্ত সাফল্য অর্জন করেছে। তাছাড়া ভারত ১৯৬৪-৬৫ সালের ন্যুইয়র্ক বিশ্বমেলায় অংশ গ্রহণ করেছে এবং দর্শকদের মনে ভারতীয় পণ্য গভীর স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে।

উপসংহার

আজ এই বিশ্বমৈত্রীর দিনে বাণিজ্যকে কোণঠাসা করে রাখার কোন যুক্তি নেই। রাষ্ট্রীয় গোপনতার লৌহ-যবনিকা অপসারিত করে যাবতীয় বিধি-নিষেধের সীমা-বেষ্টনীর পরপারে সকল মানুষ ও সকল জাতির জন্যে বাণিজ্যের অর্গল আজ মুক্ত করে দিতে হবে। এ বিষয়ে অর্ধোন্নত দেশগুলির সামনে ভারতই মহান্ পথ-প্রদর্শক। ভারত আজ যেমন তার দুয়ার খুলে দিয়েছে, তেমনি জগতের সকল রাষ্ট্র খুলে দিক তাদের বাণিজ্য-তোরণ। দ্বন্দ্ব-সংঘাত-মুখর পৃথিবীতে অবসান হোক ভুল-বোঝাবুঝির। অতীতের ভ্রান্তিবিলাস বিলীন হয়ে যাক্ দূর-দিগন্তের অন্তরালে। তাইতো আজ—

"পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে
প্রীতিহার হয় গাঁথা।"

ভারতের বাণিজ্য-মিশন, তার সংস্কৃতি-মিশন সফল হোক বিশ্বের ইতিহাসে।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- বিদেশে সাংস্কৃতিক (Cultural) মিশন প্রেরণের উপযোগিতা, ক. বি. '৫৮
- বাণিজ্য-প্রতিনিধি বিনিময়ের সার্থকতা
- বিদেশে বাণিজ্য-প্রদর্শনীর সার্থকতা

৩৮. ভারতের কুটির-শিল্প
Cottage Industry of India.

প্রবন্ধ-সূত্র :—অবতরণিকা—ভারতের কুটির-শিল্পের পরাভবের কারণ—কুটির-শিল্পের ধ্বংসের ভয়াবহ পরিণাম—বৈচিত্র্য-বিলসিত ভারতের কুটির-শিল্পের বিপুল আয়োজন—ভারতের কুটির-শিল্পের নিদারুণ দুঃসময়—প্রথম পরিকল্পনায় কুটির-শিল্পের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস—দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় কুটির-শিল্প—উপসংহার।

প্রাচীন ভারতের গ্রামগুলি ছিল যথার্থই স্বর্ণ-ভাণ্ডার। গ্রামের প্রতি কুটির ছিল সমগ্র দেশের অর্থনীতির অর্থ-যোগানের প্রধান উৎস। কুটিরে-কুটিরে কর্মব্যস্ত শিল্পী-কারিগরেরা রচনা করতো ভারতের অর্থনীতির সুদৃঢ় বনিয়াদ। অতি প্রাচীনকালেই ভারতের কুটির-শিল্প লাভ করেছিল বিশ্ববিশ্রুত মর্যাদা। ভারতের কুটির-শিল্পজাত পণ্য-সম্ভার কিনবার জন্যে পৃথিবীর অভিজাত বিলাসী জাতিরা হাতে কড়ি নিয়ে প্রাচ্যদেশীয় সার্থ-বাহের পথ চেয়ে বসে থাকতো : কবে ভারতের পণ্য আসবে? যে অপরূপ বৈচিত্র্য-বিন্যাস ও সূক্ষ্মতা শিল্পীমনের অনবদ্য শৈল্পিক আবেদনে পণ্য-অঙ্গে মুদ্রিত হতো, তা অনায়াসেই সক্ষম হতো সৌন্দর্য-বিলাসী বিশ্বের মনোরঞ্জন করতে। বিশ্বের অপর্যাপ্ত ধন-সম্পদ কুটির-শিল্পের মাধ্যমে এদেশে প্রবাহিত হয়ে আসতো। আসতো ভারতের সুখ, আসতো ভারতের সমৃদ্ধি। কোথায় গেল ঢাকাই মসলিন? কোথায় গেল চন্দ্রকোণা, ফরাসডাঙ্গা ইত্যাদি সেই সুপ্রসিদ্ধ বস্ত্র-উৎপাদন-কেন্দ্রসমূহ? অতীতের ইতিহাসের পাতায় তারা গেছে হারিয়ে। স্বদেশ-প্রেমিক কবি তার গৌরবময় স্মৃতিকে অশ্রুসিক্ত করে গাইলেন—

অবতরণিকা

> "বাংলার মসলিন বোগদাদ রোম চীন
> কাঞ্চন-তৌলেই কিনতেন একদিন।"

সেদিন আজ আর নেই। কলাকুশলী ভারতীয় তাঁতীরা আজ আর বিশ্ব-মানবকে 'চন্দ্রকোণা'য় সাজায় না। কাশ্মীরের সৌন্দর্য-বিলসিত শাল, দিল্লীর কারুকার্যময় রেশমীবস্ত্র আজ লুপ্তগৌরব। আর পরম বেদনার বিষয়, ভারতে যখন কুটির-শিল্পের স্বর্ণযুগ, তখন ইংরেজদের পূর্বপুরুষেরা ছিল 'চিত্রিত বর্বর' (painted savages)। ভারত শিল্প-সংঘাতে সেই বর্বরদের উত্তরপুরুষদের হাতে পরাজিত হলো, পদানত হলো তাদের কাছে।

ভারতের এই পরাভবের কারণ—ভারত কোন দিন শক্তিচর্চা করেনি। সে তার-জীবন-সাধনার অঙ্গরূপে করেছে শিল্প-সাধনা, সৌন্দর্য-সাধনা। তাই সে শক্তিমদমত্ত বিদেশীদের কাছে পরাভূত হলো এবং তার শিল্প-সাধনা বিধ্বস্ত হলো যন্ত্রদানবের ভক্ত জাতিগুলির হাতে। ইতিমধ্যে য়ুরোপে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। যন্ত্রজাত বিপুল পণ্যসম্ভার নিয়ে য়ুরোপীয় জাতিগুলি ভারতের বাজারে এসে ভিড় করলো।

ভারতের কুটির-শিল্পের পরাভবের কারণ

অসম প্রতিযোগিতায় ভারতের কুটির-শিল্প পরাজিত হলো। ইংরেজ-রাজশক্তির কাছ থেকে সে কোনদিন সহানুভূতি-সমবেদনা পায় নি, বিনিময়ে পেয়েছে নিদারুণ ঔদাসীন্য ও ধ্বংসের চরম আঘাত। রাজশক্তির অপব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করে নি ধূর্ত বণিক-জাতি। ঢাকার মসলিন-শিল্পীদের এবং চন্দ্রকোণার তন্তুবায়দের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-ছেদনের কাহিনী এই ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে অত্যন্ত সংগতিপূর্ণ। শিল্পবিপ্লব তাদেব অর্থনৈতিক সিদ্ধি এনে দিয়েছিল; আর ভারতের ভাগ্যে এনে দিয়েছিল ইতিহাসের চরমতম দুর্ভাগ্য।

সেই দুর্ভাগ্যের চিহ্ন প্রতিফলিত হলো আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে। বিধ্বস্ত কুটির-শিল্পের হতভাগ্য বেকার শিল্পীরা জীবিকান্নের সংস্থানের জন্য জীবন-সংগ্রামের তীব্রতায় দিশেহারা হয়ে পড়লো। যাদের পক্ষে সম্ভব হলো, তারা ফিরে গেল সর্বস্বান্ত কৃষিতে; যাদের পক্ষে সম্ভব হলো না, তারা কারখানার শ্রমিকে পরিণত হলো।

কুটির-শিল্পের ধ্বংসের ভয়াবহ পরিণাম

যারা কৃষি কিংবা শিল্পে কোথাও স্থান পেল না, তারা বরণ করে নিল অকালমৃত্যু। ওদিকে কৃষিতে যারা ফিরে গিয়েছিল, তারা কৃষিকে অতিরিক্ত জন-সংখ্যার চাপে করে তুললো অতি-ভারগ্রস্ত। কৃষির উৎপাদন-ক্ষমতা গিয়ে ঠেকলো নৈরাশ্যজনক অবস্থায়। শিল্প পেল না তার দরকারী কাঁচামাল। কৃষি-লক্ষ্মীর এই নিদারুণ কার্পণ্যে ভারতের বুকে নেমে এলো দুর্ভিক্ষ। কুটির-শিল্পের ধ্বংসের ফলে ভারতের অর্থনীতির একটা মূলসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। পরিণামে, ভারতের ভাগ্যে এসে জুটলো চরমতম দারিদ্র্য।

অথচ ভারতের কুটির-শিল্পের গৌরবময় যুগে দারিদ্র্যের চিহ্নমাত্র ছিল না, জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ছিল অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা। সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত ও

বৈচিত্র্য-বিলসিত ভারতের কুটির-শিল্পের বিপুল আয়োজন

বহু বৈচিত্র্য-বিলসিত ভারতের কুটির-শিল্প সেদিন প্রভূত বৈদেশিক ধনরত্নে স্বদেশভূমিকে সাজিয়েছে। ভারতের কুটির-শিল্পের খ্যাতি সেদিন বিশ্বের জনপ্রবাদে পরিণত হয়েছিল। রেশম ও পশম-শিল্প, তন্তুবায়-শিল্প, দুগ্ধজাত পণ্য-শিল্প, চর্ম-শিল্প, কর্মকৃতি, কুম্ভকৃতি, শঙ্খকৃতি, বেত্র-শিল্প, কাগজ-শিল্প, অলঙ্কার-শিল্প, কার্পেট, সূচী-শিল্প, কাঠ-শিল্প, ভাস্কর্য-শিল্প, মৃৎ-শিল্প, কাঁচের চুড়ি, ঝিনুক ও চীনামাটির বাসনপত্র, কাংস্য-শিল্প,

চিত্র-শিল্প, ছাতা, মিষ্টান্ন-শিল্প, গন্ধ-দ্রব্য, রঞ্জন-শিল্প, ও প্রসাধন-সামগ্রী ইত্যাদি ভারতের কুটির-শিল্পের গৌরব ও সমৃদ্ধির ছিল শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। তারপর বিদেশী-শক্তির আবির্ভাবে ভারতের কুটির-শিল্পের সেই গৌরব-সূর্য অস্তমিত হলো।

ভারতের জনসংখ্যার একটা বিরাট্ অংশের জীবিকান্নের সংস্থান যোগাত কুটির-শিল্প। কুটির-শিল্পের শ্রমিক-সংখ্যা প্রায় দু কোটি, অর্থাৎ ভারতের মোট জন-সংখ্যার কুড়ি-শভাংশ। একমাত্র তাঁত-শিল্পেই প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোকের কর্ম-সংস্থান হয়। যন্ত্রদানবের কৃপাপুষ্ট বিদেশী-শিল্পের সঙ্গে তীব্র সংঘাতে ভারতে শিল্প-গৌরব পরিণত হলো ইতিহাসের এক বিস্মৃততম অধ্যায়ে, লুপ্ত হলো অতীতের কারিগরী দক্ষতা, শিল্প-প্রকর্ষ ও উৎপাদন-নৈপুণ্য। ঋণগ্রস্ত, অর্ধ-ভুক্ত, রোগ-জীর্ণ, স্বাস্থ্যহীন, গ্রামীণ শিল্পীরা প্রতি মুহূর্তে শুনেছে মৃত্যুর ভয়ঙ্কর পদশব্দ। নতুন যুগের সঙ্গে মোকাবিলা করবার মতো তাদের উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি নেই, উৎকৃষ্ট কাঁচামাল নেই, শৈল্পিক দক্ষতা নেই, মূলধন নেই, নতুনের আবিষ্করণের জন্যে নেই গবেষণা, পণ্য-বিক্রয়ের জন্যে নেই কোন বৈজ্ঞানিক বিক্রয়-পদ্ধতি। জমিদার, মহাজন, দালাল, ফড়িয়া ইত্যাদি মধ্যবর্তী শ্রেণীর শোষণে নাভিশ্বাস উঠেছে ভারতের কুটির-শিল্পের।

ভারতের কুটির-শিল্পের নিদারুণ দুঃসময়

কুটির-শিল্পের এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি নিয়ে ভারত স্বাধীন হলো। এলো পরিকল্পনার যুগ। শিল্পায়নের আয়োজন চলতে লাগলো দিকে দিকে। কিন্তু কুটির-শিল্প? ভারতের সেই বহু-ঐতিহ্যমণ্ডিত কুটির-শিল্প? ১৯৫৫ সালে হার্ভে-কমিটি কুটির-শিল্প ও ক্ষুদ্র-শিল্পের সকল দুর্গতি ও সংকটের প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করলো। ভারত-সরকার সেই কমিটির প্রতিবেদন-অনুসারে কুটির-শিল্পের উন্নয়নে উদ্যোগী হয়েছেন। আগামীকালের ভারতের অর্থনীতিতে ভারতের কুটির-শিল্প যাতে তার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, তার জন্যে সরকার ও পরিকল্পনা কমিশন সজাগ রয়েছেন।

প্রথম পরিকল্পনায় কুটির-শিল্পের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটির-শিল্পের পুনর্গঠনের জন্যে সর্বভারতীয় বোর্ড সংগঠিত হয়। এই সংস্থা ভারতের ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পসমূহের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, অন্যদিকে, ভারতের লুপ্ত কুটির-শিল্পের পুনর্বিন্যাস ও অধুনিকীকরণের জন্যে সক্রিয় করে তোলা হলো সমবায় আন্দোলনকে। তাঁত-শিল্প, রেশম-শিল্প, খাদি ও গ্রামোদ্যোগ শিল্প, ক্ষুদ্র-শিল্প, নারকেল-ছোবড়া-শিল্প, হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্‌ট্—এই বোর্ডগুলি সমবায় আন্দোলন থেকে প্রাণ-প্রবাহ সংগ্রহ করে নবজীবনের পথে চলেছে এগিয়ে। ঋনদান, কারিগরী প্রশিক্ষণ, আধুনিকতর যন্ত্রপাতি সরবরাহ, উপযুক্ত পণ্য-বিক্রয়-ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে চলেছে কুটির-শিল্পের নব-নব আয়োজন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সেই আয়োজন লাভ করে ব্যাপকতর রূপ। প্রথম পরিকল্পনায় এই খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৪৩ কোটি টাকা; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮০ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় সেই পরিমাণ বর্ধিত হয়ে দাঁড়িয়েছে ২৬৪ কোটি টাকা। শুধু তাই নয়, বেসরকারী উদ্যোগে প্রায় ২৭৫ কোটি টাকার বিনিয়োগ অনুমিত হয়েছে। এই ক্রমবর্ধমান ব্যয়-বরাদ্দের চিত্রের সাহায্যে কুটির-শিল্পের গুরুত্ব উপলব্ধির পরিচয় মেলে। ভারত সরকার একদিকে বৃহদায়তন শিল্প-বিকাশের ভূমিকারূপে মৌল-শিল্প স্থাপনে সক্রিয়, অন্যদিকে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের পুনর্বিন্যাস ও সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগী। বৃহদায়তন শিল্প ও গ্রামীণ শিল্পের সহ-অবস্থিতির মাধ্যমে ভারতে শিল্পায়নের গতি ত্বরান্বিত করতে সরকার আজ প্রয়াসী। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে সুষম ভারসাম্যের গাঁটছড়া বেঁধে দিয়ে ভারতের বৈষয়িক সমৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন ভারত সরকার। তৃতীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন আকারের ৩০০টি নতুন শিল্প-উপনিবেশ (Industrial Estates) স্থাপন প্রস্তাবিত হয়েছে, যাতে প্রায় ৮০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব হবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় গ্রামীণ শিল্পের পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণের জন্যে পরিকল্পনা কমিশন যে মূল্যবান সুপারিশগুলি করেছেন, সেগুলি হলো: এক, উৎপাদন-বৃদ্ধি ও উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করবার জন্যে শৈল্পিক দক্ষতা বৃদ্ধি, কারিগরী পরামর্শদান, উন্নত যন্ত্রপাতি ও ঋণ সরবরাহ; দুই, বিক্রয়-ব্যবস্থায় উৎসাহ-সৃষ্টির জন্যে রিবেট দান ও সংরক্ষিত বাজারের ব্যবস্থা; তিন, ক্ষুদ্র শহর ও গ্রামাঞ্চলে কুটির-শিল্পের যথাযথ সম্প্রসারণ; চার, বৃহদায়তন শিল্পের সহায়ক শিল্পরূপে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের সম্প্রসারণ; এবং পাঁচ, গ্রামীণ শিল্পীদের মধ্যে সমবায়-প্রথার বহুল প্রচলন।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় কুটির-শিল্প

এতদিন বৃহৎ-শিল্পসমূহের চাপে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি সুষ্ঠুভাবে বিকাশের সুযোগ পায়নি। নীতিগতভাবে ক্ষুদ্র-শিল্পগুলির গুরুত্ব স্বীকৃত হলেও কার্যতঃ তা হয়নি। সম্প্রতি আবার নতুন হাওয়া উঠেছে। ক্ষুদ্র-শিল্পগুলির বিকাশের দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে, এ বড়ো আশার কথা। বাস্তবিকই, ভারী এবং বৃহৎ-শিল্পে প্রচুর মূলধন নিয়োগ করেও যত লোকের কর্ম-সংস্থান হয়, ক্ষুদ্র-শিল্পে অল্প টাকায় তার চেয়ে অনেক বেশি লোকের নিয়োগ সম্ভব হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, শিল্পোন্নত জাপানে তাই হয়েছে। সেখানে এক-একটি অঞ্চলে ক্ষুদ্র-শিল্পের এক-একটি উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। বেকার-সমস্যা ও খাদ্য-সমস্যায় জর্জরিত ভারতের পক্ষে ক্ষুদ্র-শিল্পের পথানুসরণ হবে কল্যাণপ্রদ। কুটির-শিল্প ও ক্ষুদ্র-শিল্পের বিকাশের মধ্যে ভারতের বেকার-সমস্যা ও খাদ্য-সমস্যার সমাধানের চাবি-কাঠি যে লুকানো রয়েছে, তা বলা বাহুল্য।

বেকার-সমস্যা ও খাদ্য-সমস্যা সমাধানে কুটির-শিল্প

ভারতের গ্রামীণ শিল্পসমূহের পুনরুজ্জীবন সুরু হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ধান-ভাঙ্গা, তৈল-উৎপাদন, চর্ম-শোধন, দিয়াশলাই, গুড, মক্ষিকাপালন, তালগুড়, হস্ত-নির্মিত কাগজ, সাবান, সুতা ইত্যাদি উৎপাদনের দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। এ বড়ো আশার কথা। চতুর্থ পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র-শিল্পে বিনিয়োগ-বরাদ্দ আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে। এবার ক্ষুদ্র-শিল্পে ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ হলো ৪৫০ কোটি টাকা।

উপসংহার

ভারতের অর্থনীতির এই মরাখাতে আজ বহুদিন পরে আবার জোয়ারের নতুন স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে। কুটির-শিল্পের সমবায়ী নৌকার পালে আজ হাওয়া লেগেছে। কুটির ও গ্রামীণ শিল্প আজ অভূতপূর্ব গতির প্রেরণায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বহু শতাব্দীর জডতা কাটিয়ে ভারতের গ্রামীণ শিল্পের এই নব জাগরণ ভারতবাসার জীবনে সত্য হোক, সফল হোক।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- ভারতের গ্রামীণ-শিল্প
- ভারতে কুটির-শিল্পের উপযোগিতা, ক. বি. '৬২
- ভারতে ক্ষুদ্র-শিল্পগুলির বিকাশের প্রয়োজনীয়তা
- ভারতের অর্থনীতিতে কুটির-শিল্পের স্থান
- বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সহাবস্থান
- বাংলাদেশে কুটির-শিল্পের প্রয়োজনীয়তা, ক. বি. '৬৫

৩৯. ভারতের শর্করা-শিল্প
Sugar Industry in India.

প্রবন্ধ-সূত্র ঃ—অবতরণিকা—ভারতের শর্করা-শিল্পের ধারাবাহিক ইতিহাস—নতুন চিনির কল স্থাপন ও বর্তমান কলগুলির সম্প্রসারণ—স্থানীয়করণ বনাম বিকেন্দ্রীকরণ নীতি—শর্করা-শিল্পের সমস্যা এবং সমস্যা-সমাধানে সরকারী প্রয়াস—ভারতের শর্করা-শিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—পুনর্নিয়ন্ত্রণাদেশ, ১৯৬৩; তার পটভূমি ও পরিণাম—বর্তমান সংকটের মূল ও প্রকট রূপ—উপসংহার।

অবতরণিকা

ভারতের শর্করা-শিল্পের ইতিহাস অতি প্রাচীন। কিন্তু প্রাচীন ভারতে শর্করা-শিল্প ছিল সম্পূর্ণরূপে কুটির-শিল্প-ভিত্তিক। ভারতের ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে তা ছিল একেবারেই অক্ষম; তাছাড়া, এই শিল্পের বিপুল সম্ভাবনাময় বিকাশের দিকটি তখনও ছিল সুদূরপরাহত এবং তার প্রতিশ্রুতিময় সমৃদ্ধ বাজার তখনও ছিল কল্পনাতীত। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ রাজশক্তির শিল্প-বঞ্চনায় এই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎময় শিল্পটির বিকাশের অঙ্কুর গেছে অকালে শুকিয়ে। তাতে ভারতের ক্ষতি হয়েছে; কিন্তু ইংরেজেরও লাভ হয় নি। জাভা ও কিউবার কাছ থেকে উচ্চ মূল্যের চিনি ক্রয় করতে ভারতের কড়ি যেমন ব্যয়িত হয়েছে, তেমনি ব্যয়িত হয়েছে ইংলণ্ডের স্টার্লিং। কিন্তু ১৯০৩ সালে যেই ভারতে চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হলো, ইংরেজ তার সুমিষ্ট আস্বাদ পেয়ে আকৃষ্ট হলো, ভারতের শর্করা-শিল্পের নব উদ্বোধন হলো। দেখতে দেখতে চিনির কলের সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে লাগলো। কিন্তু তার বিকাশ-লগ্নেই ঘনিয়ে এলো নানা বিপদের পুঞ্জীভূত মেঘ।

ভারতের শর্করা-শিল্পের ধারাবাহিক ইতিহাস

বিজাতীয় সরকারের হৃদয়হীন বিমাতৃ-সুলভ আচরণে এই শিল্পের অফুরন্ত সম্ভাবনাময় দিকটি অকালে শুকিয়ে যাবার উপক্রম হলো। প্রথম মহাযুদ্ধ বিকাশের সুযোগ নিয়ে এলো বটে, কিন্তু সরকারের দুরূহ করভার বহন করে এই শিশু-শিল্পটি অকাল-মৃত্যুর দিকে চললো এগিয়ে। এলো বিভেদাত্মক সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের কুণ্ঠিত হস্তের দাক্ষিণ্য এই শিল্পটির ভাগ্যে এসে পৌঁছুলো অনেক পরে—১৯৩২ সালে। সামান্য সংরক্ষণ লাভের ফলে ১৯৩৬ সালের মধ্যেই ভারতবর্ষ চিনি উৎপাদনে স্বয়ংভর হয়ে উঠলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষীয় দেশগুলিতে ভারতীয় চিনির চাহিদা বৃদ্ধি পেল। কিন্তু

অতি-উৎপাদনের যন্ত্রণা তাকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে হলো। মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির চাহিদা মেটাতে গিয়ে এবং অন্তর্দেশীয় পরিবহণের অব্যবস্থায় চিনির অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হলো। ভারতের শর্করা-শিল্পের বিকাশ যে লক্ষ্যমানে পৌঁছোয় নি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর ও সার্বিক পণ্যাভাবের মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যে তা আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করলাম। সরকারকে পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ-প্রথা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসতে হলো। তারপর দেশ স্বাধীন হলো। ১৯৫০ সাল থেকে শর্করা-শিল্প সংরক্ষণের সুযোগ লাভে বঞ্চিত হলো। অন্যদিকে, ১৯৫২ সালে জাতীয় সরকার চিনির ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ-প্রথা অপসারিত করে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা গেল দ্রুত-হারে বেড়ে। বাধ্য হয়ে সরকারকে পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্যে বিদেশ থেকে চিনি আমদানি করতে হলো। দেশের পুঁজিপতিরা চিনির এই আগ্রাসী বাজারের রূপ দেখে এই শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত চলেছিল এই শিল্পের উৎপাদন-সংকট। তারপর থেকে সেই সংকট উত্তীর্ণ হয়ে ভারতের শর্করা-শিল্প ক্রমোন্নতির স্বপ্ন দেখছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সে এক বছর আগেই পরিকল্পনার পাঁচ বছরের লক্ষ্যমান অবলীলায় অতিক্রম করে যায়।

স্বাধীনতালাভের পূর্বে ভারতে চিনির কলের সংখ্যা ছিল ১৩৮; ১৯৬০-৬১ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭৫। চিনির উৎপাদন-বৃদ্ধিকল্পে ৫৪টি সমবায়-সহ অতিরিক্ত ৭২টি নতুন কল-স্থাপন এবং বর্তমান কলগুলির মধ্যে ১২০টির সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে চিনির উৎপাদন ছিল ৩০·২৯ লক্ষ টন। পরবর্তী আর্থিক বছরে ইক্ষু-উৎপাদন স্বল্পতার জন্যে চিনির উৎপাদন হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ২১·৫২ লক্ষ টন। কিন্তু তা সত্ত্বেও রপ্তানি হ্রাস না পেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল লক্ষাধিক টন

নতুন চিনির কল স্থাপন ও বর্তমান কলগুলির সম্প্রসারণ

১৯৬৩ সালে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪·৭৯ লক্ষ টন। ১৯৬৩ সালে উৎপাদন-লক্ষ্য ছিল ৩৩ লক্ষ টন। সেই উৎপাদন-লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্যে নতুন চিনির কল স্থাপন ও সম্প্রসারণের এই আয়োজন।

ভারতের শর্করা-শিল্প উত্তর ভারতে—বিশেষতঃ বিহার ও উত্তরপ্রদেশে কেন্দ্রীভূত। তার কারণ ইক্ষু-উৎপাদনে এই অঞ্চল ইতিহাস-বিশ্রুত গৌরব অর্জন করেছে এবং এতদঞ্চলের জলবায়ুও শর্করা-শিল্পের অত্যন্ত অনুকূল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দক্ষিণ ভারতের বোম্বাই, মাদ্রাজ, মহীশূর ও অন্ধ্রপ্রদেশে বহু নতুন চিনির কলের উদ্ভব হয়েছে এবং তাদের উৎপাদন-ক্ষমতাও আশাপ্রদ। দক্ষিণ ভারতের জলবায়ু চিনি-উৎপাদনের অধিক অনুকূল বলে বর্তমানে

স্থানীয়করণ বনাম বিকেন্দ্রীকরণ নীতি

স্বীকৃতি লাভ করেছে। শিল্পের আঞ্চলিকতার যতই সাফল্য থাকুক, তার ত্রুটিও আছে

এবং সরকার সেই ত্রুটির প্রতি সজাগ। তাই শর্করা-শিল্পে সরকার বিকেন্দ্রীকরণ নীতির পক্ষপাতী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সরকারের শর্করা-নীতি রচনায় উত্তরাঞ্চলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত থাকায় দক্ষিণাঞ্চল অবহেলিত হয়েছে এবং হচ্ছে। ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে লোকসভায় দক্ষিণাঞ্চলের কোন প্রতিনিধির মন্তব্যে এই ব্যাপার প্রকট হয়ে ওঠে এবং সরকার পক্ষ থেকে এই ত্রুটি অপসারণের প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হয়।

শর্করা-শিল্পের সমস্যা এবং সমস্যা-সমাধানে সরকারী প্রয়াস

ভারতের এই শিল্পের ভবিষ্যৎ যেমন সম্ভাবনাময়, বিকাশের পথে বাধাও তেমনি অজস্র। উত্তরাঞ্চলে এই শিল্পের আত্যন্তিক আঞ্চলিকতার দরুন সন্নিহিত কলগুলির মধ্যে ইক্ষু-সংগ্রহের জন্যে প্রতিযোগিতা অত্যন্ত তীব্র। ইক্ষুর ফসলের মরশুম অত্যন্ত স্বল্প। ফলে, ফসলের মরশুমে ইক্ষু-ক্রয়ের প্রতিযোগিতা তীব্রতম রূপ পরিগ্রহ করে। তার ওপর আছে 'খণ্ডেসরী' মহাজন ইত্যাদির প্রতিক্রিয়াশীল দৌরাত্ম্য। তাছাড়া গুড-উৎপাদনের জন্যে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু গ্রামাঞ্চলে আটক হয়ে যায়। অথচ ওদিকে অবহেলিত ইক্ষু-চাষের উৎপাদন আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পায় নি। এই পরিস্থিতিতে চিনির কলগুলির পক্ষে ইক্ষু-সংগ্রহ এক দুরূহ ব্যাপার। একদিকে, ক্রমবর্ধিষ্ণু চাহিদার পরিতৃপ্তি-সাধনের আহ্বান; অন্যদিকে, ইক্ষু-সংগ্রহের কৃচ্ছ্রতা ও মূল্যাতিশয্য। এই দুয়ের টানা-পোড়েনে ভারতের শর্করা-শিল্প যখন দ্বিধাগ্রস্ত, তখন সরকারকে নতুন করে তাঁদের শর্করা-শিল্প-নীতি রচনা করতে হলো। এই নীতি একদিকে ইক্ষু-উৎপাদনে কৃষকদের এবং অন্যদিকে চিনি-উৎপাদনে মিল-মালিকদের প্রেরণা যুগিয়েছে। সরকার কৃষকদের ইক্ষু-উৎপাদনে দিয়েছেন নানা সুবিধার প্রতিশ্রুতি, আর মিল-মালিকদের দিয়েছেন শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অন্তঃশুল্কের হাত থেকে রেহাই।

ভারতের শর্করা-শিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

ভারতে শর্করা-শিল্পের স্থান বস্ত্রশিল্পের পরেই। কিন্তু ভারতে চিনির ব্যবহারের পরিমাণ মাথাপিছু অত্যন্ত কম। ডেনমার্কে মাথাপিছু চিনির ব্যবহার ৫৫'৫ কিলোগ্রাম, কিন্তু ভারতে মাথাপিছু ব্যবহার মাত্র ১৫ কিলোগ্রাম। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক চিনির উৎপাদক হলো কিউবা। এবং বিশ্বের চিনির বাজারে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী হলো সোভিয়েট রাশিয়া, ব্রেজিল, জাভা, জার্মানী, কিউবা ও পোল্যাণ্ড। ভারতের প্রায় ৫০ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষুচাষ হয়। বছরে ইক্ষুর উৎপাদন প্রায় দশ কোটি টন; তা থেকে উৎপন্ন হয় প্রায় ত্রিশ লক্ষ টন চিনি। ১৯৬০-সালে ভারতে চিনির কলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭৫টি। শর্করা-শিল্পে প্রায় ৬০ কোটি টাকার মূলধন খাটে এবং প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়। এই শিল্পের উন্নতিকল্পে ইক্ষুর উৎপাদন-বৃদ্ধি, উপযুক্ত গবেষণা, মিলের যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ, উপজাত-পণ্যাদির উৎপাদন ও তাদের বাজারীকরণের

সুব্যবস্থা করা চাই। অন্যান্য দেশে শর্করা-শিল্পের উপজাত-রূপে সুরাসার (power alcohol), কাগজ, বোর্ড ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। ভারতে সেই লাভজনক দিকটি উন্নীত হলে সঙ্গত কারণেই চিনির মূল্যও হ্রাস পাবে।

এই দুর্ভাগাদেশে বহু সমস্যার সঙ্গে চিনির সমস্যাও এসে ভিড় করেছে। দেশে চিনির সরবরাহ হ্রাস পেয়েছে। জনগণের কাছে চিনি আজ দুষ্প্রাপ্য। নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পাওয়া গেলেও মূল্য অতি উচ্চ। চিনির সরবরাহ হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ উৎপাদন-হ্রাস। ১৯৫৫-৫৬ সালে চিনির উৎপাদন ছিল ১৮·৬২ লক্ষ টন; ১৯৬০-৬১ সালে ৩০·২৯ লক্ষ টন, ১৯৬১-৬২ সালে ২৭·১৪ লক্ষ টন। অতএব চিনির সর্বোচ্চ উৎপাদন-বর্ষ ১৯৬০-৬১ সাল। ১৯৬২-৬৩ সালে চিনির উৎপাদন হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ২১·৬০ লক্ষ টন। ১৯৬০-৬১ সালের তুলনায় প্রায় ৯ লক্ষ টন কম। এদিকে ভারতের ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যা এবং জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশের ক্রয়-ক্ষমতা-বৃদ্ধি হেতু চিনির ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে চাহিদা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিণামে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে মূল্য-রেখা। চিনির মূল্য-রেখার ঊর্ধ্বগতি রোধ করবার উদ্দেশ্যে ১৯৬৩ সালের ১৭ই জুলাই সরকার চিনির মূল্য ও বণ্টনের ওপর ভারতীয় প্রতিরক্ষা বিধিবলে একটি আদেশ জারি করে পুনরায় নিয়ন্ত্রণ-প্রথা বলবৎ করেছেন। তাতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে পরামর্শ করে অন্তঃশুল্ক ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ব্যয়সহ বিভিন্ন রাজ্যের জন্যে প্রতি কুইন্টলের পাইকারী ও খুচরা মূল্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন: উত্তর প্রদেশ ও উত্তর বিহারের জন্যে ১০৮·৫০ টাকা; দক্ষিণ বিহার, পাঞ্জাব, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্র প্রদেশের জন্যে ১০৯·৮৫ টাকা; উড়িষ্যার জন্যে ১১০·৫০ টাকা; পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ, মহীশূর, কেরালা, পণ্ডিচেরীর জন্যে ১১১·২০ টাকা; গুজরাটের জন্যে ১১২·৫০ টাকা; আসামের জন্যে ১১৩·৮৫ টাকা। কিন্তু এই সরকারী হস্তক্ষেপে বড় বেশি বিলম্ব হয়ে গেছে। ১৯৬২-৬৩ সালের ইক্ষু-মরশুমের সূচনাতেই সুস্পষ্টভাবে বোঝা গিয়েছিল যে, ইক্ষু-চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং গুড় ও খণ্ডেসরী উৎপাদনের জন্যে ইক্ষুর ফটকাবাজিতে দারুণ কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। তথাপি রাজ্যসরকার কি কেন্দ্রীয় সরকার, কারুর ঘুম ভাঙে নি। সেই নিদারুণ সরকারী ঔদাসীন্যের ফলে চিনির উৎপাদন হ্রাস পেল এবং জনগণকে উচ্চ মূল্যের খেসারত দিয়ে যেতে হচ্ছে। ১৯৬২-৬৩ সালে পাঞ্জাবে বন্যা, উত্তর প্রদেশ ও বিহারে শুষ্ক আবহাওয়া এবং দক্ষিণ ভারতে ইক্ষুর সংক্রামক রোগাক্রমণের জন্যে ইক্ষু-উৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত হ্রাস পেয়েছিল। ১৯৬৩ সালে

পুনর্নিয়ন্ত্রণাদেশ ১৯৬৩; তার পটভূমি ও পরিমাণ

বর্তমান সংকটের মূল ও প্রকট রূপ

ভারতীয় চিনিকল সমিতির সভাপতি শ্রী জি. এম. মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি-মন্ত্রক ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রতি কুইণ্টল চিনির মূল্য পুনর্বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস দান করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ১৮ই নবেম্বর সরকার বিভিন্ন অঞ্চলে চিনির প্রতি-কুইণ্টল তিন টাকা থেকে আট টাকা মূল্য-বৃদ্ধি ঘোষণা করলেন। ইক্ষু-চাষের অঞ্চল আজ রাজনীতির ও কায়েমী-স্বার্থের চক্রান্তে পূর্ণ। সেখানে সরকারের ভূমিকা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টায় সীমাবদ্ধ। পরিণামে মূল্য-ভারে জর্জরিত হতভাগ্য ক্রেতার ঘাড়ে বাড়লো কিলোগ্রাম-প্রতি অতিরিক্ত দশ পয়সার বোঝা।

দুঃখের বিষয়, আজও দেশে বছরে কত পরিমাণ চিনির প্রয়োজন, তার কোন হিসাব প্রস্তুত হয় নি। মনে হয়, সেই প্রয়োজনের পরিমাণ ২৬ লক্ষ টনের মতো। চুক্তিবদ্ধ রপ্তানির জন্যে প্রয়োজন ৫ লক্ষ ৪০ হাজার টন। জাপান, কানাডা, মালয়, আমেরিকা ও সিংহল ভারতীয় চিনির বড় ক্রেতা। এদিকে ১৯৬৩-৬৪ সালে কিউবা ও সোভিয়েট রাশিয়ার চিনি-উৎপাদন নানা কারণে ব্যাহত হয়েছে। ফলে লণ্ডনের বাজারে ১৯৬৩ সালে চিনির প্রতি-টনের মূল্য দাঁড়িয়েছে ১,৪০০২ টাকায়। ভারতীয় চিনির সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। তাই ভারত ১৯৬৩-৬৪ সালে তার চিনি-উৎপাদনের লক্ষ্য-মাত্রা ৩৩ লক্ষ টন স্থির করেছে। এর ফলে ৫০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। তাই সরকার চিনির মূল্য-নিয়ন্ত্রণেই তাঁদের কর্তব্য শেষ মনে না করে চিনি-উৎপাদন অঞ্চলে মণ-প্রতি ইক্ষুর মূল্য পঞ্চাশ পয়সা বৃদ্ধির ঘোষণা করেছেন এবং ১৯৬৩ সালের ৫ই অক্টোবর ভারতীয় প্রতিরক্ষাবিধির বলে ইক্ষু-সরবরাহজনিত বিশেষ নিয়ন্ত্রণাদেশ বলবৎ করেছেন। আশা করা যায়, ভারতের প্রতিশ্রুতিময় এই শর্করা-শিল্প বর্তমান সংকট কাটিয়ে অদূর ভবিষ্যতে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মুখ দেখতে পাবে। বিশ্ব-পরিস্থিতি তার সহায়; তার অগ্রগতি রোধ করবে কে?

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- ভারতে শর্করা-শিল্পের বর্তমান সংকট
- ভারতে শর্করা-শিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

৪০. ভারতের পাট-শিল্প

Jute Industry of India.

প্রবন্ধ-সূত্র :—অবতরণিকা—বাংলার পাট-শিল্পের সমৃদ্ধির ইতিহাস—ভারতের পাট-শিল্পের সংকটের সূত্রপাত—ভারতীয় পাট-শিল্পে চতুবাঙ্গিক সংকট—সংকট-জয়ের ব্যবস্থা এবং অবস্থার ক্রমোন্নতি—ক্রমোন্নতির দিক্‌দিগন্ত—পাট-উৎপাদনে স্বয়ং-নির্ভরতা—উপসংহার।

স্বাধীনতার মাশুলরূপে ভারতকে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে; বিনিময়ে ঘরে তুলতে হয়েছে বহু দুঃখ, বহু অনিবার্য সংকট। পাট-চাষ ও পাট-শিল্প-সংকট তাদের অন্যতম। অথচ বিংশ শতাব্দীর প্রভাত-লগ্নে ভারতের এই শিল্পের বিকাশ ও সমৃদ্ধি বিশ্বকে স্তম্ভিত করেছিল। সেদিন পাট-চাষে অখণ্ড বাংলার ছিল গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। কিন্তু ভাগ্যচক্রের আকস্মিক পরিবর্তনে অখণ্ড বাংলা হলো দ্বিধা-বিভক্ত এবং ভারতীয় পাট-শিল্পের কপালে জুটলো দুর্নিবার ক্ষতির ক্রমবর্ধিষ্ণু অঙ্ক। বঙ্গ-বিভাগে ১৯০৫ সালের বৈদেশিক প্রয়াস ১৯৪৭ সালে সফল হলো স্বদেশীয়দের হাতেই। পাট-চাষের সমৃদ্ধ অঞ্চল পূর্ববঙ্গ পড়লো পাকিস্তানের ভাগে। ওপারে পূর্ববঙ্গের পাট পাকিস্তানের অর্থনীতির বনিয়াদ স্থাপন করলো। আর এপারে ভারতের ভাগ্যে জুটলো ভাগীরথী-তীরবর্তী শতাধিক চটকল, যার সঙ্গে প্রায় তিন লক্ষাধিক শ্রমিক-মজুরের অন্ন-বস্ত্র এবং ভারতীয় অর্থনীতির এক বিরাট্ প্রশ্ন জড়িত। শতাধিক চটকল তো জুটলো, কিন্তু কাঁচা পাট যে পড়ে রইল পাকিস্তানে; পরিণামে যা হবার তাই হলো, ভাগীরথী-তীরের ভাগ্যহত চটকলগুলি ধুঁকতে ধুঁকতে বেঁচে রইল অতীত গৌরবের মূক সাক্ষীরূপে।

অবতরণিকা

প্রাচীন বাংলার পাট-শিল্প ছিল কুটির-শিল্পের গণ্ডিবদ্ধ। আধুনিক যুগের মহাশিল্পের ব্যাপ্তি সে কখনও লাভ করে নি। কিন্তু তার উৎপন্ন 'পাটের পাছড়া', 'পট্টবস্ত্র', 'খোসলা' ইত্যাদি সেদিন কাব্য-গৌরব লাভ করেছিল। সমাজের উচ্চ-নীচ - সকলের কাছেই ছিল পাটজাত বস্ত্রের সমান মর্যাদা। বাঙালী কৃষক ও বাঙালী শিল্পীর এই কৃতিত্বের অবদান সেদিন সমগ্র ভারত সসম্মানে গ্রহণ করেছিল। যুগাবসানে এদেশে এসেছে 'প্রবল ইংরেজ'। ফলে মধ্য-উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার পাট-শিল্প কুটির-শিল্পের সংক্ষিপ্ত রূপ পরিহার করে ধারণ করে মহাশিল্পের ব্যাপক রূপ। ১৮৫৫ সাল। শ্রীরামপুরের সন্নিকটে রিষড়ায় বিদেশী পুঁজি ও পরিকল্পনায় হলো এই শিল্প-প্রয়াসের যাত্রা-সুরু। সেদিন অবিভক্ত 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি' বিপুল উৎসাহে যোগান দিয়েছে কাঁচা মাল, গঙ্গার

বাংলার পাট-শিল্পের সমৃদ্ধির ইতিহাস

সুগভীর জলধারা হুগলি-বক্ষকে ভারী মালবাহী জাহাজ-চলাচলের পক্ষে দান করেছে অবাধ নাব্যতা। অন্যদিকে বাংলার কুটির-শিল্প বিধ্বস্ত হওয়ায় পাটের যোগান হয়েছে ঊর্ধ্বমুখী। বাংলাদেশের কৃষক এবং সমগ্র পূর্ব-ভারতের শ্রমিক ছুটে এসেছে এই শিল্পকে বিকশিত করে তোলার জন্যে। তারপর বিদেশী পুঁজির পাশাপাশি স্বদেশী পুঁজির প্রবাহও লক্ষ্য করা গেল স্বদেশী আন্দোলনের জন্মলগ্ন থেকে। এলো প্রথম মহাযুদ্ধ। বিশ্বের চাহিদার আনুকূল্যে চটকলগুলির উৎপাদন হলো ঊর্ধ্বমুখী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চটকলগুলির চরম সমৃদ্ধি এনে দিল। কিন্তু মহাযুদ্ধান্তে দেশবিভাগ বহন করে নিয়ে এলো ভারতীয় পাট-শিল্পের চরম দুর্ভাগ্যের সংবাদ।

ভাগীরথী-তীরের চটকলগুলিকে দুর্ভাগ্যের রাহু গ্রাস করলো দেশবিভাগের ক্রান্তিকাল থেকেই। নানা দুর্নিবার সংকট ঘনিয়ে এল তার ভাগ্যে। সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যজনক যে সংকট তার অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুললো, তা হলো কাঁচামালের সরবরাহের অভাব। দেশবিভাগের পর শতকরা ৮০ ভাগ পাটজমি পড়লো পাকিস্তানের ভাগে। পশ্চিমবঙ্গের অবশিষ্ট ২০ ভাগই হলো ভাগীরথী-তীরের চটকলগুলির একমাত্র আশা-ভরসা। আবার পশ্চিমবঙ্গের ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত পাট চাষের চেয়ে ধান-উৎপাদনে অধিক আগ্রহী। তাছাড়া ধান ও পাটের উৎপাদনের এই দ্বৈত-ভূমিকা গ্রহণে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিও পরিশ্রান্ত। অন্যদিকে পাকিস্তানে চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ ও খুলনায় ইতিমধ্যেই অনেকগুলি চটকল স্থাপিত হয়েছে। ফলে পাকিস্তানের পাট পাকিস্তানেই আটক হয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তিক্রমে ভারত পাকিস্তান থেকে যে পাট আমদানি করতো, ভারতের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে পাকিস্তান আদায় করতো তার অতি-উৎকট মূল্য। এই পরমুখাপেক্ষিতা ও মূল্যাতিরেক ভারতীয় পাট-শিল্পের কণ্ঠরোধ করেছে। তাছাড়া পাকিস্তানের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা কাঁচাপাট-আমদানির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। সংকটের দ্বিতীয় রূপ হলো, বিশ্বের পাটজাত দ্রব্যের বাজারে ভারতেরই অঙ্গচ্ছিন্ন রাষ্ট্র পাকিস্তানের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা তথা নেতৃত্ব। পাকিস্তান নতুনতম যন্ত্রপাতি, উৎকৃষ্ট পাট এবং অপেক্ষাকৃত সস্তা শ্রমিক ইত্যাদির সুবিধার আনুকূল্যে আজ বিশ্বের পাটের বাজার জয় করে নিতে পেরেছে। আর পরাজয়ই হয়েছে ভারতের ভাগ্যলিপি। সংকটের তৃতীয় রূপ হলো, নানা বৈদেশিক পরিবর্ত (Substitute) পণ্যের প্রতিযোগিতা। কাগজ, তুলা, শণ, প্লাস্টিক্-জাত বস্তা, থলে ইত্যাদি পাটজাত বস্তা, থলে ইত্যাদির সহজ পরিবর্ত-রূপে সস্তায় বিশ্বের বাজারে বিক্রী হচ্ছে এবং তাদের জনপ্রিয়তাও দিন দিন ক্রমবর্ধিষ্ণু।

ভারতের পাট-শিল্পের সংকটের সূত্রপাত

ভারতীয় পাট-শিল্পের চতুরাঙ্গিক সংকট

সংকটের চতুর্থ রূপ হলো, গঙ্গার মূল-জলধারার পক্ষপাত। ভাগীরথী-তীরের চটকলগুলির অবস্থিতি জল-পরিবহণের সুযোগ-সুবিধাদির কথাই ঘোষণা করে। বাস্তবিকই, ভারতীয় চটকলগুলির বিকাশের মূলে ভাগীরথীর অবদান ছিল অসামান্য। আজ, গঙ্গার মূল জলধারা ভাগীরথীর প্রতি বিমুখ হয়ে পদ্মাবক্ষ আশ্রয় করেছে। ফলে একদিন যে পরিবহণগত সুবিধা ভাগীরথী-তীরের চটকলগুলি পেয়েছিল, ভাগীরথীর ধারা-স্বল্পতায় তা আজ তিরোহিত; অন্যদিকে সেই সুবিধা পেয়েছে চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ ও খুলনা। পরিবহণগত ব্যয়-স্বল্পতা পাকিস্তানী পাট-পণ্যের মূল্য-স্বল্পতা বিধান করেছে এবং প্রকারান্তরে ভারতীয় পাট-শিল্পের সংকটকে আরো তীব্র করে তুলেছে।

ভারতের পাট-চাষ ও পাট-শিল্পের এই হতাশাময় চিত্র আর কতদিন সহ্য করা যায়? উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ও ক্রমবর্ধিষ্ণু এই শিল্প-প্রয়াসের অকাল-বার্ধক্য যে জাতীয় অর্থনীতিতে দুঃসহ ফাটল ধরিয়ে দিল! বিকাশের তারুণ্য-লগ্নে নেমে এলো অকাল-বার্ধক্যের নিশ্চল স্থবিরতা। জাতীয় সরকার সেই স্থবিরতার হাত থেকে পাট-চাষ ও পাট-শিল্পকে মুক্ত করবার জন্যে অগ্রসর হলেন। বাস্তবিকই, পাট-শিল্পের পুনর্জীবনায়নে সরকারী প্রয়াস হলো শক্তি-সঞ্চারের ইতিহাস এবং পাট-শিল্পের সাম্প্রতিক ইতিহাস হলো নানা সংকটের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস। ভারতীয় চটকলগুলির পূর্ণ কর্ম-পূর্তির জন্যে বছরে অন্তত:পক্ষে ৭৩½ লক্ষ গাঁইট কাঁচা পাট প্রয়োজন। কিন্তু ১৯৫০-৫১ সালের উৎপাদনকে ৩৩ লক্ষ গাঁইট থেকে ১৯৫৫-৫৬ সালে ৫১ লক্ষ গাঁইটে পরিণত করবার চেষ্টা ৪২ লক্ষ গাঁইট উৎপাদনে নিয়ে যায়। তৃতীয় প্রকল্পে ৬৫ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপাদনের প্রত্যাশা আছে। কাঁচা পাটের এই উৎপাদন-বর্ধিষ্ণুতার ফলে ১৯৫৯ সালে ভারতের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা রাশিয়া, চীন, বেলজিয়াম, পোল্যাণ্ড এবং যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে কাঁচাপাট রপ্তানির চুক্তি সম্পাদন করে। ১৯৪৯ সালে ভারতীয় চটকল সমিতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে চাহিদা-বৃদ্ধিকল্পে একটি বাণিজ্য-মিশন প্রেরণ করেন। এই মিশন বাজারের অবস্থা বিবেচনা করে পাটজাত পণ্যের মূল্য পঁচিশ-শতাংশ হ্রাসের সুপারিশ করেন। কিন্তু তা কার্যকরী হয় নি। আমেরিকায় ভারতীয় পাটজাত পণ্যের জনপ্রিয়তা সৃষ্টির জন্যে একটি প্রচার-সংস্থা স্থাপিত হয়। এদিকে পাট-শিল্পের পুনর্জীবনায়নকল্পে ১৯৫৪ সালে শ্রীকে. আর. পি. আয়েঙ্গারের নেতৃত্বে পাট-শিল্প অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত করা হয়। এই কমিটি রিপোর্টে যে সুপারিশগুলি করেছিলেন, তাহলো: এক, পাট-শিল্পের উন্নতিকল্পে একটি উন্নয়ন পরিষদ গঠন করতে হবে; দুই, বর্তমান শিল্পায়তনগুলির কর্ম-পূর্তি না হওয়া পর্যন্ত নতুন শিল্পায়তনের অনুমতি না দেওয়া

সংকট-জয়ের ব্যবস্থা এবং অবস্থার ক্রমোন্নতি

উচিত; তিন, পাট-শিল্পের যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ প্রয়োজন; চার, কাঁচাপাট-উৎপাদনে সম্পূর্ণ স্বনির্ভরতার চেয়ে অংশিকভাবে পাকিস্তানী পাট আদানি করা শ্রেয়; আঞ্চলিক বণ্টননীতি ও পাটের নিম্নতম মূল্য নির্ধারিত হওয়া উচিত; এবং ছয়, এই শিল্পের রক্ষাকল্পে শুল্কমুক্তি-বিধান আবশ্যিক। যাই হোক, পাট-ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতায় জয়লাভকল্পে পাট-শিল্পকে আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত করতে হবে। তাই ১৯৫৫ সালে জাতীয় শিল্পোন্নয়ন সংস্থা (National Industrial Development Corporation) পাট-শিল্পায়তনগুলির আধুনিকীকরণ ও সুসংবদ্ধ সংস্কার-সাধনের জন্যে অবাধ হস্তে ঋণদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলে বাইশটি পাট শিল্পায়তন এক বছরের মধ্যে ৪·৬০ কোটি সরকারী ঋণ লাভ করে। তাছাড়াও দেশীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্যে এই শিল্পায়তনগুলিকে স্বল্প-মেয়াদী ঋণদানের প্রতিশ্রুতি আছে।

পাট-শিল্পের সংকট-উত্তরণ-প্রয়াসের প্রকৃত সূত্রপাত ১৯৫৬ সাল থেকে। ১৯৫৬ সালের সূচনায় পাট-শিল্পের পুনর্জীবনায়ন সূচিত হয়; কিন্তু ঐ বছরের অন্তিমকালে আবার দুর্দিন এলো ঘনিয়ে। ১৯৫৭ সালে পাটজাত পণ্যের মূল্য ঊর্ধ্বমুখী হলো এবং অন্তর্দেশীয় চাহিদাও হ্রাস পেল। ১৯৫৮ সালে আবার অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হলো। স্বদেশে ও বিদেশে ভারতীয় পাটজাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় দীর্ঘকাল পরে লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি পায়। ১৯৬০ সাল ভারতীয় পাট-শিল্পের চরম দুঃসময়। কাঁচা পাটের ফলন ছিল সে বছর স্বল্প। তদুপরি ফড়িয়া-দালাল ইত্যাদি মধ্যবর্তীদের চক্রান্তে কাঁচা পাটের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ফলে বহু পাট-শিল্পায়তনে কর্মবিরতি লক্ষিত হয়। ১৯৬১-৬২ সালে আবার পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচামাল, চাহিদাবৃদ্ধি এবং মূল্যের স্থৈর্যে সূচিত হলো পাট-শিল্পের সুদিন। ভাগীরথী-তীরের চটকলগুলি আবার কর্মমুখর হয়ে উঠলো। ১৯৬২ সালের জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর—এই সময়টি ভারতীয় পাট-শিল্পের অত্যন্ত স্বচ্ছলতার কাল। পাট-পণ্যের রপ্তানি ৭ লক্ষ টনে পৌঁছায়, যার মূল্য ১১৯·১ কোটি টাকা। বর্তমানে পাট-শিল্প স্বয়ং-নির্ভরতার পথে চলেছে এগিয়ে। সুতো, দড়ি, চট, বস্তা, কার্পেট, কম্বল, ত্রিপল, মিশ্র সুতোর কাপড়, ইন্‌সোলেশান ইত্যাদি রপ্তানি করে ভারতীয় পাট-শিল্প প্রায় ১২০ কোটি টাকার মতো বিদেশী মুদ্রা ঘরে আনছে। ১৯৬২-৬৩ সালের পাট-উৎপাদন সাম্প্রতিক কালের পাট-উৎপাদন ইতিহাসে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ১৯৬১-৬২ সালের উদ্বৃত্ত ২৭ লক্ষ গাঁইট এবং ১৯৬২-৬৩ সালের ৮০ লক্ষ গাঁইট উৎপাদন চটকলগুলিকে তৃতীয় পরিকল্পনার ১৩ লক্ষ টনের লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেয়। পাটজাত দ্রব্যের বর্ধিষ্ণু চাহিদাও ছিল বিশেষভাবে এই অনুকূল পরিস্থিতির জন্যে দায়ী। রপ্তানির দিক্ থেকেও পাট-শিল্প আশার চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৬২ সালে যেখানে

ক্রমোন্নতির দিক্-দিগন্ত

রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৫০ কোটি টাকা মূল্যের ৮·৬৮ লক্ষ টন, ১৯৬৩ সালে সেখানে রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯·১১ লক্ষ টন; যার মূল্য ১৬০ কোটি টাকা। ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ভারত ১৭০ কোটি টাকার পাট-জাত দ্রব্য রপ্তানি করেছে। ভারতের দুর্দশাগ্রস্ত পাট-শিল্প যে তার সংকট-কাটিয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারছে, পাট-জাত দ্রব্যের এই ক্রমবর্ধমান রপ্তানির চিত্রই তার প্রমাণ।

দেশবিভাগ-জনিত বিপর্যয় অতিক্রম করে ভারতের পাট-শিল্প ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে। কাজেই, তার উজ্জ্বল সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যৎকে শক্ত বনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করবার ব্যবস্থা এখনই করা উচিত। একথা কখনই বিস্মৃত হলে চলবে না যে, পাকিস্তানই এই শিল্পের দুর্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী এবং ভারতের কাঁচাপাটের উৎপাদন-বৃদ্ধির গতি অত্যন্ত মন্থর। তাছাড়া পরমুখাপেক্ষিতা কোন শিল্পের ভবিষ্যৎ-নিশ্চয়তার গ্যারান্টি দিতে পারে না। তথাপি আশ্চর্যের বিষয়, আয়েঙ্গার অনুসন্ধান কমিটি ভারতীয় পাট-শিল্পের বিকাশে পাকিস্তানী পাটের ওপর আপেক্ষিক নির্ভরতার সুপারিশ করেছেন। পাকিস্তানী পাটের গুণগত উৎকর্ষের জন্যে পর-নির্ভরতার প্রশ্রয় একদিন নয় একদিন এই শিল্প-সম্ভাবনার সর্বনাশ সাধন করবে, বিশেষতঃ পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক সম্পর্ক যখন একান্তভাবে অনিশ্চিত। কাজেই, গুণগত এবং পরিমাণগত উৎপাদনের স্বয়ং-নির্ভরতার দিকে মনোযোগী হতে হবে। তাছাড়া পাকিস্তান থেকে কাঁচা পাট আমদানি করে পরিবহণ-ব্যয় বহন করে পাকিস্তানী পাটজাত পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করার কল্পনা বাতুলতা মাত্র। আর, একটি শিল্পের চিরন্তন ঘাটতি মেটাবার জন্যে সরকারকে যে চিরকাল শুল্কমুক্তি ও ঋণদান করতে হবে, তারই বা যুক্তি কি? অতএব কাঁচাপাট-উৎপাদনে স্বয়ং-নির্ভরতাই এই শিল্পের প্রকৃত জীবনায়নের প্রকৃত চাবি-কাঠি। তাই পাট-উৎপাদনে নতুন অভিযান সুরু করতে হবে।

পাট-উৎপাদনে স্বয়ং-নির্ভরতা

কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাট-শিল্পের পুনর্জীবনায়নকল্পে সরকার যে সমস্ত কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করেছেন, তাতে আছে পাট-শিল্পে যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ, বিশ্বের বাজারে চাহিদার ব্যবস্থা ইত্যাদি। কিন্তু পাটের উৎপাদন-বৃদ্ধিকল্পে সরকারী প্রয়াস অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। পাট-চাষীদের বাদ দিয়ে পাট-উৎপাদনে অগ্রসর হওয়া শিবহীন যজ্ঞায়োজনের সামিল। পাট-উৎপাদন অভিযানের পতাকা যাদের হাতে, তাদের সেই পতাকা-বহনের শক্তি দান করতে হবে। উন্নত বীজ, সার, জলসেচের ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি-সরবরাহ ছাড়াও পাটচাষীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ, ঋণদান ও দারিদ্র্য-মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এ

উপসংহার

ব্যাপারে ভারতীয় পাট-শিল্প সমিতির কি কোন দায়িত্ব নেই? বাজার-সৃষ্টিকল্পে এই সমিতি বিদেশে বাণিজ্য-মিশন প্রেরণ করতে পারেন। পাট-চাষীদের উন্নত বীজ, সার, যন্ত্রপাতি-সরবরাহ বা বিশেষ প্রশিক্ষণ ও পাট-চাষে কৃষক-সমাজে উৎসাহ-সৃষ্টির জন্যে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয় না কেন? পাট-শিল্পের ওপরের মহলের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই চলবে না, নিচের মহলের দিকেও তাকাতে হবে। সেই সঙ্গে দালাল, ফড়িয়া, মহাজন ইত্যাদি নানা মধ্যবর্তী শ্রেণীর শোষণের হাত থেকে পাট-চাষীদের মুক্ত করতে হবে। পাট-চাষে সমবায়-কৃষি-পদ্ধতির প্রবর্তন অত্যন্ত সাফল্যের বার্তাবহ। সেদিকে পাট-চাষী, সরকার ও পাট-শিল্পপতিদের এখনই মন দিতে হবে।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- পাট ও পাট-শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ, ক. বি. '৫৭
- ভারতীয় পাট-শিল্পের উন্নয়নের উপায়
- পাট-চাষ ও পাট-ব্যবসায়, ক. বি. '৬১

৪১. লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পে ভারত
India in Iron and Steel Industry.

প্রবন্ধ-সূত্র :—অবতরণিকা—ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পের ইতিহাস : সূচনা-লগ্ন—সংঘাত ও সমাধান—প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ—দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প : সরকারী ও বে-সরকারী অভিজ্ঞতার সংঘাত—প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইস্পাত-শিল্পের অগ্রগতির জরীপ—সরকারী ইস্পাত-শিল্পোদ্যোগ—দুর্গাপুর—ভিলাই—রাউরকেলা—চতুর্থ পরিকল্পনা—সালেম, ভিজাগাপট্টম ও গোয়া—উপসংহার।

অবতরণিকা

ভারতের লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পের ইতিহাস একান্তভাবে আধুনিক। তার সূচনা মধ্য-ঊনবিংশ শতকে। তবুও প্রাচীন ভারতে লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প অবহেলিত ছিল না। তার চরম বিকাশ ও বিস্ময়কর সমৃদ্ধির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দিল্লীর সুপ্রাচীন নিষ্কলঙ্ক লৌহ-স্তম্ভটি, যা অতি-আধুনিক গবেষকদেরও অনুসন্ধানী দৃষ্টিকে বিস্মিত করে। কিন্তু সেই সমৃদ্ধি কেবল ঐতিহাসিক নিদর্শন হয়েই রইলো, স্থান পেল কেবলমাত্র ইতিহাসের যাদুঘরে। গণজীবনে তা প্রতিফলিত হয় নি, দেশের ও জাতির স্বার্থে উৎপাদনের সমূহ সম্ভাবনা নিয়ে সে আর ইতিহাসের প্রদর্শনীশালা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি জনগণের মাঝখানে। তা শুধুমাত্র গবেষণার বস্তু, আধুনিক কালের কৌতূহলের বস্তু হয়েই রইলো। অবশ্য ভারতের লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পের মানের এই-যে বিস্ময়কর উৎকর্ষ, তাকে জনজীবনে সঞ্চারিত করে দেবার জন্যে যে বিপুল আয়োজনের দরকার, সেই শিল্প-বিপ্লব ছিল তখন সুদূর-পরাহত। শিল্প-বিপ্লবের সার্বিক গতি-প্রেরণা ছাড়া কোন গবেষণালব্ধ আবিষ্কার জাতীয় জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই প্রাচীন ভারতের লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পের সমৃদ্ধিও ভারত-ভাগ্য-গঠনের বিশেষ সহায়ক হয় নি।

প্রাচীন ভারতের লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প ছিল মূলতঃ কুটির-শিল্প-নির্ভর। দলমাদল-কালে খাঁ প্রভৃতি কামান কিংবা লৌহের কড়ি-বরগা থেকে আরম্ভ করে দা-কাস্তে-কুড়ুল পর্যন্ত সবই কুটির-শিল্পীর কামারশালা থেকে তৈরী হয়ে বেরিয়ে আসতো। শিল্প-বিপ্লবের গতি-চাঞ্চল্য তখন তার মর্মে দোলা দেয় নি। প্রথম সেই দোলা লাগলো ১৮৩০ সালে। ভারতে আধুনিক পদ্ধতিতে লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পের প্রাথমিক প্রয়াস ঐ বছর দক্ষিণ-আর্কটে দেখা গেল। কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত

হলো। তারপর দীর্ঘকাল কেটে গেছে। লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পের কোন নতুন প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় নি ভারতে। ইতিমধ্যে ভারতীয় খনিগুলিতে দেখা গেল কর্মোদ্দীপনা। ১৮৭৪ সালে বরাকর আয়রন ওয়ার্কস্ ঝরিয়া কয়লাখনির সান্নিধ্যে সফলভাবে সুরু করে ইস্পাত-উৎপাদন। পরে ১৮৮৯ সালে বেঙ্গল আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানী বরাকর আয়রন ওয়ার্কসের কর্মভার গ্রহণ করে এবং ১৯০০ সালে তার উৎপাদন ৩৫,০০০ টনকে স্পর্শ করে। ভারতে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে প্রথম ইস্পাত-উৎপাদক হিসাবে এই বেঙ্গল আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানীর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পের ইতিহাস

তারপর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের স্বাদেশিকতার পটভূমিতে ১৯০৭ সালে জামসেদজী টাটা বিহারের সাকৃচীতে নবযুগের প্রতীক টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠান ১৯১১ সালে লৌহপিণ্ড উৎপাদন এবং ১৯১৩ সালে ঢালাই ইস্পাত উৎপাদন সুরু করে। বিহারের এই জামসেদপুর থেকে ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পের জয়যাত্রা সুরু। তারপর থেকেই ভারতের লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পের নব নব সমাবেশ ও সাফল্যের দুয়ার খুলে গেল। ১৯০৮ সালে বাংলার হীরাপুরে ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানীর ঢালাইর কাজ সুরু হলো। ১৯২৩ সালে ভদ্রাবতীতে মাইশোর স্টেট আয়রন ওয়ার্কসের (বর্তমান নাম—মহীশূর আয়রন এণ্ড স্টীল ওয়ার্কস্) ঢালাই চুল্লীর উদ্বোধন হলো। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, ইস্পাত-উৎপাদনে টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানী সবাইকে অতিক্রম করে গেছে।

সূচনা-লগ্ন

কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশ ও বিজাতীয় কায়েমী স্বার্থের প্রবল সংঘাতে এই বিকাশোন্মুখ শিল্প বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলো। লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পের সেই শৈশবাবস্থায় যখন প্রয়োজন ছিল রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য ও সমবেদনা, তখনই তার ভাগ্যে জুটলো প্রতিরোধ ও প্রতিযোগিতা। ১৯১৬ সালে গঠিত শিল্প কমিশন ভারতীয় সম্পদ ও চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানের যে সুপারিশ করেছিলেন, বিজাতীয় হৃদয়হীন সরকার তা কঠিনভাবে উপেক্ষা করলো। সুরু হলো তীব্র আন্দোলন, যার শ্লোগান হলো—'Feed the baby, nurse the child, and free the adult.' তার ফলে ১৯২২ সালে ভারতীয় রাজস্ব কমিশন (Indian Fiscal Commission) বিভেদাত্মক সংরক্ষণের সুপারিশ করলেন এবং সরকারকে মাথা নোয়াতে হয়। তাতে ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প উৎপাদনে আশ্চর্য গতিলাভ করে। ইতিমধ্যে এই শিল্প প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিবেশে বিকাশের সুবর্ণ সুযোগ লাভ করে এবং উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করে নেয়।

সংঘাত ও সমাধান

প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

তারপর যুগান্তর এলো। দেশ স্বাধীন হলো। সুরু হলো পরিকল্পিত উপায়ে ভারতের অর্থনীতির পুনর্গঠনের অভূতপূর্ব আয়োজন। একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, ভারত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পের উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ না করে একটা বিরাট্ ভুল করেছিল। পরবর্তীকাল ভারত লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পে অগ্রগতির পথে প্রথম পদক্ষেপ সুরু করে এবং তার ফলে নব নব আশা ও সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যায়। কিন্তু লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প সরকারী পরিচালনাধীন থাকায় সুরু হলো সরকারী ও বে-সরকারী অভিজ্ঞতার সংঘাত। সরকারী পরিচালনায় বোকারোর ইস্পাত-শিল্পের সমর্থনে ১৯৬৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পের প্রাচীনতম বে-সরকারী ব্যক্তি শ্রীজি. আর. ডি. টাটার সোচ্চার ঘোষণায় সকলেই স্তম্ভিত হয়েছিল। বিভিন্ন যোজনার রূপায়ণে যে ইস্পাতের প্রয়োজন, তা পূরণ করবার জন্যে ইস্পাত-শিল্পের বলিষ্ঠ সম্প্রসারণ সরকারী বিশেষজ্ঞগণের কাম্য। কিন্তু বে-সরকারী বিশেষজ্ঞগণের অভিমত ভিন্ন। তাঁরা ক্ষুদ্রায়োজনের মাধ্যমে পূর্ণতর ও নিবিড়তর ব্যবহারীকরণের অভিলাষী। সরকারী মহলের মতে, কিরূপ প্রয়োজন হতে পারে এবং তার জন্যে কি করা উচিত্, সেইমতো তৈরী হতে হবে। বে-সরকারী মতে, কি করা যেতে পারে এবং কি করা যায়, সেইমতো অগ্রসর হতে হবে। শ্রীজি. আর. ডি. টাটার সোচ্চার অভিভাষণে সেই সংঘাতের অবসান হয়েছে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প: সরকারী ও বে-সরকারী অভিজ্ঞতার সংঘাত

পরিকল্পনা-কালে লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পে ভারতের অগ্রগতির একটি চিত্র এই প্রসঙ্গে তুলে ধরা যেতে পারে। ১৯৫১ সালে ভারতের ইস্পাত-উৎপাদন ছিল ১৫ লক্ষ টন। প্রথম পরিকল্পনায় লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পে ভারতের নিষ্ক্রিয়তার পরিণামে ১৯৫৬ সালে উৎপাদন হ্রাস পেয়ে হলো সাড়ে ১৩ লক্ষ টন। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার কর্মচাঞ্চল্যের পরিণামে ১৯৬২ সালে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৭ লক্ষ টন। অবার ১৯৫১ সালে বিদেশ থেকে ইস্পাত আমদানির পরিমাণ ছিল পৌনে দু' লক্ষ টনের মতো, ১৯৫৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় সাড়ে আঠারো লক্ষ টনের মতো এবং ১৯৬২ সালে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় মাত্র সোয়া ৭ টনে। এই পরিসংখ্যান্ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে ইস্পাতের আমদানি যে বৃদ্ধি পেয়েছিল, তার মূলে ছিল দেশ-ব্যাপী নানা যোজনার কর্মোদ্যোগ, অন্যদিকে প্রথম পরিকল্পনায় ইস্পাত-শিল্পের প্রতি ভ্রান্তিপূর্ণ অবহেলা। প্রথম পরিকল্পনার কার্যকালে ইস্পাত-শিল্পোদ্যোগের প্রতি মনোযোগ দেশকে আমদানির আতিশয্যের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারতো এবং

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইস্পাত-শিল্পের অগ্রগতির জরীপ

দ্রুততর শিল্পায়নের দ্বার খুলে দিতে সক্ষম হতো। দেশের শিল্পোন্নয়নে সাহায্যের অনুসন্ধানও তখন ছিল না। ফলে যা হবার তাই হয়েছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারকে ইস্পাত-শিল্পের উন্নতি-সাধনের জন্যে এগিয়ে আসতে হলো। দেশের শিল্পায়নেও লাগলো গতির স্পন্দন। কিন্তু ইতিমধ্যে বড়ো দেরী হয়ে গেছে।

ইস্পাত-শিল্পে সরকারের প্রবেশের এই সিদ্ধান্ত নতুন ব্যাপার নয়। প্রাক্তন ব্রিটিশ সরকারও ১৯৪৫ সালে স্যার পদমজী ঘিন্‌ওয়ালার নেতৃত্বে ইস্পাত নির্মাণ ব্যবসায় জন্যে ৫ লক্ষ টন করে উৎপাদনক্ষম দুটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সরকারী ইস্পাত-শিল্পোদ্যোগ

ক্ষমতা-হস্তান্তর ও দীর্ঘ-মেয়াদী শিল্পনীতি রচনায় জাতীয় সরকারের ব্যাপৃতির ফলে তা সম্ভব হয় নি। তাছাড়া ইস্পাত-শিল্প সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন হবারও একটা আশঙ্কা তখন দেখা দিয়েছিল। ১৯৫৫ সালের সূচনায় ইস্পাত-শিল্পে জার্মানী ভারত সরকারের সঙ্গে অংশীদার হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তারা প্রথমে ৫ লক্ষ টন উৎপাদনক্ষম শিল্পোদ্যোগের পরিকল্পনা পেশ করে। কিন্তু তখন দিল্লী চিন্তা করছে ৬০ লক্ষ টন উৎপাদনের কথা। ১৯৫৫ সালে জার্মানেরা ১০ লক্ষ টন ইস্পাত-উৎপাদনক্ষম একটি পরিকল্পনা ভারত সরকারের হাতে তুলে দেয়। উড়িষ্যার রাউরকেলার অভ্যুদয়-লগ্ন সমাগত হলো। রাউরকেলার ভাগ্য রচিত হলো জার্মানদের হাতেই। ঐ বছর স্মরণীয় হয়ে থাকবে অন্য এক কারণে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ক্রুশ্চেভের অবতীর্ণ হবার নীতি বিঘোষিত হলো। ভিলাইতে ইস্পাত-শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলায় ভারতকে সাহায্য করবার জন্যে সোভিয়েট রাশিয়া হলো চুক্তিবদ্ধ। এদিকে দুর্গাপুর গড়ে

দুর্গাপুর

তোলার কাজে ভারতীয়দের সঙ্গে ইংরেজেরা হাত লাগালো। ইংরেজেরা এদেশের সঙ্গে তাদের নিবিড় পরিচয়কে এই প্রসঙ্গে কাজে লাগালো। ভিলাইতে রাশিয়ানদের বিশেষ অসুবিধে হয় নি। তাদের ত্রুটিহীন যন্ত্রপাতি ও অভিজ্ঞ কলাকুশলীদের সাফল্যে বার্ষিক ১০ লক্ষ টন ইস্পাত-উৎপাদনক্ষম

ভিলাই

ভিলাই গড়ে উঠলো। ১৯৬৫ সালে এর বার্ষিক উৎপাদন-ক্ষমতা হবে ২৫ লক্ষ টন। পূর্ব-নির্ধারিত লক্ষ্য-কালের পাঁচদিন আগেই ভিলাই সম্পূর্ণ হলো। ভিলাইর সাফল্যে আমেরিকান বিশেষজ্ঞগণও বিস্মিত :

"Bhilai's success is not so much its ability to produce up to its rated capacity but rather the steps it has made towards the creation of an organisation capable of producing steel in the future under the direction of Indian personnel entirely."

ভিলাই কেবল শিল্পোদ্যোগে নয়, সংগঠন-রচনায়ও তার ভূমিকা অনবদ্য।

অন্যদিকে দুর্গাপুর ও রাউরকেলা রইলো তাদের নির্ধারিত সময়ের এক বছরের পশ্চাদ্বর্তী। ভিলাই ও দুর্গাপুরের সঙ্গে তুলনায় রাউরকেলা ছিল দুর্বল। তিনটি সরকারী শিল্পোদ্যোগের মধ্যে রাউরকেলাই রুগ্নশিশু রূপে পরিগণিত হলো। কিন্তু সে আজ দেশের প্রতিরক্ষাকে সাহায্য করবার জন্যে বলিষ্ঠ যুবকরূপে গড়ে উঠছে।

রাউরকেলা

ইস্পাতের পাত-নির্মাণে রাউরকেলার সমকক্ষ ভবিষ্যতে কেউ থাকবে না। এ বিষয়ে বোকারো ছাড়া সে হবে ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বহু বিষয়ে রাউরকেলা বর্তমানে এশিয়ার ইস্পাত-শিল্পের আধুনিকতম দৃষ্টান্ত। আর বোকারো? সে হবে রাউরকেলার চেয়েও আধুনিকতর। আমেরিকার হিসাবে বোকারোতে যত ব্যয় হবার কথা, তদপেক্ষা স্বল্পতর ব্যয়ে বোকারো গড়ে তোলার পরিকল্পনা রচনা করেছেন দস্তুর এণ্ড কোম্পানী। এই সংস্থাই বোকারোর উপদেষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করবে। এবং প্রারম্ভিক পনের লক্ষ টন উৎপাদনক্ষম বোকারো ১৯৬৭-৬৮ সালের মধ্যেই উৎপাদন স্থরু করে দেবে। ১৯৭২-৭৩ সালে তার উৎপাদন ক্ষমতা হবে ৪০ লক্ষ টন। তাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে আর কাল-বিলম্ব না করে

চতুর্থ পরিকল্পনা

সালেম, ভিজাগাপটম, গোয়া

এখনি কাজে হাত লাগাতে হবে। ১০০ কোটি টাকার প্রারম্ভিক শেয়ার পুঁজি নিয়ে বোকারো স্টীল লিমিটেড নামে একটি নতুন কোম্পানীর উদ্বোধন হয়ে গেছে। এখন শুধু এগিয়ে চলার অপেক্ষা। ১৯৬৩ সালে সরকার পাঞ্জাব, মাদ্রাজ ও পশ্চিমবঙ্গে তিনটি প্রকল্প অনুমোদন করেছেন এবং মহারাষ্ট্রে ও গোয়ায় দুটি ইউনিট চালু করেছেন। তাছাড়া চতুর্থ পরিকল্পনায় সালেম, ভিজাগাপটম ও গোয়ায় নতুন ইস্পাত-শিল্পের উদ্বোধন হবে। বন্দরের সন্নিহিত এই স্থানগুলিতে দেশের সংরক্ষিত জ্বালানি কয়লা ব্যয় না করে আমদানিকৃত কয়লা ব্যয় করাই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তাছাড়া মাদ্রাজে এবং গুজরাটের বাতোয়া (Vatwa) নামক স্থানে দুটি নিষ্কলঙ্ক ইস্পাত কারখানা অনুমোদিত হয়েছে। তাদের বার্ষিক উৎপাদন হবে প্রায় কুড়ি হাজার টন।

অন্যদিকে টাটা আয়রন (TISCO), ভারতীয় আয়রন (IISCO) ও মহীশূর আয়রনে উৎপাদন-চাঞ্চল্য সঞ্চারিত করবার প্রয়াস সূচিত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সন্ধিকাল থেকে সেই প্রয়াসের সূচনা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় টাটার জন্য ২০ লক্ষ

টাটা আয়রন, ভারতীয় আয়রন ও মহীশূর আয়রন

টন, ভারতীয় আয়রনের জন্যে ১০ লক্ষ টন এবং মহীশূর আয়রনের জন্যে ১ লক্ষ টনের উৎপাদন-লক্ষ্য স্থির করে দেওয়া হয়েছিল। টাটা এবং ভারতীয় আয়রনের সম্প্রসারণ-সূচী সম্পূর্ণ হয়েছে। তবু টাটা পারেনি তার ২০ লক্ষ টনের লক্ষ্যে পৌঁছোতে। তবে চতুর্থ পরিকল্পনায় টাটা ৩০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনের লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারবে বলে আশা করা

হয়েছে। ভারতীয় আয়রনও চতুর্থ পরিকল্পনায় তার ২০ লক্ষ টনের লক্ষ্য-বিন্দুতে পৌঁছোতে পারবে বলে আশা করা যায়। নানা কারণে মহীশূর আয়রনের সম্প্রসারণ সূচীর রূপায়ণ বিলম্বিত হলেও ১৯৬৬-৬৭ সালে তার উৎপাদন ১'০৬ লক্ষ টন লক্ষ্যে সম্ভবতঃ পৌঁছোতে পারবে। বর্তমানে মহীশূর আয়রণের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে মহীশূর ওয়ার্ক্‌সের দায়িত্ব-ভার। ভারতের সব শিল্পায়নে এই তিন লৌহ-উদ্যোগ তাদের স্মরণীয় স্বাক্ষর মুদ্রিত করে চলেছে।

ভারতে যে নব-শিল্পায়ন সূচিত হয়েছে, ইস্পাত-শিল্পের উন্নয়নই তাকে গতিদান করবে, তাকে সমৃদ্ধ করবে। এই শক্ত-সমর্থ লৌহ-দানবের স্কন্ধে ভর করেই ভারতের শিল্প-বিপ্লব সফল হবে। মজবুত ইস্পাতের মতো ভারতের ভবিষ্যৎও সুদৃঢ়রূপে গড়ে উঠছে। এখন চলেছে শুধু ভিত্তি-স্থাপন। এই সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর গড়ে উঠবে ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের সুকঠিন বনিয়াদ। সার্থক হোক ভারতের এই শিল্প-প্রয়াস।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পে ভারতের অগ্রগতি
- ভারতের লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প

৪২. বাণিজ্য ও সংবাদপত্র
Commerce and Newspaper.

প্রবন্ধ-সূত্র :— অবতরণিকা—যুগ-প্রয়োজন ও সংবাদপত্র : জন্ম-ইতিহাস—সংবাদপত্রের দৌত্য : বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের গাঁটছড়া—সংবাদপত্রের দৌত্য : বাণিজ্য ও বিশ্বমানব—সংবাদপত্রের দৌত্য : বিজ্ঞাপন : উৎপাদক ও ভোক্তা-সাধারণ—"It is the people's parliament always in session". সংবাদ-বাণিজ্যের নতুন প্রতিষ্ঠা—উপসংহার।

অবতরণিকা

পূর্ব-দিগন্তে আলোকের বিজয়-ঘোষণার পূর্বেই সমগ্র পৃথিবী এসে আমাদের দুয়ারে করাঘাত হানে। সংবাদপত্রই সেই পৃথিবীর বাণী-রূপ। গৃহবদ্ধ মানুষ এক মুহূর্তে তার সকল সংকীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করে পৃথিবীর বিশাল আকাশের নীচে এসে দাঁড়ায়। সংবাদ-পত্র দৈনন্দিন জীবনের সীমাবদ্ধ মানুষকে বিশ্ব-মানবতা ও বিশ্ব-নাগরিকতার উদার প্রাঙ্গণে উত্তীর্ণ করে দেয়। মানুষ সুদূরকে জানতে চায়, বিশ্বকে পেতে চায় হাতের মুঠোয়। সংবাদপত্র মানুষের দুয়ারে সুদূরকে বহন করে আনে, ঘরের প্রাঙ্গণে এনে দাঁড় করায় সুদূর বিশ্বকে। দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অগ্নি-পরিধি, মহাসাগরের দুস্তর ব্যবধান কিংবা গিরি-কান্তার মরু-প্রান্তরের দুঃসাধ্য দুর্গমতাকে তুচ্ছ করে সে সংগ্রহ করে আনে বিশ্ব-বার্তা। রোগজর্জর পৃথিবীর শিয়রে বসে সে মহাতাপসীর মতো অনুভব করে তার বক্ষ-স্পন্দন এবং পৃথিবীর মানুষের কানে পৌঁছে দেয় তার সকল সংবাদ, দূর করে মানুষের উৎকণ্ঠা ও সংবাদ-তৃষ্ণা। তার বিচরণ সর্বত্র। পৃথিবীর রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি—সকল ক্ষেত্রেই তার অবাধ পদসঞ্চার। মানুষের দয়া-দাক্ষিণ্য, মানুষের ক্ষমতার অহংকার, তার পৈশাচিক বর্বর উল্লাস—দেশ-বিদেশের সকল ঘটনার অকৃত্রিম বিবরণ এনে সে উপস্থিত করে মানুষের বিবেকের দরবারে, গণদেবতার নির্মম বিচারশালায়। পৃথিবীর যেখানে 'প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে', সেখানেই সংবাদপত্রের নির্ভীক ধিক্কারবাণী ধ্বনিত হয়ে ওঠে; সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর লক্ষ-কোটি মানুষের মূক কণ্ঠস্বরও প্রবল বিক্ষোভে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

যুগ-প্রয়োজনে সংবাদপত্রের আবির্ভাব। এ যুগের শিক্ষা ও সভ্যতা সংবাদপত্রের সহায়তা ভিন্ন সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। তাই বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে সভ্যতার এই চরম বিকাশ-লগ্নে সে দ্রুত গতিতে এগিয়ে এসেছে।

সে শুধু বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের সাহায্যই গ্রহণ করে নি, তার শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে সে বিজ্ঞান ও বাণিজ্যকে আরো সমৃদ্ধ, আরো সচল, আরো বিস্তৃত করে দিয়েছে।

যুগ-প্রযোজন ও সংবাদ-পত্র : জন্ম-ইতিহাস

কাগজ ও মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের এবং সংবাদপত্র প্রকাশের প্রথম গৌরব চীন দেশের। ভারতবর্ষেও মোগল রাজত্বকালে ছিল হস্তলিখিত সংবাদপত্রের প্রচলন। অবশ্য, তার প্রচার একমাত্র প্রশাসনিক বিভাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যুরোপে সংবাদপত্রের প্রথম প্রকাশ ইতালীতে। বাংলাদেশে সংবাদপত্রের প্রথম আবির্ভাব অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে। তারই সূত্র ধরে বাংলা সংবাদপত্র উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ-লগ্নে আত্মপ্রকাশ করলো শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান মিশনারীদের হাতে। পৃথিবীর সর্বত্রই আজ সংবাদপত্রের পদ-সঞ্চার। সংবাদপত্রহীন আধুনিক জীবন অচল ও অসম্ভব।

মানুষের দিন-যাপন, প্রাণধারণের সকল সমস্যার সমাধানকল্পে বাণিজ্যের বিপুল আয়োজন। এই যে বিষয়-নিভর জীবন—যার মাপকাঠি হলো টাকা, ডলার, স্টার্লিং, রুবল—যার স্বরূপ প্রকাশিত হয় চাহিদা ও ক্রয়শক্তির সংগতি-সাধনের অক্লান্ত প্রচেষ্টায়,

সংবাদপত্রের দৌত্য : বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের গাঁটছড়া

বাণিজ্য তার সকল জটিলতার গ্রন্থি-মোচনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। বাণিজ্যের যে জটিলতা তার মূলে রয়েছে আধুনিক জীবনের জটিল রূপ। সংবাদপত্র তাকে জটিলতামুক্ত করতে এসেছে। সংবাদপত্রের প্রচলন গতি বাণিজ্যের প্রচলন গতিকে দ্বিগুণিত করেছে। আধুনিক যুগের প্রত্যুষ-লগ্নে বাণিজ্য বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর আশীর্বাদে পুষ্ট হয়ে লাভ করলো যন্ত্র-সিদ্ধ শিল্পময় রূপ। তার ফলে পৃথিবীতে নেমে এলো শিল্প-বিপ্লব। আর সংবাদপত্র বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে পরস্পরের বন্ধন-গ্রন্থি আরো দৃঢ় করে দিল। বিজ্ঞান বাণিজ্যের নিত্য-নতুন উৎপাদন-প্রকরণকে সমৃদ্ধ করেছে, যা ব্যবসায়-সংগঠনে উৎপাদন ও বণ্টনগত ব্যবস্থাপনায় এনেছে এক ধারাবিধৃত স্বাচ্ছন্দ্য, সংবাদপত্র সেই নবলব্ধ জ্ঞান-অভিজ্ঞতাকে গবেষণাগার থেকে শিল্পাগারে এবং শিল্পগার থেকে পণ্য-বিকিকিনির বাজারে পৌঁছে দিচ্ছে। বাণিজ্যের আজ যে বিস্ময়কর গতি-গৌরব লক্ষ্য করছি, তার মূলে আছে সংবাদপত্রের বিশ্ব-বিজয়ী জঙ্গমতা। সংবাদপত্রের দৌত্যকর্মে বাণিজ্য লাভ করেছে বিজ্ঞানের নিবিড় অনুষঙ্গ।

বাণিজ্য ও বিশ্বমানবের মধ্যে সেতু-রচনায় সংবাদপত্রের দৌত্য কর্মের ভূমিকা অত্যন্ত মূল্যবান। বাণিজ্যের ধারা-প্রকৃতি, উৎপাদনের নব নব সাফল্য, বণ্টনের মৌল-নীতি এবং ব্যবহারে অনিবার্য সুবিধা—এই সব প্রয়োজনীয় তথ্য সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়। ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যা, ক্রমোর্ধ্বমুখী চাহিদা এবং প্রাণধারণ ও দিন-যাপনের জীবন-সংকট যেখানে প্রকট, সেখানে সংবাদপত্র তাদের

সমাধান প্রয়াস ও সাফল্যের বার্তা জনগণের দুয়ারে বহন করে নিয়ে আসে। শুধু তাই নয়, সংবাদপত্রের বাণিজ্য-বিভাগ বাণিজ্য-জগতের নানা খবরাখবরকে প্রতিফলিত করে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য-সংকট বা অর্থনৈতিক সমস্যার ওপর করে আলোকপাত। ফলে সরকার, উৎপাদক-মালিক, শ্রমিক, জনসাধারণ—সকলেই উপকৃত হন এবং সমস্যার গোলক-ধাঁধায় লাভ করেন নব নব পথের ইশারা।

সংবাদপত্রের দৌত্য : বাণিজ্য ও বিশ্বমানব

আধুনিক কালের বাণিজ্যে যুগ-চরিত্র অত্যন্ত প্রকট। উৎপাদন-শৈলীর নিত্য-নব পরিবর্তমানতায়, প্রতিযোগিতার সুতীব্র সংঘাতে এবং উৎপাদন-বৈচিত্র্যের রূপ-রূপায়ণে বাণিজ্য-রঙ্গমঞ্চের যবনিকা নিত্য-কম্পমান। আজ যা উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ নিরিখ বলে গৃহীত হচ্ছে, রাত্রি-প্রভাতে তাই নিকৃষ্ট বলে পরিত্যক্ত হচ্ছে। জগতের বিকি-কিনির বাজারে আজ যে পণ্যের জয়জয়কারে আকাশ-বাতাস মুখরিত, কাল কোন নতুন উৎকৃষ্টতর পণ্যের আবির্ভাবে তা নিঃশব্দে পরাজয় বরণ করে বিদায় নিচ্ছে। নব নব পণ্যাবির্ভাব এত ত্বরিত, চকিত ও আকস্মিক যে, তার সাথে পাল্লা দিয়ে চলা মানুষের পক্ষে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু বিজ্ঞাপনের অবারিত দাক্ষিণ্যে নব নব পণ্যাবির্ভাবের কথা সংবাদপত্রে পরিবেশিত হয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারপর সেই পণ্যকে ঘিরে বাণিজ্যের চাকা নতুন ছন্দে আবর্তিত বিবর্তিত হয়। এভাবে সংবাদপত্র উৎপাদক ও ভোক্তা-সাধারণের মধ্যে রচনা করে সংযোগের সেতু। এই দৃষ্টি-কোণ থেকে বিচার করলে বিজ্ঞাপন খাতে অর্থব্যয় অপব্যয় নয়, তা বাণিজ্য-চক্রকে ঘূর্ণমান রাখার একটি প্রশ্নাতীত কৌশলমাত্র।

সংবাদপত্রের দৌত্য : বিজ্ঞাপন : উৎপাদক ও ভোক্তা-সাধারণ

সংবাদপত্র মহামানবের দরবার, গণ-দেবতার বিচারশালা। জনস্বার্থে গৃহীত কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপায়ণ ও তার সাফল্য বা ব্যর্থতার চিত্র গণ-দেবতার দরবারে উপস্থিত হওয়া চাই। সংবাদপত্র সেই চিত্র উপস্থাপনায় অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও দায়িত্বশীল। সংবাদপত্র, বলা যায়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সকল দায়িত্বের সজাগ প্রহরী। কোথাও গণ-স্বার্থ পদদলিত কিংবা অবহেলিত হয়ে মুষ্টিমেয়ের স্বার্থ স্বীকৃত হলে সংবাদপত্রের নির্ভীক কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে ওঠে। সংবাদপত্রের দৌত্যে জনসাধারণ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রগতির চিত্র এবং বাণিজ্যিক অগ্রসর-গতির ধারা-প্রকৃতির পরিচয় লাভ করতে পারে। এদিক থেকে সংবাদপত্র, বলা চলে, জনগণের দৃষ্টিশক্তি। কোথাও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ব্যর্থতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি, কোথাও-বা কায়েমী-স্বার্থের পদ-লেহন—সেই সব ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ক্ষুরধার মন্তব্যে ও তির্যক ঘৃণা-বর্ষণে সংবাদপত্র মুখর হয়ে

"It is the people's parliament always in session"

ওঠে। তাছাড়া জনসাধারণের চিঠিপত্র প্রকাশনার মাধ্যমে গণমতকে প্রতিফলিত করে সংবাদপত্র তার পবিত্র নৈতিক দায়িত্ব বহন করে। তখন সরকারকে এগিয়ে আসতে হয়, গণ-দেবতার বিচারশালার কাঠগড়ায় ন্যস্ত দায়িত্ব-বহনে অসামর্থ্যের কথা স্বীকার করে সরকারকে নতজানু হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হয়। তাই "It is the people's parliament always in session"—কথাটি সর্বতোভাবে সার্থক। সংবাদপত্র, আক্ষরিক অর্থেই, সদাজাগ্রত লোকসভা।

সংবাদপত্র নয়া দুনিয়ার একটি নয়া বাণিজ্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছে। দেশ-দেশান্তরের সংবাদ-সংগ্রহ, সংবাদ-প্রেরণ ও সংবাদ-প্রকাশন নিয়ে এই নতুন বাণিজ্য শাখাটি গড়ে উঠেছে। এখানে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণের সমবায়ী সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। দেশ-দেশান্তরের সংবাদ বহু উচ্চ মূল্যে বিক্রীত ও প্রেরিত হয়ে থাকে। সেই সংবাদ সংগ্রহের জন্যে সাংবাদিক মহলে তীব্র প্রতিযোগিতা ও উৎকণ্ঠা লক্ষিত হয়। তাছাড়া বিভিন্ন সংবাদপত্রের মধ্যে প্রাধান্যলাভের জন্যে আছে প্রতিযোগিতা, আছে লাভ-লোকসানের উত্থান-পতনের বাণিজ্যিক গতি-প্রকৃতি। বহু শ্রমিককর্মীর শ্রমের বনিয়াদের ওপর এই সংবাদ-শিল্পের প্রতিষ্ঠা। পৃথিবীর লোকসংখ্যার একটা বিরাট্ অংশ এই শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে জড়িত।

সংবাদ-বাণিজ্যের নতুন প্রতিষ্ঠা

সংবাদপত্রের এই বিজয়-অভিযান গৌরবোজ্জ্বল হলেও সংকটমুক্ত নয়। সংকটের রাহুগ্রাসে পড়ে সংবাদপত্র মাঝে মাঝে তার পবিত্র দায়িত্ব বহনে অসমর্থ হয়ে পড়ে। তখন মানব-জাতির সত্যই দুর্দিন। নানা কায়েমী-স্বার্থের চক্রান্তে সংবাদপত্র তার পবিত্র ও মহান্ স্বাধীনতা বিক্রয় করে দিয়ে জনগণের দুঃখ-দুর্দশার মাত্রাকে তোলে আরো বাড়িয়ে। যেখানে 'প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে,' সেখানে যদি সংবাদপত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়, যদি সংবাদপত্র লাঞ্ছিত, নিপীড়িত মানবতার মূঢ়, মূক, ম্লান মুখে ভাষা জোগাতে ব্যর্থ হয়, তা হলে এই আধুনিক পৃথিবীর লক্ষ-কোটি মানুষ বিচারের প্রার্থনায় কার দ্বারে গিয়ে দাঁড়াবে? মুষ্টিমেয় শক্তিমান, বুদ্ধিমান ও ধনবানের হাতে যদি সংবাদপত্র গণস্বার্থকে বিকিয়ে দেয়, তবে এই লোভ-জটিল পৃথিবীতে তার আশা-ভরসা রইলো কি? সংবাদপত্র কবে এই রাহুমুক্ত হবে?

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- বাণিজ্যের বিকাশে সংবাদপত্রের অবদান
- জনগণের সেবায় সংবাদপত্র

৪৩. ভারতের গণ-শিক্ষা ও গণ-সংযোগ

Mass Education and Mass Communication in India.

প্রবন্ধ-সূত্র :—অবতরণিকা · প্রাচীন গণ-শিক্ষার বিপর্যয়—গণ-শিক্ষার বেদনাময় পরিণতি—স্বাধীন ভারতে গণ-শিক্ষা ও গণ-সংযোগ : বেতার প্রেরক-যন্ত্র এবং অনুষ্ঠান-সূচী ও সংবাদ-সরবরাহের ব্যবস্থা—বেতার গ্রাহক-যন্ত্রের উৎপাদন ও সহজ-লভ্যতা এবং টেলিভিশন—সংবাদপত্রের তথ্য-তালিকা—চলচ্চিত্র, নিউজ্‌রীল ও প্রামাণিক চিত্র—উপসংহার।

এদেশে ইংরেজদের আগমনের পূর্বে এদেশের সনাতন শিক্ষার ধারা ছিল বহু-স্রোতা। পঞ্চবটী-ছায়াচ্ছন্ন গ্রাম-ভারতে সার্বজনীন শিক্ষার ছিল অবারিত দ্বার। সেই শিক্ষা আক্ষরিক ছিল না বটে, কিন্তু আত্মিক ছিল। সেই আনন্দ-ঘন সজীব শিক্ষার ধারাবর্ষণে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠতো সমগ্র জাতির অফুরন্ত প্রাণ-ধারা। কিন্তু ভাগ্যচক্রের নিষ্ঠুর পরিবর্তনে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রবল আক্রোশে আমাদের সেই আনন্দ-ঘন লোক-শিক্ষার ধারা শুষ্ক হয়ে গেল। শিক্ষার সেই সার্বজনীন ব্যাপ্তিকে সংকুচিত করে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী চার দেয়ালের বজ্র-আঁটুনির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়ে তার নামকরণ করলো বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার নেই। যারা উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়ে প্রবেশাধিকার পায়, তারা শুধু স্বজাতিকে, স্বজাতির ইতিহাস-সংস্কৃতিকে ঘৃণা করতেই শেখে। গভীর মর্ম-বেদনায় সেদিন রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করলেন—"একদিকে আমাদের দেশে সনাতন শিক্ষার ব্যাপ্তি রুদ্ধ হয়ে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের অনাবৃষ্টি চিরকালীন হয়ে দাঁড়াল, অন্যদিকে আধুনিক কালের নতুন বিদ্যার যে আবির্ভাব হলো তার প্রবাহ বইল না সার্বজনীন দেশের অভিমুখে। পাথরে-গাঁথা কুণ্ডের মতো স্থানে স্থানে সে আবদ্ধ হয়ে রইল, তীর্থের পাণ্ডাকে দর্শনী দিয়ে দূর থেকে এসে গণ্ডূষ ভর্তি করতে হয়, নানা নিয়মে তার আটঘাট বাঁধা।" বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কূপ-বেষ্টনীর বাইরে আছে যারা, সেই কোটি-কোটি মূঢ় মূক ম্লানমুখে ভাষা যোগাতে, সেই শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে আশার বাণী ধ্বনিত করে তুলতে না পারলে দেশের মুক্তি নেই, জাতির মুক্তি নেই।

অবতরণিকা

অথচ আবহমান কাল থেকে এদেশের গণ-শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল সমাজ। সেই কৃষক, মজদুর, শিল্পী-শ্রমিক, যারা জাতির মেরুদণ্ড-স্বরূপ, তাদের কর্মক্লান্ত জীবনে আনন্দ-ঘন শিক্ষার ধারা বিতরণের দায়িত্ব নিজে হাতে গ্রহণ করেছিল সেদিনের হৃদয়বান সমাজ। হিন্দুধর্মের দুরূহ তত্ত্ব ও তথ্যসম্ভার কর্মক্লান্ত

দিবসের অবসানে তারা আয়ত্ত করতো যাত্রা, কথকতা, ব্রতকথা, ছড়া ও সংকীর্তনের মাধ্যমে। অভিনয়, গান ও আবৃত্তির মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মের সারমর্ম সংস্কৃতের জটাবন্ধন থেকে বহুস্রোতা হয়ে প্রবাহিত হয়ে যেত। শাস্ত্রের সেই মহান্ আদর্শের অমৃত-সমান গীত-ধারারূপে উৎসারণে তারা লৌকিক জীবন গঠনে অনুপ্রাণিত হতো। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মরু-তৃষ্ণায় সেই বহু-স্রোতা অমৃত-ধারা আজ বিশুষ্ক। কোথায় গেল রাম-লক্ষ্মণ-সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর দল ? কোথায় গেল যুধিষ্ঠির-ভীষ্ম-দাতাকর্ণের ন্যায় মহান্ আদর্শ নিষ্ঠের দল ? আর সেই বেহুলা-চাঁদসদাগর-বিল্বমঙ্গলের দলই বা কোথায় গেল ? পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় আমাদের পিতৃ-পিতামহের অনুশীলিত কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে গ্রাস করেছে। যাত্রার অভিনেতারা আজ আর নেই, কথক-ঠাকুর বিদায় নিয়েছেন, পাঁচালী ও লোক-সাহিত্যের গণ-কবিরা হয়েছেন নিরুদ্দেশ।

প্রাচীন গণ-শিক্ষার বিপর্যয়

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার জলুস-ভরা আকর্ষণে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে যে বিপর্যয় ঘনিয়ে এলো, ভারতের গৃহলক্ষ্মীরাও তার হাত থেকে রেহাই পেলো না। স্বামী ও শ্বশুরকুলের সঙ্গে নগরবাসিনী হয়ে তাঁরাও ত্যাগ করলেন ব্রতাচার। শহরের ভোগ-সর্বস্বতার আলোকে প্রাচীন ব্রতাচরণ অর্থহীনরূপে প্রতিভাত হলো। এলো স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রস্তুতি। পল্লীগীতির স্থানে ধ্বনিত হলো স্বদেশী-গান। স্বাধীনতা লাভের পর সে ধারাও এলো শুকিয়ে। তারপর এলো সিনেমা ও সিনেমা-পত্রিকার যুগ। সাহিত্যের সঙ্গে সিনেমার ভেজাল দিয়ে এক অদ্ভুত সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। বলাবাহুল্য, এই নব্য-সংস্কৃতির ভক্তদল হলো স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, আপিস-কেরানী ও গৃহস্থ-বধূর দল। এদিকে গ্রামে-গাঁথা ভারতের "সমস্ত দিনের দুঃখ-ধান্ধার রিক্ত প্রান্তে নিরানন্দ ঘরে আলো জলবে না, সেখানে গান উঠবে না আকাশে। ঝিল্লী ডাকবে বাঁশবনে, ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য থেকে শেয়ালের ডাক উঠবে প্রহরে প্রহরে, আর সেই সময়ে শহরে শিক্ষাভিমানীর দল বৈদ্যুত আলোয় সিনেমা দেখতে ভিড় করবে।" যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী, ব্রতকথা নিশ্চিহ্ন হলো ; আর তার স্থান দখল করলো সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও ও টেলিভিশন।

গণ-শিক্ষার বেদনাময় পরিণতি

স্বাধীন ভারতে গণ-শিক্ষা ও গণ-সংযোগের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। এ-বিষয়ে সরকার বিশেষভাবে অগ্রণী। সরকারী অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গণ-সংযোগ বিভাগ। লোকরঞ্জনী শিক্ষা-প্রসারের গুরুত্ব আজ রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেছে। লোকরঞ্জনী শিক্ষা-প্রচারের প্রধান বাহন হলো বেতার, যা গণ-সংযোগ বিভাগেরও প্রধান উপকরণ। ১৯৪৭ সালে ছিল মাত্র ছ'টি বেতার প্রচার-কেন্দ্র। এখন তার স্থলে বেতার

প্রচার-কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সর্বমোট ৪৪। জম্মু, কাশ্মীর, গোয়া ছাড়াও কার্সিয়াং, শিলিগুড়ি ও কোহিমায় বেতার প্রচার-কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। অন্যদিকে শত্রুর প্রচারের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যে তৃতীয় প্রকল্পকালে কেন্দ্রীয় সরকার একশত কিলোওয়াটের পাঁচটি শর্ট-ওয়েভ বেতার-প্রেরক-যন্ত্র সংগ্রহ করেছেন।

স্বাধীন ভারতে গণ-শিক্ষা ও গণ-সংযোগ : বেতার প্রেরক যন্ত্র এবং অনুষ্ঠান-সূচী ও সংবাদ-সরবরাহের ব্যবস্থা

ইতিমধ্যে এক হাজার কিলোওয়াটের একটি উচ্চক্ষমতা-সম্পন্ন মিডিয়াম-ওয়েভ বেতার প্রেরক-যন্ত্র সংগৃহীত হয়েছে। সংগীত-প্রচার হলো বেতার-সূচীর প্রায় অর্ধাংশ। কথিকা, বেতার-রূপক, নাটক বেতার-সূচীর প্রধান আকর্ষণ। কলা, বিজ্ঞান ও সাহিত্য-শাখার বিখ্যাত ব্যক্তিদের ভাষণের বিশেষ অনুষ্ঠান আছে, তাছাড়া আছে প্রামাণ্য রূপক, যৌথ আলোচনা, সাক্ষাৎকার ইত্যাদির সম্প্রচারের ব্যবস্থা। সেই কথকতা, কবি গান, পাঁচালী গান, ছড়া, পল্লীগীতি, যাত্রা ইত্যাদি আজ অবহেলিত নেই। আধুনিকীকরণের মাধ্যমে জন্মান্তর ঘটেছে তাদের। পল্লীমঙ্গল আসর ও মজদুর মণ্ডলীর আসর এখন বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আধুনিক কালে বিশ্ববিমুখতার অর্থই হলো মৃত্যু। আকাশবাণীর মাধ্যমে দেশের ও বিশ্বের সংবাদ-প্রচারের ব্যবস্থা রয়েছে সারা দিনে ছ'বার: ইংরাজীতে দু'বার, হিন্দীতে দু'বার, এবং আঞ্চলিক ভাষায় দু'বার। তাছাড়া আছে স্থানীয় সংবাদ।

কিন্তু এই দরিদ্র দেশে, যেখানে অধিকাংশ লোকের পেট ভরে দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের সংস্থান হয় না, সেখানে রেডিও সেট কেনার সামর্থ্য কতজনের আছে? গ্রামে-

বেতার গ্রাহক-যন্ত্রের উৎপাদন ও সহজ-লভ্যতা এবং টেলিভিশন

গ্রামে পল্লীমঙ্গল সমিতিগুলিকে বিনা-মূল্যে বেতার গ্রাহক-যন্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করে সরকার বহু দরিদ্র জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ১৯৪৭ সালে বেতার গ্রাহক-যন্ত্র উৎপাদনের যে দীন আয়োজন মাত্র ৩,০৩৬ টিতে সীমাবদ্ধ ছিল, ১৯৫৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১,৫০,৫৯৬টিতে এবং ১৯৬১ সালে ৩,২৬,৩৪০টিতে। ১৯৬৩ সালে প্রায় ৪ লক্ষ গ্রাহক-যন্ত্র উৎপন্ন হয়েছে। তাছাড়া ১৯৫৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ভারত টেলিভিশনের যুগেও পদার্পণ করেছে। দিল্লী টেলিভিশন কেন্দ্রের ২৫ মাইলের মধ্যে টেলিভিশন সহযোগে অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে টেলিভিশনের প্রচার মঙ্গলবার ও শুক্রবার—সপ্তাহে এই দুই দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। এই প্রচারের চরিত্র মূলতঃ শিক্ষাত্মক এবং সংবাদ পরিবেশন-মূলক। এই কয় বৎসরে ১৮০টি টেলি-ক্লাব স্থাপিত হয়েছে। তাদের সদস্য-সংখ্যা ৩,৬০০ এবং শ্রোতার সংখ্যা ২০,০০০। দিল্লীতে বর্তমানে ৫৫১টি টেলিভিশন

গ্রাহক-যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। সম্প্রতি বেতার মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আশা দিয়েছেন, শীঘ্রই ভারতের বড় বড় শহরে টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপিত হবে।

এবার সংবাদপত্রের কথায় আসা যাক। পশ্চিমী দুনিয়ার গণ-শিক্ষা ও গণ-সংযোগের প্রধান উপকরণ হলো সংবাদপত্র। সেখানে সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা সর্বাধিক হওয়ায় সংবাদপত্রের প্রচলন অত্যন্ত বেশি। কিন্তু ভারতে এ যাবৎ অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য ছিল এবং তাই সংবাদপত্রের প্রচলনও ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু এখন সমগ্র ভারতে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত হওয়ায় সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। সেইদিক দিয়ে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা ভারতে সম্ভাবনাময়। ১৯৬০ সালে যেখানে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ছিল ৮,০২৬ এবং ১৯৬১ সালে যেখানে ছিল ৮,৩০৫ সেখানে ১৯৬২ সালে তা দাঁড়ায় ৯,২১১-এ। সংবাদপত্র প্রকাশনায় মহারাষ্ট্রের স্থান সর্বোচ্চ ১,৪৪০, তারপর যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গ ১,২৭৩, উত্তরপ্রদেশ ১,১৯৬, দিল্লী ৯৬১ এবং মাদ্রাজ ৮৭৩। সর্বমোট ৯,২১১খানি সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার মধ্যে ১৯৬২ সালে মাত্র ৫,৪৯৪ খানির তথ্য পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে ইংরেজি সংবাদপত্রের সংখ্যা ১,৮৭১, হিন্দী ১,৭৮১। সেই তুলনায় বাংলার সংখ্যা '৫৮৯'। বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের যথাক্রমিক শতকরা হার: ইংরেজি ২৫.৫, হিন্দী ১৮.২। বর্তমান ভারতে ইংরেজি সংবাদপত্রের প্রচলনই সর্বাধিক। ১৯৬২ সালে ইংরেজি সংবাদপত্রের প্রচলন সংখ্যা ৫৪.২৬ লক্ষ, হিন্দীর সংখ্যা ৩৮.৫০ লক্ষ, তামিল ২৬.৩৯ লক্ষ, গুজরাটী ১৪.১৩ লক্ষ, মালয়ালম ১৪.১১ লক্ষ, মারাঠী ১৩.৩৩ লক্ষ, বাংলা ১১.১০ লক্ষ, উর্দু ১০.৫৬ লক্ষ এবং তেলেগু ৭.৫৫ লক্ষ। তার জন্যে ১৯৫৭ সালে যেখানে নিউজপ্রিন্টের আমদানি ছিল ৬৫০,৩৪,৩৩৩ কিলোগ্রাম, ১৯৬৩ সালে সেখানে বৃদ্ধি পায় ৯০,০০০ টন। ঐ বছর নেপা মিল উৎপাদন করেছে ২৮,০০০ টন নিউজপ্রিন্ট। প্রত্যেক নাগরিকের কথা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা সংবাদপত্রগুলির মাধ্যমে রূপলাভ করলেও ন্যায়সংগত নিয়ন্ত্রণ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

সংবাদপত্রের তথ্য-তালিকা

অতঃপর যুগ-সর্বস্ব চলচ্চিত্র। গণ-শিক্ষা ও গণ-সংযোগের ব্যাপারে চলচ্চিত্রের ভূমিকা অসাধারণ। ১৯৫৬ সালে ২৯৬টি ফিল্ম মুক্তিলাভ করে, তার স্থলে ১৯৬১ সালে ৩০৩টি এবং ১৯৬৩ সালে ৩০৫টি ফিল্ম মুক্তিলাভ করেছে। তন্মধ্যে হিন্দী ৯৩, তামিল ৫৬, তেলেগু ৪৬ এবং বাংলা ৩৯। কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের ফিল্মস্ ডিভিশনের হাত দিয়ে ১৯৬২ সালের শেষাবধি ৭৪২খানি নিউজ্‌রীল ও ৬২৪ খানি প্রামাণিক চিত্র মুক্তিলাভ করেছিল। ১৯৬৩ সালে তার স্থানে মুক্তিলাভ করে ৭৯৪

খানি নিউজ্‌রীল ও ৬৭৯ খানি প্রামাণিক চিত্র। এই নিউজ্‌রীল ও প্রামাণিক চিত্র-সম্ভার রচিত হয় বিভিন্ন ১৩টি আঞ্চলিক ভাষায়ঃ ইংরেজি, হিন্দী, বাংলা, তামিল, তেলেগু, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, অসমীয়া, কানাড়ী, উর্দু, ওড়িয়া, মারাঠী ও মালয়ালম্‌। গ্রামাঞ্চলে মোটর গাড়ীর মাধ্যমে প্রদর্শনীর জন্যে রচিত ফিল্মগুলিকে সহজ, সরলভাবে গ্রামীণ দর্শকদের পক্ষে সহজবোধ্য করে রূপদান করা হয়ে থাকে। তাছাড়া, প্রেক্ষাগৃহ-কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক প্রদর্শনীর সঙ্গে ২,০০০ ফুট নিউজ্‌রীল ও প্রামাণিক চিত্র প্রদর্শনের আইনতঃ বাধ্য। অন্যদিকে স্কুল, কলেজ, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, আধা-সরকারী ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে প্রদর্শনীর জন্যে ফিল্ম সরবরাহ করা হয়ে থাকে। আবার সকল প্রকার ফিল্ম প্রদর্শনীযোগ্য কিনা, তা বিচার করবার জন্যে রয়েছে, সেন্সর বোর্ড। দেশের শিক্ষাবিদ্‌, চিকিৎসক, আইনবিদ্‌, সমাজকর্মীরা এই বোর্ডের সদস্য হবার যোগ্য।

চলচ্চিত্র, নিউজ্‌রীল ও প্রামাণিক চিত্র

প্রাচীন ভারতের সনাতন ও সার্বজনীন শিক্ষার ধারা রুদ্ধ হয়ে গেছে সত্য, কিন্তু সেজন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কোন লাভ নেই। যুগ বদ্‌লেছে, যুগ-প্রয়োজনে গণ-শিক্ষা ও গণ-সংযোগের রূপও গিয়েছে বদ্‌লে। যুগকে অস্বীকার করে গ্রীস, রোম, ব্যাবিলন হারিয়ে গেছে। কাজেই যুগোপযোগী গণ-শিক্ষা ও গণ-সংযোগের রীতি-প্রকরণকে হাতিয়ার করে জাতির লোক-রঞ্জনী শিক্ষার ধারাকে অব্যাহত রাখতে হবে। তবু প্রাচীন-রীতির সঙ্গে আধুনিক-রীতির একটা আপস-রফা হওয়া প্রয়োজন। আধুনিক রীতি-প্রকরণের মাধ্যমে প্রাচীন ঐতিহ্যধারাকে পুনরুজ্জীবিত করে জাতির শুভ চেতনা ও সম্ভাবনার উদ্বোধন ঘটানো যেতে পারে। তাছাড়া গণতন্ত্র এ দেশে বিবর্তিত নয়, প্রবর্তিত। পাশ্চাত্যের ঘরে এর সাফল্যের-মূলে রয়েছে সার্বজনীন শিক্ষা, যা ছাড়া গণতন্ত্রের চাকা অচল। গণতন্ত্রের চরম সাফল্যের জন্য গণ-শিক্ষা ও গণ-সংযোগকে আরো শক্তিশালী, আরো সক্রিয় করে তুলতে হবে। নইলে গণতন্ত্রের তরু-শিশু দেশের সর্বব্যাপী শিক্ষাহীনতা ও অজ্ঞতার মরু-নিশ্বাসে শুকিয়ে যাবে, তার বিকাশের সকল সম্ভাবনা লুপ্ত হয়ে যাবে। সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দেবার দিন এখন এসেছে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়ঃ

- পশ্চিমবঙ্গে জনশিক্ষা, ক. বি. '৫৫
- ভারতীয় জনশিক্ষা ও জনসংযোগ
- গণতন্ত্রের বিকাশে ভারতের জনশিক্ষা

৪৪. ভারতের গণস্বাস্থ্যের রূপচিত্র
Survey of India's Public Health.

প্রবন্ধ-সূত্র :—অবতরণিকা—ব্রিটিশ ভারতে গণস্বাস্থ্যের চিত্র—জাতির স্বাস্থ্যহীনতার কারণ-বিশ্লেষণ—স্বাস্থ্যহীনতার অন্যতম কারণ দারিদ্র্য ও শিক্ষাহীনতা- স্বাধীন ভারতে গণ-স্বাস্থ্যের স্বরূপ-বিশ্লেষণ—'ভোর' কমিটি এবং স্বাস্থ্য পর্যালোচনা ও প্রকল্প সংস্থা—ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, কুষ্ঠ, ক্যান্সার, যক্ষ্মা, উদরাময়, আমাশয়, কলেরা ইত্যাদির প্রতিরোধ—উপসংহার।

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।" —রবীন্দ্রনাথ

অবতরণিকা

এই স্বাস্থ্যহীন, শক্তিহীন, নিরানন্দ দেশে স্বাস্থ্য চাই, শক্তি চাই, চাই আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু। ইংরেজ-পরিত্যক্ত ভারতে গণস্বাস্থ্যের যে অপচয় এবং তার যে অসহায় রূপ পরিলক্ষিত হয়েছিল, তাতে আতঙ্কিত হয়ে ওঠার যথেষ্ট কারণ ছিল। দিকে দিকে স্বাস্থ্যহীনতা, শক্তিহীনতা, চির-রুগ্নতা ও অকাল-মৃত্যুর দুর্নিবার হাতছানি। রোগ-জর্জর, মৃত্যু-ভীত জাতি অসহায়ভাবে ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করে প্রতি মুহূর্তে শুনেছে মৃত্যুর পদধ্বনি, আর বিদেশী শাসকেরা নিষ্ক্রিয়তা ও উদাসীনতার নির্লজ্জ নজীর রেখে সেই সুযোগে এ দেশ শোষণ করে অমেয় ধনরত্ন জাহাজ বোঝাই করে স্বদেশে চালান দিয়েছে। সর্বব্যাপী রিক্ততা, দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যহীনতার মধ্যে কবি তাই বেদনা-বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—

"চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস-বিস্তৃত বক্ষ-পট।"

স্বাস্থ্যই জাতির প্রকৃত সম্পদ। ভূমি নয়, জল নয়, অরণ্য নয়, খনি নয়, ছাগ-মেষ-গো-মহিষাদি নয়, অর্থও নয়; জাতির প্রকৃত সম্পদ হলো তার সুস্থ, সবল জনগণ।

ব্রিটিশ ভারতে গণস্বাস্থ্যের চিত্র

পৃথিবীর আধুনিকতম স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের অধিকারী ইংরেজ দুশো বছর ধরে ভারতের গণস্বাস্থ্যকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিয়েছে। এ বিষয়ে ইংরেজদের কাছে ভারতের প্রত্যাশা ছিল অনেক, কিন্তু তাদের কাছ থেকে নিদারুণ নৈরাশ্য ছাড়া ভারত আর কিছুই পায় নি। ভারতের গণস্বাস্থ্য ব্রিটিশ রাজত্বের একটা দুরপনেয় কলঙ্ক-চিহ্ন। দুশো বছরের ব্রিটিশ

শাসনে সমগ্র জাতি আজ পঙ্গু, মেরুদণ্ডহীন। মহামারীর তাণ্ডবে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে, অকাল-মৃত্যুর করাল গ্রাসে সমগ্র দেশ পরিণত হয়েছে এক সীমাহীন শ্মশানভূমিতে। সেই মহাশ্মশানের বুকে যদি এতটুকু করুণা, এতটুকু সমবেদনা ও মানবিক অনুকম্পার ধারা বর্ষিত হতো, তাহলে গণস্বাস্থ্যের ভিন্নতর রূপ হয়তো ভারতে দেখা যেত। কিন্তু তা হয় নি। যে সকল ব্যাধি মহামারীর ভয়াল আকার ধারণ করে সারা দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করেছে, তার সব ক'টিই ছিল প্রায় প্রতিরোধযোগ্য। কেবল মানবিক স্পর্শকাতরতা, ইচ্ছা ও উৎসাহের অভাবে সেদিন ভারতের ঘরে ঘরে উঠেছিল হাহাকার, নেমে এসেছিল শোকের গাঢ় অন্ধকার।

রোগগ্রস্তকে ঔষধ দান করলেই বা সত্বর তার ব্যাধি নিরাময় করতে পারলেই গণস্বাস্থ্য সম্পর্কে সরকারী কর্তব্য অবসিত হয় না। জাতির স্বাস্থ্যহীনতা ও চিররুগ্নতার মূলোন্বেষণে যাত্রা করতে হবে। কেন জাতিকে অস্বাস্থ্য ও রোগ-যন্ত্রণার অভিশাপ মাথায় বহন করে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হতে হয়?—তার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে সর্বাগ্রে। অর্থনীতি-বিশারদগণের মতে, দারিদ্র্যই জাতির স্বাস্থ্যহীনতার মূলীভূত সমস্যা।

জাতির স্বাস্থ্যহানতার কাবণ-বিশ্লেষণ

বস্তুতপক্ষে, দারিদ্র্য মানুষের সকল জীবন-রস নিঃশেষ করে তার রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতাকে একেবারে দেউলে করে দেয়। তার ফলে হয়ে ওঠে 'শরীরম্ ব্যাধি মন্দিরম্।' ভারতের গণস্বাস্থ্যের রূপচিত্র যে কী সাংঘাতিকভাবে নৈরাশ্যজনক, তা একটি পরিসংখ্যানেই পরিস্ফুট হবে। আমেরিকায় বা গ্রেট ব্রিটেনে যেখানে গড় আয়ুষ্কাল ৬৩ বৎসর, অস্ট্রেলিয়ায় ৬৭ বৎসর, ইতালিতে ৫৬ বৎসর এবং জাপানে ৪৬ বৎসর, ভারতে সেখানে ৩০ বৎসর। ভারতে শিশু-মৃত্যুহার সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক। ১৯৪১-৫১ সাল পর্যন্ত শিশু-মৃত্যুর হার ছিল হাজারে ৪৬৫, ১৯৫১-৫৬ সাল পর্যন্ত ৩০৮, ১৯৫৬-৬১ সাল পর্যন্ত ২৭০। সেক্ষেত্রে গ্রেট ব্রিটেনে শিশু-মৃত্যুহার হাজারে ৫২, আমেরিকায় ৪২, কানাডায় ৫৪, অস্ট্রেলিয়ায় ৩৬। তাছাড়া গড়ে প্রতিবছরে প্রায় দু'লক্ষ মাতা সন্তান-প্রসবান্তে মারা যান এবং অন্ততঃপক্ষে দশ হাজার মাতা চির-পঙ্গুত্ব লাভ করেন। ভারতে হাজার-প্রতি সাধারণ মৃত্যুহার ১৯৪১-৫১ সাল পর্যন্ত ২৭·৪, ১৯৫১-৫৬ সাল পর্যন্ত ২৫·৯ এবং ১৯৫৬-৬১ সাল পর্যন্ত ২১·৬। আর আজও ভারতে প্রতি বছর কলেরায় মরে ৯৯,০০০ নরনারী, প্লেগে মরে ২,৮০০ নরনারী এবং বসন্তে মরে ৫৫,০০০ নরনারী। সাধারণ মৃত্যুসংখ্যা ও অকাল মৃত্যুসংখ্যার এই বিপুলত্বের কারণ কি? কারণ নিশ্চয়ই দারিদ্র্য। দারিদ্র্যজনিত অপুষ্টি ও রোগ-প্রতিরোধক শক্তির অভাবের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে এ দেশের শিক্ষার অভাব। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে সাধারণ জ্ঞান মানুষকে বহু সংক্রামক ব্যাধির

স্বাস্থ্যহীনতার অন্যতম কারণ: দারিদ্র্য ও শিক্ষাহীনতা

হাত থেকে রক্ষা করতে পারে, ভারতে তা কোথায়? কাজেই দেশের স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে কেবল রোগ-প্রতিষেধক বিতরণ করলেই চলবে না, দেশে শিক্ষা-বিস্তার করতে হবে; সর্বোপরি, বিনাশ করতে হবে দারিদ্র্য নামক দৈত্যকে।

স্বাধীন ভারতে গণস্বাস্থ্য সম্পর্কে আমাদের প্রত্যাশা ছিল অসীম। বলাবাহুল্য, আমাদের সেই প্রত্যাশা সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নি। সফল যে হয় নি, তার সমর্থন ভারতের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউরের বিবরণীতে পাওয়া যায়। বিবরণী-অনুসারে ভারতের বার্ষিক মৃত্যুসংখ্যা ৬৬ লক্ষের বেশী; এর অর্ধেক মারা যায় ২০ বছর বয়স হবার আগেই এবং শিশু মারা যায় প্রায় ১৩ লক্ষ। স্বাস্থ্যসম্মত বাসগৃহ ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে দেশে ক্ষয়রোগে মরে প্রায় ২৫ লক্ষ লোক। আর ম্যালেরিয়ায় ভোগে বছরে প্রায় ৭ কোটি লোক; তার মধ্যে প্রাণ হারায় ৩ লক্ষ হতভাগ্য। কিন্তু এর কারণ কি? ক্ষয়-রোগ, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, টাইফয়েড্ বা ম্যালেরিয়া কি আজও দুরারোগ্য? তবে কেন সারা দেশে এই নিদারুণ মৃত্যু-যন্ত্রণা? এর উত্তর নিহিত রয়েছে সর্বক্ষেত্রে সরকারী ব্যর্থতায়। প্রথমতঃ, দেশের সকল মানুষকে জীবন-যাপনের নিম্নতম মানও আমরা দিতে পারি নি। জাতীয় আয়ের ক্রমবর্ধমানতার যাদুকৌশল যতই দেখাই না কেন, তাদের মাথা গুঁজবার স্বাস্থ্য-সম্মত বাসগৃহ দিতে পারি নি, দেহের পুষ্টি-সাধনের জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য তাদের মুখে তুলে দিতে পারি নি। অথচ তারা সকল সরকারী করভার (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ) বহন করে। কিন্তু কেবল উচ্চস্তরের সরকারী কর্মচারীদের জন্যে স্বাস্থ্য-সম্মত বাসগৃহ নির্মিত হয়, কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে অতিথি-ভবন ও মন্ত্রীদের বাসভবন নির্মিত হয়। দরিদ্র দেশে এই বিলাসের ফাঁস কি মৃত্যু-ফাঁস নয়? আর দরিদ্র কৃষক-সম্প্রদায় মাটি-কোঠার ভিজে স্যাঁতসেতে ভগ্নপ্রায় কুঁড়ে ঘরে রোগ-ব্যাধির সাহচর্যে জীবন ভোর করে দেয়। আলোহাওয়া-বিবর্জিত কুঁড়ে ঘরটি সাধারণতঃ থাকে গোময়-গোমূত্রের প্রাচুর্যে অস্বাস্থ্যকর। শিল্প-শ্রমিকদের অবস্থা আরো সঙ্গীন। যে সকল বস্তী বা আবর্জনা-পূর্ণ পূতিগন্ধময় নরককুণ্ডে তারা বাস করে, তাতে যে তাদের স্বাস্থ্য ও কর্মদক্ষতাই বিনষ্ট হয়, তাই নয়; কুৎসিত ব্যাধিও সংক্রমিত হয় তাদের মধ্যে। এই তো শিল্পশহরগুলির বস্তী-জীবনের গোপন রহস্য। একে কি বলা যাবে? এ কি সরকারী নৈষ্কর্ম্য না ক্লীবত্ব? আর স্বাধীনতার শহীদ ছিন্নমূল উদ্বাস্তুরা তো আজও পায়ের তলার মাটি খুঁজে পায় নি। দ্বিতীয়তঃ, ভারত কেন্দ্রে ও রাজ্যে যে স্বাস্থ্য-দপ্তরের উত্তরাধিকার লাভ করেছে, তা মূলতঃ ব্রিটিশ সরকারেরই সৃষ্টি। এই বিভাগ তার পূর্ব-ঐতিহ্য বিস্মৃত হতে পারে নি। তদুপরি এই বিভাগ নানা দুর্নীতি ও অকর্মণ্যতার যে নজীর স্থাপন করেছে, তা দেখে যে কোন স্বাধীন দেশ

স্বাধীন ভারতে গণ-স্বাস্থ্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ

লজ্জিত হবে। দাতব্য চিকিৎসালয় ও সরকারী হাসপাতালগুলিতে এখনও যে রুগ্ন মানুষগুলি যথার্থ মানুষের ব্যবহার পায় না—এ কলঙ্ক আমরা রাখবো কোথায় ?

সে যাই হোক, প্রথম ও দ্বিতীয় যোজনায় স্বাস্থ্যখাতে যথাক্রমে ১৪০ কোটি ও ২২৫ কোটি টাকার স্থানে তৃতীয় যোজনায় ৩৪৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় এই খাতে ব্যয় করা হবে ১,০৯০ কোটি টাকা। স্বাধীন ভারতে স্যার জোসেফ 'ভোরে'র নেতৃত্বে এ দেশের স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়েছিল। কমিটি দেশে স্বাস্থ্যপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টিকল্পে ১,০০০ কোটি টাকা ব্যয়-সাপেক্ষ একটি দশসালা পরিকল্পনা রচনা করেন। কৃষকেরাই ভারতের প্রাণ। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কবলে এবং চিকিৎসার অভাবে হতভাগ্য কৃষকেরাই শহীদ হয়। তাই কমিটি যে ভারতের পল্লী-অঞ্চলকেই প্রধান কর্মক্ষেত্ররূপে বেছে নিয়েছিলেন, তা সাধুবাদযোগ্য। এই কমিটিই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মন্ত্রীসভার স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর নেতৃত্বে স্বাস্থ্যবিভাগ গঠনের সুপারিশ করেন এবং রাজ্যের স্বাস্থ্য-বিভাগকে জেলা স্বাস্থ্য-বিভাগ ও মহকুমা স্বাস্থ্য-বিভাগে সুবিন্যাসের পরামর্শ দান করেন। তাছাড়া দু'লক্ষের অধিক লোকের শহরে ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট গঠন করে তার হাতে শহরের স্বাস্থ্য-রক্ষার দায়িত্ব দানের সুপারিশ করেন। সম্প্রতি সুস্থ, সবল ও বলিষ্ঠ জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য পর্যালোচনা ও প্রকল্প সংস্থা (Health Survey and Planning Committee) একটি পরিকল্পনা রচনা করেছেন। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো, প্রতি ৫০ লক্ষ লোকের জন্যে একটি মেডিক্যাল কলেজ, প্রতি ৩,৫০০ লোকের জন্যে একজন চিকিৎসক এবং প্রতি ১,০০০ লোকের জন্যে হাসপাতালে একটি শয্যার ব্যবস্থা। বর্তমানে দেশে মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ৫৭ ; বর্ধিত সংখ্যায় দাঁড়াবে ৯০।

'ভোর' কমিটি এবং স্বাস্থ্য পর্যালোচনা ও প্রকল্প সংস্থা

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ম্যালেরিয়া ছিল ভারতের বিভীষিকা। আজ কেবল ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ নয়, ম্যালেরিয়া দূরীকরণের জন্যে ৩৯১টি ইউনিটে কাজ চলেছে। ফলে যেখানে ১৯৫৩-৫৪ সালে রোগ-তালিকায় ১০·৮% ছিল ম্যালেরিয়া রোগী, সেখানে ১৯৬৩ সালে তা হয় মাত্র ০·২%। ম্যালেরিয়ার মতো ফাইলেরিয়াও একটি মারাত্মক ব্যাধি। ভারতে প্রায় ৬৮০ লক্ষ লোক ফাইলেরিয়া অঞ্চলে বাস করে। তন্মধ্যে ২৭০ লক্ষ লোককে প্রতিষেধক ঔষধ দান করা হয়েছে এবং ৩৯ লক্ষ বাসগৃহ জীবাণুমুক্ত হয়েছে। বর্তমান ভারতে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ। প্রথম যোজনায় কুষ্ঠ-নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পানুযায়ী চারটি চিকিৎসা ও গবেষণা-কেন্দ্র এবং ২৯টি সহযোগী কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৬৩-৬৪ সালে ১৬২টি কুষ্ঠ-নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র এবং ৩৪৬টি গবেষণা, শিক্ষা ও চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। ক্যান্সার চিকিৎসার জন্যে বোম্বাইতে,

মাদ্রাজে ও কলিকাতার চিত্তরঞ্জন জাতীয় ক্যান্সার হাসপাতালে আধুনিক ব্যবস্থা রয়েছে। যক্ষ্মার আক্রমণের জন্যে দায়ী অপুষ্টি, বাসগৃহ-সমস্যা ও সামাজিক কারণ।

ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, কুষ্ঠ, ক্যান্সার, যক্ষ্মা, উদরাময়, আমাশয়, কলেরা ইত্যাদির প্রতিরোধ

যক্ষ্মার চিকিৎসার জন্যে ১৪০টি যক্ষ্মা স্বাস্থ্যনিবাস ও হাসপাতাল, ২২৫টি যক্ষ্মা-চিকিৎসা-কেন্দ্র, ১৫২টি যক্ষ্মা-বিভাগ রয়েছে এবং শয্যা-সংখ্যা ২৭,০০০ করা হয়েছে। তৃতীয় যোজনায় আরো ২০০টি চিকিৎসা কেন্দ্র, ২৫টি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা-কেন্দ্র এবং আরো ৫,০০০টি শয্যার ব্যবস্থা রয়েছে। উদরাময়, আমাশয়, কলেরা ইত্যাদি সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের জন্যে তৃতীয় যোজনায় শহরাঞ্চলে জল সরবরাহ খাতে ৮৮·৯৫ কোটি এবং পল্লী-অঞ্চলে ১৬·৩৩ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

স্বাধীন ভারতে গণস্বাস্থ্য-রক্ষাকল্পে যে সব প্রকল্প গৃহীত হয়েছে, নিঃসন্দেহে তা প্রশংসনীয়। কিন্তু সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় স্বাস্থ্য-দপ্তরেও যে দুর্নীতি প্রবেশ করেছে, তা অতি পরিতাপের বিষয়। জনগণের ব্যাধি দূর করবার আগে সরকারী স্বাস্থ্য দপ্তরকে ব্যাধিমুক্ত করতে হবে। পরিশেষে একটি কথা। দেশের সকল ব্যাধির

উপসংহার

মূল যে দারিদ্র্য ও শিক্ষার অভাব, তা দূরীভূত না হলে সকল আয়োজন ব্যর্থ হবে। আশার কথা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষা-ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম বিঘোষিত হয়েছে। কবে সেই সংগ্রাম জয়যুক্ত হবে—তার প্রতীক্ষায় ভারতের ৪৬ কোটি জনগণ আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- ভারতের জনস্বাস্থ্য
- ভারতের জনজীবন ও জনস্বাস্থ্য

৪৫. ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা
Banking System of India.

প্রবন্ধ-সূত্র:—অবতরণিকা—ভারতের টাকার বাজারের ত্রুটি—ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার ইতিহাস : দেশীয় মহাজন—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও তার আচরণ—ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক (State Bank of India)—তপশীল-ভুক্ত ও তপশীল-বহির্ভূত ব্যাঙ্ক সমূহ—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও তার কার্যসূচী—উপসংহার।

অবতরণিকা

ব্যাঙ্ক দেশের অর্থ-সঞ্চালনতন্ত্রের হৃৎপিণ্ড-স্বরূপ। দেশের উদ্বৃত্ত অর্থকে আকর্ষণ করে সম্পদ-সৃষ্টির ব্যাপারে ব্যাঙ্ক বিনিয়োগ-যোগ্য অর্থ করে সরবরাহ। সম্পদ-সৃষ্টির মূল কথা হলো উৎপাদন। কিন্তু মূলধন-সরবরাহ ছাড়া উৎপাদন অসম্ভব। দেশের প্রয়োজনীয় পুঁজি-সরবরাহ ও সম্পদ-রচনার সেই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা হলো ব্যাঙ্কের। শুধু তাই নয়, ব্যাঙ্ক প্রত্যেক দেশের টাকার বাজারের নেতৃত্ব গ্রহণ করে সমগ্র দেশের অর্থ-সঞ্চালনতন্ত্রের মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করে এবং একটি সংগতিপূর্ণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ রচনা করে দেয়।

ভারতের টাকার বাজারের ত্রুটি

ভারতের মতো স্বল্পোন্নত দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার ও টাকার বাজারের এখনও ত্রুটিমুক্তি ঘটে নি। দুঃখের বিষয়, এখনও ভারতের টাকার বাজার দ্বিধা-বিভক্ত। একটি হলো, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগোষ্ঠী, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও স্টেট ব্যাঙ্ক ইত্যাদি নিয়ে আধুনিক টাকার বাজার ; অন্যটি হলো, দেশীয় কুঠিয়াল, সাহুকার, পোদ্দার, বেনে, নানাবতী, শেঠ প্রভৃতির নিয়ে ভারতের চিরাচরিত প্রাচীন টাকার বাজার। পারস্পরিক সহযোগিতাহীন এই দুই জগতের টানা-পোড়েনে ভারতীয় টাকার বাজারের মাঝে মাঝে নাভিশ্বাস ওঠে। তাছাড়া বোম্বাই ও কলকাতা—ভারতের এই দুই বৃহৎ শহরে আবার ভারতের টাকার বাজার দ্বিধা-বিভক্ত। আর রয়েছে ক্ষুদ্রতর একাধিক আঞ্চলিক টাকার বাজার। এদিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বয়স স্বল্প এবং সেই কারণে টাকার বাজারের ওপর তার সর্বময় নেতৃত্ব এখনো পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তার ওপর রয়েছে বিদেশী ব্যাঙ্কের দৌরাত্ম্য। তাই একদিকে ভারতীয় ব্যাঙ্কের সঙ্গতি যেমন স্বল্প, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন টাকার বাজারের মধ্যেই নেই কোন স্বাস্থ্যকর যোগ-সংহতি।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের শ্রেষ্ঠী-সমাজের উদ্যোগে একপ্রকার লগ্নী-প্রথা প্রচলিত ছিল—মনুর ধর্ম-শাস্ত্র ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রই তার প্রমাণ। যীশু খ্রীস্টের

জন্মের চারশো বছর আগেও এদেশে লগ্নী-প্রথা বিদ্যমান ছিল। তারপর দ্বাদশ শতকে দেখা যায় হুণ্ডির প্রচলন। সেই সব সূত্র থেকে আসতো ব্যবসা-বাণিজ্যের পুঁজি, রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় অর্থ, ধন-ভাণ্ডারের অর্থ, রাজস্ব ও যুদ্ধাভিযানের টাকা। অন্তর্বাণিজ্য ছাড়াও বৈদেশিক বাণিজ্যে টাকার সেই সব উৎসভূমির ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের সঙ্গে অর্থপতিদের ভাগ্যেরও উত্থান-পতন ঘটতো।

ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার ইতিহাস : দেশীয় মহাজন

মোগল-সাম্রাজ্যের পতনে দেশীয় মহাজনদের এমনি একবার ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটেছিল। তবু এরা আবহমান কাল ধরে দেশের পল্লী-অর্থনীতিতে অর্থ সঞ্চালিত করে আসছে। একাধারে এঁরা গ্রাম্য দোকানদার, মহাজন ও কৃষি-পণ্যের ক্রেতা। তারপর ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে আবির্ভূত হয়েছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, ব্রিটিশ এজেন্সী হাউস ও ব্রিটিশ-পোষিত বৈদেশিক বিনিময় ব্যাঙ্ক-গোষ্ঠী। এদের দৌরাত্ম্যে ভারতের টাকার বাজারে সৃষ্টি হয়েছে চরম বিশৃঙ্খলা।

তথাপি সেই সমস্ত ব্যাঙ্কের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভারত ব্যাঙ্কিং-জগতের আধুনিক যুগে পদার্পণ করেছে। প্রথমেই ধরা যাক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কথা। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে তাদের পসার-বৃদ্ধি ও সওদাগরী কাজে অর্থ-যোগানের উদ্দেশ্যে ১৮০৬ সালে বাংলায়, ১৮৪১ সালে বোম্বাইতে এবং ১৮৪৩ সালে মাদ্রাজে মোট তিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক স্থাপন করে। ১৯২১ সালে এই তিনটি ব্যাঙ্ক একত্রিত হয়ে 'ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক' নাম গ্রহণ করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য নির্বাহ করেছে। ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও তার আচরণ

যে সমস্ত স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা নেই, সেখানে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কই পেয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিত্ব। এই ব্যাঙ্কের পুঁজি মালিকানা ও পরিচালনা ছিল সম্পূর্ণভাবে বৈদেশিক। তার রুদ্ধদ্বারে ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা কতোবার মাথা ঠুকে মরেছে ; তবু প্রবেশাধিকার পায় নি। তাছাড়া ভারতীয় ও য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে করা হতো এক ঘৃণ্য পক্ষপাত-পূর্ণ আচরণ। ভারতীয় শিক্ষানবীশ গ্রহণে ছিল ঘোর বিরোধিতা। বস্তুতপক্ষে, ভারতীয় টাকার বাজারে একাধিপত্য স্থাপনে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক সাম্রাজ্যবাদী কায়েমী-স্বার্থের ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হাতিয়ার।

স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা-লগ্ন থেকে ভারতীয় গণমত ছিল ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের তীব্র বিরোধী। স্বাধীনতালাভের পর গণচিত্তের সেই বিরোধিতায় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের রূপান্তর এলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-কাল থেকেই পৃথিবীর সকল দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের একটা জোয়ার আসে। তার প্রভাবে ১৯৪৮ সালে ভারতে

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হয়। ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হলো এবং ভূমিষ্ঠ হলো ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক (The State Bank of India)।

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক (State Bank of India)

ভারতের পল্লী-অঞ্চলে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার জাল-বিস্তারের দায়িত্ব হাতে তুলে নিল এই ব্যাঙ্ক এবং যেখানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা নেই, সেখানে সে গ্রহণ করলো তার প্রতিনিধিত্ব-ভার। অন্যদিকে, হায়দরাবাদ রাজ্য ব্যাঙ্ক, জয়পুর ব্যাঙ্ক, মহীশূর ব্যাঙ্ক প্রমুখ আটটি সরকারী ব্যাঙ্ককে ১৯৫৯ সালের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক আইনের দ্বারা রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের অধীনস্থ ব্যাঙ্কে পরিণত করা হয়।

স্বদেশী আন্দোলন থেকে প্রেরণা সঞ্চয় করে কতকগুলি ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্ক বিংশ শতাব্দীর সূচনায় বিকশিত হয়ে উঠলো। কিন্তু পরিচালনগত ত্রুটি, ফট্‌কাবাজি, ব্যাঙ্কের শৈশবেই লভ্যাংশ ঘোষণা, পুঁজির স্বল্পতা, পুঁজি ও আমানতের দুস্তর ব্যবধান

তপশীল-ভুক্ত ও তপশীল-বহির্ভূত ব্যাঙ্ক সমূহ

এবং সর্বোপরি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও নানা বৈদেশিক ব্যাঙ্কের তীব্র প্রাতিদ্বন্দ্বিতায় সেই সদ্য-প্রজ্বলিত প্রদীপ-শিখাগুলির অধিকাংশই নির্বাপিত হলো। কিন্তু হাতে জমলো যে বেদনার ধূমাঙ্কিত কালি, তাই দিয়ে ভারতীয় ব্যাঙ্কের নতুন কালের ইতিহাস রচিত হলো। বেদনার তিক্ত অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে ভারতের তপশীল-ভুক্ত ও তপশীল-বহির্ভূত ব্যাঙ্কগুলি ভারতীয় টাকার বাজারের ওপরে বিস্তার করেছে তার ন্যায্য আধিপত্য। ১৯৪৪ সালে এই ধরনের তপশীল-ভুক্ত ব্যাঙ্ক ছিল আশিটি। পরে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ১৯৪৮-৫১ সালের ব্যাঙ্ক-সংকটে ১৮৫টি ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তপশীল ব্যাঙ্কের কার্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪,৬৪৪ ; ১৯৬৩ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ৫,০১২। স্বল্পকালের মধ্যে ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কগুলির প্রসার ও প্রভাব দেশের প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য হলেও যে আশাব্যঞ্জক, তা সহজেই অনুমেয়। তপশীল-ভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির সাম্প্রতিক পরিস্থিতির একটি চিত্র তুলে ধরা যাক্। ১৯৬২ সালে এই ব্যাঙ্কগুলির আমানতের বৃদ্ধি ছিল ২১৬৯৫ কোটি টাকা ; ১৯৬৩ সালে সেই বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় ২০৩৮৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ ১৪·৬% এর স্থলে ১৩·৭%। তবে চলতি আমানতের (demand deposits) চেয়ে মুদ্দতী আমানতের (time deposits) বৃদ্ধি-হার ছিল মন্থর। ১৯৬২ সালের আমানত বৃদ্ধি ছিল ইদানীং কালের মধ্যে ভারতের তপশীল-ভুক্ত ব্যাঙ্কের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা।

ভারতীয় টাকার বাজারের মুকুটমণি হলো ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। এই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রারম্ভে ছিল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। কিন্তু ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ড ও ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্সের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পর বহু বাগ্‌বিস্তারের অবসানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কও রাষ্ট্রায়ত্ত

হলো। তার প্রারম্ভিক মূলধন ছিল ৫ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় পরিচালক-বোর্ডের হাতে ন্যস্ত হলো এর পরিচালন-দায়িত্ব। কেন্দ্রীয় সরকার-নিযুক্ত একজন গভর্নর, তিনজন সহকারী গভর্নর, চারটি স্থানীয় বোর্ড থেকে মনোনীত চারজন পরিচালক, ছয়জন অন্যান্য মনোনীত পরিচালক এবং একজন সরকারী কর্মচারী—এই পনের জন সদস্য নিয়ে কেন্দ্রীয় পরিচালক-বোর্ড। এর রয়েছে দুটি পৃথক্ বিভাগ: এক, নোট প্রচলন বিভাগ ও দুই, ব্যাঙ্কিং বিভাগ। নোট প্রচলনের ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রয়েছে সার্বভৌম ক্ষমতা। তাছাড়া, সরকারের ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ, দেশের ঋণ ও ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার ওপর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষি-ঋণ সরবরাহ ইত্যাদি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যসূচীর অন্তর্গত।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও তার কার্যসূচী

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রধান ত্রুটি হলো, সে আজও ভারতের পুরাতন দেশীয় ব্যাঙ্কারদের তার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে এনে আধুনিক ও প্রাচীন—এই দুই প্রকার ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের মধ্যে সমন্বয় ও সংহতি সাধন করতে পারেনি। তেমনি পারেনি বৈদেশিক বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলিকে তার কঠোর নিয়ন্ত্রণের আওতার মধ্যে আনতে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, দেশীয় মহাজন ও বিদেশী বিনিময়-ব্যাঙ্ক—ভারতীয় টাকার বাজারের এই ত্রিধা-বিভক্তি আর কতোদিন চলবে? মাঝে মাঝে ভারতের ব্যাঙ্কসমূহের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রশ্ন সোচ্চার হয়ে ওঠে। কিন্তু আবার কোন্ অদৃশ্য যাদুমন্ত্র-বলে তা স্তব্ধ হয়ে যায়। ভারতীয় টাকার বাজারে সংহতি ও সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে এবং অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের স্বার্থে ভারতের ব্যাঙ্ক-সমূহের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ আর কোনমতেই বিলম্বিত হওয়া উচিত নয়।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- ভারতের টাকার বাজার ও তাহার সংহতি সাধনের উপায়
- ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়

৪৬. ভারতে বীমা-ব্যবস্থা
Insurance System in India.

প্রবন্ধ-সূত্র ঃ— অবতরণিকা—বীমা-ব্যবস্থার ইতিহাস—ভারতের বীমা-ব্যবস্থার হতাশাময় চিত্র—ভারতীয় বীমা-ব্যবসার রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ও ভারতীয় জীবন-বীমা কর্পোরেশনের জন্ম—ভারতে জীবন-বীমার সম্প্রসারিত রূপ—জীবন-বীমার বৈচিত্র্য—রাষ্ট্রায়ত্তকরণের আওতার বাইরে বীমা-ব্যবস্থা—নানাপ্রকার সুবিধাজনক বীমা-ব্যবস্থা—নানা প্রতিষ্ঠান-কর্মীদের বীমা—উপসংহার।

মানব-জীবনে 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু'। তবু দুঃখ, মৃত্যু ও দৈব-দুর্ঘটনা নিয়ে ঘর বাঁধে মানুষ। বীমা পরিকল্পনা মানব-জীবনের সেই অনিবার্য দুঃখ, মৃত্যু ও দৈব-দুর্ঘটনার ওপর বুলিয়ে দেয় সমবেদনা, সান্ত্বনা ও নিরাপত্তার করস্পর্শ। অন্যান্য বহু ব্যবস্থার মতো বীমা-ব্যবস্থাও ভারতে প্রবর্তিত, বিবর্তিত নয়। এই ব্যবস্থার জন্মভূমি য়ুরোপ।

অবতরণিকা

ভারতে যে আধুনিক-পূর্ব কাল পর্যন্ত বীমা-ব্যবস্থা বিকশিত হয় নি, তার মূলে ছিল ভারতীয় ধর্ম-ভিত্তিক জীবন-দর্শন এবং একান্নবর্তী পরিবার-প্রথা। দুর্বল, অকর্মণ্য ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিবর্গের ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব বহন করতো সমগ্র পরিবার। বিধবার ভরণ-পোষণ, অনাথ মাতৃপিতৃহীনদের ভরণ-পোষণ—সবই হিন্দু আইনের ব্যবস্থাধীন। তাছাড়া ব্যাবিলন, ফিনিসিয়া, গ্রীস ও রোম প্রভৃতি দেশে অতি প্রাচীনকালেও ভবিষ্যতের আপদ-বিপদ সম্বন্ধে পূর্বাহ্লে সতর্কতা অবলম্বন করতো। একজনের ঝুঁকি অন্যান্যেরা 'আত্মীয়' হিসেবে অথবা 'পেশা-বন্ধু' কিংবা 'জাত-ভাই' হিসেবে গ্রহণ করতো। কিন্তু বর্তমান যুগ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের যুগ। তার ঢেউ ভারতের মাটিকেও স্পর্শ করেছে। ফলে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে পড়ছে এবং তার ধ্বংসস্তূপের ওপর 'ব্যক্তি'র অসহায়তা আজ অত্যন্ত প্রকট। যুগধর্মের এই বিশেষ প্রবণতার ধারানুসরণে আধুনিক বীমা-ব্যবস্থা ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে।

সমুদ্র-বীমাই আধুনিক বীমার পথ-প্রদর্শক। চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে ইতালির জেনেভা, পিসা ও ফ্লোরেন্সে সমুদ্র-বীমার বর্তমান মূর্তি সর্বপ্রথম আত্ম-প্রকাশ করে। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ইতালি আর স্পেন সমুদ্রবীমা সম্বন্ধে য়ুরোপের অগ্রবর্তী দেশ। সপ্তদশ শতাব্দীতে হল্যাণ্ড ও ফ্রান্স, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড এবং উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানী সমুদ্র-বীমার আসল সূত্রপাত করে। অগ্নি-বীমা বিলেতে দেখা দেয় ১৬৬৬ সালে লণ্ডনের

বীমা-ব্যবস্থার ইতিহাস

সর্বধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের পর। ভারতে আধুনিক বীমা-ব্যবস্থার প্রবর্তন ব্রিটিশ আমলে। খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্তভাবে এর সূচনা; কিন্তু বর্তমানে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে ধারণ করেছে সংহত রূপ।

য়ুরোপ ও আমেরিকায় ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই বীমাজালে জড়িত; জার্মানীতে তো বীমা আবশ্যিক। বহু ব্যক্তির অল্প অল্প অর্থের সমবায়ে ঐ সব দেশে বীমা-কোম্পানীগুলি প্রচুর পুঁজি সৃষ্টি করে বৃহদায়তন যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। মার্কিন মুলুকে চারটি বড় বীমা কোম্পানীর পুঁজি দেশের সমস্ত ব্যাঙ্কের একত্রিত পুঁজির সমতুল্য। বিলেতে ১৫ কোটি নর-নারীর জন্যে রয়েছে ১১০৯টি বীমা-কোম্পানী এবং তাদের পুঁজির পরিমাণ ৪০,০০০ কোটি টাকা। সেই তুলনায় ভারতে বীমার প্রসার অত্যন্ত নৈরাশ্য-জনক। ভারতের ৪৪ কোটি নর-নারীর জন্যে রাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রাক্কালে বীমা-কোম্পানীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫০। গড়ে প্রত্যেকের ভাগে মাত্র ১২ টাকার বীমা। বর্তমানে সেই গড় উঠেছে ৪০ টাকায়।

ভারতের বীমা-ব্যবস্থার হতাশাময় চিত্র

ভারতে একদিকে বীমা-ব্যবসার অনগ্রসরতা, অন্যদিকে অধিকাংশ বীমা-ব্যবসায়ীর ধূর্ততা—এই দুয়ের টানা-পোড়েনে বীমার ক্ষীণ প্রদীপ-শিখাটি হয়ে পড়ে নির্বাণোন্মুখ। রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পূর্বে দরিদ্র ভারতের দরিদ্র জনসাধারণকে প্রতারিত করে তাদের কষ্টার্জিত অর্থ আত্মসাৎ করার জন্যে অসংখ্য বীমা-কোম্পানী ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছিল। অন্যদিকে বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলি হতভাগ্য ভারতবাসীকে কোনরূপ জানার সুযোগ না দিয়ে স্বদেশে রহস্যজনকভাবে করতো টাকার বিনিয়োগ। এই দুই অসাধুতার বিরুদ্ধে ভারতের জনমত সোচ্চার হয়ে ওঠে। তার ফলশ্রুতিতে, ১৯৫৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ভারতের বীমা-ব্যবসার রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বিঘোষিত হলো এবং ভূমিষ্ঠ হলো ভারতীয় জীবন-বীমা কর্পোরেশন।

ভারতীয় বীমা-ব্যবসার রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ও ভারতীয় জীবন-বীমা কর্পোরেশনের জন্ম

জীবন-বীমা কর্পোরেশন আইনক্রমে সমগ্র ভারতকে পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে: মধ্যাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চল; এবং তাদের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়েছে যথাক্রমে কানপুর, কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও দিল্লীতে। ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত কর্পোরেশনের ৩৬টি বিভাগীয় কার্যালয় এবং ৩৪০টি শাখা কার্যালয়, ১৭৯টি নিম্ন কার্যালয় এবং ১৭৫টি উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। ব্যবস্থাপনার এই নবতম বিন্যাসে সাধারণ মানুষের মনে আশা ও আস্থা দুয়েরই সঞ্চার হয়েছে। এবং জীবন-বীমার গুরুত্ব আজ জনজীবনে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তার ফলে ভারতে

ভারতের জীবন-বীমার সম্প্রসারিত রূপ

বীমা-ব্যবস্থা এখন ক্রম-সম্প্রসারণশীল। ১৯৫৫ সালে যেখানে দেশী-বিদেশী বীমা-কোম্পানীগুলি মাত্র ২৩৮ কোটি টাকার বীমাপত্র বিক্রয় করেছিল, ১৯৬১ সালে সেখানে ৬০৮·৮২ কোটি টাকার বীমাপত্র বিক্রয় করতে পেরেছিল। ১৯৬৩ সালে ৭৪৫·৯৫ কোটি টাকার বীমাপত্র বিক্রী হয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা-ব্যবস্থা কৃষি-অঞ্চল ও শিল্পাঞ্চলের মানুষদের জন্যে প্রসারিত করে দিয়েছে তার আশ্বাসপূর্ণ কর-যুগল। অকূল সংসার-সমুদ্রে সে জীবনকে সহায়-সম্বলহীনভাবে চরম বিনষ্টির হাতে পরিত্যাগ করবে না। সকল ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে নিঃসহায় জীবনকে সে নিরাপদ উপকূলে পৌঁছিয়ে দেবে, এই তার প্রতিশ্রুতি। তাই প্রচলিত হয়েছে বার্ধক্য-বীমা, যৌথ-বীমা, জনতা-বীমা পরিকল্পনা, বেতন সঞ্চয় পরিকল্পনা ইত্যাদি। তাছাড়া প্রবর্তিত হয়েছে কর্মচারী রাজ্য বীমা কর্পোরেশন (Employees' State Insurance Corporation)। যে শিল্পায়তনে কুড়ি জন কিংবা তার অধিক কর্মচারী নিযুক্ত, তা এই পরিকল্পনার আওতায় আসবে। শ্রমিক, মালিক ও সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই পরিকল্পনা ক্রমাগত সম্প্রসারণশীল। এতে রুগ্ন পাবে চিকিৎসার সুযোগ, পঙ্গু পাবে জীবিকার সংস্থান, অনাথ পাবে অর্থ নৈতিক নিরাপত্তার আশ্বাস এবং বিকলাঙ্গ পাবে উপযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ। যে দেশে শিল্পে রয়েছে অনগ্রসরতা এবং যে দেশে মালিক-শ্রমিকের সম্পর্ক মধুর নয়, সেখানে এই পরিকল্পনার উপযোগিতা যে অসীম, তা সহজেই অনুমেয়।

জীবন-বীমার বৈচিত্র্য

জীবন-বীমা ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত হয়েছে; কিন্তু এখনও তার বাইরে রয়েছে অগ্নি বীমা, নৌ-বীমা, দুর্ঘটনা-বীমা ইত্যাদি। রাষ্ট্রায়ত্তকরণের আওতার মধ্যে তাদের আনা এখনও সম্ভব হয় নি। দেশী কোম্পানীগুলির তুলনায় বিদেশী কোম্পানীগুলির প্রতিপত্তি সমধিক এবং ব্যবস্থাপনাও বেশ লাভজনক। এরূপ ক্ষেত্রে দেশী কোম্পানীগুলিকে সাহায্যের উদার প্রতিশ্রুতি নিয়ে সরকারের অগ্রসর হওয়া উচিত। অন্যদিকে বিদেশী কোম্পানীগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করবার কোন ইচ্ছা বা পরিকল্পনা সরকারের নেই বলে মনে হয়। আনন্দের কথা, ১৯৫৬ সালে ভারতে দশকোটি টাকার অনুমোদিত মূলধন নিয়ে পুনর্বীমা কর্পোরেশন প্রচুর সম্ভাবনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যাত্রা সুরু করেছে।

রাষ্ট্রায়ত্তকরণের আওতার বাহিরে বীমা-ব্যবসা

মুনাফা-সহ ও মুনাফা-বিহীন—উভয় প্রকার বীমাই প্রচলিত আছে। আজীবন বীমা বা নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত দেয় বীমায় বীমাকারীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বীমাপত্রে উল্লিখিত ব্যক্তি কিংবা তার আইনসম্মত উত্তরাধিকারী মুনাফা-সহ বীমার টাকা

লাভ করেন। বীমাকারী মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক, বার্ষিক হিসাবে তাঁর দেয় চাঁদা জমা দিতে পারেন। বেতন সঞ্চয় পরিকল্পনায় মাসিক বেতন থেকেই চাঁদা কাটা যায়। তাছাড়া রয়েছে বিবাহবীমা, শিক্ষাবীমা, যুক্তবীমা ইত্যাদি নানা সুবিধাজনক বীমা-ব্যবস্থা। বীমাকারী এখন চাঁদা দিতে অক্ষম হয়ে পড়লে তামাদি (lapsed) বীমাপত্রের পুনরুজ্জীবন সম্ভব; অন্যদিকে প্রত্যর্পণ মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ইদানীং আবার প্রত্যর্পণ মূল্য লাভ করবার ক্ষমতা জন্মালে ৯০ শতাংশ টাকা স্বল্পহার সুদে ঋণ গ্রহণ করাও চলে। বাসস্থান নির্মাণে সাহায্য করবার জন্যে জীবনবীমা কর্পোরেশন শহরাঞ্চলে 'নিজের বাড়ী নিজে বানাও' পরিকল্পনা চালু করেছেন।

নানাপ্রকার সুবিধা-জনক বামী-ব্যবস্থা

ভারতের ডাক ও তার বিভাগের এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের নিজস্ব বীমা-ব্যবস্থা রয়েছে। প্রায় তের-চৌদ্দ লক্ষ কর্মী এর সুবিধা লাভ করে। উক্ত প্রতিষ্ঠান-সমূহের যে কোন অসামরিক কর্মী ৩০ হাজার টাকার এবং সামরিক কর্মী ২০ হাজার টাকার বীমা করতে পারেন। বীমা-ব্যবস্থার জনপ্রিয়তা-সৃষ্টির জন্যে বীমার চাঁদার টাকাকে আয়করমুক্ত রাখার রীতি প্রচলিত আছে।

নানা প্রতিষ্ঠান-কর্মীদের বীমা

রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পর ভারতীয় বীমা-ব্যবস্থার নবযুগ সূচিত হয়েছে। জাতির সেবার মহৎ প্রেরণা নিয়ে আজ জীবন-বীমা কর্পোরেশন এগিয়ে এসেছে। তার হাতে রয়েছে মানুষের ভবিষ্যৎ ভাগ্য-রচনার দায়িত্ব, রয়েছে ব্যধি-নিরাময় ও সুখী-সন্তুষ্ট জীবন গঠনের পরম আশ্বাস। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে যে ব্যয়বাহুল্য হয়, জাতির সেবা ও অগণিত আর্ত অসহায় মানুষের মুখের দিকে চেয়ে তা সংক্ষেপ করা উচিত। তাহলে বীমাপিছু চাঁদার হার হ্রাস পাবে এবং বীমা-ব্যবস্থা লাভ করবে নিরঙ্কুশ জনপ্রিয়তা।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- **ভারতীয় বীমা-ব্যবস্থার সেকাল ও একাল**

৪৭. রাষ্ট্রসংঘ: বিশ্বশান্তি ও বাণিজ্য
U. N. O.: World Peace and Commerce

প্রবন্ধ-সূত্র:—অবতরণিকা—সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ—শান্তি-স্থাপনে রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা—নানা অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কর্ম—রাষ্ট্র-সংঘের নানা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দপ্তর: ECAFE, FAO, ILO, UNESCO, WHO, UNICEF, GATT, UNTAP, IMP, IBRD, IDA—দুর্বল রাষ্ট্রগুলির বাণিজ্যিক অভ্যুত্থান—বিশ্ব-বাণিজ্যে যুগান্তর—উপসংহার।

যুদ্ধ চিরকালই মানবজাতির ভাগ্যে বহন করে এনেছে রূঢ়তম অভিসম্পাত। তবু যুগে যুগে পৃথিবীতে কতো যুদ্ধই না সংঘটিত হলো। কতো উর্বর শস্যপ্রান্তর, কতো সমৃদ্ধ শিল্প-নগরী, কতো সম্ভাবনাপূর্ণ জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। অন্তরের সমর-তৃষ্ণার চরিতার্থতার জন্যে মানুষ সংগ্রাম করেছে। নিজের হাতে সাজানো পৃথিবীকে নির্মমভাবে ধ্বংস করার জন্যে পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠেছে। আবার যুদ্ধের অবসানে অনুশোচনার চোখের জলে, আত্মধিক্কারের প্রবল তাড়নায় প্রার্থনা করেছে 'বিধাতার কন্যা-ললাটিকা' শান্তির শুভাগমনকে। তেমনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিশ্বব্যাপী ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হলো রাষ্ট্রসংঘ। আবার ক্ষত বিক্ষত পৃথিবীর বুকে শান্তির প্রদীপশিখা জ্বলে উঠলো। লীগ অব্ নেশন্স্ বিশ্বের যুদ্ধবাজদের সমর-তৃষ্ণাকে যে প্রতিরোধ করতে পারে নি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তা প্রমাণিত করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আণবিক মারণাস্ত্রের প্রয়োগ এবং তার প্রতিক্রিয়ায় হিরোসিমা-নাগাসাকির মৃত্যু-যন্ত্রণা পৃথিবীর যুদ্ধবাজদের মনে শুভবুদ্ধির উদ্বোধন ঘটিয়েছে। ১৯৪৫ সালে পৃথিবীর ৮২-টি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হলো আবার এক বিশ্ব-সংস্থা। রাষ্ট্রপুঞ্জ তার নাম।

অবতরণিকা

সূচনা-লগ্নে ৮২-টি সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতি নিয়ে এই শান্তি-সংস্থার যাত্রা সুরু। বর্তমানে তার সদস্য-সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এশিয়া-আফ্রিকার সদ্য-ভূমিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলি রাষ্ট্রসংঘের শান্তি ও নিরাপত্তার পবিত্র পতাকার নীচে সমবেত হচ্ছে। তারা সকলেই সাধারণ পরিষদের সদস্য। বিশ্বের যে-কোন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার অধিকার তাদের আছে। তবে কোন সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করবার নৈতিক ক্ষমতা ছাড়া অন্য কোন ক্ষমতা সাধারণ পরিষদের নেই। তবে কোন রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য কোন রাষ্ট্র আক্রান্ত হলে সে নিরাপত্তা পরিষদে আবেদন করার যোগ্য। নিরাপত্তা

সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ

পরিষদ এগারোটি সদস্য-রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। আমেরিকা, রাশিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও চীন—এই পাঁচটি সদস্য-রাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য। অবশিষ্ট ছয়জন সদস্য দু'বছরের জন্যে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে থাকে। যে পাঁচটি বৃহৎ সদস্য-রাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য, তাদের হাতে আছে 'ভেটো' বা নাকচ করবার ক্ষমতা। কোন সিদ্ধান্ত জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হলে এই ক্ষমতার জোরে তা নাকচ করে দেওয়া যায়। পৃথিবীর কোথাও সংঘাত সূচিত হলে নিরাপত্তা পরিষদ তার শান্তিপূর্ণ সমাধানের চেষ্টা করবে এবং প্রয়োজন হলে আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেও পৃথিবীর নানাস্থানে বিরোধের আগুন জ্বলে উঠেছে। সেই সমস্ত বিরোধ রক্তাক্ত সংঘর্ষে পরিণত হয়েছে অচিরকালের মধ্যেই। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ তার সতর্ক কর্মতৎপরতায় সেই বিরোধাগ্নিকে নির্বাপিত করেছে কিংবা অঞ্চল বিশেষে সীমাবদ্ধ রেখে পৃথিবীকে বিশ্বযুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করেছে। কঙ্গো ও কোরিয়ার যুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রসংঘ সেখানে 'শান্তির ললিত বাণী' শোনাতে পেরেছে। ইঙ্গ-ফরাসীর বোমা-বর্ষণের হাত থেকে মিশরকে, আমেরিকান সৈন্য বাহিনীর আক্রমণ থেকে লেবাননকে রক্ষা করেছে রাষ্ট্রসংঘ। অবশ্য কাশ্মীর সমস্যার সমাধান এখনো রাষ্ট্রসংঘ করে উঠতে পারে নি। কাশ্মীর সমস্যা এখনো রাষ্ট্রসংঘের কাছে একটা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে রয়েছে।

শান্তি-স্থাপনে রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা

কেবল শান্তির মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যেই রাষ্ট্রসংঘের কর্ম-প্রয়াস নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। স্থায়ী শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্যে সে সুরু করেছে তার নীরব সাধনা। পৃথিবীর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূলে যে কেবল রাজনৈতিক বিরোধিতাই একমাত্র কারণ, তা নয়, অর্থ নৈতিক বৈষম্যও সেখানে একটি বড়ো কারণ। কাজেই পৃথিবীর সমৃদ্ধ দেশগুলির পাশে যে সব অনুন্নত দেশ রয়েছে, তাদের অর্থ নৈতিক দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে শক্তিশালী দেশগুলি তাদের কুক্ষিগত করবার চেষ্টা করে। ফলে দুর্বল, অক্ষম রাষ্ট্রগুলিকে কেন্দ্র করে বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে বাধে সংঘাত এবং সেই সংঘাতের আগুন ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময়।

নানা অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকর্ম

অনুন্নত জাতিগুলিকে তাদের আপন ভাগ্য জয় করবার শক্তিদানের জন্যে তাদের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী জ্ঞান বিতরণ করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জেনেভায় ৮৭টি রাষ্ট্রের একটি প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

রাষ্ট্রসংঘের সেই বিজ্ঞান ও কারিগরী সম্মেলনে অনুন্নত দেশগুলির প্রাকৃতিক সম্পদ ও তার শোষণের জরীপ করে, মূলধন সংগঠনের ব্যবস্থা করে এবং মানব সম্পদের উন্নতি বিধান করে বৈষয়িক সমৃদ্ধির পথ সুগম করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাছাড়া আছে এশিয়া ও দূর-প্রাচ্যের অর্থনৈতিক কমিশন (ECAFE), খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), রাষ্ট্রসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), শিশুদের জন্যে রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক জরুরী তহবিল (UNICEF), শুল্ক ও বাণিজ্যের সাধারণ চুক্তি (GATT), রাষ্ট্রসংঘ কারিগরী সাহায্য কর্মসূচী (UNTAP), আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMP), পুনর্গঠন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (IBRD), আন্তজাতিক উন্নয়ন সমিতি (IDA) ইত্যাদি অর্থনৈতিক সংস্থা। রাষ্ট্রসংঘের এই সব প্রতিষ্ঠান মানবজাতির সেবায় রচনা করেছে বহু মূল্যবান অর্ঘ্য। কৃষি ও শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী উৎকর্ষের মাধ্যমে কৃষি ও শিল্পের মান উন্নয়ন, শ্রমিক কল্যাণ, শিক্ষা বিস্তার, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিকাশ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ইত্যাদি বহু মানব-কল্যাণ-মূলক কাজে রাষ্ট্রসংঘ পৃথিবীর সকল জাতির উদ্দেশ্যে প্রসারিত করে দিয়েছে তার প্রীতি ও শুভেচ্ছার উদার দাক্ষিণ্য।

রাষ্ট্রসংঘের নানা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দপ্তর : ECAFE, FAO, ILO, UNESCO, WHO, UNICEF, GATT, UNTAP, IMP, IBRD, IDA.

এতকাল বৃহৎ জাতিগুলি ক্ষুদ্র জাতিগুলিকে শোষণ করে এসেছে। নিজেরা হয়ে উঠেছে অসীম শক্তিশালী আর পৃথিবীর সেই হতভাগ্য দরিদ্র জাতিগুলিকে দুর্বল, পঙ্গু ও শক্তিহীন করে রেখে যুদ্ধের সম্ভাবনাকে করে তুলেছে অনিবার্য। আজ রাষ্ট্রসংঘ নানা বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী শিক্ষাদানের মাধ্যমে, নানা অর্থনৈতিক সাহায্যদানের মাধ্যমে সেই দুর্বল শক্তিহীন জাতিগুলির উন্নয়নের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য একদিন ধনী রাষ্ট্রগুলির কুক্ষিগত ছিল। বাণিজ্য-লক্ষ্মী বাঁধা ছিল তাদের ঘরে। আজ রাষ্ট্রসংঘ সেই বন্দিনী বাণিজ্য-লক্ষ্মীকে মুক্ত করে দিয়েছে। ফলে যারা দু'দশক আগে ধনী রাষ্ট্রগুলির পদানত ছিল, যাদের বাণিজ্য ছিল ধনী রাষ্ট্রদের অর্থাগমের প্রধান উৎস, আজ তারা অর্থনৈতিক সম্ভাবনার বিপুল আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জাগছে। ধনী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যে তারা শুধু অগ্রসরই হচ্ছে না, তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়ও অবতীর্ণ হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এশিয়া ও দূর-প্রাচ্যের দীর্ঘ শোষিত দেশগুলির কথা। তাদের অর্থনৈতিক জাগরণের মধ্য দিয়ে ভাবীকালের বাণিজ্য-সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যাচ্ছে।

দুর্বল রাষ্ট্রগুলির বাণিজ্যিক অভ্যুত্থান

বিশ্ব-বাণিজ্যের বাধা অপসারণেও রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা অনবদ্য। পৃথিবীর দুই শক্তি-সীমান্তের মাঝখানে বাণিজ্যিক লেনদেনের মধ্যে ছিল এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। রাষ্ট্রসংঘের প্রয়াসে আজ সেই প্রাচীর ভেঙে ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে দুই শক্তি-সীমান্ত তথা বাণিজ্য-সীমান্তের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন সুরু হচ্ছে। বহুদিন পরে বিশ্ব-বাণিজ্যের সেই জমাট-বাঁধা বরফ গলতে আরম্ভ করেছে, এ বড়ো আশার কথা। ফলে আজ বিশ্ব-বাণিজ্যে ঘনিয়ে এসেছে অভূতপূর্ব যুগান্তর।

বিশ্ব-বাণিজ্যে যুগান্তর

তথাপি আজ রাষ্ট্রসংঘের সাফল্য নিয়ে দেখা দিয়েছে ঘোরতর সংশয়, মানবজাতির চরম জিজ্ঞাসা। সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ ও ধনিকতন্ত্র মানবসভ্যতার বিরুদ্ধে আজ গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কিংবা তার পরবর্তী এই দীর্ঘকালের ইতিহাসেও সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ ও ধনিকতন্ত্রের কবরভূমি রচিত হয়নি। এখনো দেশে দেশে সমাজতন্ত্রের সূর্যোদয়ের বহু বিলম্ব। রাষ্ট্রসংঘ প্রাণান্তকর প্রয়াসে যুদ্ধের সেই শেষ কণ্টকগুলিকে উৎপাটিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। অসহায়ভাবে নিষ্ফলতার পাথরে মাথা কুটে কি রাষ্ট্রসংঘের সকল শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যাবে? তাহলে—

উপসংহার

"স্বর্গ কি হবে না কেনা
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
জগতের এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?"

এই অমারাত্রির শেষ কোথায়? যুদ্ধ-সম্ভাবনা ও বাণিজ্যাবরোধের দিন কবে শেষ হবে?

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- ইউ. এন. ও., ক. বি. '৫৯
- আন্তর্জাতিক শান্তি-প্রতিষ্ঠায় বাণিজ্যের দান, ক. বি. '৬৪

৪৮. ভারতের ঘাট্‌তি-ব্যয়
Deficit Financing in India.

প্রবন্ধ-সূত্র :— অবতরণিকা—ঘাট্‌তি-ব্যয় ও স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতি—পরিকল্পনাশ্রয় ও ঘাট্‌তি-ব্যয়—ঘাট্‌তি-ব্যয়েব সুবিধা : এক, উৎপাদন বৃদ্ধি, দুই, নব নব সুযোগ সৃষ্টি, তিন প্রতিক্রিয়াহীন অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য—ঘাট্‌তি-ব্যয়ের সমর্থক গোষ্ঠী—ঘাট্‌তি-ব্যয়ের বিপদ : মুদ্রাস্ফীতি—ঘাট্‌তি-ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা—উপসংহার।

অবতরণিকা

দু শতাব্দীর পরাধীনতার অবসানে জাতির মরাগাঙে যে বান এসেছে, তাতে বৈষয়িক উন্নতির জাহাজখানিকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতকাল ভারতের সম্পদ বিদেশীর ঘর সাজাতে ব্যয়িত হয়ে এসেছে। যখন ইংরেজ 'ইতিহাসের অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট' রূপে ভারত ত্যাগ করে চলে গেল, তখন নিজের ঘর সাজাতে বসে ভারত দেখলো—তার ভাণ্ডার রিক্ত, তার শিল্প-কৃষি-বাণিজ্য একেবারে সর্বস্বান্ত। এই নিদারুণ নৈরাশ্যের মাঝখানে বিশ্বাসের ছবি ফুটিয়ে তোলার কাজে হাত লাগালেন জাতীয় সরকার। কিন্তু দু শতাব্দীর অচল জগদ্দল পাষাণ-ভার দেশের বুকের ওপর থেকে নামিয়ে সমগ্র দেশব্যাপী একটা জঙ্গমতার সাড়া জাগিয়ে তুলতে যে পুঁজির দরকার, ভারতের হাতে তা নেই। অথচ ভারতের বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন করতেই হবে। দেশ-গঠনের কাজে যত সাধ আছে, তত সাধ্য নেই। দেশের চিরাচরিত অর্থ-সংগ্রহের সূত্রগুলিকে হাতে নিয়ে হিসেব করে দেখা হলো। কিন্তু তাতেও শূন্যতার বিরাট্ গহ্বর পূর্ণ হলো না। সেই আশা-নিরাশার মাঝে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও জাতীয় সরকারকে গৃহীত পরিকল্পনার রূপায়ণে বরণ করে নিতে হলো ঘাট্‌তি-ব্যয়ের দুঃসাহসিক নীতিকে।

ঘাট্‌তি-ব্যয় ও স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতি

ঘাট্‌তি-ব্যয় হলো দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামে স্বল্পোন্নত দেশগুলির সর্বশেষ ব্রহ্মাস্ত্র। কর-রাজস্ব, সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের উদ্‌বৃত্ত, জনগণের কাছ থেকে গৃহীত ঋণ, বিভিন্ন আমানত ও তহবিল অথবা বৈদেশিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত এবং অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত মোট সরকারী আয়ের চেয়ে সরকারী ব্যয়ের আধিক্যকে বলা হয় ঘাট্‌তি-ব্যয়। ঘাট্‌তি-ব্যয়ের অর্থ সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ সংগ্রহ করেন। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অতিরিক্ত পত্রমুদ্রা (note) ছাপিয়ে সরকারের প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করে থাকে। সোভিয়েট

রাশিয়াও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর অর্থনীতির পুনর্গঠনে অনুরূপভাবে পত্রমুদ্রার মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ লেনদেন সীমাবদ্ধ রেখে দেশের স্বর্ণের বিনিময়ে বিদেশ থেকে যন্ত্র-সম্ভার ক্রয় করে দ্রুত শিল্পায়নের পথ প্রস্তুত করেছিল। বাস্তবিকই, স্বল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনীতিক পুনর্বিন্যাস ও দ্রুত শিল্পায়নের কার্যসূচী হাতে নিয়ে কেবলমাত্র রাষ্ট্রের ধরাবাঁধা আয়ের ওপর নির্ভর করে বসে থাকা চলে না। তাদের প্রয়োজন হয় ব্যয়-সঙ্কুল কর্ম-পদ্ধতির প্রযোজনা। ভারতেও বর্তমানের মাটিতে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনার বীজ বপন করবার জন্যে সরকারকে ঘাটতি-ব্যয়ের ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে দৃঢ় পদ-বিক্ষেপে।

ভারত পরিকল্পিত অর্থনীতির সংকটাকীর্ণ পথে চলতে গিয়ে ঘাটতি-ব্যয়ের সাহায্য গ্রহণ করেছে। প্রথম পরিকল্পনায় প্রকৃত ঘাটতি-ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৩৩৩ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৯৪৮ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঘাটতি-ব্যয়ের পরিমাণ ছিল সর্বাধিক। ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতির দৈত্য স্ফীত হয়ে উঠলো ভয়ানক মূর্তিতে। তাই তৃতীয় পরিকল্পনায় মুদ্রাস্ফীতি ও তার আনুষঙ্গিক প্রতিক্রিয়া-সমূহের গলায় বল্গা পরাবার জন্যে ঘাটতি-ব্যয়ের পরিমাণকে নামিয়ে আনা হলো ৫৫০ কোটি টাকায়। ঘাটতি-ব্যয়ের পরিমাণকে সংযত করে অন্যান্য সূত্র থেকে অর্থ-সংগ্রহের দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে তৃতীয় পরিকল্পনায়। চতুর্থ পরিকল্পনায় ঘাটতি-ব্যয়কে আরো নামিয়ে ৫০০ কোটি টাকায় আনা হবে বলে সংবাদ প্রকাশ।

পরিকল্পনাত্রয় ও ঘাটতি-ব্যয়

অর্থনীতিতে ঘাটতি-ব্যয় হলো 'আগুন নিয়ে খেলা'। যে আগুন আলো জেলে ঘরের অন্ধকার দূরীভূত করতে পারে, সেই আগুনই আবার গৃহস্থের সামান্যতম অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে ঘটাতে পারে ভয়াবহ গৃহদাহ। কাজেই জাতীয় অর্থনীতিতে যদি ঘাটতি-ব্যয়কে প্রশ্রয় দান করতে হয়, তবে অত্যন্ত দৃঢ়-হাতে ধরে থাকতে হবে তার নিয়ন্ত্রণ-রজ্জু। তাহলে যে সুবিধাগুলি পাওয়া যাবে, তা হলো: এক, উন্নয়ন-প্রকল্পের সুষ্ঠু রূপায়ণে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ক্রমবর্ধিষ্ণু উৎপাদনের পটভূমিকায় অর্থের বাজারে টাকার যোগান বৃদ্ধি পেলেও কোন প্রতিক্রিয়া অনুভূত হবে না। দুই, এতকাল আর্থিক ক্ষেত্র ছিল গোষ্পদের মতো; আজ সেখানে টাকার স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ সৃষ্টি করে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সঞ্চার করা হয়েছে অভূতপূর্ব কর্ম-চাঞ্চল্য। ভারতের অর্থনীতির বন্ধ্যা প্রান্তর আজ শস্য-শ্যামল হয়ে উঠেছে অর্থ-সরবরাহের প্রাচুর্যে। তিন, পরিকল্পিত উন্নয়নের ক্রমাভিব্যক্তিতে টাকার যোগানবৃদ্ধি সহনীয় মনে হবে। একটি পরিকল্পনার কর্মোদ্যোগে হবে সুযোগ সৃষ্টি; পরবর্তী পরিকল্পনায় হবে তার সদ্ব্যবহার। তাতে কোন প্রতিক্রিয়া জাতীয়

ঘাটতি-ব্যয়ের সুবিধা: এক, উৎপাদন-বৃদ্ধি, দুই, নব নব সুযোগ সৃষ্টি, তিন, প্রতিক্রিয়াহীন অর্থ নৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য

অর্থনীতির ওপর কালোছায়া বিস্তার করতে পারে না। অধিকন্তু দেশের ভাগ্যে উদিত হয় অর্থ নৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও বৈষয়িক সচ্ছলতা।

ঘাট্‌তি-ব্যয়ের দৃঢ় সমর্থক-গোষ্ঠী হলেন লর্ড কেইন্‌স্‌ প্রমুখ আধুনিক অর্থশাস্ত্রীবৃন্দ। তাঁদের মতে, জাতীয় অর্থনীতির সকল সম্ভাবনাকে রূপায়িত করে তোলার জন্যে ঘাট্‌তি-ব্যয়ের ঝুঁকি নিতে হবে, অসাধ্য সাধনের মন্ত্রে নিতে হবে দীক্ষা। নইলে জাতীয় আয়-বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন —যা সকল পরিকল্পনার মূল কথা, তার রূপায়ণ থেকে যাবে সুদূরপরাহত; স্বল্পোন্নত দেশের উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ রচনা কোনদিনও সম্ভব হয়ে উঠবে না এবং দেশের দারিদ্র্য-মুক্তি কোনদিনই সফল হবে না।

ঘাট্‌তি-ব্যয়ের সমর্থক-গোষ্ঠী

ঘাট্‌তি-ব্যয়ের ঘনায়মান বিপদের প্রতি যিনি প্রথমে অঙ্গুলি সংকেত করেছিলেন, তিনি প্রখ্যাত আধুনিক অর্থশাস্ত্রী অধ্যাপক ক্যাল্‌ডোর। তাঁর মতে, ভারতের মতো স্বল্পোন্নত দেশে ঘাট্‌তি-ব্যয়ের সুবিধার পাশাপাশি রয়েছে বিপদের সমূহ সম্ভাবনা। বিশেষতঃ ভারতের মতো স্বল্পোন্নত দেশে, যেখানে শ্রমদক্ষতার একান্ত অভাব, যেখানে উৎপাদনের মৌলিক শিল্পপ্রয়াস নিতান্তই অনগ্রসর, সেখানে ঘাট্‌তি-ব্যয় বিপজ্জনক। ঘাট্‌তি-ব্যয়ের অনুগ্রহে টাকার বাজার যখন স্ফীত হয়ে ওঠে, তখন সেই টাকাকে কাজে লাগাবার মতো পর্যাপ্ত পরিমাণ সুযোগ সৃষ্টি হওয়া চাই। তার অর্থ হলো, কারিগরী দক্ষতা-বৃদ্ধি ও মূলধন-দ্রব্য উৎপাদন-প্রযাসের সাফল্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন। নইলে ভারতের মতো স্বল্পোন্নত দেশে মুদ্রাস্ফীতির দৌরাত্ম্য অত্যন্ত প্রকটরূপে দেখা দেবে। ভারতে দীর্ঘকালের অবহেলায় নেই শ্রম-নৈপুণ্য; মূলধন-দ্রব্য উৎপাদন-প্রয়াসও সীমাবদ্ধ। কাজেই যা হবার তাই হয়েছে। ভারতে ঘাট্‌তি-ব্যয়ের অনিবার্য পরিণামরূপে দেখা দিয়েছে মুদ্রাস্ফীতি এবং তার প্রবল প্রতিক্রিয়ায় এসেছে পণ্যমূল্য-বৃদ্ধি। অর্থাৎ, টাকার যোগান যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই হারে উৎপাদন-বৃদ্ধি হয়নি। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে চোরাকারবার, মজুতদারী ইত্যাদি দুর্নীতি রাতের অন্ধকারে মাথা চাড়া দিয়ে জেগে ওঠে। দেশ দাঁড়ায় চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি। এমনকি, গণ-বিক্ষোভে ফেটে পড়তে পারে সমগ্র দেশ।

ঘাট্‌তি-ব্যয়ের বিপদ: মুদ্রাস্ফীতি

এরূপ পরিস্থিতিতে গণ-জীবনের স্বার্থে কতকগুলি নিয়ন্ত্রণ-মূলক ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া উচিত: এক, দেশের টাকার বাজারের ওপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ বিস্তৃত হওয়া উচিত। যাতে ব্যাঙ্ক-ঋণ ক্রমবর্ধিষ্ণু না হয়, যাতে ফট্‌কা কারবার ইত্যাদি অনুৎপাদক কাজে ব্যাঙ্ক-ঋণ আত্যন্তিক মাত্রায় ব্যবহৃত না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। দুই, দেশের প্রয়োজনমতো খাদ্য-শস্য আমদানি করে এবং

নিত্য-ব্যবহার্য সামগ্রী জনগণের কাছে সহজলভ্য করে জীবন-যাত্রার ব্যয়কে তাদের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। তিন, অতিরিক্ত মুনাফা বা আকস্মিক লাভকে সংযত করবার জন্যে এবং অবাঞ্ছিত ভোগবাসনাকে অবনমিত করবার জন্যে সরকারকে তৎপর হতে হবে। মুদ্রাস্ফীতি ও পণ্যমূল্য-বৃদ্ধির গতিকে আয়ত্তে আনবার জন্যে বণ্টন-ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ও নিয়ন্ত্রণ-প্রথার পুনঃপ্রবর্তনে উদ্যোগী হতে হবে।

ঘাটতি-ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা

আসল কথা হলো, ঘাটতি-ব্যয় নীতিকে স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতির পুনর্গঠনে ব্যবহার করা যেতে পারে; কিন্তু সর্ত ও সতর্কতা-সাপেক্ষে। যদি দেশে খাদ্য-পরিস্থিতির সচ্ছলতা বিধান করে জীবন-সংকটের তীব্রতা হ্রাস করা যায় এবং শ্রম-নৈপুণ্য সঞ্চারিত করে দেশের উৎপাদন-গতিতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা যায়, তাহলে ঘাটতি-ব্যয় অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদ হয়ে উঠতে পারে। যেখানে তা হয় না, সেখানে সরকারকে চিন্তা করা উচিত যে, সাধারণ মানুষের সহনশীলতার একটা সীমা আছে এবং অনাগত ভবিষ্যতের সুখ-সমৃদ্ধির 'আশার ছলনে ভুলি'য়ে তাদের বর্তমানকে কেড়ে নিয়ে তাদের দুঃসহ দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে ঠেলে দিলে তারা গণ-বিদ্রোহের আকারে এক সময় ফেটে পড়তে পারে। কাজেই, শান্তি ও শৃঙ্খলা-রক্ষার খাতিরে সরকারকে ঘাটতি-ব্যয়ের সর্বনাশা প্রতিক্রিয়া-সমূহকে সংযত করবার জন্যে বলিষ্ঠ পদবিক্ষেপে অগ্রসর হতে হবে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- মুদ্রাস্ফীতির কারণ ও পরিণাম
- মুদ্রাস্ফীতি ও খুচরা ব্যবসা, ক. বি. '৬৩
- ঘাটতি-ব্যয়ের সুবিধা ও বিপদ, ক. বি. '৫৩

৪৯. ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা-সংকট
Crisis of India's Foreign Exchange.

প্রবন্ধ-সূত্র :—অবতরণিকা—ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য : ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে—ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য : ব্রিটিশ রাজত্বে—ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য : স্বাধীনতা লাভের পর—নব ভারতের বাণিজ্য-চুক্তি—সাম্প্রতিক বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি—প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত—১৯৫০-১৯৬৪—ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা-সংকট : প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনা—কারণানুসন্ধান—রপ্তানি-বৃদ্ধি ও প্রসার-প্রয়াস—উপসংহার।

অবতরণিকা

অতি প্রাচীনকালেই ভারত বৈদেশিক বাণিজ্যে লাভ করেছিল আন্তর্জাতিক খ্যাতি। স্থলপথ ও জলপথ—উভয় পথেই চলতো তার বহির্বাণিজ্য। স্থলপথে য়ুরোপের সঙ্গেও স্থাপিত ছিল তার বাণিজ্যিক সম্পর্ক। সম্ভবতঃ সে বাণিজ্য চলতো আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়-পথরেখা ধরে আরবীয় ও ভেনিসীয় বণিকদের মধ্যস্থতায়। জলপথে তার যে বাণিজ্য চলতো, তা চলতো চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে। ভারতের কৃষকেরা এ দেশের উর্বর মৃত্তিকা থেকে ফলিয়ে তুলতো সোনার ফসল, যোগান দিত কুটির-শিল্পের উৎকৃষ্ট কাঁচামাল। শিল্পীরা তাদের প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর মুদ্রিত করে তৈরী করতো মূল্যবান পণ্য-সামগ্রী। এবং ধনপতি, চাঁদ সদাগর, বিহারী দত্ত ও শ্রীমন্ত সদাগরের দল তাই দিয়ে সাজাতো তাদের মধুকর-সপ্তডিঙা। পৃথিবীর বিলাসী জাতিরা ভারতের সেই পণ্য-সামগ্রীর পথ চেয়ে বসে থাকতো হাতে কড়ি নিয়ে, ভারতের পণ্যসামগ্রী বিদেশের বাজারে বিক্রী হতো অতি উচ্চ-মূল্যে। সে ছিল ভারতের বহির্বাণিজ্যের স্বর্ণযুগ। অতীতের দিগন্তরালে সে যুগ অস্তমিত হয়েছে।

ওদিকে ভারতীয় পণ্যের আকর্ষণে প্রলুব্ধ হয়ে বিশ্বের শক্তিমদমত্ত জাতিরা চাইলো ভারতের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে। ভারত কোনদিন শক্তি-চর্চা করেনি, সে করেছে শিল্প-চর্চা, সৌন্দর্য-চর্চা। তাই ভারত পরাজিত হলো সেই শক্তি-মদমত্ত জাতিদের হাতে, তার শিল্প চর্চা ধ্বংস হলো শিল্প-বিপ্লবের আশীর্বাদ-পুষ্ট বিদেশীদের আক্রমণে। তার বৈদেশিক বাণিজ্যের গৌরবময় অধ্যায়ের অবসান হলো।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য : ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে

ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের প্রারম্ভিক পর্বে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব সম্পূর্ণ

হয়নি। তখন তাই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারত থেকে ইংলণ্ডে বস্ত্র-শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার রপ্তানিকে উৎসাহিত করেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব সম্পূর্ণতা লাভ করেছে এবং ইংরেজ জাতি নানা উপায়ে ভারতের কুটির-শিল্পজাত বস্ত্রের উৎপাদন বিনষ্ট করে এদেশ থেকে ইংলণ্ডে কাঁচামাল রপ্তানিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য : ব্রিটিশ রাজত্বে

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল থেকেই ইংরেজ জাতি ভারতকে কৃষি-প্রধান এবং কৃষিজ ও খনিজ পণ্যের কাঁচামাল-রপ্তানিকারক দেশে পরিণত করবার চক্রান্ত-জাল বিস্তৃত করে। ইতিমধ্যে ১৯০৫ সাল থেকে স্বদেশী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশী পণ্য বর্জন ও স্বদেশী শিল্পোদ্যোগের অনুকূল মনোভাব গড়ে ওঠে। তার ফলে প্রথম মহাযুদ্ধের সুযোগে বর্ধিষ্ণু হয়ে উঠলো ভারতের বহির্বাণিজ্য। আবার ১৯২২-২৩ সাল থেকে প্রভেদাত্মক সংরক্ষণের প্রসাদে ভারতের নবজাত শিল্পগুলি বিদেশী প্রতিযোগিতার সমকক্ষতা অর্জন করে। ভারতের বস্ত্রশিল্প এই সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করে এবং নিকট ও দূর-প্রাচ্যের বাজারে বস্ত্র রপ্তানি করতে সমর্থ হয়। কিন্তু ১৯২৯ সালের পর আন্তর্জাতিক মন্দাবাজারের ফলে ভারতের বহির্বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে আরম্ভ করে। ১৯৩০-৪০ সালে ভারতের বহির্বাণিজ্যে ঘনিয়ে আসে গুরুতর সংকট। তাতে রপ্তানির চেয়ে আমদানির পরিমাণ যায় বেড়ে। এবং দেশবাসিগণকে মজুত স্বর্ণ বাজারে বিক্রয় করতে হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া-বদল হলো। আমদানি সংকুচিত হলো, রপ্তানির পরিমাণও পেল বৃদ্ধি। লেনদেনে উদ্বৃত্তের পরিণামে ইংলণ্ডের কাছে ভারতের ১৭০০ কোটি টাকার স্টার্লিং পাওনা জমে উঠলো। এই যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্য মূলতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সীমিত ছিল এবং সেই বাণিজ্যের প্রকৃতিও ছিল ঔপনিবেশিক। ভারতের বহির্বাণিজ্যে সেই যুগে ব্রিটিশ ভূমিকার প্রাধান্য থাকলেও জাপান, জার্মানী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সময় থেকে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ছাড়পত্র সংগ্রহ করে। অবশ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তিমকালে (১৯৪৪-৪৫ সালে) ভারতের বহির্বাণিজ্যে ইংলণ্ড ও আমেরিকার অংশ প্রায় সমান সমান হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য : স্বাধীনতা-লাভের পর

দ্বিতীয় মহাসমরের অবসানে দেশবিভাগ, স্বাধীনতালাভ ও পরিকল্পিত অর্থনীতির কর্মসূচী-গ্রহণে ভারতের সাম্প্রতিক বহির্বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতিতে সূচিত হয়েছে আমূল পরিবর্তন। পূর্বে আমদানি-দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল বিবিধ ভোগপণ্য। আর আজ? আজ আমদানি-দ্রব্যের মধ্যে সর্বপ্রধান হলো পরিকল্পনার জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আর পরিবহণ-সংক্রান্ত নানা সাজ-সরঞ্জাম। পূর্বে প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য ছিল কাঁচামাল। আর আজ

সে বিশ্বের বাজারে শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করতে সুরু করেছে। ভারতের বহির্বাণিজ্যের এই রূপান্তর নিঃসন্দেহে ক্রমবর্ধমান শিল্পায়িত অর্থনীতির ইংগিতবহ এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বাক্ষরময়। এদিকে দীর্ঘকাল সাম্রাজ্যিক বন্ধনে বন্দী থাকার পর সাম্রাজ্য-ভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে বানিজ্যের সম্পর্ক-ছেদনের সম্ভাব্য পরিণামের দিকে দৃষ্টি রেখে ভারতকে কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হয়েছে।

১৯৬২ সাল পর্যন্ত ভারত পৃথিবীর ২৮টি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। বর্তমানে সেই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬৩ সালে রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, জর্ডান, ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানের সঙ্গে নতুন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। নতুন চুক্তির গাঁটছড়ায় বাঁধা পড়েছে চিলি, গ্রীস, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, তিউনিসিয়া ও মরক্কো। তাছাড়া ১৯৫৩ সালে স্বাক্ষরিত ভারত-মিশর চুক্তির মেয়াদ ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভারত ও পশ্চিম য়ুরোপীয় দেশগুলির বাণিজ্য-মিশন-বিনিময়ের ফলে পশ্চিম জার্মানী সরকার ক্রয়ের জন্যে ভারতের কাপড, সেলাই মেশিন প্রভৃতি তালিকাবদ্ধ করলেন এবং আরো কয়েকটি পণ্যকে অনুরূপ সুবিধাদানের জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন। এদিকে ইরাক ও পোল্যাণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এবং জার্মান সংযুক্ত প্রজাতন্ত্র, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে মিলের কাপড, তাঁতের কাপড, সেলাই মেসিন, পাটজাত দ্রব্য, নারকেল কাতানের জিনিস প্রভৃতি বিষয়ে দ্বি-পার্বিক আলোচনা চলেছে। তাছাড়া ব্রাজিল ও কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির বিনিময় হয়েছে এবং অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্যে আরও আলোচনা চালান হচ্ছে। ইতিমধ্যে ব্রহ্মদেশ, ইরান, মেক্সিকো, যুগোশ্লাভিয়া ও রুমানিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ভিয়েৎনাম প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। পাকিস্তান ও নেপালের সঙ্গে নতুন বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতের সঙ্গে চীনের বাণিজ্যিক ছাডাছড়ি হয়ে গেছে। ৬৫ কোটি লোকের সেই বাজার খুবই সমৃদ্ধ সন্দেহ নেই। সেখানে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও পাকিস্তান আজ প্রবেশ করেছে। এদিকে বাণিজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, সোভিয়েট রাশিয়া ও জর্ডানের বাণিজ্য প্রতিনিধি দল ভারত পরিদর্শন করে গেছেন। ভারতের বাণিজ্য-জগৎ ক্রমাগত সম্প্রসারণশীল। সে আজ তার লুপ্ত বাণিজ্য-খ্যাতি পুনরুদ্ধার করতে চলেছে, এ বড়ো আশার কথা।

নবভারতের বাণিজ্য-চুক্তি

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রম-সম্প্রসারণশীল হলেও কতকগুলি সাময়িক প্রভাব তার বহির্বাণিজ্যকে প্রভাবিত করেছে। যুদ্ধকাল থেকে ভারতে বিপুল খাদ্য-ঘাটতির

আবির্ভাব, খাদ্যপণ্য-উৎপাদনে সমৃদ্ধ অঞ্চল-সমূহের পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি, ইংলণ্ডের কাছে স্টার্লিং পাওনার উদ্ভব, জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি, পরিকল্পিত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও শিল্পায়নের গতি-সঞ্চার, যন্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণ ইত্যাদির দ্বারা ভারতের বহির্বাণিজ্য গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে। তাছাড়া যুদ্ধকালীন নিরুদ্ধ চাহিদার পূরণের জন্যে যুদ্ধোত্তর কালে অভূতপূর্ব আমদানি-বৃদ্ধি, ১৯৫০-৫১ সালে কোরীয় যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ববাজারে ক্রয়ের হিড়িকে রপ্তানি-বৃদ্ধি, ১৯৫৬ সালে ইঙ্গ-মিশরীয় লড়াই, প্রতিবেশী পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে ক্রমাগত সম্পর্কের অবনতির জন্যে প্রতিরক্ষা-ব্যয় বৃদ্ধি প্রভৃতি ভারতের বহির্বাণিজ্যে বিস্তার করেছে সাময়িক প্রভাব। কিন্তু ঔপনিবেশিক চরিত্রের বহির্বাণিজ্যের উন্নয়নমূলক কার্যসূচীতে রূপান্তরের স্বাক্ষর আজ ভারতের অর্থনীতিতে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ কি?

সাম্প্রতিক বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি

রপ্তানি বেড়েছে, আমদানিও বেড়েছে; রপ্তানির চেয়ে আমদানি অনেক বেশি বেড়ে গেছে। ফলে ভারতের ভাগ্যে জুটেছে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত। এবং তা সুরু হয়েছে ১৯৫০-৫১ সাল থেকে। ১৯৫০-৫১ সালে আমদানি ছিল ৬৫০·৪৬ কোটি টাকা, রপ্তানি ৬০০·৬৮ কোটি টাকা, ঘাটতি ৪৯·৭৮ কোটি টাকা। ১৯৫৫-৫৬ সালে আমদানি ৭৭৪·৩৬ কোটি টাকা, রপ্তানি ৬০৮·৮৩ কোটি টাকা, ঘাটতি ১৬৫·৫৩ কোটি টাকা। ১৯৬০-৬১ সালে আমদানি ১,১২২·৪৮ কোটি টাকা, রপ্তানি ৬৪২·৩২ কোটি টাকা, ঘাটতি ৪৮০·১৬ কোটি টাকা। ১৯৬১-৬২ সালে আমদানি ১,০৪০·০৭ কোটি টাকা, রপ্তানি ৬৬১·৯৯ কোটি টাকা, ঘাটতি ৩৭৮·০৮ কোটি টাকা। ১৯৬৩ সালে রপ্তানি ৭৮৩ কোটি টাকা, আমদানি ১১৭৮ কোটি টাকা; ঘাটতি ৩৯৫ কোটি টাকা; ১৯৬৪ সালে রপ্তানি ৮৩৫ কোটি টাকা, আমদানি ১২৫০ কোটি টাকা; ঘাটতি ৪১৫ কোটি টাকা। বৈদেশিক বাণিজ্যে এই প্রতিকূল পরিস্থিতির রূপান্তর সাধনের জন্যে রপ্তানি-বৃদ্ধির প্রয়াস সূচিত হয়েছে এবং ১৯৬৪ সালের রপ্তানি ভারতের রপ্তানি-ইতিহাসে রেকর্ড্ সৃষ্টি করেছে।

প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত: ১৯৫০-১৯৬৪

ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা-সংকটের এই হলো গোড়ার কথা। প্রথম পরিকল্পনায় ৪০০ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা ধরা হয়েছিল। কিন্তু কার্যতঃ লেনদেনের ঘাটতি দাঁড়ায় ৩১৮ কোটি টাকা। তার মধ্যে ১৯৬ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্যরূপে জুটেছিল। অবশিষ্ট ১২২ কোটি টাকা তুলতে হয়েছিল বিদেশী মুদ্রার তহবিল থেকে। কাজেই প্রথম পরিকল্পনায় বৈদেশিক মুদ্রা-সংকট ভারতকে গ্রাস করতে পারেনি। এমন কি, দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূচনা-লগ্নে তার হাতে ছিল ৭৫৯ কোটি

টাকার বিদেশী মুদ্রা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ধরা হয়েছিল মোট ১১০০ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রার ঘাট্‌তি। কিন্তু শেষে দেখা গেল, সেই ঘাট্‌তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৯২০ কোটি টাকা। শেষ পর্যন্ত ভারতকে বিদেশী মুদ্রার তহবিল থেকে তুলতে হয় ৬০০ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বর্ষে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। অবশ্য ১৯৬৩ সালে সে অতিকষ্টে সেই সংকট উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়। কিন্তু ১৯৬৫ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে দেখা গেল, ভারতের হাতে মাত্র ৭৯ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা আছে। এবং আইনতঃ অন্ততঃপক্ষে যে ৮৫ কোটি টাকা রাখার কথা, তার চেয়েও তা ৬ কোটি টাকা কম। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার এমন চরম দুঃসময় স্বাধীনতালাভের পর আর কখনো আসেনি। অবশ্য ভারতীয় অর্থনীতির ব্যাখ্যাকারগণ এই ক্রমাগত প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তকে জাতীয় অর্থনীতির একটা সুলক্ষণ বলে অভিহিত করেছেন।

ভাবতের বৈদেশিক মুদ্রা-সংকট: প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনা

তার কারণ, বর্তমান জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমানতা, জনসাধারণের আয় ও জীবন-যাত্রার মান-বৃদ্ধির ফলে উৎপন্নদ্রব্য-সামগ্রীর অধিকাংশই দেশমধ্যে ব্যবহৃত হওয়ায় রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে না। দ্বিতীয়তঃ, পণ্যমূল্য-বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পণ্য-বিক্রয় সম্ভব হচ্ছে না। তৃতীয়তঃ, ভারতীয় রপ্তানি-দ্রব্যগুলির উৎকর্ষ আন্তর্জাতিক দ্রব্য-মানের নিম্নবর্তী, মোড়ক-বাঁধাই ইত্যাদি অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের। চতুর্থতঃ, অত্যধিক রেলভাড়া রপ্তানি-বৃদ্ধির অপর বাধা। পঞ্চমতঃ, ভারতের রপ্তানি-দ্রব্য প্রধানতঃ তিনটি—পাটজাত দ্রব্য, চা ও সূতীবস্ত্র। প্রত্যেকটি পণ্য তীব্র প্রতিযোগিতায় সম্মুখীন হয় এবং এদের উৎপাদন-ব্যয়-বাহুল্যই বাজার-সম্প্রসারণের পথের প্রধান অন্তরায়। ষষ্ঠতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতের আমদানি সর্বাধিক। কিন্তু রপ্তানি অতি অল্প। তার জন্যে অবশ্য দায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুদার আমদানি-নীতি। সপ্তমতঃ, বিশ্বের বাজারে পুঁজি-দ্রব্যের চাহিদা অত্যধিক। কিন্তু ভারত এখনও পুঁজি-দ্রব্য-রপ্তানি স্তরে পৌঁছায় নি। অষ্টমতঃ, খাদ্য রাসায়নিক সার ও প্রতিরক্ষার সরঞ্জামাদির আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে। নবমতঃ, ভারতে অবস্থিত বৈদেশিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির স্বদেশে মুনাফা প্রেরণ, বিদেশী ঋণের সুদ প্রদান, অবৈধ আমদানির মূল্য প্রদান এবং বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহারে অসামর্থ্য ইত্যাদির ফলে বৈদেশিক মুদ্রা-সংকট ঘনীভূত হয়েছে। দশমতঃ, বিদেশী জাহাজ-পরিবহণের ওপর আত্যন্তিক নির্ভরতা রপ্তানি-বৃদ্ধির পথে অপর বাধা।

কারণানুসন্ধান

গত পনের বছর ধরে রপ্তানি-বৃদ্ধির জন্যে চলেছে প্রাণান্তকর প্রয়াস। তার জন্যে বিদেশী বাণিজ্য-পর্ষদ (Foreign Trade Board), রপ্তানি-প্রসার অধিকার (Directorate of Export Promotion), রপ্তানি-প্রসার পরিষদ (Export Promotion Council), রপ্তানি-প্রসার উপদেষ্টা পরিষদ (Export Promotion Advisory Council), রপ্তানি ঝুঁকি বীমা কর্পোরেশন (ERIC), স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন, বাণিজ্য পর্ষদ (Board of Trade) ইত্যাদি সংগঠিত হয়েছে। এত সত্ত্বেও প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তই ভারতের হাতে জমে উঠেছে ক্রমাগত।

রপ্তানি-বৃদ্ধি ও প্রসার-প্রয়াস

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের রথচক্রকে আজ যেন মেদিনী গ্রাস করছে। একদিকে আমদানিকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে; অন্যদিকে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্যে উৎসাহ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এত প্রয়াস সত্ত্বেও রপ্তানি-বাণিজ্যের অচল রথ আর সচল হচ্ছে না। আজ আমেরিকা ও য়ুরোপের উন্নত দেশগুলির সঙ্গে রপ্তানি-বৃদ্ধির আশা ত্যাগ করতে হবে। তাদের জায়গায় দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার স্বল্পোন্নত দেশগুলির সঙ্গে রপ্তানি-বাণিজ্য-বৃদ্ধির কথা চিন্তা করতে হবে। এই সব নতুন দিগন্ত-পানে ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্য-সম্প্রসারণের রয়েছে উজ্জ্বল সম্ভাবনা। তা যদি হয়, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে আসবে যুগান্তর, দেশের ভাগ্যে আসবে সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতা।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যে কাঁচামাল রপ্তানির সুবিধা ও অসুবিধা, ক. বি. '৬৩
- ভারত-রাষ্ট্রের বাণিজ্য-নীতি, ক. বি. '৬৩
- ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য

৫০. ভারতে শিল্প-বিকাশে রাষ্ট্রের ভূমিকা
Role of State in the Industrial Development in India.

প্রবন্ধ-সূত্র ঃ—অবতরণিকা—সাম্রাজ্যিক পক্ষপাত ও শিল্প-আন্দোলন—প্রথম রাজস্ব-নীতি ও বিভেদাত্মক সংরক্ষণ—প্রধান প্রধান শিল্প ও প্রথম রাজস্ব-নীতির স্বরূপ-বিশ্লেষণ—দ্বিতীয় রাজস্ব-নীতি: নব-শিল্পায়নের দ্বারোদ্‌ঘাটন: মূল-শিল্প, প্রতিরক্ষামূলক শিল্প ও অন্যান্য শিল্প—দ্বিতীয় রাজস্ব-নীতির সার্বিক মূল্যায়ন—উপসংহার।

মধ্য-উনবিংশ শতক থেকে রেল-পরিবহণ ও আধুনিক যোগাযোগ-ব্যবস্থার উদ্বোধনে, ভারতে আধুনিক শিল্প-সম্ভাবনার হয়েছিল দ্বারোদ্‌ঘাটন। তারপর ভারতের অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ও সুলভ মানবিক শক্তির শোষণে উদ্ভূত বিপুল মুনাফার লোভে এদেশে ব্রিটিশ পুঁজি আকৃষ্ট হলো। প্রথমে রেলপথ, পরে বাগিচা, খনি ও পাট-শিল্পে সেই পুঁজি হলো বিনিয়োজিত। অবশ্য ব্রিটিশ পুঁজি এবং মালিকানায় স্থাপিত সেই সব শিল্প ছিল প্রধানতঃ রপ্তানি-নির্ভর। এবং সেই সব ব্রিটিশ শিল্পে সরকারের ছিল অসীম পক্ষপাতিত্ব। তার ওপর ১৯৩৬ সাল থেকে প্রবর্তিত ছিল অবাধ বাণিজ্য-নীতি। ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ সরকারের হাতে ভারত-শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলো এবং শাসন-যান্ত্রিক ব্যয়-সংকুলানের জন্যে ভারতে আমদানি ব্রিটিশ পণ্যের ওপর আরোপিত হলো আমদানি-শুল্ক। সেই আমদানি-শুল্কের ছত্র-ছায়ায় ভারতে শিল্প-বিকাশ সূচিত হয়, যার ফলে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে কঠোর মন্তব্য করতে হলো যে, ইংলণ্ডের শিল্পপণ্যের প্রতিকূল কোন সংরক্ষণ-মূলক শুল্ক সে বরদাস্ত করবে না। শেষ পর্যন্ত ভারতে উৎপন্ন তূলাবস্ত্রের ওপর অন্তঃশুল্ক স্থাপন করে সেই বিবাদের ওপর যবনিকাপাত করতে হলো। এইরূপে প্রথম মহাযুদ্ধকাল পর্যন্ত ভারতে ব্রিটিশ সরকারের শিল্প-নীতির মূল কথা ছিল ভারতে ব্রিটিশ স্বার্থে অবাধ বাণিজ্য-নীতির অনুসরণ ও ব্রিটিশ পুঁজি-পরিচালিত রপ্তানি-নির্ভর শিল্প ছাড়া অন্য যে কোন দেশীয় শিল্প-প্রয়াসের বিরোধিতা করা।

অবতরণিকা

তা সত্ত্বেও কখনও কখনও ভারতে আগত ব্রিটিশ পণ্যাদির ওপর আমদানি-শুল্ক স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু তার পশ্চাতে এদেশীয়দের শোষণ করে রাজকোষের আয় বৃদ্ধিই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য—দেশীয় শিল্প-বিকাশের সহায়তা নয়। আর দেশীয় শিল্পায়নের প্রতি সরকারী বিরোধিতা ছিল যেমন তীব্র, তেমনি স্পষ্ট। এদিকে দেশীয় শিল্প-সম্ভাবনার বিকাশের অনুকূল মনোভাব সূচিত হয়েছিল হিন্দু-মেলায়

(১৮৬৭) যুগ থেকে। সরকারী শিল্পনীতির সঙ্গে সংঘাতে সেই মনোভাব ধীরে ধীরে প্রবল আকার ধারণ করছিল। অবশেষে ১৯০৫ সালে তাই স্বদেশী আন্দোলন রূপে ফেটে পড়লো। সকল বাধা-প্রতিরোধ ঠেলে দেশীয় শিল্প-বিকাশের লগ্ন হলো সমাগত। তারই মধ্যে এসে পড়লো প্রথম মহাযুদ্ধের ঝড়। সেই অবকাশে দেশীয় শিল্প পেল প্রস্তুতি ও শক্তি-সঞ্চয়ের সুবর্ণ-সুযোগ। স্থাপিত হলো শিল্প কমিশন (১৯১৬)। দেশীয় শিল্পের অনুকূলে প্রদত্ত শিল্প কমিশনের মূল্যবান সুপারিশগুলি সরকার কর্তৃক হলো নির্মমভাবে উপেক্ষিত। তার প্রতিক্রিয়ায় সুরু হলো শিল্প-আন্দোলন। সেই আন্দোলনের যুক্তি ছিল ভারতের শিশু-শিল্পের সংরক্ষণ, জাতীয় শিল্পের স্বয়ং-সম্পূর্ণতা এবং শিল্পায়োজনের বৈচিত্র্য-সাধনা। অবাধ বাণিজ্য যে তৎকালীন ভারতের পক্ষে বিপজ্জনক, তা স্বার্থহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন জার্মান অর্থশাস্ত্রী ফ্রেডারিক লিস্ট। শিল্পায়নের পথে যে দেশ সবেমাত্র যাত্রা সুরু করেছে, অবাধ বাণিজ্য-নীতি তার পক্ষে অপমৃত্যুর নামান্তর। লালা হরকিষেণ লাল তাই দাবী করেছিলেন, "Feed the baby, nurse the child and free the adult" তাই ছিল শিল্প-আন্দোলনের অন্যতম শ্লোগান।

সাম্রাজ্যিক পক্ষপাত ও শিল্প-আন্দোলন

ব্রিটিশ-ভারত সরকারের দেশীয় শিল্পের প্রতি দীর্ঘকালের বিমাতৃ-সুলভ মনোভাবের অবসানকল্পে ১৯২১ সালে স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লার সভাপতিত্বে প্রথম ভারতীয় রাজস্ব কমিশন গঠিত হয়। সেই কমিশন অবাধ বাণিজ্য-নীতির প্রতিকূলে এবং বিভেদাত্মক সংরক্ষণের (Discriminating protection) অনুকূলে মত প্রকাশ করে। সংরক্ষণ-প্রার্থী শিল্পের সর্তাবলী হলো: এক, শিল্পকে পর্যাপ্ত কাঁচামাল, সস্তা চালক-শক্তি, শ্রমিক ও বিস্তৃত স্বদেশী বাজারের অধিকারী হতে হবে; দুই, শিল্পকে অদূর ভবিষ্যতে সংরক্ষণ ছাড়া দেশীয় স্বার্থে বিকশিত হতে হবে; তিন, সংরক্ষণের সুযোগ লাভ করে শিল্পকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হবে; তাছাড়া শিল্পকে স্বদেশের চাহিদা, দেশরক্ষার প্রয়োজন মেটাতে হবে বা মূল-শিল্পের মর্যাদা লাভ করতে হবে। ব্রিটিশ-ভারত সরকারের এই নীতি-বদলের পশ্চাতে ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা, ব্রিটিশ ব্যতীত অন্যান্য বিদেশী পণ্যের সঙ্গে সংঘাত, উদীয়মান ভারতীয় শিল্পপতিগণের দাবী ও জাতীয় নেতৃবর্গের তা সমর্থন ও শিল্প-কমিশনের সুপারিশ। যা হোক, শেষ পর্যন্ত রাজস্ব-নীতি সম্পর্কে সরকারী কঠোরতার বরফ গলতে আরম্ভ করলো।

প্রথম রাজস্ব-নীতি ও বিভেদাত্মক সংরক্ষণ

১৯২৩ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভা বিভেদাত্মক সংরক্ষণ নীতির প্রস্তাব গ্রহণ করে একটি শুল্ক পর্ষদ (Tariff Board) গঠনের নির্দেশ দেন। ১৯২৪ সাল থেকে

শুল্ক পর্ষদ প্রধান প্রধান শিল্পের সংরক্ষণের সুপারিশ করেন। ফলে সংকট উত্তীর্ণ হয়ে ভারতীয় ইস্পাত-শিল্প বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবার শক্তি সঞ্চয় করে।

প্রধান প্রধান শিল্প ও প্রথম রাজস্ব-নীতির স্বরূপ-বিশ্লেষণ

তাছাড়া, শর্করা-শিল্প, কাগজ-শিল্প, বস্ত্র-শিল্প, দেশলাই-শিল্প সংরক্ষণের আশীর্বাদ লাভ করে বিকাশের সুযোগ পায়। আর উল্লিখিত শিল্পগুলির ওপর নির্ভরশীল শিল্পগুলিও বিকশিত হয়েছে, কৃষকেরাও পেয়েছে সেই আশীর্বাদের বখরা। কিন্তু প্রথম রাজস্ব কমিশন বা ভারত সরকার—কেউই এই রাজস্ব-নীতিকে দেশের শিল্পায়ন ও বৈষয়িক উন্নয়নের সোপানরূপে গণ্য করেন নি। বরং ভারতীয় শিল্পকে ব্রিটিশ ব্যতীত অন্যান্য বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগীরূপে গড়ে তোলার উপায় হিসেবে তাঁরা একে ব্যবহার করেছেন। তাই ব্রিটিশ আমলে কিছু কিছু শিল্পের বিকাশ হলেও তা সুশৃংখলভাবে সংঘটিত না হওয়ায় দেশে শিল্পায়ন আসে নি।

দেশব্যাপী শিল্পের এই অনগ্রসরতার পটভূমিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসে পড়লো। মহাযুদ্ধের সেই মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যে ভারত নতুন এক রাজস্ব-নীতির অভাব অনুভব করেছিল। প্রথম রাজস্ব-নীতিতে সুষ্ঠু শিল্প-বিকাশের কোন পরিকল্পনা ছিল না।

দ্বিতীয় রাজস্ব-নীতি: নব-শিল্পায়নের দ্বারোদ্ঘাটন: মূল-শিল্প, প্রতিরক্ষা-মূলক শিল্প ও অন্যান্য শিল্প

ফলে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি শিল্পায়তন গড়ে উঠলেও সার্বিক শিল্প-প্রগতির রুদ্ধ-দ্বার উন্মুক্ত হয় নি তাতে। ১৯৪৫ সালে নতুন শুল্ক পর্ষদ গঠিত হলো। তাও নতুন কোন আশার আলো তুলে ধরতে পারে নি। তারপর দেশ স্বাধীন হলো। এবং ১৯৪৯ সালে জাতীয় সরকার শ্রীটি. টি. কৃষ্ণমাচারীর সভাপতিত্বে দ্বিতীয় রাজস্ব কমিশন গঠন করলেন। এই কমিশন প্রথমেই স্বীকার করলেন যে, মূল-শিল্পের সংগঠন ছাড়া দেশের সার্বিক শিল্পায়ন অসম্ভব। মূল-শিল্প ছাড়া প্রতিরক্ষা-মূলক শিল্প-প্রয়াস ও জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে অন্বিত শিল্প-প্রয়াসকে যথার্থ গুরুত্ব দান করতে হবে। সংরক্ষণ-দানের ব্যাপারে অন্যান্য শিল্প-প্রয়াসকেও যথাযথ মর্যাদা দান করতে হবে। অবশ্য সংরক্ষণের প্রশ্নে সময়, পরিমাণ, উৎপাদন-ব্যয়, জাতীয় স্বার্থ ইত্যাদি বিশেষভাবে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ, সকল দিক দিয়ে ভারতের শিল্প-জগতে একটা সাড়া জাগিয়ে তুলতে হবে, সৃষ্টি করতে হবে নতুন কর্ম-চাঞ্চল্য। দ্বিতীয় রাজস্ব-নীতিই প্রকৃতপক্ষে দেশের সার্বিক শিল্পায়নের সিংহদ্বার খুলে দিল।

এতদিন প্রতিকূল আবহাওয়ায় ও বিদেশী সরকারের হৃদয়হীন কঠোরতায় ভারতের কতো সম্ভাবনাময় শিল্প পূর্ণ বিকশিত হবার আগেই সমূলে বিনষ্ট হয়েছে। এখন হওয়া-বদল হয়েছে। যে শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সম্ভাবনাময়, ভবিষ্যৎ দেশের আভ্যন্তরীণ

চাহিদা পূরণে যে শিল্প সক্ষম, যে শিল্প ভবিষ্যতে বিদেশী বাজার দখল করতে সমর্থ কিংবা যে শিল্প অন্য কোন সম্ভাবনাময় শিল্পের পরিপূরক—তার জন্যে সংরক্ষণের উদার হস্ত প্রসারিত করে দিতে হবে। আর যে কৃষি কোন সম্ভাবনাময় শিল্পের কাঁচামাল যোগানে প্রতিশ্রুত, তাকেও অনধিক পাঁচ বছরের জন্যে সংরক্ষণের সুবিধা দিতে হবে। সংরক্ষিত কৃষি ও শিল্পকে অন্তঃশুল্কের হাত থেকে মুক্ত রাখতে হবে। একদিকে সংরক্ষণ-সুবিধার ঔদার্য, অন্যদিকে অন্তঃশুল্কের কুঠারাঘাত—এই পরস্পর-বিরুদ্ধ নীতি বর্জনীয়। সর্বশেষে, সার্বিক শিল্প-বিকাশের অভিভাবকত্ব যার হাতে, সেই শিল্প কমিশনের স্থায়িত্ব চাই। কোন স্বল্পায়ু শিল্প কমিশন এই দেশব্যাপী শিল্প-বিকাশকে পূর্ণতা দান করতে পারে না। তার জন্যে চাই স্থায়ী শিল্প কমিশন।

দ্বিতীয় রাজস্ব-নীতির সার্বিক মূল্যায়ন

ভারতের রাজস্ব-নীতি ও শুল্ক-সংস্কারের ধারালোচনায় যে বিপরীত দুটি চিত্র আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হয়, তা অত্যন্ত স্পষ্ট। ব্রিটিশ-ভারতের প্রথম রাজস্ব-নীতির তুলনায় স্বাধীন ভারতের দ্বিতীয় রাজস্ব-নীতি অনেকখানি উদার, সামগ্রিক ও বাস্তবানুগ। ভারতীয় শিল্প-জগতে যে-নবযুগ এসেছে, এসেছে যে কর্মোদ্দীপন, তা দ্বিতীয় রাজস্ব-নীতিরই অবদান। এই দেশোপযোগী, যুগোপযোগী রাজস্ব-নীতি দেশের যে নব-শিল্পায়নের চাবিকাঠি এনেছে, তা কর্মে ও সাধনায় সাফল্য লাভ করুক, বেদনাময় যুগাবসানে আবার ভারত-ভাগ্যে আসুক অর্থ নৈতিক সুখ, সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতা—এই কামনা করি।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়
● ভারতে রাজস্ব-নীতি ও শুল্ক-সংস্কার

৫১. ভারতের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপরেখা
Frame-work of the Fourth Five Year Plan of India.

প্রবন্ধ-সূত্র ঃ—অবতরণিকা—চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য—তৃতীয় পরিকল্পনার শিক্ষা—চতুর্থ পরিকল্পনার ব্যয় ও পুঁজি সংগ্রহ—ব্যয়-বণ্টন—সমালোচনা—উপসংহার।

"আমাদের প্রয়োজন এবং দেশের কারিগরী, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার কথা বিচার বিবেচনা করে চতুর্থ যোজনার রূপরেখা রচিত হয়েছে।" —শ্রীঅশোক মেটা

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনার সাফল্য ও ব্যর্থতার পুঁজি হাতে নিয়ে ভারতের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যাত্রা সুরু। চতুর্থ পরিকল্পনা তাই ভারতের প্রগতিশীল অর্থনীতির চতুর্থ প্রবাহ। প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় ভারতের জাতীয় অর্থনীতিতে যে উর্বরতা সঞ্চিত হয়েছে, তাতে আরও উর্বরতা সঞ্চারিত করে উৎপাদন-সম্ভাবনার নব-নব দ্বারোদ্ঘাটনের প্রতিশ্রুতি নিয়েই এর আবির্ভাব।

অবতরণিকা

দীর্ঘকালের শোষণ, ঔদাসীন্য ও নৈষ্কর্ম্যের পরিণামে ভারতের অর্থনীতির বিশাল প্রান্তরে যে জড়তা ও নৈরাশ্যের স্তূপ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল, তাকে অপসারিত করে সেখানে সোনা ফলাতে হলে যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করা দরকার, ভারতের পরিকল্পনাগুলি মূলতঃ সেই উদ্দেশ্যে রচিত। পরিকল্পনার মাধ্যমে সঞ্চারিত অতিরিক্ত শক্তিবলেই দারিদ্র্য এবং অশিক্ষার বিরুদ্ধে আজ সংগ্রাম বিঘোষিত হয়েছে। তাইতো দেশের সম্পদের সৃষ্টি ও সুষম ব্যবহারীকরণের মাধ্যমে স্ব-নির্ভর এবং স্বয়ংচল অর্থনীতি গড়ে তোলার আশ্বাস নিয়ে চতুর্থ পরিকল্পনার আবির্ভাব।

চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন যে প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছেন, তা হলো "স্ব-নির্ভর অর্থ নৈতিক বিকাশের সুদৃঢ় বনিয়াদ রচনা, কর্মপ্রার্থীদের জন্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য হ্রাস এবং দেশের প্রতিটি পরিবারকে নিম্নতম জীবনধারণের মান-প্রদান।" বাস্তবিকই এই উপমহাদেশের বৈষয়িক জড়ত্বের অবসান ঘটিয়ে উৎপাদনে চাঞ্চল্য আনতে হলে এমনি এক বিশাল কর্ম-কাণ্ডের প্রয়োজন ছিল। চতুর্থ পরিকল্পনা ভারতের অর্থ নৈতিক সংগঠনের চলমান ধারায় আর একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তার লক্ষ্য হলো : এক, কৃষিতে বার্ষিক অন্ততঃপক্ষে পাঁচ-শতাংশ হারে উন্নয়ন, গ্রামীণ জনগণের আয় ও খাদ্যদ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি। দুই, উচ্চতর হারে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহের নিশ্চয়তা দান। তিন, সূতীবস্ত্র, চিনি, কেরোসিন, সিমেণ্ট, ঔষধপত্রাদি অত্যাবশ্যক ভোগ্য পণ্যের ও গৃহ নির্মাণের উপাদান সমূহের যোগান বৃদ্ধি। এবং চার, ধাতু, রাসায়নিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি নির্মাণ,

চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য

খনিজ দ্রব্য, বিদ্যুৎ শক্তি এবং পরিবহণের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সাধন। পাঁচ, পরিবার পরিকল্পনার একটি সংগতিপূর্ণ কার্যসূচীর মাধ্যমে দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। ছয়, মানবিক শক্তির উন্নয়নের দ্বারা উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি। এবং সাত, অধিকতর কর্ম-সংস্থানের সুযোগ-সৃষ্টি ও সামাজিক ন্যায়-বিচারের ব্যাপকতর প্রয়োগ সাধন। এই সপ্ত-প্রতিশ্রুতির ঘোষণায় চতুর্থ পরিকল্পনা মুখর। এবং আশা করা যায়, এই সপ্তাশ্ব-বাহিত চতুর্থ পরিকল্পনার রথে আগামী পাঁচ বছরের জন্যে আসছেন যে ভারতের ভাগ্য-দেবতা, তিনি ভারতের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জড়ত্ব ও নৈষ্কর্ম্যের মর্মমূলে গতি সঞ্চারিত করে তাকে নবজীবনের মন্ত্রে দীক্ষা দেবেন।

অনুরূপভাবে তৃতীয় পরিকল্পনাও ভারত-ভাগ্যে নানা আশা ও আশ্বাসের বাণী বহন করে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু সেই আশা ও আশ্বাস ভারতের জীবনে কতখানি সফল হয়েছে, তা এই প্রসঙ্গে অবশ্যই আলোচিতব্য। কারণ প্রথম তিনটি পরিকল্পনার সাফল্য এবং ব্যর্থতার শিক্ষাই হবে চতুর্থ পরিকল্পনা রূপায়ণের সর্বশ্রেষ্ঠ পুঁজি। বিশেষতঃ তৃতীয় পরিকল্পনা। তৃতীয় পরিকল্পনায় ভারতবাসীর হাতে জমেছে ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের কালি। পরিকল্পনা কমিশনও স্বীকার করেছেন যে, তৃতীয় পরিকল্পনার রূপায়ণ তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বহু পিছনে পড়ে আছে। কিন্তু যেখানে প্রত্যাশা সর্বাপেক্ষা বেশি ব্যাহত হয়েছে, তা হলো কৃষি; এবং এই কৃষির ব্যর্থতাই সাধারণ মানুষের ভোগ-স্পৃহার কণ্ঠরোধ করেছে, ঘটিয়েছে অস্বাভাবিক মূল্য-বৃদ্ধি। এই হলো সাম্প্রতিক চিত্রের প্রধানতম দিক। কৃষিক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বিনিয়োগের পূর্ণতম ফললাভের অহেতুক বিলম্বই এই বেদনাদায়ক চিত্রের জন্যে মূলতঃ দায়ী। এদিকে জাতীয় উৎপাদন-বৃদ্ধির মন্থর গতি, কৃষি-উৎপাদনের অবনতি, জনসংখ্যা-বৃদ্ধি ও তজ্জনিত অতিরিক্ত কর্ম-সংস্থানের প্রয়োজনীয়তা ও ভোগ-ব্যয় বৃদ্ধি, বিপুলতর প্রতিরক্ষা ব্যয়, সমাজ-সেবা খাতে ব্যয়াধিক্য এবং সরকারী ও বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ-বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে পণ্য ও সেবার চাহিদা। তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রতিশ্রুতি ছিল জাতীয় আয় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হবে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রশাসনিক দুর্বলতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণে পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ১০ শতাংশ। তৃতীয় পরিকল্পনা সাধারণ মানুষের জীবনে স্বস্তি তো আনতেই পারেনি, বরং মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যের ঊর্ধ্বগতি, দুর্বহ করভার, সরকারী ঋণ-বৃদ্ধি, মন্থর উৎপাদন-ক্ষমতা ও মন্দা পুঁজির বাজার যে সাধারণ মানুষের মনের স্বস্তি অপহরণ করেছে, তা বলা বাহুল্য। কারণ, উদ্যোগের প্রসার-পদ্ধতি স্ব-নির্ভর বিকাশের মূলে যেমন গতি-চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারেনি, তেমনি সেচ-জলের অব্যবহার ও শিল্প-সামর্থ্যের

তৃতীয় পরিকল্পনার শিক্ষা

অব-ব্যবহার (under-utilisation) ইত্যাদি সাংগঠনিক অকর্মণ্যতা পরিকল্পনার ত্রুটি-সমূহকে আরো আকাশ-প্রমাণ করে তুলেছে। এইভাবে একদিকে পরিকল্পনার জন্যে বিপুল পরিমাণ অর্থের ছড়াছড়ি, অন্যদিকে উৎপাদন-স্বল্পতা—এই দুই দুর্বলতার চক্রান্তে ঘটেছে মূল্য-রেখার উর্ধ্ব-বিহার, যার ফলে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বহ হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে হাত মিলিয়েছে ভারতের বিদেশী-মুদ্রার চরম সংকট। স্মরণীয় কালের মধ্যে ভারতে পণ্যদ্রব্যের এরূপ মূল্য-বৃদ্ধি এবং বিদেশী মুদ্রার এমন সংকট কখনো দেখা দেয়নি।

এইরূপ নৈরাশ্যজনক অবস্থায় পরিকল্পনা কমিশন চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া রচনায় হাত দিয়েছেন। চতুর্থ পরিকল্পনার কার্যক্রমের রূপায়ণের জন্যে সর্বমোট ব্যয়-বরাদ্দ হবে ২১,৫০০ থেকে ২২,৫০০ কোটি টাকা। তার মধ্যে সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ ১৪,৫০০-১৫,৫০০ কোটি টাকার মতো এবং অবশিষ্ট ৭,০০০ কোটি টাকা বেসরকারী ক্ষেত্রে ব্যয়িত হবে। তাছাড়া পরিকল্পনার শেষার্ধে অতিরিক্ত পুঁজি সংগ্রহ সম্ভব হলে আরো কয়েকটি প্রকল্প গৃহীত হবে। তাই প্রকল্পগুলির জন্যে রাখা হয়েছে ১০০ কোটি টাকার বরাদ্দ। প্রথমার্ধে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করবার জন্যে সকল প্রকার চেষ্টা করা হবে, যাতে ঐ অতিরিক্ত পুঁজি সংগ্রহ সম্ভব হয়। যেভাবে চতুর্থ পরিকল্পনার পুঁজি সংগৃহীত হবে, তার তথ্য-চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো :

চতুর্থ পরিকল্পনার ব্যয় ও পুঁজি সংগ্রহ

বর্তমান করমানের ভিত্তিতে উদ্বৃত্ত	১,৯১০	কোটি	টাকা
রেলপথ সহ সকল সরকারী উদ্যোগের উদ্বৃত্ত	১,৩৫০	,,	,,
ক্ষুদ্র সঞ্চয়	১,০০০	,,	,,
বার্ষিক আমানত	২০০	,,	,,
ভবিষ্যনিধি আমানত	৫২৫	,,	,,
বিবিধ সংগ্রহ	৮৬০	,,	,,
বাজার ঋণ	১,৬০০	,,	,,
বিদেশী ঋণ	৩,৫০০	,,	,,
অতিরিক্ত কর	৩,০০০	,,	,,
ঘাট্তি ব্যয়	৫০০	,,	,,
মোট	১৪,৪৪৫	কোটি	টাকা
অর্থাৎ	১৪,৫০০	কোটি	টাকা।

এই ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ সত্যিই বিপুল এবং সেই দৃষ্টিতে চতুর্থ পরিকল্পনার আয়তন নিঃসন্দেহে বিশাল। চতুর্থ পরিকল্পনা তৃতীয় পরিকল্পনার প্রায় দ্বিগুণ এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনার প্রায় সমান।

ব্যয়-বণ্টনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রাধান্য লাভ করেছে কৃষি এবং আনুষঙ্গিক কার্য-সূচী। সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ হলো ১৫,৫০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ হলো ৭,০০০ কোটি টাকা। ব্যয়-বণ্টনের পরিকল্পিত তথ্য-চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো :

ব্যয়-বণ্টন

সরকারী খাতে :

কৃষি	২,৪০০	কোটি টাকা
সেচ	১,০০০	”
সংগঠিত শিল্প	৩,২০০	”
ক্ষুদ্র শিল্প	৪৫০	”
শক্তি	১,৯৫০	”
পরিবহণ ও সংসরণ	৩,০০০	”
শিক্ষা	১,৪০০	”
বৈজ্ঞানিক গবেষণা	১৪৫	”
স্বাস্থ্য	১,০৯০	”
গৃহনির্মাণ	৪০০	”
অনুন্নত সম্প্রদায়	২০৫	”
বিবিধ	২৭৫	”
মোট	১৫,৫১৫	কোটি টাকা

বেসরকারী খাতে :

কৃষি	৭০০	কোটি টাকা
শক্তি	৫০	”
সংগঠিত শিল্প	২,৪০০	”
ক্ষুদ্র শিল্প	৪০০	”
পরিবহণ ও সংসরণ	৬৫০	”
শিক্ষা	১০০	”
গৃহনির্মাণ	১,৪৭০	”
সমাজকল্যাণ	১০	”
মজুত মাল	১,২০০	”
মোট	৬,৯৮০	কোটি টাকা

তৃতীয় পরিকল্পনার যখন 'ছিন্ন, ভিন্ন, ভাঙা নৌকার পাল', তখনই চতুর্থ পরিকল্পনার এই নতুন অঙ্গরাগ ও নবরূপায়ণ জন-মানসে কতখানি উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং বলিষ্ঠ আশাবাদ সঞ্চারিত করতে পারবে, তা অবশ্যই বিবেচ্য। ইতিমধ্যে চতুর্থ পরিকল্পনার এই বিশালতা নিয়ে বহু সমালোচনা-কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

সমালোচনা

তন্মধ্যে ভারতের ব্যবসায়ী সমাজ অন্যতম। তারা চতুর্থ পরিকল্পনাকে 'অবাস্তব' ও 'দুঃসাহসিক' বলে অভিহিত করেছেন। ব্যবসায়ী সমাজের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী (পরিকল্পনা কমিশনের সভাপতি) আক্ষেপের সুরে বলেছেন যে, দেশে শিল্পের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ হওয়া সত্ত্বেও ব্যবসায়ী সমাজের এই নৈরাশ্যজনক মনোভাব নিন্দনীয়। পরিকল্পনা কমিশনের সহকারী সভাপতি শ্রীঅশোক মেটাও ব্যবসায়ী সমাজকে এই হতাশার ভাব পরিত্যাগ করে পরিপূর্ণ প্রত্যয় নিয়ে নবভারত গঠনের ব্রতে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কথা থেকে যায়। কেবল আশাবাদকেই পুঁজি করে একটা পরিকল্পনার রূপায়ণ সম্ভব নয়। প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় জনসাধারণ

সরকারী আশাবাদে আস্থা স্থাপন করে বহু দুঃখ-বহন ও কষ্ট-সহন স্বীকার করে এতদিন মুখ বুজে আছে। তার বিনিময়ে সে আজ কি পেয়েছে, তার হিসাব মেলাতে তাদের মন আর রাজী নয়। এই নিরুৎসাহজনক পরিস্থিতিতে এই বিপুলাকার পরিকল্পনার রথ চালাবার প্রয়াস নিঃসন্দেহে দুঃসাহসের পরিচায়ক। অবশ্য, প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় সরকার যদি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারতেন, তবে দেশবাসীর মনে হতাশার এত অন্ধকার নেমে আসতো না। পরিকল্পনার রথ গতিহীন নয়, কিন্তু তার চলার বেগ বড়ই মন্থর। দেশবাসী তাতে সন্তুষ্ট নয়, সরকারও পথের ঠিকানা হারিয়ে দিশাহারা। তাছাড়া দেশে যে মাথাভারী এবং কর্ম-দক্ষতাহীন শাসনযন্ত্র বর্তমান, সেই শাসনযন্ত্রের হাতেই পড়বে পরিকল্পনার রূপায়ণের ভার। সরকার তাঁর চিরাচরিত নীতি ও কর্মপন্থা নিয়ে দেশ ও বিদেশ থেকে সংগৃহীত অর্থের দ্বারা যদি চতুর্থ পরিকল্পনার রূপায়ণে হাত দেন এবং তাতেও যদি কর্ম-কুশলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়, তবে তাতে দেশের উন্নতির পরিবর্তে দেশের সমূহ বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। চতুর্থ পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের চিত্রও তেমন আশাপ্রদ নয়। এই পরিকল্পনার পাঁচ বছরে বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে মোট সাড়ে তিন কোটি; কিন্তু পরিকল্পনার সর্বাঙ্গীণ সাফল্যে ২ কোটি ৩০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব হবে। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষেও ১ কোটি ২০ লক্ষ লোক বেকার থাকবে, এ দুঃখ রাখবো কোথায়?

কাজেই বৈষয়িক উন্নতির সুখ-সমুজ্জ্বল স্বর্ণ-তোরণ থেকে এখনও ভারত বহুদূরে। যাত্রা সূচিত হয়েছে; কিন্তু লক্ষ্য অনেক দূরে। বহু দুঃখ-বহন ও কষ্ট-সহনের মধ্য দিয়ে ভারতবাসী সেই সুখী সন্তুষ্ট জীবনের স্বপ্ন দেখছে। সেই স্বপ্ন তার সার্থক হবে তো? অর্থ-ব্যবস্থার মৌলনীতির পরিবর্তন ছাড়া ভারতের অর্থ-ব্যবস্থার সঠিক রূপায়ণ কেমন করে সম্ভব হবে? সর্বাগ্রে নীতির পরিবর্তন চাই। এ পর্যন্ত পরিকল্পনার বৃহদায়তন চক্রকে আবর্তিত করা হয়েছে ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগের পুঁজির ধাক্কায়; কিন্তু সেই বিনিয়োগের ক্রমবর্ধমান ফসল ঘরে তোলার কোন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। ফলে দেশের পুঁজি মুষ্টিমেয়ের হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের হাতে দিন-যাপনের ও প্রাণ-ধারণের গ্লানি দিনের পর দিন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে। দৈনন্দিন জীবনের সেই গ্লানির মধ্যে থেকেও আমরা আশা করে থাকবো, ১৯৬৬ সালের ১লা এপ্রিলের নব-অরুণোদয় ভারতের জীবনে জয়যুক্ত হবে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও তাহার সমীক্ষা
- চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি

৫২. বৃহত্তর কলকাতার সমস্যা ও মহানাগরিক পরিকল্পনা
Problem of Greater Calcutta and Metropolitan Planning.

প্রবন্ধ-সূত্র ঃ—অবতরণিকা—কলকাতার সমস্যার ভয়াবহ চিত্র—সমস্যার কারণ—সমাধান প্রয়াস ও বৃহত্তর কলকাতার মহানাগরিক পরিকল্পনা—ভৌগোলিক আয়তন বৃদ্ধি, উপনগরী নির্মাণ—বস্তি অপসারণ, পথ ও যাতায়াত—জল সরবরাহ ও জল নিষ্কাশন—স্বাস্থ্য ও শিক্ষা—ব্যবসা-বাণিজ্য ও বন্দর-রক্ষা—চতুর্থ পরিকল্পনায় কলকাতা মহানাগরিক পরিকল্পনা—অর্থ-সংস্থান—উপসংহার।

মহানগর কলকাতা আধুনিক ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ইতিহাসের হৃৎপিণ্ড। ভারতের ইতিহাসে বিগত দুশো বছরে যত উত্থান-পতন ঘটেছে, তার মূক সাক্ষী রূপে দাঁড়িয়ে আছে কলকাতা শহর। তার ইট-কাঠ-পাথরের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের কতো গৌরব-স্মৃতি। পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের গাঁটছড়া সে-ই তো বেঁধেছিল প্রথমে। কৃষি-ক্ষেত্র থেকে শিল্প-ক্ষেত্রে পদ-চারণার প্রথম প্রেরণামন্ত্র সে-ই যুগিয়েছিল। তারপর পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় এগিয়েছে ইতিহাস। ভাগীরথীর বুকেও অনেক জল বয়ে গেছে। কলকাতার কলেবর ক্রমাগত বৃদ্ধি হয়ে ধারণ করেছে বর্তমান মহানাগরিক রূপ। সেই সঙ্গে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে তার নানা জটিল সমস্যার গুরুভার। বহু দুরূহ সমস্যার পাহাড় মাথায় নিয়ে সে আজ বর্তমান কালের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। কণ্ঠে তার চরম জিজ্ঞাসা ঃ সে কি আরও কিছুদিন টিকে থাকবে, না তার টিকে থাকার আর কোনও প্রয়োজন নেই? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে মনে রাখতে হবে যে, আজ কেবল এশিয়ার অন্যতম সর্ব-বৃহৎ শহরাঞ্চলের এক অতি বৃহৎ জনসমষ্টির কল্যাণই বিপন্ন হয়নি কিংবা এখানকার সাধারণ মানবিক জীবন-যাপনই বিপন্ন হয়নি, সমগ্র উত্তর ভারতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-ব্যবসায়-কেন্দ্রের ভবিষ্যৎও আজ বিপন্ন।

অবতরণিকা

দুর্ভাগ্যের বিষয়, যে কলকাতা বিগত দু'শতাব্দী ধরে ভারতের ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, সে আজ ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে 'পচা শহর', 'মিছিল শহর' 'গন্ধা শহর' বলে ধিক্কৃত। সত্যকথা, তার যাতায়াতের পথঘাট, জল-সরবরাহ, জল-নিষ্কাশন, জঞ্জাল অপসারণ, খাদ্য-সরবরাহ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা—এককথায়, জীবনধারণের সকল দিকই আজ তার সমস্যা-কণ্টকিত। তার মূলে রয়েছে কলকাতার অভাবনীয় লোক-বৃদ্ধি। বিশাল জনভারে জর্জরিত

কলকাতার সমস্যার ভয়াবহ চিত্র

কলকাতার বর্তমান অবস্থা সংকটপূর্ণ এবং ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। প্রায় ৬৫ লক্ষ মানুষের জনতা আজ কলকাতার পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কিন্তু আশ্রয় কোথায়? কলকাতার সংকীর্ণ আয়তনে এই বিশাল জনতার বাসগৃহ-সংস্থান একেবারে অসম্ভব। তাই ফুটপাতে, পার্কে, ময়দানে, রকে, মোড়ে, গলিতে অজস্র মানুষের ভিড়। ভিড় সর্বত্র; ভিড়—ট্রেনে-বাসে-ট্রামে; ভিড়—সিনেমা-বায়োস্কোপে-থিয়েটারে; ভিড়—দোকানে-বাজারে-রেশনের লাইনে। রাস্তাঘাটে যানবাহনের অভাব, ফুটপাথে হাঁটার মতো জায়গার অভাব, হাসপাতালে পর্যাপ্ত সংখ্যক শয্যার অভাব, স্কুল-কলেজেও তেমনি স্থানাভাব। স্থানাভাবে কলকাতার জনসংখ্যার সিকি ভাগ লোকই বাস করে বস্তি নামক নরককুণ্ডে। বাড়ির সম্মুখে, স্কুল-কলেজের সম্মুখে, পার্ক ও বাজারের সম্মুখে জঞ্জালস্তূপ দিনে দিনে জমা হয়ে ওঠে; অপসারণের বিন্দুমাত্র প্রয়াস নেই। কলের জলে নেই বিশুদ্ধতার নিশ্চয়তা। কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড, ক্ষয়রোগ তো শহরবাসীদের নিত্য সঙ্গী। যখন শহরের পথে আবর্জনার স্তূপ পর্বত-প্রমাণ হয়ে ওঠে, কলের মুখে কেঁচো থেকে সাপের আবির্ভাব ঘটে, যখন নানা সংক্রামক ব্যাধি মহামারী আকার ধারণ করে কলকাতাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়, তখনই কলকাতা কর্পোরেশনের পৌর-পিতাগণ কথা-কাটাকাটির রেকর্ড ভেঙে হাতাহাতির নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন। এই তো হলো কলকাতার শহরবাসের ইতিকথা!

সমস্যার এই তীব্রতার পেছনে আছে কতকগুলি অনিবার্য কারণ। দ্বিতীয় মহাসমরের কাল থেকে কলকাতার জনসংখ্যা ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকে। ভাগ্যের অন্বেষণে কেবল উত্তর ভারত থেকেই নয় সমগ্র ভারতের জনগণ কলকাতায় এসে ভিড় করেছে।

সমস্যার কারণ

তারপর দেশবিভাগের পর অগণিত বাস্তুহারার দল নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে এসে দাঁড়িয়েছে কলকাতার বুকে। কলকাতার চারদিকে গড়ে উঠেছে বাস্তুহারাদের উপনিবেশ। তারপর কলকাতার সান্নিধ্যে শিল্প-বিকাশের ফলে বহুলোক কর্মোপলক্ষে এখানে এসে ভিড় করেছে। ফলে সমগ্র শিল্পাঞ্চল এক বড়-রকমের বস্তি এলাকায় পরিণত হয়েছে। প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোক বৃহত্তর কলকাতা-এলাকায় ভাসমান জন-গোষ্ঠীর মতো বর্তমান। তাদের একটা বিরাট্ অংশকে রুজি-রোজগারের প্রয়োজনে কলকাতায় আসতে হয়। তাতে শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে কলকাতার যাতায়াতের ব্যবস্থা ছাড়া মহানগরীর পরিবহণ ব্যবস্থাতেও মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। কলকাতার কর্মব্যস্ততা বেড়েছে, বেড়েছে কলকাতার জনসংখ্যা। অতি-জনতার ভারে কলকাতার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এখন টালমাটাল। এই ঘন জন-বিন্যাসের দরুন স্বাস্থ্য, জল-সরবরাহ, জল-নিকাশ, আবাসন ও পরিবহণ ব্যবস্থা এক অকল্পনীয় সমস্যার সম্মুখীন।

তার ফলে জঞ্জাল-স্তূপের মতো কলকাতার সমস্যা দিনে দিনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে। সমস্যা থেকে আসে সংঘাত। সেই সংঘাত আজ কলকাতার অলিতে-গলিতে, ট্রামে-বাসে, খেলার মাঠে, কর্পোরেশনে ও বিধান-সভায়। এই সংঘাতের হাত থেকে কলকাতাকে মুক্ত করতে হলে পূতি-গন্ধময় আবর্জনা-পরিকীর্ণ কলকাতার মুক্তি-স্নান চাই। চাই তার ৬৫ লক্ষ মানুষের বাসোপযোগী পরিসর; চাই বাসস্থান, জল সরবরাহ, জল-নিকাশ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুষম ব্যবস্থা; যেখানে ৬৫ লক্ষ মানুষ স্বাস্থ্য-সম্মত উপায়ে বেঁচে থাকতে পারে, তার বিজ্ঞান-সম্মত, রুচি-সম্মত আয়োজন। এই দুরূহতম সমস্যার সমাধান প্রয়াসেই বৃহত্তর কলকাতার মহানাগরিক পরিকল্পনার জন্ম। স্বর্গীয় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনিই বৃহত্তর কলকাতার মহানাগরিক পরিকল্পনার জনক।

সমাধান-প্রয়াস ও বৃহত্তর কলকাতার মহানাগরিক পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার গঠন করেছেন 'কলকাতা মেট্রোপলিটান্ পরিকল্পনা সংস্থা' নামে একটি সংসদ এবং ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ও রাষ্ট্রপুঞ্জ বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে চলেছে একটি পরিকল্পনা রচনার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। উলুবেড়িয়া থেকে বাঁশবেড়িয়া এবং কল্যাণী থেকে বজবজ ও বারুইপুর—এই সাড়ে চারশো বর্গমাইল এলাকার নামই কলকাতা মেট্রোপলিটান্ জেলা। ১৯৬৬ সালের মধ্যেই কলকাতা মেট্রোপলিটান্ জেলার জল সরবরাহ, জলনিকাশী এবং ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর সর্বাত্মক উন্নয়ন প্রকল্প রচনা শেষ হবে। এই প্রকল্প কার্যকরী করার উপযোগী একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা গঠনকল্পে বিধানসভার আগামী অধিবেশনে একটি বিল পাশ করানো হবে।

ভৌগোলিক আয়তন বৃদ্ধি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই এই পরিকল্পনার আংশিক রূপায়ণে হাত লাগিয়েছেন। কলকাতার পূর্বাঞ্চলে লবণ হ্রদ ভরাট করবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একটি বিদেশী সংস্থার হাতে। তাতে এক অতি-আধুনিক প্রক্রিয়ায় গঙ্গাগর্ভের পলি-মোচন ও লবণ-হ্রদ পূর্তির কাজ এক সঙ্গে চলেছে। কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলে বেহালা থেকে ডায়মণ্ডহারবার রোডের দুপাশের ৫৫ হাজার একর জমি পুনরুদ্ধার করে একটি নতুন উপনগরী নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। উত্তর দিকে কল্যাণী গড়ে উঠেছে। বৃহত্তর কলকাতার সঙ্গে সেও এসে মিলিত হবে। সোনারপুর উপনগরী নির্মাণের কার্যসূচী তৃতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হলেও তা চতুর্থ পরিকল্পনাকালেই কার্যকর হবে। বৈদ্যুতিক ট্রেন হবে দুই দিগন্তে যাতায়াতের প্রধান অবলম্বন। তাছাড়া মূল কলকাতাকে বেষ্টন করে স্থাপিত হবে চক্রবেড় রেল। বস্তির অপসারণ করে প্রশস্ত রাজপথ নির্মিত হবে। কলকাতা

উপনগরী নির্মাণ

উন্নয়ন সংস্থা (Calcutta Improvement Trust) সেই কাজে হাত লাগিয়েছেন। ইতিমধ্যে কতকগুলি প্রশস্ত রাজপথ নির্মিত হয়েছে। এদিকে বস্তি উন্নয়নের জন্য ১৪০০ একর জমি দখলের ও চার লক্ষ লোকের আবাসনের উপযোগী একটি প্রকল্প রচিত হয়েছে। বস্তিগুলির মালিকানা সরকারে বর্তাবার জন্যে বিল রচনার কার্যও সমাপ্ত। একমাত্র মহানগরীর বস্তি অপসারণের জন্যেই তিনশো কোটি টাকার প্রয়োজন। বৃহত্তর কলকাতার বস্তি অপসারণ আরো বহুগুণ ব্যয়-সাপেক্ষ, তা বলা বাহুল্য। টালা সেতুর উদ্বোধন হয়েছে এবং গড়িয়াহাটের লেভেল ক্রসিং-এ ওভার ব্রীজ্ তৈরীর কাজ সমাপ্তির পথে। অন্যদিকে হাওড়ার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও সহজ করে তোলার জন্যে হুগলী নদীর ওপরে ষোল কোটি টাকা ব্যয়-সাপেক্ষ দ্বিতীয় সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। আগামী কয়েক বছরে যে সমস্ত কার্যসূচী গৃহীত হবে, তাদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো, গঙ্গার ওপর দ্বিতীয় সেতু এবং কলকাতা চক্রবেড় রেলপথ। রাজ্য সরকার বৃত্তাকার রেলপথের বিস্তারিত সমীক্ষা ও প্রকল্প প্রস্তুত করার জন্যে রেলপথ-মন্ত্রককে অনুরোধ করেছেন এবং রাজ্য-সরকার এই সমীক্ষা-কার্য ও বিবরণ প্রস্তুত করবার জন্যে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়-ভার বহনে প্রস্তুত আছেন। জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং রাস্তায় যানবাহনের পরিমাণ বৃদ্ধির দরুন কলকাতা ও হাওড়া অঞ্চলের পরিবহণ সমস্যা যে গুরুতর আকার ধারণ করেছে, এই দুটি কার্যসূচী তা হ্রাস করতে সহায়ক হবে।

বস্তি অপসারণ, পথ ও যাতায়াত

বৃহত্তর কলকাতার জলসরবরাহ-ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলার জন্যে স্থাপিত হয়েছে পল্‌তা জল সরবরাহ কেন্দ্র। ৭২ ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট পাইপে জল সরবরাহ করা হবে সমগ্র কলকাতায়। সেই সঙ্গে গঙ্গাগর্ভকে পলিমুক্ত করে কলকাতার জল-নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কলকাতার স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থার জন্যে বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা সুপারিশ করেছেন। কলেরা, আন্ত্রিক রোগ ও ক্ষয়রোগের দাপটে কলকাতার মাঝে মাঝে নাভিশ্বাস ওঠে। ব্যাধি-কবলিত কলকাতার রোগ-মুক্তির জন্যে হাসপাতাল, ক্লিনিক ইত্যাদি ব্যবস্থার পাশে বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড, প্লেগ ইত্যাদি মহামারী প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কলকাতার শিক্ষায়তনগুলিতে এখন 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই' রব উঠেছে। নতুন কলেজ কতকগুলি স্থাপিত হয়েছে। স্থাপিত হবে আরো কয়েকটি নতুন কলেজ। যাদবপুর ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মভার অনেকাংশে লাঘব করে দিয়েছে। তবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় কমে নি, কাজের চাপও কমে নি।

জল সরবরাহ ও জল নিষ্কাশন

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা

কলকাতার ব্যবসা-বাণিজ্যকে আরো সহজ ও গতিশীল করে তোলার জন্যে হাওড়া স্টেশনকে ঢেলে সাজানো হয়েছে; নতুন পরিকল্পনায় ঢেলে সাজানো হচ্ছে শিয়ালদা স্টেশনকে। এদিকে কলকাতা বন্দরের সংস্কার ও পুনর্বিন্যাসের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। কারণ ১৯৭০-৭১ সালের মধ্যে কলকাতা বন্দরকে দু কোটি টন মাল চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া হল্‌দি নদীর মুখে পরিপূরক বন্দররূপে গড়ে উঠছে হলদিয়া বন্দর। তার সঙ্গে রেলপথে কলকাতার যোগসূত্র স্থাপিত হবে। অন্যদিকে ভাগীরথীর জল-প্রবাহের পুষ্টিসাধনের জন্যে গঙ্গার ওপরে ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। কলকাতাকে বাঁচাবার জন্য কলকাতা বন্দরকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও বন্দর-রক্ষা

বৃহত্তর কলকাতার মহানাগরিক পরিকল্পনার রূপায়ণে চতুর্থ যোজনায় যে ব্যয়-বরাদ্দ এবং ব্যয়-বণ্টনের ব্যবস্থার আয়োজন চলেছে, তার একটি তথ্য-চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো:

চতুর্থ পবিকল্পনায় কলকাতা মহানাগরিক পরিকল্পনা

	কোটি টাকা
কোনা উপনগরী	১·২০
কলকাতায় স্টেডিয়াম	১·৫০
সোনারপুর উপনগরী (তৃতীয় পরিকল্পনার বকেয়া)	৪·০০
কলকাতা ও হাওড়ার গৃহনির্মাণ কর্মসূচী	৩·৮৫
নগর অঞ্চলের পুনরুন্নয়ন	৩·০০
জল-সরবরাহ কর্মসূচী	৬·২৫
হাওড়া সেতু	১৬·০০
পয়ঃপ্রণালী, জলনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা কর্মসূচী	১১·৯৯
সড়ক	১৮·৯৩
হাওড়ায় বস্তি-উন্নয়ন কর্মসূচী	২·০০
সমাজসেবা, পার্ক ও মনোরঞ্জন, শিক্ষা	৮·০০
কলকাতা মহানাগরিক পরিকল্পনা সংস্থার সাংগঠনিক ব্যয়	১·৫০
আসানসোল-রানীগঞ্জ পয়ঃপ্রণালী কর্মসূচী	১·০০
জল-সরবরাহ, বস্তি-উন্নয়ন, পরীক্ষামূলক গৃহনির্মাণ, জনসমষ্টির বহির্গমন সম্ভাবনা, সমীক্ষা প্রভৃতির দরুন তৃতীয় পরিকল্পনার বকেয়া ব্যয়	২১·৭৮
মোট	১০১·০০

তৃতীয় যোজনায় মহানাগরিক পরিকল্পনার রূপায়ণে ১০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায়ও অনুরূপ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। আশা ছিল,

কেন্দ্রীয় সাহায্যের ১০ কোটি টাকার বৃহত্তর অংশ অনুদানরূপে প্রদত্ত হবে। কিন্তু কলকাতা মহানাগরিক পরিকল্পনা সংস্থার সাংগঠনিক মোট ব্যয় এক কোটি টাকা ছাড়া—প্রায় সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সাহায্যই ঋণ রূপে প্রদত্ত হচ্ছে। এই পরিকল্পনার সার্বিক রূপায়ণে অন্ততঃ ২২০ কোটি টাকার প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনেক আগেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার

অর্থ-সংস্থান

এ পর্যন্ত এই পরিকল্পনাকে স্বীকার করেন নি। তাঁদের ধারণা, কলকাতার সমস্যা নিতান্তই পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা এবং তার সমাধান-দায়িত্বও একান্তভাবে পশ্চিমবঙ্গের। অগত্যা পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিশাল পরিকল্পনার রূপায়ণে অগ্রসর হয়েছিলেন। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় সরকার বা পরিকল্পনা কমিশন কলকাতা সম্পর্কে তাঁদের দায়িত্ব স্বীকার করতে রাজী হন নি বটে; কিন্তু বিশ্ব ব্যাঙ্কের সমালোচনার পরেই কলকাতার শঙ্কাজনক পরিস্থিতির দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

কলকাতার সম্প্রসারণ ও সংগঠন, তার স্বাস্থ্য, জল-সরবরাহ, জল-নিষ্কাশন, আবাসন, যাতায়াত ইত্যাদি নাগরিক জীবনের যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করবার জন্যে

উপসংহার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই প্রাথমিক নিঃসঙ্গ প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কলকাতা কেবল পশ্চিমবঙ্গের নয়, পূর্ব ও উত্তর ভারতের প্রাণকেন্দ্র—কেন্দ্রীয় সরকারের তা বুঝে উঠতে এত বিলম্ব হওয়ার কারণ কি? কেন্দ্রীয় সরকার কি জানেন না—পূর্ব ও উত্তর ভারতের বাণিজ্য-পসরা কে সাজায়? পূর্ব ও উত্তর ভারতের সমৃদ্ধি আসে কোন্ পথে? সে তো 'নবযুগের জ্যোতির কনকপদ্ম কলকাতা।' এবং আমরা বিশ্বাস করি—'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে।'

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- **কলকাতা নগরের বিচিত্র সমস্যা, ক. বি. '৬৪**
- **বৃহত্তর কলকাতার মহানাগরিক পরিকল্পনা**

৫৩. হলদিয়া বন্দর ও তাহার ভবিষ্যৎ
The Haldia Port and Its Future.

প্রবন্ধ-সূত্র ঃ—অবতরণিকা—তাম্রলিপ্তের ঐতিহ্যে হলদিয়ার জন্ম—হলদিয়া বন্দরের প্রয়োজনীয়তা—অবস্থান ও পশ্চাদ্‌ভূমি—যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা—হলদিয়া বন্দরের নির্মাণ ও নির্মাণ-ব্যয়—'অবাধ-আমদানি-অঞ্চল'—'অবাধ-বাণিজ্য-বন্দর'—অবাধ-বাণিজ্য-প্রেরণা—হলদিয়া বন্দরের সম্ভাব্য অবদান—ক্ষতি, তবু ক্ষতি নয়—উপসংহার।

কলকাতা বন্দরের মৃত্যু-আশঙ্কা থেকেই হলদিয়া বন্দরের জন্ম। হুগলী নদীর দাক্ষিণ্যেই কলকাতা বন্দরের সমৃদ্ধি। আজ সেই হুগলী নদীর ধারা-কার্পণ্যে কলকাতা বন্দরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা আশঙ্কার জল্পনা-কল্পনা দেখা দিয়েছে বিভিন্ন চিন্তাশীল মহলে।

অবতরণিকা

একদিকে যখন কলকাতার মৃত্যু-লগ্ন ঘনিয়ে আসছে, তখনই ভারতের অতীত বাণিজ্যের ধূসর দিগন্তে দেখা দিচ্ছে নতুন আলো, নতুন সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনার নাম হলদিয়া বন্দর। ভারতের বাণিজ্য-সম্ভাবনার বিপুল আশ্বাস নিয়ে ভারতের এই পূর্ব দিগন্তে তার আবির্ভাব ঘটতে চলেছে। তার জন্যে চলেছে নানা আয়োজন, নানা প্রস্তুতি।

কয়েক বছর আগেও হলদিয়া ছিল অখ্যাত গণ্ডগ্রাম। সে অখ্যাত হলেও বিশ্ব-বিখ্যাত তাম্রলিপ্ত বন্দরের বিপুল ঐতিহ্য তাকে ঘিরে রেখেছে। বলা যায়, তাম্রলিপ্ত বন্দরের গৌরবময় ঐতিহ্যে হলদিয়ার জন্ম। যিশু খ্রীস্টের জন্মের বহু পূর্বেই প্রাচী-ধরিত্রীর

তাম্রলিপ্তের ঐতিহ্যে হলদিয়ার জন্ম

শ্রেষ্ঠ সমুদ্র-বন্দর রূপে তাম্রলিপ্ত খ্যাতিলাভ করেছিল, যার উল্লেখ রয়েছে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে। এখান থেকে সমুদ্র-পথে সুদূর সিংহল, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, এমনকি চীন দেশেও যাত্রা করতো বণিকদল। পঞ্চম শতকে ফা-হিয়েন এবং সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙ এখান থেকেই স্বদেশে যাত্রা করেছিলেন। এখানে ছিল একটি বৌদ্ধমঠ, ছিল মহামতি অশোকের নির্মিত একটি বৌদ্ধস্তূপ। অষ্টম-নবম শতকের পর তাম্রলিপ্তের গৌরব-সূর্য অস্তমিত হলো। বিশাল ধূসর বালুকাময় চর তাম্রলিপ্তের কপালে রেখে বঙ্গোপসাগর সরে গেল সুদূর দক্ষিণে। তাম্রলিপ্ত বালুকাময় প্রান্তরে ঘুমিয়ে পড়লো। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সে আবার জাগছে নতুন নামে। তাম্রলিপ্ত ও হলদিয়ার মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান মাত্র কয়েক মাইলের ; কিন্তু কালের ব্যবধান হাজার বছরের।

সেই হাজার বছরের ব্যবধান অপসারিত করে হলদিয়া বন্দরের উদ্ভব হলো। তাম্রলিপ্তের স্বার্থে নয়, কলকাতা বন্দরের স্বার্থে। গঙ্গার মূল জলধারা পদ্মাবক্ষ আশ্রয় করায় এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণে হুগলী নদীতে দেখা দিয়েছে নিদারুণ জল-কার্পণ্য। হুগলী নদীর সেই নাব্যতা-গৌরব আজ আর নেই। কলকাতা বন্দর তাই ভারী জাহাজের মুখ দেখতে পায় না। হলদিয়ায় কিছু পণ্যাবতরণ ঘটিয়ে ভারী জাহাজগুলি আংশিক ভারমুক্ত হলে তবেই কলকাতা বন্দরে এসে ভিড়তে পারে। ইতিমধ্যে হলদিয়ায় খাদ্য-পণ্যাবতরণের পরিমাণ ক্রমবর্ধিষ্ণু। ১৯৬১-৬২ সালে ৪৬,৬৫২ টন এবং ১৯৬২-৬৩ সালে ৬৩,০০০ টন খাদ্য-পণ্যের অবতরণ ঘটেছে হলদিয়ায়। তাও বছরের চার মাস—নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী হলদিয়া কর্ম-মুখর থাকে। এই কাল-পরিধি বৃদ্ধি করা যায় কিনা এখন চিন্তা করা হচ্ছে। এইভাবে টোকিয়োর ইয়াকোহামার মতো কলকাতার সহায়ক বন্দর (ancillary port) রূপে হলদিয়া গড়ে উঠছে। কলকাতা মেট্রোপলিটান্ প্ল্যানিং সংস্থা তার ১৯৬২ সালের রিপোর্টে তাই জানালেন "The importance of the deep sea-port at Haldia as an auxiliary to the port of Calcutta has been well-established with the development of the Haldia port, urbanization of the immediate vicinity would be inevitable."

হলদিয়া বন্দরের প্রয়োজনীয়তা

হলদিয়া মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমায় হুগলী ও হল্‌দি নদীর সঙ্গম-স্থলে হল্‌দি নদীর বাম উপকূলে অবস্থিত। কাঁসাই ও কেলেঘাই এই নদী-যুগলের যৌথ প্রবাহেই হল্‌দি নদীর সৃষ্টি। এই অঞ্চলের জনবসতি ঘন এবং কৃষি ও শিল্প-সম্পদ প্রচুর। এই অঞ্চল থেকে ধান, নারকেল, তরি-তরকারী ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য এবং মাদুর, তাঁতবস্ত্র ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য কলকাতার বাজারে চালান দেওয়া হয়ে থাকে। পশ্চাদ্ভূমিরূপে হলদিয়া পেয়েছে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার কিয়দংশ। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার কৃষি ও শিল্প-সমৃদ্ধ অঞ্চল যে হলদিয়ার সমৃদ্ধির দুয়ার খুলে দেবে, তা বলা বাহুল্য। যন্ত্রপাতি, সিমেণ্ট, কাগজ ও চীনা বাসনের কারখানার এখানে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

অবস্থান ও পশ্চাদ্ভূমি

হলদিয়া বন্দরের উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গেই রেলপথে একটি সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। পরিবহণ-মন্ত্রী শ্রীরাজবাহাদুর জানিয়েছেন, দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের পাঁশকুড়া স্টেশনের সঙ্গে হলদিয়া বন্দরের নতুন ব্রড্‌গেজ রেলপথের গাঁটছড়া বেঁধে দেওয়া হবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। তাহলে শুধু কলকাতা বন্দরের সঙ্গেই নয় ভারতের অন্যান্য বন্দরগুলির সঙ্গেও তার নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হবে। সড়কপথে

রেলপথে ও জলপথে উড়িষ্যা রাজ্যের সঙ্গেও তার যোগাযোগ সহজ হবে। এই ব্যাপারে উড়িষ্যা ক্যানেল এবং হিজলি টাইড্যাল্ ক্যানেলের ভূমিকা হবে অসামান্য। একদিকে হলদিয়া থেকে সুতাহাটা ও তমলুক হয়ে পাঁশকুড়া পর্যন্ত রয়েছে মোটর চলার উপযোগী সড়ক। পরিবহণ-মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, ৬নং জাতীয় রাজপথ (National highway) থেকে হলদিয়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের প্রাথমিক তদন্ত সমাপ্ত হয়েছে। মৃত্তিকা খনন ও জমি দখল কতখানি ব্যয়-সাপেক্ষ, তা এখন বিবেচনাধীন। বন্দরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ ও পরিবহণ-ব্যবস্থার আরো উন্নতি হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা

কলকাতা থেকে ৫৬ মাইল দূরে প্রচুর সম্ভাবনা নিয়ে গড়ে উঠেছে হলদিয়া। এখানে থাকবে পাঁচটি বার্থ (berth)-সমন্বিত এক সুষ্ঠু ডক-ব্যবস্থা: কয়লার জন্যে দুটি বার্থ, আকরিক লৌহের জন্যে একটি এবং সাধারণ জাহাজী মালের জন্য দুটি। একটি জেটি থাকবে খনিজ তৈলের জন্যে। সম্প্রতি সংসদীয় হিসাব কমিটি এখানে একটি বৃহৎ ড্রাই ডক স্থাপনের প্রস্তাব করেছেন। হলদিয়া বন্দরে কেন্দ্রীয় সরকার ৩০ কোটি টাকা ব্যয়-সাপেক্ষ ২৫ লক্ষ টনের একটি তৈল-শোধনাগার স্থাপনের প্রকল্প অনুমোদন করেছেন। রুমানিয়া ভারতের সহযোগিতায় এই তৈল-শোধনাগার নির্মাণে আগ্রহী। তাছাড়া পূর্ব-পাকিস্তানাগত নয় লক্ষাধিক বাস্তুহারার কর্ম-সংস্থানের জন্যে হলদিয়া বন্দর-এলাকায় পেট্রো-কেমিক্যাল কমপ্লেক্স ও বিভিন্ন শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে। তৈল-শোধনাগার, দস্তা স্মেল্টার এবং তৈল-রসায়ন-শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হলদিয়ার শিল্পায়নের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। শুধু তাই নয়, রপ্তানি-ভিত্তিক লৌহ এবং ইস্পাত-শিল্পের সম্ভাবনাও বিপুল। আশা করা যায়, বিশ্বব্যাঙ্ক হলদিয়ার জন্যে ১৪ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন করবেন। ১৯৬৬ সালের মধ্যে হলদিয়া বন্দরের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হবে বলে অনুমান। নির্দিষ্ট সময়মত এই নির্মাণকার্য সমাপ্ত করবার জন্যে বিভিন্ন পর্যায়ে সময়-তালিকা স্থির করে দেওয়া হয়েছে। এতে ব্যয় হবে ২৫ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই প্রকল্পের জন্যে ৭ কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে। অবশিষ্ট অংশের নির্মাণকার্য চতুর্থ পরিকল্পনায় সমাপ্ত হবে বলে জানা গিয়েছিল। সম্প্রতি জানা গেছে যে, বিশ্বব্যাঙ্ক হলদিয়া বন্দর নির্মাণে এবং পশ্চাদ্ভূমির সঙ্গে তার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সাহায্যের দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছে। তাতে মনে হয়, ১৯৬৭ সালের মধ্যেই হলদিয়া বন্দরের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হবে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, হলদিয়া পাঁশকুড়া ব্রডগেজ রেলপথের নির্মাণ ব্যয় হবে ৮ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। যাই হোক, সংসদীয় হিসাব কমিটি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে হলদিয়া প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

হলদিয়া বন্দরের নির্মাণ ও নির্মাণ-ব্যয়

ইতিমধ্যেই হলদিয়া বন্দরকে কেন্দ্র করে ভারতের বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা, পরীক্ষা-পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে। তার সমৃদ্ধি কামনায় সকলেই আজ উদ্‌গ্রীব। হলদিয়া বন্দরের উন্নতি-কল্পে ভারতীয় অনুসন্ধান সমিতি (Indian Enquiry Association) লক্ষ্য করলেন, হলদিয়া বন্দর থেকে রপ্তানিযোগ্য ভারতীয় যন্ত্রপাতির পরিমাণ হবে নগণ্য। তাই সমিতি প্রস্তাব করলেন, "Engineering exports from the Haldia port would be brightened if a substantial measure of economic freedom and tax-relief be granted in the Haldia zone. The zone may be declared a tax-free industrial area for export orientation." তাই হলদিয়া বন্দরের দ্রুত বিকাশের জন্যে এই অঞ্চলে মূলধনী দ্রব্য, কাঁচামাল ও শিল্পোপকরণ ইত্যাদির অবাধ প্রবেশ, উৎপাদন-পর্যাপ্তি ও প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে শিল্পজাত পণ্যের সহজলভ্যতার প্রকল্প রচনা ও শিল্পানুমতি ব্যাপারে উদারতা প্রদর্শনের জন্যে সমিতি সুপারিশ করেছেন। তার জন্যে যন্ত্রপাতি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি-ক্ষেত্রে সরকারী অনুদান পৌঁছিয়ে দিতে হবে এবং উৎসাহিত করতে হবে রপ্তানি-প্রেরণাকে। শুল্ক-বিধি, দুর্লভ পণ্যাদির বিশেষ বরাদ্দ, প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যহ্রাস, বিশেষ আমদানি-সুবিধা এবং বৈদেশিক বাজারানুসন্ধান ইত্যাদির মাধ্যমে রপ্তানি-প্রেরণা সৃষ্টি করা যায়। কেন্দ্রীয় পরিবহণ-মন্ত্রী শ্রীরাজবাহাদুর বলেছেন, কান্দলার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই হলদিয়ায় অবাধ-বাণিজ্য-বন্দর স্থাপিত হবে।

অবাধ-আমদানি-অঞ্চল

হলদিয়ার 'অবাধ-আমদানি-অঞ্চল' প্রকল্পের প্রবক্তা হলেন ভারতীয় বাস্তুকার সমিতি (Indian Engineering Association)। ঐ সমিতির মতে, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি-বৃদ্ধির ফলে সমগ্র দেশের, বিশেষতঃ ঐ অঞ্চলের সমৃদ্ধির দ্বারোদ্ঘাটন হবে। সমিতি শিল্পজাত পণ্যাদির রপ্তানি-বৃদ্ধির ওপরেও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে হলদিয়া সিঙ্গাপুর ও হংকং-এর মতো 'অবাধ-বাণিজ্য-বন্দর'রূপে গড়ে উঠবে। তার জন্যে ১২৫ বর্গমাইল এলাকাই যথেষ্ট হবে না। অন্ততপক্ষে ২০০ বর্গমাইল এলাকা প্রয়োজন। উত্তরে ও পূর্বে হুগলী নদী, দক্ষিণে হল্‌দি নদী এবং পশ্চিমে হিজ্‌লি টাইড্যাল ক্যানেল-এর মধ্যবর্তী ২০০ বর্গমাইল এলাকা পরিচিত হবে হলদিয়া 'অবাধ-বাণিজ্য-অঞ্চল'। অবাধ বন্দরের দ্রুত সমৃদ্ধির জন্যে এই অঞ্চলে দ্রুত শিল্প-বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। এই অঞ্চলে বিঘোষিত বাণিজ্য-প্রেরণার সুযোগ গ্রহণ করবার জন্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাগ্রসর দেশগুলি এগিয়ে আসবে। ভারত হয়তো তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারবে না। তার জন্যে যাতে রাষ্ট্রায়ত্ত

'অবাধ-বাণিজ্য-বন্দর'

কারখানাগুলি বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় বিদেশী কারখানাগুলির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে, তার উৎসাহ দান করতে হবে। সেই কারখানাগুলি হলদিয়া বন্দরে আমদানি ও রপ্তানি—উভয়বিধ কর-অব্যাহতি লাভ করবে।

হলদিয়ায় অবাধ-বাণিজ্য গড়ে তোলার সপক্ষে সমিতি কতকগুলি সুপারিশও করেছেন। সুপারিশগুলি হলো : এক, অঞ্চলটি ভারতীয় শুল্ক-প্রাচীরের বাইরে থাকবে এবং ঐ অঞ্চলের উৎপন্ন পণ্যসম্ভার বিশ্বের সব দেশেই রপ্তানি হতে পারবে। ভারতের ঘরোয়া বাজারও এই ব্যাপারে বৈদেশিক বাজারের অনুরূপ ব্যবহার পাবে। দুই, বৈদেশিক ও ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি এখানে স্বল্পতম বাধানিষেধের বন্ধনীর মধ্যে কারখানা স্থাপন বা যন্ত্র-যোজনা (assembly plants) করতে পারবে। তিন, এখানে বিনা শুল্কে মূলধনী দ্রব্য, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতির অংশবিশেষ আমদানি করা যাবে। চার, শ্রমিক ও কর্মচারী ভারত ও বিদেশ থেকে সংগৃহীত হবে। পাঁচ, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর হবে সুবিধাজনক এবং লাভের কড়ি যে দেশে প্রবাহিত হয়ে যাবে, সে দেশেই কর দান করতে হবে।

অবাধ-বাণিজ্য-প্রেরণা

এই অবাধ বন্দর ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে পরিকল্পিত তার অবদান রাখবে নানাভাবে। সম্ভাব্য সেই অবদানগুলির কথা সমিতি তার রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন : এক, ভারতীয় কারখানাগুলি বিদেশী কারখানাসমূহের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবার শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে। একবার বাইরের কাঁচামাল বা যন্ত্রোপকরণ প্রবেশলাভ করলে পূর্ণ শক্তি দিয়ে ভারতীয় শিল্পায়তনগুলি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে। দুই, হলদিয়া বন্দরের প্রতিশ্রুত সুযোগ-সুবিধা রপ্তানি-বাণিজ্যের জন্যে বহু নতুন প্রতিষ্ঠানকে আকৃষ্ট করবে; সেই সঙ্গে বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলিকেও সম্প্রসারণের জন্যে প্রলুব্ধ করবে। তিন, হলদিয়ায় যে সব কারখানা স্থাপিত হবে, তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ভারত থেকেই সংগৃহীত হবে। ফলে, ভারত ঘরের দুয়ারে বসেই বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করতে পারবে। চার, ব্যাঙ্ক, বীমা ও জাহাজী ব্যবসায় ইত্যাদির মাধ্যমেও বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন সম্ভব হবে। পাঁচ, বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলি ঐ অঞ্চলে সরবরাহ করবার জন্যে এবং ভারতে রপ্তানি করবার জন্যে এখানে প্রচুর যন্ত্রোপকরণ এবং অতিরিক্ত অংশবিশেষ মজুত করে রাখবে। ক্রেতাদের এই সমস্ত পণ্য অধিক পরিমাণে মজুত রাখবার আর প্রয়োজন থাকবে না। তখন তারা ঐ অর্থ উৎপাদনের জরুরী প্রয়োজনে খাটাতে পারবে। ছয়, ভারতে রপ্তানি করবার জন্যে বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্ডার অনুযায়ী উৎপন্ন বা আংশিক উৎপন্ন অংশসমূহের পণ্য-যোজনা করতে হবে এখানেই। তাছাড়া প্যাকিং ইত্যাদিও করতে হবে। তার জন্যে তাদের কিছু ভারতীয় পণ্য ভোগ

হলদিয়া বন্দরের সম্ভাব্য অবদান

করতে হবে এবং নিয়োগ করতে হবে ভারতীয় শ্রমিকদের। ফলে, ভারতের বেকার সমস্যার কিছুটা সমাধান তো হবেই, বৈদেশিক মুদ্রাও কিছু পরিমাণ উপার্জন করা সম্ভব হবে।

এই প্রসঙ্গে হলদিয়া বন্দর ভারতের অর্থনীতিকে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত করবে, তাও বিবেচ্য। হলদিয়ায় উৎপন্ন পণ্য রপ্তানি-শুল্ক (export duty) ছাড়াই পৃথিবীর যে কোন দেশে প্রবেশ করতে পারবে। কিন্তু ভারতীয় পণ্য রপ্তানি-শুল্ক দিয়ে তবেই তা রপ্তানি হতে পারবে। কাজেই হলদিয়ায় জাত ভারতীয় পণ্য এবং ভারতে জাত ভারতীয় পণ্যের মধ্যে প্রতিযোগিতা হবে এবং সে প্রতিযোগিতায় বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন ব্যাহত হবে। কিন্তু সমিতির মতে এই ক্ষতির পরিমাণ কার্যতঃ হবে নগণ্য। তাছাড়া ভারত থেকে হলদিয়ায় পণ্য বা পণ্যাংশ রপ্তানি হবে এবং তাতে রপ্তানি-শুল্ক ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ হবে যথেষ্ট। কাজেই আশঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই।

ক্ষতি, তবু ক্ষতি নয়

আশঙ্কিত হবার মতো কারণ আছে অন্যদিকে। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে হুগলী নদীর অববাহিকায় অনুরূপ বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি গড়ে উঠে দেশের সর্বনাশ সাধন করেছিল। সেই কলঙ্কিত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে, পূর্বাহ্নে তার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। আর সেই সঙ্গে প্রস্তুত হতে হবে অবাধ-বাণিজ্য-বন্দরের সম্ভাব্য দুর্নীতি ও নানা সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপকে দমন করতে। চোরাই কারবার (smuggling), দুর্নীতি ও সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপের স্বর্গ সিঙ্গাপুর ও হংকং-এর মতো হলদিয়া বন্দরও যদি গড়ে ওঠে, তবে আশঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। তবে একথাও সত্য যে, তা দমন করা সরকারের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠবে। কিন্তু ভারতের পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্যে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের এ ছাড়া অন্য পথ নেই। তাই দেখা যায়, কলকাতার ভাগ্যাকাশে যখন সূর্য অস্তাচলগামী, ঠিক তখনই হলদিয়ার ভাগ্যাকাশে উদিত হচ্ছে নবযুগের সূর্য।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়ঃ

- অবাধ-বাণিজ্য-বন্দর রূপে হলদিয়া

৫৪. ভারতের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য
State Trading in India.

প্রবন্ধ-সূত্র :—অবতরণিকা—রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের লক্ষ্য—কায়েমী-স্বার্থ-গোষ্ঠীর বিরূপ সমালোচনা—সমর্থক গোষ্ঠীর যুক্তি-প্রাচীর—রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের কার্য-সূচী—সাফল্য : ভারতের বাণিজ্যে যুগান্তর—আমদানি ও রপ্তানি—পুঁজি ও সম্প্রসারণ—উপসংহার।

এতদিন ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য বেসরকারী হস্তে পরিচালিত হয়েছে। ভারতের সেই স্বার্থসন্ধ, দুর্নীতি-পরায়ণ ব্যবসায়ী-গোষ্ঠী একদিকে ভারতের বহির্বাণিজ্যে জাতীয় স্বার্থকে পদদলিত করেছে, অন্যদিকে অন্তর্বাণিজ্যে সৃষ্টি করেছে বণ্টনমূলক অসাম্য এবং চোরাকারবার, মজুতদারী ও ফটকাবাজির এক কলঙ্কিত ইতিহাস। তাছাড়া ভারত ধীরে ধীরে বাহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বহু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যে অবতীর্ণ হতে চলেছে। বেসরকারী উদ্যোগে ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেনে সেরূপ ক্ষেত্রে নানারূপ অসুবিধার সম্ভাবনা। ভারতও তো সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ প্রতিষ্ঠার ব্রত গ্রহণ করেছে। তবে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যকে আর বেসরকারী উদ্যোগ-নির্ভর রাখার সার্থকতা কি? বিশেষতঃ বেসরকারী উদ্যোগে যখন প্রতি বছরেই ভারতের ভাগ্যে জুটছে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত? ভারতীয় বাণিজ্যে তাই হাওয়া-বদলের উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালের মে মাসে সূচিত হলো রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য উদ্যোগ। উদ্যোগ-পর্বে এই সংস্থা ছিল ভারতীয় কোম্পানী আইনের (১৯৫৬) বলে গঠিত একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী মাত্র।

অবতরণিকা

ভারতের বাণিজ্য-জগতের অজস্র ত্রুটি। সেই ত্রুটিগুলির অন্যতম হলো, তার বহির্বাণিজ্য-পরিচালনার উপযুক্ত সংগঠনের অভাব। বেসরকারী হাতে আমদানির তুলনায় রপ্তানির স্বল্পতা, বহির্বাণিজ্যে ও আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত এবং বৈদেশিক মুদ্রা-সংকট—এই সকল ত্রুটি ভারতের অর্থনীতি বেশি দিন সহ্য করতে পারে না। তাই ভারতের বহির্বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কাঠামো শক্তিশালী করবার জন্যে, আমদানি-নিয়ন্ত্রণ এবং রপ্তানি-বৃদ্ধির জন্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ও রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা। তবে বহির্বাণিজ্যে বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বেসরকারী বাণিজ্য সংস্থাগুলির স্থান গ্রহণ এর উদ্দেশ্য নয়। এর লক্ষ্য হলো, বেসরকারী বহির্বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির পাশাপাশি একটি রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের স্রোত

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের লক্ষ্য

প্রবাহিত করা, যা রপ্তানি বৃদ্ধি করে বৈদেশিক বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ভারতের বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের এই শুভ সূচনায় কায়েমী-স্বার্থ-গোষ্ঠী বিচলিত বোধ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তোলে প্রবল সমালোচনার ঝড়। তাদের ধারণায় রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য-উদ্যোগে বেসরকারী বাণিজ্য-উদ্যোগের প্রতিপত্তি খর্ব হয়ে যাবে। তাদের বিরোধিতার চিরাচরিত যুক্তি হলো: এক, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরিচালিত বহির্বাণিজ্যে আমলা-তান্ত্রিকতার লালফিতের বজ্র-আঁটুনি অনিবার্যরূপে দেখা দেবে; দুই, বহির্বাণিজ্যের ব্যাপারে সরকারী দক্ষতা, তৎপরতা ও অভিজ্ঞতার অভাবে হাতে সাফল্যের চেয়ে ব্যর্থতার অঙ্কই জমবে বেশি; তিন, বেসরকারী উদ্যোগ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে; চার, সরকারী একচেটিয়া কারবারের পরিণাম কখনই শুভ হবে না; পাঁচ, বাণিজ্যে ক্ষতি প্রতিরোধের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব এর অন্যতম প্রধান ত্রুটি এবং ছয়, সামগ্রিকভাবে দেশের বাণিজ্যে অবনতিই হবে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য উদ্যোগের চরম পরিণাম। কায়েমী-স্বার্থের এই বিরূপ সমালোচনার ভিত্তি ছিল ধুরন্ধর ব্যবসায়ী-চক্রের স্বার্থ-সংঘাতের ভবিষ্যৎ আশঙ্কা। তবু তাদের সমালোচনা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়, তা পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতা প্রমাণিত করেছে।

কায়েমী-স্বার্থ-গোষ্ঠীর বিরূপ সমালোচনা

সে যাই হোক, এর সমর্থকগণের মতে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় নিঃসন্দেহে ভারতীয় সংবিধান ও সরকারী নীতি-সম্মত। তাঁদের যুক্তি হলো: এক, জাতীয় স্বার্থরক্ষার খাতিরে সরকার কর্তৃক আমদানি-নিয়ন্ত্রণ একান্তভাবে কাম্য; দুই, বেসরকারী বাণিজ্যে যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা চলে, তার অবসান হবে; তিন, মধ্যবর্তী কারবারীগণের বিলোপের দ্বারা রপ্তানি ও আমদানি দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাবে; চার, আমদানি-ব্যয়ও হ্রাস পাবে; পাঁচ, দেশে আমদানি-পণ্যের একটা সুষম বণ্টন সম্ভব হবে; ছয়, বহির্বাণিজ্যে অনুকূল সর্ত আদায় করা যাবে; সাত, আমদানি-কৃত পণ্যমূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষিত হবে; আট, ভারতীয় পণ্যের নতুন বাজার-সৃষ্টি ও রপ্তানি-বৃদ্ধির নতুন দিগন্ত দেখা দেবে; নয়, বিদেশী মুদ্রা-তহবিলের ওপর চাপ হ্রাস পাবে এবং রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে দেশে খাদ্যশস্যের ক্রয়-বিক্রয় ও বণ্টন-ব্যবস্থা পরিচালিত হলে মজুতদারী ও ফট্‌কাবাজি বন্ধ হবে। সমর্থক-গোষ্ঠীর এই যুক্তিগুলি আশাপ্রদ এবং সেই জন্যে সমর্থনযোগ্য। কাজেই এই দৃঢ় যুক্তি-প্রাচীরের গায়ে কায়েমী-স্বার্থ-গোষ্ঠীর সমালোচনার যুক্তি প্রতিহত হয়ে ফিরে গেছে।

সমর্থক-গোষ্ঠীর যুক্তি-প্রাচীর

যুক্তি ও প্রতিযুক্তির ঘূর্ণাবর্তের মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থার যাত্রা সুরু। প্রথমেই রপ্তানি-বৃদ্ধির জন্যে নতুন নতুন বাজার সৃষ্টির অভিপ্রায়ে নতুন দিগন্তের অনুসন্ধান করবে এই সংস্থা। সেই সঙ্গে অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানির নতুন নতুন উৎস আবিষ্কারও তাকে করতে হবে। শুধু তাই নয়, বিদেশ থেকে বাণিজ্যের অনুকূল সর্ত আদায়ের মাধ্যমে এই সংস্থা দেশের বহির্বাণিজ্যের সমৃদ্ধির সূচনা করবে। তাছাড়া সে আমদানির ব্যয়-সংকোচ সাধন করে স্থিতমূল্যে দ্রব্য আমদানি করে ও দেশে যথাযথ বণ্টনের ব্যবস্থা করে ভারতের বাণিজ্যে একটা সুস্থ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করবে।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের কার্য-সূচী

সূচনা-লগ্ন থেকে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে মোটামুটি সাফল্যের সঙ্গে বাণিজ্য পরিচালনা করে আসছে এবং তাতে রপ্তানি বৃদ্ধি করে তার পরিবর্তরূপে ইস্পাত, সিমেণ্ট এবং যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আমদানি করে আসছে। ফলে ভারতের বিদেশী-মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে। ভারতের বহির্বাণিজ্যে এসেছে বৈচিত্র্য এবং দেশের চিরাচরিত ও নতুন দ্রব্য-সামগ্রীর বাজারে সৃষ্টি হয়ে চলেছে নতুন নতুন দিগন্ত। এই সংস্থা কস্টিক সোডা, সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ, পারদ, কর্পূর, রং ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল বেশি পরিমাণে আমদানি করে এবং দেশের মধ্যে তাদের বণ্টনের সুব্যবস্থা করে পণ্যগুলির মূল্য হ্রাস ও স্থিতিশীলতার ব্যবস্থা করেছে। শুধু তাই নয়, এই পণ্যগুলি এমন পরিমাণে আমদানি করা হচ্ছে, যাতে বিভিন্ন শিল্পে এদের সরবরাহের ঘাটতি কখনও না হয়। এই পণ্যগুলি দেশে যাতে ভবিষ্যতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতে পারে, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা তার জন্যেও সচেষ্ট। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠান আমদানি-রপ্তানি কার্যের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে বন্দর, খনিসমূহ এবং পরিবহণের উন্নয়নে যথেষ্ট সহায়তা করে আসছে। বলা যায়, এই সংস্থা ভারতীয় বাণিজ্যে একটা যুগান্তর এনেছে।

সাফল্য : ভারতের বাণিজ্যে যুগান্তর

খনিজ আকরিক, জুতা, কুটির-শিল্পজাত দ্রব্য, চিনি, বস্ত্রজাত দ্রব্য, চা, কফি এবং পশমী দ্রব্য—রপ্তানি-পণ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম। আমদানি-দ্রব্যের মধ্যে সিমেণ্ট, সোডা এ্যাশ্‌, কস্টিক সোডা, কাঁচা রেশম, রাসায়নিক সার, সাজিমাটি, সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ, গুঁড়া দুধ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া এই সংস্থা সার, প্রয়োজনীয় মূলধনী দ্রব্য, এবং শিল্পীয় কাঁচামাল আমদানি ব্যাপারের কতকগুলি সংযোগ ও বদলাই কারবারের (link and barter deals) ব্যবস্থা করেছে। এই সংস্থা পাট ও লাক্ষা বীজ ক্রয়ের ব্যাপারে মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রবর্তন করে রপ্তানি মূল্যে এনেছে একটা স্থিতিশীলতা। তাছাড়া

আমদানি ও রপ্তানি

জাপান ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে দীর্ঘ-মেয়াদী চুক্তি অনুযায়ী ভারতের আকরিক লৌহ রপ্তানিতে উৎসাহ সঞ্চার করবার জন্যে বন্দর ও খনি-অঞ্চলের মধ্যে রেলপথ বিস্তৃত হয়েছে। ১৯৫৮ সাল থেকে এই সংস্থাকে সিমেণ্ট রপ্তানি করবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বহির্বাণিজ্যে এই সংস্থা সাফল্যলাভ করলেও অন্তর্বাণিজ্যে বিশেষতঃ সিমেণ্ট-ব্যবসায়ে ব্যর্থতা হয়েছে বেদনাদায়ক। এর সিমেণ্ট বণ্টন-পদ্ধতিতে বড ব্যবসায়ীরা সিমেণ্টের দাম বাডিয়ে মোটা মুনাফা করেছে।

প্রারম্ভিক লগ্নে এই সংস্থার অনুমোদিত পুঁজি ছিল ১ কোটি টাকা ও আদায়ীকৃত পুঁজি ছিল ৫ লক্ষ টাকা। সম্পূর্ণ পুঁজি দিয়েছেন ভারত সরকার। বর্তমানে তার অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫ কোটি টাকা। এর পরিচালন-দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে সরকার-মনোনীত কয়েকজন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি পরিচালক মণ্ডলীর ওপর। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশনের বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ক্রম-বর্ধিষ্ণু। ১৯৫৬-৫৭ সালে তার ব্যবসায়ে বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৯·১৯ কোটি টাকা। কিন্তু ১৯৬২-৬৩ সালে কর্পোরেশন মোট ৮৭ কোটি টাকার পণ্য আমদানি-রপ্তানি করেছে। এবং ঐ বছর বিনিময়-ব্যবসায়ের পরিমাণ হয়েছে ৫১ কোটি টাকা।

পুঁজি ও সম্প্রসারণ

১৯৫৮-৫৯ সাল থেকে খাদ্যশস্যের ক্রয়-বিক্রয় রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব অত্যন্ত জোরালো হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেসের ভুবনেশ্বর অধিবেশনে ভারতের চালকলগুলিকে—সংখ্যায় যারা প্রায় ৪৩ হাজার—রাষ্ট্রায়ত্ত করার এবং তাদের পরিচালন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থার হাতে অর্পণ করার প্রস্তাব প্রবল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শ্রীপাতিল প্রমুখ নেতৃবৃন্দের চাপে তা পরিত্যক্ত হয়। আবার নতুন দিল্লীতে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে (১৯৬৪) খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যমের প্রচুর পূর্ব-ঘোষণা সত্ত্বেও খাদ্য-শস্য ব্যবসায়ের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থার অন্তর্ভুক্তি শূন্যতায় বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু ১৯৬৫ সালের ১৪ই জানুয়ারী মাদ্রাজে ভারতের খাদ্য কর্পোরেশনের উদ্বোধন হয়েছে। আমাদের সম্মিলিত আশা, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতে খাদ্য-শস্যের বণ্টন-ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে এবং খাদ্য-শস্যের মুনাফাবাজ, মজুতদার ও চোরাকারবারীরা জব্দ হবে। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের কাছে আমাদের প্রত্যাশা সফল হবে তো?

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- ভারতের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের অগ্রগতি
- চালকল রাষ্ট্রায়ত্তকরণ

৫৫. ভারতে ক্রেতা-সমবায় ও তাহার ভবিষ্যৎ
Consumers' Co-operative in India and Its Future.

প্রবন্ধ-সূত্রঃ—অবতরণিকা—ব্যবসায়ী জোট, সরকার ও গণ-প্রতিরোধ : ক্রেতা-সমবায় —১৯৬৩ সালের অভিজ্ঞতা—সমাধান কোথায়? —'ক্রেতা-সমবায়'বা 'সমবায় ভোগ্যপণ্য ভাণ্ডার' —ভারতে ক্রেতা-সমবায় সমিতির আবির্ভাব ও বিস্তার—ক্রেতা-সমবায় ও ভেজাল প্রতিরোধ—বর্তমান পরিস্থিতিতে ক্রেতা-সমবায়ের উপযোগিতা —সাফল্যের দিক্-দর্শন—বণ্টন-ব্যবস্থা—পরিচালন-ব্যবস্থা—উপসংহার।

অবতরণিকা

অতি সাম্প্রতিককালে একশ্রেণীর ভারতীয় ব্যবসায়ীরা যে ভাবে জোটবদ্ধ হয়ে অত্যধিক মুনাফার লোভে ক্রেতা-সাধারণের স্বার্থের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে অতি দ্রুতগতিতে পণ্যমূল্য বাড়িয়ে চলেছে, তাতে ক্রেতা-সাধারণের আর নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকা চলে না। সে একদিন ছিল, যখন ব্যবসায়ীদের ওপর আস্থা স্থাপন করে, তাদের সততা ও নীতিবোধের কাছে জনসাধারণের ক্রয়শক্তিকে জিম্মা রাখা যেত। কিন্তু আজ আর সেদিন নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইতিহাসের এত দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে যে, তার সঙ্গে সমান তালে চলা জনসাধারণের প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, দেশবিভাগ ও তজ্জনিত বিপর্যয়, শ্রেণী-পক্ষপাতপূর্ণ সরকারী নীতি এবং সাম্প্রতিক জরুরী অবস্থা একদিকে ব্যবসায়ীদের সততা ও নীতিবোধের ভিত্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে, অন্যদিকে ক্রেতা-স্বার্থকে পদদলিত করে অধিক মুনাফা অর্জনে ব্যবসায়ীদের অত্যধিক আস্কারা দিয়েছে। আইনের আস্ফালনকে ধূর্ত, নীতিহীন ব্যবসায়ীরা দিনের পর দিন বিদ্রূপ করে চলেছে। তার ফলে খাদ্যে এবং ঔষধে ভেজালের পরিমাণ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে, পণ্যমূল্য হয়েছে আকাশস্পর্শী। জনসাধারণের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙবার উপক্রম করেছে।

জনসাধারণ এতদিন সরকারের মুখের দিকে চেয়ে বসেছিল। তাদের আশা ছিল, সরকার নিশ্চয়ই কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আশা ছিল, যে সরকারের হাতে তারা তাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা তুলে দিয়েছে, তুলে দিয়েছে তাদের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতা, সেই সরকার আইনের সাহায্যে, পুলিশী-শক্তির সাহায্যে ব্যবসায়ীদের শায়েস্তা করে জনস্বার্থকে রক্ষা করবে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই সরকারী ব্যর্থতা কিংবা সরকারী অসহায়তা নির্লজ্জভাবে প্রকটিত হয়ে উঠেছে। দেশে খাদ্য-শস্য মজুত আছে, অথচ

পণ্যমূল্য উঠে যায় ক্রয়শক্তির নাগালের বাইরে। যোগান ও চাহিদার অর্থনৈতিক সূত্র মুনাফাবাজ ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে ব্যর্থ প্রমাণিত হলো। তার ওপর অধিক মুনাফার লোভে ব্যবসায়ীরা আজ জোটবদ্ধ হয়েছে। জনসাধারণকে প্রতারিত করে ভেজাল খাইয়ে, আইনের চোখে ধূলো দিয়ে অধিক মুনাফার জন্যে ব্যবসায়ীদের এই জোট-বদ্ধতার কাছে সরকার এবং ক্রেতা-সাধারণ একান্তভাবে অসহায়। সরকার যেখানে ব্যর্থ ও অসহায় এবং ব্যবসায়ীরা ধূর্ত ও প্রতারক, তখন ক্রেতা-স্বার্থরক্ষার জন্যে জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ হয়ে একটা দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। ক্রেতা-সমবায় সেই প্রতিরোধের দুর্ভেদ্যতার আশ্বাস নিয়ে এসেছে।

ব্যবসায়ীদের-জোট সরকার ও গণ-প্রতিরোধ : ক্রেতা-সমবায়

অবশ্য অনেকে খাদ্য-পরিস্থিতির এই উদ্বেগজনক অবস্থায় 'দমদম দাওয়াই'র কথা চিন্তা করতে পারেন। দলবদ্ধভাবে হয়তো দোকানদারকে ন্যায্যমূল্যে পণ্যবিক্রয়ে বাধ্য করা যায়। কিন্তু তাতে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয় না। গত ১৯৬৩ সালে খাদ্য-সংক্রান্ত সরকারী বিবৃতির সুযোগে চালের বাজারে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে ব্যবসায়ীরা চালের দাম আকাশস্পর্শী করে তুলেছিল। চালের মণ ৩০৲/৩১৲ টাকা থেকে কয়েক দিনের মধ্যেই ৪৮৲/৫০৲ টাকায় দাঁড়িয়েছিল। বাজারে চালের যে বিশেষ অভাব ছিল, তা নয়—কৃত্রিম অভাবের আবহাওয়া সৃষ্টি করে চালের দাম অতিরিক্ত হারে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। অতি-মুনাফালোভী অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজি এর পেছনে না থাকলে পারদের ঊর্ধ্বগতির মতো চালের দাম এভাবে বাড়তে পারে না। অবশেষে মারমুখী জনতার চাপে চালের দাম স্থিতিশীল হয়ে আসে।

১৯৬৩ সালের অভিজ্ঞতা

১৯৬৩ সালের সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, বর্তমানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ক্রমবর্ধমান মূল্য যদি প্রতিরোধ করা না যায়, তাহলে জরুরী অবস্থার সুযোগে পুনরায় এক সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। দলবদ্ধভাবে দোকানে দোকানে হামলা করে দোকানীদের ন্যায্যমূল্যে জিনিসপত্র বিক্রয়ে বাধ্য করার মধ্যে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ সাধারণ খুচরা দোকানদারদের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে দায়িত্ব অতি অল্পই। বরং লোকসানের ভয়ে তারা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রয় বন্ধ করতেই বাধ্য হবে। সমস্যা তাতে গভীরতর হবে। তবে সমাধান কোথায়?

সমাধান কোথায়?

যে বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ ব্যবসায়ীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে ন্যায্যমূল্যে জিনিসপত্র বিক্রয়ে বাধ্য করে সমস্যার সাময়িক সমাধান করেছিলেন, অযৌক্তিক দ্রব্যমূল্য

বৃদ্ধি-প্রতিরোধের সমাধানের চাবিকাঠিও তাঁদেরই হাতে। তবে সেটা দোকানে হামলা করে নয়—ব্যবসায়ীদের ওপর নির্ভর করেও নয়; নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহের দায়িত্ব সম্মিলিত ভাবে নিজেরাই গ্রহণ করে। এরই নাম 'ক্রেতা-সমবায়' বা 'সমবায় ভোগ্যপণ্য ভাণ্ডার'।

ক্রেতা-সমবায় বা সমবায় ভোগ্য-পণ্য ভাণ্ডার

ক্রেতা-সমবায় সমিতি নতুন কথা নয়। এর উদ্ভব হয় প্রায় একশো কুড়ি বছর আগে—ইংলণ্ডে। তারপর এই সমিতি ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর নানাদেশে। বর্তমানে এই ক্রেতা-সমবায় সমিতিগুলি বিভিন্ন দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতে ক্রেতা-সমবায় সমিতি আন্দোলনের বিকাশ ও প্রসার তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। ভারতে সমবায় আন্দোলনের সূচনা-পর্বে কেবলমাত্র কৃষি ঋণদান সমিতি গঠনের ওপর গুরুত্ব হয়েছিল বেশি; ফলে এদিকে আর তেমন নজর দেওয়া হয়নি। গত যুদ্ধের সময় অবশ্য আমাদের দেশেও ক্রেতা সমিতির আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। নিয়ন্ত্রিত জিনিসপত্র ন্যায্য দরে জনসাধারণের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার জন্যেই এগুলি সাময়িক ভাবে গড়ে উঠেছিল। যুদ্ধশেষে যখন নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা তুলে দেওয়া হলো, তখন খোলা বাজারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এই সমিতিগুলির অল্পই টিকে থাকতে পারলো। তার কারণ, সমিতিগুলির ব্যবসায়িক ভিত্তি ছিল দুর্বল এবং পরিচালন-ব্যবস্থাও ছিল ত্রুটিবহুল।

ভারতের ক্রেতা-সমবায় সমিতির আবির্ভাব ও বিস্তার

বর্তমান জরুরী অবস্থায় ন্যায্যমূল্যের দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্যে পুনরায় ক্রেতা-সমবায় সমিতির প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। অতি-মুনাফার হাত থেকে রেহাই পেতে হলে ক্রেতাদের সংঘবদ্ধ হওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। অত্যাবশ্যক জিনিসপত্র বণ্টনের ভার সম্মিলিত ভাবে জনসাধারণের নিজেদের হাতেই গ্রহণ করতে হবে। এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় উভয় স্তরেই। কেবল দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার ব্যাপারেই নয়, খাদ্যবস্তুর ভেজাল প্রতিরোধেও ক্রেতা-সমবায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ক্রেতা-সমবায় ও ভেজাল প্রতিরোধ

শুধু জরুরী অবস্থায় নয়, স্বাভাবিক সময়েও জিনিসপত্রের ক্রয়-বিক্রয়ের বিভিন্ন স্তরে দালাল ও ব্যবসায়ীদের হাতে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। ফলে উৎপাদনকারীর কাছ থেকে সাধারণ ক্রেতার হাতে পণ্য-সম্ভার পৌঁছানোর মধ্যে যে ভাবে হাত বদল হয়, তাতে সকলের হাতে মুনাফার কড়ি তুলে দিতে গিয়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। আবার যে সব জিনিসের যোগান চাহিদার তুলনায় কম, সেগুলির মূল্য সাধারণ

ব্যবসায়ীদের কাছে অবাঞ্ছিত ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া খাদ্যবস্তুর জাল, ভেজাল, নিম্নমানের দ্রব্যাদি বিক্রয় বা ওজন কম দেওয়া ইত্যাদি নানা ধরনের অসাধুতা সম্পর্কিত অভিযোগ তো ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে লেগেই আছে। অথচ ক্রেতাদের নিজেদের সংগঠিত সমবায় ভাণ্ডার থাকলে এই সব সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব। উপরন্তু ক্রেতা-সমবায়গুলি প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে উৎকৃষ্ট দ্রব্য সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করে সাধারণ ব্যবসায়ীদের ওপর এর সুস্থ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে। তাছাড়া মনে রাখতে হবে যে, মিশ্র অর্থনীতির বনিয়াদই হলো সমবায়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে ক্রেতা-সমবায়ের উপযোগিতা

ক্রেতা-সমবায়গুলির সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে ন্যায্যমূল্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সদস্যদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার ওপর। সে জন্যে মাল সরবরাহ-ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন, যাতে অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি সরাসরি উৎপাদন-কেন্দ্র বা পাইকারী বাজার থেকে সদস্যদের কাছে নিয়মিত পৌঁছিয়ে দেওয়া যায়। জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রেতা-সমবায় সমিতির দ্রুত প্রসারের জন্যে কতকগুলি সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

সাফল্যের দিক্‌দর্শন

সমগ্র দেশে বিশেষতঃ শহরাঞ্চলে চার হাজার প্রাথমিক সমবায়-ভাণ্ডারসহ দুই শতটি পাইকারী সমবায়-ভাণ্ডার স্থাপন করা হবে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই ২৭টি পাইকারী ও ৭৪০টি খুচরা ক্রেতা-ভাণ্ডার স্থাপনের কথা। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২৭টি পাইকারী ভাণ্ডার এবং প্রায় সব কয়টি খুচরা ক্রেতা-সমবায়-ভাণ্ডার খোলা হয়েছে। শহরাঞ্চলে সাধারণতঃ ২,০০০টি বাসগৃহ এবং ১০,০০০ অধিবাসী সমন্বিত এলাকা নিয়ে এক-একটি প্রাথমিক ক্রেতা-সমবায়-ভাণ্ডার কাজ করবে। কয়েকটি ক্রেতা-সমবায়-ভাণ্ডার নিয়ে এক-একটি পাইকারী-সমবায়-ভাণ্ডার গঠিত হবে। পাইকারী-ভাণ্ডার থেকে প্রাথমিক ক্রেতা-সমবায় সমিতিগুলিকে প্রয়োজনমত জিনিসপত্র ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ করা হবে। প্রাথমিক ও পাইকারী ভাণ্ডারগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে সরকার থেকে মূলধন ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। গ্রামাঞ্চলে সেবামূলক ও বিপণন সমিতিগুলির মাধ্যমে অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ঘোষণা করেছেন, বাংলা দেশের গ্রামে-গ্রামে অন্ততঃপক্ষে পঁচিশ হাজার ক্রেতা-সমবায় স্থাপন করতে হবে। খাদ্য-শস্যের নিয়ন্ত্রণ-প্রথা পুনরায় চালু হবার পর ক্রেতা-সমবায় ছাড়া নতুন কোন ন্যায্য মূল্যের বিপণি খোলার অনুমতি দেওয়া হবে না বলে সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

বণ্টন-ব্যবস্থা

ক্রেতা-সমবায় সমিতিগুলির পরিচালন-ব্যবস্থা হবে অন্য যে কোন সমবায়িক প্রতিষ্ঠানের মতো গণতান্ত্রিক। যার যত শেয়ার থাকুক না কেন, প্রত্যেক সদস্যের থাকবে একটি মাত্র ভোট। ব্যবসায়ের উদ্বৃত্ত মুনাফা সদস্যগণ যে যেমন জিনিস ক্রয় করবেন, সেই অনুপাতে রিবেট হিসাবে ফিরে পাবেন। সদস্যগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতেই থাকবে এর পরিচালন-ব্যবস্থা।

পরিচালন-ব্যবস্থা

এই দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্তির চরম সংকটেও ক্রেতা-সমবায় আন্দোলন বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি। তার এই জনপ্রিয়তার অভাবের কারণ প্রথমতঃ জনসাধারণ নিজেরাই। একদিকে তাদের দুর্জয় ঢিলেমি, অন্যদিকে পারস্পরিক ঘৃণা এবং অবিশ্বাস। এই আত্মপ্রবঞ্চনার ফল তাদের ভোগ করতেই হবে। দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের একাংশের হাতে আজ প্রচুর কালো টাকা এসেছে। তারা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে বিশেষ বিচলিত নয়। তারা বরং নিজেদের স্বার্থে বর্তমান সংকটের দীর্ঘস্থায়িত্বই কামনা করে। এবং তৃতীয়তঃ, এই আন্দোলনের প্রতিরোধে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের যে হাত নেই, তা বিশ্বাস করা যায় না। এই দুর্ভাগ্যের ত্র্যহস্পর্শে ক্রেতা-সমবায় আন্দোলন বিশেষ অগ্রগতি লাভ করতে পারে নি। এবং সেজন্যে আমরাই বিশেষ করে দায়ী।

উপসংহার

এই প্রবন্ধ অনুসরণে লেখা যায়:

- ক্রেতা সমবায় ও দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধি প্রতিরোধ
- ক্রেতা-সমবায় গঠন ও তাহার উপযোগিতা

৫৬. ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা
The Farakka Barrage Project.

প্রবন্ধ-সূত্র:—অবতরণিকা—ভাগীরথীর জল-কার্পণ্যের কারণ—ভাগীরথীর জলাবনতির পরিণাম: কলকাতা বন্দরের ব্যয়বৃদ্ধি, কলকাতার জল সরবরাহের অসুবিধা, জল পরিবহণের বিপর্যয়, শিল্পাঞ্চলের সর্বনাশ—ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনার কার্যসূচী ও অর্থব্যয়—বাঁধ-নির্মাণের যৌক্তিকতা স্বীকার—পরিকল্পনার খুঁটিনাটি-ফরাক্কা: সম্ভাব্য উপকারিতা—উপসংহার।

ভাগীরথীর জল-কার্পণ্যে ঘনিয়ে এসেছে কলকাতা বন্দরের মৃত্যুলগ্ন। তার মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করেছে একদিকে হলদিয়া বন্দর, অন্যদিকে ফরাক্কা বাঁধ। একদিন ভাগীরথী-নদীবক্ষকে পূর্ণ করে গঙ্গার মূল জলপ্রবাহ বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশে বয়ে যেত। কিন্তু আজ ভাগ্যের বিড়ম্বনায় গঙ্গার মূল জল-প্রবাহ ভাগীরথী-বক্ষ পরিহার করে আশ্রয় করেছে পদ্মা-বক্ষ। ভাগীরথীর জলধারা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসছে। তার

অবতরণিকা

স্রোত-কার্পণ্য এবং গতি-মন্থরতার পরিণামে এখানে সেখানে জেগে উঠছে বিপুলাকৃতি চর। ফলে ভাগীরথীর নাব্যতা হ্রাস পেয়েছে। ভারী জাহাজের মুখ আর কলকাতা বন্দর দেখতে পায় না। কিছু অল্প ভারী জাহাজ পথ-প্রদর্শক জাহাজের পশ্চাদনুসরণ করে অতি সাবধানে মন্থর গতিতে কলকাতা বন্দরের দিকে অগ্রসর হয়। তাতেও আবার জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গে তাল বজায় রেখে চলতে হয় তাদের। সেইজন্যে ভারী জাহাজগুলি কলকাতা বন্দরে না ভিড়ে মাদ্রাজ উপকূলের বিশাখাপত্তমে চলে যায়। তাতে কলকাতা বন্দরের প্রচুর টাকা ক্ষতি হয়। শুধু তাই নয়, পূর্ব ও উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-বন্দর ও বাণিজ্য-নগরী কলকাতার ভাগ্যে ঘনিয়ে আসছে এক চরম বিলুপ্তির মুহূর্ত। ফরাক্কা বাঁধ কলকাতা বন্দরকে সেই অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে।

ভূ-তত্ত্ববিশারদদের মতে, ভাগীরথীর নদীখাত পদ্মার নদীখাত থেকে প্রাচীনতর। আজ থেকে প্রায় চারশত বর্ষ পূর্বে গঙ্গার মূল প্রবাহ খাত-পরিবর্তন করে। ভাগীরথী ও গঙ্গার মিলনস্থল থেকে একটি স্রোত পূর্ব-বাহিনী হয়ে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়। ভূ-পৃষ্ঠের উত্থান-পতন ও ইত্যাদির ফলে সেই পূর্বমুখী নদীখাত ক্রমশঃ গভীর ও প্রশস্ত হয়ে

ওঠে। কালক্রমে গঙ্গার মূল জলস্রোত সেই পূর্বমুখী নদীখাতকে আশ্রয় করে। অন্যদিকে ভাগীরথী নদীখাত জল-স্বল্পতায় ধীরে ধীরে ভরাট হয়ে এলো। তার স্রোতোবেগ স্তিমিত হয়ে এলো ক্রমে ক্রমে। ভাগীরথীর এই স্রোত-কার্পণ্যের মূলে যে গঙ্গার নিষ্করুণ ঔদাসীন্যই রয়েছে, তা নয়; দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার সাফল্যও তার এই জলাবনতির অন্যতম দ্বিতীয় কারণ। দামোদর তার উপনদী-শাখানদী ধরে ছোটনাগপুর পার্বত্য অঞ্চলের বৃষ্টিপাতে প্রচুর জল বহন করে আনতো। কিন্তু আজ ভাগীরথীর অন্যতম উপনদী দামোদর শক্ত সিমেন্টের বাঁধনে বন্দী হয়েছে; আর ভাগীরথী তার জলকর-লাভে হয়েছে বঞ্চিত। ফলে জলস্রোতের মন্থর গতি নদীগর্ভে পলি সঞ্চয়ে করেছে সাহায্য। তাতে নদীখাত পূর্ব প্রসারতা ও পূর্ব গভীরতা হারিয়ে ফেলেছে এবং তার জলধারণ ক্ষমতাও হয়ে পড়েছে সঙ্কুচিত।

ভাগীরথীর জল-কার্পণ্যের কারণ

ভাগীরথীর জলাবনতির ফলে পূর্ব ও উত্তর ভারতের অন্যতম বাণিজ্য-বন্দর কলকাতার মৃত্যুশ্বাস উঠেছে। ভারী জাহাজেরা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যায় বিশাখাপত্তমে; তাতে কলকাতার আর্থিক ক্ষতি হয় প্রচুর। তাছাড়া অল্পভারী জাহাজগুলির চলাচলের উপযুক্ত নাব্যতা বজায় রাখবার জন্যে মাটি-কাটা জাহাজের সাহায্যে ভাগীরথীর নদীগর্ভকে পলিমুক্ত করার কাজে প্রচুর ব্যয় করতে হয় কলকাতা বন্দর-কর্তৃপক্ষকে। অন্যদিকে, ভাগীরথীর জলাবনতি কলকাতার জল সরবরাহ ব্যবস্থাকে করে তুলেছে দুর্বল। অফুরন্ত স্বাদু জলধারায় যে কার্পণ্য দেখা দিয়েছে, তাতে বঙ্গোপসাগরের জোয়ার-ভাঁটার প্রাধান্যে লবণাক্ত আস্বাদ দিনে দিনে তীব্র হয়ে উঠছে। তাছাড়া পতিতোদ্ধারিণী ভাগীরথী তার ধারা-সম্পাতের জন্যে কলকাতা ও তার সন্নিহিত শিল্পাঞ্চলগুলির আবর্জনা-রাশিকে বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করতে পারছে না। ফলে ভাগীরথীর উপকূলবর্তী অঞ্চল দিনে দিনে অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠছে। এদিকে, ভাগীরথীই তো সমগ্র পূর্ব ভারতের একমাত্র জলপথ। সেই নদীপথে ভারী জাহাজের চলাচল তো দূরের কথা, হাল্কা জাহাজের চলাচলও আজ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কলকাতার পশ্চাদ্ভূমির অর্থাৎ উত্তর ও পূর্ব ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি আজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। কলকাতার সন্নিহিত শিল্পাঞ্চলের ভাগ্যেও আজ তার ফলে ঘনিয়ে এসেছে ঘোরতর দুর্দিন। ভাগীরথীর উভয় তীরের শত শত চটকল, কাপড়ের কল, কাগজ কল ও অন্যান্য কল-কারখানাগুলি তার এই প্রাণপ্রবাহের অভাবে দাঁড়িয়েছে চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি। কলকাতা বন্দর, কলকাতার জীবনধারা, তার পশ্চাদ্ভূমি এবং তার সন্নিহিত

ভাগীরথীর জলাবনতির পরিণাম: কলকাতা বন্দরের ব্যয়বৃদ্ধি, কলকাতার জল-সরবরাহের অসুবিধা, জল-পরিবহণের বিপর্যয়, শিল্পাঞ্চলের সর্বনাশ

শিল্পাঞ্চলের গৌরব-সূর্য আজ অস্তমুখী। ভাগীরথীর জলাবনতির ফলে কলকাতা বন্দর কালক্রমে পরিণত হবে অতীতের এক মৃত বন্দরে এবং পূর্ব-ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের হৃৎপিণ্ড কলকাতা স্থান পাবে অতীত ইতিহাসের ধূসর পাতায়।

ফরাক্কা বাঁধ-পরিকল্পনার কার্যসূচী ও অর্থব্যয়

এই অবস্থার প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে ফরাক্কা বাঁধ। গঙ্গা-ভাগীরথীর মিলনস্থলে গঙ্গার উভয় তীর পাকিস্তানের অন্তর্গত। সেই মিলনস্থল থেকে ২০ মাইল উজানে গঙ্গার উভয় তীর যেখানে ভারতের অন্তর্গত, সেই স্থানের নাম তিলডাঙা বা ফরাক্কা। এই ফরাক্কায় বাঁধ তৈরী করে ভাগীরথীকে জল-প্রাচুর্য দানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এপারে মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা, ওপারে মালদহ জেলার খেজুরিয়া ঘাট। এর দুই পার বাঁধা পড়বে এক শক্ত কংক্রিটের সেতু বাঁধের নিবিড় বন্ধনে। ফরাক্কা কর্ম-সূচীর আছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ : এক, ফরাক্কায় গঙ্গার ওপর আড়াআড়িভাবে মূল-বাঁধ নির্মাণ ; দুই, বাঁধের পেছনে গঙ্গার দক্ষিণ তীর থেকে একটি ২৬½ মাইল দীর্ঘ জল-প্রবাহী ফীডার খাল কেটে জঙ্গীপুরে ভাগীরথীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং তিন, জঙ্গীপুরে ভাগীরথী ও ফীডার খালের সংযোগস্থলের ওপরে ভাগীরথীর ওপর আড়াআড়িভাবে একটি বাঁধ নির্মাণ। অর্থাৎ, দুটি বাঁধ নির্মাণ ও একটি জল-প্রবাহী ফীডার খাল খনন—এই হলো ফরাক্কা বাঁধ নির্মাণ। অর্থাৎ, দুটি বাঁধ পরিকল্পনার কার্যসূচী। মজুর দিয়ে সাড়ে ছাব্বিশ মাইল দীর্ঘ খালের মাটি কাটার কাজ সময়-সাপেক্ষ। তাই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই খাল কাটার ভার দেওয়া হয়েছে একটি সংস্থাকে। তাছাড়া ফরাক্কা থেকে মাইল দেড়েক দূরে নৌ-চলাচলের উপযোগী একটি পৃথক খালও খনন করা হবে। এটিও জঙ্গীপুরের কিছু আগে মূল খালের সঙ্গে যুক্ত হবে। দুটি খালের মুখেই মাটি কেটে প্রচণ্ড স্রোতোবেগ-সহনক্ষম মজবুত ভিত নির্মিত হয়েছে। প্রথমে স্থির হয়েছিল এই কার্যসূচীর রূপায়ণে ব্যয় হবে ৬৯ কোটি টাকা এবং সময় লাগবে আট বছর। আশা ছিল, তৃতীয় পরিকল্পনার সূচনা থেকেই ফরাক্কার নির্মাণ-যজ্ঞ সুরু হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের গড়িমসি, অর্থের অনটন, বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি, মাল-মসলার অভাব ইত্যাদি বহু পর্বত-প্রমাণ বাধা ঠেলে ফরাক্কা সেতু-বাঁধের কাজ প্রকৃতপক্ষে এতদিনে আরম্ভ হয়েছে। এই বিলম্বের মাশুল আমাদের অবশ্যই দিতে হবে। তাই দেখা যাচ্ছে, ক্রমাগত যন্ত্রপাতি, মাল-মসলা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়-বৃদ্ধির ফলে ফরাক্কার মোট নির্মাণ-ব্যয় প্রারম্ভিক ব্যয়-বরাদ্দের প্রায় দ্বিগুণ দাঁড়াতে পারে। ইতিমধ্যে ২২/২৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়ে গেছে এবং প্রায় ৪০/৪৫ কোটি টাকার অর্ডার প্রদত্ত হয়েছে। ফরাক্কা এখন পুরোপুরি কর্ম-মুখর। প্রকল্পের রূপায়ণে প্রায় দশ হাজার

শ্রমিক নিত্য-কর্মরত। তবু ফরাক্কার রূপায়ণ সমাপ্ত হতে ১৯৭০-৭১ সাল এসে পড়বে বলে মনে হয়। কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, এই প্রকল্পের রূপায়ণে বিদেশী মুদ্রার মঞ্জুরী পেতেও অসুবিধে হবে না।

ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনার কার্যসূচী ইদানীংকালে গৃহীত হলেও তার প্রস্তাবের জন্ম বহু পূর্বে। ১৯৩৮ সালে অর্থনীতিবিদ্ ও এঞ্জিনিয়ার শ্রীবিশ্বেশ্বরায়ার নেতৃত্বে যে কমিশন গঠিত হয়, তা এই বাঁধ নির্মাণের যৌক্তিকতা অস্বীকার করে। তারপর ১৯৫০ সালে কেন্দ্রীয় শক্তি ও জল কমিশন (Central Power and Water Commission) প্রস্তাবটি বিচার-বিবেচনা করে এই বাঁধের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং একটি পরিকল্পনা রচনা করেন। কিন্তু ফরাক্কা বাঁধের প্রয়োজনীয়তা যে কতো গভীর এবং সুদূর-[illegible]রী, তা উপলব্ধি করতে কেন্দ্রীয় সরকারের বহু বিলম্ব হয়ে গেল। কেবলমাত্র কলকাতার স্বার্থে নয়, কেবল মাত্র পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে নয়, উত্তর ভারতের তথা সমগ্র ভারতের অর্থ নৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও জাতীয় সংহতির গভীরতর স্বার্থে ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের রূপায়ণ একটি অত্যন্ত জরুরী বিষয়। আনন্দের কথা, এতদিনে কেন্দ্রীয় সরকারের ঘুম ভেঙেছে।

বাঁধ নির্মাণের যৌক্তিকতা স্বীকার

ফরাক্কায় নির্মিত বাঁধের দৈর্ঘ্য হবে ৭,৮১২ ফুট। তাতে থাকবে জল নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১০৯টি 'বে' বা ফটক। বাঁধের ওপরে প্রস্তুত হবে ৫০ ফুট চওড়া একটি পথ। এই পথ দিয়ে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে যোগাযোগের রেল ও মোটরগাড়ি চলাচল করতে পারবে। সেতু-বাঁধের ওপরে তার জন্যে ডবল লাইন ব্রডগেজ রেল পাতা হবে। বাঁধের দুদিক হবে উঁচু, যাতে বাধাপ্রাপ্ত জলরাশিকে পরিকল্পিত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ফীডার খালটি হবে ২৫০ ফুট প্রশস্ত এবং নয় ফুট গভীর। জল-প্রবাহী খাল ও নৌবহ খাল—দুটির কাজ একই সঙ্গে সমাপ্ত হবে। বাঁধ ইত্যাদির ভিত নির্মাণের জন্যে প্রায় ৪০ ফুট দীর্ঘ ইস্পাতের শীট পাইল এতদিন জাপান ও পশ্চিম জার্মানী থেকে আমদানি করা হচ্ছিল, এবং সামান্য কিছু অংশ ক্রয় করা হচ্ছিল টাটা থেকে। এবার রাউরকেলায় এ ধরনের ইস্পাত শীট পাইল তৈরী করার জন্যে কথাবার্তা চলেছে। অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি, যেমন—ড্রেজার, বুল ডোজার, হেভী ট্রাক ইত্যাদি বাবদও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা এতদিন লেগেছে। এখন থেকে ঐসব যন্ত্রপাতির একটা বিরাট অংশ এদেশেই পাওয়া যাবে, আশা করা যাচ্ছে।

পরিকল্পনার খুঁটিনাটি

গঙ্গার মূল জলধারা থেকে ২৬½ মাইল দীর্ঘ ফীডার খালটি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৪০ হাজার কিউসেক জল বহন করে এনে ভাগীরথীর শুষ্কপ্রায় খাতে ঢেলে দেবে।

এই অতিরিক্ত জল-সরবরাহের ফলে ভাগীরথীর বুকে আর অবাঞ্ছিত চর সৃষ্টি হবে না। জলের চাপ ও গতিবেগ বৃদ্ধি পেলে নাব্যতা লাভ করবে মুমূর্ষু ভাগীরথী। তাতে নবজীবন ফিরে পাবে সে। কলকাতা বন্দর-কর্তৃপক্ষ যে অতিরিক্ত অর্থব্যয়ে ভাগীরথীকে পলিমুক্ত করে থাকেন, আর তার প্রয়োজন হবে না। অন্যদিকে ভারী জাহাজেরা কলকাতা বন্দরে এসে অনায়াসে ভিড়তে পারবে। ততে বন্দর-কর্তৃপক্ষের আয় বৃদ্ধি পাবে। শুধু তাই নয়, ছোট ও মাঝারি ধরনের বহু জলযান ভাগীরথী ও গঙ্গার বুকে উত্তর ভারতে বহুদুর পর্যন্ত যাতায়াত করতে পারবে। ভাগীরথী ও তার শাখানদী জলঙ্গী ও চূর্ণীর জলধারণ ও জলবহন-শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং ফরাক্কায় জল-নিয়ন্ত্রণের ফলে আকস্মিক বন্যার হাত থেকে অববাহিকা অঞ্চলের শস্যোৎপাদন রক্ষা পাবে। মশা ও ম্যালেরিয়া দূর করা সম্ভব হবে। শীতের সময় জলসেচের মাধ্যমে অববাহিকা-অঞ্চলের কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ভাগীরথীর উভয় তীরের শিল্পায়তনগুলিও বিকাশের সাহায্য পাবে। কলকাতা বন্দর অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। কলকাতা নগরীর জল-সরবরাহ ব্যবস্থা এবং জলনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি হবে। তাছাড়া উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে মোটর ও রেলপথের যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হলে বহু প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সুবিধালাভ করা সম্ভব হবে। এদিকে রাজ্য সরকারও আশ্বাস দিয়েছেন যে, ফরাক্কায় এই নির্মাণ-যজ্ঞ সমাপ্ত হলে ওখানে আনুষঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় কতকগুলি শিল্প-স্থাপনের কথা চিন্তা করা হবে।

ফরাক্কা বাঁধের সম্ভাব্য উপকারিতা

ভাগীরথীর জীবন-জিজ্ঞাসার তীব্রতায় আজ যে সকলের নিদ্রা-ভঙ্গ হয়েছে, এ বড়ো আশার কথা। ফরাক্কা বাঁধের সার্থক রূপায়ণে ভাগীরথী নবজীবন লাভ করবে। কিন্তু পরবর্তীকালে আবার নব নব সমস্যার উদ্ভব হতে পারে এবং তাতে সমগ্র প্রকল্পটির সাফল্য বানচাল হয়ে যাবারও রয়েছে প্রচুর সম্ভাবনা। ভাগীরথীর সেই বর্তমান ও ভাবী সমস্যা সমূহের মোকাবিলার জন্যে ফরাক্কা নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ একটি বিশেষ-সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর থেকে চব্বিশ পরগণার স্বরূপনগর পর্যন্ত ভাগীরথী ও হুগলীর ১৬০ মাইল গতিপথে পলি অপসারণ ও নদীর নাব্যতা রক্ষা হবে এই সংস্থার প্রধানতম দায়িত্ব। কলকাতা পোর্ট কমিশনার্স, কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গের সেচ দপ্তরের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত এই সংস্থা এই ১৬০ মাইল নদী স্রোতের সার্বিক সমীক্ষা চালাবেন। এবং এই সংস্থা ফরাক্কা নিয়ন্ত্রণ পরিষদ থেকে পৃথক হবে। এই ১৬০ মাইল নদী-পথে বহু লক্-গেট নির্মাণ, পলি অপসারণ ইত্যাদি কাজের জন্যে অতিরিক্ত কয়েক কোটি টাকা ব্যয় হবে। কলকাতা বন্দরের স্বার্থে গঙ্গা জল সরবরাহের মূল লক্ষ্য অব্যাহত রাখবার জন্যে

ভাগীরথী উন্নয়ন

ভাগীরথীর সংস্কার ও উন্নয়ন অপরিহার্য। ফরাক্কা বাঁধ নির্মাণ ও ভাগীরথী উন্নয়নের ফলে কলকাতা বন্দরের জন্যে সারা বছর জলের কমপক্ষে ২৬ ফুট গভীরতা পাওয়া যাবে।

উপসংহার

এইভাবে ফরাক্কা বাঁধ কলকাতা বন্দর, তথা পশ্চিমবঙ্গ, তথা সমগ্র ভারতের অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধির দুয়ার খুলে দেবে। দেশবিভাগ পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে যে অর্থ নৈতিক বিপর্যয় ডেকে এনেছে, তা জয় করা সম্ভব হবে। পশ্চিমবঙ্গ দুর্দশার রাহুমুক্ত হবে। গঙ্গার দাক্ষিণ্যে-ভরা অবারিত আশীর্বাদ-ধারায় ধন্য হবে 'গঙ্গা-হৃদি বঙ্গভূমি'। আজ শুধু কলকাতা মহানগর বা কলকাতা বন্দরের স্বার্থেই নয়, সমগ্র উত্তর ভারতের অর্থ নৈতিক স্বার্থে ও সমগ্র ভারতের জাতীয় সংহতির স্বার্থে ফরাক্কা বাঁধ ও ভাগীরথীর পলি-মোচন তথা ভাগীরথীর উন্নয়ন অপরিহার্য। কারণ এ হলো সমগ্র উত্তর ভারতের জীবন-মরণের প্রশ্ন।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনা
- ভাগীরথী উন্নয়ন
- ফরাক্কা বাঁধ ও উত্তর ভারতের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন

৫৭. ভারতের ভাষা-সমস্যা

Language Controversy in India.

প্রবন্ধ-সূত্র :—অবতরণিকা—ভারতে ভাষা-সমস্যার মূল স্বরূপ—ইংরেজিকে অপসারিত করার যৌক্তিকতা—হিন্দীকে সরকারী ভাষা করার যৌক্তিকতা—সংবিধানের কার্যকারিতার যৌক্তিকতা-সোভিয়েট রাশিয়ার ভাষা-সমস্যার সমাধান—উপসংহার।

"As a result of revolutionary upheavals in countries like India scores of hitherto unknown nationalities, each with its own language and its own distinctive culture will emerge on the scene."

—Stalin

অবতরণিকা

বহু-সমস্যা-জর্জরিত ভারতে দেখা দিয়েছে আবার এক নতুন সমস্যা—ভাষা-সমস্যা যার নাম। অন্নবস্ত্রের-সমস্যা, বাস-গৃহ-সমস্যা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-সমস্যা এবং প্রতিরক্ষা-সমস্যার চাপে যখন ভারত দিশাহারা, যখন ঘরে ও বাহিরে শত্রুর আক্রমণে তার জীবনধারা বিপর্যস্ত, তখনই ভাষা-সমস্যা ভারত-ভাগ্যে বহন করে নিয়ে এসেছে এক অশুভ অশনি-সংকেত। ১৯৬৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী—ভারতের পবিত্র প্রজাতন্ত্র দিবসটি তার ফলে হলো রক্ত-কলঙ্কিত। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের শুভ্র পাষাণ-ফলকে সেদিন যে রক্ত-লিখা পড়েছে, যে আগুন জ্বলেছে আজ দক্ষিণে, তা সাময়িকভাবে নির্বাপিত হলেও তার সম্ভাবনা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। সেই সম্ভাবনার বীজকে নির্মূল করে সমগ্র ভারতবাসীর মনে আশা, আস্থা এবং ঐক্য-চেতনা-প্রতিষ্ঠাকল্পে একটা ন্যায়সঙ্গত, সুবিবেচনা-প্রসূত এবং চিরস্থায়ী সমাধান চাই। কারণ আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও জাতীয় সংহতির প্রশ্নের সঙ্গে ভাষা-সমস্যার প্রশ্নটিও নিবিড়ভাবে জড়িত। কাজেই আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও জাতীয় সংহতির স্বার্থে ভাষা-সমস্যার একটি সুচিন্তিত সমাধান যে অপরিহার্য, তা বলা বাহুল্য।

ভারত একটি বহু ভাষা-ভাষী দেশ। তার মধ্যে সংস্কৃত ছাড়া চৌদ্দটি আঞ্চলিক ভাষা সংবিধানের অষ্টম অনুসূচীতে (Eighth Schedule) স্বীকৃত। তাছাড়া আছে অর্ধশতাধিক উপভাষা, যার প্রত্যেকটিতে লক্ষাধিক মানুষ কথা বলে। আর আছে ইংরেজি ভাষা। আর্যরা যখন ভারতে আসেন, তখন তাঁরা যে ভাষা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, তার নাম বৈদিক ভাষা। কালক্রমে সেই ভাষা থেকে সংস্কৃত ও উত্তর-ভারতের অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাগুলির উদ্ভব হয়। উত্তর-ভারতের ভাষাগুলির উৎসভূমি যেমন আর্য-ভাষা, দক্ষিণ-ভারতের ভাষাগুলির উৎসভূমি হলো, তেমনি

দ্রাবিড় ভাষা। তাই উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ-ভারতের ভাষাগত বৈষম্য যেমন তীব্র, পূর্ব-ভারত ও পশ্চিম-ভারতের ভাষাগত বৈষম্য ততখানি তীব্র নয়। তারপর ভারতের ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন মুসলমানেরা। সঙ্গে এনেছেন তাঁদের আরবী, ফারসী ভাষা। তাঁরা দীর্ঘকাল ভারতের শাসনকার্যে অধিষ্ঠিত থাকায় আরবী, ফারসী তাৎকালিক সরকারী ভাষার মর্যাদালাভ করেছিল। সেই সময় উত্তর-ভারতের হিন্দীর সঙ্গে আরবী-ফারসীর সংমিশ্রণে উর্দু ভাষার উদ্ভব হলো। তারপর ইংরেজরা এলো ভারতবর্ষে। 'বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে।' আরবী-ফারসীকে অপসারিত করে দিল্লীর তখৎ-ই-তাউসে বসলো ইংরেজি। ইংরেজি-স্পর্শমণির স্পর্শে উনবিংশ শতাব্দীতে এলো ভারতের রেনেসাঁস্ বা নবজাগৃতি। এবং ইংরেজির চাবিকাঠিতেই বিশ্বজগতের রুদ্ধ দুয়ার আমাদের সম্মুখে খুলে গেল। তারপর ইংরেজও নিল বিদায়। স্বাধীন ভারতে প্রশ্ন উঠলো: এখনও কি সরকারী কার্য ইংরেজী ভাষাতেই সম্পাদিত হবে? বিদেশীর দাসত্ব-মোচনের পর বিদেশী ভাষার দাসত্ব অসহ্য হয়ে উঠলো। ভারতীয় গণপরিষদ মাত্র দুটি ভোটের জোরে সিদ্ধান্ত নিয়ে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করলেন: "The official language of the union shall be Hindi in Devnagri script." হিন্দীকে বিপুল ঐতিহ্যময় ইংরেজির স্থলাভিষিক্ত করার পেছনে যতখানি উগ্র জাতীয়তাবোধ, ভাষাগত গোঁড়ামি এবং ভাবপ্রবণতা ছিল, ততখানি দূরদৃষ্টি ছিল না।

ভারতে ভাষা-সমস্যার মূল স্বরূপ

একথা সত্য যে, ইংরেজি ভাষার হাত ধরে ভারত মধ্যযুগীয় তিমিরাবগুণ্ঠন থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিক যুগের আলোকিত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে দিক থেকে বিচারে ইংরেজ জাতি এবং ইংরেজি ভাষা আমাদের স্ব-রচিত অচলায়তন থেকে মুক্তির দূত। কিন্তু পৃথিবীর সব দেশেই চলেছিল যুগান্তরের আয়োজন। ইংরেজ জাতি বা ইংরেজি ভাষা ছাড়াই অন্য কোন ঐতিহাসিক উপকরণের মাধ্যমে হয়তো ভারতে নবযুগ আসতো। ইংরেজ বা ইংরেজি ভাষা ছাড়াই যদি জাপান বা সোভিয়েট রাশিয়ায় নবজাগরণ আসতে পারে, ভারতে কেন তা ভারতীয় ভাষাতেই সম্ভব হতো না? কিন্তু যা হয়নি, তার জন্যে ইতিহাসকে অভিযুক্ত করে কোন লাভ নেই। একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, ইংরেজি ভাষা দীর্ঘ দুশতাব্দী ধরে ভারত শাসন করেছে এবং ভারতের নবজাগরণ এনেছে, আর জাপান বা সোভিয়েট রাশিয়ায় ইংরেজি ভাষা সঞ্চারিত হয়নি এবং তাদের নিজস্ব ইতিহাসের স্বতন্ত্র ধারা-বিবর্তনে সেখানে নবযুগ এসেছে। এই ঐতিহাসিক সত্যটিকে স্বীকার করে নিয়ে ভারতের ভাষা-সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হওয়া উচিত।

ইংরেজিকে অপসারিত করার যৌক্তিকতা

তবে আজ ইংরেজিকে ভারত থেকে অপসারিত করলে ভারত কতখানি লাভবান হবে, তা ভারত-ভাগ্য-বিধাতা বিচার করবেন ; কিন্তু ভারত যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তার সম্ভাবনা অত্যন্ত স্পষ্ট। বিশ্বজগতের সংযোগের সেতুটা অপসারিত হলে ভারত যে আবার তার স্ব-রচিত অচলায়তনের মধ্যে নির্বাসিত হতে পারে, সে সম্ভবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অন্যদিকে ইংরেজির পরিবর্তে কোন একক ভাষাকে সরকারী ভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত করলে বহুভাষা-ভাষী ভারতে ভাষাগত অসহিষ্ণুতা যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের আকারে ফেটে পড়তে পারে এবং তীব্র ভাষা-সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ঠুরভাবে সত্য হয়েছে। এবং 'হবে তা সহিতে মর্মে দহিতে আছে সে ভাগ্যে লিখা'। কিন্তু তাই বলে স্বাধীনতা লাভের পরেও কি ভারত বিদেশী ভাষার জগদ্দল পাষাণ-ভার চিরদিন বহন করে চলবে ? আর বিদেশী ভাষার প্রশ্নই যদি তুলতে হয়, তবে ইংরেজিও তো ব্রিটেনের বিদেশী ভাষা এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিও তো বিদেশী বৈদিক ভাষার বংশধর। আসল কথা, ভাষার প্রশ্নে আমাদের দৃষ্টি যেমন সঙ্কুচিত, আমাদের চিন্তাশক্তিও ভাবপ্রবণতায় আচ্ছন্ন।

স্বাধীনতালাভের পর ইংরেজির বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর লোকের কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে ওঠে। বিদেশী ভাষার চাপে স্বদেশী ভাষাগুলি এতদিন বিকাশের সুযোগ পায়নি—তা কি কম বেদনার কথা ? কিন্তু কোন একক-ভাষা যদি ভারতের সরকারী ভাষার মর্যাদা লাভ করে, তবে কি ভারতের অন্যান্য ভাষাগুলি বিকাশের উপযুক্ত সুযোগ পাবে ? এই সুতীব্র জিজ্ঞাসা এবং ঘোরতর সংশয় জেগেছে আজ অহিন্দী-ভাষীদের মনে। সংখ্যা-গরিষ্ঠতার জোরেও তো হিন্দীর রথ অচল। সরকারী হিসেবে ৪৪ কোটি জনগণের মধ্যে ১৫ কোটিকে হিন্দীভাষী বলে প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু সংবিধানে স্বীকৃত ১৪টি ভাষার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য সত্ত্বেও হিন্দী, উর্দু ও হিন্দুস্থানী—এই তিনটি ভাষাকে যে একসঙ্গে হিন্দী বলে ১৫ কোটিতে দাঁড় করানো হয়েছে, তা আজ আর কারো অজানা নয়। তাছাড়া মাড়োয়ারী, মেওয়ারী, জয়পুরী, ভোজপুরী, বাগড়ী, ছত্তিসগড়ী, সিন্ধি, রাজস্থানী, কুমায়নী, ব্রজভাষা ইত্যাদির লোকসংখ্যাকে, যা প্রায় ২ কোটিরও বেশী, হিন্দীভাষী বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার হিন্দীর সরকারী রূপ হিন্দীভাষীদের ক জন বোঝে, তাও অবশ্য-বিচার্য। আসল কথা, বর্তমান ভারতে ভাষার যে মাৎস্যন্যায় চলেছে, যাকে রাজনৈতিক পরিভাষায় বলা যায় ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদ, তার গ্রাস থেকে আঞ্চলিক ভাষাগুলির এবং উপভাষাগুলির মুক্তি আজ প্রকৃতই এক দুরূহ সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। তবু হিন্দী যদি উপযুক্ত প্রকাশ-ক্ষমতা-সম্পন্ন হতো কিংবা গৌরবময় সাহিত্যিক ঐতিহ্য-মণ্ডিত হতো, তাহলে বোধ হয় সমস্যার এত তীব্রতা দেখা

হিন্দীকে সরকারী ভাষা করার যৌক্তিকতা

যেত না। দুদিক দিয়েই যে হিন্দী নিদারুণভাবে দুর্বল। তাহলে সমস্যার সমাধান কোথায়?

সংবিধানের সপ্তদশ অনুচ্ছেদটিকে দ্রুত কার্যকর করবার জন্যে যে অতি-ব্যস্ততা লক্ষ্য করা গেল, ভারতের মন্থর রাষ্ট্রীয় জীবনে তার দৃষ্টান্ত বিরল। সংবিধান চালু হওয়ার ১৫ বৎসরের মধ্যে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা, সরকারী ভাষা ও যোগাযোগ রক্ষাকারী ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত হবে; ইতিমধ্যে হিন্দী প্রচারের ব্যাপক ব্যবস্থা করতে হবে—এই হচ্ছে সংবিধানের নিদেশ। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে গণ-পরিষদ সংবিধানে সপ্তদশ সংযোজিত করেছিলেন, আজ তার পট-পরিবর্তন ঘটেছে।

সংবিধানের কার্যকারিতার যৌক্তিকতা

সেক্ষেত্রে সংবিধানের এই অনুচ্ছেদটিকে অনড়, অপরিবর্তনীয় আপ্তবাক্যরূপে মনে না করে পরিস্থিতির মর্ম-গ্রহণের জন্যে গণ-মানসের দিকে দৃষ্টিক্ষেপণ করা উচিত। তাছাড়া সংবিধানের ৩৪৭ নং অনুচ্ছেদে আবার একথাও বলা রয়েছে যে, "On a demand being made in that behalf, the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a state desire the use of any language spoken by them to be recognized by that state, direct that such language shall also be officially recognized throughout that state or any part thereof for such purpose as he may specify." কাজেই দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের প্রতিবাদ যখন হিন্দীর বিরুদ্ধে সোচ্চার, তখন হিন্দীকে অদ্বিতীয় সরকারী ভাষারূপে অভিষিক্ত করার কোন যৌক্তিকতা নেই। যুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সংবিধানও পরিবর্তন-সাপেক্ষ। এই পনের বছরে অপেক্ষাকৃত অল্প-গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংবিধানের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এবং তাতেও যদি সংবিধানের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ থেকে থাকে, তবে ভাষার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সংবিধানের পরিবর্তনও কোনরূপ পবিত্রতা হানি করবে না।

কিন্তু হিন্দীর পাশাপাশি ইংরেজি চালু থাকলে কি সমস্যার সমাধান হবে? রুজি-রোজগারের প্রশ্ন যেখানে তীব্র, সেই সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় একজন উত্তর রচনা করবে তার মাতৃ-ভাষা হিন্দীতে, আর একজন উত্তর রচনা করবে বিদেশী ভাষা ইংরেজিতে। তখন সংবিধানের গণতান্ত্রিক ন্যায়বিচার কি ব্যাহত হবে না? এরূপ ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়ার ভাষা-সমস্যার

সোভিয়েট রাশিয়ার ভাষা-সমস্যার সমাধান

সমাধান-পন্থা ভারতের ভাষা-সমস্যার ওপর আলোকপাত করতে পারে। ভারতের মতো সোভিয়েট রাশিয়ার ভৌগোলিক বিস্তার, বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাষা-ভাষী জন-সমষ্টি বর্তমান। সেখানে প্রধান ১৫টি ভাষাই

রাষ্ট্রের সরকারী ভাষা। কিন্তু আরো ১০৫টি ভাষা যাদের মাতৃভাষা, তাদেরও অবহেলা করা হয়নি। অক্টোবর বিপ্লবের আগে যে সব ভাষার কোন স্বতন্ত্র মর্যাদা ছিল না, ছিল না কোন লেখার হরফ, বিপ্লবোত্তর রাশিয়া বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিকদের সাহায্যে সে রকম ৬০টি ভাষার হরফ তৈরী করে দিয়েছে। তার ফলে সমগ্র সোভিয়েট রাশিয়ায় ঘটে গেছে এক যুগান্তকারী সাংস্কৃতিক বিপ্লব। যা ছিল নিছক মুখের ভাষা, সীমিত অঞ্চলের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের ভাষা, তা আজ সমৃদ্ধ সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হয়ে নিরক্ষর, শিক্ষা-বঞ্চিত অসংখ্য মানুষের জীবনে এনে দিয়েছে নতুন আশা ও নতুন আলো। আবার রুশ ভাষা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম এবং সোভিয়েট রাশিয়ার বিপুল সংখ্যা-গরিষ্ঠের মাতৃভাষা। তা সত্ত্বেও রুশভাষাকে কোন বিশেষ সরকারী মর্যাদা দেওয়া হয়নি। তবে রুশভাষা সর্বাপেক্ষা উন্নত ভাষা বলে সোভিয়েট রাশিয়ার সকল মানুষ এই ভাষা শিক্ষায় বিশেষভাবে আগ্রহী। রুশভাষা তাই সেখানে স্বেচ্ছাবৃত্ত নিখিল-সোভিয়েট-ভাষায় পরিণত হয়েছে।

সোভিয়েট রাশিয়ায় যা স্বেচ্ছাবৃত্ত হয়ে সমস্যার সমাধানের সহায়ক হয়েছে, ভারতে তা বাধ্যতামূলক হয়ে সমস্যার তীব্রতাকে তুলেছে বাড়িয়ে। স্ট্যালিন বলেছিলেন, "The national cultures must be allowed to develop and unfold, to reveal all their potentialities, in order to create the conditions for merging them into one common culture with one common language." প্রথমে চাই সকল ভাষার উন্নয়ন, চাই সকল সংস্কৃতির মুক্তি। তারপর উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হলে একটি স্বেচ্ছাবৃত্ত সাধারণ ভাষা গড়ে উঠবে। তাই হবে সমস্যার স্বাভাবিক সমাধান। ভারতেও সেই স্বাভাবিক সমাধানের সাধনা করা উচিত ছিল। কিন্তু ভারত সে পথে পদচারণা করেনি। স্বাভাবিকতার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে যা স্বেচ্ছাবৃত্ত হতে পারতো, তা কৃত্রিম পথে বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। ভাষার প্রশ্নে জাতীয় সংহতির চলেছে আজ চরম অগ্নি পরীক্ষা। ভারতের ভাষা-চিত্র এখন ভিন্নরূপ। দক্ষিণের বিক্ষোভে হিন্দী ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে ঘরে ফিরে এসেছে। তাছাড়া তার অন্য কোন উপায় ছিল না। তার পশ্চাদপসরণের পটভূমিকায় আঞ্চলিক ভাষাগুলির রক্ষাকবচের ব্যবস্থা এবং ত্রি-ভাষা সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা চলেছে পুরোদমে। কিন্তু সরকারের এখন উচিত অনির্দিষ্ট কালের জন্যে

উপসংহার

স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। এবং যে কোটি-কোটি টাকা হিন্দী-প্রচারের জন্যে ব্যয় করা হচ্ছে, তা সকল আঞ্চলিক ভাষা ও উপভাষাগুলির উন্নয়নে ব্যয়িত হওয়া উচিত। আর সেই সঙ্গে চিন্তা করা উচিত, যে প্রত্যাশা নিয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন ভাষা-ভাষী মানুষ গোর্কি-টলস্টয়-

ডস্টয়ভস্কির রুশভাষা শিক্ষা করে, সেরকম কোন্ প্রত্যাশা নিয়ে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠীর মানুষ হিন্দী শিক্ষা করতে যাবে। কাজেই বর্তমানে হিন্দী ভাষার প্রচার নয়, হিন্দী সাহিত্যের উন্নয়ন দরকার। যার আকর্ষণে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে সারা ভারতবাসী এক-ভাষা ও এক-সাহিত্য সঙ্গমে সম্মিলিত হবে, এখন হিন্দী-সাহিত্যে চাই সেই গোর্কি-টলস্টয়-ডস্টয়ভস্কির মতো কিংবা সেক্সপিয়ার-রবীন্দ্রনাথের মতো সমুন্নত সাহিত্য-প্রতিভা। তারপর উপযুক্ত ও অনুকূল সময়ের জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা। এই পথেই আছে ভারতের ভাষা-সমস্যার সঠিক সমাধান। তাছাড়া নান্যঃ পন্থাঃ।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- ভারতের রাষ্ট্রভাষা-প্রসঙ্গ
- ভারতের সরকারী ভাষা
- ভারতের ভাষা-সমস্যা ও জাতীয় সংহতি

৫৮. ভারতে খাদ্য-শস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়
State Trading in Food Grains.

প্রবন্ধ-সূত্র :—অবতরণিকা—খাদ্য-শস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় ও খাদ্য কর্পোরেশনের জন্ম—খাদ্য কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য, সংগঠন ও পুঁজি—কার্যাবলী—তর্ক-বিতর্কের ঝড়—বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি—সমর্থক-গোষ্ঠীর যুক্তি—উপসংহার।

দেশের মানুষকে নিশ্চিত উপবাসের দিকে ঠেলে দিয়ে খাদ্য-শস্যের মজুতদারী ও কালোবাজারী আর কতোদিন চলবে? কতোদিন চলবে খাদ্য-শস্যের মূল্য-রেখার এই অস্বাভাবিক ঊর্ধ্ব-বিহার। ভারতের খাদ্য-সংকট প্রকৃত খাদ্য-ঘাটতির জন্যে যতখানি নয়, তদপেক্ষা বহুগুণে বেশি বণ্টনগত ত্রুটি-জনিত। ভারতের পণ্য-বণ্টন ব্যবস্থা কুখ্যাত এবং বহু-কলঙ্ক-যুক্ত। ১৯৫৮-৫৯ সালে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। কিন্তু তা সত্বেও খাদ্য-শস্যের মূল্য ছিল ক্রমোর্ধ্বমুখী। চলতি বছরেও খাদ্য-শস্যের ঘাট্‌তি ছয়-শতাংশ; কিন্তু খাদ্য-শস্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে চব্বিশ-শতাংশ। এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির পশ্চাতে যে কৃত্রিম ঘাট্‌তি সৃষ্টি এবং মূল্য-বৃদ্ধির চক্রান্ত রয়েছে, তা আজ আর গোপন কথা নয়। খাদ্য-শস্য খামারে উঠতে না উঠতেই মজুতদারদের গুদামজাত হয়ে যায় কিংবা দুর্ভেদ্য অন্ধকার গহ্বরে তিরোহিত হয়। পুলিশ তাদের হদিশ পায় না; পেলেও আইন তাদের কেশস্পর্শ করতে পারে না। তাদের যাদুময় কারসাজিতে ফসলের মরশুমেই খাদ্য-শস্যের মূল্য দুর্ভিক্ষ-কালীন পণ্যমূল্যকেও লজ্জা দেয়। আরো মজার কথা হলো, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দাদন নিয়ে একশ্রেণীর ধূর্ত ব্যবসায়ী খাদ্য-শস্য নিয়ে এই ঘৃণ্য, সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপে মেতে ওঠে। অর্থাৎ জনসাধারণের অর্থে জনসাধারণের মুখের গ্রাস নিয়ে, জনসাধারণের প্রাণ নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলে। অথচ তাদের বিরুদ্ধে কারো কিছু করবার নেই, করবার ক্ষমতাও নাকি নেই।

অবতরণিকা

'সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ!' খাদ্য-বণ্টনের এই দুরপনেয় কলঙ্ক অপসারিত করবার জন্যে দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৮-৫৯ সালের খাদ্য-শস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রবর্তন করেন। কিন্তু খাদ্য-শস্যের সেই রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে সরকারের ভূমিকা ছিল দ্বিধা-দুর্বল। কেবল কৃষকদের কাছ থেকে খাদ্য-শস্য ক্রয় করা এবং অনুমতি-প্রাপ্ত (licensed) পাইকারী ব্যবসায়ীদের মধ্যস্থতায় তা বিক্রয় করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল সরকারী ভূমিকা। কিন্তু যে পর্যায়ে বেশি করে মজুতদারী ও কালোবাজারী চলে, সেই পাইকারী ব্যবসায়ী থেকে খুচরা ব্যবসায়ী পর্যন্ত সরকারের ছিল না কোন নিয়ন্ত্রণ।

খাদ্য-শস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় ও খাদ্য-কর্পোরেশনের জন্ম

ফলে যা হবার তাই হয়েছিল। সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে মজুতদার ও কালো-বাজারীরা সুযোগ বুঝে অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছিল। সাধারণ ক্রেতা দুর্ভাগ্যের হাতে আত্ম-সমর্পণ করে শিয়রে মৃত্যুর পদশব্দ শুনেছিল। কাজেই ১৯৫৮-৫৯ সালের খাদ্য-শস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় নামে রাষ্ট্রীয় হলেও ধূর্ত ব্যবসায়ীরাই ছিল সেই নাটকের নায়ক। তৃতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় বর্ষে আবার খাদ্য-সংকট তীব্র হয়ে উঠলো। সত্য কথা, কৃষি-উৎপাদনের নৈরাশ্যজনক চিত্র তার জন্যে আংশিকভাবে দায়ী। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য-শস্য আমদানি করা সত্ত্বেও দেশে খাদ্য-সংকট তীব্রতর হয়ে উঠলো কেন? পরে কুখ্যাত ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর নাগালের বাইরে ভারতের খাদ্য-শস্যের বণ্টন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখে খাদ্য-সংকটের সমাধানকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছেন প্রশংসনীয় দৃঢ়তার মনোভাব। সেই মনোভাবের প্রকাশ হলো ভারতের খাদ্য-কর্পোরেশন। ১৯৬৫ সালের ১৪ই জানুয়ারী মাদ্রাজে হয়েছে এর শুভ উদ্বোধন।

'ভারতের খাদ্য-কর্পোরেশন বিধি'-বলে ভারতের খাদ্য-কর্পোরেশন নামে একটি কেন্দ্রীয় খাদ্য-শস্য ব্যবসায় সংস্থা ও প্রতি রাজ্যে একটি করে রাজ্য খাদ্য-শস্য ব্যবসায় সংস্থা স্থাপনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। ভারতের খাদ্য-কর্পোরেশনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো, ব্যাপক আকারে খাদ্য-শস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মাধ্যমে দেশে খাদ্য-শস্যের বাজারে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ-কারীর ভূমিকা গ্রহণ করা। বারোজন সদস্য-সমন্বিত একটি পরিচালক-পর্ষদের ওপর ন্যস্ত থাকবে এর পরিচালন-ভার। তার মধ্যে থাকবেন একজন চেয়ারম্যান এবং একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। কেন্দ্রীয় খাদ্য, অর্থ ও সমবায় মন্ত্রকের প্রতিনিধিত্রয় হবেন এর তিনজন পরিচালক। কেন্দ্রীয় পণ্যাগার কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হবেন এর একজন অন্যতম পরিচালক। তাছাড়াও থাকবেন ছয়জন পরিচালক। কর্পোরেশনের এক বা একাধিক উপদেষ্টা কমিটি থাকবে, তা কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছাধীন। এর প্রারম্ভিক শেয়ার পুঁজি হবে অনধিক ১০০ কোটি টাকা এবং রাজ্য খাদ্য-কর্পোরেশনগুলির পুঁজি হবে অনধিক ১০ কোটি টাকা। সমগ্র পুঁজিই সরবরাহ করবেন কেন্দ্রীয় সরকার।

খাদ্য-কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য, সংগঠন ও পুঁজি

খাদ্য-কর্পোরেশন গঠনে ইতিমধ্যে যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। দেরি হলেও এর আবির্ভাব অভিনন্দনযোগ্য। এই কর্পোরেশন একটি স্বয়ংচালিত সংগঠন। লাভ-ক্ষতির বাণিজ্যিক নীতি রচনায় এই সংস্থা সম্পূর্ণরূপে অনন্য-নির্ভর। এর হাতে সব সময়ই থাকবে খাদ্য-শস্যের একটি সাময়িক ভাণ্ডার। খাদ্য-শস্যের ক্রয়-বিক্রয়, গুদামজাতকরণ, চলাচল ও বণ্টনই হলো এর কার্য-সূচীর প্রধান অঙ্গ। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছানুযায়ী এই সংস্থা অন্যান্য খাদ্য-পণ্যের

কার্যাবলি

ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করতেও পারে। তাছাড়া পারে খাদ্য-শস্য ব্যবসায়ের আনুষঙ্গিক চালকল, ময়দাকল এবং অন্যান্য কলকারখানা স্থাপন করে ব্যবসায় পরিচালনা করতে। তবে সেরূপ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তিমপর্বে অশোক মেহতা কমিটির সুপারিশক্রমে ভারতে খাদ্য-শস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে প্রবর্তনের সরকারী সিদ্ধান্ত বিঘোষিত হয়। এই সিদ্ধান্তটিকে কেন্দ্র করে সেদিন উঠেছিল তর্ক-বিতর্কের তুমুল ঝড়। খাদ্য ব্যবসায়ে এই বলিষ্ঠ সরকারী নীতির জন্মলগ্নে যে ঝড় উঠলো, তাতে এই নীতির ভিত্তি ভূমি হয়ে পড়লো দ্বিধা-দুর্বল। তাই নতুন কোন সংস্থা স্থাপন না করে সরকারী খাদ্য-দপ্তরের মাধ্যমে খাদ্য-শস্যের অত্যন্ত সীমাবদ্ধ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় চালিত হয়। এবং পরিচালন-ব্যবস্থায় ছিল অত্যন্ত দ্বিধা-গ্রস্ত নীতি। ফলে বহু ক্ষেত্রে ব্যর্থতাই হয়েছিল তার ভাগ্য-লিপি। সেই দ্বিধা-দুর্বল খাদ্য নীতির ত্রুটিপথে সমাজ-বিরোধী ক্রিয়াকলাপ অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। খাদ্য-শস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়কে কেন্দ্র করে সেদিন যে তর্ক-বিতর্কের ঝড় উঠেছিল, তা এখনও থামেনি।

তর্ক-বিতর্কের ঝড়

খাদ্য-শস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের বিরুদ্ধবাদীদের মতে :—এক, খাদ্য-শস্যের সীমাবদ্ধ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে যখন পর্বত-প্রমাণ ব্যর্থতাই জমেছিল সরকারের হাতে, তখন খাদ্য-শস্যের এই ব্যাপক রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে ব্যর্থতা এক প্রকার অবধারিত; দুই, উপযুক্ত সরকারী গুদামের অভাবে ক্রীত খাদ্য-শস্য সংরক্ষণের অনিবার্য সংকট দেখা দেবে; তিন, পাইকারী ব্যবসায়ীদের ওপর খাদ্য-কর্পোরেশনের নির্ভরশীলতার পরিণামে খাদ্য-শস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় কার্যতঃ বেসরকারী ব্যবসায়ী-চক্রের হাতের মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়বে; চার, খাদ্য-শস্যের এই ব্যাপক রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে যে বিপুল পরিমাণ পুঁজির প্রয়োজন, তা সংগ্রহ করা সরকারের পক্ষে হবে একটি দুঃসাধ্য ব্যাপার; এবং পাঁচ, খাদ্য-শস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের প্রবর্তনের ফলে খাদ্য-শস্যের কারবারে নিযুক্ত বহু ব্যক্তি তাদের পুরাতন কর্ম ও জীবিকাচ্যুত হয়ে সমস্যা-জর্জর ভারতে সৃষ্টি করবে আবার এক নতুন সমস্যা।

বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি

বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তিগুলির অধিকাংশই ভীতি-প্রদর্শন হলেও সেগুলি সর্বাংশে অন্তঃসারশূন্য নয়। রাষ্ট্রীয় পরিচালনার সর্বক্ষেত্রে এমন এক শনির দৃষ্টি পড়েছে যে, সব ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার অঙ্ক জমে উঠছে পাহাড়-প্রমাণ হয়ে। মাথাভারি এবং ব্যয়বহুল প্রশাসনিক দুর্বলতা ও পরিচালনা-নীতির ব্যর্থতা ইত্যাদি তার জন্যে প্রধানতঃ দায়ী। তবু খাদ্য-শস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সমর্থক-গোষ্ঠী সেই দ্বিধা-দুর্বলতা পরিহার করে যে সব বলিষ্ঠ যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, সেগুলি হলো :—এক, ব্যবসায়ী-চক্রের সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে আজ

সমর্থক-গোষ্ঠীর যুক্তি

ভারতের চিরাচরিত খাদ্য-বণ্টন-রীতি একেবারে অচল এবং ভারতের নিত্য-নৈমিত্তিক খাদ্য-সংকটের স্থায়ী সমাধান হলো খাদ্য-শস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়; দুই, খাদ্য-শস্যের ন্যায্য বণ্টনের মাধ্যমে খাদ্য-শস্যের মূল্য-মান-রেখাকে অবিচলিত রক্ষা সম্ভব হবে; তিন, এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী-চক্রের মুনাফা-লোলুপতার জন্যে দেশের মধ্যে যে কালোটাকার খেলা চলেছে, তা সর্বাংশে না হলেও আংশিক অবদমিত হবে; চার, দেশে নিদারুণ খাদ্য-সংকটের পরিণামে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলি বারে বারে যে বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাড়ায়, তার সম্ভাবনা দূরীভূত হবে এবং পরিকল্পনাগুলির সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হবে; এবং পাঁচ, কৃষক-সমাজ মধ্যবর্তী-ব্যবসায়ীদের শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাবে ও উৎপন্ন দ্রব্যের ন্যায্যমূল্য তাদের উৎপাদন-বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করবে।

আশার কথা, খাদ্য-শস্য ব্যবসায়ের এই সরকারী উদ্যোগে দেশব্যাপী তীব্র খাদ্য-সংকট এবং তার অমঙ্গলের প্রেতচ্ছায়া আজ ধীরে ধীরে অপসৃত হচ্ছে। দেশের মুনাফা-লোলুপ ও অসাধু ব্যবসায়ী চক্রের বিরুদ্ধে এই দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন ছিল বহু পূর্বে। ইতিমধ্যে বহু বিলম্ব হয়ে গেছে। এবং সেই বিলম্বের জন্যে দেশবাসীকে ও সরকারকে কম খেসারত দিতে হয়নি।

উপসংহার

পরিকল্পিত অর্থনীতির স্বার্থে, খাদ্য-শস্যের ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের স্বার্থে, শোষিত কৃষক-সমাজ ও প্রতারিত ক্রেতা-সাধারণের স্বার্থে অসাধু ব্যবসায়ী-চক্রের মূল্য-বৃদ্ধির কারসাজির বিরুদ্ধে এই অমোঘ হাতিয়ার বহু পূর্বেই প্রযুক্ত হওয়া উচিত ছিল। বিলম্বে হলেও, জনগণের সার্বিক অকল্যাণের বিরুদ্ধে সরকারের এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ অবশ্যই অভিনন্দন-যোগ্য। সামাজিক অকল্যাণের প্রেতচ্ছায়া আজ দূরীভূত হোক, অতীত সরকারী অভিজ্ঞতা হোক তার পথ-প্রদর্শক এবং ভবিষ্যৎ যাত্রাপথ হোক তার শুভ এবং কল্যাণশ্রী-মণ্ডিত।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- খাদ্য-শস্যের সরকারী ব্যবসায়
- খাদ্য-শস্যের সরকারী বাণিজ্য
- খাদ্য-সংকট দূরীকরণে সরকারী ভূমিকা

৫৯. ভারতে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ
Nationalisation of Banks in India.

প্রবন্ধ-সূত্র :—অবতরণিকা - ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ প্রস্তাবের উদ্ভব—দেশের পরিকল্পিত অর্থনীতিতে ব্যাঙ্কগুলির সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপ—ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সপক্ষে যুক্তি—ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের বিরুদ্ধে যুক্তি—উপসংহার।

নানা অশুভ শক্তির পাকে-চক্রে স্বাধীন ভারতের পরিকল্পিত অর্থনীতি দারুণ সংকটের রাহুগ্রাসে আজ বিপন্ন। পরিকল্পনার বল্গা আজ সেই অশুভ শক্তিগুলির দাপটে বারে বারে শিথিল হয়ে পড়ছে। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে সোভিয়েট রাশিয়া দশ বছরের মধ্যে দেশের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণরূপে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। চীনও এই কয়েক বছরে দেশের হাল সম্পূর্ণ ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার রূপায়ণে পরিকল্পনার দেড় যুগ পরেও অনুরূপ দৃশ্য ভারতে কেন দেখা যায় না, তার জবাব দেবে কে? প্রখ্যাত অর্থশাস্ত্রী অধ্যাপক ক্যালডর ভারত ও অন্যান্য দেশে করনীতির সংস্কার সাধন করতে এসে যে ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তার ভিত্তিতে তাঁর সাম্প্রতিকতম গ্রন্থে তিনি লিপিবদ্ধ করলেন: "The main reason for these failures undoubtedly lay in the fact that the power behind the scenes of the wealthy property-owning classes and business interests proved to be very much greater than the responsible political functionaries suspected"—অর্থাৎ ধনিক শ্রেণী ও অসাধু ব্যবসায়ী-গোষ্ঠীর চক্রান্তে আজ ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলি বানচাল হয়ে যাচ্ছে। পরিকল্পনা কমিশনের সহকারী সভাপতি শ্রীঅশোক মেহতাও স্বীকার করেছেন—'গত পরিকল্পনার দশকটি মানুষের স্বার্থ-ত্যাগের দশক।' সত্যকথা, সাধারণ মানুষ গত দশকে পরিকল্পনার জন্যে স্বার্থত্যাগ করে, দুবেলা পেট ভরে না খেয়ে ধনীর লভ্যাংশ বৃদ্ধি করেছে এবং সমাজের প্রভূত অর্থ মুষ্টিমেয় ধনীর হাতে তুলে দিয়েছে। আর দেশের সরকারও সমাজের সর্বপ্রকার সম্পদকে ধনীর গোপন কক্ষে প্রেরণের সাহায্য করেছে। ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সমাজের এই সামগ্রিক স্বার্থ-বিরোধী কার্যকলাপে এতদিন গ্রহণ করে এসেছে নানা কলঙ্কিত ভূমিকা। তারা আর কতোদিন এইভাবে ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের কণ্ঠরোধ করে চলবে? এখনো কি ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করবার সময় হয়নি?

অবতরণিকা

ভারতীয় অর্থনীতির এই সংকট-মোচনের জন্যে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দাবী আজ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন সরকারী বিবরণের সাম্প্রতিক স্বীকৃতিই হলো এই যে, পরিকল্পনার রথ বাঞ্ছিত পথে অগ্রসর হয়নি, সম্পদ-বণ্টনের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে ঘোরতর বৈষম্য এবং সমাজের সর্বত্র গাঢ়তর হচ্ছে অর্থনৈতিক সংকটের অশুভ ছায়া। কাজেই সামাজিক কল্যাণের স্বার্থে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ আর কোনোমতেই বিলম্বিত হওয়া উচিত নয়। পরলোকগত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে গঠিত কংগ্রেসের উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন 'অর্থনৈতিক কার্যক্রম কমিটি'র অন্যতম সুপারিশ ছিল ভারতের ব্যাঙ্ক ও বীমার রাষ্ট্রায়ত্তকরণ। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে সেই মূল্যবান সুপারিশ গৃহীত হয়েছিল ১৯৪৮ সালে। পরবর্তীকালে জীবন বীমা ব্যবস্থার রাষ্ট্রায়ত্তকরণ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু নানা প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের চক্রান্তে এখনও ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ সম্ভব হয়নি।

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ প্রস্তাবের উদ্ভব

ভারতে আজ পরিকল্পনার বান ডেকেছে। ভারতের জাতীয় স্বার্থে সেই পরিকল্পনাগুলির সার্থক রূপায়ণ প্রয়োজন। দেশের অভ্যন্তরে সঞ্চিত অর্থ-সূত্রগুলি পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণে সরকারের হাতকে আরো শক্তিশালী করে তুলবে—এই আশাই করা হয়েছিল। তা হলে অবশ্য স্বাভাবিক হতো এবং পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণ দ্রুত এবং সার্থক হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতে সুলভ অর্থসূত্রগুলি পরিকল্পনার রূপায়ণে সহায়ক না হয়ে, হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বী। ব্যাঙ্কগুলি অধিক সুদের লোভে বেসরকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেয় প্রচুর ঋণ এবং দাদন। তার ফলে সমাজ-বিরোধী ফাট্‌কা কারবারের বাজার বেশ গরম হয়ে ওঠে। সমাজের সামগ্রিক প্রয়োজনে যে সব শিল্পের অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত, সেগুলি অবহেলিত পড়ে থাকে। সরকারও পুঁজির অভাবে তাদের প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করতে পারেন না। কিন্তু সমাজের সার্বিক বিকাশের পথে গুরুত্বহীন অথচ প্রচুর মুনাফার সম্ভাবনাময়—এমন শিল্প-ব্যবসায়ে ধূর্ত ব্যবসায়ীদের কোনদিন অর্থাভাব হয় না। ব্যাঙ্কগুলি তাদের হাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত পুঁজি পৌঁছিয়ে দিয়ে সমাজ-বিরোধী কার্য-কলাপকে উৎসাহিত করে। দেশে খাদ্যাভাব সৃষ্টি করে, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যাভাব সৃষ্টি করে, আমদানি-রপ্তানির গরমিল দেখিয়ে দেশের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে জাতির অর্থনৈতিক বিকাশ-পথের যে অশুভ শক্তিগুলি দিন দিন স্ফীত হয়ে উঠছে, তাদের প্রাণ-প্রবাহিণী রজত-ধারা যোগান দিয়ে আসছে এই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি। দুঃখের বিষয়, এইভাবে ভারতের বাণিজ্য, ভারতের টাকার বাজার সরকারের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে।

দেশের পরিকল্পিত অর্থনীতিতে ব্যাঙ্কগুলির সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপ

সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশে ব্যাঙ্কের ভূমিকা হবে অনবদ্য। জাতির সার্বিক শিল্প-বিকাশে সে সঞ্চারিত করবে প্রাণোল্লাস। তাই একদিন ভারতে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের বিকাশ ও সম্প্রসারণের শুভ জয়ধ্বনি বিঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু আজ ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় সম্বন্ধে সমগ্র জাতির আশাভঙ্গ হয়েছে। আজ ব্যাঙ্কগুলির রাষ্ট্রায়ত্তকরণ সম্পূর্ণ না হলে অশুভ রাহুগ্রাস থেকে ভারতের অর্থনীতির মুক্তি নেই। তাই আজ ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পক্ষে জনমত মুখর হয়ে উঠেছে। ভারতে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সপক্ষে যে যুক্তিগুলি জোরালো হয়ে উঠেছে, সেগুলি হলো: এক, পর্যাপ্ত পুঁজির অভাবে পরিকল্পনাগুলি আজ বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ছে। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ফলে সেই পুঁজির অভাব-মোচন হবে এবং দেশের পুঁজি ব্যক্তিগত মুনাফা বৃদ্ধিতে বিনিযুক্ত না হয়ে যে-সকল শিল্পের বিকাশ সমাজের জরুরী প্রয়োজন, তাতে বিনিয়োজিত হয়ে সমাজের সার্বিক বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে দেবে। দুই, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ব্যাঙ্ক-ব্যবসা দেশের শিল্প-জগতে একচেটিয়া প্রবণতাকে শক্তিশালী করে শুভ ও সুস্থ শিল্প-সম্প্রসারণের পথে এবং গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথে সৃষ্টি করছে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধকতা। তার জন্যে দায়ী ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে একচেটিয়া মালিকানা ও সমাজের আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ফলে দূর হবে এই প্রতিবন্ধকতা, দূর হবে সর্ব অমঙ্গল-ভয়। তিন, অসাধু ব্যবসায়ীরা আমদানি-রপ্তানি মূল্যের হেরফের দেখিয়ে জাতির অর্থনীতির সঙ্গে করছে ঘৃণ্য প্রবঞ্চনা। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি তাদের এই প্রতারণামূলক কারসাজিকে উৎসাহিত করে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা-সংকটকে করে তুলেছে তীব্রতর। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দ্বারা এই দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করা সম্ভব হবে। চার, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দ্বারা দেশে সমাজ-বিরোধী ফট্‌কা কারবার বন্ধ করা যাবে এবং মূল্য-রেখার অস্থিরতা দমন সম্ভব হবে। পাঁচ, এই ব্যবস্থার দ্বারা কর-ফাঁকি দেবার প্রবণতা রোধ করা যাবে। ছয়, ব্যাঙ্ক-বিপর্যয়ের আশঙ্কা দূরীভূত হবে। বিনিয়োগ-কারীর মনে আসবে আস্থা, বৃদ্ধি পাবে সঞ্চয়-প্রবণতা এবং শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আসবে এক দুর্লভ স্থায়িত্ববোধ। সাত, দেশের টাকার বাজারের ওপর রিজার্ভ-ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ ফলপ্রসূ হবে। আট, অযোগ্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে যোগ্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির ঋণলাভ সহজ হবে। নয়, এদিকে পরিকল্পিত অর্থনীতির কল্যাণে ব্যাঙ্কগুলির আমানত ঋণ, আগাম ও বিনিয়োগ—সব কিছুই জাতীয় আয়ের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার ফলে যে নানা সমাজ-বিরোধী শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠেছে, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দ্বারা তাদের নির্মূল করা সম্ভব হবে। দশ, দেশের ক্ষুদ্র সঞ্চয়গুলি, যা এতদিন একচেটিয়া শিল্পপতিদের মুনাফার অঙ্ক বৃদ্ধি করেছে, ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সপক্ষে যুক্তি

রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পরে দেশের সামগ্রিক প্রয়োজনে নিয়োজিত হতে পারবে।) এগারো, এই সময়োপযোগী ব্যবস্থা ধন-বৈষম্য হ্রাস করে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ প্রতিষ্ঠার সরকারী প্রতিশ্রুতির রূপায়ণ ত্বরান্বিত করবে।) এবং এই ব্যবস্থা ভারতকে এক অশুভ রক্তাক্ত শ্রেণী-সংঘাতের সম্ভাবনার হাত থেকে রক্ষা করছে কিনা, তাই-বা কে বলতে পারে?

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সপক্ষে দেশের গণমতের এই সোচ্চার ঘোষণায় প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থ আজ শিহরিত, সন্ত্রস্ত। তারাও আজ যুক্তি-কঠিন ব্যূহ-রচনায় ব্যস্ত। তাদের যুক্তিগুলো হলো: এক, ভারতের মিশ্র-অর্থনীতির অনুষঙ্গরূপে বেসরকারী শিল্প-প্রয়াস স্বীকৃত। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ফলে বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি দারুণ অর্থ-সংকটের সম্মুখীন হবে। দুই, যেহেতু জনসাধারণ সরকারী অর্থনৈতিক কার্যকলাপের দক্ষতায় আস্থাশীল নয়, সেই হেতু তাদের নবজাগ্রত সঞ্চয়-প্রবণতায় ভাঁটা পড়বে। তিন, সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা আছে। অতএব, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ নিষ্প্রয়োজন। চার, এই ব্যবস্থার রূপায়ণে সরকার যে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে আইনতঃ বাধ্য, তা দেওয়া সরকারের পক্ষে দুঃসাধ্য। পাঁচ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ফলে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় তার পূর্ববর্তী নৈপুণ্য হারিয়ে সরকারী ব্যর্থতার তালিকাবৃদ্ধি করবে। এবং ছয়, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ সরকারের গণতান্ত্রিক আদর্শের পরিপন্থী। এর ফলে দেশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার আর বিলম্ব থাকবে না।

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের বিরুদ্ধে যুক্তি

বলা বাহুল্য, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পক্ষে যে গণমতের জোয়ার উঠেছে তার প্রবল তাড়নায় কায়েমী স্বার্থের এই যুক্তি-ব্যূহ বালির বাঁধের মতো ভেসে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ন্যায়-বিচার ও বিবেকের কষ্টি-পাথরে বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তিসমূহের অসারতা প্রতিপন্ন হবে। প্রথমতঃ, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ হলেও বেসরকারী শিল্প-বাণিজ্যের পুঁজি-সংগ্রহের অন্যান্য সূত্রগুলি উন্মুক্ত থাকছে। কাজেই সরকারের মিশ্রনীতির আদর্শচ্যুতির প্রশ্নই ওঠে না। দ্বিতীয়তঃ, বীমা রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ফলে যদি বীমা-ব্যবসায় সম্প্রসারিত হতে পারে, তবে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ফলে জনগণের সঞ্চয়-প্রবণতায় ভাঁটা পড়বে কেন? বরং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিতে সঞ্চয়-প্রবণতার বৃদ্ধিই স্বাভাবিক। তৃতীয়তঃ, তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রণ সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে অসাধ্য, তা অর্থমন্ত্রীর বিভিন্ন ভাষণে স্পষ্ট। চতুর্থতঃ, তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ মাত্র ৭৫ কোটি টাকা। এবং এই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দান সরকারের অসাধ্য নয়। পঞ্চমতঃ, ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের যাবতীয় জটিল কাজ বেতন-ভোগী বিপুল সংখ্যক

উপসংহার

কর্মচারীর দলই করে থাকে। তাদের যদি নৈপুণ্য থেকে থাকে, রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পর তাদের নৈপুণ্য লুপ্ত হবে—এ যুক্তি হাস্যকর। ষষ্ঠতঃ, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ এবং সাম্যবাদ দুই স্বতন্ত্র বস্তু। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দ্বারা সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে, এ আশঙ্কা অমূলক। এর দ্বারা দেশের টাকার বাজারের ওপর একটা প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছিত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে মাত্র। এবং আজ সার্বিক নিয়ন্ত্রণের অভাবে যে সমাজ-বিরোধী শক্তিগুলির নানা অশুভ প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠছে, তাদের দমন করে সামাজিক কল্যাণের রুদ্ধ দুয়ারগুলিকে, এর দ্বারা উন্মুক্ত করে দেওয়া সম্ভব হবে। কাজেই, কায়েমী-চক্রের ভীতি প্রদর্শনে দ্বিধা-দুর্বল চিত্তে তাদের হাতে সরকারের আর আত্মসমর্পণ নয়, প্রকৃত কল্যাণের খাতিরে কংগ্রেসের পূর্ব-গৃহীত এই মূল্যবান সিদ্ধান্তের রূপায়ণে সরকারকে আজ বলিষ্ঠ পদবিক্ষেপে অগ্রসর হতে হবে। তাহলে জাতির অর্থনৈতিক জীবনে সঞ্চারিত হবে নতুন আশা, নতুন উদ্দীপনা এবং ভারতের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের ঘটবে নিত্য-নতুন দ্বারোদ্ঘাটন। ভারতের এই কল্যাণকর অর্থনৈতিক প্রয়াস জয়যুক্ত হোক।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- ভারতে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ
- ভারতে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ উচিত কিনা ?

৬০. ভারতের ইউনিট ট্রাস্ট
Unit Trust of India.

প্রবন্ধ-সূত্র :—অবতরণিকা—ইউনিট ট্রাস্টের জন্ম ও সংগঠন—স্বল্প-সঞ্চয় ও ইউনিট ট্রাস্ট—সুবিধা : সঞ্চয়কারী, ইউনিট-ক্রেতা ও ভারতের অর্থ-নীতি—ট্রাস্টের পুঁজি ও ইউনিট বিক্রয়-পদ্ধতি—ইউনিট ক্রয়-বিক্রয় ও লভ্যাংশ—উপসংহার।

স্বাধীনতালাভের পর নবযুগ সূচিত হয়েছে ভারতে। সুদীর্ঘকালের নৈষ্কর্ম্য ও স্থবিরতার ফলে তার অর্থনীতিতে সঞ্চিত হয়েছে যুগ-যুগান্তরের জড়তা। বিগত দুই শতাব্দী ধরে বিদেশীর অবারিত শোষণের ফলে সেখানে জমে আসে সীমাহীন অবসাদ। ভারতের অর্থনীতির সেই জড়তা ও অবসাদ দূর করে তাকে জঙ্গম করে তুলতে হলে যে বিপুল উদ্যোগ-আয়োজনের দরকার, ভারতের প্রথম তিনটি পরিকল্পনা তারই অভিব্যক্তি। এই পরিকল্পনাত্রয়ের পলি-ক্ষেপণে ভারতের মৃত্তিকায় আজ যে উর্বরতা সঞ্চিত হয়েছে, দেশবাসীর হাতে এসেছে যে স্বল্প সঞ্চয়-ক্ষমতা, আজ তাকে সংগ্রহ করে অধিকতর উৎপাদনশীল উদ্যোগে বিনিয়োজিত করতে হবে। তাই আজ পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণের পটভূমিকায় বৃদ্ধি পেয়েছে মূলধন-সংগঠনের গুরুত্ব। স্বাধীনতা-লাভের পূর্বে শিল্পোদ্যোগ ছিল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। কিন্তু উত্তর-স্বাধীনতা পর্বে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে গড়ে উঠছে বিপুল শিল্পোদ্যোগ। কাজেই তার প্রয়োজনে মূলধন-সংগঠনের সমস্যা ধারণ করেছে তীব্রতর রূপ। আবার তৃতীয় পরিকল্পনায় স্বনির্ভর অর্থনীতি গঠনের ওপর গুরুত্ব আরোপিত হওয়ায় দেশব্যাপী মূলধন-সংগঠনের একটি সুসংবদ্ধ প্রয়াস অপরিহার্যরূপে দেখা দিয়েছে। সেই প্রয়াসের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে ভারতের ইউনিট ট্রাস্ট।

অবতরণিকা

ভারতের ইউনিট ট্রাস্ট এখনো তার বাল্যাবস্থা অতিক্রম করেনি। তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যসূচীর রূপায়ণ যখন পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে বিঘ্নিত হয়ে পড়েছিল, তখন সরকারকে বাধ্য হয়ে অবশ্য সঞ্চয় পরিকল্পনা হাতে নিতে হয়েছিল। নানা কারণে অবশ্য সঞ্চয় পরিকল্পনা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু দেশব্যাপী যে বিরাট কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়েছে, তার রূপায়ণে পুঁজি চাই। কিন্তু কোথা থেকে আসবে সেই পুঁজি? আসলে মূলধন-সংকট থেকেই ইউনিট ট্রাস্টের জন্ম। ১৯৬৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর ভারতের লোকসভায় বিধিবদ্ধ একটি আইনের বলে এর প্রতিষ্ঠা। ১৯৬৪ সালের ১লা জুলাই থেকে সুরু হয়েছে এর কার্যকারিতা। নয়জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি পর্ষদের

ইউনিট ট্রাস্টের জন্ম ও সংগঠন

হাতে ন্যস্ত রয়েছে এর পরিচালন-দায়িত্ব। পর্ষদের সভাপতি যদি পূর্ণকালীন রূপে নিযুক্ত না হন, তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একজন অতিরিক্ত কার্য-নির্বাহক ট্রাস্টী নিয়োগ করবে। কাজেই ইউনিট ট্রাস্ট সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র-ভুক্ত।

উন্নয়ন-পথে যাত্রা করে প্রত্যেক স্বল্পোন্নত দেশকেই মূলধন-সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। মূলধন-সংগঠনের দেশব্যাপী সুসংহত প্রয়াস ছাড়া এই সমস্যা-জয়ের অন্য পথ নেই। দেশমধ্যে সঞ্চিত বৃহদায়তন পুঁজিকে স্পর্শ করবার কোন ক্ষমতা রাষ্ট্রের নেই। অন্ততঃ ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ছাড়া তা সুদূরপরাহত। কায়েমী-চক্রের বিরোধিতায় ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণে সরকার এখন দ্বিধা-দুর্বল। ওদিকে অবশ্য সঞ্চয় পরিকল্পনা হয়েছে প্রত্যাহৃত। এই অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র সঞ্চয়-আকর্ষণের দিকে সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। পরিকল্পিত অর্থনীতির এই পনের বছরে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা যৎসামান্য হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে মুদ্রাস্ফীতি ও পণ্যমূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। জনসাধারণের হাতের সেই অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমতাকে শোষণ করে সম্পদ-উৎপাদনের খাতে প্রবাহিত করে দিতে না পারলে মুদ্রাস্ফীতি ও পণ্যমূল্য-বৃদ্ধি রোধ করা যাবে না। স্বল্প সঞ্চয়ের উৎপাদন-মুখীনতা সৃষ্টি করতে না পারলে তার একটা বৃহৎ অংশ অনুৎপাদনশীল খাতে প্রবাহিত হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া, একথা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, ভারতের টাকার-বাজার সুসংগঠিত নয়। তার ফলে স্বল্প সঞ্চয় সমূহের নিরাপত্তা বিধান করে উৎপাদনের লাভজনক বিনিয়োগের দিকে তাদের প্রবাহমান করা যায় না। অথচ সমাজের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে স্বল্প সঞ্চয়ের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু বৃহৎ সঞ্চয় যেমন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে লাভজনক বিনিয়োগের দিকে প্রবাহিত হবার সুবিধা পায়, স্বল্প সঞ্চয় স্বল্প বলে স্বাভাবিক কারণেই হয় তা থেকে বঞ্চিত। ফলে ক্ষতি, অপচয় কিংবা বন্ধ্যাত্ব হয় তার ভাগ্য-লিপি।

স্বল্প সঞ্চয় ও ইউনিট ট্রাস্ট

ইউনিট ট্রাস্ট স্বল্প সঞ্চয়গুলির বন্ধ্যাত্ব দূর করে দেশের উৎপাদন-কার্য গতিশীল করে তুলবে। এর দ্বারা ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের সঞ্চয়গুলি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শলাভে সমর্থ হবে। এবং বিনিয়োগযোগ্য অর্থকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে বিভিন্ন শিল্পে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে দেবে। তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা বিলুপ্ত হবে। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠান বিনিযুক্ত অর্থের নিরাপত্তাবিধান, *নিয়মিত লভ্যাংশ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা-দান* এবং *পুঁজিমূল্য বৃদ্ধি-জনিত অন্যান্য সুবিধা সঞ্চয়কারীদের দেবে।* ইউনিট-ক্রেতারাও কতকগুলি সুবিধা পাবে। ট্রাস্ট যেমন একদিকে আয়কর, অতিরিক্ত কর—এবং

সুবিধা: সঞ্চয়কারী, ইউনিট-ক্রেতা ও ভারতের অর্থনীতি

অন্যান্য করমুক্ত থাকবে, ইউনিট-ক্রেতাদেরও তেমনি তাদের লভ্যাংশ ক্রয়ের জন্যে আয়কর দিতে হবে না। এই প্রতিষ্ঠানের আওতায় যে কেবল সঞ্চয়কারী ও ইউনিট-ক্রেতারাই লাভবান হবেন, তাই নয়; সামগ্রিক ভাবে ভারতের অর্থনীতিও হবে উপকৃত। ভারতের জড়তাগ্রস্ত অর্থনীতির মরাগাঙে বহুদিন পরে আবার জলোচ্ছ্বাস দেখা দেবে এবং অপসৃত হবে মুদ্রাস্ফীতি ও পণ্যমূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি নানা অমঙ্গলের প্রেতচ্ছায়া।

ভারতে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান এই প্রথম। ব্রিটেনে ও মার্কিন মুলুকে ইউনিট ট্রাস্টের মতো অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, যারা সঞ্চয়-সংগ্রহে, মূলধন-সংগঠনে এবং মূলধন-বিনিয়োগে নানা দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। ভারতেও মূলধন-সংগঠন ও বিনিয়োগের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির জন্যে এই সরকারী প্রয়াস অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। ৫ কোটি টাকার প্রারম্ভিক পুঁজি নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা-সুরু। তার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অংশ ২½ কোটি টাকা, জীবন বীমা কর্পোরেশনের অংশ ৭৫ লক্ষ টাকা, কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ ৭৫ লক্ষ টাকা, বেসরকারী ক্ষেত্রের তপশীলভুক্ত বাণিজ্যিক ও অন্যান্য অর্থ-সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অংশ ১ কোটি টাকা। ১০০ কোটি টাকার পুঁজি সংগ্রহ এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। প্রারম্ভিক পুঁজি বিভিন্ন লগ্নীপত্রে এমনভাবে বিনিয়োগ করা হবে, যাতে গড়ে ৬ শতাংশেরও অধিক হারে আয় হয়। এই প্রারম্ভিক বিনিয়োগের ভিত্তিতে সম-মূল্যের কতকগুলি একক সৃষ্টি করে সেগুলি বিনিয়োগেচ্ছু জনসাধারণের কাছে বিক্রী করা হবে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ আরো নানা প্রকারে লগ্নীপত্রে বিনিয়োগ করা হবে। তবে ট্রাস্ট-কর্তৃক বিক্রীত প্রতিটি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ১০ টাকার কম বা ১০০ টাকার বেশী হবে না।

ট্রাস্টের পুঁজি ও ইউনিট-বিক্রয় পদ্ধতি

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের একটা সুস্থ পরিমণ্ডল সৃষ্টির জন্যে দেশব্যাপী ইউনিট ট্রাস্টের একটি জাল বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ও অন্যান্য ৩৬টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সাড়ে তিন হাজার শাখার মাধ্যমে ইউনিট বিক্রয়ের অর্থ সংগৃহীত হবে এবং প্রত্যেক আর্থিক বর্ষান্তে ব্যয়-বিযুক্ত লভ্যাংশের ৯০ শতাংশ ইউনিট-ক্রেতাদের মধ্যে বণ্টিত হবে। অনুমান, এই বণ্টনযোগ্য লভ্যাংশের পরিমাণ বিনিযুক্ত অর্থের ১০ শতাংশ হবে। ইউনিটগুলির ওপরে বিভিন্ন সময়ে ঘোষিত লভ্যাংশের পরিমাণ অনুসারে তাদের মূল্য নির্ধারিত হবে এবং সেই মূল্যের ভিত্তিতে বাজারে বিক্রয় করা হবে। কখন, কতো মূল্যে ট্রাস্ট ইউনিটগুলিকে পুনরায় ক্রয় করবে, তা ভিন্ন ভিন্ন সময় ঘোষিত হবে। তবে ইউনিট-ক্রয়ের সংখ্যার ব্যাপারে কোন কড়াকড়ি সীমানা বেঁধে দেওয়া হয়নি।

ইউনিট ক্রয়-বিক্রয় ও লভ্যাংশ

প্রয়োজনমতো ইউনিটগুলি হস্তান্তর-যোগ্য। তাছাড়া ব্যাঙ্কের কাছেও ইউনিট জমা রেখে প্রয়োজনের সময় ঋণ পাওয়া যাবে।

ভারতের মতো স্বল্পোন্নত দেশে, যেখানে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীরা জনসাধারণের বহুকষ্ট-সঞ্চিত অর্থ নিয়ে অনুৎপাদনশীল ফট্‌কা কারবারে মেতে উঠে গণজীবনকে দুর্বহ করে তোলে এবং মুনাফার কড়ি থেকে জনসাধারণকে বঞ্চিত করে থাকে, সেখানে ইউনিট ট্রাস্টের শুভ উদ্বোধন জাতির পক্ষে শুভ ফলদায়ক হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। জনসাধারণের ট্যাঁকের কড়ি যে আর জনসাধারণেরই গলা-কাটার কাজে ব্যবহৃত হবে না, এতদিনে তার নিশ্চয়তা পাওয়া গেল। কাজেই

উপসংহার

ইউনিট ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠা সেই সব অসাধু ব্যবসায়ীদের কায়েমী-চক্রের মনে স্বাভাবিক কারণেই নৈরাশ্য বয়ে এনেছে। সেই সঙ্গে আশঙ্কা বয়ে এনেছে বেসরকারী বৃহৎ বিনিয়োগকারীদের মনে। তাদের ধারণা, সরকারী পরিচালনায় ট্রাস্টের এই একচেটিয়া কারবার পশ্চাৎ-দ্বারপথে শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রয়াস ছাড়া অন্য কিছু নয়। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ ইউনিট ট্রাস্ট বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান সমূহের আভ্যন্তরীণ কাযকলাপে যে হস্তক্ষেপ করতে যাবে না, তা সুনিশ্চিত। জীবনবীমা কর্পোরেশনও তো বহু বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের মালিক। কিন্তু সে যে ঐ সব প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ কার্যে হস্তক্ষেপ করেছে, তার তো কোন নজীর নেই। তবু কেন এত দ্বিধা, এত ভয় এবং এত সংশয়? আসল কথা, এই দুর্ভাগা দেশে নতুনের আগমন যতই কল্যাণকর হোক না কেন, তার সম্বন্ধে জনসাধারণের মনের দ্বিধা এবং সংশয় ঘুচলেও কায়েমী স্বার্থের ভয় ঘোচে না। তাই ইউনিট ট্রাস্ট নিয়ে তাদের মনে পুঞ্জীভূত হচ্ছে আশঙ্কার কালো মেঘ। কিন্তু আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, ইউনিট ট্রাস্ট খুলে দেবে ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির এক উজ্জ্বল দিগন্ত।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- ভারতের অর্থনীতিতে ইউনিট ট্রাস্টের ভূমিকা
- স্বল্প সঞ্চয় ও ইউনিট ট্রাস্ট
- ইউনিট ট্রাস্ট ও শিল্প-বিকাশ

৬১. ভারতের জাতীয় সংকট
National Emergency of India.

প্রবন্ধ-সূত্র :—অবতরণিকা—রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় সংকট ঘোষণা—কলম্বো সম্মেলন, প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার পুনর্নবীকরণ,—জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল ও জাতীয় সংহতি—বিদেশী নিয়ন্ত্রণ বিধি ও ভারত রক্ষা আইন প্রয়োগ—প্রতিরক্ষা ও পরিকল্পনা—উপসংহার।

সাম্প্রতিক কালের মতো এমন চরম দুঃসময় ভারতের উত্তর-স্বাধীনতা পর্বে আর কখনো আসেনি। সীমান্তে শত্রু, দেশের অভ্যন্তরে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ ও মজুতদারী, মুনাফাবাজি, চোরাকারবার ইত্যাদি নানা সমাজ-বিরোধী শক্তি আজ মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে এবং বিপর্যস্ত করে তুলছে ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নিরাপত্তাকে। তার ওপর সাম্প্রদায়িকতার বিষফোড়া ভারতকে বারে-বারে এক চরম অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সর্বোপরি, মাথার ওপরে খড়্গের মতো ঝুলছে অনির্দিষ্টকালের জন্যে জাতীয় সংকট। এই জাতীয় সংকটের কালো ছায়া বিস্তৃত হয়েছে জাতীয় জীবনে সর্বক্ষেত্রে। তার সার্বিক প্রতিক্রিয়ায় গণ-জীবনে নেমে এসেছে দুঃসহ দুঃখের অমারাত্রি। বলা বাহুল্য, শান্তিকালীন অর্থনীতি যখন সমরকালীন অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয় এবং জাতির ভাগ্যাকাশে যখন জাতীয় সংকটের ছায়া নেমে আসে, তখন সমাজ-জীবন ও ব্যক্তি-জীবন তার স্বাভাবিক বিকাশের পথ হারিয়ে নানা সাময়িক আইনের বেড়ীতে আষ্টেপৃষ্ঠে-বাঁধা সংকীর্ণ গোষ্পদে পরিণত হয়। তেমনি সাম্প্রতিক জাতীয় সংকটের চাপে ভারতের গণ-জীবন আজ ক্লান্ত, ক্লিষ্ট এবং রুদ্ধশ্বাস।

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় সংকট ঘোষণা

ভারতের এই জাতীয় সংকটের প্রেক্ষাপটে রয়েছে ভারত-চীন সীমান্ত সংকট এবং ভারতের প্রতিরক্ষার সার্বিক প্রস্তুতি-প্রয়াস। ১৯৬২ সালে ভারত-চীন সীমান্ত বিবাদ চরমে পৌছায়। ৮ই সেপ্টেম্বর চীনা সশস্ত্র-বাহিনী কামেং সীমান্ত বিভাগে অনুপ্রবেশ করে এবং ২০শে অক্টোবর নেফা এবং লাডাকে সুরু করে ব্যাপক অভিযান। ভারতীয় বাহিনী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ২১শে নভেম্বর চীনারা যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করে এবং কতকগুলি অঞ্চল থেকে সৈন্যাপসারণ করে। সেই সব অঞ্চলে ভারতীয় অসামরিক শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছে। চৈনিক আক্রমণের পটভূমিকায় ১৯৬২ সালের ২৬শে অক্টোবর রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংকট ঘোষণা করে উদ্ভূত পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্যে

সরকারের হাতে তুলে দেন জরুরীকালীন ক্ষমতা। তারপর ৩রা নভেম্বর জরুরী অবস্থায় দেশে রাষ্ট্রদ্রোহী এবং সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্যে ভারতের প্রতিরক্ষা (সংশোধিত) অর্ডিন্যান্স বিঘোষিত হলো। পরে অবশ্য উভয় অর্ডিন্যান্সের স্থলে ভারতরক্ষা আইন, ১৯৬২ প্রবর্তিত হয়েছে। ভারতরক্ষা আইন বলে কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের মৌলিক অধিকারগুলিকে খর্ব করার উপযোগী আইন প্রণয়ন করতে পারেন এবং সেই সব ব্যাপারকে আইন-আদালতের এক্তিয়ারের বহির্ভূত রাখতেও পারেন। রাজ্যসরকারের হাতেও তুলে দেওয়া হয়েছে অনুরূপ আইন রচনার ক্ষমতা।

এদিকে চীন-ভারত সীমান্ত-সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক সমাধানের জন্যে ছয়টি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র কলম্বো সম্মেলনে মিলিত হন। ভারত কলম্বো প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু চীন অস্বীকৃত হওয়ায় ভারত জানিয়ে দিয়েছে যে, চীন কলম্বো প্রস্তাব পুরোপুরি মেনে না নিলে সে তার সঙ্গে কোনরকম আপস-আলোচনায় বসতে রাজী নয়। সীমান্ত-বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। দেশে সমরোপকরণ প্রস্তুত করার এবং বিদেশ থেকে সমরোপকরণ ক্রয় ও বিশেষ সাহায্য লাভের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আমূল সংস্কার সাধন করা হয়েছে সামরিক শিক্ষা-ব্যবস্থার এবং জাতীয় সমর-শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ১৯৬৩ সালের ১৪ই আগস্ট থেকে। এইভাবে দেশময় স্বদেশপ্রেমের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন জাতীয় সরকার। দেশের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার পুনর্নবীকরণের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হলো জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল। জনসাধারণ তাতে মুক্তহস্তে দান করেছে অর্থ এবং স্বর্ণালঙ্কার। ১৯৬৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এই তহবিলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৯ কোটি টাকা এবং ২৩ লক্ষ গ্রাম সোনা। বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে জনগণের ঐক্য-চেতনার উদ্বোধনে জাতীয় সংহতি কমিটি সানন্দে ঘোষণা করলেন—'The Chinese aggression has proved that we are a nation : let us strive to remain a nation and forget the obsolete claims of communities and castes.' তাছাড়া সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে বে-সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও সুদৃঢ় করে তোলা হয়েছে।

কলম্বো সম্মেলন, প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার পুনর্নবীকরণ, জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল ও জাতীয় সংহতি

১৯৬২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত জাতীয় সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে ঘটে গেছে একাদিক্রমে বহু ঘটনার প্রবাহ। প্রকৃতপক্ষে চৈনিক আক্রমণের ফলে স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের পট পরিবর্তিত হয়ে গেছে। বিদেশী নিয়ন্ত্রন বিধিবলে সরকার সংবিধানের

২১ এবং ২২ নং ধারায় স্বীকৃত বিদেশীদের আইনের আশ্রয় গ্রহণের ক্ষমতা বাতিল করে দেন। প্রায় দু'হাজার চীনাকে গ্রেপ্তার করে তাদের মধ্যে ১,৬৫৪ জনকে তাদের স্বদেশে প্রেরণ করা হয় এবং অবশিষ্টদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করা হয়। আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ এবং পাঞ্জাব—এই সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে বিদেশীদের প্রবেশ ও বসবাস নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সেই সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক অব চায়নার লাইসেন্স বাতিল করে দিয়েছে। তাছাড়া ভারতের একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সদস্যদের কারারুদ্ধ করা হয়েছে দেশের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে।

বিদেশী নিয়ন্ত্রণ বিধি ও ভারত রক্ষা আইন প্রয়োগ

আধুনিক যুদ্ধ শিল্প-প্রগতিতে সঞ্চারিত করে এক অভূতপূর্ব গতির উচ্ছ্বাস। শান্তিব্রতী রাষ্ট্র হিসেবে, সমস্যা-জর্জর রাষ্ট্র হিসেবে ভারত তার সম্পদকে প্রতিরক্ষা ও পরিকল্পনা—এই দুই ধারায় প্রবাহিত করে দিয়েছে। আধুনিক কালের যুদ্ধ হলো সামগ্রিক জাতীয় প্রয়াসের সঙ্গে যুদ্ধ। কাজেই ভারত যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, তার মোকাবিলা হবে রণাঙ্গনে, শিল্পাঙ্গনে এবং খামারে-খামারে। সকল শক্তি দিয়ে আমাদের আজ তাই শিল্পাঙ্গনে গতির সঞ্চার করতে হবে ; সেই সঙ্গে আমাদের সকল পণ্যের উপভোগ হ্রাস করতে হবে। একদিকে উৎপাদন-বৃদ্ধি, অন্যদিকে ভোগ-সংযম। তাহলে আমাদের প্রতিরক্ষা-প্রয়াস দ্বিগুণিত হবে। সমর, শিল্প ও কৃষি—এই তিন সীমান্তে যুদ্ধ-সজ্জার জন্যে আমাদের প্রভূত পুঁজির প্রয়োজন। কেবলমাত্র প্রতিরক্ষা খাতেই ১৯৬২ ৬৩ সালে ৩৭৬ কোটি টাকা ও তৎসহ অতিরিক্ত ৯৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ১৯৬৩-৬৪ সালের সংশোধিত বাজেটে ৮০৮ কোটি টাকা এবং ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেটে ৮৫৪ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছিল। কাজেই ভারতের যুদ্ধ-সজ্জার জন্যে যে বিপুল পরিমাণ পুঁজির প্রয়োজন, তার জন্যে দেশবাসীকে ত্যাগ স্বীকারে এগিয়ে আসতে হয়েছে। ভারতের সমর-সজ্জাকে শক্তিশালী করে তুলতে দেশবাসীকে প্রতিরক্ষা তহবিলে মুক্তহস্তে অর্থ ও স্বর্ণ দান করতে হয়েছে, প্রতিরক্ষা বণ্ড, প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট ও কাঞ্চন-পত্র ক্রয় করতে হয়েছে। ১৯৬৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ভারতের প্রতিরক্ষা তহবিলে পাওয়া গেছে ৫৯ কোটি টাকা এবং ২৩ লক্ষ গ্রাম সোনা। কাঞ্চন-পত্র পরিকল্পনায় ১৯৬৪ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত চাঁদা হিসাবে পাওয়া গেছে ১৬৩.২ লক্ষ গ্রাম সোনা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কও সব ব্যাঙ্ককে সোনার বিনিময়ে অগ্রিম দেবার আদেশ দিয়েছে। ভারতরক্ষা আইনে ১৯৬৩ সালের ১০ই জানুয়ারী স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা চালু করা হয়। স্বর্ণের চাহিদা ও মূল্য-হ্রাস এবং স্বর্ণের চোরাই কারবার বন্ধ করার জন্যে এই পরিকল্পনা রচিত হলেও বহু স্বর্ণ-শিল্পীর আত্মহত্যায় এই পরিকল্পনা এবং তার রচয়িতা সরকার

প্রতিরক্ষা ও পরিকল্পনা

জন-সমর্থন হারায়। এবং সরকারকে জীবিকাচ্যুত স্বর্ণ-শিল্পীদের পুনর্বাসনের জন্যে সাড়ে তিন কোটি টাকা ব্যয় করে মুখ-রক্ষা করতে হয়। ওদিকে প্রতিরক্ষা বণ্ড ও প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট বিক্রয় করে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে। তাছাড়া সরকার শিল্প ও বাণিজ্যের গতিকে অব্যাহত রাখবার জন্যে চালু করেছেন সংকটকালীন ঝুঁকি বীমা। শিল্প-জগতে উৎপাদন-ধারাকে অবাধ রাখবার জন্যে শিল্পীয় শান্তি সংকল্প (Industrial Truce Resolution) ঘোষিত হয় ১৯৬২ সালের ৩রা নভেম্বর। সরকার, মালিক ও শ্রমিক—এই ত্রি-পাক্ষিক সম্মেলনে গৃহীত হয়েছিল এই সংকল্প। বহুক্ষেত্রে শ্রমিকেরা বিনা পারিশ্রমিকে অধিক-কাল কর্ম (overtime work) করেছে এবং উদার হস্তে প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করে স্বদেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

জাতীয় সংকট অন্যান্য ক্ষেত্রে সফল হলেও মুদ্রাস্ফীতি, পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, মজুতদারী ও চোরাকারবার ইত্যাদি দমনে ব্যর্থ হয়েছে। বরং যুদ্ধকালীন অর্থনীতির সুড়ঙ্গপথে জাতীয় সংকটের ছত্রচ্ছায়ায় এগুলি অতিরিক্ত মাত্রায় স্ফীতকায় হয়ে উঠেছে। ভারতরক্ষা আইন সেই সব রাষ্ট্রদ্রোহী ও সমাজদ্রোহীদের কয়জনের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হতে পেরেছে? আসল কথা, দেশরক্ষার ডাকে জনসাধারণ যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করবার জন্যে এগিয়ে এসেছে; ত্যাগ স্বীকার তারা করেছে এবং সব চেয়ে বড়ো কথা, তারা মুখ বুজে সংকটকালীন সকল প্রকার দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করে চলেছে। জরুরী অবস্থার শানিত খড়্গ নির্মমভাবে পড়েছে তাদের ঘাড়েই। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে

উপসংহার

তারা রক্তের অক্ষরে প্রাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সারি সারি দাঁড়িয়ে ব্লাড্ ব্যাঙ্কে রক্তদান করেছে, মেয়েরা তুলে দিয়েছে গায়ের গয়না, পুরুষেরা দিয়েছে তাদের কষ্টার্জিত সঞ্চয়, আর দুধের শিশুরা টিফিন না খেয়ে পয়সা বাঁচিয়ে দান করেছে প্রতিরক্ষা তহবিলে। আর তখনই ধূর্ত ব্যবসায়ীরা দু'হাত ভ'রে কুড়িয়েছে টাকা—রাশি রাশি কালো টাকা। যে সুযোগ তারা এতদিন খুঁজছিল, জাতীয় সংকটের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তারা তা পেয়ে গেছে। কালো টাকার আত্মপ্রকাশের জন্যে সরকারী ঘোষণা কতটুকু সফল হয়েছে? আয়কর মুক্ত করে কালো টাকার একটা বিশেষ অংশ সরকার দাবী করেছেন। জন-নিগ্রহ থেকে প্রাপ্ত অর্থ যে ভাবেই বখরা হোক, তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তবু অবগুণ্ঠিতা কৃষ্ণমুদ্রা অবগুণ্ঠন উন্মোচন করবে না। জাতীয় সংকটকালেই রাশি রাশি কালো টাকা বালিগঞ্জে, টালিগঞ্জে কিংবা বড় বাজারের মশলা বস্তায় পাওয়া যাবে। কিন্তু এত কালো টাকা এল কোত্থেকে? এই অমারাত্রির অন্ধকারে সমাজ-বিরোধী শত্রুরা অতি-মুনাফার লালসায় মানুষের মুখের গ্রাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে।

ক্ষুধার্তের খাদ্যে, মুমূর্ষুর ঔষধে এবং শিশুর দুগ্ধে ভেজাল মিশিয়ে তারা দুহাতে কুড়োচ্ছে মুঠো মুঠো কালো টাকা। মজুতদারী ও চোরাকারবার পণ্যমূল্যরেখাকে নিয়ে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের ক্রয়শক্তির নাগালের বাইরে। এ দুর্দশার হাত থেকে কি জনগণের মুক্তি নেই? যুদ্ধ মানব-ভাগ্যে কখনো আশীর্বাদ বহন করে আনে না। চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধও ভারত-ভাগ্যে অভিসম্পাতই বহন করে এনেছে। তাই ভারতের জনগণও আজ মনে-প্রাণে প্রার্থনা করছে, কবে এই দুঃখ-রজনীর অবসান হবে? শান্তির সূর্যালোকে কবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে বুদ্ধ-গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের ভারত-ভূমি? এই রাত্রির তপস্যার মধ্য দিয়ে কবে আমাদের দুয়ারে এসে দাঁড়াবে শান্তির সমুজ্জ্বল প্রভাত…

'নূতন উষার সিংহদ্বার
খুলিতে বিলম্ব কতো আর?'

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- ভারতের সীমান্ত সংকট
- স্বদেশ প্রেম ও চোরাকারবার
- ভারতের বাণিজ্য ও জাতীয় সংকট

বাণিজ্য বিচিন্তা

বাণিজ্যিক পত্র-বিনিময়

"আজ শুধু একলা চাষীর চাষ করিবার দিন নাই, আজ তাহার সঙ্গে বিদ্বানকে, বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে। আজ শুধু চাষীর লাঙলের ফলার সঙ্গে আমাদের দেশের মাটির সংযোগ যথেষ্ট নয়—সমস্ত দেশের বুদ্ধির সঙ্গে, বিদ্যার সঙ্গে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে, তাহার সংযোগ হওয়া চাই।"

—রবীন্দ্রনাথ

Commercial Correspondence 20 marks

one letter to be drafted on one of the following subjects :—

1. Application for a situation ;
2. Recommendation and credit ;
3. Status enquiries ;
4. Circular letters ;
5. Offers, Quotations and Orders ;
6. Confirmation, Execution, Refusal, Cancellation and Collection of Orders ;
7. Collection, Claims, Complaints and Adjustments ;
8. Agency ;
9. Banking and Insurance ; Export and Import ;
10. Publicity and Public Relations ;
11. Company Secretary.

বাণিজ্য বিচিন্তা

প্রস্তাবনা

> "বর্তমান কালে অন্যান্য বিষয়ের মতো বাংলার বাণিজ্যও পুনর্বিন্যাসের পথে। কাজেই বাংলা ভাষায় বাণিজ্যিক পত্র-রচনার গুরুত্ব ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি পাবে।"
>
> —বাণিজ্য বিচিন্তা

বাণিজ্য ব্যাপারে পত্র-বিনিময়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্য পারস্পরিক লেনদেনের ওপর নির্ভরশীল। এবং বাণিজ্যকে সাহায্য করবার জন্যে এসেছে বাণিজ্যিক পত্র। প্রাচীন কালের বাণিজ্যের প্রকৃতি ছিল সহজ ও সরল। প্রত্যক্ষ বিনিময়ের মধ্যে তা ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু বর্তমান কালের বাণিজ্য ক্রমাগত জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে। বাণিজ্যের সেই জটিলতাকে আংশিকভাবে সহজসাধ্য করে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে বাণিজ্যিক পত্র। বাণিজ্যিক পত্র তাই বর্তমান বাণিজ্যের পক্ষে একান্ত ভাবে অপরিহার্য। বরং প্রত্যক্ষ বিনিময়ে যে সুবিধা ছিল না, বর্তমান বাণিজ্যে চিঠিপত্রের মাধ্যমে তা সম্ভব হয়েছে। অতীতে প্রত্যক্ষ বিনিময়ের ক্ষেত্রে অনায়াসে চুক্তিভঙ্গ হতে পারতো; কিন্তু বর্তমানে চিঠিপত্র অনেকাংশ চুক্তি-পত্রের কাজ করে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্যের দলিলরূপে বাণিজ্যিক পত্রের মূল্য অপরিসীম।

বাণিজ্যিক পত্র-রচনার উদ্দেশ্য বাণিজ্যিক কার্য-সিদ্ধি। কাজেই বাণিজ্যিক পত্রের রচনা-রীতি তদনুরূপ হওয়া উচিত। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে বক্তব্যটিকে কোনরূপে অন্যের জ্ঞানগোচর করতে পারাটাই বড়ো কথা নয়, পত্র-প্রাপকের মনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারা চাই। কাজেই টেলিগ্রাফিক ভাষায় বাণিজ্যিক পত্র রচিত হওয়া উচিত নয়। তাতে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য-সিদ্ধি সম্ভব নাও হতে পারে। অন্যদিকে, অতি-অলঙ্কারবহুল ভাষায়ও পত্র-রচনা সমীচীন নয়। অর্থাৎ মশা মারবার জন্যে কামান দাগার প্রয়োজন নেই।

বর্তমান কালের বাণিজ্যের আছে দুটি ব্যবহারিক দিক: এক, তার ঘরোয়া রূপ; দুই, তার আন্তর্জাতিক রূপ। আবহমান কাল ধরে বাংলাদেশে যে ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারা বহমান এবং যে জমিদারী, দালালী বা মহাজনী কারবার চলে

আসছে, তাইই আমাদের বাণিজ্যের ঘরোয়া রূপ। আবার আধুনিক কালে বাংলার বাণিজ্য কেবল যে বাংলাদেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে গেছে, তাই নয়; ভারতের গণ্ডী ছাড়িয়ে জগৎময় প্রসারিত হয়ে গেছে। ইদানীং সেই বাণিজ্য ক্রমসম্প্রসারণশীল।

বাণিজ্যিক পত্রেরও আছে তেমনি পৃথক দুটি রূপ : তার ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক রূপ। এতদিন জমিদারী সেরেস্তার কাজ ঘরোয়া রূপেই চলে এসেছে। দালালী ও মহাজনী কারবার এখনও এই রূপেই চলে। দোকানের আদায়-বাকি, বেচা-কেনা ইত্যাদি এই রূপেই তো চলে আসছে। শুধু তাই নয়, দলিল-দস্তাবেজ, সম্পদ ক্রয়বিক্রয় এই রূপেই সম্পাদিত হয়। আংশিক সংস্কৃত, আংশিক ফারসী, আংশিক বাংলা– এই তিন-মিশেলি ভাষার সমাহারে বাংলার বাণিজ্যিক চিঠিপত্রের ঘরোয়া রূপ গড়ে উঠেছিল। সেই ভাষায় এবং সেই রূপাঙ্গিকে চিঠিপত্র লিখিত হয়েছে ব্রিটিশ আমলেও। এখন অবশ্য তার ক্ষীণধারা বিশুষ্ক-প্রায়। তবু গ্রামাঞ্চলে এবং শহরের সোনারূপা ও মুদির দোকানগুলিতেও 'সেই tradition সমানে চলেছে।' এক দলের মতে, সেই রীতি ও রূপাঙ্গিকই বাংলা ভাষার বাণিজ্যিক পত্রের আদি ও অকৃত্রিম রূপ এবং বর্তমান কালে তাই অনুসৃত হওয়া উচিত। অপর পক্ষের মতে, বাংলার বাণিজ্যের পরিধি আজ সুদূর-প্রসারিত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক পত্রের পাশ্চাত্য রীতিই স্বীকৃতি লাভ করেছে। কাজেই বর্তমানে পাশ্চাত্য রীতিই অনুসৃত হওয়া উচিত।

এই দুই অভিমতের মধ্যে প্রথমটি অনাধুনিক, কাজেই তা আধুনিকতা এবং বাণিজ্যিক ব্যাপ্তির বিচারে পরিত্যাজ্য। অন্যদিকে, পাশ্চাত্য রীতি আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত; কাজেই তা অনুসরণযোগ্য। কিন্তু যে কোন বিষয়ে গোঁড়ামি নিন্দনীয় এবং তা প্রগতি-বিরোধী। বিশেষতঃ যখন বাংলার বাণিজ্য অগ্রগতির পথে পদচারণা সুরু করেছে, তখন তো পত্র-রচনায়ও প্রগতিশীলতার স্বাক্ষর বাঞ্ছনীয়। প্রাচীন রীতির গোঁড়ামি, যেমন গোঁড়ামি, আধুনিক রীতির প্রতি আত্যন্তিক গোঁড়ামিও গোঁড়ামি। অতএব উভয় রীতির সমাহারে একটা যুগোপযোগী রীতি সৃষ্টি করা যেতে পারে। অতি প্রাচীন বা অতি আধুনিক—এই উভয় রীতির মধ্যপন্থাই সর্বোৎকৃষ্ট। এবং তাই অনুসরণযোগ্য।

পরিশেষে একটি কথা। প্রশ্ন উঠতে পারে, বাংলা ভাষায় বাণিজ্যিক পত্র-রচনায় সুযোগ-সুবিধা কতখানি? প্রথমতঃ, বঙ্গ সমাজের ওপরের তলায় ইংরেজিতে বাণিজ্যিক পত্র রচিত হলেও নিচের তলায় অসংখ্য বাণিজ্যিক পত্রাদি বাংলা ভাষায় রচিত হয়ে থাকে। বর্তমান কালের অন্যান্য বিষয়ের মতো বাংলার বাণিজ্যও পুনর্বিন্যাসের পথে। কাজেই বাংলা ভাষায় বাণিজ্যিক পত্র-রচনার গুরুত্ব ভবিষ্যতে

আরো বৃদ্ধি পাবে। দ্বিতীয়তঃ, গত রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার (পূর্ব পাকিস্তান তো আগেই করেছে) বাংলা ভাষাকে রাজ্য ভাষার সম্মানে অভিষিক্ত করেছেন। অর্থাৎ এবার থেকে রাজ্য সরকারের যাবতীয় কাজকর্ম বাংলা ভাষায় পরিচালিত হবে। এবং তা সুরুও হয়ে গেছে। তৃতীয়তঃ, রাজ্য সরকারের কাজকর্ম বাংলা ভাষায় অনুষ্ঠিত হওয়ার অর্থ রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যও এবার থেকে বাংলা ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত হবে। চতুর্থতঃ, অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানও বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাণিজ্য ব্যাপারে বাংলা ভাষায় পত্র-বিনিময় করতে বাধ্য হবে। এবং সেখানে বাঙ্গালীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। কাজেই বাংলা ভাষায় পত্র-রচনার গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন বর্তমান কালে অবাস্তর।

● বাণিজ্যিক পত্রের কাঠামো

বাণিজ্যিক চিঠিপত্রের কাঠামোটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কাঠামোটি সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ পরীক্ষায় কাঠামোর নির্ভুলতার জন্যে কিছু নম্বর বন্টিত থাকে। শুদ্ধরূপে তা লিখতে পারলে পুরো নম্বরটিই পাওয়া যায়। শুদ্ধরূপে অনুশীলন করলে কাঠামো ব্যাপারে অশুদ্ধির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কাঠামোটিকে পারম্পর্য-অনুসারে কয়েকটি অংশে ভাগ করা যায়। যেমন :

এক. শিরোনামা (Letter head) ;

দুই. অন্তর্বর্তী ঠিকানা (Inner address) ;

তিন. অভিবাদন (Address) ;

চার. বিষয়বস্তু (Matter বা body of the letter) ;

পাঁচ. বিদায়-সম্ভাষণ ;

ছয়. স্বাক্ষর (Signature) ;

সাত. ক্রোড়পত্র (Enclosure) ।

বাণিজ্যিক পত্রে শিরোনামার গুরুত্ব অপরিসীম। এই অংশে পত্র-লেখকের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম, বিশেষ পরিচয়, ঠিকানা, তারিখ, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, কোড নং, লাইসেন্স নং, আমদানি লাইসেন্স নং (আমদানির ব্যাপারে), রপ্তানি লাইসেন্স নং (রপ্তানির ব্যাপারে) সূচক-সংখ্যা ও বিষয়—এই কয়টি প্রসঙ্গের উল্লেখ

একান্তভাবে আবশ্যিক। শিরোনামাই পত্র-লেখকের সামগ্রিক পরিচয় বহন করে। তাই শিরোনামার প্রসঙ্গগুলি যথা-নির্দিষ্ট স্থানে এবং যথাযথ ভাবে লিখিত হওয়া উচিত। চিঠির কাগজের শিরোদেশের ঠিক মধ্যস্থলে পত্র-লেখকের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম এবং তার ঠিক নীচেই তার ব্যবসায়িক বিশেষ পরিচয় লিখিত থাকবে। তার নীচে ডান প্রান্তে লেখা থাকবে ঠিকানা এবং তার নীচে তারিখ। ঠিকানার সমান উঁচুতে চিঠির কাগজের বাম প্রান্তে পর-পর, নীচে নীচে থাকবে টেলিগ্রাম, টেলিফোন নং, কোড্ নং এবং আবশ্যক-বোধে আমদানি লাইসেন্স নং বা রপ্তানি লাইসেন্স নং। তার নীচে একটু ফাঁক দিয়ে থাকবে সূচক-সংখ্যা এবং তার নীচে ঠিক মধ্যস্থলে—বিষয়। নীচের শিরোনামার আদর্শ নমুনাটি অবশ্যই দ্রষ্টব্য :

শিরোনামা
Letter head

রবীন্দ্র লাইব্রেরী

[প্রখ্যাত পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা]

টেলিগ্রাম : 'বিচিন্তা' — ১৫/২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট

টেলিফোন নং : ৩৪-৮৩৫৬ — কলিকাতা : ১২

কোড্ নং........ — ৮ই আগষ্ট, ১৯৬৫

আমদানি লাইসেন্স নং—
বা
রপ্তানি লাইসেন্স নং } (প্রয়োজন হলে)

সূচক-সংখ্যা... অ/৫২/৬৫

বিষয় : অর্ডার স্বীকৃতি

এই শিরোনামা বা Letter head অংশটি সাধারণতঃ ছাপা 'প্যাডে'র শীর্ষদেশে মুদ্রিত থাকে। কিন্তু পরীক্ষার উত্তরপত্রের পাতায় অবশ্য এই letter head অংশটি রচনা করে নিতে হবে। কিন্তু পত্র-শীর্ষে 'শ্রীশ্রীহরি শরণম্', 'শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়', '৺কালীমাতা সহায়', 'গণেশায় নমঃ' বা 'ওঁ' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছগুলির ব্যবহার অনাবশ্যকবোধে পরিত্যাজ্য। সেই সঙ্গে বাংলায় সাল তারিখের উল্লেখও বর্জনীয়। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্য বর্তমান কালে ইংরেজি সাল-তারিখ অনুসারে পরিচালিত হয়ে থাকে।

শিরোনামার পরবর্তী অংশ হলো অন্তর্বর্তী ঠিকানা (Inner address)। এই অংশটি শিরোনামার নীচে বাম প্রান্তে লিখিত হওয়া উচিত। এই অন্তর্বর্তী ঠিকানার গুরুত্ব প্রচুর। এক, এই অংশে পত্র-প্রাপকের নাম উল্লিখিত হয়। দুই, খামে ঠিকানা লেখার ব্যাপারে কোনরূপ ভুল হওয়ার

অন্তর্বর্তী ঠিকানা

সম্ভাবনা থাকে না। তিন, অনায়াসে window envelope ব্যবহার করা যায়। এবং চার, যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তার নাম ঠিকানার উল্লেখ থাকাও দরকার। অন্তর্বর্তী ঠিকানা লিখতে হবে নীচের মতো :

পিপ্‌ল্‌স্‌ পাবলিশিং হাউস
রাজভুবন, সন্ধুর্স্ট রোড
বোম্বাই—৪

অভিবাদন

তারপর অভিবাদন। বাংলায় অভিবাদনের রীতি আছে অনেক রকম। তার মধ্যে 'সবিনয় নিবেদন' শব্দগুচ্ছের প্রয়োগ সব দিক দিয়েই সমধিক উপযোগী। তবে 'সবিনয় নিবেদন' শব্দগুচ্ছের পর একটি কমা দেওয়া উচিত।

বিষয়বস্তু

অভিবাদনের পর চিঠির বিষয়বস্তু। এই বিষয়বস্তুটিই বাণিজ্যিক পত্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অন্যান্য অংশগুলি এই আসল বিষয়বস্তু প্রকাশকে সাহায্য করবার জন্যে পরিকল্পিত। কাজেই বিষয়বস্তু অংশটি সুলিখিত, সংক্ষিপ্ত ও নিটোল হওয়া প্রয়োজন। তাই বলে নিতান্তই সাদামাঠা ভাষায় বা উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি না করেই মূল বক্তব্যটি প্রকাশ করে ফেলা ঠিক হবে না। তার জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং অত্যন্ত সৌজন্যপূর্ণ ভঙ্গিতে মূল প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হবে। এই অংশে যে ভুলগুলি হয়ে থাকে, তা হলো : বানান ভুল, অপরিচ্ছন্নতা এবং বাক্য ও বক্তব্যসমূহের মধ্যে অসংলগ্নতা। সে বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে। দরকার হলে একাধিক অনুচ্ছেদে বক্তব্য পরিবেশন করা উচিত।

বিদায়-সম্ভাষণ

তারপর বিদায়-সম্ভাষণ। বিদায়-কালে বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন একটি আন্তর্জাতিক শিষ্টাচার। বাণিজ্যিক পত্রেও সেই শিষ্টাচার রক্ষা করা কর্তব্য। বিষয়বস্তুর সমাপ্তি-বাক্যের পর 'ইতি' এবং নীচের ডান দিকের প্রান্ত-সীমায় লিখিত হবে 'বিনীত', 'নিবেদক', 'ভবদীয়', 'আপনাদের বিশ্বস্ত' বা 'বশংবদ'—এই শব্দগুলির যে কোন একটি।

স্বাক্ষর

বিদায়-সম্ভাষণের ঠিক নীচেই স্বাক্ষর। এই অংশে থাকবে স্বাক্ষর এবং প্রতিষ্ঠানের নাম। পত্র-লেখকের পদ-মর্যাদা ও তাঁর প্রতিষ্ঠানের নাম মুদ্রলেখ যন্ত্রের সাহায্যে মুদ্রিত করা হয়। তাতে আভিজাত্য-মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য স্বাক্ষরটি অনেক ক্ষেত্রে শীলমোহর দিয়ে সেরে দেওয়া হয়। কিন্তু তা অনুচিত। কারণ চিঠিপত্র আইনের দিক দিয়ে

সাক্ষ্য-প্রমাণসহ দলিলের মতো। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লেনদেন, চুক্তি বা আলোচনা চিঠি-পত্রের বৈধতার ওপরে সাধিত হয়ে থাকে। কাজেই শীলমোহর নয়, পূরা নাম নিজের হাতে স্বাক্ষর করা উচিত। স্বাক্ষরবিহীন পত্র অর্থহীন।

চিঠির গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্যে অনেক সময় চিঠির সঙ্গে প্রয়োজনীয় প্রশংসাপত্র, সুপারিশপত্র বা গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদির অনুলিপি (true copy) প্রেরণ করা হয়। কিন্তু চিঠির নীচে ঠিক বাম প্রান্তে তার উল্লেখ থাকা উচিত। ক্রোড়পত্র কতখানা প্রেরিত হচ্ছে, তার সংখ্যাও উল্লিখিত হওয়া প্রয়োজন। ধরা যাক্, তিনখানা ক্রোড়পত্র আছে। সে ক্ষেত্রে এই ভাবে লিখতে হবে : 'ক্রোড়পত্র — ৩'।

বাণিজ্যিক পত্রের বৈশিষ্ট্য

বাণিজ্যিক চিঠিপত্র ব্যক্তিগত চিঠিপত্র থেকে পৃথক ধরনের। রূপগত দিক থেকে তো বটেই; গুণগত দিক থেকেও বাণিজ্যিক চিঠিপত্র পৃথক। সেই পার্থক্য বাণিজ্যিক চিঠিপত্রের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে স্পষ্ট।

বাণিজ্যিক পত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, তার সংক্ষিপ্ততা। বর্তমান ব্যস্ততার যুগে, বিশেষতঃ বাণিজ্যিক ব্যস্ততায় বাণিজ্যিক পত্রের সংক্ষিপ্ততা একান্তভাবে কাম্য। বেশি কথা লিখতে হলে, অনেক অপ্রয়োজনীয় কথা লিখতে হয়। সেই অপ্রয়োজনীয়

সংক্ষিপ্ততা

- কথার মধ্যে বাণিজ্যের বহু গোপনীয় তথ্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে।
- অথবা তার মধ্যে আইনের নানা ফাঁক-ফোকর থেকে যেতে পারে।

এই অপ্রয়োজনীয় কথা লেখার জন্যে ভবিষ্যতে নানা বিপদের সম্ভাবনা থাকে। পরীক্ষার্থীর পক্ষে যে বিপদ সব চেয়ে বেশি মারাত্মক সেই বানান-ভুল ও আনুষঙ্গিক ভুল পত্রের অতিদীর্ঘতার জন্যে ঘটতে পারে। বাণিজ্যিক পত্র ঠিক কত বড় হবে, তা নির্ভর করে পত্রের বিষয়ের ওপর। পত্রের প্রয়োজনীয় সব কথার জন্যে পত্রের কলেবর যত বড করা দরকার, ঠিক তত বড়ই হবে বাণিজ্যিক পত্র। তবে পরীক্ষার উত্তর-পত্রের এক পৃষ্ঠার মধ্যে পত্রের কলেবর সীমাবদ্ধ রাখতে পারলে ভালো হয়।

বাণিজ্যিক চিঠিপত্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, তার ভাষার স্পষ্টতা। যে সকল বাক্যের অর্থ একাধিক বা অস্পষ্ট, তা বর্জনীয়। কারণ সেক্ষেত্রে পত্রলেখক লিখলেন এক অর্থে, পত্র-প্রাপক বুঝলেন অন্য—তাতে ভুল বোঝাবুঝির প্রচুর অবকাশ থেকে

যায়। ফলে যে উদ্দেশ্যে পত্র রচিত হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। বাণিজ্যিক পত্রের মধ্যে এমন কোন বাক্য বা শব্দ প্রয়োগ সমীচীন হবে না, যা বাণিজ্যের স্বার্থ-বিরোধী কিংবা যা পত্র-প্রাপকের মনে কোনরূপ সংশয় জাগিয়ে তুলতে পারে।

ভাষার স্পষ্টতা

বাণিজ্যিক পত্রের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, ভাষার সারল্য। সহজ ভঙ্গিই শ্রেষ্ঠ ভঙ্গি। কাব্যিক বর্ণনা বা ভাষার ফুলঝুরি জ্বালবার স্থান বণিজ্যিক পত্র নয়। একেবারে সাদামাঠা ভাষায়ও বাণিজ্যিক পত্র রচিত হওয়া ঠিক নয়। অর্থযুক্ত উপযুক্ত শব্দ-বিন্যাসের দ্বারা একটা সহজ, সাবলীল ঋজু পত্র-লিখন ভঙ্গি গড়ে তোলা যায়। অবশ্য তার জন্যে অধ্যবসায় দরকার। অধ্যবসায়ের দ্বারা উৎকৃষ্ট বাণিজ্যিক পত্র লিখনের একটা নিজস্ব ভঙ্গি আয়ত্ত করা যায়।

ভাষার সারল্য

বাণিজ্যিক পত্রের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো, বাক্য-বিন্যাস। কেবল শব্দ-যোজনা বা বাক্য-যোজনার দ্বারা উৎকৃষ্ট বাণিজ্যিক পত্র লেখা যায় না। বাক্যগুলির পারম্পর্য রক্ষিত হওয়া উচিত। শিথিল-বন্ধ বাক্য-বিন্যাস বক্তব্যকে দুর্বল করে তোলে। অনেক সময় বক্তব্যকে সংক্ষেপে লিখতে গিয়ে কতকগুলি অসংলগ্ন বাক্যের সমাবেশ ঘটানো হয়। তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ হয় বেশি। কাজেই বক্তব্যটিকে মনে মনে আগে পারম্পর্য-ক্রমে সাজিয়ে নেওয়া ভালো। তারপর সুপরিকল্পিত-ভাবে যুক্তি-সহকারে বাক্য-বিন্যাসের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট বাণিজ্যিক পত্র রচনা করা যায়।

বাক্যের সংলগ্নতা

বাণিজ্যিক পত্রের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হলো, সৌজন্যবোধ। বাণিজ্যিক পত্র ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে লিখিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। আবার ব্যবসা-বাণিজ্যে দেনা-পাওনার দিকটা বড়ো বেশি প্রকট। কাজেই সৌজন্যবোধ দিয়ে সেই অতি-প্রকট দিকটা আবৃত করে বাণিজ্যিক পত্র রচনা করতে হয়। তাছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে সব চেয়ে বড়ো কথা হলো পারস্পরিক সদিচ্ছা। তাই-ই ব্যবসায়ীর সবচেয়ে বড়ো মূলধন। বাণিজ্যিক পত্রের মাধ্যমে যদি সেই পারস্পরিক সদিচ্ছা হারাতে হয়, তবে ব্যবসায়ীর যে ক্ষতি হয়, তা অপূরণীয়। সৌজন্যহীন পত্রালাপ পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। কাজেই মার্জিত সৌজন্যবোধ উৎকৃষ্ট বাণিজ্যিক পত্রের একটি বিশেষ লক্ষণ।

সৌজন্যবোধ

বাণিজ্যিক পত্রের সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তার পরিচ্ছন্নতা। পরিচ্ছন্নতা প্রতিষ্ঠানের সুনাম বহন করে এবং পত্রলেখকের চারিত্রিক পরিচ্ছন্নতার স্বাক্ষর রাখে। মুদ্রলেখ যন্ত্রে লিখিত হলে অপরিচ্ছন্নতার আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু হস্তলিখিত বাণিজ্যিক পত্রে এই আশঙ্কা পুরাপুরিই থাকে। পরীক্ষার

পরিচ্ছন্নতা

উত্তরপত্রে এ বিষয়ে অবশ্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কারণ পরিচ্ছন্নতা সর্বাগ্রে পুরস্কৃত হয়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখি। ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রে নির্দেশিত পত্রগুলি কিন্তু বাণিজ্যিক পত্র নয়। সেগুলি প্রবন্ধধর্মী পত্র। কিন্তু ১৯৫৭ সাল থেকে যথার্থ বাণিজ্যিক পত্রই সন্নিবেশিত হয়ে আসছে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে এই ধারার কোনরূপ পরিবর্তন হবে না। তাই বাণিজ্যিক পত্রের পাঠ-সূচী অনুযায়ী যথার্থ বাণিজ্যিক পত্রেরই (প্রবন্ধধর্মী পত্রের নয়) আদর্শ, প্রশ্ন ও বৈশিষ্ট্যাদি পরিবেশিত হলো। বাণিজ্যিক পত্রের ভাষা সাধু হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সেই জন্যে বাণিজ্য বিচিন্তায় বাণিজ্যিক পত্রাদর্শ সাধু ভাষায়ই রচিত হলো।

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৬৫ সালের প্রশ্নপত্রে প্রদত্ত কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ সহযোগে একটি পত্র রচনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি যেমনি অভিনব, তেমনি জ্ঞান-বিচারের উৎকৃষ্ট মাধ্যমও বটে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষেও তা অনুশীলন যোগ্য।

চাকরির আবেদন পত্র

ক বি. '৬৪, ব. বি. '৬১, '৬৪

Application for a Situation

প্রথম পর্যায়

চাকরির আবেদন পত্র রচনা বড়ো সহজ কাজ নয়। কারণ আবেদন-পত্রের কাঠামো, বক্তব্যের পারম্পর্য ও পরিচ্ছন্নতা এবং ভাষাশুদ্ধির ওপর আবেদনকারীর চরিত্র প্রতিফলিত হয়। চাকরির আবেদন পত্রের কাঠামো অন্যান্য বাণিজ্যিক পত্রের কাঠামো থেকে পৃথক। সেই কাঠামোটি অতি অবশ্য আয়ত্ত করতে হবে। কাঠামোর বিষয়গুলি পারম্পর্যক্রমে প্রদত্ত হলো :

এক. আবেদন পত্রের শীর্ষের ডান দিকের কোণে প্রথমে আবেদনকারীর ঠিকানা ও পরে তারিখ দিতে হয়।

দুই. তার নীচে বাম প্রান্তে লিখতে হবে অন্তর্বর্তী ঠিকানা অর্থাৎ বিজ্ঞাপন-দাতার নাম-ঠিকানা। বিজ্ঞাপনে নামের উল্লেখ না থাকলে এবং বক্স্ নং থাকলে 'বিজ্ঞাপনদাতা, বক্স্ নং' এইভাবে লিখতে হয়।

তিন. অভিবাদন। যেমন : 'সবিনয় নিবেদন',।

চার. আবেদন সূত্র। যেমন : "গত ১৯শে জুন তারিখের 'রবিবাসরীয় যুগান্তর' পত্রিকার বিজ্ঞাপন হইতে জানিতে পারিলাম যে," ইত্যাদি। আবার 'বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিলাম যে,' ইত্যাদিও হতে পারে।

পাঁচ. শিক্ষাগত যোগ্যতাবলী।

ছয়. বিশেষ যোগ্যতা।

সাত. অভিজ্ঞতা।

আট. কর্ম-বিনিময় কেন্দ্রের নিবন্ধকরণ সংখ্যা। এই অংশটি বেকার ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

নয়. বর্তমান বয়স ও স্বাস্থ্য।

দশ. অন্যত্র কর্মানুসন্ধানের কারণ। এই অংশটি কেবল মাত্র বর্তমানে কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে প্রযোজ্য।

এগারো. প্রত্যাশিত ন্যূনতম বেতন।

বারো. প্রশংসাপত্রাদি।

তেরো. সাক্ষাৎকার প্রার্থনা।

চৌদ্দ. উপসংহার।

পনের. স্বাক্ষর।

ষোলো. ক্রোড়পত্র।

উল্লিখিত বিষয়গুলি পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদে ক্রমানুযায়ী সাজাতে হবে। আবেদন পত্রের দুটি আদর্শ প্রদত্ত হলো : একটি, গতানুগতিক আদর্শ, অন্যটি আধুনিক রীতিসম্মত আদর্শ। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি কথা স্মরণীয়। বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনদাতার নামের উল্লেখ থাকতে পারে অথবা নাও থাকতে পারে। কাজেই বিজ্ঞাপনদাতার নাম অথবা বক্স্ নং—যেমন থাকবে, সেই মতো অন্তর্বর্তী ঠিকানা লিখতে হবে।

১. প্রশ্ন। কোনও ব্যাঙ্কে জনৈক সুদক্ষ হিসাব-রক্ষক প্রয়োজন। শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়স ও ন্যূনতম প্রত্যাশিত বেতন ইত্যাদি জানাইয়া একখানি আবেদন-পত্র রচনা কর।

পত্রাদর্শ ১।

২৪/১, হরিনাথ দে রোড
কলিকাতা : ৯
১লা আগস্ট, ১৯৬৫।

বিশ্ব ব্যাঙ্ক লিমিটেড
বিশ্ব ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, এভিনিউ রোড
বাঙ্গালোর

সবিনয় নিবেদন,

সম্প্রতি এক বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিলাম যে, আপনাদের প্রতিষ্ঠানে জনৈক সুদক্ষ হিসাব-রক্ষক প্রয়োজন। তদনুযায়ী আমি উক্ত পদের জনৈক প্রার্থীরূপে আমার আবেদন পত্র প্রেরণ করিতেছি।

আমি গত ১৯৬০ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাণিজ্য শাখায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হই। তারপর ১৯৬৪ সালের স্নাতক শ্রেণীর বাণিজ্য (সাম্মানিক) পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছি।

গত এপ্রিল মাস হইতে আমি ৩৬, স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা—১-স্থিত 'দি ব্যাঙ্ক অব্ বাঁকুড়া লিমিটেড'-এ অস্থায়ী হিসাব-রক্ষকের পদে তিন মাসের জন্য নিযুক্ত ছিলাম। সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে আমি আমার কর্তৃপক্ষের মনোরঞ্জনে সমর্থ হই। আমি বিশ্বাস করি, বর্তমানে আমি যে কোন প্রতিষ্ঠানে হিসাব-রক্ষকের দায়িত্ব নিষ্ঠার সহিত পালন করিতে পারিব এবং কর্তৃপক্ষের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইব।

বর্তমানে আমি কর্মহীন এবং আমার কর্ম-বিনিময়-কেন্দ্রের নিবন্ধকরণ সংখ্যা হইল ক/১১৩৭।

আমার বর্তমান বয়স ২৩ বৎসর ৭ মাস। আমি সক্ষম স্বাস্থ্যের অধিকারী এবং কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত।

'দি ব্যাঙ্ক অব্ বাঁকুড়া'য় আমি তিন মাসের জন্য অস্থায়ী রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। বর্তমানে আমি তাই অন্যত্র কর্মানুসন্ধানে বাধ্য হইয়াছি।

উক্ত প্রতিষ্ঠানে আমি ভাতা সমেত মাসিক ৩৭০্ টাকা পাইয়াছি। আপনাদের প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী পদে আমি মাসিক সাড়ে তিন শত টাকা পাইলে যোগদান করিতে প্রস্তুত আছি।

এই আবেদন পত্রের সহিত কয়েকখানা প্রশংসাপত্রের অনুলিপি পাঠাইলাম। তাহা ছাড়া 'দি ব্যাঙ্ক অব্ বাঁকুড়া'য় অনুসন্ধান করিলে আমার সততা ও কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে যথাযথ বিবরণ জানিতে পারিবেন।

অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে সাক্ষাৎকারের অনুমতি প্রদান কবিলে আপনার অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমস্ত জানাইতে পারিব।

আপনার সহৃদয় নির্দেশের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক
বিকাশ মুখোপাধ্যায়

ক্রোড়পত্র—৫

২. প্রশ্ন। কোনও প্রতিষ্ঠানে [বক্স্ নং ২৭১৩, আনন্দ বাজার পত্রিকা, কলিকাতা] জনৈক সুদক্ষ হিসাব-রক্ষক প্রয়োজন। যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়স ও ন্যূনতম প্রত্যাশিত বেতন ইত্যাদি জানাইয়া একখানি আবেদন পত্র রচনা কর।

পত্রাদর্শ ২। **প্রথম পৃষ্ঠা**

৫, বিদ্যাসাগর স্ট্রীট
কলিকাতা : ৯
২রা আগস্ট, ১৯৬৫।

বিজ্ঞাপন দাতা,
বক্‌স্ নং ২৭১৩
আনন্দ বাজার পত্রিকা
কলিকাতা : ১

সবিনয় নিবেদন,

গত ২৬শে জুলাই তারিখের 'রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে' প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে জানিতে পারিলাম যে, আপনাদের প্রতিষ্ঠানে একজন সুদক্ষ হিসাব-রক্ষকের প্রয়োজন। তদনুযায়ী উক্ত পদের প্রার্থীরূপে আমি আমার আবেদন পত্র প্রেরণ করিতেছি।

সহৃদয় বিচার-বিবেচনার জন্য আমার যোগ্যতাদির বিশদ বিবরণ পর-পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সেবা করিবার এবং আমার যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা প্রমাণিত করিবার সুযোগ লাভ করিলে কৃতার্থ হইব।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

বিনীত
পরিমল বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্রোড়পত্র—৪

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

১.	আবেদনকারীর নাম :	শ্রীপরিমল বন্দ্যোপাধ্যায়
২.	ঠিকানা—স্থায়ী :	৫, বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, কলিকাতা : ৯
	বর্তমান :	ঐ
৩.	শিক্ষাগত যোগ্যতা :	উচ্চ মাধ্যমিক, প্রথম বিভাগ, ১৯৬০, বি-কম (দ্বিতীয় শ্রেণী) ১৯৬৪
৪.	অন্যান্য যোগ্যতা :	বাংলায় মুদ্রলিখন, মিনিটে অন্যূন ২৫টি শব্দ।
৫.	অভিজ্ঞতা :	৬ মাস 'ব্যাঙ্ক অব্ বরোদা'য় হিসাব-রক্ষকের পদে অস্থায়ীরূপে নিযুক্ত ছিলাম।

৬.	বর্তমান বয়স ও স্বাস্থ্য :	২৪ বৎসর ৫ মাস। স্বাস্থ্য কর্মঠ।
৭.	অন্যত্র কর্মানুসন্ধানের কারণ :	'ব্যাঙ্ক অব্ বরোদা'য় অস্থায়ী হিসাব-রক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলাম। বর্তমানে আমি কর্মহীন।
৮.	স্থানীয় নিবন্ধকরণ সংখ্যা :	ক/৭৩৮
৯.	প্রত্যাশিত বেতন :	ভাতাসহ ৩৫০৲ টাকা।
১০.	প্রশংসাপত্রাদির অনুলিপি	মোট চার খানা : [১] উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সার্টিফিকেট। [২] বি-কম পরীক্ষার সার্টিফিকেট। [৩] ব্যাঙ্ক অব্ বরোদার কর্মকর্তার প্রশংসাপত্র। [৪] স্থানীয় এম-এল-এ-র প্রশংসাপত্র।
১১.	স্বাক্ষর ও তারিখ :	পরিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২রা আগস্ট, ১৯৬৫

অনুসরণী ১

●১. কোনও ব্যাঙ্কের কলিকাতাস্থ শাখার ম্যানেজার পদের জন্য দরখাস্ত কর। ব. বি. '৬৪

●২. দৈনিক পত্রিকার বিজ্ঞাপন অনুসারে কোনও ব্যাঙ্কের হিসাব-রক্ষক পদের জন্য আবেদন কর। ব. বি. '৬১

৩. কোনও সওদাগরী প্রতিষ্ঠানে একজন হিসাব-রক্ষক আবশ্যক। শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়স ও ন্যূনতম প্রত্যাশিত বেতন ইত্যাদি জানাইয়া একখানি আবেদন পত্র রচনা কর।

৪. কোনও ব্যাঙ্কের মুখ্য করণিকের (Head clerk) পদের জন্য একখানি আবেদন পত্র রচনা কর।

৫. কোনও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের একজন আপ্ত করণিক (Confidential clerk) পদের জন্য তোমার যোগ্যতাদি জানাইয়া একখানি আবেদন পত্র রচনা কর।

●৬. তুমি বি-কম পাশ করিয়াছ। তোমার বিশেষ যোগ্যতা উল্লেখ করিয়া ও সেই যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মে নিযুক্ত করিবার প্রার্থনা করিয়া কোন সওদাগরী আপিসে দরখাস্ত কর। ক. বি. '৬৪

সুপারিশ ও প্রত্যয় পত্র
Letter of Recommendation and Credit.

দ্বিতীয় পর্যায়

সুপারিশ পত্র

সুপারিশ পত্র দু প্রকারের : এক, চাকরির ব্যাপারে সুপারিশ পত্র এবং দুই, বাণিজ্যিক ব্যাপারে সুপারিশ পত্র। প্রথম প্রকারের অর্থাৎ চাকরির ব্যাপারে সুপারিশ পত্র বর্তমানে বে-আইনী। চাকরির ব্যাপারে বহু বিজ্ঞাপনে সুপারিশ করার বিরুদ্ধে নিষেধবাণী উচ্চারিত থাকে। সুপারিশ করলে সেরূপ ক্ষেত্রে আবেদন পত্রের বাতিল হয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি। কাজেই দ্বিতীয় প্রকার সুপারিশ পত্র রচনার দিকে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারে কোনও 'প্রতিপত্তি-শালী, সুপ্রতিষ্ঠিত' এবং পরিচিত ব্যবসায়ীর কাছে অপর কোন পরিচিত ব্যবসায়ীকে সাহায্য করার জন্যে সুপারিশ পত্র রচিত হয়। বাণিজ্যিক সুপারিশ পত্রের চারটি বৈশিষ্ট্য : এক, যে পরিচিত ব্যবসায়ীর স্বার্থে এই পত্র লিখিত হয়, তার প্রতি সহৃদয় আন্তরিকতা যেন পত্রমধ্যে প্রতিফলিত হয়। দুই, যে প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায়ীর কাছে এই পত্র লিখিত হচ্ছে, তিনি সুপারিশকারীর পরিচিত। তিন, পত্রলেখক যার স্বার্থে পত্র লিখছেন, তার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যে পত্রমধ্যে প্রভাব বিস্তার করবেন। চার, আইনতঃ না হলেও নৈতিকভাবে পত্রলেখক তৃতীয় ব্যক্তির জন্যে পত্র-প্রাপকের কাছে দায়ী।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুপারিশ পত্রের খুবই প্রয়োজনীয়তা আছে। পারস্পরিক সহযোগিতা, শুভেচ্ছা ও সৌজন্যবোধই এইরূপ পত্রের ভিত্তিভূমি। নিম্নের পত্রাদর্শটি দ্রষ্টব্য :

১. প্রশ্ন। "তোমার পরিচিত কোনও প্রভাবশালী সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর নিকট তোমার পরিচিত অপর এক ব্যবসায়ীকে সাহায্য করার জন্য একখানি সুপারিশ পত্র রচনা কর।

পত্রাদর্শ ৩।

ক্যাল্‌কাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

[উৎকৃষ্ট প্রসাধন সামগ্রী উৎপাদক]

টেলিগ্রাম : 'ক্যাল্‌কেমিকো'
টেলিফোন নং : ৪৬-৩৪৫২

৩৫, পণ্ডিতিয়া রোড
কলিকাতা : ২৯
৭ই আগস্ট, ১৯৬৫।

নিউ ইণ্ডিয়া ইণ্ডাস্ট্রিজ্‌ লিঃ
বরোদা

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আমাদের বিশেষ পরিচিত ও বন্ধুস্থানীয় এবং কলিকাতার প্রতিষ্ঠাবান বস্ত্র-ব্যবসায়ী মোহিনী মিল্‌সের কার্যাধ্যক্ষ শ্রীবিপ্লব চক্রবর্তী আগামী সপ্তাহে তাঁহাদের কলে উৎপন্ন বস্ত্রের চাহিদা-বৃদ্ধিকল্পে বরোদায় যাইতেছেন।

শ্রীচক্রবর্তী আমাদের প্রতিষ্ঠানের সুদীর্ঘকালের পরিচিত ব্যক্তি। তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় ব্যতীত তাঁহার প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি ও সুনাম যে বস্ত্রশিল্পের বাজারে যথেষ্ট, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

তাঁহার কলে প্রস্তুত রঙীন শাড়ি ও ছিট্‌ কাপড় ইতিমধ্যে কলিকাতার বাজারে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। উচ্চতর মানের এই কাপড়গুলি অত্যন্ত টেক্‌সই এবং রুচিসম্মত বর্ণে চিত্রিত।

তাহা ছাড়া, ব্যবসায়গত দিক হইতে এই বস্ত্রের কারবার অত্যন্ত লাভজনক। ইহারা যে হারে কমিশন দিয়া থাকেন, তাহা আকর্ষণীয়। তদুপরি, লেনদেনগত সুবিধা তো আছেই।

শ্রীচক্রবর্তী আগামী সপ্তাহে বরোদায় আপনাদের প্রধান কার্যালয়ে যাইতেছেন। আপনারা শ্রীচক্রবর্তীকে বরোদার বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের নাম-ঠিকানা ইত্যাদি দিয়া সাহায্য করিলে এবং সম্ভব হইলে তাঁহাদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলে বিশেষ বাধিত হইব। আপনারা বরোদার লব্ধ-প্রতিষ্ঠ এবং প্রভাবশালী ব্যবসায়ী। আশা করি, শ্রীচক্রবর্তীর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য আপনারা আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিবেন।

আপনারা শ্রীচক্রবর্তীকে যে সাহায্য করিবেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে আমাদের স্বার্থেই করিতেছেন বলিয়া মনে করিবেন। ভবিষ্যতে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে অনুরূপ সাহায্য করিবার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রহিলাম।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীপ্রদ্যোৎ মজুমদার
[ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ-র পক্ষে]

প্রত্যয় পত্র

যে কোন প্রতিষ্ঠানের স্বার্থেই সেই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রত্যয় পত্র লেখা যায়। প্রচারের উদ্দেশ্যে বা মাল বিক্রীর জন্যে বা অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাপারে কোন কোন প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব প্রতিনিধিকে ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে থাকেন। তখন প্রতিনিধির গন্তব্যস্থলে কোনও পরিচিত ব্যক্তি বা ব্যবসায়ী বা তার সঙ্গে লেনদেন আছে এমন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের-সাহায্যের প্রয়োজন হয়। তখন উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে উক্ত প্রতিনিধিকে সাহায্য করবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে প্রত্যয় পত্র লিখিত হয়। প্রতিনিধিকে দু রকমের সাহায্যের অনুরোধ করা হয়ে থাকে : এক, ব্যবসায়িক পরামর্শাদি দিয়ে সাহায্য ; দুই, টাকাকড়ি ধার দিয়ে সাহায্য।

যেখানে টাকাকড়ির ধার দেওয়ার প্রশ্ন জড়িত, সেখানে কতকগুলি বিষয় উল্লিখিত হওয়া দরকার। এক, প্রত্যয় পত্রে কতো টাকা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, তার সর্বোচ্চ সীমা স্পষ্ট করে উল্লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দুই, কোন্ তারিখের মধ্যে টাকা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, তার উল্লেখ থাকা চাই। তিন, কি ভাবে এবং কোন্ তারিখের মধ্যে সেই টাকা পরিশোধ করা হবে, তারও উল্লেখ রাখতে হবে। চার, যার হাতে টাকা দিতে অনুরোধ করা হলো, তার স্বাক্ষরও প্রত্যয় পত্রে থাকা উচিত। এবার পত্রাদর্শটি দ্রষ্টব্য।

২ প্রশ্ন। তোমার প্রতিষ্ঠানের বিশেষ বাণিজ্যিক প্রতিনিধিকে (special commercial representative) সকল প্রকার সাহায্য করিবার অনুরোধ জানাইয়া দূরস্থিত কোনও পরিচিত প্রতিষ্ঠানের নিকট একখানি (প্রত্যয়) পত্র লিখ।

পত্রাদর্শ ৪।

চয়ন মানুফ্যাক্চারিং এণ্টারপ্রাইজেস্

[নরম ইস্পাত প্রস্তুতকারক]

টেলিগ্রাম : 'চয়ন'
টেলিফোন নং : ৫৬-৩৭১৩

২২, যাদবচন্দ্র ঘোষ লেন
কলিকাতা : ৩৬
১৭ই আগস্ট, ১৯৬৫।

গোদাবরী স্থগার মিল্‌স্ লিঃ
ফজল ভাই বিল্ডিং
মহাত্মা গান্ধী রোড
বোম্বাই : ১

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আমাদের বিশেষ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি শ্রীকল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী সপ্তাহে বোম্বাই যাত্রা করিতেছেন। বোম্বাইতে আমাদের উৎপন্ন নরম ইস্পাতের চাহিদা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিবার জন্য আমরা তাঁহাকে প্রেরণ করিতেছি। তিনি যে কিরূপ গুরু দায়িত্ব লইয়া ওখানে যাইতেছেন, তাহা আশা করি বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে আপনাদের মূল্যবান পরামর্শাদি ছাড়া সেই গুরু দায়িত্ব স্থষ্ঠুরূপে উদ্‌যাপন করা সম্ভব হইবে না। বোম্বাইতে অবস্থানকালে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু অর্থের প্রয়োজন হইতে পারে। সেরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাকে অনুগ্রহপূর্বক তিন কিস্তিতে সর্বমোট ১৫০০৲ (এক হাজার পাঁচ শত টাকা মাত্র) দিয়া বাধিত করিবেন। প্রতি কিস্তিতে টাকা দিবার সময় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর-যুক্ত দুইখানি রসিদ লইবেন। তন্মধ্যে একখানি আপনাদের নিকট রাখিবেন, একখানি আমাদের নিকট পাঠাইবেন।

আনুষঙ্গিক ব্যয়-সমেত আপনাদের প্রদত্ত টাকা প্রদানের তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে পরিশোধের জন্য প্রতিশ্রুত রহিলাম।

এই পত্র অদ্য হইতে ৩০ দিন পর্যন্ত কার্যকরী থাকিবে।

আপনাদের এই সহযোগিতার জন্য আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকিব এবং ভবিষ্যতে যদি আপনাদের আবশ্যক হয়, অনুরূপ সাহায্য করিবার জন্য প্রতিশ্রুত রহিলাম।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরের নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল। টাকা দিবার সময় স্বাক্ষর মিলাইয়া লইবেন।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীঅমিতাভ সেনগুপ্ত
[চয়ন ম্যানুফ্যাক্‌চারিং এণ্টারপ্রাইজেসের পক্ষে]

শ্রীকল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
স্বাক্ষরের নমুনা :
শ্রীকল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুসরণী ২

১. তোমার এক ব্যবসায়ী-বন্ধু তাঁহার ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য শিলং যাইতেছেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য শিলং-স্থিত এক ব্যবসায়ী-বন্ধুর নিকট একখানি সুপারিশ-পত্র রচনা কর।

২. তোমার এক বিশেষ পরিচিত ব্যবসায়ী তাঁহার ব্যবসায়ের শাখা স্থাপনের উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ যাইতেছেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য মাদ্রাজ-স্থিত এক সুপরিচিত ব্যবসায়ীকে একখানি পত্র লিখ।

৩. তোমার পণ্যের বাজার-সৃষ্টির জন্য এক বিশেষ বিক্রয়-প্রতিনিধিকে পূর্ব-পাকিস্তানে প্রেরণ করিতেছ। তাহাকে সর্ববিধ সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পূর্ব-পাকিস্তানস্থিত এক ব্যবসায়ী-বন্ধুকে একখানি প্রত্যয় পত্র লিখ।

৪. তোমার এক বিশেষ ব্যবসায়ী-বন্ধু বাণিজ্য-ব্যপদেশে নয়াদিল্লীতে গিয়া হঠাৎ অর্থকষ্টে পড়িয়াছেন। তাঁহাকে কিছু পরিমাণ অর্থ ঋণদানের জন্য দিল্লীস্থিত তোমার এক পরিচিত ব্যবসায়ীর নিকট একখানি প্রত্যয় পত্র রচনা কর।

যোগ্যতা অনুসন্ধান পত্র

ব. বি. '৬২

Letter of Status Enquiries

তৃতীয় পর্যায়

যোগ্যতা অনুসন্ধান পত্র দু প্রকারের : এক, কর্মপ্রার্থীর যোগ্যতা অনুসন্ধান ; দুই, বাণিজ্যিক লেনদেনে ইচ্ছুক ব্যবসায়ীর অবস্থানুসন্ধান। কর্মপ্রার্থীর ক্ষেত্রে শিক্ষাগত ও কর্মগত যোগ্যতা, চারিত্রিক সততা ও বিশ্বস্ততা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক লেনদেনে ইচ্ছুক ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে আর্থিক সংগতি, বাণিজ্যিক সততা ও সুনাম ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয়ে অনুসন্ধান করা হয়। অনুসন্ধান পত্রের উত্তর দান সম্পর্কে পত্র-প্রাপকের ওপর কোনরূপ বাধ্যবাধকতা থাকে না। কিন্তু তবু উত্তর দান করতে হয় ; কারণ তা বাণিজ্যিক সৌজন্যবোধ।

বাণিজ্যিক অনুসন্ধান পত্রের কতকগুলি স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য :

এক. উভয় ক্ষেত্রেই আবেদনকারীর পত্রে যোগ্যতা বা অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য কোন বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামের উল্লেখ থাকে।

দুই. পত্র লেখার কারণ উল্লিখিত থাকা দরকার।

তিন. তারপর জ্ঞাতব্য তথ্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করতে হয়।

চার. পত্রোত্তরে প্রাপ্ত তথ্যাদি গোপন রাখবার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। সে জন্যে পত্র-শীর্ষের বাম প্রান্তে <u>ব্যক্তিগত ও সংগুপ্ত</u> (Private and Confidential) লিখিত থাকা চাই।

পাঁচ. কৃতজ্ঞতা স্বীকার এবং পত্র-প্রাপককে ভবিষ্যতে অনুরূপ সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া দরকার।

নিম্নের পত্রাদর্শগুলি দ্রষ্টব্য।

কর্মপ্রার্থীর যোগ্যতা অনুসন্ধান

১ প্রশ্ন। তোমার প্রতিষ্ঠানে কোন কর্মপ্রার্থী তাঁহার আবেদন পত্রে তাঁহার সম্পর্কে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার জন্য এক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের অনুরোধ করিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানে একখানি পত্র লিখ।

পত্রাদর্শ ৫।

ব্যক্তিগত ও সংগুপ্ত

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্স্ লিঃ

[শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বস্ত্র-উৎপাদক]

টেলিগ্রাম : 'লক্ষ্মী'
টেলিফোন : ২২-৭৮৩৬

৭, চৌরঙ্গী রোড
কলিকাতা : ১

পত্র সংখ্যা :— চ/১০৩ ৬৫ ১৬ই আগস্ট, ১৯৬৫

বিহার ফায়ার ব্রিক্স্ এণ্ড পটারিজ্ লিঃ
২২, স্ট্রাণ্ড রোড
কলিকাতা : ১

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আমাদের প্রতিষ্ঠানে হিসাব-রক্ষকের কর্মপ্রার্থী শ্রীপ্রদীপ কুমার সান্ন্যাল তাঁহার আবেদন-পত্রে আবেদন-সূত্র হিসাবে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তদনুযায়ী তাঁহার সম্পর্কে নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি যথাসত্বর আমাদের জানাইয়া বাধিত করিবেন :

এক. শ্রীসান্ন্যালের সহিত আপনাদের পরিচয় কত দিনের ?

দুই. তাঁহার কর্ম-দক্ষতা, সততা ও চরিত্র সম্বন্ধে আপনারা কিরূপ অভিমত পোষণ করেন ?

তিন. তাঁহার বিশ্বস্ততা কি নির্ভরযোগ্য ?

চার. পূর্বে তিনি মাসিক কিরূপ হারে বেতন পাইতেন ?

পাঁচ. তিনি কি কোন দিন আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন ? যদি হইয়া থাকেন, তাহাতে আদালতের রায় কি ছিল ?

আপনাদের সহিত আমরা প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত না হইলেও ব্যবসায় জগতে আমরা পরস্পরের সহিত অপরিচিত নহি। ভবিষ্যতে অনুরূপভাবে আপনাদের উপকার করিবার সুযোগ লাভ করিলে কৃতার্থ হইব।

শ্রীসান্ন্যাল সম্পর্কে আপনারা যে সকল তথ্যাদি সরবরাহ করিবেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে সংগুপ্ত রাখা হইবে ;—সে প্রতিশ্রুতি আমরা দিতেছি।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীগৌতম ভট্টাচার্য
[বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্স্ লিঃ-এর পক্ষে]

অনুসন্ধান পত্রের অনুকূল উত্তর

পত্রাদর্শ ৬।

ব্যক্তিগত ও সংগুপ্ত

বিহার ফায়ার ব্রিক্‌স্‌ এণ্ড পটারিজ্‌ লিঃ

[ইট, সিমেণ্ট ইত্যাদি উৎপাদনের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান]

টেলিগ্রাম : বন্‌কো — ২২, স্ট্রাণ্ড রোড
টেলিফোন নং : ২২-৯৯৯১ — কলিকাতা : ১

পত্র সংখ্যা :—প/২২৫/৬৫ — ২২শে আগস্ট, ১৯৬৫

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্‌স্‌ লিঃ
৭, চৌরঙ্গী রোড
কলিকাতা : ১

পূর্ব-সূত্র :—চ/১০৩/৬৫

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনাদের ১৬.৮.৬৫ তারিখে লিখিত চ/১০৩/৬৫ সংখ্যক পত্র আমরা পাইয়াছি। তদনুযায়ী আমরা ধারাবাহিকরূপে শ্রীপ্রদীপ কুমার সান্ন্যাল সম্পর্কে আপনাদের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইতেছি।

এক. শ্রীসান্ন্যালের সহিত আমাদের পরিচয় ইং ১৯৫৮ সাল হইতে।

দুই. তাঁহার কর্মদক্ষতা, সততা ও চরিত্র সম্বন্ধে আমরা অনুকূল অভিমত পোষণ করি।

তিন. আমাদের মতে, তাঁহার বিশ্বস্ততা নির্ভরযোগ্য।

চার. পূর্বে তিনি মাসিক ৪০০্ (চারি শত টাকা মাত্র) হারে বেতন পাইতেন বলিয়া জানি।

পাঁচ. তিনি কোন দিন আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া জানি না।

প্রতিশ্রুতিময় যুবক শ্রীসান্ন্যাল আপনাদের প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত হইয়া জীবনে উন্নতি করুন, ইহাই কামনা করি। আমাদের বিশ্বাস, শ্রীসান্ন্যাল অল্পকালের মধ্যেই আপনাদের প্রীতি ও বিশ্বাসের পাত্র হইয়া উঠিতে পারিবেন।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীদীপঙ্কর দাশগুপ্ত
[বিহার ফায়ার ব্রিক্‌স্‌ এণ্ড পটারিজ্‌ লিঃ-এর পক্ষে]

বাণিজ্যিক লেনদেনে ইচ্ছুক ব্যবসায়ীর অবস্থানুসন্ধান

২ প্রশ্ন। কোন ব্যবসায়ী তোমার প্রতিষ্ঠানের সহিত বাণিজ্যিক লেনদেনে ইচ্ছুক। তাঁহার পত্রে অনুসন্ধান-সূত্ররূপে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানে তাঁহার অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া একখানি পত্র লিখ।

পত্রাদর্শ ৭।

ব্যক্তিগত ও সংগুপ্ত

ইণ্ডিয়ান মেকানিক্যাল্ কোং লিঃ

[কারিগরী দক্ষতার আধুনিকতম আয়োজন]

টেলিগ্রাম : 'মেকানো'
টেলিফোন নং : ২৩-৩২২৪

২৭, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
কলিকাতা : ১
২৫শে আগস্ট, ১৯৬৫

পত্র সংখ্যা :—জ/৩০৭/৬৫

জয় ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ
৬, প্রিন্স আনোয়ার শা রোড
কলিকাতা : ৩১

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

৫৮, সুবার্বন্ স্কুল রোড, কলিকাতা-২৫ ঠিকানাস্থিত এ্যালায়েড্ সায়েন্টিফিক্ ট্রেডার্স সম্প্রতি আমাদের প্রতিষ্ঠানের সহিত বাণিজ্যিক লেনদেনগত সম্পর্ক স্থাপনে ইচ্ছুক। তাঁহারা পরিচয়-সূত্র হিসাবে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের নাম পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন।

আপনাদের সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকিলেও ব্যবসায় জগতে আমরা পরস্পরের সহিত অপরিচিত নই। সেই সূত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি লইয়া উক্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এবং সেই সঙ্গে আপনাদের মূল্যবান মতামত যথাসত্বর পত্রোত্তরে জানাইতে অনুরোধ করিতেছি :

এক. উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত আপনাদের বাণিজ্যিক লেনদেন আছে কি? থাকিলে তাহা কত দিনের?

দুই. উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংগতি কত হইতে পারে?

তিন. বাজারে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সুনাম আছে কি?

চার. বাণিজ্যিক লেনদেনে এই প্রতিষ্ঠান নিয়মিত কিনা ?

পাঁচ. এই প্রতিষ্ঠানকে এক সঙ্গে ২০০০৲ (দুই হাজার টাকা মাত্র) মূল্যের মাল বাকিতে সরবরাহ করা যায় কিনা ?

বলাবাহুল্য, এই তথ্যগুলি আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং জানিতে পারিলে বিশেষ উপকৃত হইব। আপনাদের প্রেরিত তথ্যসমূহ এবং আপনাদের মূল্যবান মতামত সম্পূর্ণরূপে সংগুপ্ত রাখা হইবে—আমরা তাহার প্রতিশ্রুতি দিতেছি। ভবিষ্যতে অনুরূপভাবে আপনাদের উপকার করিবার সুযোগ পাইলে কৃতার্থ হইব।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীসুপ্রকাশ ঘোষ
[ইণ্ডিয়ান মেকানিক্যাল কোং লিঃ-এর পক্ষে]

অনুসন্ধান পত্রের প্রতিকূল উত্তর

পত্রাদর্শ ৮।

ব্যক্তিগত ও সংগুপ্ত

জয় ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ

[প্রসিদ্ধ পাখা, সেলাইকল ইত্যাদি উৎপাদক]

টেলিগ্রাম : 'উষা'
টেলিফোন নং : ৫৬-৪৬৭১
(৭টি লাইন)

৬, প্রিন্স আনোয়ার শা রোড
কলিকাতা : ৩১
১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

পত্র সংখ্যা :—ক/১০০১/৬৫

ইণ্ডিয়ান মেকানিক্যাল্ কোং লিঃ
২৭, ইণ্ডিয়া এক্স্চেঞ্জ প্লেস
কলিকাতা : ১

পূর্ব-সূত্র :—জ/৩০৭/৬৫

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনাদের ২৫. ৮. ৬৫ তারিখের জ/৩০৭/৬৫ সংখ্যক পত্র আমরা পাইয়াছি।

তদনুযায়ী আমরা 'অ্যালায়েড্ সায়েন্টিফিক্ ট্রেডার্স' সম্বন্ধে আপনাদের জ্ঞাতব্য যাবতীয় তথ্য ধারাবাহিকভাবে প্রদান করিতেছি :

এক. উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক অল্পদিনের। কিন্তু ইতিমধ্যে কয়েকটি বিশেষ কারণে উহা ছিন্ন হইয়াছে।

দুই. উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংগতি স্বল্প এবং উহার ব্যবসায় ক্রমাগত সংকুচিত হইয়া আসিতেছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

তিন. বাজারে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সুনাম কোনকালে ছিল না, এখনও নাই।

চার. বাণিজ্যিক লেনদেনে উক্ত প্রতিষ্ঠান কোনদিন নিয়মিত হইতে পারে নাই। ফলে আমাদের প্রচুর অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

পাঁচ. এই প্রতিষ্ঠানকে একসঙ্গে ২০০০৲ টাকা কেন, ২০০৲ টাকার মাল বাকিতে সরবরাহ করিতে আমরা বলিতে পারি না। আপনারা নিজস্ব দায়িত্বে দিতে পারেন কিনা, তাহা আপনাদের বিবেচনাধীন।

যে সকল তথ্য আপনাদের প্রয়োজন, তৎসমুদয় প্রেরণ করিলাম। আশা করি, ইহাতেই আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীপ্রণবেন্দু মুখোপাধ্যায়
[জয় ইঞ্জিনিয়ারিং কোং-র পক্ষে]

অনুসরণী ৩

● ১. কোন ব্যক্তি ব্যাঙ্কে ধার চাহিয়াছেন ও তাঁহার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে পরিচয় জানিবার জন্য তোমার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যাঙ্ক এ বিষয়ে তোমার নিকট জানিতে চাহিয়াছেন। তুমি এ বিষয়ে যথোপযুক্ত উত্তর লিখ। ব. বি. '৬২

২. তোমার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন ব্যক্তি অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মপ্রার্থী। উক্ত প্রতিষ্ঠান উক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদের নিকট অনুসন্ধানপত্র লিখিয়াছেন। তাহার উত্তরে একখানি অনুকূল পত্র রচনা কর।

৩. তোমাদের প্রতিষ্ঠানে কর্মপ্রার্থী এক ব্যক্তির যোগ্যতা অনুসন্ধান করিয়া আবেদনপত্রে উল্লিখিত কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নিকট একখানি পত্র লিখ।

৪. কোন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান তোমাদের প্রতিষ্ঠানের সহিত ব্যবসায় করিতে ইচ্ছুক। পরিচয়-সূত্র হিসাবে কোন এক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের অবস্থাদি সম্পর্কে একখানি অনুসন্ধান পত্র রচনা কর।

প্রচার পত্র

ক. বি. '৬৪ **চতুর্থ পর্যায়**

Circular Letters

কোন প্রতিষ্ঠানের কোন কিছু বিষয় ক্রেতা-সাধারণের কাছে বা জনসাধারণের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার জন্যে প্রচার পত্র রচিত হয়ে থাকে। কাজেই, প্রচারের উদ্দেশ্যেই প্রচার পত্র রচিত হয়।

প্রচার পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো দুটি: এক, সংবাদ জ্ঞাপন এবং দুই, চাহিদা-সৃষ্টি ও চাহিদা-বৃদ্ধি।

সংবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত প্রচার পত্র: নতুন শাখা প্রতিষ্ঠা, নতুন ব্যবসায়ের উদ্বোধন, ব্যবসায় ক্রয় বা বিক্রয়, গৃহ সম্প্রসারণ, স্থান পরিবর্তন, অংশীদার আহ্বান, একাধিক ব্যবসায়ের সংযুক্তি, একই ব্যবসায়ের একাধিক ভাগে বিভক্তি, দায়িত্বশীল কর্মচারীর পদচ্যুতি, মূল্যবৃদ্ধি বা মূল্যহ্রাস ইত্যাদি।

চাহিদা-সৃষ্টি ও চাহিদা-বৃদ্ধিকল্পে রচিত প্রচার পত্র: নতুন পণ্যের আমদানি বা উৎপাদন, পুরাতন পণ্যের উৎকর্ষসাধন ইত্যাদি।

প্রচার পত্র রচনার আগে প্রচার পত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, প্রচার পত্রে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিফলিত হয়েছে কিনা। বৈশিষ্ট্যগুলি হলো: এক, প্রচার পত্র সাধারণভাবে (in general) এবং বিশেষভাবে (in particular) লেখা যায়। দুই, বাক্-চাতুর্য বা শিল্প চাতুর্যের দ্বারা ক্রেতার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার সাফল্যই প্রচার পত্রের সাফল্য নির্ভর করে। তিন, প্রচার পত্রের কোথাও যেন এমন কোন দম্ভ প্রকাশ না পায়, যাতে ভাবপ্রবণতা (sentiment) আহত হতে পারে। চার, প্রচার পত্রের বড়ো গুণ সৌজন্যবোধ। পাঁচ, ক্রেতার স্বার্থ সম্বন্ধে ক্রেতা অনেক সময় সচেতন থাকে না। প্রচার পত্রে তা তুলে ধরতে পারলে ক্রেতাকে আকৃষ্ট করা যায়।

নূতন বিভাগের উদ্বোধন

১ প্রশ্ন। তোমার ব্যবসায়ের একটি নূতন বিভাগ খোলা হইতেছে। ক্রেতা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া একখানি প্রচার পত্র রচনা কর।

পত্রাদর্শ ৯।

স্বদেশী কটন মিল্‌স্‌ কোঃ লিঃ

[স্থাপিত ১৯০৫]

টেলিগ্রাম : 'স্বদেশী'
টেলিফোন নং : ২২-১৩৪৬

৫০, ব্রাবোর্ন রোড
কলিকাতা : ১

৮ই আগস্ট, ১৯৬৫

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া আমাদের প্রতিষ্ঠান আপনাদের সেবা করিয়া আসিতেছে। আমাদের কলে প্রস্তুত ধুতি ও শাড়ি এই দীর্ঘকাল ধরিয়া আপনাদের রুচিসম্মত চাহিদা মিটাইয়া আসিয়াছে। আমাদের উৎপন্ন বস্ত্রের জনপ্রিয়তায় উৎসাহিত হইয়া আমরা একটি পোশাক বিভাগ স্থাপনে মনস্থ করিয়াছি।

৭৭, চৌরঙ্গী রোডে আমাদের সুসজ্জিত প্রদর্শনীকক্ষে পরিকল্পিত পোশাক বিভাগটি স্থাপিত হইতেছে। আমাদের নিজস্ব কলে প্রস্তুত কাপড় হইতে পোষাকগুলি প্রস্তুত হইবে। নূতন নূতন ডিজাইনের ছাপা ছিট্‌ এবং অতি উৎকৃষ্ট কাপড় হইতে প্রস্তুত পোশাকগুলি একদিকে হইবে যেমন সুরুচিসম্পন্ন, অন্যদিকে হইবে তেমনি যুগোপযোগী। স্থায়িত্বের দিক দিয়া ইহা অতুলনীয়। সুদক্ষ ও সুশিক্ষিত কারিগর দিয়া পোশাকগুলি প্রস্তুত হইতেছে।

সেই সঙ্গে আর একটি বিষয়েও আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমাদের প্রদর্শনী কক্ষটিকে আমরা নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী সাজাইয়াছি। আপনাদের সুবিধার জন্য আধুনিক পদ্ধতিতে ইহাব বিক্রয়-বিন্যাস, আলো-বাতাস ও বসিবার ব্যবস্থা ইত্যাদি—সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমরা আনন্দিত। সর্বোপরি, আপনাদের আপ্যায়নের জন্য উপযুক্ত আয়োজন করা হইয়াছে।

আগামী ১৫ই আগস্ট তারিখে বেলা চারটার সময় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহোদয় এই প্রদর্শনী কক্ষটির দ্বারোদ্‌ঘাটন করিবেন। তাঁহার উপস্থিতিতে আমাদের নির্মিত প্রথম স্বদেশী পোশাকটি বিক্রয় করা হইবে।

আশা করি, এই সংবাদে আপনারা প্রীত হইবেন এবং অনুগ্রহপূর্বক আমাদের প্রদর্শনী কক্ষে পদার্পণ করিয়া আমাদের ধন্য করিবেন। আমাদের বিশ্বাস, এই নূতন

বিভাগের মাধ্যমে আমরা আরও দক্ষতার সহিত আপনাদের সেবা করিতে ও মনোরঞ্জন করিতে পারিব।

নমস্কারান্তে। ইতি—

বিনীত

শ্রীস্বদেশরঞ্জন পাল

[স্বদেশী কটন মিল্‌স্ কোং লিঃ-এর পক্ষে]

অংশীদার আহ্বান

২ প্রশ্ন। তোমার কারবারে মূলধন বাড়াইবে। সেই উদ্দেশ্যে নূতন অংশীদার আহ্বান করিয়া একটি প্রচার পত্র রচনা কর। ক. বি. '৬৪

পত্রাদর্শ ১০।

নিউ ইণ্ডিয়া কেমিক্যাল কোং লিঃ

[রাসায়নিক দ্রব্য আমদানি-রপ্তানিকারক]

টেলিগ্রাম : 'নিউ কেমিক্যাল'
টেলিফোন নং : ২২-৩২৮০

৩৭, স্ট্রাণ্ড রোড,
কলিকাতা : ১
২০শে আগস্ট, ১৯৬৫

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

নিউ ইণ্ডিয়া কেমিক্যাল কোং লিঃ ভারতীয় বাণিজ্যের অগ্রগতির প্রতীক। স্বাধীনতা লাভের পর এই সম্ভাবনাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা-সুরু। ইহার ইতিহাসের এই কয়েক বৎসরে ইহা আশাতিরিক্ত উন্নতি করিয়াছে। দিন দিন ইহার বাণিজ্যিক পরিমাণ ক্রমবর্ধমান। ইহার বর্তমান পুঁজির পরিমাণ প্রায় এক কোটি টাকা।

অতি সামান্য পুঁজি লইয়া এই প্রতিষ্ঠান ভারতীয় বাণিজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকায় স্বল্প পুঁজিতে আর ইহার কারবার সুষ্ঠুমত চলিতেছে না। তাই ইহার বাণিজ্যের সম্প্রসারণের জন্য আমরা ইহার মূলধন বৃদ্ধি করিতে মনস্থ করিয়াছি।

বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান তিনজন অংশীদার লইয়া গঠিত একটি অংশীদারী কারবার প্রতিষ্ঠান। ইহাতে অতিরিক্ত দুইজন অংশীদার গ্রহণ করা হইবে। প্রত্যেক

অংশীদারকে ২৫ লক্ষ টাকা দিতে হইবে। অংশীদারী কারবার আইনের দ্বারা যাবতীয় চুক্তি সম্পাদিত হইবে।

এই প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ লাভজনক কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য উৎসাহী বিনিয়োগেচ্ছু ব্যক্তিদের আহ্বান জানাইতেছি। অন্যান্য সকল বিষয় অবগত হইবার জন্য আমরা তাঁহাদের আমাদের অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীঅরুণাচল বসু
শ্রীমণীন্দ্রনাথ সিংহ
শ্রীশান্তিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ব্যবসায় সংযুক্তিকরণ

৩ প্রশ্ন। সমব্যবসায়ী দুইটি প্রতিষ্ঠান একত্র সংযুক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। সংযুক্তি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সাধারণভাবে ক্রেতা-সাধারণের উদ্দেশ্যে একখানি প্রচার পত্র রচনা কর।

পত্রাদর্শ ১১।

দত্ত চক্রবর্তী এণ্ড কোম্পানী লিঃ
[সকল প্রকার অর্ডার সরবরাহ-কারক]

টেলিগ্রাম : 'দত্তচক্র' ১৫, মহাত্মা গান্ধী রোড
টেলিফোন নং : ৩৪-৩২৫৭ কলিকাতা : ৯
২১শে আগস্ট, ১৯৬৫

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনাদের নিকট 'দত্ত এণ্ড কোং' এবং 'চক্রবর্তী এণ্ড কোং'—এই দুই প্রতিষ্ঠানের পরিচয় দীর্ঘকালের। বিভিন্ন সময়ে আপনারা এই দুই প্রতিষ্ঠানকে আপনাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সরবরাহ করিবার অর্ডার দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। আমরা উভয় প্রতিষ্ঠানই সেজন্য আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

আগামী ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ তারিখ হইতে আমাদের উভয় প্রতিষ্ঠানের সংযুক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। একক-মালিকানাসম্পন্ন এই দুই প্রতিষ্ঠান উক্ত তারিখ হইতে

২. দেশের চাহিদানুযায়ী তোমার প্রতিষ্ঠান একটি যুগোপযোগী পণ্য উৎপাদন করিতেছে। ক্রেতা-সাধারণের উদ্দেশ্যে একখানি উপযুক্ত প্রচার পত্র রচনা কর।

৩. তোমাদের অংশীদারী কারবার প্রতিষ্ঠান অতঃপর দুইটি পৃথক প্রতিষ্ঠানরূপে ব্যবসায় পরিচালনা করিবে। এই বিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া একখানি প্রচার পত্র রচনা কর।

৪. তোমার পুরাতন পণ্য-প্রদর্শনী কক্ষটির সংস্কার করিয়া আধুনিক সকল সুবিধার আয়োজন করা হইয়াছে। ক্রেতা-সাধারণের উদ্দেশ্যে এই বিষয়ে একখানি উপযুক্ত প্রচার পত্র রচনা কর।

৫. বিদেশ হইতে কতকগুলি যন্ত্রের বিশেষ বিশেষ অংশ আমদানি করিতেছ। ক্রেতা-সাধারণকে অবিলম্বে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য আহ্বান করিয়া একখানি প্রচার পত্র রচনা কর।

৬. তুমি একটি বিশিষ্ট কারবারের মালিকানা ক্রয় করিয়াছ। ইহার নানা প্রকার সংস্কার সাধন করিয়া উহার নাম পরিবর্তন করিয়াছ। সমস্ত বিষয়টির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া একখানি যথাযোগ্য প্রচার পত্র রচনা কর।

৭. তোমার ব্যবসায় সম্প্রসারিত হওয়ায় বর্তমান ঠিকানায় স্থান-সংকুলান হইতেছে না। কোন সুপরিসর স্থানে ব্যবসায় স্থানান্তরের সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। ক্রেতা-সাধারণের উদ্দেশ্যে একখানি প্রচার পত্র রচনা করিয়াছ।

৮. তোমাদের প্রতিষ্ঠানের জনৈক অংশীদার তোমাদের প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিয়াছেন। অতঃপর তোমাদের প্রতিষ্ঠানের নামে তাঁহার যাবতীয় লেনদেনে তোমাদের কোন দায়-দায়িত্ব নাই—এই বিষয় জানাইয়া সাধারণভাবে একখানি প্রচার পত্র রচনা কর।

৯. তোমাদের প্রতিষ্ঠানের জনৈক আদায়কারীকে কোন কারণে বরখাস্ত করা হইয়াছে। তাহাকে আদায় না দিয়া তোমাদের নব-নিযুক্ত আদায়কারীকে আদায় দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ক্রেতা-সাধারণের নিকট বিশেষভাবে একখানি প্রচার পত্র রচনা কর।

বিক্রয়-প্রস্তাব, মূল্য-জিজ্ঞাসা, মূল্য-জ্ঞাপন ও অর্ডার-সংক্রান্ত পত্র

ক. বি. '৬৩, ব. বি '৬৪

Letters relating to Offers, Quotations and Orders.

পঞ্চম পর্যায়

বিক্রয়-প্রস্তাব, মূল্য-জিজ্ঞাসা, মূল্য-জ্ঞাপন ও অর্ডার সংক্রান্ত পত্র—এই চতুর্বিধ পত্র-বিনিময়ের আছে চতুর্বিধ দিক বা পর্যায়। প্রথমতঃ, বিক্রেতা বা উৎপাদক বা আমদানিকারক পণ্য-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিক্রয়-প্রস্তাব-বিষয়ক পত্র রচনা করতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, তার উত্তরে ক্রেতা পণ্যের উৎকর্ষে আকৃষ্ট হয়ে রচনা করতে পারেন মূল্য-জিজ্ঞাসা-সূচক প্রশ্ন। তৃতীয়তঃ, বিক্রেতা-প্রতিষ্ঠান পণ্যের মূল্য জানিয়ে মূল্য-জ্ঞাপন-সংক্রান্ত পত্র রচনা করেন। এবং চতুর্থতঃ, ক্রেতা পণ্য-ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রচনা করেন অর্ডার-সংক্রান্ত পত্র। এমনি করে বাণিজ্য গতি লাভ করে।

আসল কথা হলো, কোন উৎপাদক-প্রতিষ্ঠান কোন নতুন পণ্য উৎপাদন করলে বা কোন আমদানিকারক-প্রতিষ্ঠান কোন নতুন পণ্য আমদানি করলে বা গুদামে প্রচুর পরিমাণে কোন পণ্য জমে উঠলে পণ্য-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নানা সুবিধাজনক সর্তাদির উল্লেখ করে ক্রেতা-সাধারণের সম্মুখে পণ্য-বিক্রয়ের প্রস্তাব রাখা হয়। এই হলো-বিক্রয়-প্রস্তাব (Offers)। এই পত্রের বৈশিষ্ট্য হলো : এক, পণ্যের বিস্তারিত বিবরণ; দুই, উপযোগিতা ও তিন, সুবিধাজনক সর্তাদির উল্লেখ। বিক্রয়-প্রস্তাব-সংক্রান্ত পত্রের সঙ্গে প্রচার পত্রের মিল আছে। তবে প্রচার পত্র যেমন নির্বিশেষ (general), বিক্রয়-প্রস্তাব-সংক্রান্ত পত্র তেমনি বিশেষ (particular)।

মূল্য-জিজ্ঞাসা-সংক্রান্ত পত্র লিখবেন ক্রেতা। মূল্য-জিজ্ঞাসা পত্রের বৈশিষ্ট্য হলো : পণ্যের পরিমাণ ও যোগান দেবার সময়-জ্ঞাপন এবং দস্তুরীর পরিমাণ, মূল্য-পরিশোধের রীতি ইত্যাদি আনুষঙ্গিক প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করা হয়ে থাকে। সেই সঙ্গে থাকে ক্রেতার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠা, সংগতি ও সুনামের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। আর ক্রেতা যদি বিক্রেতার অপরিচিত হন, তবে পরিচয়-সূত্রের উল্লেখও প্রয়োজন।

মূল্য-জ্ঞাপন-সংক্রান্ত পত্র মূল্য-জিজ্ঞাসা-সংক্রান্ত পত্রেরই উত্তর। এই পত্র লিখিত হয় মূল্য-জিজ্ঞাসা-সূচক পত্রের সূত্র ধরে। মূল্য-জিজ্ঞাসা-পত্রে যে-যে প্রশ্নগুলি করা হয়, মূল্য-জ্ঞাপন-পত্রে ঠিক সেই-সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। মনে রাখতে হবে যে, এই পত্রের ভিত্তিতেই পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়-সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদিত হয়।

বলা বাহুল্য, মাল প্রেরণের দায়িত্ব আপনাদের এবং মাল ত্রুটিযুক্ত হইলে বা মাল প্রেরণে বিলম্ব হইলে আমরা মাল গ্রহণে বাধ্য থাকিব না।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীরামস্বামী নাইডু
[আর ব্রাদার্স এণ্ড কোং-র পক্ষে]

অনুসরণী ৫

১. পুস্তক প্রকাশনের জন্য কাগজ চাহিয়া কাগজ ব্যবসায়ীদের কাছ হইতে টেণ্ডার (tender) আহ্বান করিয়া বিজ্ঞাপন লিখ। ক. বি. '৬৩

২. কোন বিদেশী কোম্পানীকে এক লক্ষ টাকা মূল্যের বস্ত্রশিল্পের জন্য বিদ্যুৎ-চালিত বয়নযন্ত্র সরবরাহের নির্দেশ (order) দিয়া একখানি পত্র লিখ। ব. বি. '৬৪

৩. তোমার প্রতিষ্ঠান একটি নূতন পণ্য উৎপাদন করিয়াছে। সেই পণ্যের গুণাবলী ও বিক্রয়ের বিশেষ সুবিধাদির কথা উল্লেখ করিয়া একখানি পত্র রচনা কর।

৪. কোন বিদেশী প্রতিষ্ঠানের নিকট কোন যন্ত্রপাতির অংশবিশেষ আমদানি করিতে মনস্থ করিয়াছ। মূল্য ও আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া একখানি পত্র লিখ।

৫. ক্রেতার নিকট হইতে পণ্যের মূল্য জিজ্ঞাসা করিয়া তোমার প্রতিষ্ঠানে একখানি পত্র আসিয়াছে। উহার একখানি উপযুক্ত উত্তর-পত্র রচনা কর।

৬. তোমাদের কলেজ-পত্রিকা প্রকাশনের জন্য কোন বিশেষ মানের কাগজের মূল্য জিজ্ঞাসা করিয়া কাগজ-ব্যবসায়ীর নিকট একখানি পত্র লিখ।

অর্ডার—স্বীকৃতি, সম্পাদন, প্রত্যাখ্যান, বাতিল ও সংগ্রহ সংক্রান্ত পত্র

Letters relating to Confirmation, Execution, Refusal, Cancellation and Collection of Orders.

ষষ্ঠ পর্যায়

পণ্যক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ক্রেতা অর্ডার পাঠান। বিক্রেতা সেই অর্ডারের স্বীকৃতি দান করে পত্র রচনা করেন। আবার অর্ডার সরবরাহের সময় অর্ডার সম্পাদন পত্রও লিখতে হয় বিক্রেতাকে।

এমনি সহজ স্বচ্ছন্দগতিতে বাণিজ্য চলে। কিন্তু সব সময় বাণিজ্য সহজ স্বচ্ছন্দগতিতে চলে না। বিক্রেতা কোন কারণে পণ্য সরবরাহে অক্ষম হলে ক্রেতা সেই অর্ডার প্রত্যাখ্যান করে থাকেন। পণ্য সরবরাহে অতিরিক্ত বিলম্ব হলে ক্রেতা বিরক্ত হয়ে অর্ডার বাতিল করেও পত্র দিতে পারেন। বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান অর্ডার সংগ্রহের জন্য আবার নতুন করে চেষ্টা করতেও পারেন।

উল্লিখিত প্রতিটি পর্বে পত্র লিখিত হয়। এবং পত্রের উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়ে বাণিজ্য গতিলাভ করে।

অর্ডার-স্বীকৃতি পত্ররচনার সময় কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। যেমন, পণ্যের বিবরণ, পণ্যের পরিমাণ, পণ্য-সরবরাহের সময়, পণ্য-সরবরাহের ব্যবস্থা, মূল্য-পরিশোধের সর্ত ইত্যাদি।

অর্ডার-সম্পাদন পত্রে পণ্যের বিবরণ, পরিমাণ, পাকিং-এর বিশেষ ব্যবস্থা এবং মূল্য-শোধের সর্তাদি উল্লেখ করতে হয়।

অর্ডার-প্রত্যাখ্যান পত্রে বিক্রেতাকে অর্ডার-প্রত্যাখ্যানের জন্যে সৌজন্যের খাতিরে একটা কারণ দেখাতে হয়। অবশ্য, বিক্রেতা যে সব সময় কারণ দেখাবার জন্যে বাধ্য, তা নয়। সাধারণতঃ ক্রেতার ব্যবহার বা মূল্য-শোধের বিলম্ব ইত্যাদি বিক্রেতাকে অর্ডার-প্রত্যাখ্যানে বাধ্য করে।

অর্ডার-বাতিল পত্র আসে ক্রেতার পক্ষ থেকে। সাধারণতঃ বিক্রেতার পক্ষ থেকে পণ্য-সরবরাহের বিলম্ব কিংবা বাজারে উক্ত পণ্যের চাহিদা-মন্দা বা মূল্য-হ্রাস ইত্যাদি কারণে ক্রেতা অর্ডার বাতিল করে দিতে বাধ্য হন।

অর্ডার-সংগ্রহ পত্র লেখেন বিক্রেতা-পক্ষ। বিক্রেতার হাতে প্রচুর পণ্য জমে উঠলে তিনি নানা সুবিধাজনক সর্তে পণ্য বিক্রয়ের জন্যে ক্রেতাদের কাছে অর্ডার-সংগ্রহ পত্র লিখে থাকেন।

অর্ডার-স্বীকৃতি পত্র

১ প্রশ্ন। ক্রেতার পক্ষ হইতে তোমার প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুত এক হাজার টাকা মূল্যের ফাউণ্টেন পেনের কালির অর্ডার আসিয়াছে। সরবরাহ দিবার সময়, ব্যবস্থা ও অন্যান্য সর্তাদির কথা উল্লেখ করিয়া একখানি স্বীকৃতি-পত্র রচনা কর।

পত্রাদর্শ ১৭।

সুলেখা কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ (প্রাঃ) লিঃ

[বিখ্যাত ফাউণ্টেন পেনের কালি প্রস্তুতকারক]

টেলিগ্রাম: 'সুলেখা'
টেলিফোন নং: ৪৬-৩৭৫৬

৩৬, রাজা সুবোধ মল্লিক রোড
কলিকাতা: ৩২
২৮শে আগস্ট, ১৯৬৫

ভ্যারাইটি স্টোর্স
৭, গোরক্ষবাসী রোড, দমদম
কলিকাতা: ২৮

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনাদের ২৪শে আগস্ট, ১৯৬৫ তারিখের পত্রের জন্য ধন্যবাদ। আপনারা ১২ গ্রোস্ সুলেখা (বিশেষ) কালির অর্ডার দিয়া আমাদের সহিত কারবারে যে সহযোগিতার স্বাক্ষর রাখিলেন, তাহাতে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

আপনারা জানেন যে, অর্ডারী মাল কলিকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে আমরাই আমাদের নিজস্ব মালবাহী গাড়িতে সরবরাহ করিয়া থাকি এবং সেইজন্য কোনরূপ পরিবহণ-ব্যয় দাবি করা হয় না। মূল্য-শোধের সর্তাদি পূর্ব-পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

মাল আমাদের স্টকে যথেষ্ট আছে। তাহাতে আপনাদের অর্ডার সরবরাহ করিতে আমাদের কোন অসুবিধাই হইবে না। কেবল প্যাকিং-এর জন্য একদিন

সময় লাগিবে। আগামী ৩১শে আগস্ট, বেলা ১২টার মধ্যে আপনারা মাল সরবরাহ পাইবেন।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়

শ্রীযামিনীরঞ্জন ঘোষ

[সুলেখা কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে]

অর্ডার-সম্পাদন পত্র

২ প্রশ্ন। অর্ডার অনুযায়ী মাল সরবরাহ করা হইয়াছে। তদনুযায়ী একখানি অর্ডার-সম্পাদন পত্র রচনা কর।

পত্রাদর্শ ১৮।

বেঙ্গল ট্রেডিং কোং লিঃ

[বিবিধ পণ্যের আমদানিকারক]

টেলিগ্রাম : 'ট্রেড্'
টেলিফোন নং : ৪৬-৮৩৪৭

৩২, পার্ক সাইড রোড
কলিকাতা : ২৬
২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

আর ব্রাদার্স এণ্ড কোং
১৫৭, মাউন্ট রোড
মাদ্রাজ : ২

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনাদের প্রেরিত ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ তারিখের অর্ডার অনুসারে 'নিভা' জল গরম করিবার স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক যন্ত্রের—'ক' শ্রেণীর এক ডজন এবং 'খ' শ্রেণীর এক ডজন—মোট দুই ডজন প্রেরিত হইল।

আমাদের ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ তারিখের পত্রের সর্তেই এই মাল গ্রহণ করা হইয়াছে। উহাতে ২৫% হারে কমিশন প্রদত্ত হইয়াছে এবং মূল্য-শোধের ব্যাপারে প্রথমে এক তৃতীয়াংশ ও অবশিষ্টাংশ ছয় মাসের মধ্যে পরিশোধনীয়।

মাল বিশেষ তত্ত্বাবধানে উত্তম প্যাকিং করা হইয়াছে। সঙ্গে চালানী রসিদ পাঠান হইল। প্যাকিংএর পূর্বে অবশ্য মালগুলি বিশেষ যত্নের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। তথাপি মালের কোন প্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি থাকিলে আমরা ফেরৎ লইতে বাধ্য থাকিব।

আপনাদের অর্ডার ও সর্বপ্রকার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। আশা করি, ভবিষ্যতে অনুরূপ সহযোগিতালাভে বঞ্চিত হইব না।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়
[বেঙ্গল ট্রেডিং কোং লিঃ-এর পক্ষে]

অর্ডার-প্রত্যাখ্যান পত্র

৩ প্রশ্ন। তুমি সাইকেলের কারবার বন্ধ করিয়া দিয়াছ। অর্ডার প্রত্যাখ্যান করিয়া একখানি পত্র লিখ।

পত্রাদর্শ ১৯।

সেণ্ট্রাল ইণ্ডাস্ট্রিজ্ (প্রাঃ) লিঃ
[ঘড়ি, রেডিও ও সাইকেল প্রস্তুতকারক]

টেলিগ্রাম : 'সিল' — ৪, নেতাজী সুভাষ রোড
টেলিফোন নং : ২২-৫১৫২ — কলিকাতা : ১
২৫শে আগস্ট, ১৯৬৫

রঞ্জন স্টোর্স
বেলুড় বাজার
হাওড়া

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনাদের ২০শে আগস্ট, ১৯৬৫ তারিখের অর্ডার পত্রের জন্য ধন্যবাদ। আপনারা উক্ত পত্রে এক ডজন 'স্পীড' সাইকেলের অর্ডার দিয়া আমাদের সহিত কারবারে যে সহযোগিতার স্বাক্ষর রাখিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা চিরদিন আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন অনিবার্য কারণে আমরা গত ছয়মাস হইল, 'স্পীড' সাইকেল উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিয়াছি। কাজেই আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করা আমাদের পক্ষে এক্ষেত্রে সম্ভব হইল না।

আশা করি, ভবিষ্যতে আমরা আমাদের অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য বিষয়ে আপনাদের অর্ডার ও সহযোগিতালাভে বঞ্চিত হইব না।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়

শ্রীআব্দুল খালেক চৌধুরী

[সেণ্ট্রাল ইণ্ডাস্ট্রিজ্ (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে]

অর্ডার-বাতিল পত্র

৪ প্রশ্ন। তোমার অর্ডারের মাল প্রেরণে বিক্রেতা-প্রতিষ্ঠানের অত্যধিক বিলম্ব হইতেছে। অর্ডার বাতিল করিয়া একখানি পত্র রচনা কর।

পত্রাদর্শ ২০।

ইস্টার্ন ট্রেডার্স্ লিঃ

[যাবতীয় অর্ডার সরবরাহকারক]

টেলিগ্রাম : 'ইস্ট' ৩৩৯, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড

টেলিফোন নং : ৪৬-৪৩৮৯ কলিকাতা : ৪৭

৩রা জুন, ১৯৬৫

ন্যাশন্যাল রবার কোং লিঃ

২০, চৌরঙ্গী,

কলিকাতা : ১৩

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

গত ১৩ই এপ্রিল, ১৯৬৫ তারিখে আমরা দুই ডজন ২৪ নং সাইকেল টায়ারের অর্ডার দিয়া আপনাদের নিকট পত্র লিখিয়াছিলাম। আপনারাও আপনাদের ১৫ই এপ্রিলের পত্রে উক্ত অর্ডার প্রাপ্তির কথা স্বীকার করিয়াছিলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, অদ্যাবধি আপনাদের মাল বা কোনরূপ পত্র আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছায় নাই। আমাদের অর্ডার পত্রে স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছিল যে ৩০শে এপ্রিল, ১৯৬৫ তারিখের পরে মাল প্রেরিত হইলে উক্ত মাল গ্রহণে আমরা বাধ্য থাকিব না।

আমাদের পত্রে বিশেষভাবে উল্লিখিত সেই তারিখ অতিক্রান্ত হইয়াছে। তথাপি আপনাদের মাল আসিয়া উপস্থিত হইল না। এরূপ অবস্থায় আমরা আমাদের প্রদত্ত অর্ডার বাতিল করিয়া দিতে বাধ্য হইলাম। বলাবাহুল্য, অতঃপর মাল পৌঁছিলে আমরা উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিব না। পত্রোত্তরে আপনারা যদি যথাযথ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি না দেন, ভবিষ্যতে অর্ডার প্রেরণে আমরা বিরত থাকিব।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে, ইতি—

ভবদীয়

শ্রীপ্রীতিরঞ্জন পাল

[ইস্টার্ন ট্রেডার্স্ লিঃ-এর পক্ষে]

অর্ডার-সংগ্রহ পত্র

৫ প্রশ্ন। তুমি কোন বিদেশী পণ্য আমদানির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছ। অর্ডার আহ্বান করিয়া কোন ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের নিকট একখানি পত্র রচনা কর।

পত্রাদর্শ-২১।

সুর নিয়োগী এণ্ড কোং

[যাবতীয় অর্ডার সরবরাহকারী]

টেলিগ্রাম: 'সুনিকো'
টেলিফোন নং: ২২-৫২৯৪

৬, রাজা উডমণ্ট স্ট্রীট
কলিকাতা: ১
৭ই মার্চ, ১৯৬৫

বসুমিত্র এণ্ড কোং
৭৭, গড়িয়াহাট রোড
কলিকাতা: ১৯.

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনারা দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের সহিত যে সহযোগিতা করিয়া আসিতেছেন, তাহার জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আমরা সম্প্রতি যুগোশ্লাভিয়ার একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তিক্রমে নলকূপের ফিল্টার ইত্যাদি মূল্যবান যন্ত্রপাতি আমদানির ব্যবস্থা করিয়াছি। আমাদের দেশের মৃত্তিকায় ও জলবায়ুতে এই ফিল্টার অত্যন্ত কার্যকরী ও দীর্ঘস্থায়ী হইবে। ইহাতে বহু পুনর্স্থাপন ব্যয় বাঁচিয়া যাইবে।

আমরা বিষয়টির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উপযোগিতার তুলনায় ইহার মূল্য অতি অল্প। আশা করি, আপনাদের অর্ডার ও সহযোগিতালাভে আমরা বঞ্চিত হইব না।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়

শ্রীধর্মদাস সুর

[সুর নিয়োগী এণ্ড কোং-র পক্ষে]

অনুসরণী ৬

১. তোমার প্রতিষ্ঠানের নিকট দুই হাজার টাকা পণ্যের অর্ডার আসিয়াছে। আনুষঙ্গিক সর্তে মাল প্রেরণের সম্মতি জানাইয়া একখানি পত্র রচনা কর।

২. অর্ডার অনুযায়ী মাল পাঠাইতেছ। তদনুযায়ী একখানি অর্ডার সম্পাদন পত্র রচনা কর।

৩. অর্ডার অনুযায়ী তোমার গুদামে মাল মজুত নাই। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাল প্রেরণের অসামর্থ্যের কথা জানাইয়া একখানি পত্র রচনা কর।

৪. তুমি যে মাল চাহিয়া অর্ডার দিয়াছিলে বাজারে তাহার মূল্য-হ্রাস ঘটিয়াছে এবং তাহাতে তোমার সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। অর্ডার বাতিল করিয়া একখানি পত্র লিখ।

৫. তোমার প্রতিষ্ঠানের জনৈক পুরাতন ক্রেতা দীর্ঘদিন ধরিয়া তোমাদের নিকট কোন অর্ডার দিতেছেন না। সত্বর অর্ডার পাঠাইবার অনুরোধ করিয়া একখানি পত্র রচনা কর।

৬. ক্রেতা প্রতিষ্ঠান যে হারে কমিশন দাবি করিয়াছে এবং যেভাবে মূল্য শোধ করিতে চাহিয়াছে তাহাতে তোমার অসামর্থ্যের কথা জানাইয়া একখানি অর্ডার প্রত্যাখ্যান পত্র রচনা কর।

আদায়, দাবী, ক. বি. '৫৮, '৬০, '৬২, '৬৪, '৬৫, ব. বি. '৬৪ অভিযোগ ব. বি. '৬২ ও মীমাংসা সংক্রান্ত পত্র

Letters relating to collections, claims, complaints, and Adjustments.

সপ্তম পর্যায়

এই পর্যায়টি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, তা বুঝিয়ে বলবার আর কোন প্রয়োজন নেই। প্রতি এক বছর অন্তর এই পর্যায় থেকে একটি করে প্রশ্ন এসেছে। কাজেই এই পর্যায়ের দাবী ও অভিযোগ সংক্রান্ত পত্রগুলি মনোযোগ সহকারে পড়া এবং অনুশীলন করা দরকার। কেবল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ও এই পর্যায়ে গুরুত্ব আরোপ করছেন।

আদায়-সংক্রান্ত পত্র বিক্রেতা-প্রতিষ্ঠান লেখেন ক্রেতা-প্রতিষ্ঠানের কাছে। মূল্যশোধের তারিখের মধ্যে ক্রেতা-প্রতিষ্ঠান মূল্য পরিশোধ না করলে বিক্রেতা-প্রতিষ্ঠান এরূপ পত্র লিখতে বাধ্য হন। এইরূপ পত্রের আর এক নাম তাগাদা পত্র বা তাগিদ পত্র। এই তাগাদা পত্রের ভাষা সৌজন্যপূর্ণ হওয়া উচিত। প্রথম তাগাদা পত্রেই আইনের আশ্রয় নেবার কথা উল্লেখ না করাই শ্রেয়। কিন্তু একাধিক তাগাদা পত্র প্রেরণের পরেও যদি ক্রেতা-প্রতিষ্ঠান নিশ্চেষ্ট থাকেন. তবে তাছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

দাবী-সংক্রান্ত পত্রের গুরুত্বের কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। চালানী মাল চুক্তি-অনুযায়ী কখনও প্রেরিত হয় বিক্রেতার দায়িত্বে, কখনও প্রেরিত হয় ক্রেতার দায়িত্বে। প্রেরিত মাল অনেক সময় পরিবহণ-কর্তৃপক্ষের হেপাজাত থেকে চুরি হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, কিংবা মাল এসে পৌছোতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হয়। রেল-কর্তৃপক্ষ, ডাক-বিভাগ, মোটর-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ, বিমান-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ বা জাহাজী-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ মাল পরিবহণ-কালে মালের সকল দায়িত্বই গ্রহণ করে থাকেন। কাজেই তাঁদের দায়িত্বে মাল ক্ষতিগ্রস্ত হলে, অপহৃত হলে কিংবা মাল পৌছোতে বিলম্ব হলে, তাঁরা চুক্তি-অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য থাকেন। কিন্তু ক্ষতিপূরণ দাবী করবেন কে? ক্রেতা পক্ষ, না বিক্রেতা পক্ষ? পরীক্ষার্থীরা অনেক সময় এই প্রশ্নে

ভুল করে থাকে। কাজেই প্রশ্নের অর্থটি ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। প্রশ্নের ভাষা থেকে বুঝে নিতে হবে মাল কার দায়িত্বে প্রেরিত হয়েছিল—ক্রেতার, না বিক্রেতার। তারপর সেই মতো পত্র রচনা করতে হয়। সাধারণতঃ মালগ্রহণ করবার সময় কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য করতে হয়: প্যাকিং খোলা কিংবা ভাঙ্গ হয়েছে কিনা; প্যাকিং-এর মধ্যে মাল চালানের হিসাব অনুযায়ী আছে কিনা। যদি তা না থাকে, যদি মাল চালানের হিসাবের চেয়ে কম থাকে, তবে চালানে স্থানীয় দায়িত্বশীল কর্মচারীর স্বাক্ষর এবং গৃহীত মালের পরিমাণ লিখিয়ে নিতে হয়। পরে সেই চালান বা চালানের অনুলিপি-সহ ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করতে হয়। আবেদন পত্রে ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখ করতে হয়। অবশ্য ক্ষতিপূরণ দাবীর জন্যে বিভিন্ন পরিবহণ সংস্থায় প্রপত্রের (form) ব্যবস্থা আছে। তা পূরণ করে আবেদন পত্রের সঙ্গে প্রেরণ করতে হয়।

অভিযোগ পত্রের আর এক রূপ হলো প্রতিবাদ পত্র। প্রতিবাদ পত্রের বা অভিযোগ পত্রের লেখক হলেন ক্রেতা-পক্ষ। বিক্রেতার প্রেরিত মাল ত্রুটিযুক্ত হলে কিংবা নিম্নমানের হলে ক্রেতাপক্ষ অভিযোগ পত্র লিখে থাকেন। অনেক সময় মাল ফেরৎ পাঠান বা পরিবর্তরূপে অন্য মাল গ্রহণের প্রস্তাব রাখেন। আবার অনেক সময় বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মচারী ক্রেতার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলেও অভিযোগ পত্র লিখিত হয়। সরকারী রেলবিভাগ, ডাক ও তার বিভাগ, পরিবহণ-বিভাগ বা অন্য কোন বিভাগ ক্রেতার সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করলেও অভিযোগ পত্র লিখিত হতে পারে।

সর্বশেষ স্তর হলো মীমাংসাপত্র। পত্র ও পত্রোত্তরের বাদানুবাদের ওপর যবনিকাপাত করে মীমাংসা পত্র একটা সদিচ্ছার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে। মীমাংসার সর্ত উপস্থাপিত করতে পারেন ক্রেতা ও বিক্রেতা—উভয় পক্ষই। কাজেই মীমাংসাপত্র ক্রেতা ও বিক্রেতা—উভয় পক্ষ থেকেই লিখিত হতে পারে।

আদায় পত্র

১ প্রশ্ন। চুক্তি অনুযায়ী মূল্য শোধের তারিখ অতিক্রান্ত হইয়াছে। আগামী একমাসের মধ্যে মূল্য শোধ করিবার জন্য নির্দেশ দিয়া ক্রেতার নিকট একখানি পত্র লিখ।

—এই ঠিকানায় প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উহা অদ্যাবধি উল্লিখিত ঠিকানায় গিয়া পৌঁছায় নাই। এতদিনেও যখন উহা মাল-প্রাপকের নিকট গিয়া পৌঁছিল না, তখন উহা যে খোয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ কি?

চুক্তি অনুযায়ী এই মাল আপনাদের দায়িত্বে প্রেরিত হইয়াছিল। কাজেই ক্ষতি-পূরণের দায়িত্ব যে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ কর্তৃপক্ষের, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

চালানপত্র অনুসারে এই মালের মূল্য ৯৬০৲ (নয় শত ষাট) টাকা। কমিশন বাদ দিয়া ৮৪০৲ (আট শত চল্লিশ) টাকা। আমরা এই সঙ্গে মালের চালানপত্র পাঠাইলাম।

আশা করি, সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া ক্ষতিপূরণ বাবদ আমাদের প্রাপ্য অর্থ সত্বর পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলে বাধিত হইব।

নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীমোহিনীমোহন কাঞ্জিলাল
[জুবিলি রেডিও এণ্ড কোং-র পক্ষে]

অভিযোগ-পত্র

৭ প্রশ্ন। তুমি একটি বিদেশী কোম্পানীর নিকট অগ্রিমসহ যে মালের অর্ডার দিয়াছিলে, তাহা সরবরাহ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা নিম্নমূল্যের। উদ্বৃত্ত অর্থ ফেরৎ পাঠাইবার অনুরোধ করিয়া কোম্পানীর নিকট পত্র লিখ।

৮ প্রশ্ন। একখানি ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রে নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলির বাংলা প্রতিশব্দগুলিকে প্রাসঙ্গিকভাবে ব্যবহার কর :—

Advance ; balance ; ceiling price ; demurrage ; indemnity.

গৌ. বি. '৬৫

[এই ধরনের পত্রে ছাত্রদের কল্পনাশক্তি ও চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শব্দগুলির সঠিক প্রতিশব্দ জানা চাই এবং সেই শব্দগুলি সহযোগে একটি চিঠির পরিকল্পনা গড়ে তুলতে হবে। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরনের পত্র রচনার নির্দেশ এসেছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও এ ধরনের পত্র রচনার নির্দেশ আসা অসম্ভব নয়।]

পত্রাদর্শ ২৬।

নিউ ইণ্ডিয়া কট্‌ন্ ফ্যাব্রিক্‌স্ (প্রাঃ) লিঃ
[উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুতকারক]

টেলিগ্রাম : 'ফ্যাব্রিক্‌স্'
টেলিফোন নং : ২২-৪২৭৮
আমদানি লাইসেন্স নং : ইণ্ডিয়া /৩২৩/৬৫-৬৬

১২, মঙ্গো লেন
কলিকাতা : ১
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

স্মিথ বসির এণ্ড কোং
৬, নাসের এভিন্যু,
কায়রো
মিশর

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আমাদের গত ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫-তারিখের অর্ডার অনুযায়ী আপনাদের তুলা প্রথম শ্রেণীর তূলা পাঠাইতে অনুরোধ করা হইয়াছিল, তাহার প্রত্যুত্তরে আপনারা ভুলক্রমে ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে দ্বিতীয় শ্রেণীর তূলা পাঠাইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছি যে, প্রথম শ্রেণীর তূলার মূল্যের হিসাবে ৫০ শতাংশ মূল্য **অগ্রিম (advance)** প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু যে তূলা আপনারা সরবরাহ করিয়াছেন, তাহার **সর্বোচ্চ মূল্যও (ceiling price)** চলতি বাজারে আমাদের অগ্রিম প্রদত্ত অর্থের ১০ শতাংশ কম।

এই বিতর্কমূলক পরিস্থিতিতে আমরা মাল সরবরাহ লইতে পারিতেছি না। কাজেই আপনাদের প্রেরিত তূলার দ্বিতীয় শ্রেণীর মালের মূল্য গ্রহণ করিতে আপনারা রাজী আছেন কিনা এবং রাজী থাকিলে আমাদের **উদ্বৃত্ত (balance)** অর্থ প্রেরণের জন্য প্রস্তুত আছেন কিনা জানাইলে আমরা মাল সরবরাহ গ্রহণে অগ্রসর হইব।

কিন্তু মাল সরবরাহ গ্রহণে এই বিলম্বের জন্য **বিলম্ব-শুল্ক (demurrage)** আপনাদের দিতে হইবে এবং বন্দরে মাল ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তাহার **ক্ষতিপূরণও (indemnity)** আপনাদের দিতে হইবে।

[illegible] নির্দেশ আসিলে সেইমত ব্যবস্থা করা হইবে।

৫. দিল্লী হইতে কলিকাতায় তোমার ঠিকানায় বিমানযোগে প্রেরিত কিছু মাল দুর্ঘটনায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া বিমান কর্তৃপক্ষের নিকট একখানি আবেদনপত্র রচনা কর।

৬. জাহাজযোগে বিদেশ হইতে তোমার চালানী মাল ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া জাহাজ-কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র লিখ।

৭. তুমি যে মালের অর্ডার দিয়াছিলে, তাহা ত্রুটিযুক্ত হওয়ায় বিক্রেতা-প্রতিষ্ঠানের নিকট সেই বিষয়ে অভিযোগ করিয়া একখানি পত্র লিখ।

৮. উৎপাদক কোম্পানীর মাল খারাপ বলিয়া তুমি গ্রহণ কর নাই। কোম্পানী তোমার কাছে মালের দাম চাহিয়াছে। টাকা না দিবার উপযুক্ত কারণ দেখাইয়া কোম্পানীর পত্রের উত্তর দাও। ক. বি. '৬৫

এজেন্সী বা কারপরদাজী সংক্রান্ত পত্র

ক. বি. '৫৭, '৬২ ব. বি. '৬৩

Letters relating to Agency.

অষ্টম পর্যায়

উৎপাদক বা বড ব্যবসায়ী কোন প্রতিষ্ঠানকে তাঁদের পণ্য বিক্রয়ের এজেন্সী দেন। এজেণ্টগণ খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে সেই পণ্য বিক্রয় করে থাকেন। তার বিনিময়ে এজেণ্টরা একটা কমিশন লাভ করেন।

এজেন্সী সংক্রান্ত পত্র ব্যবসায়ী ও এজেণ্ট --উভয় পক্ষ থেকেই লিখিত হতে পারে। এজেণ্ট এজেন্সী প্রার্থনা করে পত্র লিখতে পারেন; আবার ব্যবসায়ী তেমনি এজেন্সী প্রদানপত্রও রচনা করতে পারেন।

এজেন্সী প্রার্থনা-পত্রে কতকগুলি বিষয় উল্লিখিত হওয়া প্রয়োজন। যেমন, স্থানীয় বাজারে সংশ্লিষ্ট পণ্যের চাহিদার প্রাচুর্য, আবেদনকারীর আর্থিক সংগতি কতখানি নির্ভরযোগ্য, পূর্ব অভিজ্ঞতা ও বিক্রয়শিল্পে নৈপুণ্য, পণ্য-প্রচারের সুযোগসুবিধা, কমিশনের স্বল্পতা এবং পরিচয়-সূত্র ইত্যাদি।

তাছাড়া ব্যবসায়ীর পক্ষ থেকে যে সব বিষয়ে পত্র লিখিত হতে পারে, সেগুলি হলো: বিক্রয়-হ্রাসের কারণ অনুসন্ধান, নিম্নমূল্যে পণ্যবিক্রয়ের নির্দেশ, ব্যাপকতর প্রচারের নির্দেশ ইত্যাদি। এজেণ্টের পক্ষ থেকে যে সব বিষয়ে পত্র লিখিত হতে পারে, সেগুলি হলো: পণ্যমালের অপকর্ষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ, বাজারে চাহিদা হ্রাসের দরুন মূল্য-হ্রাসের অনুরোধ, পণ্য ফেরত দেবার প্রস্তাব, ক্ষতিগ্রস্ত মালের পরিমাণসহ স্বল্পমূল্যে বিক্রয়ের প্রস্তাব, ব্যাপকতর প্রদর্শনীর ব্যবস্থার জন্যে অনুরোধ ইত্যাদি।

এজেন্সী প্রার্থনা

●১ প্রশ্ন। ব্রিটেনের একটি প্রসিদ্ধ পুস্তক-ব্যবসায়ীর সঙ্গে কারবারের উদ্দেশ্যে তোমার অভিপ্রেত ও সামর্থ্য জানাইয়া একটি পত্র রচনা কর। ক. বি. '৫৭

●২ প্রশ্ন। বিদেশী কারবারের এজেন্সী লইবার উদ্দেশ্যে সেই কারবারের কর্তৃপক্ষকে নিজের ব্যবসায়ের বিবরণ দিয়া পত্র লিখ। ক. বি. '৬২

কিন্তু যে পরিমাণ অর্থ আপনাদের ব্যাঙ্কে আমার হিসাবে জমা আছে, তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অল্প।

আপনাদের সঙ্গে আমার টাকাকড়ির লেনদেনগত সম্পর্ক অনেক দিনের। সেই সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়া আপনাদের নিকট আমার প্রয়োজনীয় ২৫,০০০৲ (পঁচিশ হাজার টাকা) জমাতিরিক্ত ঋণ দানের জন্য অনুরোধ জানাইতেছি। অবশ্য তজ্জন্য আমি ১ লক্ষ টাকা মূল্যের শেয়ার আপনাদের নিকট গচ্ছিত রাখিতেছি। শেয়ারগুলির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১.	ওরিয়েণ্টাল মেশিনারী লিঃ	২৫,০০০৲
২.	সেঞ্চুরী সুগার মিল্‌স্ লিঃ	৫০,০০০৲
৩.	গ্লোব স্টীল্‌স্ লিঃ	২৫,০০০৲
	মোট	১,০০,০০০৲

পত্রোত্তরে আপনাদের অভিমত জানাইলে আমরা সেইমত অগ্রসর হইব। আশা করি, অনুকূল পত্র দিয়া বাধিত করিবেন।

নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীমণীশচন্দ্র মজুমদার

বীমা সংক্রান্ত পত্র

ব. বি. '৬২

৪ প্রশ্ন। ভারতীয় বীমা নিগমের নিকট বীমাপত্র বন্ধক রাখিয়া তুমি ঋণ লইতে ইচ্ছুক; কি শর্তে, কত দিনের মধ্যে, কত ঋণ লইতে পার, জানিতে চাহিয়া কার্যাধ্যক্ষের নিকট একখানি পত্র লিখ। ব. বি. '৬২

পত্রাদর্শ ৩২।

টেলিফোন নং : ৪৬-৩২১৩

৭, গড়িয়াহাট রোড
কলিকাতা : ৩২
২৫শে নভেম্বর, ১৯৬৫

কার্যাধ্যক্ষ,
ভারতীয় বীমা নিগম
সিটি শাখা, ইউনিট সংখ্যা ৭
৬৪, গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা : ১

বীমাপত্র সংখ্যা—৮৫৩২১০

সবিনয় নিবেদন,

নারিকেল কাতান শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনার বিষয় অবগত হইয়া আমি একটি কাতান-শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছি। এইরূপ একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের

জন্য প্রায় ৩০,০০০৲ (ত্রিশ হাজার) টাকা চল্‌তি মূলধন দরকার। কিন্তু আমার হাতে মাত্র ৬০,০০০৲ (ষাট হাজার) টাকার বীমাপত্র আছে।

আমি উক্ত বীমাপত্র আপনাদের নিকট বন্ধক রাখিয়া আমার প্রয়োজনীয় মূলধন ঋণ গ্রহণ করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছি। কুড়ি বৎসরের মেয়াদী এই বীমাপত্রের দশ বৎসরের চাঁদা প্রদত্ত হইয়াছে। এমতাবস্থায় কি সর্তে, কতদিনের মধ্যে এবং কত পরিমাণ অর্থ আপনাদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারি, জানাইলে বাধিত হইব।

আপনাদের নিকট হইতে সত্বর উত্তর প্রত্যাশা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক

শ্রীপ্রসূনকান্তি সরকার

৫ প্রশ্ন। কাল রাতে অগ্নিকাণ্ডের ফলে তোমার কারখানা-গৃহটি ভস্মীভূত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ জানাইয়া অগ্নিবীমা কর্তৃপক্ষের নিকট একখানি ক্ষতিপূরণ দাবীপত্র রচনা কর।

পত্রাদর্শ ৩৩।

নিউ প্রাইমা ইলেকট্রিক্যাল্ কোং (প্রা) লিঃ

[প্রসিদ্ধ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম উৎপাদক]

টেলিগ্রাম : 'প্রাইমা'
টেলিফোন নং : ৪৬-৪৬৪৫

৩২, গুরুসদয় দত্ত রোড
কলিকাতা : ১৯
১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৬৫

কার্যাধ্যক্ষ,
রুবী জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ
"ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ"
ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা : ১

অগ্নি-বীমাপত্র সংখ্যা—খ/৩২৪৫

সবিনয় নিবেদন,

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গতকাল রাত্রি ২টার সময় আমাদের ৩২, গুরুসদয় দত্ত রোড, কলিকাতা : ১৯-ঠিকানাস্থিত উল্লিখিত অগ্নিবীমা সম্পাদিত কারখানা গৃহটি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়াছে।

কারখানায় রাত্রিকালীন কার্যধারা অব্যাহত গতিতে চলিতেছিল। হঠাৎ কারখানার উত্তর-পূর্বকোণে আগুন ধরিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিশিখা উত্থিত হইতে থাকে। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া আমরা অগ্নি-নির্বাপক বাহিনীতে সংবাদ দিই এবং দশ মিনিটের মধ্যেই তাঁহারা আসিয়া অগ্নি-নির্বাপনের চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু পঞ্চাশ মিনিটের অক্লান্ত চেষ্টায় তাঁহারা অফিস ঘরটি ছাড়া অন্য কিছুই রক্ষা করিতে পারেন নাই।

অগ্নি-নির্বাপক বিশেষজ্ঞের মতে, বৈদ্যুতিক তারের ত্রুটি হইতেই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছে। অথচ গতকাল সকালেই বৈদ্যুতিক-তার বিশেষজ্ঞের সাহায্যে সমস্ত লাইন পরীক্ষা করান হইয়াছিল। তিনি সাপ্তাহিক রিপোর্টে ইহা ত্রুটিহীন বলিয়া ঘোষণা করিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন।

অদ্যকার প্রায় সকল দৈনিক পত্রিকাতে এই দুর্ঘটনার সংবাদ আলোকচিত্র সমেত প্রকাশিত হইয়াছে। আপনারা তাহা নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবেন।

এই দুর্ঘটনার ফলে কেহ হতাহত হয় নাই। তবে আমাদের লক্ষাধিক টাকা মূল্যের সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অফিস ঘরে রক্ষিত হিসাবের খাতাপত্র সমস্তই রক্ষা পাইয়াছে। সে সমস্ত হইতে ক্ষতির পরিমাণ আপনারা স্থির করিয়া লইতে পারিবেন।

পত্রপাঠ অনুগ্রহপূর্বক আপনাদের দুর্ঘটনা-পরিদর্শক মহাশয়কে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনের জন্য পাঠাইবেন, এবং সেই সঙ্গে আমাদের প্রয়োজনীয় প্রপত্রাদি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীচিরায়ুষ্মান চৌধুরী
[নিউ প্রাইমা ইলেক্ট্রিক্যাল্ কোং (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে]

৬ প্রশ্ন। তোমার নৌবীমা সম্পাদিত মাল জাহাজযোগে আমষ্টারডাম হইতে আসিবার কালে সমুদ্রপথে নৌ-দুর্ঘটনায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া নৌবীমা কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র লিখ।

পত্রাদর্শ ৩৪।

দত্তত্রয় কেমিক্যাল্ ইণ্ডাস্ট্রীজ্ (প্রা) লিঃ

[রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদক ও আমদানীকারক]

টেলিগ্রাম : 'দত্তত্রয়' ৫, এস. এন. ব্যানার্জী রোড

টেলিফোন নং : ২৪-৭৮৯১ কলিকাতা : ১৪

২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৬৫

কার্যাধ্যক্ষ,
দি সাউথ ব্রিটিশ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ
সাউথ ব্রিটিশ বিল্ডিং,
১০, নেতাজী সুভাষ রোড
কলিকাতা : ১

নৌবীমাপত্র সংখ্যা—৫৬৩২

সবিনয় নিবেদন,

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫-তারিখে আপনাদের নিকট নৌবীমাকৃত এবং ১লা নভেম্বর, ১৯৬৫-তারিখে আমস্টারডাম হইতে "কাবেরী" জাহাজযোগে প্রেরিত আমাদের সমুদয় মাল ২১শে নভেম্বর, ১৯৬৫-তারিখে আরব সাগরে নৌ-দুর্ঘটনায় বিনষ্ট হইয়াছে। সংবাদপত্রে "কাবেরী" জাহাজের ভয়াবহ দুর্ঘটনার কথা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। ইহাতে আমাদের কলিকাতা অফিসের ঠিকানায় আপনাদের নিকট বীমাকৃত এক টন ওজনের রসায়নিক দ্রব্য প্রেরিত হইয়াছিল।

আমাদের প্রেরিত এই মাল আপনাদের নিকট বীমা-সম্পাদিত ছিল। এই মালের মূল্য ১,২০,০০০৲ (এক লক্ষ কুড়ি হাজার) টাকা। ইহার সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে।

আপনারা পত্রপাঠ সিন্ধিয়া নেভিগেশন কোং-র কলিকাতাস্থিত অফিসের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া আমাদের বিনষ্ট মালের ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করিয়া বাধিত করিবেন।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক

শ্রীমহিম রঞ্জন দত্ত

[দত্তত্রয় কেমিক্যাল্ ইণ্ডাস্ট্রীজ্ (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে]

অনুসরণী ৯

১. কাস্টম্‌স্ হইতে মাল খালাস করিবার জন্য তোমার ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ চাহিয়া একটি পত্র রচনা কর। ক. বি. '৫৯

২. একটি নূতন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাঙ্ক হইতে টাকার দাদন চাহিয়া ও ব্যবসায়ের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করিয়া ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের নিকট একটি আবেদনপত্র লিখ। ক. বি. '৬২

৩. ব্যাঙ্কে তোমার হিসাবে উপযুক্ত পরিমাণ টাকা থাকা সত্ত্বেও তোমার একখানি চেক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। এই বিষয়ে অভিযোগ করিয়া ও কারণ জানিতে চাহিয়া ম্যানেজারের নিকট একখানি পত্র লিখ। ব. বি. '৬১

৪. তোমার বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণকল্পে ব্যাঙ্ক হইতে টাকার দাদন চাহিয়া ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের নিকট একটি আবেদনপত্র লিখ। ব. বি. '৬৩

৫. কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার কথা চিন্তা করিতেছেন। একটি ব্যাঙ্কের পরিচালক হিসাবে এই নীতির অশুভ ফল প্রতিপন্ন করিয়া একটি স্মারকপত্র (memorandum) রচনা কর। ক. বি. '৬৪

[প্রচার ও জনসংযোগ সংক্রান্ত পত্র—৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

৬. কোন কোম্পানীর শেয়ার মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। উক্ত শেয়ার কিছু ক্রয়ের নির্দেশ দিয়া তোমার ব্যাঙ্কের নিকট একখানি পত্র লিখ।

৭. নূতন ব্যবসায় স্থাপনকল্পে তোমার বীমাপত্র গচ্ছিত রাখিয়া ঋণ দিবার অনুরোধ করিয়া বীমাকর্তৃপক্ষের নিকট একখানি পত্র লিখ।

৮. তোমার প্রতিষ্ঠানের অগ্নি-বীমাকৃত একটি লরী এঞ্জিনে আগুন লাগিয়া ভস্মীভূত হইয়াছে। অগ্নিবীমা প্রতিষ্ঠানের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া একখানি আবেদন-পত্র রচনা কর।

৯. "গঙ্গা" জাহাজযোগে তোমার নৌবীমাকৃত কিছু মাল লণ্ডন হইতে ভারতে আসার পথে নৌ-দুর্ঘটনায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া নৌবীমা কর্তৃপক্ষের নিকট একখানি পত্র লিখ।

১০. তোমার কারখানা গৃহটির অগ্নিবীমা করাইবে। অগ্নিবীমা কর্তৃপক্ষকে তোমার উদ্দেশ্য জানাইয়া একখানি পত্র রচনা কর।

রপ্তানি ও আমদানি সংক্রান্ত পত্র

ক. বি. '৫৭, '৬২

Letters relating to Export and Import.

দশম পর্যায়

ভারতের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্য আজ ক্রমপ্রসারমান। কাজেই রপ্তানি-আমদানি সংক্রান্ত পত্রের গুরুত্বও ক্রমবর্ধমান। তবে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ার-ভুক্ত হওয়ায় আমদানি-রপ্তানি ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের আমদানি-অনুমতি (license) ও রপ্তানি-অনুমতি গ্রহণ করতে হয়। কাজেই আমদানি-রপ্তানি পত্রে আমদানি বা রপ্তানি লাইসেন্স নং উল্লেখ করতে হয়।

আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত পত্র রচনাকালে কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন। যেমন—এক, ভারত সরকারের সঙ্গে কোন দেশ যে সকল পণ্যের ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ, কেবলমাত্র সেই দেশের সঙ্গে এবং সেই সকল পণ্যের ব্যাপারে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য চলতে পারে। দুই, আমদানি-রপ্তানি অনুমতি সংখ্যা (License No) উল্লেখ করতে হয়। তিন, কোন বিনিময় ব্যাঙ্ক (Exchange Bank) বা ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট থেকে সংশ্লিষ্ট দেশের বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যেতে পারে।

এই সকল পত্র সংক্ষিপ্ত এবং বাহুল্য-বর্জিত হওয়া উচিত। এই সব পত্রের যে গুণটি সবচেয়ে বড়ো, তা হলো সৌজন্যবোধ।

১ প্রশ্ন। কোনও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে তুমি কিছু যন্ত্রপাতির আমদানি করিতে ইচ্ছুক। ভারতের উন্নয়নমূলক কাজে উক্ত যন্ত্রপাতির যথেষ্ট প্রয়োজন আছে—এই যুক্তিতে আমদানির অনুমতি (license) চাহিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রকের নিকট একখানি পত্র লিখ।

পত্রাদর্শ ৩৫।

মেশিন এণ্ড টুল্‌স্ (প্রা) লিঃ

[যন্ত্রপাতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান]

টেলিগ্রাম : 'টুল্‌স্'

টেলিফোন নং : ২৩-৪৫৬৭

'উইমেট হাউস'

৭, রাসেল স্ট্রীট

কলিকাতা : ১৬

২০শে অক্টোবর, ১৯৬৫

সচিব,

বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রক,

ভারত সরকার

নয়াদিল্লী

সবিনয় নিবেদন,

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের উন্নয়নমূলক কাজে সাফল্যের সহিত অংশ গ্রহণ করিতে পারায় আমরা নিজেদের ধন্য মনে করিতেছি। এখন ভারতের কৃষি উন্নয়নের জন্য ট্রাক্‌টারের উপযোগিতা কতখানি, তাহা বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন।

আমরা বিলাতের একটি প্রতিষ্ঠান হইতে ট্রাক্‌টারের কয়েকটি অংশ-বিশেষ ভারতে আমদানি করিতে মনস্থ করিয়াছি। ভারতের প্রস্তুত অন্যান্য অংশগুলির সহিত উক্ত বিলাতী অংশগুলি সংযোজিত করিয়া উৎকৃষ্ট ট্রাক্‌টার নির্মাণ করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, আমরা যে অংশগুলি বিলাত হইতে আমদানি করিতে মনস্থ করিয়াছি, সেগুলি ভারতে অল্প পরিমাণেই প্রস্তুত হয় এবং তাহার মানও নিকৃষ্ট। সেইজন্য উল্লিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমরা বাধ্য হইয়াছি।

এই ব্যাপারে আমাদের এক লক্ষ টাকা মূল্যের স্টার্লিং মুদ্রার প্রয়োজন হইবে। এই লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রার দ্বারা ভবিষ্যতে বহু লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হইবে, ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আশা করি, ভারতের উন্নয়নমূলক কাজে যোগদানে আমাদের সহায়তা করিবার জন্য উক্ত যন্ত্রপাতিগুলি আমদানি করিবার অনুমতি দান করিয়া এবং উল্লিখিত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর করিয়া বাধিত করিবেন।

নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক

শ্রীধ্রুবজ্যোতি গুপ্ত

[মেশিন এণ্ড টুল্‌স্ (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে]

২ প্রশ্ন। বিলাতে একটি প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে তুমি কিছু যন্ত্রপাতি ভারতে আমদানি করিতে ইচ্ছুক। তোমার অভিপ্রায়, সামর্থ্য এবং সর্তাদি জানাইয়া একখানি পত্র লিখ।

পত্রাদর্শ ৩৬।

মেশিন এণ্ড টুল্‌স্ (প্রা) লিঃ
[যন্ত্রপাতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান]

টেলিগ্রাম : 'টুল্‌স্'
টেলিফোন নং : ২৩-৪৫৬৭

'উইমেট হাউস'
৭, রাসেল স্ট্রীট
কলিকাতা : ১৬
১লা ডিসেম্বর, ১৯৬৫

জোন্স এণ্ড উইলিয়ম্‌স্ লিঃ
২৮, বেডফোর্ড স্কোয়ার
লণ্ডন
যুক্তরাজ্য

আমদানি-অনুমতিপত্র সংখ্যা : গ/২৩০১/ইণ্ডিয়া ৬৫-৬৬

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

ভারতের উন্নয়নমূলক কাজে এখন ট্রাক্‌টারের বিশেষ চাহিদা দেখা দিয়াছে। অথচ ভারতে এখনও ট্রাক্‌টারের সমুদয় অংশ নিখুঁতভাবে উৎপাদন করা সম্ভব হয় নাই। ভারতের বাজারে এখন আপনাদের উৎপন্ন ট্রাক্‌টারের বিশেষ চাহিদা আছে।

তাই আমরা আপনাদের উৎপন্ন ট্রাক্‌টারের কয়েকটি বিশেষ অংশ ভারতে আমদানি করিতে মনস্থ করিয়াছি। নিম্নে অংশগুলির তালিকা প্রদত্ত হইল :

১. এঞ্জিনের য়্যাক্সিলারেটার ... ২০০টি
২. " জেনারেটার ... ২০০টি
৩. " পিস্টন ... ২০০টি

এই মালগুলি আপনারা কি মূল্যে, কিরূপ কমিশনে আমাদের নিকট বিক্রয় করিতে প্রস্তুত, অথবা অন্য কোন সর্তাদি থাকিলে জানাইয়া বাধিত করিবেন। মাল সরবরাহ কাহার দায়িত্বে, তাহাও জানাইলে উপকৃত হইব।

ভারতের বাণিজ্যে আমাদের বিশেষ সুনাম আছে। আমাদের বর্তমানে চলতি মূলধনের পরিমাণ প্রায় চার লক্ষ টাকা। আপনাদের পণ্যের মূল্য আমরা স্টার্লিং হিসাবেই এক বৎসরের মধ্যে দুই কিস্তিতে শোধ করিবার প্রতিশ্রুতি দিতেছি।

আশা করি, আমাদের প্রস্তাবে আপনাদের মতামত জানাইয়া সত্বর পত্রের উত্তর দান করিয়া বাধিত করিবেন। আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক

শ্রীধ্রুবজ্যোতি গুপ্ত

[মেশিন এণ্ড টুল্‌স্ (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে]

প্রশ্ন ৩। তোমার প্রতিষ্ঠান যে পণ্য উৎপাদন করে, তাহা ক্রয় করিতে কোনও বিদেশী প্রতিষ্ঠান ইচ্ছুক। তোমার সম্মতি ও সর্তাদি জানাইয়া একখানি পত্র লিখ।

পত্রাদর্শ ৩৭।

গঙ্গা ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোং লিঃ

[উৎকৃষ্ট পাটজাত দ্রব্য উৎপাদক]

টেলিগ্রাম : 'গঙ্গা'

টেলিফোন নং : ২৩-৬১৪১

৭, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট

কলিকাতা : ১

২৫শে নভেম্বর, ১৯৬৫

হেনরি ফিলিপ্‌স্ এণ্ড কোং

২৬, বিশপ্‌স্ গেট, লণ্ডন,

যুক্তরাজ্য

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনাদের ১লা নভেম্বর, ১৯৬৫-তারিখের পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আপনারা আমাদের উৎপন্ন চট ক্রয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

আপনাদের চট ক্রয়ের প্রস্তাব আমরা সানন্দে গ্রহণ করিলাম। কয়েকটি সর্তে আপনাদের নিকট আমরা আমাদের প্রস্তুত চট বিক্রয় করিতে সম্মত আছি। একসঙ্গে ২৫,০০০৲ (পঁচিশ হাজার) টাকার চট ক্রয় করিলে আমরা শতকরা কুড়ি টাকা হারে কমিশন দিতে পারি। কিন্তু আমাদের পণ্যের মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় শোধ দিতে হইবে।

আশা করি, আমাদের প্রস্তাবে আপনারা সম্মত হইবেন। আমাদের রপ্তানি অনুমতিপত্র আছে। কাজেই মাল রপ্তানি করিতে আমাদের কোন অসুবিধাই হইবে না। তবে পরিবহণ-ব্যয় আপনাদের। সত্বর উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক

শ্রীআত্মজ্যোতি মিত্র

[গঙ্গা ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং লিঃ-এর পক্ষে]

অনুসরণী ১০

●১. ব্রিটেনের একটি প্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ীর সঙ্গে কারবারের উদ্দেশ্যে তোমার অভিপ্রেত ও সামর্থ্য জানাইয়া একটি পত্র লিখ। ক. বি. '৫৭

●২. বিদেশী কারবারের এজেন্সি পাইবার উদ্দেশ্যে সেই কারবারের কর্তৃপক্ষকে নিজের ব্যবসায়ের বিবরণ দিয়া পত্র লিখ। ক. বি. '৬২

৩. তুমি চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে কিছু যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে মনস্থ করিয়াছ। তোমার অভিপ্রায় ও সর্তাদি জানাইয়া একটি পত্র রচনা কর।

৪. নিউ ইয়র্কের একটি প্রতিষ্ঠান তোমার প্রতিষ্ঠানের নিকট কিছু সূতী কাপড় ক্রয়ের অভিপ্রায় জানাইয়া একখানি পত্র দিয়াছে। তোমার সামর্থ্য ও সর্তাদি জানাইয়া একখানি পত্র রচনা কর।

৫. মিশরের কোন কারবারী প্রতিষ্ঠানের নিকট কিছু পরিমাণ তুলার অর্ডার দিয়া একখানি পত্র লিখ।

একাদশ পর্যায়

প্রচার ও জনসংযোগ সংক্রান্ত পত্র

ক. বি. '৬৩, '৬৪, '৬৫, ব. বি. '৬১, '৬৪

Letter relating to Publicity and Public Relations.

প্রচার ও জনসংযোগ সংক্রান্ত পত্রের লক্ষ্য হলো জনসাধারণ। জনসাধারণ বলতে ক্রেতা বা বিক্রেতা, জনগণ ও সরকার—সকল শ্রেণীকেই বোঝায়। এই পত্রের বৈশিষ্ট্য হলো, ব্যক্তিগতভাবে এতে কোন উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে সম্ভাষণ করা হয় না। সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যেই এই পত্রগুলি রচিত হয়। তাই স্বভাবতঃই সংবাদপত্রের সম্পাদক মহাশয়কে সম্ভাষণ করাই এই পত্র-রচনার রীতি। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় লক্ষ্য নন, উপলক্ষ মাত্র। সম্পাদক মহাশয়কে উদ্দেশ করে জনগণের বা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টি আলোচ্য বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করাই হলো এই পত্র রচনার উদ্দেশ্য।

জনসাধারণের মতামত প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকারের বলেই এই সকল পত্র রচিত হয়ে থাকে। কোনও গণস্বার্থ-বিরোধী কার্য বা অন্যায় কার্য সংঘটিত হলে জনগণের কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। তা নইলে গণতন্ত্র অর্থহীন হয়ে পড়ে। সংবাদপত্র সেই গণতান্ত্রিক মতামত প্রকাশের সার্থক বাহন।

এই সকল পত্রের ভাষা সরল, সংক্ষিপ্ত এবং যুক্তিনিষ্ঠ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনেক সময় ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে সম্পাদককে পত্রলেখকের নাম গোপন রাখতে অনুরোধ করা হয়। সেরূপ ক্ষেত্রে "জনৈক ভুক্তভোগী", "জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী", বা "জনৈক রেলযাত্রী", "জনৈক পরীক্ষক" ইত্যাদি ছদ্মনাম ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ থাকে। তবে সম্পাদককে পত্র-লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা জানাতে হয়। বলাবাহুল্য, এই সব পত্রের মতামতের জন্যে সম্পাদক দায়ী থাকেন না।

আর একটি কথা, প্রচারপত্র (Circular Letter) এবং প্রচার-সম্পর্কিত পত্র (Letter relating to publicity) দুই ভিন্ন জাতের। প্রচারপত্রে প্রতিষ্ঠান-বিশেষকে সম্ভাষণ করা হয়ে থাকে ; কিন্তু প্রচার-সম্পর্কিত পত্র সংবাদপত্রের সম্পাদকের উদ্দেশ্যে রচিত হয়ে থাকে অথবা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন (Advertisement) আকারে সন্নিবেশিত হয়ে থাকে ; "খোলা চিঠি" বা "স্মারকপত্র" (memorandum)-ও এই শ্রেণীর পত্র।

●প্রশ্ন ১। কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার কথা চিন্তা করিতেছেন। একটি ব্যাঙ্কের পরিচালক হিসাবে এই নীতির অশুভ ফল প্রতিপন্ন করিয়া এক স্মারকপত্র (memorandum) রচনা কর। ক. বি. '৬৪

[বি. দ্র.—পত্রখানি কাকে সম্ভাষণ করে লিখতে হবে—এই নিয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। কিন্তু আরম্ভেই বলা হয়েছে "কেন্দ্রীয় সরকার···চিন্তা করিতেছেন।" অতএব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হচ্ছেন "কেন্দ্রীয় সরকার"। কাজেই "কেন্দ্রীয় সরকারের" এই বিষয়ে অন্যতম সংশ্লিষ্ট সদস্য অর্থমন্ত্রী মহাশয়কেই সম্ভাষণ করতে হবে।]

পত্রাদর্শ ৩৮।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
[ভারতের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বৃহত্তম ব্যাঙ্ক]

টেলিগ্রাম : 'সেণ্ট্রাল' ১, মহাত্মা গান্ধী রোড
টেলিফোন নং : ৬৩৫৫০ বোম্বাই : ১
৭ই আগষ্ট, ১৯৬৫

মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয়,
কেন্দ্রীয় সরকার,
নয়াদিল্লী

সবিনয় নিবেদন,

কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাঙ্কগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার কথা চিন্তা করিতেছেন শুনিয়া আমরা বিশেষ বিব্রত বোধ করিতেছি। ইহাতে ভারতের অর্থনীতি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ভারতের অর্থনীতি এখনও পুরাপুরি সংগঠিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাই আমাদের আশঙ্কা, ইহার ফলে ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিষময় ফল ফলিবে।

প্রথমতঃ, ব্যাঙ্ক পরিচালন ব্যাপারে সরকারের অভিজ্ঞতা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। সমগ্র ভারতের অর্থনীতির প্রধান সূত্র ব্যাঙ্কগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া তাহার পরিচালনার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সরকারী দায়িত্বে কতখানি সম্ভব হইবে—এই প্রশ্ন উঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার অভাবে সমগ্র ভারতের অর্থনীতির মূল কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে এবং তাহাতেও একটি চরম বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হইলে ভারতের বাণিজ্যে ঘোর দুর্দিন ঘনাইয়া আসিবে। কারণ সরকারী ব্যক্তিগণ নীতি-নির্ধারণে যতই সিদ্ধহস্ত হউন, কোন্ বিনিয়োগ

লাভজনক এবং কোন্ বিনিয়োগ অলাভজনক—স্থির করিয়া উঠা সব সময় তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে বহু অলাভজনক কারবারে প্রচুর অর্থ-বিনিয়োগের দ্বারা জাতীয় অর্থের প্রভূত অপব্যয়ের সম্ভাবনা আছে।

তৃতীয়তঃ, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যও ইহার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। বর্তমানে আমাদের দেশের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন; কিন্তু ব্যাঙ্ক-সমূহ রাষ্ট্রায়ত্ত হইলে বৈদেশিক বাণিজ্যে সরকারী অনভিজ্ঞতার ফলে বহু বিদেশী মুদ্রা খেসারত দিতে হইবে। ফলে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে বাধা সৃষ্টি হইবে।

আশা করি, উল্লিখিত অশুভ পরিণামের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আপনাদের ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ নীতির পরিবর্তন সাধন করিবেন এবং ভারতের অর্থনীতিকে সমূহ বিপর্যয়ের হাত হইতে রক্ষা করিবেন।

নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীরামগোপাল আগরওয়ালা
পরিচালক,
সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

২ প্রশ্ন। নূতন বাজেট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে অনেক জিনিস অসংগতরূপে দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কোন পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একখানি পত্র লিখ। ব. বি. '৬১

পত্রাদর্শ ৩৯।

টেলিফোন নং : ৪৬-৫৬৩৬

২১, ডোভার লেন
কলিকাতা : ১৯
২৫শে আগষ্ট, ১৯৬৫

সম্পাদক মহাশয়,
আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রা) লিঃ
৬, সুতারকিন স্ট্রীট
কলিকাতা : ১০

সবিনয় নিবেদন,

প্রতি বৎসর মার্চ মাসে ভারতের বাজেট ঘোষিত হয় এবং তাহার প্রতিক্রিয়ায় বাজারে পণ্যমূল্যও ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভের মত কয়েক ধাপ উপরে উঠিয়া যায়। ইহা অধুনা একটি বাৎসরিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সত্য কথা, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর বৃদ্ধি এই মূল্যবৃদ্ধির প্রেরকশক্তির কার্য করে। কিন্তু সামান্যমাত্র করারোপে কিংবা করারোপ ছাড়াই বহু নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অন্তর্ধান ও মূল্য-বৃদ্ধিতে আশঙ্কিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।

মূল্যবৃদ্ধির এই আতিশয্যের কারণ কি? কেবলই কি করারোপ ইহার জন্য দায়ী? এক শ্রেণীর ধূর্ত ব্যবসায়ী প্রচুর পরিমাণে নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্য গুপ্ত গহ্বরে মজুত করিয়া বাজারে কৃত্রিম চাহিদার সৃষ্টি করিতেছে এবং পণ্য-মূল্যের ঊর্ধ্বগতিকে উৎসাহিত করিতেছে। দুঃখের বিষয়, জাতীয় অর্থ তাহাদের দাদন দিয়া ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই জাতীয় স্বার্থ-বিরোধীকার্যে তাহাদিগকে প্রকারান্তরে উৎসাহিত করিতেছে।

প্রশ্ন করি, মজুতদারী, চোরাকারবার ও ফট্‌কাবাজিতে যাহাতে জাতীয় অর্থ বিনিয়োজিত হইতে না পারে, তজ্জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এত দ্বিধা কেন? জাতির সেই শত্রুদের যথার্থ শাস্তিদানের জন্য আইন রচনায় ও আইন প্রয়োগেই বা এত গড়িমসি কেন? আমাদের ইতিমধ্যে অনেক শিক্ষা হইয়াছে। আমরা চাই, জাতির এই শত্রুদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ভারতরক্ষা আইন প্রযুক্ত হউক।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীশান্তনু সেনগুপ্ত

● ৩ প্রশ্ন। পুস্তক-প্রকাশনের জন্য কাগজ চাহিয়া কাগজ-ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে টেণ্ডার (tender) আহ্বান করিয়া বিজ্ঞাপন লিখ। ক. বি. '৬৩

পত্রাদর্শ ৪০।

প্রাইমা প্রকাশনী (প্রা) লিঃ

টেণ্ডার

বিষয় : কাগজ সরবরাহ

পুস্তক-প্রকাশনের জন্য নিম্নোক্ত মানের কাগজ সরবরাহের নিমিত্ত কেবলমাত্র অনুমতি-প্রাপ্ত (licensed) কাগজ-ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। সীল-করা খামে টেণ্ডার পুরিয়া তাহার উপরে "কাগজ সরবরাহের জন্য টেণ্ডার" লিখিয়া দিতে হইবে। উহা ২৯-৮-৬৫ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত আমাদের *৩, কলেজ রো, কলিকাতা : ৯-ঠিকানাস্থিত অফিসে গৃহীত হইবে।*

মাল চালান দিবার খরচ সমেত দর উল্লেখ করিতে হইবে। বিক্রয়কর এবং অন্যান্য কর যদি অতিরিক্তরূপে প্রদেয় হয়, তজ্জন্য তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে। টেণ্ডার

গৃহীত হইলে ২৯-১১-৬৫ তারিখের মধ্যে মাল সরবরাহ করিতে পারা চাই। গ্রাহ্য মূল্যের শতকরা ৫ টাকা জমা দিয়া একটি চুক্তি সম্পাদন কবিয়া দিতে হইবে। উল্লিখিত তারিখের মধ্যে মাল সম্পূর্ণরূপে সরবরাহ করা না হইলে টেণ্ডারের অর্থ বাজেয়াপ্ত হইবে।

ক্রমিক নং	কাগজের বিবরণ	মান	পরিমাণ
১.	হোয়াইট প্রিন্ট	১০.৯ কে. জি	৫০০ রিম্
২.	এন্টিক্	২০ কে. জি.	২০০ রিম্
৩.	কার্টরিজ্	৩৬.৩ কে. জি.	১০০ রিম্

সরবরাহকৃত মাল নিম্নমানের প্রমাণিত হইল চুক্তি বাতিল হইবে। ২।৮।৬৫

প্রধান কর্মকর্তা,
প্রাইমা প্রকাশনী (প্রা) লিঃ
৩, কলেজ রো, কলিকাতা : ৯

অনুসরণী ১১

১. ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় জাতীয়করণের পক্ষে অভিমত জ্ঞাপন করিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একখানি নাতিদীর্ঘ পত্র রচনা কর। ব. বি. '৬৪

২. চাল-কল রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পক্ষে অভিমত জ্ঞাপন করিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একখানি পত্র রচনা কর।

৩. খাদ্যে ও ঔষধে ভেজাল মিশ্রণ জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী কার্য। অপরাধ দমনের জন্য ভারতরক্ষা আইন প্রযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এই মর্মে সংবাদপত্রের সম্পাদকের নিকট একখানি পত্র লিখ।

৪. নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের রেলপথের জন্যে দুই লক্ষ টন পাথরের নুড়ি (stone cheaps) সরবরাহ করার নিমিত্ত টেণ্ডার আহ্বান করিয়া এবং তাহার যাবতীয় সর্তাদি উল্লেখ করিয়া রেলওয়ের কর্মকর্তারূপে সংবাদপত্রে প্রকাশিতব্য একখানি বিজ্ঞপ্তি রচনা কর।

৫. পণ্যমূল্য বৃদ্ধির যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া সংবাদপত্রের সম্পাদকের নিকট একখানি পত্র লিখ।

৬. বাজারে মারাত্মকরূপে ভেজাল সরিষার তৈল বিক্রয় হইতেছে। ইহা অবিলম্বে বন্ধ করা হউক। এই মর্মে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীর নিকটে জনৈক ব্যবসায়ীরূপে একখানি স্মারকপত্র (memorandum) রচনা কর।

৭. তোমার আমদানি-রপ্তানি কারবারের জন্য উপযুক্ত জেনেরল ম্যানেজার চাহিয়া বিজ্ঞাপন লিখ। বিজ্ঞাপনে তোমার ব্যবসায়ের বিবরণ ও প্রার্থীর যোগ্যতার খুঁটিনাটি উল্লেখ থাকিবে। ক. বি. '৬৫

কোম্পানীর সচিবের পত্র
Letters by Company Secretary.

দ্বাদশ পর্যায়

কোম্পানীর সচিবের কার্যাবলী বহুবিচিত্র। তিনি একদিকে যেমন নির্বাহী পরিচালক-মণ্ডলীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেন, তেমনি তাঁকে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয় কোম্পানীর অংশীদার, পাওনাদার ও ঋণপত্রের মালিকের সঙ্গে। তিনি কোম্পানীর অধীনস্থ কর্মচারী। তাই তিনি নির্বাহী পরিচালক-মণ্ডলীর (Managing Directors) সকল নির্দেশই পালন করতে বাধ্য। তাই গৃহীত নির্দেশের অতিরিক্ত কিছু করতে হলে তাঁকে নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে পরিচালক-মণ্ডলীর সভার ব্যবস্থা করতে হয়। তার জন্যে তাঁকে সভার বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে, আলোচ্য বিষয়সূচী স্থির করতে হবে, পরিচালকদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় পত্রালাপ করতে হবে, সিদ্ধান্তগুলিকে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং পরবর্তী অধিবেশনে পরিচালক-মণ্ডলীর কাছ থেকে তার অনুমোদন লাভ করতে হবে। অপরদিকে অংশীদার, পাওনাদার ও ঋণপত্রের মালিকদের সঙ্গে সচিবকে পত্রবিনিময় করতেও হবে।

কোম্পানীর সচিবের কাযাবলী যেমন বহুবিচিত্র, তাঁর রচিত পত্রাবলীও তেমনি বহু বিচিত্র। কোম্পানীর সচিবের পত্রাবলীকে চারটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায় :

১. নির্বাহী পরিচালকগণের নিকট পত্র,
২. অংশীদারগণের নিকট পত্র,
৩. বিভাগীয় কর্মচারীগণের নিকট পত্র,
এবং ৪. কোম্পানীর নিবন্ধকের নিকট পত্র।

১. নির্বাহী পরিচালকগণের নিকট পত্র

১. প্রশ্ন। কোনও যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের সচিবরূপে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গের নিকট সভার উদ্দেশ্যে একটি বিজ্ঞপ্তিপত্র লিখ।

পত্রাদর্শ ৪১।

কেশোরাম কটন মিল্‌স্ লিঃ
[প্রসিদ্ধ বস্ত্র উৎপাদক প্রতিষ্ঠান]

টেলিগ্রাম : 'ধুতি'
টেলিফোন : ৩৫-২৩৭৫

৭, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা : ৬
১৯শে জুলাই, ১৯৬৫

সবিনয় নিবেদন,

আগামী ১লা আগষ্ট ১৯৬৫, রবিবার, সকাল নয় ঘটিকায় কেশোরাম কটন মিল্‌স্ লিঃ-এর ৭ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা : ৬-ঠিকানায় অবস্থিত কার্যালয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীর একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে।

আপনার উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

ভবদীয়
স্বাঃ—শ্রীনীরদবরণ ভট্টাচার্য
সচিব,
কেশোরাম কটন মিল্‌স্ লিঃ

সভার কার্যসূচী :

১. পূর্ববর্তী সভার কার্য-বিবরণী অনুমোদন।
২. কারখানার সম্প্রসারণ ও আনুষঙ্গিক ব্যয় অনুমোদন।
৩. বিবিধ।

২ প্রশ্ন। জনৈক পরিচালক কোম্পানীর সচিবের নিকট পরিচালকবর্গের সভার বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে কিছু তথ্য জানিতে চাহিয়া পত্র লিখিয়াছেন। তাহার একখানি উত্তরপত্র রচনা কর।

পত্রাদর্শ ৪২।

কেশোরাম কটন মিল্‌স্ লিঃ
[প্রসিদ্ধ বস্ত্র উৎপাদক প্রতিষ্ঠান]

টেলিগ্রাম : 'ধুতি'
টেলিফোন : ৩৫-২৩৭৫

৭, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা : ৬

সূচক সংখ্যা : চ/৩০৫/১৯৬৫ ২৬শে জুলাই, ১৯৬৫

শ্রীদিলীপ চট্টোপাধ্যায়
৭, হিন্দুস্থান পার্ক
কলিকাতা : ১৯

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ২৩শে জুলাই, ১৯৬৫-তারিখের পত্র পাইয়াছি। তাহার উত্তরে আপনাকে জানাইতেছি যে, পরিচালকবর্গের আগামী সভার অধিবেশন আগামী

১লা আগষ্ট ১৯৬৫, রবিবার সকাল নয় ঘটিকায় কেশোরাম কটন মিল্‌স্ লিঃ এর ৬, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা : ৬-ঠিকানাস্থিত কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত সভার বিজ্ঞপ্তি আপনার বাড়ির ঠিকানায় পত্রবাহক মারফত প্রেরিত হইয়াছিল এবং তাহা স্বাক্ষর করিয়া আপনি গ্রহণও করিয়াছেন।

তৎসত্ত্বেও আগামী সভার কার্যসূচী আপনার নির্দেশানুযায়ী প্রেরণ করিতেছি।

আগামী সভার কার্যসূচী :

১. পূর্ববর্তী সভার কার্য-বিবরণী অনুমোদন।

২. কারখানার সম্প্রসারণ ও আনুষঙ্গিক ব্যয় অনুমোদন।

৩. বিবিধ।

আপনার কোন প্রস্তাব থাকিলে তাহা 'বিবিধ' পর্যায়ে উত্থাপন করিবেন।

নমস্কারান্তে। ইতি—

স্বাক্ষর :—শ্রীনীরদবরণ ভট্টাচার্য
সচিব,
কেশোরাম কটন মিল্‌স্ লিঃ

৩ প্রশ্ন। গত পরিচালকবর্গের সভার কার্য-বিবরণী জ্ঞাপন করিয়া পরিচালকগণের নিকট উক্ত প্রতিষ্ঠানের সচিবরূপে একখানি পত্র রচনা কর।

পত্রাদর্শ ৪৩।

কেশোরাম কটন মিল্‌স্ লিঃ
[প্রসিদ্ধ বস্ত্র উৎপাদক প্রতিষ্ঠান]

টেলিগ্রাম : 'ধুতি' ৭, বিবেকানন্দ রোড
টেলিফোন : ৩৫-২৩৭৫ কলিকাতা : ৬
৬ই আগষ্ট, ১৯৬৫

সূচক সংখ্যা : চ/৪০৬/১৯৬৫

শ্রীদিলীপ চট্টোপাধ্যায়
৭, হিন্দুস্থান পার্ক
কলিকাতা : ১৯

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ৩রা আগষ্ট, ১৯৬৫-তারিখের পত্রের নির্দেশানুযায়ী গত ১লা আগষ্ট, ১৯৬৫-তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালকবর্গের সভার কার্য-বিবরণীর অনুলিপি প্রেরিত হইল। ইহার ২নং প্রস্তাবের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

২নং প্রস্তাবে কারখানার সম্প্রসারণ ও আনুষঙ্গিক ব্যয় অনুমোদন প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবটির উত্থাপক—শ্রীযতীন্দ্র বিমল ভট্টাচার্য এবং সমর্থক—শ্রীনিতাইচন্দ্র ধর। অন্যতম পরিচালক শ্রীপ্রমথেশ মজুমদার ইহার বিরোধিতা করিয়া বলেন যে জাতীয় সংকটের এই দুঃসময়ে কারখানা সম্প্রসারণের এই ঝুঁকি গ্রহণ অনুচিত। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের এই বিদেশী মুদ্রার সংকটকালে বিদেশ হইতে উচ্চমূল্যে বস্ত্র-বয়ন-কল ক্রয় করা উচিত হইবে না। তৃতীয়তঃ, আগামী পূজায় শ্রমিকদের অন্ততঃপক্ষে ছয় মাসের বোনাস না দিলে বিক্ষোভ দেখা দিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কাজেই তাঁহার মতে, এই প্রস্তাব বর্তমানে বাতিল করা উচিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের বোনাসের ব্যবস্থা হইবে জানান হইলে তিনিও প্রস্তাবটির পক্ষে সম্মতি দান করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ও প্রস্তাবটির সমর্থনে ভাষণ দেন এবং তাঁহার ভাষণের পর সবসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

সভার অন্যান্য কার্যাবলী গতানুগতিকভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেগুলি উল্লেখযোগ্য নয়। যদি অন্য কোন বিষয় অবগত হইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পত্র দেন, তবে তাহা সানন্দে আপনাকে বিস্তারিতভাবে জানানো হইবে।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়
স্বাঃ—শ্রীনীরদবরণ ভট্টাচার্য
সচিব,
কেশোরাম কটন মিল্‌স্ লিঃ

২. অংশীদারগণের নিকট পত্র

৪ প্রশ্ন। কোনও যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের সচিবরূপে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণের নিকট সাধারণ সভার একটি বিজ্ঞপ্তি রচনা কর।

পত্রাদর্শ ৪৪।

কেশোরাম কটন মিল্‌স্ লিঃ
[প্রসিদ্ধ বস্ত্র উৎপাদক প্রতিষ্ঠান]

টেলিগ্রাম : 'ধুতি' ৭, বিবেকানন্দ রোড
টেলিফোন : ৩৫-২৩৭৫ কলিকাতা : ৬
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, আগামী ১লা অক্টোবর, ১৯৬৫, বৃহস্পতিবার বেলা পাঁচ ঘটিকায় ৭, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা : ৬-ঠিকানায় অবস্থিত কেশোরাম

কটন মিল্‌স্ লিঃ-এর সভাগৃহে প্রতিষ্ঠানের দশম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে।

সভায় পরিচালকবর্গের কার্য-বিবরণী, হিসাব আলোচনা ও গ্রহণ, নূতন পরিচালকবর্গ ও নিরীক্ষক নির্বাচন, লভ্যাংশ ঘোষণা ও প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদিত হইবে।

আপনার উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

পরিচালক-মণ্ডলীর অনুমত্যনুসারে
স্বাঃ নীরদবরণ ভট্টাচার্য
সচিব,
কেশোরাম কটন মিল্‌স্ লিঃ

৫ প্রশ্ন। কোনও যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের সচিবরূপে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণের নিকট সাধারণ লভ্যাংশের বিবৃতিসহ একটি বিজ্ঞপ্তি রচনা কর।

পত্রাদর্শ ৪৫।

কেশোরাম কটন মিল্‌স্ লিঃ
[প্রসিদ্ধ বস্ত্র উৎপাদক প্রতিষ্ঠান]

টেলিগ্রাম : 'ধুতি' ৭, বিবেকানন্দ রোড্
টেলিফোন্ : ৩৫-২৩৭৫ কলিকাতা : ৬
২১শে নভেম্বর, ১৯৬৫

সূচক সংখ্যা : ড/৩০৫/১৯৬৫

শ্রীদেবব্রত বসু
৫৫, আমহার্ষ্ট স্ট্রীট
কলিকাতা : ৯

সবিনয় নিবেদন,

আনন্দের সহিত আপনার নিকট এই পত্রসহ লভ্যাংশলিপি প্রেরণ করিতেছি। ইহার বিবৃতি নিম্নরূপ :

১,৫০০ টাকা মূল্যের সাধারণ শেয়ারে ১০% হিসাবে লভ্যাংশ—১৫০·০০ টাকা
৪% হিঃ আয়কর বাদ— ৬০·০০ টাকা
৯০·০০ টাকা

অত্রসহ প্রেরিত লভ্যাংশ লিপিখানি বিচ্ছিন্ন করিয়া আপনার স্বাক্ষরসহ যত শীঘ্র সম্ভব ব্যাঙ্কে জমা দিতে হইবে।

এই সঙ্গে আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, উল্লিখিত লভ্যাংশ হইতে যে পরিমাণ টাকা আয়করব্রূপে কাটিয়া লওয়া হইতেছে, তাহা এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর আধিকারিকের নিকট প্রেরিত হইয়াছে বা হইবে।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়
স্বাঃ—শ্রীনীরদবরণ ভট্টাচার্য
সচিব,
কেশোরাম কটন মিলস্ লিঃ

৩. বিভাগীয় কর্মচারীগণের নিকট পত্র

৬ প্রশ্ন। কোন যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের সচিবরূপে উক্ত প্রতিষ্ঠানে কোন কর্মপ্রার্থীর নিকট একখানি সাক্ষাৎকারের আমন্ত্রণ পত্র লিখ।

পত্রাদর্শ ৪৬

কেশোরাম কটন মিল্‌স্ লিঃ
[প্রসিদ্ধ বস্ত্র উৎপাদক প্রতিষ্ঠান]

টেলিগ্রাম : 'ধুতি' ৭, বিবেকানন্দ রোড
টেলিফোন : ৩৫-২৩৭৫ কলিকাতা : ৬
২১শে নভেম্বর, ১৯৬৫

সূচক সংখ্যা : গ/২১/১৯৬৫

শ্রীঅমল বন্দ্যোপাধ্যায়
৬/১, কাঁকুলিয়া রোড
কলিকাতা : ১৯

সবিনয় নিবেদন,

কেশোরাম কটন মিল্‌স্ লিঃ-এ হিসাব-রক্ষক পদের জন্য আপনার প্রেরিত আবেদনপত্রের উত্তরে সানন্দে জানানো যাইতেছে যে, সাক্ষাৎকারের জন্য আপনি নির্বাচিত হইয়াছেন। তদুদ্দেশ্যে আগামী ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৬৫ রবিবার সকাল দশ ঘটিকার সময় মূল প্রশংসা পত্রাদিসহ উক্ত প্রতিষ্ঠানের ৭, বিবেকানন্দ রোড,

কলিকাতা : ৬-ঠিকানাস্থিত কার্যালয়ে নির্বাচন পর্ষতের সমক্ষে উপস্থিত হইতে আপনাকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়
স্বাঃ—শ্রীনীরদবরণ ভট্টাচার্য
সচিব,
কেশোরাম কটন মিল্‌স্ লিঃ

৭ প্রশ্ন। যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের সচিবরূপে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন পর্ষৎ কর্তৃক নির্বাচিত হিসাব-রক্ষক পদের জন্য জনৈক প্রার্থীর নিকট একখানি নিয়োগপত্র রচনা কর।

পত্রাদর্শ ৪৭।

কেশোরাম কটন মিল্‌স্ লিঃ
[প্রসিদ্ধ বস্ত্র উৎপাদক প্রতিষ্ঠান]

টেলিগ্রাম : 'ধুতি'
টেলিফোন : ৩৫-২৩৭৫

৭, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা : ৬
১০ই ডিসেম্বর, ১৯৬৫

সূচক সংখ্যা : গ/১৭৭/১৯৬৫

শ্রীঅমল বন্দ্যোপাধ্যায়
৬/১, কাঁকুলিয়া রোড
কলিকাতা : ১৯

সবিনয় নিবেদন,

আপনাকে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, নির্বাচন পর্ষৎ কর্তৃক আপনি এই প্রতিষ্ঠানের হিসাব-রক্ষকের পদে নির্বাচিত হইয়াছেন। আপনার বেতনের হার নিম্নে প্রদত্ত হইল :

বেতনের হার—৪০০˙০০—১৫˙০১—৬০০˙০০—২০˙০০—৮০০˙০০।

আশা করি, আপনি আগামী ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৬৫-তারিখের মধ্যে যোগদান বিবৃতি দিয়া আপনার সমস্ত কার্যভার বুঝিয়া লইবেন।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়
স্বাঃ—শ্রীনীরদবরণ ভট্টাচার্য
সচিব,
কেশোরাম কটন মিল্‌স্ লিঃ

৮ প্রশ্ন। যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের জনৈক কর্মচারী অসুস্থতার জন্য ছুটির আবেদন করিয়াছেন। পরিচালকমণ্ডলী ছুটি মঞ্জুর করিয়াছেন। এই সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া উক্ত কর্মচারীর নিকট একখানি পত্র লিখ।

পত্রাদর্শ ৪৮।

কেশোরাম কটন মিল্‌স্‌ লিঃ

[প্রসিদ্ধ বস্ত্র উৎপাদক প্রতিষ্ঠান]

টেলিগ্রাম : 'ধুতি' — ৭, বিবেকানন্দ রোড

টেলিফোন : ৩৫-২৩৭৫ — কলিকাতা : ৬

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

সূচক সংখ্যা : অ.১০৩/১৯৬৫

শ্রীউজ্জ্বলকুমার দাশগুপ্ত
২৩/১, আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড
কলিকাতা : ১৭

সবিনয় নিবেদন,

অপনার চিকিৎসা-সম্পর্কিত প্রত্যয়-পত্রসহ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫-তারিখের আবেদনপত্রের উত্তরে আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, পরিচালকমণ্ডলী আপনাকে অসুস্থতার নিমিত্ত ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫-তারিখ হইতে পুরাবেতনসহ আরো একমাসের ছুটি মঞ্জুর করিয়াছেন।

এই ছুটি চিকিৎসাভিত্তিক ছুটি বলিয়া পরিগণিত হইবে। মাসান্তে আপনার প্রাধিকার অর্পণ-পত্র (letter of authorisation) সহ কাহাকেও প্রেরণ করিলে আপনার সেপ্টেম্বর মাসের মাহিনা প্রদত্ত হইবে।

আপনার সত্বর আরোগ্য কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়
স্বাঃ—শ্রীনীরদবরণ ভট্টাচার্য
সচিব,
কেশোরাম কটন মিল্‌স্‌ লিঃ

৯ প্রশ্ন। কোনও কর্মচারী বিনা নোটিশে দীর্ঘদিন যাবৎ অনুপস্থিত আছেন। তাঁহাকে কর্ম হইতে বরখাস্ত করা হইল জানাইয়া যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের সচিবরূপে একখানি পত্র লিখ।

পত্রাদর্শ ৪৯।

কেশোরাম কটন মিল্‌স্‌ লিঃ

[প্রসিদ্ধ বস্ত্র উৎপাদক প্রতিষ্ঠান]

টেলিগ্রাম : 'ধুতি' ৭, বিবেকানন্দ রোড

টেলিফোন : ৩৫-২৩৭৫ কলিকাতা : ৬

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

সূচক সংখ্যা : অ/১৫৫/১৯৬৫

শ্রীসুশোভন কর্মকার

১৩, কালীঘাট রোড

সবিনয় নিবেদন,

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আপনি বিনা নোটিশে গত ১লা আগষ্ট হইতে কর্মে যোগদান হইতে বিরত আছেন। অবিলম্বে কার্যে যোগদানের জন্য গত ১৬ই আগষ্ট, ১৯৬৫ তারিখে আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। আপনি তাহারও কোন উত্তর দেন নাই।

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ তারিখের পরিচালকমণ্ডলীর সভায় আপনাকে উল্লিখিত কারণে বরখাস্ত করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। তদনুযায়ী আপনাকে জানাইতেছি যে, আপনাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইল।

এই প্রতিষ্ঠানে আপনার প্রাপ্য যদি কিছু থাকে, তাহা অদ্য হইতে তিন মাসের মধ্যে গ্রহণের ব্যবস্থা করিবেন।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়

স্বাঃ—শ্রীনীরদবরণ ভট্টাচার্য

সচিব,

কেশোরাম কটন মিল্‌স্‌ লিঃ

৪. কারবার নিবন্ধকের নিকট পত্র

১০ প্রশ্ন। যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠানের সচিবরূপে কারবার নিবন্ধকের নিকট উক্ত প্রতিষ্ঠানের আবণ্টন বিবৃতি জ্ঞাপন করিয়া একখানি পত্র লিখ।

পত্রাদর্শ ৫০।

কেশোরাম কটন মিল্‌স্ লিঃ
[প্রসিদ্ধ বস্ত্র উৎপাদক প্রতিষ্ঠান

টেলিগ্রাম : 'ধুতি'
টেলিফোন : ৩৫-২৩৭৫

৭, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা : ৬
২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

সূচক সংখ্যা : আ/২২৫/১৯৬৫

কারবারসমূহের নিবন্ধক মহাশয়,
পশ্চিমবঙ্গ
৪৭, গণেশচন্দ্র এভিন্যু
কলিকাতা : ১

বিষয় : আবণ্টন বিবৃতি

সবিনয় নিবেদন,

১৯৫৬ সালের বিঘোষিত কোম্পানী বিধির ৭৫ ধারানুযায়ী ১৯৬৫ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে পরিসমাপ্ত শেয়ারের যথাবিধি বিলিকরণের আবণ্টন বিবৃতি অত্রসহ প্রেরিত হইল।

এই সঙ্গে পত্রবাহকের মারফত দাখিল করিবার জন্য ৫·০০ (পাঁচ টাকা মাত্র) পেশ-মাশুলও প্রেরিত হইল।

আবণ্টন বিবৃতিপত্র ও পেশ-মাশুল প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া বাধিত করিবেন।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়
স্বাঃ—শ্রীনীরদবরণ ভট্টাচার্য
সচিব,
কেশোরাম কটন মিল্‌স্ লিঃ

ক্রোড়পত্র :
১. আবণ্টন বিবৃতি

অনুসরণী ১২।

১. পরিচালক পর্ষতের সভাপতি নির্দিষ্ট তারিখে সভা আহ্বানের নির্দেশ দিয়াছেন। তদনুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠানের সচিবরূপে পরিচালক বর্গের উদ্দেশ্যে একটি বিজ্ঞপ্তিপত্র রচনা কর।

২. পরিচালক পর্ষতের সভার কার্য-বিবরণী জ্ঞাপন করিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের সচিবরূপে পরিচালকগণের নিকট একখানি পত্র লিখ।

৩. যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের সচিবরূপে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণের নিকট সাধারণ সভার একটি বিজ্ঞপ্তিপত্র রচনা কর।

৪. যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের সচিবরূপে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণের নিকট সংবিধিবদ্ধ সভার একটি বিজ্ঞপ্তিপত্র রচনা কর।

৫. যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণের নিকট উক্ত প্রতিষ্ঠানের সচিবরূপে সাধারণ লভ্যাংশের বিবৃতি দিয়া একখানি বিজ্ঞপ্তিপত্র রচনা কর।

৬. যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের কোন অংশীদার হস্তান্তরের জন্য কতকগুলি স্বাক্ষরিত শেয়ারপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত অংশীদারের নিকট প্রতিষ্ঠানের সচিবরূপে একখানি শেয়ার হস্তান্তরের বিজ্ঞপ্তিপত্র রচনা কর।

৭. যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের সচিবরূপে জনৈক কর্মপ্রার্থীর নিকট একখানি আমন্ত্রণপত্র রচনা কর।

৮. নির্বাচকমণ্ডলী কোনও কর্মপ্রার্থীকে মনোনীত করিয়াছেন। উক্ত কর্মপ্রার্থীর নিকট প্রতিষ্ঠানের সচিবরূপে একখানি নিয়োগপত্র রচনা কর।

৯. কারবার নিবন্ধকের নিকট যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের সচিবরূপে উক্ত প্রতিষ্ঠানের আবণ্টন বিবৃতি জ্ঞাপন করিয়া একখানি পত্র লিখ।

১০. যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের সচিবরূপে অংশীদারগণের নিকট সাধারণ সভার কার্য-বিবরণী রচনা কর।

১১. কোনও যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানে জনৈক হিসাব-রক্ষক প্রয়োজন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সচিবরূপে সংবাদপত্রে প্রকাশের নিমিত্ত একটি বিজ্ঞাপন রচনা কর।

১২. তুমি কোনও যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের সচিবরূপে নিযুক্ত। অফিসের প্রয়োজনীয় কিছু আসবাবপত্রের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করিয়া একটি বিজ্ঞপ্তি রচনা কর। [প্রচার ও জন সংযোগ সংক্রান্ত পত্র : ৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বাণিজ্য বিচিন্তা

অনুবাদ

" ……………বাণিজ্যের স্রোত
ধরণী বেষ্টন করে জোয়ার-ভাটায়।
পণ্যপোত ধায় সিন্ধু-পারে-পারে।"
—রবীন্দ্রনাথ

প্রস্তাবনা

> "ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষায় প্রকাশের প্রথা স্বতন্ত্র এবং পরস্পরের মধ্যে শব্দ ও প্রতিশব্দের অবিকল মিল পাওয়া অসম্ভব; এই কথাটি তর্জমা করতে গিয়ে যতই আমাদের কাছে ধরা পড়ে ততই উভয় ভাষার প্রকৃতি স্পষ্ট করে বুঝতে পারি।"
>
> —রবীন্দ্রনাথ

অনুবাদ আমরা সবাই করে থাকি। যখন মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কোন কথা শুনি বা বই পড়ি, এবং সে ভাষা যদি আমাদের জানা থাকে, তবে তখন আমরা মনে মনে বক্তব্যটুকু মাতৃভাষায় অনুবাদ করে নিয়ে তাকে আমাদের উপলব্ধির দুয়ারে পৌঁছিয়ে দিই। এইভাবে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। যখন আমরা ইংরেজি কথা শুনি বা ইংরেজি বই পড়ি, তখন মনে মনে বাংলায় অনুবাদ করে তার অর্থ উপলব্ধির চেষ্টা করি। এ হচ্ছে অনুবাদের নীরব প্রক্রিয়া। বলা যায়, নীরব অনুবাদ। আবার যখন ইংরেজিতে আমরা কথা বলি বা ইংরেজিতে কিছু লিখি, তখন আমরা প্রথমে ভাবি বাংলায় এবং তারপর মনে মনে ইংরেজিতে অনুবাদ করে নিই। এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলে। তাই ধরা যায় না। তবে কাগজে-কলমে অনুবাদ করার সময় এতো বিহ্বলতা কেন?

নীরব অনুবাদ

বাণিজ্যিক স্নাতক শ্রেণীর পাঠ-সূচী অনুসারে এই দ্বিবিধ অনুবাদ-কর্মই শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে: বাংলা থেকে ইংরেজি এবং ইংরেজি থেকে বাংলা। তার কারণ, ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা এবং ভারতীয় বাণিজ্যও আজ বিশ্বব্যাপী। বাণিজ্য-ব্যাপারে বিদেশে পত্র-প্রেরণ কিংবা বিদেশ থেকে পত্র-প্রাপ্তি—আজ আর কল্পনার বস্তু নয়। আমাদের ঘরের বাণিজ্য যখন বাইরের বাণিজ্যের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছে, তখন বাইরের ভাষার সঙ্গে আমাদের ঘরের ভাষার সংযোগের সেতু স্থাপিত হওয়া উচিত। তাই বাণিজ্যিক স্নাতক শ্রেণীতে অনুবাদ শিক্ষার এই আয়োজন।

বাণিজ্যিক স্নাতক শ্রেণীতে অনুবাদ-শিক্ষার সার্থকতা

অনুবাদকের কাছে আমাদের দাবি দু'রকমের: প্রথমতঃ, অনুবাদ যথাসম্ভব আক্ষরিক হওয়া উচিত। ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের উপযুক্ত প্রতিশব্দ অনূদিত অংশে

যথাযথ রূপে ব্যবহার করা চাই। দ্বিতীয়তঃ, অনূদিত অংশের সাবলীলতা রক্ষিত হওয়াও দরকার। অর্থাৎ, প্রাথমিক প্রয়াসে আক্ষরিক অনুবাদে মনোনিবেশ করে তারপব অনূদিত অংশটি পাঠ করে যদি দেখা যায় যে, বক্তব্য অস্পষ্ট, ভাব চলেছে খুঁড়িয়ে, তবে সাবলীলতা আনবার জন্যে ভাবানুবাদের দিকে একটু মন দিতে হবে। আক্ষরিক অনুবাদ ও ভাবানুবাদের মিশ্র-পদ্ধতিই অনুবাদ-শিল্পের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি।

আক্ষরিক অনুবাদ ও ভাবানুবাদ

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষায় প্রকাশের প্রথা স্বতন্ত্র এবং পরস্পরের মধ্যে শব্দ ও প্রতিশব্দের অবিকল মিল পাওয়া অসম্ভব; এই কথাটি তর্জমা করতে গিয়ে যতই আমাদের কাছে ধরা পড়ে ততই উভয় ভাষার প্রকৃতি স্পষ্ট করে বুঝতে পারি।” অর্থাৎ কিনা, ইংরেজি ও বাংলা—এই দুই ভাষার রূপ-রীতি ও বিন্যাস-প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। কাজেই ভাষান্তরীকরণ দুরূহ না হলেও কষ্টসাধ্য তো বটেই। প্রথমতঃ, উভয় ভাষার স্বতন্ত্র রূপ-রীতি ও বাগ্ধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ, একের বৈশিষ্ট্য অন্যের বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হওয়া চাই।

উভয় ভাষার রূপ-রীতি ও বাগ্ধারা

কোন প্রবন্ধ বা কোন অনুচ্ছেদের আছে দুটি দিক: এক, বহিরঙ্গ; দুই, অন্তরঙ্গ। একটি ভাষা, অন্যটি ভাব। একটি দেহ, অন্যটি আত্মা। আত্মা অবিনশ্বর; কিন্তু দেহ পরিবর্তনশীল। তেমনি ভাষান্তর সম্ভব, ভাবান্তর অসম্ভব। কাজেই অনুবাদ-কর্ম হলো, ভাবকে অটুট রেখে ভাষান্তরীকরণ। তবু এক ভাষায় আবেগ ও উত্তাপ অন্য ভাষায় সঞ্চারিত হওয়াও প্রয়োজন। এবং অনুবাদ-কর্মের সাফল্য ধরা পড়ে ঠিক সেই-খানেই। অর্থাৎ মূল অংশে ভঙ্গী যদি সরস হয়, অনূদিত অংশের ভঙ্গীও হবে সরস। আর মূল অংশে ভঙ্গী যদি ধীরোদাত্ত হয়, অনূদিত অংশেও তা হবে ধীরোদাত্ত।

ভাব ও ভাষা এবং আবেগ ও উত্তাপের সঞ্চার

বাণিজ্যিক স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রদের অনুবাদ-কর্মে হাত লাগাবার আগে নিজের নিজের শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে হবে। একথা সত্য যে, যার শব্দভাণ্ডার যত সমৃদ্ধ, অনুবাদ-কর্মে সে ততই সিদ্ধহস্ত। অনুবাদ-কর্মে বাণিজ্যিক স্নাতককে প্রথমেই বহু অপরিচিত পারিভাষিক শব্দের সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই প্রথমে তার বাণিজ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ের নানা পারিভাষিক শব্দসমূহের উপযুক্ত প্রতিশব্দ জানা দরকার। এবং সেজন্যে তাকে দূর-দূরান্তরে যেতে হবে না। বাণিজ্য বিচিন্তার শেষাংশে প্রয়োজনীয় বহু পারিভাষিক শব্দের উপযুক্ত প্রতিশব্দ ও সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সেগুলি অধীত হলে বাণিজ্যিক স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রদের স্ব-স্ব শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে। এবং তাদের অনুবাদ করবার শক্তিও বৃদ্ধি পাবে।

পারিভাষিক শব্দ

শুধু প্রচুর শব্দের অধিকারী হলেই ভালো অনুবাদ করা যায় না। সেগুলি যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারা চাই। সেগুলি যথাযথভাবে ব্যবহারের সহজ উপায় হলো : প্রথমতঃ, প্রদত্ত বাক্যটি বিশ্লেষণ করতে হবে। জটিল বা যৌগিক বাক্য হলে তার প্রধান বাক্য বা অপ্রধান বাক্যগুলিকে বেছে নিতে হবে। আর সরল বাক্য হলে তো কথাই নেই। তারপর সেই প্রধান বাক্য বা সরল বাক্যের ক্রিয়া এবং কর্তার সন্ধান করতে হবে। পরে সেই মতো অনুবাদ করতে অগ্রসর হতে হবে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। বাক্যের মধ্যে যে শব্দ ও বাক্যাংশের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, অনূদিত অংশে যেন তার প্রতিশব্দ বা প্রতিশব্দ-গুচ্ছের ওপর ঠিক সেই গুরুত্ব আরোপিত হয়।

বাক্য-বিশ্লেষণ ও অনুবাদ

অন্যদিকে ইংরেজি ভাষা ও বাংলা ভাষার দীর্ঘকাল পারস্পরিক সহাবস্থানের ফলে প্রচুর ইংরেজি শব্দ বাংলায় এবং কিছু বাংলা শব্দ ইংরেজিতে স্থান লাভ করেছে। বাণিজ্য বা অর্থনীতি সম্পর্কিত যে সমস্ত ইংরেজি শব্দ বাংলায় স্থান লাভ করেছে, সেগুলি হলো : Bank, Cheque, Degree, Kartel, Parcel, Dock, Station, Committee, Commission, Corporation, Board, Reserve Bank of India, State Bank of India, United Bank of India, Company (Private) Ltd., Parliamentary, Common Wealth ইত্যাদি। বাংলায় অনুবাদ করবার সময় এগুলি উচ্চারণের দিক লক্ষ্য রেখে বাংলা হরফে লেখাই বাঞ্ছনীয়। তাহলে উল্লিখিত শব্দগুলি বাংলা হরফে দাঁড়ায় যথাক্রমে : ব্যাঙ্ক, চেক, ডিগ্রি, কার্টেল, পার্শেল, ডক, স্টেশন, কমিটি, কমিশন, কর্পোরেশন, বোর্ড, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, স্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, কোম্পানী (প্রাইভেট) লিমিটেড, পার্লিয়ামেণ্টারী, কমনওয়েল্‌থ্ ইত্যাদি। আবার কতকগুলি বাংলা শব্দ আছে, যেমন —আমন, খরিফ, লোকসভা, ভূদান, গ্রামদান ইত্যাদি ইংরেজিতে অনুবাদকালে উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রেখে সেগুলি অপরিবর্তিতভাবে ইংরেজি হরফে লেখা বাঞ্ছনীয়। যেমন—Aman, Kharif, Lok Sabha, Bhoodan, Gramdan ইত্যাদি।

ইংরেজি ও বাংলার কতকগুলি অপরিবর্তনীয় শব্দ

সর্বশেষে একটি কথা, ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদকালে সাধু বা চলিত ভাষার যে কোন একটি রীতি অনুসরণীয়। যে রীতিই অনুসরণ করা যাক না কেন, আদ্যন্ত সেই এক রীতিই অনুসরণ করতে হবে। তাছাড়া একদিনে অনুবাদ-কর্মে দক্ষতা অর্জন করা যায় না। তার জন্যে চাই নিয়মিত অনুবাদ-চর্চা। সেদিকে লক্ষ্য রেখে অনুবাদ-চর্চার জন্যে ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত কুড়ি

বছরের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্যিক স্নাতক শ্রেণীর প্রশ্নপত্রে অনুবাদের জন্যে প্রদত্ত ইংরেজি ও বাংলা অনুচ্ছেদ সমূহ এবং তার আদর্শ অনুবাদ প্রথম পর্যায়ে দেওয়া হলো। মূল অনুচ্ছেদ এবং তার অনূদিত অনুচ্ছেদগুলি অবশ্যই পঠনীয় এবং অনুশীলনীয়। তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পযন্ত বাণিজ্যিক স্নাতক শ্রেণীর প্রশ্নপত্রে অনুবাদের জন্যে প্রদত্ত অংশসমূহ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত বাণিজ্যিক স্নাতক শ্রেণীর প্রশ্নপত্রে অনুবাদের জন্যে প্রদত্ত অংশসমূহ এবং গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৬৫ সালের বাণিজিক স্নাতক শ্রেণীর প্রশ্নপত্রে অনুবাদের জন্যে প্রদত্ত অংশসমূহ অল্প-বিস্তর সংকেতসহ পরিবেশিত হলো। সংকেত প্রদানের উদ্দেশ্য, ছাত্রগণ সংকেতের সাহায্যে অংশগুলি নিয়ে অনুবাদ-চচা করে তাদের স্ব স্ব অনুবাদ শক্তির উদ্বোধন ঘটাবে। তৃতীয় পর্যায়ে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে স্নাতক শ্রেণীর উপযোগী অংশবিশেষ তুলে দেওয়া হয়েছে। সেগুলিরও অনুবাদ-সংকেত সংযোজিত হলো। আশাকরি, ছাত্রগণ স্বয়ংসিদ্ধ-ভাবে অনন্য-নির্ভর হয়ে অনুবাদ-কর্মে আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাস লাভ করবে।

শেষকথা

॥ প্রথম পর্যায় ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

● বাংলা থেকে ইংরেজি ●

১৯৩৭

আমাদের দেশে বেকারদের সংখ্যা গননা করিবার কোন ব্যবস্থা না থাকিলেও বেকার সমস্যা যে একটি প্রধান সমস্যা হইয়া দেখা দিয়াছে এবং বেকারের সংখ্যা হ্রাস না পাইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। সমস্যার প্রাধান্য শিক্ষিতদের মধ্যে যেরূপ, নিরক্ষরদের মধ্যেও তদ্রূপ। তবে তফাৎ এই, শিক্ষিত বেকারদের শতকরা ৯৯ জন সম্পূর্ণভাবে বেকার, পক্ষান্তরে নিরক্ষর বেকারদের অধিকাংশ আংশিকভাবে বেকার—অর্থাৎ প্রত্যেকেরই আয় ভয়াবহরূপে কমিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের দুর্দশা সম্বন্ধে আমরা সচেতনও নহি।

Though there is no provision for the census of the unemployed in our country, there is very little doubt that the problem of unemployment has grown to be one of the major problems and the number of the unemployed, instead of showing any decrease, is rather increasing steadily. The Pre-eminence of the problem is as much among the literate as among the illiterate mass but for the difference that among the literate unemployed 99 per cent are entirely out of employment, whereas most of the illiterate unemployed are partly out of employment, which means the income of every-one of them has become terribly low ; and we are not at all conscious of their hardships.

১৯৩৮

"পুনর্গঠন সম্পর্কে আমাদের প্রধান সমস্যা হইবে—কি করিয়া দেশ হইতে দারিদ্র্য দূর করা যায়। ইহার জন্য আমাদের ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আবশ্যক হইবে, জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত করিতে হইবে, কৃষকগণকে ঋণভার হইতে মুক্তি দিতে হইবে এবং

পল্লীবাসীকে অল্প সুদে ঋণদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহারা বস্তু উৎপাদন করে এবং যাহারা ব্যবহার করে, উভয়ের মঙ্গলের জন্য সমবায় আন্দোলন বিস্তৃত করিতে হইবে। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষির ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

"As for reconstruction, our major problem should be how to repel poverty from the country. For this, a radical change in our land tenancy system must be brought about, the zamindary system must be abolished, the peasantry must be relieved of their burden of debts and provisions must be made to sanction loans to the villagers at a minimum rate of interest. Co-operative movement must be spread throughout the country for the good of those who produce goods and of those who consume them. In agriculture, scientific method has to be adopted for the increase of production."

১৯৩৯

বাঙ্গালা দেশের নূতন ও ক্ষুদ্রায়তন ব্যাঙ্কগুলিকে কার্যক্ষেত্রে বর্তমানে যে সমস্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে—তাহার প্রধান কারণ এই যে, এই সব ব্যাঙ্কের প্রায় সবগুলিই মধ্যবিত্ত সমাজের বেকার ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং একটা ব্যাঙ্ক চালাইতে হইলে যে পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন, তাহার অতি সামান্য অংশও এই সব ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতাগণ প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই। কাজেই প্রথম হইতে ব্যাঙ্ক চালাইবার পক্ষে প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য উহাদিগকে মধ্যবিত্ত সমাজের শেয়ারক্রেতাদের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। কিন্তু নানা কারণে মধ্যবিত্ত সমাজের হাতে এখন টাকার অভাব ঘটিয়াছে। যাঁহাদের কিছু সম্বল আছে, তাঁহারাও অনিশ্চিত লাভের আশায় ব্যাঙ্কের শেয়ারে টাকা খাটাইতে রাজী নহেন। ফলে অধিকাংশ ব্যাঙ্কেরই পরিচালকবর্গ শেয়ার বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক চালাইবার পক্ষে প্রয়োজনীয় মূলধন বাজার হইতে সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

The major cause of the great many difficulties that the new-born small banks have been undergoing in the practical field at the present time is that almost all of these banks had been founded by the unemloyed persons of the middle class society and the founders could not invest even a small fraction of the capital necessary for running such a bank. So, since the very start, they had to depend on the

middle class shareholders for necessary working capital of the banks. For various reasons the middle class people have at present been seriously handicapped by scarcity of money. Even those who have some means are not intent to invest any amount in the bank shares owing to the uncertainty of returns. As a result, the directors of most of the banks could not procure necessary working capital of the banks from the market by the selling of shares.

১৯৪০

বর্তমানে দেশে যে শ্রমিক বিক্ষোভ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলে প্রধানতঃ যুদ্ধজনিত ভাতা ও বেতনবৃদ্ধির দাবিই নিহিত রহিয়াছে। যুদ্ধের ফলে বর্তমান সময় পর্যন্ত এদেশে সাধারণের নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের মূল্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব হইতেই জিনিষপত্রের ভবিষ্যৎ চাহিদা ও যোগান সম্বন্ধে একটা বেশী রকম জল্পনা-কল্পনা সুরু হয়। আর সে কারণেও ব্যবসায়ীরা তাহাদের পণ্যের দাম চড়াইয়া দিতে থাকেন। গত ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত দামের হার এইভাবে অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় সহসা দেশের স্বল্প-আয়বিশিষ্ট লোকমাত্রকেই নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যাদি কিনিতে বেশী পরিমাণ বেগ পাইতে হইতেছে। শ্রমিক সাধারণের আয়ের পরিমাণ সাধারণতঃ স্বল্প ও নির্দিষ্ট বলিয়া তাহারা জীবনযাত্রার বর্ধিত ব্যয় মিটাইতে পারিতেছে না।

The demand for war allowance and enhanced wages is mainly at the root of the outbursts of the present labour unrest in the country. As a result of war, the prices of daily necessaries of the people have considerably increased upto the present time. Even before the outbreak of war heavy speculations regarding the future demand and supply of commodities had started. For that reason also, the businessmen began to increase the prices of their commodities. Thus up to December last, the ratio of prices increased to a great extent. Under such circumstances, low income people have to undergo a lot of hardships in buying their daily necessaries. The income of the general labourers being low and fixed, they are not in a position to cope with the increased cost of living.

১৯৪১

"যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষে বিবিধ প্রকার নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং প্রচলিত শিল্পগুলির উন্নতি ও প্রসারের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, একথা বলিলেই ভারতবর্ষস্থিত ব্রিটিশ স্বার্থের সমর্থকগণ এরূপ একটা মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের বিপদের সুযোগে নিজের লাভের পন্থা খুঁজিতেছে। যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ যাহাতে শিল্পের ব্যাপারে কোন উন্নতি লাভ করিতে না পারে এবং যুদ্ধাবসানে ব্রিটিশ শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ যাহাতে ভারতবর্ষের বাজারে পূবের মতো মালপত্র বিক্রয় করিয়া লাভবান্ হইতে পারে, তজ্জন্যই যে বর্তমানে ভারতীয় শিল্প-প্রচেষ্টাকে নিরুৎসাহ করা হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ বর্তমান যুদ্ধে কোন সুবিধা লাভ করিতে সমর্থ না হইলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত অন্যান্য দেশগুলি এই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অস্ট্রেলিয়ার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর বর্তমান সময় পর্যন্ত উক্ত দেশে সংবাদপত্রের উপযোগী কাগজ, কলকব্জা প্রস্তুতের যন্ত্রপাতি, অ্যালয় স্টীল, কাঁচা-লোহা, দড়ি, টায়ার প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য-সামগ্রী প্রস্তুতের জন্য অগণিত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।"

"Whenever it is said that opportunities for establishing various new industries and for developing and expanding the existing ones have come to India as a result of war, the upholders of British interests in India express such an air that India has been looking for her self-interest by taking advantage of the disadvantage of England. There is no doubt that the present Indian industrial enterprises are being discouraged, so that India may not make a headway in industry during wartime and British industrial enterprises may continue to make profit as before by selling their commodities in Indian markets even after the close of the war. But though India has failed to avail herself of the advantages presented by the recent war, other countries in the British empire are taking the fullest advantage of the situation. The case of Australia, for an instance, may be cited. Since the outbreak of war up to the present day, innumerable factories for the production of newsprints, machinery for tools, alloy steel, pig iron, ropes, tyres and many other things have been established in that country."

১৯৪২

বস্ত্রের মূল্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় এদেশের কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের চরম দুঃখ-দুর্দশা দেখা দিয়াছে। নানাভাবে দেশে কাপড়ের যোগান কমিয়া যাওয়ায় ও দেশের বস্ত্রব্যবসায়ীরা সময় বুঝিয়া কাপড়ের জন্য বেশী দাম আদায়ে প্রবৃত্ত হওয়ায় এই জটিল অবস্থার সূচনা হইয়াছে। এই ব্যবস্থার একটা সময়োচিত প্রতিকার সাধন করিয়া দেশের জনসাধারণের দুঃখ লাঘবের জন্য দীর্ঘকাল যাবৎ গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন উপস্থিত করা হইতেছে। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এতদিন সে বিষয়ে কোন মনোযোগ দেন নাই। গত অক্টোবর মাসে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নূতন দিল্লীতে যে বৈঠক হয়, তাহাতে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়র এদেশে "স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ" বা নির্ধারিত মূল্যে সাধারণের ব্যবহার্য কতিপয় নির্দিষ্ট শ্রেণীর কাপড় প্রচলন সম্পর্কে এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। কিন্তু ঐ বৈঠকের আলোচনায় সে সম্বন্ধে কোন পাকাপাকি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। যাহা হউক, সম্প্রতি প্রকাশ—ভারত সরকার 'স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' প্রচলনের ঐ প্রস্তাব সম্বন্ধে এখন বিবেচনা করিতেছেন এবং শীঘ্রই এ সম্পর্কে সমস্ত প্রদেশে যুগপৎ বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

The excessive rise in the price of cloth has caused extreme distress to the cultivators, labourers and general middle class people in this country. Fall in the supply of cloth in the country due to various reasons and the realisation of higher prices for cloth by the cloth-merchants of the country by taking the advantage of the time have given rise to this complicated situation. Appeals are being made to the Gove rnment for a long time in order to relieve the people of the country of their distress by implementing some timely remedy for the situation, but the Government have so far paid no heed to the matter. In the Price-Control Conference held in New Delhi in October last, Sir Rama Swami Mudaliar, the Commerce Minister of the Government of India, placed a proposal for the introduction of a "Standard cloth" or a few specified types of cloth consumable by the general public at a fixed price in the country. But no final dicision was taken in the matter from the discussions in that conference. However, it has been reported recently that the Government of India have now been considering the proposal for the introduction of the 'Standard cloth' and

legislations will be enacted very soon in this connection throughout all the provinces simultaneously.

১৯৪৩

সকল সমস্যা আমাদের এরূপ ভীষণভাবে ঘিরিয়াছে যে তাহা হইতে মুক্তির কোন উপায় আমরা লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না। সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে এই দেশে নূতন ধান উঠে বলিয়া ধান চাউলের দাম কমিয়া যায়। এ বৎসর ঠিক তাহার বিপরীত দেখা যাইতেছে। অগ্রহায়ণ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে চাউলের দাম বাড়িয়া ১০৲ টাকা মণের স্থানে ৪০৲ টাকা মণ হইয়াছে। মফঃস্বলেও নূতন ধান ৮৲—৯৲ টাকা মূল্য হইতে বাড়িয়া বর্তমানে ১৮৲—২০৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে; ফলে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ব্যক্তিগণের পক্ষে দুইবেলা ভাতের সংস্থান করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আটার দাম বাড়িয়াছে,—যে আটার দাম ছিল ৫৲ টাকা মণ তাহা ২০৲ টাকা মণ দরে বিক্রী হইতেছে, তাহাও পয়সা দিয়া দোকানে পাওয়া যায় না। কলিকাতায় বহু পশ্চিমা লোকের বাস, তাহারা শীতকালে দুইবেলা রুটি খাইত। তাহারা আটার অভাবে শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, দুইবেলা ভাত খাইয়া কোন রকমে জীবনধারণ করিতে বাধ্য হইতেছে।

All the problems have encompassed us so critically that we find no way out. Generally the price of rice comes down in the months of Agrahayana and Pous, as new crop is harvested by this time in the country. Just the reverse is seen this year. From the second week of Agrahayana the price of rice has gone up to Rs. 40/- from Rs. 10/- per maund. In the moffusil also the price of new paddy has increased from between Rs 8/- and Rs. 9/- per maund and the same is being sold at between Rs. 18/- and Rs. 20/-. In consequence, it has become quite impossible for the middle class and the poor people to provide two rice-mills a day. Relatively, the price of atta has gone up. Atta which was sold at Rs. 5/- per maund, is being sold at Rs. 20/- per maund. Over and above, it is not available at the shops against cash payment. A fair number of up-country people lives in Calcutta and they were habituated to take bread in both of their meals during winter. They are getting emaciated for want of atta and are compelled to live anyhow on rice for both the meals.

১৯৪৪

বর্তমান যুদ্ধের অগ্রগতি ও পরিণতির ফলে যুদ্ধের অন্তদশা হইতে যে জগৎজোড়া মন্বন্তর মহামারীর নিদারুণ প্রাদুর্ভাব ঘটিবে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। বিবেচক ও বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাইবেন। সম্প্রতি বিলাতের ভূতপূর্ব খাদ্য ও বর্তমান পুনর্গঠন সচিব লর্ড উল্টন ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমরা জগৎজোড়া মন্বন্তরে দ্রুত প্রবিষ্ট হইতেছি। যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী সভাপতি ওয়ালেস্‌ও সতর্কবাণী করিয়াছেন যে, ১৯৪৪ সালের খাদ্য সমস্যাই হইবে আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রবল সমস্যা। এই বৎসরের উৎপাদন পরবর্তী বৎসরের প্রচণ্ড চাহিদা মিটাইতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং পূর্ব হইতেই এই সর্বজনীন জগৎজোড়া খাদ্যসঙ্কটের প্রতিবিধান-মূলক বিধিব্যবস্থা অবলম্বন আমাদিগের পক্ষে জীবনমরণ সমস্যা সমাধানের সমতুল। নাৎসী অত্যাচারের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইব। এই অদূরবর্তী অতি প্রচণ্ড সঙ্কটের প্রতি সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

There is little doubt that an awful outbreak of a world-wide famine and pestilence will follow from the inherent circumstances of the war as an outcome of the progress and effect of the present warfare. Any reasonable and intelligent man may find sufficient evidences in the pages of history. Lord Walton, the Ex-Food Minister and present Minister of Reconstruction of England has recently declared that we are being dragged quickly into a world-wide famine. Wallace, the Vice-President of the United States has broadcast a note of warning that in 1944 food crisis will be our most critical problem. The production of the current year will not be able to meet the enormous demand of the next year. So the adoption of preventive measures in advance against the world-wide and universal food crisis will be equivalent to the solution of our life and death problem. With the end of Nazi tyranny we shall have to face this dreadful situation. A sharp attention of the United Nations has been drawn to this tremendous crisis near at hand.

১৯৪৫

রেলওয়ে বোর্ডের সদস্য স্যার লক্ষ্মীপতি মিশ্র কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে নিখিল ভারতীয় বেতারে এইরূপ আশা প্রকাশ করেন যে, যুদ্ধান্তে ভারত গভর্ণমেণ্ট রেলওয়ের উন্নতির

জন্য ৩২০ কোটি টাকা ব্যয়ের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে মরুভূমি ও পাহাড় ব্যতীত অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থানই কোন রেলপথ হইতে ২৫ মাইলের অধিক দূরবর্তী থাকিবে না। তিনি আরও বলেন যে, এই যুদ্ধে ভারতের একস্থান হইতে অন্যস্থানে দ্রব্যাদির প্রেরণের অসুবিধা হইতে যে শিক্ষালাভ হইয়াছে, তাহা ভুলিয়া যাওয়া হইবে না এবং ভারতে যানবাহনের যোগাযোগ-ব্যবস্থা সমগ্রভাবে বিবেচিত হইবে। দেশের উন্নতিতে রেলপথ, ষ্টীমারপথ ও বিমানপথ বিশেষ অংশ গ্রহণ করিবে। যাহা হউক, ইতিমধ্যেই প্রায় ১৫ হাজার মাইল রেলপথ নির্মাণের জন্য জরিপ করা হইয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে নূতন রেলপথ নির্মাণের তালিকার বিস্তার সাধন সহজ হইবে।

Replying to certain questions Sir Lakshmipati Mishra, a member of the Railway Board, expressed the hope over All India Radio that according to the Government of India's post-war railway development plan of Rs. 320 crores all important places except those in deserts and mountains will not be at a distance of more than twenty-five miles from the railways. He added that the lesson from the difficulties in transporting goods from one place to another in India during war-time would not be forgotten and that the transport system in India would be considered as a whole. The railways, the water-ways and the air-ways would take their important roles in the development of the country. However, in the mean-time, survey for the construction of about fifteen thousand miles of railways has been completed and, if necessary, it will be easy to extend the programme of construction of new railways.

১৯৪৬

মহাসমর আরম্ভ হইবার পূর্বে কাপড়ের দিক হইতে ভারতবর্ষ অনেকটা স্বাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ এবং মুষ্টিমেয় সহরবাসী ও স্বচ্ছল ব্যক্তিদের বাদ দিলে এদেশের অধিকাংশ লোকই এখনও আধুনিক সুসভ্য জীবনধারণের উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্র ব্যবহার করে না। মোটের উপর, ১৯৩৮-৩৯ সালে অর্থাৎ যে বৎসর বিশেষ সামরিক প্রয়োজনে এক গজও বস্ত্র ব্যবহার করিতে হয় নাই, সেই বৎসর ভারতের মিল ও তাঁতগুলিতে উৎপন্ন কাপড়েই এদেশের শতকরা ৯০ ভাগের বেশী অভাব মিটিয়াছিল। উক্ত বৎসরে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে ৪ শত কোটি গজ এবং তাঁতে দেড়শত কোটি গজ কাপড় উৎপন্ন হয় এবং ৭০ কোটি গজ কাপড় জাপান,

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানি হয়। এই ৬২০ কোটি গজ কাপড়ের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ২০ কোটি গজ কাপড় সিংহল, ব্রহ্ম প্রভৃতি নিকটবর্তী নির্ভরশীল দেশে রপ্তানি করিয়া ভারতে উদ্বৃত্ত থাকে পূরা ৬০০ কোটি গজ—এবং ইহাই কিঞ্চিদধিক ৩৭ কোটি নরনারীর লজ্জা নিবারণ করে। পৃথিবীর সভ্য দেশসমূহের তুলনায় এইভাবে কমবেশী ১৬ গজ কাপড় ব্যবহার উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নহে; কিন্তু ভারতবর্ষ চিরকাল অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত বলিয়া এই সামান্য পরিমাণ কাপড়েই ভারতবাসীর মোটামুটি চলিয়া গিয়াছিল।

Before the outbreak of the Great War India became self-sufficient to a great extent in respect of cloth. Of course, India is a poor country and if the few townsfolk and well-to-do people are not taken into consideration, most of the people of this country do not even now use clothes in keeping with the standard of modern well-civilized living. On the whole, cloth produced in Indian mills and handlooms met more than 90 per cent of the demand of this country in 1938-39 i.e. the year in which not even a single yard of cloth was used for special military requirements. That year 400 crore yards of cloth in Indian cotton mills and 150 crore yards in handlooms were produced and 70 crore yards were imported into India from Japan, England and other countries. Out of this 620 crore yards of cloth, practically 20 crore yards were exported to Ceylon, Burma and other neighbouring dependent countries and there was a net surplus of 600 crore yards in India, with which a little over 37 crore men and women clothed themselves. In comparison with civilized countries of the world this consumption of about 16 yards of cloth per capita is not worth mentioning, but the Indians could somehow manage with this poor quantity, as they are always accustomed to simple living.

১৯৪৭

যুদ্ধের পর সকল জাতির আর্থিক উন্নতিসাধনের ব্যবস্থা এবং সকল জাতি যাহাতে সমানভাবে পণ্যের উৎপাদন এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে—এ বিষয়ে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট হইতে সিনেটর গিনেটি পর্যন্ত সকলেই একমত। প্রস্তাবটি স্থূল দৃষ্টিতে কতকটা নিরীহ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু শিল্পকার্যে যে সকল জাতি পশ্চাৎপদ তাহাদের পক্ষে ইহাতে শঙ্কার কথা আছে। কারণ,

অবাধ বাণিজ্য দ্বারা কৃষিপ্রধান জাতির শিল্পসেবার প্রবৃত্তিকে পঙ্গু করা সম্ভব। ভারতবর্ষকেও এই অবাধ বাণিজ্যের প্রভাবে শিল্পহীন করা হইয়াছে। কৃষিপ্রধান জাতির আর্থিক দুর্দশা কখনও ঘুচে না। বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে প্রত্যেক জাতি শিল্পসাধন বিষয়ে স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এইবার এই যুদ্ধের পর তাহা নষ্ট করিবার চেষ্টা হইবে বলিয়া শঙ্কা হয়। ইহার ফলে পরিণামে কোন পক্ষের হিতসাধন হইবে বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে ভবিষ্যতে বিপদের বীজ উপ্ত হইবে এবং পৃথিবীতে অশান্তি বিরাজ করিবে।

From President Roosevelt to Senator Ginette—all are unanimous with regard to the point that an arrangement should be made in the post-war period so that all nations may have opportunities for economic development, may have equal scope for production of commodities and may carry on trade and commerce on equal terms. On a superficial view, the proposal may appear somewhat harmless. But for the industrially backward countries there are some elements in it to be afraid of. The reason behind it is that free trade may cripple the industrial aspirations of agricultural countries. The influence of free trade has de-industrialised India too The economic distress of an agricultural nation is never repelled. Since the last Great War every nation is trying to be industrially self-sufficient, but it is apprehended that in the post-war period an attempt will be made to baffle it. It does not appear that any side will be benefited in consequence of this. The seeds of future conflicts will be sown in it and unrest will come to prevail in the world.

১৯৪৮

ভারতে ব্রিটিশ শাসন অবসানের পর যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে শ্রমিক সম্প্রদায় ও জাতীয় সরকার উভয়েই বর্তমান শ্রমসংক্রান্ত আইন পরিবর্তনে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। খনি আইনের প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হওয়ায় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা নিঃসন্দেহে সন্তোষ বোধ করিবেন; কারণ প্রধানতঃ ভারতের ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নয়নের জন্য কয়লার গুরুত্ব অসামান্য। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য শ্রমিকদের তুলনায় খনিমজুরদের অবস্থা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সালিশী বোর্ডের সুপারিশ মালিকেরা কার্যে পরিণত করায় কয়লা-খনি শ্রমিকদের মজুরীর

হারের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। সকল শ্রেণীর শ্রমিকই ইহার ফলে যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছে। কয়লা-শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ছাড়া ভারতের অন্য কোন শিল্পের মজুরেরাই সম্ভবতঃ বৎসরে চার মাসের বোনাস পায় না।

In view of the new situation that has come to prevail after the end of the British rule in India, both the labour community and the National Government are showing their eagerness to amend the existing labour legislations. The attention of the Government of India, first of all, has been attracted to the Mines Act and as such the trade union workers would undoubtedly feel satisfied; because, the importance of coal is immeasurable mainly for the future development of industries in India. Besides this, the condition of the miners is the worst in comparison with that of other workers. The Proprietors have given effect to the recommendations of the Adjudication Board appointed by the Government of India, and there has been a revolutionary change in the rate of wages of the miners. Labourers of all categories have been benefited to a great extent by this. Perhaps, labourers of no other industries in India but the coal miners enjoy an annual bonus equivalent to four months' wages.

১৯৪৯

পাশ্চাত্য জগতের মূলমন্ত্র সঙ্ঘশক্তি, গণশক্তি। দল বাঁধিতে পারিলেই কাজ হাসিল। কিন্তু আমরা কি দেখিলাম? দল নাই, সম্প্রদায় নাই, সঙ্ঘ নাই—একক। কঠোর-ভাবে একক,—কেবল একখানি যষ্টিমাত্র সম্বল করিয়া দাণ্ডী-যাত্রা। মনে পড়ে? 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে'? একবার কল্পনা কর—একাকী অর্ধনগ্ন ফকির নির্ভীকভাবে পথ চলিয়াছেন। দূরে দুর্ধর্ষ বিদেশী টাইর‍্যাণ্টের কামান নিষ্ফল আক্রোশে গর্জন করিতেছে, আর কাতারে কাতারে নরনারী বক্ষ প্রসারিত করিয়া সঙ্গী হইতেছে। মরণ তখন কোথায় ছিল? কোথায় ছিল মৃত্যু যখন মহাত্মা একাকী অগণিত রক্তলোলুপ সিংহব্যাঘ্র অপেক্ষা হিংস্র, ভয়াল নরপশুর মধ্যে বিচরণ করিয়াছিলেন?

The strength of organisation or the strength of the people is the main guiding principle of the western world. Mere formation of a group means the achievement of all objectives. But what did we see here? There was no group, no community, no organisation—he

was alone. Strictly alone. Do you remember the march to Dundee with only a staff in hand? 'Even if no one comes at your call, march alone.' Just imagine,—the half-naked Fakir is moving forward alone and undaunted. The cannon of the indomitable foreign tyrant are thundering in fruitless rage at a distance and rows of men and women are joining him with their chests expanded. Where was then death? Where was death, when the Mahatma marched alone amidst the innumerable beastly men, more fierce and horrible than blood-thirsty lions and tigers?

১৯৫০

বেকারেরা যাঁহাদের অভিশপ্ত করে, তাঁহারা ধনিক, পুঁজিপতি ও শিল্পপতি। তেমনি অভিশাপ দেয় শিল্পী, কৃষক, কেরাণী, এমন কি শিক্ষা-সম্পর্কিত ব্যক্তিও। দাসবৃত্তি দ্বারা যাহারা জীবিকা অর্জন করে, অভিশাপ দিতে তাহারা একটুও ইতস্ততঃ করে না। কাজ না থাকিলেই মানুষ হয় বেকার। পরিবারবর্গের ভরণপোষণ না করিতে পারিলেই বেকারের বিপ্লবপন্থী হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং বেকার-সমস্যা খুব বড় সমস্যা। এ সমস্যা প্রাচ্যেও আছে, প্রতীচ্যেও আছে। তবে প্রাচ্যের সমস্যা প্রতীচ্যের মত তীব্র নহে। ধনিক, শিল্পপতি, পুঁজিপতি ও সরকার বাহাদুর দেশ ও দশের কল্যাণে একমত হইয়া যদি শিল্প, কৃষি, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিক্ষাবিস্তারে প্রচেষ্টা করেন, তাহা হইলে সমস্যার রুদ্ধ দ্বার মুক্ত হইতে পারে।

Those who are cursed by the unemployed are the rich, the capitalists and the industrialists. Artisans, peasants, clerks and even persons attached to education, curse them in the same way. Those who have to earn their livelihood by servitude do not hesitate in the least to curse. A man becomes unemployed when he has no job. It is quite natural that an unemployed person will turn a revolutionary, when he fails to maintain his family. So the unemployment problem is a very serious one. This problem exists in the East as well as in the West. But the problem in the East is not so acute as in the West. The closed door of the problem may be opened, if the rich, the industrialists, the capitalists and the Government have consensus regarding the welfare of the country and the people, and they try to expand industry, agriculture, trade and commerce, and education.

১৯৫১

স্বাধীনতা যারা এনেছে তাদের পুরোভাগে ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তারা স্বভাবতঃই প্রত্যাশা করেছিল যে রাষ্ট্রীয় স্বাধিকার তাদের সামনে আত্মোন্নতির সিংহদ্বার খুলে দেবে। কিন্তু স্বাধীন ভারতে তাদের সে প্রত্যাশা পেয়েছে রূঢ় আঘাত। আত্মোন্নতির সুযোগ সুবিধা করা তো দূরের কথা, মধ্যবিত্ত শ্রেণী আজ আরও বিরূপ পারিপার্শ্বিকের সম্মুখীন হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে উঠেছে। চোখ খুললেই এ দৃশ্য সহজে চোখে পড়ে। দেড়শো টাকা মাইনের একজন অধ্যাপক, দুশো টাকা মাইনের একজন সাংবাদিক বা একশো টাকা মাইনের একজন কেরাণীর পক্ষে আজ পরিবারাদি নিয়ে বেঁচে থাকা যে কঠিন ব্যাপার তা সহজেই বুঝা যায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী আজ জীবনযাত্রার মান বজায় রাখবার দুষ্প্রয়াস করতে গিয়ে দিনের পর দিন এগিয়ে চলেছে ধ্বংসের দিকে—অথচ এদিকে কারও দৃষ্টি নেই বললেই চলে।

The middle class people were at the forefront of those who brought freedom. Naturally they expected that political independence would open before them the gate-way to their self-development. But in independent India their expectation has received a rude shock. Far from getting advantage of self-development, the middle class people have to face more adverse circumstances and are almost on the verge of collapse. As soon as we open our eyes, this scene freely comes to our sight. It is easily conceivable what a hard task it is for a college-teacher with rupees 150 per month or a journalist with rupees 200 per month or a clerk with rupees 100 per month to maintain his family. The middle class people are now advancing towards their destructions day by day in trying hard to cope with the standard of living—but nobody cares to take notice of it.

১৯৫২

বিগত মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হইতে তদানীন্তন কালের ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতে বিদেশ হইতে স্বর্ণের আমদানি এবং ভারত হইতে বিদেশে স্বর্ণের রপ্তানি নিষিদ্ধ করিয়া দেন। তখন ভারতে যে স্বর্ণ ছিল এবং স্বর্ণ ক্রয়ের জন্য ভারতের হাতে যে বিদেশী মুদ্রা সঞ্চিত হইতেছিল তাহা হস্তগত করিয়া ইংল্যাণ্ডের প্রয়োজনে আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ হইতে সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করাই উপরোক্ত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল। ঐ সময় যদি ভারতকে বিদেশ হইতে স্বর্ণ আমদানি করার সুযোগ দেওয়া হইত, তাহা

হইলে ভারতে বিপুল পরিমাণে স্বর্ণ আমদানি হইত। তখন ভারতের কি স্টার্লিং কি ডলার সকল শ্রেণীর বিদেশী মুদ্রারই খুব বেশী সচ্ছলতা ছিল। ঐ সময় ভারতকে স্বর্ণ আমদানির স্থযোগ না দিয়া ভারতের অর্জিত সমস্ত বিদেশী মুদ্রার বদলে ইংল্যাণ্ডের স্টার্লিং মুদ্রা দেওয়া হয় এবং তাহাও ইংল্যাণ্ডে আটক করিয়া রাখা হয়।

Since the outbreak of the last Great War, the then British Government banned the import of gold from foreign countries to India and its export from India to foreign countries The purpose behind the above mentioned measure was to buy war equipments from America, South Africa and other countries for England with the gold that was in India and the foreign exchange, accumulated at the disposal of India for the purchase of gold. A very huge quantity of gold would have been imported to India. if, at that time, an opportunity to import gold from foreign countries were permitted to her. Then India had abundant solvency in all kinds of foreign currency, whether in sterling or in dollar. Instead of permitting India an opportunity of importing gold at that time, she was given sterling of England in exchange of all the foreign currencies, earned by her and that was also blocked in England.

১৯৫৩

দেশে পণ্যদ্রব্যের তুলনায় দেশবাসীর হাতে অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমতার যোগান বৃদ্ধি পাইলেই যে দেশে মুদ্রাস্ফীতি অপরিহায হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। দেশে তখনই মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে যখন দেশবাসীর হাতে অতিরিক্ত হিসাবে প্রভূত পরিমাণে ক্রয়ক্ষমতা সঞ্চিত হইবে—অথচ সঙ্গে সঙ্গে দেশে সেই অনুপাতে পণ্যদ্রব্য ও মজুরীর যোগান বাড়িবে না। কিন্তু এইরূপ একটা ব্যবস্থার মধ্যেও টাকার স্থদবৃদ্ধি, ব্যাঙ্কের ধার দিবার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং, পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন, বিক্রয় ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ, বাধ্যতামূলক সঞ্চয়, শ্রমিকের মজুরী নিয়ন্ত্রণ, শিল্প ও বণিক প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত লভ্যাংশের সীমা নির্দেশ ইত্যাদি বহুপ্রকার ব্যবস্থার দ্বারা দেশে মুদ্রাস্ফীতির কুফল নিবারণের নানা পন্থা বর্তমানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বনেই বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে জগতের বহু দেশ দেশবাসীর হাতে প্রচুর অর্থ ছড়াইয়াও দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য একটা নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

There is no reason that inflation will be inevitable in a country, if the supply of additional purchasing power is increased in com-

parison with that of commodities in the country. Inflation occurs, when huge quantity of additional purchasing power accumulates in the hands of the people without proportionate increase in the supply of commodities and in wages simultaneously. But even in such circumstances, various preventive measures against the evils of inflation in a country have now been devised, such as increase of the rate of interest of money, restrictions on the lending capacity of banks, rationing, control of the production, sales and movements of commodites, compulsory savings, restrictions on the wages of labourers, ceiling of the quantity of dividends paid by the industrial and mercantile firms etc. etc. During the last Great War, by adopting all these measures many countries of the world succeeded to keep the price of commodities within a fixed limit, although they circulated huge sum of money in the hands of the people.

১৯৫৪

ব্যাঙ্কসমূহের প্রধান কাজ জনসাধারণের অর্থ নিরাপদভাবে সংরক্ষণ। কোন ব্যক্তির চলতি আয় যদি তাহার চলতি ব্যয় অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে তাহার অর্থ সঞ্চিত হয় এবং এই সঞ্চিত অর্থ নিরাপদভাবে সংরক্ষণ করা তাহার পক্ষে একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। ব্যাঙ্ক ও এতজ্জাতীয় অর্থনীতিক প্রতিষ্ঠান এই অর্থ নিরাপদভাবে সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া জনসাধারণকে সাহায্য করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন ইংল্যাণ্ডের স্বর্ণকারগণ জনসাধারণের অর্থ নিরাপদভাবে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিত সেই সময়ে উহারা এজন্য আমানতকারীদের নিকট হইতে একটা কমিশন আদায় করিত। পরে স্বর্ণকারগণ যখন দেখিল যে আমানতী টাকার একটা সামান্য অংশ বাদে আর সকল টাকা সবসময়ে তাহাদের হাতে পড়িয়া থাকে এবং এই টাকা দাদন করিয়া উহারা লাভ করিতে পারে তখন উহারা আমানতের জন্য কমিশন দাবি না করিয়া আমানতকারীকেই একটা সুদ দিতে আরম্ভ করিল। এইভাবেই আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উদ্ভব হয়।

The main function of the banks is the safe deposit of public money. If the current income of a person exceeds his current expenditure, some amount of his money is saved and the safe protection of his saved money becomes a problem to him. Banks and other financial institutions of the similar type take the responsibility of the safe protection of the money and thus help the

public. In the seventeenth century, when the goldsmiths of England used to take the responsibility of protecting the money of the public in saftey, they used to charge a commission from the depositors. Afterwards when the goldsmiths saw that all the disposited money except a small fraction of it always lay idle in their hands and that they could derive profit out of the investment of that money, they began to pay some amount of interest to the depositors, instead of charging any commission for the deposits. Thus the modern bank business came into being.

১৯৫৫

বাঙ্গালীর গৃহে চিনির ব্যবহার অল্প নহে। আমরা যে পরিমাণ চিনি ব্যবহার করি, তাহা আমাদের দেশেই জন্মিতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টা কে করিয়াছে? একদিন ভারতবাসী ভাবিত, জাভার সহিত চিনি প্রস্তুত ব্যাপারে তাহারা কখনই প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না। অথচ এখন জাভা হইতে চিনি তো এদেশে একেবারেই আসে না। কেবল তাহাই নহে, এখন ভারতবর্ষ হইতে চিনি বাহিরে রপ্তানি হইবার জন্যও প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। বাঙ্গালী চেষ্টা করিলে তাহারাই চিনির কল হইতে সমস্ত বাংলা দেশকেই চিনি সরবরাহ করিতে পারে। অতএব এদেশে ব্যাপকভাবে ইক্ষুর চাষ হওয়া প্রয়োজন। ইক্ষু হইতে কেবল যে চিনি প্রস্তুত হইবে তাহাই নহে, ইক্ষুর রস নিঙড়াইয়া লইলে যে ছিবড়া পড়িয়া থাকে, তাহাকেও কাজে লাগানো যায়। অবশ্য সাধারণ গুড়ের ব্যবসায়ীরা ঐ পদার্থটি পুড়াইয়া ইক্ষুরস জ্বাল দেয়, কিন্তু তাহা না করিয়া উহাকে কাগজ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার করা শ্রেষ্ঠতর ব্যবস্থা। ইক্ষুর ছিবড়ার সহায়তায় মাঝারি আকারের কাগজের কারখানা স্থাপিত হইতে পারে।

The consumption of sugar is not of a small quantity in Bengali families. The quantity of sugar we consume can be produced in our country. But who has made this endeavour? Once the Indians thought that they would never be able to compete with Java in the matter of the production of sugar. But now sugar is not at all imported from Java. Not only this, India now produces sufficient quantity of sugar for export purpose too. If Bengalees endeavour, they can produce sugar to meet even the demand of the whole of Bengal off their own mills. For that purpose in view, extensive cultivation of sugar-cane is needed in this state. Not only sugar

can be produced from sugar-canes but the crushed refuse that remains after squeezing out the juice from sugar-cane can also be utilized. Of course, ordinary gur-manufacturers use this refuse for fuel in their production ; but instead of doing this, it can be better utilized for manufacturing paper. Paper-mills of medium size can be established with the help of the crushed refuse of sugar-cane.

৮১৯৫৬

এদেশে কৃষির উপর যারা নির্ভর করে তাদের মধ্যে শতকরা ১৮ জনই কৃষিশ্রমিক। এদের দুর্দশার অন্ত নেই। বৎসরের সব সময়ে এদের কাজ থাকে না, রোজগারও সামান্য। তাছাড়াও এদের আরও অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়। এদের এই দুরবস্থার জন্যই আমাদের গ্রাম্য সমাজও দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এদের অবস্থার উন্নতি করা দরকার। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে এদের দুর্দশার অনেকটা লাঘব হবে। গ্রামের শিল্পসমূহ আবার চাঙ্গা হ'লে এবং সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করা হ'লে এদের রোজগারের নূতন পথ খুলে যাবে। এছাড়া (মজুরী) আইনবলে এদের সর্বনিম্ন মজুরীও কম হবে না। বিশেষতঃ দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শহরাঞ্চলের নানা কাজে এদের অনেককে নিয়োগ করা যাবে।

Eighteen per cent of those who depend on agriculture in this country are agricultural labourers. Their misery knows no bounds. They are not employed throughout the whole of the year and their income is also very low. Over and above, they have to undergo many difficulties. In consequence of their miserable condition, our rural community has also become weak. So it is essential to improve their condition as soon as practicable. According to the Five Year Plans their distress will be lessened to some extent. If the village industries are revived and cultivation is carried on a co-operative basis, new avenues of their income will open before them. Moreover, under the (Wages) Act their wages will not be too small. Particularly, with the economic development of the country it will be possible to employ many of them in various works in urban areas.

● ইংরেজি থেকে বাংলা ●

১৯৩৭

১. In agriculture the producer must wait for a period which is well-known before he can expect the turn over on his oultay. There are always definite intervals between cultivation, sowing, and harvest. It is therefore necessary for him to live on a system of credit to meet the expenses of cultivation and maintenace of his family until he can market his produce, unless he is in possession of sufficient capital. Unfortunately, he is seldom in affluence and he must borrow. This is the case not only in India but in almost every country of the world.

কৃষিতে উৎপাদককে তার বিনিয়োগের ফল লাভের প্রত্যাশায় কতদিন প্রতীক্ষা করতে হয়, তা আগে থেকেই সুবিদিত। ভূমিকর্ষণ, বীজবপন ও ফসল তোলার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট বিরতি সব সময়ই থাকে। কাজেই যদি তার পর্যাপ্ত পুঁজি না থাকে, তাহলে তার কৃষি-পণ্যের বাজারজাত-করণের পূর্ব পর্যন্ত কৃষিকার্য ও সংসার-যাত্রার ব্যয়-নির্বাহের জন্যে তার একপ্রকার ঋণ-পদ্ধতির উপর নির্ভর করে চলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে সে প্রায়ই বিত্তহীন, কাজেই সে ঋণ গ্রহণে বাধ্য। কেবল ভারতেই নয়, বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই এই অবস্থা।

২. A sure criterion of the economic development of a country is the growth of the investment habit of the people. When people are slow to realise the benefits of investment and take recourse to hoarding, the velocity of circulation of the currency is materially affected, the supply of finance for distributive trade becomes insufficient, and the control of central currency and credit organization over the money-market becomes less effective.

জনগণের বিনিয়োগ-প্রবৃত্তির বৃদ্ধিই হলো কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিশ্চিত মান। জনগণ যখন বিনিয়োগের উপকারিতা উপলব্ধি করতে না পেরে গোপনে অর্থ মজুত করতে থাকে, তখন মুদ্রার প্রচলন-গতি গুরুতররূপে ব্যাহত হয়, বণ্টনমূলক বাণিজ্যের জন্যে অর্থের যোগান অপ্রচুর হয়ে পড়ে এবং টাকার বাজারের ওপর কেন্দ্রীয় মুদ্রা-ব্যবস্থা ও ঋণ-সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা শিথিল হয়ে যায়।

৩. Almost all agriculturists have other sources of income besides the product of their fields. Some cultivators derive additional income by the sale of cocoanuts, betelnuts, and other fruits, from the sale of surplus cattle bred in the farms and from assisting other cultivators during harvest. During the rich harvest large bodies of cultivators and field-labourers flow into the great rice districts of Backerganj and Chittagong and into Burma. Sericulture and the cultivation of lac are the principal subsidiary occupation in Maldah, Rajshahi, Birbhum and Murshidabad.

প্রায় সকল কৃষকেরই তাদের শস্যক্ষেত্রের উৎপাদন ছাড়া আরও অন্যান্য আয়ের পন্থা আছে। কোন কোন কৃষক নারিকেল, সুপারি ও অন্যান্য ফল, গোয়ালের অতিরিক্ত গোরু-বাছুর বিক্রী করে এবং ফসল তোলার সময় অন্যান্য কৃষকদের সাহায্য করে অতিরিক্ত উপার্জন করে থাকে। ধান কাটার সময় কৃষক ও মাঠ-মজুরের দল ধান উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ জেলা বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও ব্রহ্মদেশে গিয়ে হাজির হয়। রেশমগুটি ও লাক্ষার চাষ মালদহ, রাজশাহী, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের প্রধান আনুষঙ্গিক জীবিকা।

১৯৩৮

১. The drop of car and lorry sales in the United States in January as compared with the previous month and the corresponding month last year is an indication of the extent to which purchasing power has been affected by the trade depression which began in the autumn. Americans in ordinary times change their cars at frequent intervals and a temporary tightness of money at once reflected in decreased car sales. Whether the prevailing depression is merely a passing set-back in the trade cycle or is of a more far-reaching nature is a question on which expert opinion is divided.

শরৎকাল থেকে সূচিত ব্যবসা-মন্দার দরুন দেশের ক্রয়শক্তি কতখানি ব্যাহত হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে গত জানুয়ারী মাসে, তার পূর্ববর্তী মাসের এবং পূর্ববর্তী বছরের এই মাসের তুলনায় মোটরগাড়ী ও লরী বিক্রয় হ্রাসই তার প্রমাণ। আমেরিকাবাসীরা সাধারণ সময়ে মাঝে মাঝে প্রায়ই তাদের গাড়ি বদলায় এবং গাড়ি-বিক্রয়-হ্রাসে অর্থের সাময়িক ঘাটতি প্রতিফলিত হয়েছে। বর্তমান মন্দা বাজার ব্যবসা-চক্রের একটা কেবল

সাময়িক পরিস্থিতি অথবা আরও সুদূর-প্রসারী ব্যাপার—এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে।

২. Statistics just published in this month's issue of the International Tin Research and Development Council's Bulletin, published by the Hague Statistical Office show an appreciable decrease in world tin consumption in January, 1938, to 13,800 tons against 16,800 tons in the previous month and 16,200 tons in January of the last year. While figures for individual months must be interpreted with caution, it may be noted that the only country to show a marked increase in January this year was Russia, which imported 2,307 tons of tin against 644 tons in January, 1937.

হেগ পরিসংখ্যান্ কার্যালয় থেকে প্রচারিত আন্তর্জাতিক টিন গবেষণা ও উন্নয়ন পরিষদের সদ্য-প্রকাশিত এই মাসের ইস্তাহারের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে. ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে পৃথিবীর টিনের ব্যবহার পূর্ববর্তী মাসের ১৬,৮০০ টন ও পূর্ববর্তী বছরের জানুয়ারী মাসের ১৬,২০০ টনের তুলনায় যথেষ্ট হ্রাস পেয়ে ১৩,৮০০ টনে দাঁড়ায় ; প্রতি মাসের হিসাবের অঙ্কের ব্যাখ্যা যদিও অবশ্যই সতর্কতা সহকারে হওয়া উচিত, তবুও স্মরণীয় যে, এই বছর জানুয়ারী মাসে একমাত্র দেশ রাশিয়াই ১৯৩৭ সালের জানুয়ারীর ৬৪৪ টনের স্থলে ২,৩০৭ টন টিন আমদানী করে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি প্রদর্শন করতে পেরেছে।

৩. According to the preamble of the Co-operative Societies Act, 1912, its object is the promotion of thrift and self-help among agriculturists, artisans, and persons of limited means

It is obvious, therefore, that the whole fabric of co-operative institutions in areas where this Act is in force has been built up to stimulate these virtues among the members of primary societies of whom in this province the great majority are cultivators on a small scale. The success of the movement must be mainly judged by its ability to bring into being societies composed of the people whom it is designed to benifit and really managed by those people.

১৯১২ সালের সমবায় সমিতি আইনের মুখবন্ধ অনুসারে কৃষক, কারিগর ও সীমিত-সংগতি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধিই হলো এর উদ্দেশ্য। সুতরাং যে সব অঞ্চলে এই আইন প্রবর্তিত হয়েছে, সেই সব অঞ্চলে

সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির সামগ্রিক কাঠামো প্রাথমিক সমিতিগুলির সদস্যদের মধ্যে এই গুণগুলির প্রসারকল্পেই যে সংগঠিত হয়েছে, তা স্পষ্ট। এই প্রদেশের সমিতিগুলির সদস্যদের অধিকাংশই স্বল্পআয়-বিশিষ্ট কৃষক। জনগণের দ্বারা সংগঠিত, জনগণের কল্যাণ-কল্পে পরিকল্পিত এবং প্রকৃতপক্ষে সেই জনগণের দ্বারা পরিচালিত. সমিতি সংগঠনে এর সামর্থ্যের দ্বারা এই আন্দোলনের সাফল্য প্রধানতঃ বিবেচিত হবে।

১৯৩৯

১. The extent and importance of the handloom industry in India are not generally appreciated. The following figures taken from the report of the Cotton Textile Tariff Board published in 1932 and the census table of 1931 respectively, give approximate estimates :—

	No.
Handlooms	19,84,950
Workers engaged in cotton and silk weaving and spinning	25,75,000

The consumption of cotton yarns by handloom weavers in the presidency of Madras from April to October, 1933, was about 42·7 million pounds while the value of the annual production of the Benares weavers alone is estimated at Rs. 1½ crores.

ভারতে হস্তচালিত তাঁত-শিল্পের প্রসার ও গুরুত্বের সাধারণ মূল্যায়ন হয়নি। ১৯৩২ সালে প্রকাশিত বস্ত্র-শিল্প শুল্ক পর্ষতের বিবরণী ও ১৯৩১ সালের আদমসুমারির তালিকা থেকে গৃহীত নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলিতে যথাক্রমে তার একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া যায় :

	সংখ্যা
হস্তচালিত তাঁত	১৯,৮৪,৯৫০
সুতা ও রেশম বোনা এবং সুতাকাটায় নিযুক্ত শ্রমিক	২৫,৭৫,০০০

১৯৩৩ সালের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির হস্তচালিত তাঁত-শিল্পীদের ৪২৭ লক্ষ পাউণ্ড সুতীর কাপড়ের প্রয়োজন হয়েছে এবং একমাত্র বারাণসীর তাঁত শিল্পীদেরই বার্ষিক উৎপাদনের মূল্য প্রায় ১½ কোটি টাকা।

২. In most of the Japanese industries, with the exception of spinning of cotton yarn and the making of heavy iron and steel products, the unit of production is small and most of the industrial sections are made up of small establishments. The Honjo section, situated along the Sumida riv r, is one of the principal factory-sections of Tokyo City. It includes a few large factories, but most of the establishments are little more than domestic workshops making a great variety of products from paper-lanterns to iron-nails. There were in Honjo some 300 glass factories in 1926, each with two or three furnaces and employing not more than 40 workers.

তুলা থেকে সুতা-কাটা এবং লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প ছাড়া অধিকাংশ জাপানী শিল্পেই উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র এবং শিল্পীয় শাখাসমূহের অধিকাংশই স্বল্প সরঞ্জাম নিয়ে গঠিত। সুমিদা নদীর তীরবর্তী হোঁজো শাখা টোকিও নগরীর প্রধান কারখানা-অঞ্চলের অন্যতম। তার মধ্যে পড়ে কতকগুলি বড় বড় কারখানা, কিন্তু সংস্থাগুলির অধিকাংশই আকারে সাধারণ পরিবারিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের চেয়ে খুব বড় নয় এবং সেগুলিতে কাগজের লণ্ঠন থেকে আরম্ভ করে লোহার পেরেক পর্যন্ত নানারকমের পণ্য তৈরী হয়। ১৯২৬ সালে হোঁজোতে ছিল প্রায় তিনশো কাচের কারখানা, যাদের প্রত্যেকটির ছিল দু'তিনটি চুল্লি এবং প্রত্যেকটিতে নিযুক্ত ছিল অনধিক চল্লিশজন কর্মী।

৩. The Indian Industrial Commission which submitted its report in 1918, formulated a comprehensive scheme for State Co-operation in industrial advance. In this scheme a large and, indeed, vital part was to be played by the Cetral Government. But, before the scheme could be put into operation, the transfer to Provincial Ministers in 1920 of responsibility for the development, brought about a situation which the Commission had not envisaged and which rendered it impracticable to proceed with substantial parts of it. While the Constitutional reforms were under consideration, the Government of India urged strongly that the Centre should not be divested of powers in the manner proposed by the Montagu Chelmsford Report.

ভারতীয় শিল্প কমিশন শিল্প-প্রসারে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা সম্পর্কে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা রচনা করেন এবং ১৯১৮ সালে তার বিবরণী পেশ করেন। এই পরিকল্পনায়

কেন্দ্রীয় সরকারের এক বিরাট্ এবং প্রকৃতই সক্রিয় অংশ গ্রহণের নির্দেশ ছিল। কিন্তু পরিকল্পনাটি কার্যকরী হবার পূর্বেই ১৯২০ সালে প্রাদেশিক মন্ত্রীদের হাতে উন্নয়ন দায়িত্বের হস্তান্তর ঘটায় কমিশনের এমন অভাবিতপূর্ব পরিস্থিতির উদ্ভব হলো, যার ফলে পরিকল্পনার প্রধান অংশগুলির রূপায়ণ অসম্ভব হয়ে পড়লো। নিয়মতান্ত্রিক সংস্কার বিবেচনাধীন থাকায় ভারত সরকার দৃঢ়ভাবে মন্তব্য করেছিলেন যে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড বিবরণের প্রস্তাবিত উপায়ে কেন্দ্রের ক্ষমতা হ্রাস করা ঠিক নয়।

১৯৪০

১. The Reserve Bank's Report on Currency and Finance for 1937-38 dealt with the period, the latter of which witnessed a general recession in world economic conditions. In the year 1938-39 there were signs of a recovery which would probably have been more pronounced but for growing uncertainties of the international situation which dominated the financial markets during the latter part of the year. The five years of increasing economic activity beginning with 1932 were followed by a downward trend early in 1937-38. This downward movement which had its origin in the U. S. A appears to have been arrested in that country about June, 1938.

১৯৩৭-৩৮ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রা ও অর্থ-ব্যবস্থার বিবরণীতে যে বছরের আলোচনা করা হয়েছে, তার শেষার্ধে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাধারণ অবনতি পরিলক্ষিত হয়েছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল বটে, তা হয়তো আরও সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করতে পারতো, কিন্তু বছরের শেষার্ধে অর্থনৈতিক বাজারের ওপর প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তার ফলে তা হতে পারলো না। ১৯৩২ সালে সূচিত ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অগ্রগতির পাঁচটি বছর ১৯৩৭-৩৮ সালের গোড়াতেই একটা নিম্নমুখী প্রবণতার দ্বারা আচ্ছন্ন হলো। এই নিম্নমুখী প্রবণতার সূত্রপাত হয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এবং ১৯৩৮ সালে জুন মাসের কাছাকাছি সময়ে ঐ দেশেই নিয়ন্ত্রিত হয়।

২. Despite the trade recession, the Central Government have succeeded by means of economies in Administration and the postponement or abandonment of schemes involving heavy new expenditure in presenting a series of balanced budgets. In consequence,

the credit of the Government was well maintained and it was able to meet its commitments towards the provincial Government under the Niemeyer Award. In 1937-38, the first year of Provincial Autonomy it was enabled to distribute Rs. 1¼ crores to the Provinces as their share of income-tax in addition to the various aids and subventions, and this amount was increased to Rs. 1·50 crores in 1938-39.

বাণিজ্যাবনতি সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার শাসনকার্যের মিতব্যয়িতা এবং প্রচুর-ব্যয়সাপেক্ষ নতুন পরিকল্পনাগুলি স্থগিত রাখা বা পরিত্যাগ করার দরুন বাজেটের পর্যায়ক্রমিক আয় ব্যয়ের সমতা দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। তার ফলে, সরকারী সুনাম বজায় রাখা এবং নিমেয়ার চুক্তি অনুসারে প্রাদেশিক সরকারগুলির সঙ্গে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা সম্ভব হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রথম বর্ষেই নানা রকম সাহায্য ও আনুকূল্য ছাড়াও প্রদেশগুলিকে তাঁরা আয়করের অংশ হিসেবে ১¼ কোটি টাকা বণ্টন করতে সমর্থ হন এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে তার পরিমাণ বৃদ্ধি করে ১·৫০ কোটি করা হয়।

৩. The Government of Bengal accept the proposals contained in paragraph 17 of the Niemeyer report in regard to the assistance to be given to certain provinces on the introduction of provincial autonomy. They regard the proposals as in the nature of an award given after a determination of the amount immediately available for distribution among the provinces and after an examination of the budgetary position of the several claimants to that amount. Looked at in this light they cannot but accept them as fair and reasonable though they are deeply disappointed that the immediate assistance to be given to Bengal falls far short of their original expectation.

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের ফলে বিশেষ কয়টি প্রদেশকে সাহায্য সম্পর্কে নিমেয়ার রিপোর্টের সপ্তদশ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলিকে বঙ্গীয় সরকার অনুমোদন করেন। প্রদেশগুলির মধ্যে বণ্টনের জন্যে সত্বর-লভ্য পরিমাণ নির্ধারণের পর এবং সেই অর্থের কতিপয় প্রার্থীর আয়-ব্যয়ক পরিস্থিতির পরীক্ষার পর প্রদত্ত সাহায্যরূপে তাঁরা প্রস্তাবগুলিকে গণ্য করেন। এই আলোকে বিচার করে তাঁরা একে ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত বলে গ্রহণ না করে পারেন না, যদিও বাংলাদেশকে প্রদেয় এই ত্বরিত সাহায্য তাঁদের প্রাথমিক প্রত্যাশার চেয়ে অনেক কম বলে তাঁরা গভীরভাবে হতাশ হয়েছেন।

১৯৪১

১. No less than £4,26,021 was remitted to the United Kingdom in the seven months from April to October, 1940 in consequence of the British War Savings Movement. Magnificent though the total is—and it consists as to 70% of remittances from Europeans—it is not sufficient. It is often forgotten that in this great country with a population exceeding 350 millions the European community is less than one-seventieth of 1%, say 50,000 persons. Thus from April to October, 1940, the total remitted represents a little over than £8 per head of the European population, or £1 – 3 – 0 per month per head, a figure which falls far short of the community's real savings capacity.

ব্রিটিশ সমর সঞ্চয় আন্দোলনের ফলস্বরূপ ১৯৪০ সালের এপ্রিল থেকে অক্টোবর—এই সাতমাসে যুক্তরাজ্যে কমপক্ষে ৪,২৬,০২১ পাউণ্ড প্রেরিত হয়েছিল। যদিও মোট পরিমাণ ছিল বিশাল এবং তা য়ুরোপীয়দের প্রেরিত অর্থের প্রায় ৭০%, তবু তা পর্যাপ্ত ছিল না। একথা প্রায়ই ভুলে যাওয়া হয় যে, এই বিশাল দেশের ৩৫ কোটিরও বেশী জনসংখ্যার মধ্যে য়ুরোপীয় সমাজ ১% এর এক-সপ্ততি শতাংশেরও কম, অর্থাৎ ৫০,০০০ জন। কাজেই, ১৯৪০ সালের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত মোট প্রেরিত অর্থের পরিমাণে বোঝা যায়, য়ুরোপীয় জনসংখ্যার মাথাপিছু কিছু বেশী ৮ পাউণ্ড অথবা মাসিক মাথাপিছু ১ পা. ৩ শি. ০ পে. প্রদত্ত হয়েছে, এবং তা এই সমাজের প্রকৃত সঞ্চয় ক্ষমতার বহু কম।

২. Under the stimulus of high prices, production was expanded in most industries after the outbreak of the War, according to the Review of the Trade of India in 1939-40. The output of jute manufactures increased by 5% as compared with 1938-39. The iron and steel industry was fully booked with order resulting in a considerable increase in its output, production of finished steel rising to 8,04,000 tons which was 11% higher than in the preceding year. Production of paper attained a new record amounting to 14,16,000 tons, which exceeded the previous year's figures by 2,32,000 tons. Coal raising increased to 2,50,56,000 tons, a level which was not reached at any time during the past ten years.

১৯৩৯-৪০ সালের ভারতীয় বাণিজ্যের সমীক্ষা অনুসারে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর উচ্চমূল্যের প্রেরণায় অধিকাংশ শিল্পেই উৎপাদন সম্প্রসারিত হয়েছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন ৫% বৃদ্ধি পেয়েছিল। লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প অর্ডারী কাজে পূর্ণ নিয়োজিত থাকায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং পাকা ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ৮,০৪,০০০ টনে দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ১১% বেশী। কাগজের উৎপাদন পূর্ববর্তী বছরের উৎপাদন ২,৩২,০০০ টনকে ছাড়িয়ে গিয়ে ১৭,১৬,০০০ টনে নতুন রেকর্ড স্থাপন করলো। কয়লা উত্তোলন বৃদ্ধি পেয়ে ২,৫০,৫৬,০০০ টনে দাঁড়ায়, যেখানে পৌঁছানো গত দশ বছরের মধ্যে কখনো সম্ভব হয় নি।

৩. Vagaries in the rain supply have done much damage to Bengal's winter rice-crop. A return issued by the Director of Agriculture summarizes the situation Seven districts only had favourable or fairly favourable weather. Twenty-two show a harvest below the previous year's. Howrah alone whose percentage of the normal yield was 42 in the previous year shows a 100% return. It was the prolonged drought that did the harm and reduced the average outturn throughout the province to an estimate of 72% of the normal as against the 88 of the preceding year. The area under winter rice showed a drop of about 9% and the outturn a drop of nearly a third. The crop gives Bengal some 16,00,000 tons less to eat than it had a year ago.

বৃষ্টিপাতের খামখেয়ালিপনা বাংলার শীতকালীন ধানের ফসলের দারুণ ক্ষতি করেছে। কৃষি-অধিকর্তা কর্তৃক প্রচারিত বিবরণী পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেছে। মাত্র সাতটি জেলায় অনুকূল বা মোটামুটি অনুকূল আবহাওয়া ছিল। বাইশটি জেলায় দেখা গেল, পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে কম ফসল হয়েছে। একমাত্র হাওড়া জেলায়, যেখানে ফসল পূর্ববর্তী বছরে স্বাভাবিক উৎপাদনের শতকরা ৪২ ভাগ ফলেছিল, সেখানে ১০০% ফসল ফলেছে। দীর্ঘস্থায়ী অনাবৃষ্টির কুফলে সমগ্র প্রদেশের গড়পড়তা উৎপাদন হ্রাস পেয়ে পূর্ববর্তী বছরের স্বাভাবিকতার ৮৮% এর স্থলে ৭২% হয়। শীতকালীন ধান উৎপাদন অঞ্চলে উৎপাদন হ্রাসের পরিমাণ ৯% এবং মোট হ্রাসের পরিমাণের এক-তৃতীয়াংশ। এই শস্য বাংলাদেশকে পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ১৬,০০,০০০ টন কম খাদ্য দিয়েছে।

১৯৪২

১. The health of the community is of utmost importance everywhere, and corporations have to supervise all services affecting the health of the public at large. Under the direction of the Ministry of Health, a large staff of sanitary inspectors, inspectors of nuisances and medical officers, safeguard the public health as far as they can, by seeing that proper drainage is maintained, that no food unfit for consumption is sold, and that all infectious diseases are notified to the medical officer of Health. Persons suffering from infectious diseases are immediately isolated, and their homes are disinfected to prevent the spread of the disease. Children are periodically examined while in attendance at school, and where necessary, free medical and dental treatment is given at clinics specially provided for the purpose.

সমাজের স্বাস্থ্য সর্বক্ষেত্রেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সাধারণভাবে গণ-স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সকল সেবাকর্ম পরিদর্শন করা পৌরনিগমগুলির কর্তব্য। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশানুবর্তী স্বাস্থ্য পরিদর্শক, আপদ পরিদর্শক ও চিকিৎসা-আধিকারিকের বিশাল কর্মীদল জল-নিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে, আহারের অনুপযুক্ত খাদ্য বিক্রয় বন্ধ করে, এবং সব সংক্রামক রোগকে স্বাস্থ্য-বিভাগের চিকিৎসা-আধিকারিকের নজরে এনে গণস্বাস্থ্যের যথাসাধ্য নিরাপত্তা বিধান করে থাকেন। সংক্রামক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের অতি সত্বর স্বতন্ত্র করা হয় এবং রোগবিস্তার-রোধকল্পে তাদের গৃহ জীবাণুমুক্ত করা হয়। বিদ্যালয়ে উপস্থিতকালে শিশুদের মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা হয় এবং যেখানে সম্ভব, এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আয়োজিত চিকিৎসালয়াদিতে বিনামূল্যে ঔষধপত্র সরবরাহ ও দাঁতের চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

২. The growth of Trade Unionism was very slow in its early stages and had only reached a million members in 1874. Before the Great War it had reached four mill ons and in 1920 the number had swollen to $8\frac{1}{2}$ millions. Since then there had been a decline of membership due to a variety of causes, the general strike of 1926, perhaps, being the principal factor. Nevertheless, trade unions to-day are powerful bodies and the principle of collective bargaining is recognised by the public as a wise means of settling disputes. No one with a knowledge of the historical facts in regard to wages

paid during the last hundred years could arrive at any other conclusion than this : that the workers have not received a fair share of profits of the industry during that period. Now-a-days, a much more enlightened view in regard to payment of workers is generally taken by employers of labour and the standard of living has certainly been raised since the Great War.

শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের প্রসার প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল অত্যন্ত মন্থর এবং ১৮৭৪ সালে তার সভ্যসংখ্যা হয়েছিল মাত্র ১০ লক্ষ। মহাসমরের পূর্বে তা ৪০ লক্ষে পৌঁছায় এবং ১৯২০ সালে তা স্ফীত হয়ে ৮৫ লক্ষে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর থেকে নানা কারণে সদস্যসংখ্যা কমতির মুখে। সম্ভবতঃ ১৯২৬ সালের সাধারণ ধর্মঘটই তার প্রধান কারণ। তবুও বর্তমানে শ্রমিক সংঘগুলি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান এবং সংঘবদ্ধভাবে সুবিধা আদায়ের নীতি বিবাদ-মীমাংসার বিজ্ঞ পন্থারূপে জনসাধারণ কর্তৃক স্বীকৃত। শ্রমিকের শ্রমমূল্য প্রদান বিষয়ে বিগত শতবর্ষের ঐতিহাসিক তথ্যজ্ঞান যাঁদের আছে, তাঁদের কেউ এ সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে পারবেন না যে, ঐ সময়ে শ্রমিকেরা শিল্প মুনাফার ন্যায্য অংশ লাভ করেনি। অধুনা শ্রমিক-নিয়োগকর্তারা সাধারণভাবে শ্রমিকদের শ্রমমূল্য প্রদান ব্যাপারে অধিকতর উদার মনোভাব গ্রহণ করেছেন এবং মহাসমরের কাল থেকে জীবন-যাত্রার মান নিশ্চিতরূপে উন্নীত হয়েছে।

৮. At various times in modern history the horror and destructiveness of war have caused thinking men to point the way to peace. During the Thirty Years' War which destroyed the earlier Germany, Grotius had in a great book (1625) laid the basis of international law. Other at different times and after great wars made pleas for "Perpetual Peace". After the bitter struggles for national freedom in the nineteenth century, meetings were held at the Hague (1899, 1907) to discuss the peaceful solution of national qurrrels by arbitration in order to bring about the reign of law between nations, as it has after centuries of trial been brought about between individual citizens. Yet the World War came and it wasted untold wealth and lives. No wonder that statesmen and others once again turned to schemes of peace in the hope of uniting mankind against war. The outcome of the intense desire to end war was that the Covenant of the League of Nations became part of the Treaty of Versailles, 1919, which ended the Great War.

আধুনিক ইতিহাসের নানাকালে যুদ্ধের বিভীষিকা ও তার নাশকতা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের শান্তির পথ প্রদর্শনে অনুপ্রাণিত করেছে। ত্রিশ বছরের যে যুদ্ধে প্রাচীন জার্মানীর ধ্বংস হয়েছিল, সেই সময়ে গ্রোটিয়াস্ এক মহান্ গ্রন্থে (১৬২৫) আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি স্থাপন করেন। অন্যান্যেরা বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন মহাসমরের পর "চিরস্থায়ী শান্তি"র জন্যে আবেদন করে গেছেন। উনিশ শতকে জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে তিক্ত সংগ্রামের পর ব্যক্তি-নাগরিকদের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যেভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে, বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যেও সেইভাবে তার প্রতিষ্ঠাকল্পে সালিশীর মাধ্যমে জাতিগত বিবাদাদির শান্তিপূর্ণ সমাধান বিষয়ে আলোচনা করবার জন্যে হেগ নগরীতে সভাসমূহ (১৮৯৯, ১৯০৭) অনুষ্ঠিত হয়। তথাপি মহাসমর এলো এবং ধ্বংস করলো অপরিমেয় সম্পদ ও অগণিত জীবন। রাজনীতিক ও অন্যান্যেরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে মানবজাতিকে সংঘবদ্ধ করবার আশায় শান্তি পরিকল্পনা রচনার প্রতি যে ঝুঁকে পড়লেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। যুদ্ধ সমাপ্তির গভীর আকাঙ্ক্ষার পরিণামে জাতি সংঘের চুক্তি-পত্রই ১৯১৯ সালে ভার্সাইর চুক্তির অংশে পরিণত হয় এবং তাতেই মহাসমরের অবসান ঘটে।

১৯৪৩

১. All governments have three branches: the Legislative which makes laws; the Executive which carries out the laws, and the Judicial which punishes those who break the laws. In Britain, these branches are represented as follows: the Legislative by Parliament, the Executive by the Cabinet, and the Judicial by the King's Courts and Justices. In theory, the laws are made by the King on the advice of Parliament, but actually laws are made by the Parliament alone. Parliament sets in two Houses: the House of Lords, the members of which sit by hereditary right; and the House of Commons whose members are elected by the votes of the people. The House of Commons is by far the most important of the two.

সব সরকারেরই আছে তিনটি শাখা: আইন বিভাগ, যা আইন রচনা করে; শাসন বিভাগ, যা আইনের নির্দেশ পালন করে এবং বিচার বিভাগ, যা আইন-ভঙ্গকারীকে শাস্তিদান করে। ব্রিটেনে এই শাখাগুলি নিম্নলিখিত ভাবে রূপায়িত হয়:

পার্লামেন্টের দ্বারা আইন বিভাগ, মন্ত্রী মণ্ডলীর দ্বারা শাসন বিভাগ এবং রাজকীয় বিচারালয়সমূহ ও বিচারপতিদেব দ্বারা বিচার বিভাগ। তত্ত্বগত দিক থেকে রাজা পার্লামেন্টের পরামর্শক্রমে আইন রচনা করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পার্লামেণ্টই আইন রচনা করে থাকেন। পার্লামেণ্ট দুটি সভায় বিভক্ত: উত্তরাধিকারবলে সদস্যদের নিয়ে গঠিত অভিজাত সভা এবং জনগণের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত লোকসভা। এই দুয়ের মধ্যে লোকসভাই প্রধানতঃ অধিক গুরুত্ব-সম্পন্ন।

২. The French Revolution of 1789 swept away the ancient but corrupt dynasty of Bourbon, and the First Republic was set up, based upon the declaration of the 'Rights of Man' of Jean Jacques Rousseau, a document which was the Bible of the extreme Left until the issue of Karl Marx's 'Communist Manifesto'. This Republic, like modern Communism, aimed at the international brotherhood of man, but, unlike the institute in Russia, a revolutionary France set out to achieve the brotherhood of the workers by war. From 1789 the ragged revolutionary hordes of France poured over Europe into Germany, the Netherlands and Italy, to subdue and dethrone the surrounding princes. They succeeded ; but success destroyed the Revolution, for from it sprang up the military dictatorship of Napoleon Bonaparte.

১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব প্রাচীন দুর্নীতিপরায়ণ বুরবঁ রাজবংশের বিলোপ সাধন করে এবং কার্ল মার্ক্সের "সাম্যবাদী ঘোষণাপত্র" প্রকাশের পূর্ব পযন্ত চরম বামপন্থীদের কাছে বাইবেল রূপে পরিগণিত জ্যঁ জ্যাক্ রুশোর 'মানব অধিকার' ঘোষণার ভিত্তিতে প্রথম সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। আধুনিক সাম্যবাদের মতো এই সাধারণতন্ত্রের লক্ষ্য ছিল মানুষের আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্র, তবে রাশিয়ার আদর্শের মতো নয়, যুদ্ধের দ্বারা বিপ্লবী ফ্রান্স শ্রমিকদের মধ্যে সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়। ১৭৮৯ সাল থেকে ফ্রান্সের কঠোর বিপ্লবী দল চতুষ্পার্শবর্তী রাজশক্তিগুলিকে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত করবার উদ্দেশ্যে য়ুরোপের জার্মানী, নেদারল্যাণ্ড্স্ এবং ইটালী প্রভৃতি দেশে প্রবেশ করলো। তারা সফল হলো; কিন্তু সেই সাফল্যই বিপ্লবকে করলো ধ্বংস। কারণ, তা থেকেই আবির্ভূত হলো নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সামরিক একনায়কত্ব।

১৯৪৪

১. For waging war on the scale and with the intensity demanded in these days, the first requirement of economic policy is to make the fullest possible use of the productive resources of the nation, in manpower, equipment and command over materials. This in itself is problem enough especially in view of the absorption of men into the armed forces, the unavoidable impairment of equipment, and the physical difficulty of keeping up the necessary inflow of materials. It is scarcely, however, to ensure that the goods and services produced shall be of the kinds most urgently required So great are the demands, direct and indirect, imposed by modern war that little margin is left for producing the ordinary luxuries of peaceful times or for accumulating assets which make for a rising level of social welfare.

আধুনিক যুগে সমর-পরিচালনার জন্মে যে ব্যাপকতা ও তীব্রতার প্রয়োজন, তার জন্মে চাই অর্থনীতির দিক থেকে জরুরী আবশ্যক জনবল, সাজসরঞ্জাম ও পণ্য-কর্তৃত্বে জাতির উৎপাদন-শক্তির যথাসম্ভব পূর্ণতম ব্যবহার। এমনিতেই এটা একটা বড়ো সমস্যা; তার ওপর সশস্ত্র বাহিনীতে লোক-নিয়োগ, সাজসরঞ্জামের অনিবার্য ক্ষয়ক্ষতি এবং উপকরণাদির প্রয়োজনীয় অন্তঃপ্রবাহ বজায় রাখার প্রাকৃতিক অসুবিধার তো কথাই নেই। যা হোক, সুদৃঢ় মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন যে, পণ্যোৎপাদন ও কার্য জরুরী প্রয়োজনানুসারেই হওয়া উচিত। আধুনিক যুদ্ধ-জনিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাহিদা এত বেশী হয় যে, শান্তিকালের সাধারণ বিলাসোপকরণের উৎপাদন অথবা সামাজিক কল্যাণের উর্ধ্বমুখী মানের স্বার্থে সম্পত্তি সঞ্চয়ের স্বল্প সুযোগও থাকে না।

২. The Mysore Durbar set up the first central hydro-electric installation in India on the Cauvery river at Sivasamudram in 1903. Beginning with 4,000 horse-power, the central generating station has been gradually enlarged, till at the present time its capacity is about 18,000 horse-power, the major portion of which is transmitted at 70,000 volts over a distance of 90 miles to the Kolar gold fields. The irregular flow of the Cauvery has been overcome by the construction of a dam across the river at Kannambadi near Seringapatam, which stores sufficient water to maintain a minimum flow of 900 cubic feet per second. The Kashmir Durbar subsequently established a hydro-electric station at Jhelum river near Srinagar;

but in this instance, the anticipated demand for power has yet been only partly realised. In western India, attention was drawn to the potentialities existing in the heavy rainfall on the country fringing the Ghats and the facilities offered for the construction of hydro-electric installations by the very steep drop to the plains.

মহীশূর দরবার ১৯০৩ সালে কাবেরী নদীর ওপরে শিবসমুদ্রমে ভারতের প্রথম কেন্দ্রীয় জল-বিদ্যুৎ-যন্ত্র স্থাপন করেন। ৪,০০০ অশ্বশক্তি থেকে সূচিত হয়ে এই কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ক্রম-সম্প্রসারিত হয়েছে; বর্তমানে তার ক্ষমতা প্রায় ১৪,০০০ অশ্বশক্তি, যার প্রধান অংশ ৯০ মাইলেরও অধিক দূরে কোলার স্বর্ণ-খনিতে ৭০,০০০ ভোল্টে প্রেরিত হয়। শ্রীরঙ্গপত্তমের কাছে কান্নামবাদীতে প্রতি সেকেণ্ডে কমপক্ষে ৯০০ ঘনফুট প্রবাহ রক্ষার উপযোগী পর্যাপ্ত জলধারণক্ষম নদী-বাঁধ নির্মাণের দ্বারা কাবেরীর অনিয়মিত প্রবাহকে জয় করা হয়েছে। পরবর্তীকালে কাশ্মীর দরবার শ্রীনগরের কাছে ঝিলাম নদীতে একটি জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করেছেন; কিন্তু এই ক্ষেত্রে শক্তির প্রত্যাশিত চাহিদার আংশিক মাত্র পাওয়া গিয়েছে। পশ্চিম ভারতে ঘাট-পর্বতমালার প্রান্তস্থিত অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা-সমূহের প্রতি এবং খাড়াভাবে সমতল ভূমিতে শৈলাবতরণের সান্নিধ্যে বিদ্যুৎ-যন্ত্র স্থাপনের সুবিধাদির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো।

৩. The cement industry continued to make steady progress during the year under review. The agreement between the Associated Cement Companies and the Dalmia Group referred to in the last issue of this Review functioned satisfactorily during 1941-42 also. Although internal competition was thus not entirely eliminated, the combined organisation was well-equipped to hold its own. There was increased international demand for cement due mainly to enhanced military and industrial requirements, chiefly for war purposes. Despatches against internal demand were also very satisfactory and would have been even greater but for the shortage of railway wagon which presented a serious problem to the industry. Export demand was also on the increase though it was conditioned by the limitation of freight space. (Review of the Trade of India in 1941-42).

আলোচ্য বর্ষে সিমেণ্ট শিল্পের অবিচলিত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ১৯৪১-৪২ সালেও এই আলোচনার সর্বশেষ সংখ্যায় উল্লিখিত সম্মিলিত সিমেণ্ট কোম্পানী সমূহ এবং ডালমিয়া ব্যবসায়ীমণ্ডলীর মধ্যে চুক্তিটি সন্তোষজনকরূপে কার্যকরী হয়েছে। যদিও

আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণরূপে দূর করা যায় নি, তবুও সম্মিলিত সংগঠন তার নিজস্ব অগ্রগতি বজায় রাখতে যথেষ্ট প্রস্তুত ছিল। প্রধানতঃ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বর্ধিত সামরিক ও শিল্পীয় প্রয়োজনে সিমেণ্টের আন্তর্জাতিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়। আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে মাল প্রেরণ সন্তোষজনক হয়েছিল; রেলের মালগাড়ীর অভাব, যা এই শিল্পের একটি গুরুতর সমস্যা, তা না থাকলে আরো সন্তোষজনক হতে পারতো। রপ্তানি চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু তা জাহাজী মাল-বোঝাই স্থানের সীমাবদ্ধতার জন্যে সীমিত হয়ে পড়ে। (১৯৪১-৪২ সালের ভারতের বাণিজ্য সমীক্ষা)।

১৯৪৫

১. The Reserve Bank of India was established on the 1st April 1935, in accordance with the provisions of the Reserve Bank of India Act, 1934. Although sporadic suggestions had from time to time been put forward previously that some sort of central bank should be established for India, they did not assume definite shape until 1926 when the Royal Commission on Indian currency and Finance (1925) recommended that India should perfect her currency and credit organisation by setting up a central bank with a charter framed on lines which experience had proved to be sound. A bill giving effect to the recommendation was introduced in the Legislative Assembly by Sir Basil Blackett, the then Finance Member of the Government of India, on the 25th January, 1927. It passed through several stages, but was ultimately dropped for constitutional reasons. A fresh bill introduced by Sir George Schuster on the 8th September, 1933, was enacted in due course and received the assent of the Governor-General on the 6th March, 1934.

১৯৩৪ সালের ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ধারানুসারে ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের জন্যে কোন এক প্রকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত—এইরূপ খাপছাড়া প্রস্তাবাদি মাঝে মাঝে করা হলেও সেগুলি ১৯২৬ সাল পর্যন্ত কোন নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে নি; ঐ সময় ভারতীয় মুদ্রা ও অর্থব্যবস্থা সম্পর্কিত রাজকীয় কমিশন (১৯২৫) সুপারিশ করেছিল যে, অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত সুদৃঢ় ভিত্তিতে রচিত সনদসহ একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত করে তার মুদ্রাব্যবস্থা ও ঋণ সংগঠনকে একটা সম্পূর্ণতা দান করা ভারতের কর্তব্য। সেই সুপারিশকে কার্যকরী করবার জন্যে ১৯২৭ সালের ২৫শে জানুয়ারী ভারত সরকারের

তদানীন্তন অর্থসচিব স্যার বাসিল ব্ল্যাকেট্ আইন সভায় এক আইনের খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তা কতকগুলি স্তর অতিক্রম করলো বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক কারণাদির জন্যে পরিত্যক্ত হলো। ১৯৩৩ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর স্যার জজ স্কুস্টার যে নতুন আইনের খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তা যথাসময়ে বিধিবদ্ধ হয় এবং ১৯৩৪ সালের ৬ই মার্চ বড়লাটের সম্মতি লাভ করে।

২. In village India this is a time of expectancy. Will the monsoon keep its appointment on the normal date? Will it bring plentiful rain properly spread over the season? How will rivers behave? These are questions momentous for the countryside and any one gifted with the eye of imagination can see thirsty fields watching the heavens for the answer. The last fortnight before monsoon is a testing time for living creatures. The ploughman goes more slowly to the field, the village artificer prolongs his mid-day rest taken on the floor of his place of work or under a V-shaped roof of straw. Tanks have dwindled, wells give water reluctantly, crops look pitifully at their possessors, and there is in village lanes a fierce glare from the sunshine and a heat that strikes harder, while sounds, even birds' songs, seem harshly metallic. It is not the nicest time of the year, but it holds the promise of a cooler season.

গ্রাম-ভারতের এটাই হলো প্রত্যাশার সময়। মৌসুমী স্বাভাবিক তারিখে তার আগমন-সূচী রক্ষা করবে তো? সমস্ত ঋতুটাকে উপযুক্তরূপে ব্যাপ্ত করবার মতো পর্যাপ্ত বৃষ্টি সে আনবে তো? নদীগুলোর আচরণ কিরূপ হবে? গ্রামাঞ্চলের এগুলি হলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং কল্পনাশক্তি-সম্পন্ন যে কোন ব্যক্তিই দেখতে পাবেন যে, তৃষ্ণার্ত ক্ষেত্রগুলিও উত্তরের আশায় আকাশের দিকে চেয়ে আছে। মৌসুমীর পূর্ববর্তী সর্বশেষ পক্ষকাল প্রাণী-জগতের কাছে পরীক্ষার সময়। কৃষক মন্থরতর গতিতে ক্ষেতে চলেছে, গ্রামীণ কারিগর তার কার্যস্থানের মেঝের ওপর অথবা খড়ের দোচালার নিচে তার দ্বি-প্রাহরিক বিশ্রামকে বাড়িয়ে দিয়েছে। পুকুরগুলি ক্রমশঃ শুকিয়ে গেছে, কূপগুলি জল দিচ্ছে বড়ো অনিচ্ছায়, ফসলগুলি তাদের প্রভুদের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে, গাঁয়ের রাস্তায় রোদ্দুরের চোখ-ঝলসানো আলো ও উত্তাপ দারুণ জ্বালা ধরায় এবং কোন শব্দ, এমন কি পাখির গানও ধাতুপাত্রের শব্দের মতো কর্কশ লাগে। এটা বছরের রমণীয়তম সময় নয়, কিন্তু শীতলতর ঋতুর প্রতিশ্রুতি রয়েছে এর মধ্যে।

৩. Statistics of unemployment mean rows of men and women, not of figures only. The three million or so unemployed in 1932 means three million lives being wasted in idleness, growing despair and numbing indifference. Behind these three million individuals, seeking an outlet for their energies and not finding it are their wives and families making hopeless shift with want, losing their birthright of healthy development, pondering whether they should have been born. Unemployment in the ten years before this war meant unused resources in Britain to the extent of at least £5,00,00,000 per year.

That was the additional wealth we might have had if we had used instead of wasting our powers. But the loss of material wealth is the least of the evils of unemployment. The greatest evil of unemploment is not the loss of additional material wealth which we might have with full employment. There are two other greater evils : first that unemployment makes men seem useless, not wanted, second that unemployment makes men live in fear and that from fear springs hate.

বেকারত্বের পরিসংখ্যান্ বলতে শ্রেণীবদ্ধ নর-নারীকেই বুঝায়, কেবলমাত্র সংখ্যা বুঝায় না। ১৯৩২ সালের ত্রিশ লক্ষের মতো বেকার বলতে আলস্যে, ক্রমবর্ধমান নৈরাশ্যে এবং অসাড় ঔদাস্যে ত্রিশ লক্ষ লোকের জীবনের অপচয়কেই বুঝায়। কর্মোদ্দীপনার পন্থানুসন্ধানে ব্যর্থ এই ত্রিশ লক্ষ লোকের পশ্চাতে রয়েছে তাদের স্ত্রী এবং পরিবারবর্গ, যারা অভাবের তাড়নায় হতাশভাবে ঘুরে ঘুরে এবং সুস্থবিকাশের জন্মগত অধিকার হারিয়ে অবাক্ হয়ে ভাবছে যে, তাদের জন্মগ্রহণ সংগত হয়েছে কিনা! ব্রিটেনে এই যুদ্ধের পূর্বের দশবছরের বেকারত্বের অর্থ, বছরে অন্ততঃপক্ষে ৫,০০,০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের সম্পদের অব্যবহার।

আমাদের এই শক্তিকে যদি অপচয়ের পরিবর্তে ব্যবহার করতাম, তবে আমরা এই পরিমাণ অতিরিক্ত সম্পদ লাভ করতে পারতাম। কিন্তু পার্থিব সম্পদহানি বেকারত্বের তুচ্ছতম ক্ষতি। পূর্ণ-নিয়োগে যে অতিরিক্ত পার্থিব সম্পদ লাভ হতে পারতো, তার ক্ষতিও বেকারত্বের বৃহত্তম ক্ষতি নয়। আরো দুটি বৃহত্তর ক্ষতি হয়ে থাকে : প্রথমতঃ, বেকার অবস্থা মানুষকে অপদার্থ ও অবাঞ্ছিত মনে করতে বাধ্য করে; দ্বিতীয়তঃ, বেকার অবস্থায় মানুষ ভয়ে ভয়ে বাঁচে এবং ভয় থেকে উদ্ভব হয় ঘৃণার।

১৯৪৬

১. Even in peace time the State plays an extremely important part in modern industrial life. By its laws it maintains that security of life and fulfilment of contract without which no business could be undertaken. Most modern states educate their citizens providing free elementary schools and subsidising higher education Insurance schemes and public assistance preserve the sick, old and unemployed from absolute starvation and thus assist in maintaining markets for goods and keep an existence, if not full health and vigour, a reserve of labour. By legislation or by the influence of the scale of wages paid by the State a minimum standard of living is secured for workers. Factory laws, currency regulations, exchange restrictions and many other forms of State interference limit or assist the activities of manufacturers and merchants. In times of war, State intervention is naturally greatly increased.

শান্তির সময়েও রাষ্ট্র আধুনিক শিল্প-জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। জীবনের যে নিরাপত্তা এবং চুক্তি-পূরণের ক্ষমতা ছাড়া কোন রকম ব্যবসা চলতে পারে না, রাষ্ট্র আইনের দ্বারা তা রক্ষা করে। অধিকাংশ আধুনিক রাষ্ট্রই অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে এবং উচ্চতর শিক্ষায় সরকারী অর্থসাহায্য দান ক'রে তার নাগরিকদের শিক্ষিত ক'রে তোলে। বীমা পরিকল্পনাসমূহ এবং সরকারী সাহায্য রুগ্ন, বৃদ্ধ ও বেকার ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ অনশনের হাত থেকে রক্ষা করে এবং এভাবে পণ্যের বাজারকে রাখে সক্রিয় ও স্বাস্থ্যবান, প্রাণবান না হলেও শ্রমশক্তিকে একপ্রকার মজুত করে রাখে। আইনের দ্বারা অথবা রাষ্ট্রপ্রদত্ত বেতনক্রমের প্রভাবের দ্বারা শ্রমিকদের জন্যে জীবনযাত্রার নিম্নতম মান রক্ষিত হয়। কারখানা আইন, মুদ্রা সম্পর্কিত আইন, বিনিময় নিয়ন্ত্রণ এবং রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের অন্যান্য বহুতর পদ্ধতি উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপকে সীমিত করে কিংবা সাহায্য করে। যুদ্ধের সময়ে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ স্বভাবতঃই যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

২. The internal situation in Australia after the war will be dominated by the requirements of reconstruction. The absorption into civilian employment of men discharged from the services, and the transfer of many people now engaged in war occupation to civilian activites will be an immense task. It is clear that one of the conditions conducive to the successful solution of the post-war

employment problem will be the continued maintenance of a high level of industrial activity. This implies that the reduction of industry to civilian production must be enlarged when necessary to absorb any surplus capacity left by declining war production. Some labour and materials will need to be allocated to undertake the necessary preparatory work, particularly in connection with housing and certain phases of manufacturing industry. In the immediate post-war period there will be no lack of effective demand for both goods and services. Plant and equipment have deteriorated, the supply of durable consumption goods in the hands of consumers will need to be replenished, demand of housing will be urgent. The amount of purchasing power already available to the community in the hands of institution and individual consumers, is extremely high.

যুদ্ধোত্তরকালে অস্ট্রেলিয়ার আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির ওপর পুনর্গঠনের প্রয়োজনাবলী প্রাধান্য বিস্তার করবে। সামরিক বিভাগ থেকে কর্মচ্যুত ব্যক্তিদের বেসামরিক চাকুরিতে নিয়োগ করা এবং বর্তমানে সামরিক চাকুরিতে নিযুক্ত বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে বেসামরিক চাকুরিতে বদলি করা একটা কঠিন কাজ হবে। স্পষ্টতঃই যুদ্ধোত্তর-কালীন নিয়োগ সমস্যার সার্থক সমাধানের অনুকূল সর্তসমূহের অন্যতম হলো শিল্পীয় কার্যাবলীর একটি উচ্চ স্তর সচল রাখা। অর্থাৎ হ্রাসমান সামরিক উৎপাদনের কোন অবশিষ্ট বাড়তি ক্ষমতার বিশোষণের জন্যে প্রয়োজন হলে বেসামরিক শিল্প সংকোচকে সম্প্রসারিত করতে হবে। কতকগুলি প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক কার্য নির্বাহের জন্যে বিশেষতঃ গৃহনির্মাণ এবং উৎপাদন-শিল্পের কয়েকটি পর্যায়ের ব্যাপারে শ্রম ও উপকরণাদির বিলি-ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে। অব্যবহিত যুদ্ধোত্তর-কালে পণ্য ও সেবার কার্যকরী চাহিদার অভাব হবে না। যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম ক্ষয়িত হয়েছে, ক্রেতার হাতে স্থায়ী ভোগ্য পণ্যের সরবরাহ পুনরায় পূর্ণ করতে হবে, বাসগৃহের চাহিদা হয়ে উঠবে অত্যন্ত জরুরী। ইতিমধ্যে সমাজের সুলভ ক্রয়শক্তি যে পরিমাণে প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ব্যক্তিগত ক্রেতাদের হাতে সঞ্চিত হয়েছে, তা সুপ্রচুর।

৩. The Government of India have agreed to supply to U. N. R. R. A. commodities worth about Rs. 6,50,00,000 states an Associated press of India message from New Delhi dated August 1, 1945. The balance of roughly Rs. 1,50,00,000 out of Rs. 8 crores contribution which the Government of India have decided

to make will be paid in cash. The supply of the commodities will be spread over period between four months and a year depending on shipping being made available by the U. N. R. R. A. authorities. These are some of the results of the discussion which the Government of India had with the U. N. R. R. A. Mission lasting from July 10 to July 29, on questions connected with supplies from India and procedure of procurement of supplies. It is announced that on both these questions the Government of India's view with the Mission agreed formed the basis of the conclusions which resulted from the discussions. As regards supplies, while expressing their sympathy with humanitarian aims of U. N. R R. A. and their readiness to render all possible help for the relief of distress, the Government of India indicated that their policy was that purchase should be restricted to those goods whether raw or manufactured which were not in short supply and could be safely spread without causing hardship to the Indian consumer or adversely affecting Indian economy.

নয়াদিল্লী থেকে ১৯৪৫ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে প্রচারিত এসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত সরকার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আর্তত্রাণ ও পুনর্গঠন সমিতিকে সাড়ে ছয় কোটি টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করতে রাজী হয়েছেন। ভারত সরকার যে আট কোটি টাকা দান করতে সিদ্ধান্ত করেছেন, তার মধ্য থেকে উদ্বৃত্ত দেড কোটি টাকা নগদ দেওয়া হবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আর্তত্রাণ ও পুনর্গঠন সমিতির কর্তৃপক্ষের হাতে জাহাজী পরিবহণের সুবিধামতো সেই পণ্যের সরবরাহ চার মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে। ভারত থেকে পণ্য সরবরাহ ও পণ্য সংগ্রহ প্রণালী সম্পর্কে গত ১০ই জুলাই থেকে ২৯শে জুলাই পর্যন্ত ভারত সরকার ও ইউ. এন. আর. আর. এ. মিশনের মধ্যে যে আলোচনা হয়, এ সব তারই ফল। উভয় প্রশ্নেই ভারত সরকারের অভিমত ও তাতে মিশনের সম্মতির ওপর আলোচনা থেকে উপনীত সিদ্ধান্তের ভিত্তি রচিত হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইউ. এন. আব. আর.-এর মানব-কল্যাণমূলক উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে এবং দুঃস্থ-ত্রাণে সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্যদানের আগ্রহের কথা উল্লেখ করে ভারত সরকার তাঁদের পণ্য সরবরাহ নীতি সম্পর্কে বলেছেন, যে সব কাঁচা মাল বা পাকামালের সরবরাহ অল্প নয় এবং ভারতীয় ক্রেতাদের অসুবিধা না করে বা ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষতিসাধন না করে অনায়াসে যে সব পণ্য ছেড়ে দেওয়া যায়, সেই সব পণ্যের মধ্যে ক্রয় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

১৯৪৭

১. The season of the *aman* crop of 1942, that is the crop which would provide the main supply of rice for the year 1943, did not open propitiously. In June, rain was needed in most parts of the province, the monsoon having been late in establising it. If, and although rain was more plentiful in July, still more was needed. Cultivation had been delayed and the *aman* seedlings were suffering from drought in many places. The prospects, however, improved in August, and in September rain benefited the crops throughout the province. Taking the season as a whole the weather was not favourable, particularly in West Bengal—the most important rice-producing area in the province. It was at this stage that West Bengal was visited by a great natural calamity which took a heavy toll of life and brought acute distress to thousands of homes. On the morning of October 16, 1942, a cyclone of great intensity accompanied by torrential rains, and followed late in the day by three tidal waves, laid waste a strip of land 7 miles wide along the cost in the districts of Midnapore and 24-Parganas.

১৯৪২ সালের যে আমন ধান ১৯৪৩ সালের অধিকাংশ অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করতো, তার মরশুম আশাপ্রদভাবে সূচিত হয়নি। জুনমাসে মৌসুমীর আগমন বিলম্বিত হওয়ায় প্রদেশের অধিকাংশ স্থানেই বৃষ্টির প্রয়োজন ছিল ; জুলাইমাসে প্রচুর বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও আরো অধিক পরিমাণ বৃষ্টির প্রয়োজন হলো। চাষের কাজ হলো বিলম্বিত এবং বহুস্থানে অনাবৃষ্টির জন্যে আমন চারাগাছগুলির ক্ষতি হয়েছিল যথেষ্ট। যা হোক, আগষ্ট মাসে অবস্থার উন্নতি হলো এবং সেপ্টেম্বর মাসের বৃষ্টি সারা প্রদেশের ফসলের উপকার সাধন করলো। মরশুমের সামগ্রিক বিচারে আবহাওয়া অনুকূল ছিল না, বিশেষতঃ প্রদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধান উৎপাদনকারী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গে তো নয়ই। ঠিক সেই অবস্থাতেই পশ্চিমবঙ্গে নিদারুণ প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিল, যার ফলে প্রচুর জীবনহানি ঘটলো এবং হাজার হাজার পরিবারে যা বয়ে নিয়ে এলো চরম দুর্গতি। ১৯৪২ সালের ১৬ই অক্টোবরের সকালে মুষলধারে বৃষ্টিসহ প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা এবং পরে ঐ দিনেরই শেষের দিকে সমুদ্রের তিনটি তরঙ্গোচ্ছ্বাস মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগনা জেলার সমুদ্রোপকূলবর্তী সাত মাইল বিস্তৃত ভূখণ্ড একেবারে বিধ্বস্ত করে দেয়।

২. The main trends in the world production and distribution of gold noticed in 1943 continued during 1944. The production of gold which had been rising, particularly since 1934, partly as a

result of the rise in its dollar value from $20.67 to $35 an ounce in February, 1934 reached the peak of 41 million ounces in 1940, and stood at 40 million ounces in 1941 ; during the seven years 1934 to 1940 production had expanded by about 50 per cent. There has been a continuous decline in the production during the three years ended 1944 owing mainly to the need to direct manpower and equipment from gold mines to the more pressing requirements of the War. The total world output declined by 10% in 1942, 17% in 1943 and 7% in 1944. Production in 1944 was lower than the record output of 1940 by above 32% the largest decline occurring in the United States where the output fell to as low a level as 20% of 1940. Production in South Africa showed a relative small decline of about 14% compared with the country's record output in 1941. The estimated production of gold in India amounted to 1,87,918 ounces as compared with 2,52,228 ounces in the previous year.

বিশ্বের স্বর্ণ-উৎপাদন ও বন্টনের প্রধান প্রবণতাগুলি ১৯৪৩ সালে যেমন দেখা গিয়েছিল ১৯৪৪ সালেও তা অব্যাহত থাকে। বিশেষ করে ১৯৩৪ সাল থেকে আউন্স প্রতি ২০·৬৭ ডলার থেকে ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে ৩৫ ডলারে—তার এই ডলার মূল্যবৃদ্ধির আংশিক পরিণামে স্বর্ণ-উৎপাদন ১৯৪০ সালে সর্বোচ্চ পরিমাণ ৪ কোটি ১০ লক্ষ আউন্সে ওঠে এবং ১৯৪১ সালে ৪ কোটি আউন্সে স্থিতিলাভ করে। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪০ সাল—এই সাত বছরে উৎপাদন প্রায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। স্বর্ণখনি থেকে যুদ্ধের প্রবলতর প্রয়োজনে প্রধানতঃ মানবশক্তি ও যন্ত্রপাতির স্থানান্তরের ফলে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তিন বছরে উৎপাদন ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। বিশ্বের মোট স্বর্ণ-উৎপাদন ১৯৪২ সালে ১০%, ১৯৪৩ সালে ১৭% এবং ১৯৪৪ সালে ৭% হ্রাস পায়। ১৯৪৪ সালের সর্বোচ্চ উৎপাদন ১৯৪০ সালের সর্বোচ্চ উৎপাদনের চেয়ে প্রায় ৩২% কম ছিল। সর্বাধিক উৎপাদন হ্রাস পায় যুক্তরাষ্ট্রে; সেখানে ১৯৪০ সালের উৎপাদনের হিসাবে ২০% পর্যন্ত নিম্নস্তরে নেমে যায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় উৎপাদন ১৯৪১ সালে দেশের সর্বোচ্চ উৎপাদনের তুলনায় যে প্রায় ১৪% হ্রাস পায়—তা আপেক্ষিকভাবে স্বল্পই। ভারতের আনুমানিক স্বর্ণ-উৎপাদন পূর্ববর্তী বছরের ২,৫২,২২৮ আউন্সের তুলনায় ১,৮৭,৯১৮ আউন্সে দাঁড়ায়।

৩. While India has been spared the material destruction that has befallen many other countries, she has suffered in full measure,

and in some directions in greater measure than others, the economic consequences of War. Her industrial equipment has been worked to the very edge of a breakdown and there is a large backlog of maintenance and replacement of her economic consequence of War. Her industrial equipment is to be made good; more than that the development of her economy and even her reconstruction are being delayed through her inability to obtain the necessary capital equipment owing to destruction and unsatisfied demands in the supplying countries. Civilian building has been almost entirely neglected for over five years and this presses heavily on a country where the large annual increase in population and where growing industrial development require a continually expanding building programme. In India as elsewhere there have occurred large shortages of consumer goods caused on the one hand by the failure of supplies from overseas and on the other by the diversion of a large part of her productive capacity to war purposes. Outstanding examples are textiles and food grains, though there were many other examples.

যুদ্ধের অর্থ নৈতিক প্রভাবে ভারতের যে বৈষয়িক ক্ষতি হয়েছে, তা অন্যান্য দেশেও সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পুরোপুরি, এমন কি কোন কোন ব্যাপারে সে অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তার শিল্পীয় সাজসরঞ্জামগুলিতে ভাঙনের প্রান্তসীমা পর্যন্ত কাজ করা হয়েছে এবং যুদ্ধের অর্থ নৈতিক ফলস্বরূপ তার রয়েছে সংরক্ষণ ও পুনর্স্থাপনার এক দীর্ঘ খতিয়ান। তার শিল্পীয় সরঞ্জামের ক্ষতিপূরণ করতে হবে; তার চেয়েও বড়ো কথা হলো, সরবরাহকারী দেশগুলিতে ক্ষতি ও অতৃপ্ত চাহিদার দরুন প্রয়োজনীয় মূলধনী সরঞ্জাম সংগ্রহে অসামর্থ্যের জন্যে তার অর্থনীতির উন্নয়ন ও পুনর্গঠন বিলম্বিত হয়েছে। প্রায় পাঁচ বছরের অধিক কাল ধরে বেসরকারী গৃহনির্মাণ সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত হয়েছে; যে দেশে জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধি বিপুল এবং যে দেশে শিল্পের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির জন্যে একটি ক্রম-সম্প্রসারণশীল গৃহনির্মাণ-কার্যসূচীর প্রয়োজন, সেই দেশে এই অবহেলা অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়েছে। একদিকে বিদেশ থেকে সরবরাহের ঘাটতির জন্যে এবং অন্যদিকে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে তার উৎপাদন শক্তির অধিকাংশের ভিন্নমুখিতার জন্যে অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও ভোগ্যপণ্যের বিপুল ঘাটতি সংঘটিত হয়েছে। অন্যান্য বহু দৃষ্টান্ত ছাড়াও বস্ত্র ও খাদ্য শস্যই তার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

১৯৪৮

১. Unfortunately, we are accustomed in these days all over the world to budget-deficits, and familiarity breeds contempt inspite of the fact that more than one awful example is before us among the nations of Europe of the chaos which continued budget-deficits inevitably induce. The individual who lives beyond his income year by year does not escape the penalty and the same is true of state. The individual who makes this mistake quickly finds himself compalled to a ruthless cutting down of his expenditure or is driven either to sell or mortgage a part or the whole of his possessions : or, in the worst event, to cheat his creditors. A State is in the same position, but the position is frequently obscured by the fact that the State's creditors are in another capacity the citizens of the State and its taxpayers.

দুর্ভাগ্যক্রমে, আমরা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী আয়ব্যয়ক ঘাটতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি এবং য়ুরোপীয় দেশগুলিতে অবিরাম আয়ব্যয়ক ঘাটতির অনিবার্য পরিণামে বিশৃঙ্খলার একাধিক ভীতিপ্রদ দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে থাকা সত্ত্বেও অতি পরিচিতির জন্যে ব্যাপারটাকে আমরা তুচ্ছ জ্ঞান করছি। যদি কোন ব্যক্তি বছরের পর বছর তার আয়ের বেশী ব্যয় করে, তাহলে সে যেমন দুঃখ ভোগের হাত থেকে রেহাই পায় না; তেমনি রাষ্ট্রের সম্পর্কেও এই কথা সমান সত্য। ব্যক্তি-বিশেষ এই ভুল করলে শীঘ্রই তাকে নির্মমভাবে ব্যয়-সংকোচে বাধ্য হতে হয় অথবা তার সম্পত্তির অংশবিশেষ কিংবা সম্পূর্ণটাই বিক্রী করতে বা বন্ধক দিতে হয়; আর সব চেয়ে শোচনীয় অবস্থায় তার পাওনাদারদের প্রতারণা করতে হয়। রাষ্ট্রের অবস্থাও একই রূপ, তবে রাষ্ট্রের পাওনাদাররাই অন্য দিক দিয়ে রাষ্ট্রের নাগরিক ও করদাতা হওয়ায় এই অবস্থা প্রায়ই অস্পষ্ট থেকে যায়।

২. The advances in the science of nutrition within recent years have been comparable in importance to the earlier discoveries in bacteriology which opened the way to control many deadly or handicapping diseases. Chemistry and physiology have given us a vast amount of new knowledge regarding the relation of food to human well-being. We know the certain diseases which affect immensely a number of people are caused solely by failure to get the right kind of food. We know what foods the human body needs not only to prevent diseases but to build resistance to many

others, lengthen the span of life, favour the birth of healthy children, and raise the power of many individuals to do physical and mental work formerly thought to be beyond their innate capacity.

জীবাণু-বিজ্ঞার যে প্রাথমিক আবিষ্কারগুলি বহু মারাত্মক ও দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়ন্ত্রণের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, সাম্প্রতিক কয়েক বছরের মধ্যে পুষ্টি-বিজ্ঞানের অগ্রগতি গুরুত্বের দিক দিয়ে তাদের সঙ্গে তুলনীয়। রসায়ন বিজ্ঞান ও শারীরবিদ্যা মানব স্বাস্থ্যের সঙ্গে খাদ্যের সম্পর্ক বিষয়ে আমাদের প্রচুর নতুন জ্ঞান দান করেছে। আমরা জানি, কতকগুলি ব্যাধি আছে, যাতে বহু ব্যক্তি আক্রান্ত হয়, তার মূলে রয়েছে উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণের ব্যর্থতা। কেবলমাত্র রোগ নিবারণের জন্যেই নয়, অন্যান্য বহু রোগের প্রতিরোধ শক্তি গঠনের জন্যে, আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির জন্যে, স্বাস্থ্যবান শিশুর জন্মদানের জন্যে এবং যা পূর্বে সহজাত সামর্থ্যের বাইরে মনে করা হতো সেই দৈহিক ও মানসিক কর্মশক্তি বৃদ্ধির জন্যেও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে মানব দেহের প্রয়োজনীয় কোন্ কোন্ খাদ্য দরকার, তা আমরা জানি।

৩. There are certain elements of mental outlook and character, whose participation in large mechanised industries is calculated to promote, such as alertness, application, decision and resourcefulness. Agriculture, to the extent that it depends so largely on the forces of nature, tends to produce a passive outlook; and the long periods of seasonal unemployment incidental to it create an attitude of general lethargy. There are undoubtedly valuable traits of character which an agricultural environment helps to produce and much of what is often described as the spiritual heritage of our people is to be traced to the agricultural environment in which we live and work. But in the work-a-day world in which we are placed, this needs to be supplemented and corrected by habits associated more directly with an industrial environment.

মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং চরিত্রের এমন কতগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলি বৃহৎ যন্ত্র-শিল্পে অংশ গ্রহণে কর্মতৎপরতা, গভীর মনোনিবেশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ইত্যাদি বিকশিত হয় বলে মনে করা হয়ে থাকে। কৃষি প্রাকৃতিক শক্তির উপর এত বেশী নির্ভর করে যে তাতে একটা নিষ্ক্রিয় মনোভাবের সৃষ্টি হয়; এবং তার প্রাসঙ্গিক ঋতুগত বেকারত্বের সুদীর্ঘ সময় একটা সাধারণ জড়ত্ব-পূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি করে। কৃষিগত পরিবেশ নিঃসন্দেহে কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

উন্মেষে সাহায্য করে—যার অধিকাংশই আমাদের জাতির আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার বলে প্রায়ই বর্ণিত হয়, তার বিকাশ আমরা যে কৃষিগত পরিবেশে বাঁচি ও কাজ করি, তার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু যে কর্মময় জগতে আমরা স্থান লাভ করেছি, তা শিল্পীয় পরিবেশের সঙ্গে আরো প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত অভ্যাসের দ্বারা সংযোজিত ও সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন।

১৯৪৯

১. In 1830 Rammohan Roy went to England, where the Charter of the East India Company, which was to determine the method of the East India Company's rule in India for a long period, was again to come up for discussion. In Europe Rammohan was received with respect and appreciation. His explanations of the judicial and taxation systems in India and of the conditions in which the Indian people live awoke great interest. He unfortunately died during his stay in England, so that this Indian who is undoubtedly one of the makers of the spiritual history of mankind, whose efforts at enlightenment are part of the universal heritage was buried in Europe.

রাজা রামমোহন রায় ১৮৩০ সালে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দীর্ঘকালীন শাসন-পদ্ধতির স্বরূপ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে রচিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদটির পুনরালোচনার জন্যে সেখানে উপস্থাপিত হবার কথা ছিল। য়ুরোপে রামমোহন শ্রদ্ধা ও সমাদর সহকারে অভ্যর্থিত হন। ভারতের বিচার-ব্যবস্থা ও করনীতি সম্পর্কে এবং ভারতের জনগণ যে পরিবেশে জীবন যাপন করে, সে সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা গভীর আগ্রহের সৃষ্টি করে। দুভাগ্যবশতঃ ইংলণ্ডে অবস্থিতি কালেই তাঁর মৃত্যু হয়। যিনি নিঃসংশয়ভাবে মানব জাতির আধ্যাত্মিক ইতিহাস-স্রষ্টাদের মধ্যে একজন, জ্ঞানালোক-বিস্তারে যাঁর প্রচেষ্টা ছিল বিশ্বজনীন উত্তরাধিকারের অংশবিশেষ, সেই মহান্ ভারতীয় য়ুরোপে সমাহিত হলেন।

২. The vast majority of the people of Ceylon live in windowless, mud-walled huts, thatched with plaited cocoanut leaves or straw. Under their own kings none but the nobles were allowed to live in tiled or whitewashed houses. Each hut is usually embowered

in a little garden containing a few cocoanut trees, clumps of broad-leaved plantain and sugarcane, with a few coffee bushes, custard apples, pine-apples, and other fruit trees and plants scattered about. Many houses have pumpkin vines growing over the roofs. Fruits and vegetables form a large part of the food of the people. For condiments and relishes they have chillies, turmeric, tamarinds and other pungent fruits and roots.

সিংহলের বিপুল সংখ্যক লোক স্তরবদ্ধ নারিকেল-পাতায় ছাওয়া বা খড়ে-ছাওয়া, জানালা-বিহীন, মাটির দেওয়ালের কুঁড়েঘরে বাস করে। দেশীয় রাজার অধীনে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ টালির বা চুনকাম করা বাড়িতে বাস করার অনুমতি পেত না। প্রত্যেকটি কুঁড়ে ঘরের চার পাশে কিছু নারিকেল গাছ, চওড়া-পাতা কলার ঝাড়, আখ, কফির ঝোপ, আতা, আনারস ও অন্যান্য ফলের গাছ এবং বিক্ষিপ্ত চারাগাছের ছোট্ট একখানি বাগান সাধারণতঃ থাকে। অনেক বাড়ির ছাতে কুমড়ো গাছ উঠেছে লতিয়ে। ফল ও তরিতরকারি ওদেশের জনগণের খাদ্যের একটি বড়ো অংশ। চাট্‌নি ও মুখরোচক আচারের জন্যে তারা লঙ্কা, হলুদ, তেঁতুল ও অন্যান্য ঝাঁঝালো ফল ও শিকড় ব্যবহার করে থাকে।

৩. The general attitude towards abolition of the Zamindari System in India seems somewhat more certain than a year ago. In an inflationary period it is important to preserve sources of revenue, especially when, as now, provinces are finding it difficult to reduce expenditure, are for some purposes having to increase it and have been warned by the Centre not to weaken its borrowing powers. These are not the only practical difficulties. Moreover, at least as important as abolition itself is the policy to be adopted after it. On this the Agrarian Reforms Committee has yet to report and it may be held that the merits of provincial legislation cannot be properly judged until what is to replace Zamindary has been broadly settled.

ভারতের জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের প্রতি সাধারণ মনোভাব এখন এক বছরের আগের চেয়ে প্রায় নিশ্চিততর। মুদ্রাস্ফীতির যুগে বিশেষতঃ বর্তমানে যখন প্রদেশগুলির পক্ষে ব্যয়-সংকোচ করা কঠিন হয়ে উঠেছে, উপরন্তু যেখানে নানা কারণে ব্যয়াধিক্য ঘটছে এবং যখন কেন্দ্রীয় সরকার তার ঋণ-সংগ্রহ-ক্ষমতা খর্ব না করার জন্যে সতর্ক করে দিয়েছেন, তখন রাজস্বের সূত্রগুলিকে সংরক্ষণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কেবলমাত্র

এইগুলিই বাস্তব অসুবিধা নয়। অধিকন্তু, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর কিরূপ নীতি অবলম্বিত হবে, তাও জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে কৃষি সংস্কার সমিতি কোন মতামত দাখিল করেন নি। এবং জমিদারী প্রথার স্থানে কি প্রথা অবলম্বিত হবে, তা যতদিন মোটামুটিভাবে স্থির না হবে, ততদিন প্রাদেশিক আইনের গুণাগুণ ঠিক মতো বিচার করা যাবে না বলে মনে হয়।

১৯৫০

১. The commercial value of mica is greatly affected by the ease with which it can be split into flat sheet, hardness, flexibility, colour, freedom from specks, stains and inclusions and size of the sheets. After the removal of broken flawed pieces, the sheets are trimmed, the product being then known as "dressed block". The wastage in this process alone amounts to between 70 to 80 per cent. The dressed mica is next sorted into various market sizes. After sizing comes the grading process in which the sheets are classified according to their freedom or otherwise from stains and inclusions. Over 80 per cent of the exports, however, consist of splittings made by separating the smaller sizes into the thinest possible films, one thousand films to the inch being the usual standard.

অভ্রের পাতলা চাদরে পরিণত হওয়ার সহজসাধ্যতা, তার কাঠিন্য, নমনীয়তা, তার রং, তার দাগ-চিহ্নহীনতা এবং তার চাদরগুলির আকার—এই সব বিষয়ের দ্বারা অভ্রের বাণিজিক মূল্য অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হয়। ভাঙা ত্রুটিপূর্ণ টুক্‌রোগুলির অপসারণের পর চাদরগুলিকে সাজানো হয়। তখন ঐ চাদরগুলি "পরিপাটী তাল" নামে অভিহিত হয়। শুধু এই প্রক্রিয়াতেই অপচয়ের পরিমাণ দাড়ায় ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ। পরিপাটী অভ্র পরে বাজারোপযোগী বিভিন্ন আকারে বিন্যস্ত হয়। আকারানুযায়ী বিন্যাসের পর ক্রম-বিন্যাসের কাজ সুরু হয়। তাতে কোনরূপ দাগ-চিহ্নহীনতা অনুযায়ী চাদরগুলি শ্রেণীবদ্ধ হয়। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারের অভ্রকে পৃথক করে যথাসম্ভব পাত্‌লা ফিল্মে পরিণত করবার জন্যে প্রয়োজনীয় টুক্‌রোগুলিতেই রপ্তানির ৮০ শতাংশেরও বেশী হয়ে যায়। এক ইঞ্চিতে এক হাজার ফিল্ম তৈরীই সাধারণ মান।

২. With the war, an era of industrial expansion dawned upon the country. The lessons taught by the war brought about a remarkable change in the industrial position of the country as also in the

outlook of its businessmen as compared with those of 1913. Government experienced a great shortage of materials required for munitions and the industries were handicapped on account of interruptions in the supply of machinery and stores. The Munition Board was started with the object of applying manufacturing resources of India to war purposes. But the industrial boom was shortlived.

যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই এদেশে শিল্প-প্রসারের এক নতুন যুগের সূত্রপাত হলো। ১৯১৩ সালের তুলনায় যুদ্ধলব্ধ জ্ঞান দেশের শিল্প-ব্যবস্থায় ও ব্যবসায়ীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করে। সরকার সমর-সরঞ্জামের জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণাদির তীব্র অভাব অনুভব করেন এবং যন্ত্রপাতি ও রসদসম্ভার সরবরাহের প্রতিবন্ধকতার ফলে শিল্পগুলি অসুবিধায় পড়ে। ভারতের উৎপাদন-শক্তিসমূহকে যুদ্ধের কাজে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে সমর-সরঞ্জাম পর্ষদ গঠিত হয়। কিন্তু শিল্পীয় তেজী বাজার ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল।

৩. The capital of Joint Stock Company is owned by a large number of shareholders by whom the management is made over to a board of directors and paid officers. The step is short but very important and it often alters the whole character of the business. Most of the shareholders have probably no knowledge whatever of the difficulties and needs of the enterprise. They have invested in it because somebody told them that it was a good thing, or have inherited shares in it and never troubled to enquire whether it was or was not judicious to keep them. Some of the directors are, perhaps, equally ignorant and then real business is done by a small minority, who save the rest from the consequences of their inexperience.

যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের মূলধনের মালিক হলেন বহু সংখ্যক অংশীদার; তাঁরা পরিচালক পর্ষদ ও বেতনভুক কর্মচারীদের হাতে এর ব্যবস্থাপনার কাজ তুলে দেন। এই ব্যবস্থাটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যবসায়ের সামগ্রিক চরিত্রের রূপান্তর সাধন করে। ব্যবসায় পরিচালনার অসুবিধা কি কি এবং তাতে কি প্রয়োজন—অধিকাংশ অংশীদারেরই হয়তো সে জ্ঞান থাকে না। তাঁরা তাতে যে অর্থ বিনিয়োগ করেছেন, কারণ ওটা যে ভালো কেউ তাঁদের বলেছে, অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁরা শেয়ারগুলি লাভ করেছেন এবং ওগুলি রাখা তাঁদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ কিনা তা

অনুসন্ধান করে দেখার মতো কষ্ট স্বীকার করেন নি। পরিচালকদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো সমান অজ্ঞ এবং তাঁদের প্রকৃত কাজ অল্প কয়েকজনের দ্বারা সম্পন্ন হয়। তাঁরাই অন্যান্য সবাইকে তাঁদের অনভিজ্ঞতার ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা করে থাকেন।

১৯৫১

১. In ordinary speech a wealthy man is a man with a large income. How do we state a man's income? Usually in pounds, dollars and francs, and in the same way we state a country's income in terms of money. But the pounds, shillings and pence are not the wealth. No one except the miser, desires them for their own sake; they are wanted only for their purchasing power. The real wealth consists of the things that the money will purchase and of those things we think when we try to realise what wealth is; the precious metals and precious stones, the materials and implements of manufactures, foodstuff, land and buildings, these and not their money-prices are what we mean by wealth.

সাধারণ কথায় যার আয় বেশী, সে-ই ধনী। মানুষের আয় আমরা কিভাবে প্রকাশ করি? সাধারণতঃ পাউণ্ড, ডলার ও ফ্রাঙ্কের সাহায্যে; ঠিক সেইভাবে কোন দেশের আয় আমরা অর্থের সাহায্যে প্রকাশ করে থাকি। কিন্তু পাউণ্ড, শিলিং ও পেন্স সম্পদ নয়। কৃপণ ছাড়া আর কেউ তা নিজের জন্যে আকাঙ্ক্ষা করে না, ক্রয় ক্ষমতার জন্যেই তাদের আকাঙ্ক্ষা করা হয়ে থাকে। অর্থের সাহায্যে যে জিনিষ ক্রয় করা যায় এবং চেষ্টা করলে যাকে আমরা সম্পদ বলে উপলব্ধি করতে পারি, প্রকৃতপক্ষে তাই হলো সম্পদ। মূল্যবান ধাতু, মূল্যবান পাথর, উৎপাদনের উপকরণ ও যন্ত্রপাতি, খাদ্যদ্রব্য, জমি ও ঘরবাড়ি—সম্পদ বলতে আমরা এই সব বুঝি, তাদের মুদ্রা-মূল্যকে নয়।

২. The most serious difficulty which confronts the wage-earner is unemployment. The failure of our economic organisation to utilize fully all the labour power at its disposal constitutes one of its most glaring defects. If the economic process were perfectly efficient, every able-bodied adult whose time was not needed in the home would be kept fully employed. Unfortunately, such a state of full employment is far from actual attainment. There is always

a considerable amount of unemployment which in recent years has reached alarming proportions.

বেতনভোগীদের পক্ষে ভীতিপ্রদ সবচেয়ে কঠিনতম সংকট হলো বেকারত্ব। আমাদের অর্থনৈতিক সংগঠনের হাতে সমগ্র শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহারীকরণের ব্যর্থতাই তার অন্যতম প্রধান ত্রুটি। আমাদের অর্থনৈতিক কার্য-পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে সুষ্ঠু হলে গৃহকর্মে যেসব সক্ষম-দেহী প্রাপ্ত-বয়স্কদের প্রয়োজন হয় না, তারা পূর্ণভাবে নিযুক্ত হতে পারতো। দুর্ভাগ্যক্রমে, পূর্ণ নিয়োগের সেই অবস্থা প্রকৃত সফলতা থেকে বহু দূরে। সব সময়ই কিছু পরিমাণ বেকারত্ব থাকে, সাম্প্রতিক কালে তা পৌঁচেছে এক ভয়াবহ অনুপাতে।

৩. A bank renders many valuable services to the public as well as to the trade and industry of a country. Its most important service is that it pulls together the scattered savings of a community and makes them available to those who need funds for productive purposes. The ease with which money can be obtained from banks by businessmen acts as a stimulus to productive enterprise. They are also benefited by the advice and information which banks are always ready to place at their disposal.

ব্যাঙ্ক দেশের জনগণের এবং শিল্পবাণিজ্যের সেবায় প্রভূত মূল্যবান কাজ করে। তার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, সমাজের বিক্ষিপ্ত পুঁজিকে একত্রিত করা এবং উৎপাদন উদ্দেশ্যে মূলধনকামীদের হাতে তা সহজলভ্য করে তোলা। ব্যাঙ্ক থেকে যে রকম সহজে টাকা পাওয়া যায়, তাতে ব্যবসায়ীদের উৎপাদন-প্রয়াসে একটা প্রেরণা সঞ্চারিত হয়। ব্যাঙ্ক উপদেশ ও তথ্যাদি তাদের হাতে পৌঁছিয়ে দিয়ে তাদের উপকার সাধন করতেও সব সময় প্রস্তুত থাকে।

১৯৫২

১. If human beings are to enjoy more consumers' goods than the comparatively small quantity of goods provided free by nature they must labour to produce them. Now, although most persons have laboured to produce goods many do not understand clearly just what is meant by production. When we say that a man has produced some thing, we do not mean that he has created something

out of nothing, since a man can neither create nor destroy matter. All that man can do is to produce some change in such a way that it becomes more useful. So production consists in so changing things as to increase their utility.

বিনামূল্যে প্রকৃতি-দত্ত স্বল্প-পরিমিত দ্রব্য-সামগ্রীর চেয়ে মানুষকে অধিক পরিমাণে ভোগ্যপণ্য ভোগ করতে হলে তাদের উৎপাদন করতে তাকে অবশ্যই পরিশ্রম করতে হবে। বর্তমানে বহু লোক পণ্য-উৎপাদনে পরিশ্রম করলেও উৎপাদন বলতে ঠিক কি বুঝায়, অনেকে তা পরিষ্কারভাবে বোঝে না। যখন আমরা বলি যে, কোন লোক কোন কিছু উৎপাদন করেছে, তার অর্থ এই নয় যে, কোন কিছুর সাহায্য ছাড়াই সে কিছু সৃষ্টি করেছে; কারণ মানুষ কোন বস্তু সৃষ্টিও করতে পারে না, ধ্বংসও করতে পারে না। মানুষ যা পারে, তা হলো বস্তুর এমনতরো রূপান্তর সাধন, যাতে তা আরো উপযোগী হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং উপযোগিতা বৃদ্ধির জন্যে বস্তুর এবম্বিধ পরিবর্তন সাধনই হলো উৎপাদন।

২. It is commonly asserted that to take from the rich part of their incomes in the form of income taxes or other taxes such as inheritance tax tends to retard the accumulation of capital and dissipate the capital accumulations of the past. Undoubtedly, if taxation of the rich is carried to an extreme such undesirable results will follow. Heavy taxation of the wealthy accompained by low taxation, or exemption from taxation of the poor may retard the accumulation of capital or dissipate past accumulations. But there is reason to believe that progressive taxation applied in moderation is not likely to bring these evil consequences in any marked degree. Sound public policy justifies a moderate amount of taking from the rich to give to the poor through the process of taxation and public expenditure.

সাধারণতঃ সুদৃঢ় মন্তব্য করা হয়ে থাকে যে, ধনীদের কাছ থেকে তাদের আয়ের কিছু অংশ আয়কর বা উত্তরাধিকার-কর রূপে গ্রহণ করলে মূলধন-সঞ্চয় বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের অতীতের সঞ্চিত মূলধন হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ধনীদের ওপরে করারোপ অতিরিক্ত হলে এরূপ অবাঞ্ছিত পরিণতি যে ঘটতে পারে, তাতে সন্দেহ নেই। বিত্তবানদের ওপরে অতিরিক্ত করারোপে এবং সেই সঙ্গে বিত্তহীনদের ওপরে স্বল্প করারোপে বা তাদের করমুক্তিতে মূলধন-সঞ্চয়ে বাধা সৃষ্টি হতে পারে বা অতীতের

সঞ্চিত মূলধন হ্রাস পেতে পারে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান কর-পদ্ধতি পরিমিতভাবে প্রযুক্ত হলে হয়তো এই কুফলগুলি উল্লেখযোগ্যরূপে দেখা দেবে না—একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। করারোপের মাধ্যমে বিত্তবানদের কাছ থেকে পরিমিত মাত্রায় অর্থ গ্রহণ করে সরকারী ব্যয়-পদ্ধতির মাধ্যমে বিত্তহীনদের দান করাই হলো দৃঢ় সরকারী নীতির পরিচায়ক।

৩. Since insolvency means a disagreement between assets and liabilities, often leaning heavily on the side of the latter nothing can be done until the financial position of the debtor has been accurately gauged. And this cannot be accomplished until a proper financial statement has been prepared. The law compels the debtor to make a statement of his affairs and his failure to do so renders him liable to be severely dealt with. As soon as possible after the statement of affairs has been drawn up, the creditors are called together and the position of matters is explained to them.

দেউলিয়া অবস্থা বলতে দেনা-পাওনার মধ্যে দারুণ অসঙ্গতি বোঝায় এবং এই অবস্থায় দেনার দিকটা অত্যধিক ভারী হয় বলে অধমর্ণের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা সঠিকভাবে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত কিছুই করা যায় না। এবং যে পর্যন্ত সঠিক আর্থিক বিবৃতি প্রস্তুত না হয়, ততদিন তা সম্পাদিত হয় না। আইনের দ্বারা অধমর্ণকে তার কার্যাবলীর বিবৃতি দিতে বাধ্য করা হয় এবং তাতে অপারগ হলে তাকে কঠোর শাস্তি দান করা হয়। কার্যাবলীর বিবৃতি প্রস্তুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তমর্ণগণকে একত্র আহ্বান করা হয় এবং ঘটনাবলীর পরিস্থিতি তাঁদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

১৯৫৩

১. The level of production and the material well-being of a community depend mainly on the stock of capital at its disposal—the amount of land per capita and of production equipments in the shape of factories, locomotives, machinery, irrigation facilities, power installations and communications. An increase in the stock of capital accompanied by knowledge of how to use it to the best advantage will lead to an increase in the community's output of goods and services and so to a rise in its material well-being. This may be put shortly in the sentence that "the key to economic progress is capital formation".

প্রধানতঃ, মাথাপিছু জমির পরিমাণ এবং কলকারখানা, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, জলসেচের সুবিধা, শক্তি-উৎপাদন যন্ত্রসমূহ ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার আকারে উৎপাদনের সাজ-সরঞ্জামের পরিমাণ—নিজের হাতে এই সব মজুত মূলধনের ওপর কোন সমাজের উৎপাদন-স্তর এবং পার্থিব সমৃদ্ধি নির্ভর করে। মজুত মূলধনবৃদ্ধি পূর্ণ-সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করবার জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হলে সমাজের পণ্য ও কার্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং তাতে তার পার্থিব সমৃদ্ধিও বৃদ্ধি পায়। এই কথাটিকে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যাকারে প্রকাশ করা যায়—"মূলধন সংগঠনই অর্থনৈতিক প্রগতির চাবিকাঠি।"

২. Inequalities of wealth can be reduced by fiscal measures. Death duties which are now an integral part of the system of taxation in advanced countries are an important equaliser. Over a period of years they can reduce inequalities to an extent that could be achieved straightaway only by the disruption of society. Direct taxation falling mainly or more heavily on the rich, can also be made to have an increasingly levelling effects, but here there is need for balancing the advantage of greater equality of incomes against the disadvantage of a possible fall in private savings and capital formation and general discouragement of productive activities.

রাজস্ব-ব্যবস্থার দ্বারা ধনবৈষম্য হ্রাস করা যায়। বর্তমানে সমৃদ্ধ দেশগুলির কর-ব্যবস্থায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মৃত্যু-কর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমতা-বিধায়ক। সমাজের সরাসরি ভাঙনের মাধ্যমে যে পরিমাণ বৈষম্য হ্রাস করা যায়, কিছুকালের মধ্যে মৃত্যু-কর তা করতে পারে। ধনীদের ওপরে প্রধানতঃ বা অধিকতর পরিমাণে আরোপিত প্রত্যক্ষ কর ক্রমবর্ধমান সমতাবিধায়করূপে প্রযুক্ত হতে পারে; কিন্তু ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও মূলধন সংগঠনের সম্ভাব্য হ্রাস এবং উৎপাদন-প্রয়াসের সাধারণ উৎসাহহীনতার অসুবিধাগুলির সঙ্গে আয়ের অধিকতর সমতার সুবিধাটি তুলনা করে দেখার প্রয়োজন আছে।

৩. A striking feature of the present structure of taxation in India is the relatively narrow range of the population affected by it. About 28 per cent of the total tax revenue comes from direct taxation (land revenue being treated as indirect tax) which directly affects only about half of one per cent of the working population. Another 17 per cent is accounted for by import duties which are derived to a large extent from consumers of commodities like motor vehicles, high quality tobacco, silk and silk manufactures, liquors

and wines and affect only a relatively small section of the population. On the other hand, land taxation contributes now only about 8 per cent of the total tax revenue compared with about 29 per cent in 1939.

তুলনামূলকভাবে জনসংখ্যার অতি অল্প পরিসর অংশের পীড়নই ভারতের বর্তমান কর-কাঠামোর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। মোট কর-রাজস্বের শতকরা প্রায় ২৮ ভাগ (ভূমি-রাজস্বকে পরোক্ষ কর হিসেবে ধরে) প্রত্যক্ষ কর থেকে আসে। কর্মরত জনসংখ্যার শতকরা মাত্র এক-অর্ধাংশের মতো প্রত্যক্ষভাবে তার মধ্যে পড়ে। অপর শতকরা ১৭ ভাগ আসে আমদানি শুল্ক থেকে; যা প্রধানতঃ মোটর গাড়ি, উচ্চ শ্রেণীর তামাক, রেশম, রেশমজাত দ্রব্য, সুরা, মদ্য ইত্যাদি পণ্য-ভোগীদের কাছ থেকে আসে এবং তা তুলনামূলকভাবে জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশকেই স্পর্শ করে। অন্যদিকে, ১৯৩৯ সালের শতকরা প্রায় ২৯ ভাগের তুলনায় বর্তমান ভূমি-রাজস্ব থেকে মোট কর-রাজস্বের শতকরা মাত্র প্রায় ৮ ভাগের মতো আসে।

১৯৫৪

১. No country which depends mainly on other countries for her progress and general well-being can hope to go far in achieving anything substantial. Apart from the fact that such a thing completely weakens that country receiving this outside aid, it prevents the creation of that atmosphere in which a country can begin to develop and grow on its inherent strength. Ultimately, it is the inherent strength of the country, which can take it forward. This is the most vital thing from which all progress must spring. If a country lacks this strength it is surely a sign of disease. A diseased country cannot grow. It must be healthy and be able to live on its own strength.

অগ্রগতি ও সাধারণ সমৃদ্ধির জন্যে যে দেশ প্রধানতঃ অন্য দেশের ওপর নির্ভর করে, সে দেশ প্রকৃত সমৃদ্ধির ব্যাপারে অধিকদূর অগ্রসর হতে পারে না। বহিরাগত সাহায্য যে ঐ দেশকে সম্পূর্ণরূপে দুর্বল করে তোলে, সে কথা বাদ দিলেও, যে পরিবেশে দেশ তার সহজাত শক্তির ওপর উন্নতি ও সমৃদ্ধির সূচনা করতে পারে, সেই পরিবেশ সৃষ্টিকেও করে বাধাগ্রস্ত। পরিশেষে, দেশের ঐ স্বাভাবিক শক্তিই তাকে অগ্রগতি দান করতে পারে। তাইই সর্বাপেক্ষা অপরিহার্য বস্তু, যা থেকে সকল অগ্রগতি স্ফুরিত হয়।

কোন দেশের এই শক্তিহীনতা নিশ্চিতরূপে একটি ব্যাধির লক্ষণ। ব্যাধিগ্রস্ত কোন দেশ বিকশিত হতে পারে না। তাকে তার নিজস্ব শক্তির ওপর বেঁচে থাকবার মতো সুস্থ ও সক্ষম হতে হবে।

২. Practically everyone is vitally interested in prices, because under present economic conditions the welfare, even the life of almost everyone depends upon goods that are bought and sold for a price. All persons except dependants are constantly buying and selling goods, either material objects or services. How many goods a man may enjoy depends largely upon the prices he gets for the things he sells and prices he pays for the things he buys. Obviously, if he sells his goods at low prices and buys the goods wanted at high prices he can buy fewer goods than if he sells at high prices and buys at low prices.

বাস্তবিকই, প্রত্যেকে মূল্য বিষয়ে গভীরভাবে উৎসাহী ; কারণ, বর্তমান অর্থ নৈতিক অবস্থায় কল্যাণ, এমনকি, প্রায় প্রত্যেকের জীবন মূল্য দিয়ে যে সব পণ্যের বেচাকেনা চলে, তার ওপর নির্ভর করে। পরাশ্রয়ী ছাড়া সকল ব্যক্তিই অনবরত পণ্যের বেচাকেনা করে, তা পার্থিব বস্তুই হোক বা শ্রম-কার্যই হোক। মানুষ কতটা পণ্য ভোগ করবে তা তার বিক্রীত পণ্যের ও ক্রীত পণ্যের মূল্যের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে। স্পষ্টতঃ স্বল্পমূল্যে পণ্য বিক্রয় করলে এবং উচ্চমূল্যে তার প্রার্থিত পণ্য ক্রয় করলে কোন ব্যক্তি উচ্চমূল্যে পণ্য বিক্রয় করে স্বল্প মূল্যে ক্রীত পণ্যের চেয়ে অল্প পণ্যই কিনতে পারে।

৩. The argument that large-scale modern industries were no solution of the employment problem did not take into account the indirect employment which the manufacturing industries created. The number directly employed in the factories might be small but eight to ten times these numbers shared the prosperity created by new industries by finding employment in the subsidiary industries. The real solution of this problem of unemployment lay thus in the diversification of employment. No one can deny that there are certain lines of activity in which small-scale industries could and must find an honourable place. But it is dangerous to attempt to develop cottage industries by penalizing large-scale industries.

যে যুক্তিতে বলা হয়েছিল যে, বৃহদায়তন আধুনিক শিল্পগুলিতে নিয়োগ-সমস্যার সমাধান হয়নি, তাতে উৎপাদন-শিল্পগুলির সৃষ্ট পরোক্ষ নিয়োগকে হিসেবের মধ্যে ধরা হয়নি। কারখানাগুলিতে প্রত্যক্ষ নিয়োগের সংখ্যা অল্প হতে পারে, কিন্তু সেই সংখ্যার আট থেকে দশগুণ লোক সহায়ক শিল্পে কাজ পেয়ে নতুন শিল্পের সৃষ্ট সমৃদ্ধির অংশীদার হয়েছে। বেকার সমস্যার প্রকৃত সমাধান এইভাবে নিয়োগের বৈচিত্র্য-সাধনের মধ্যে নিহিত রয়েছে। এমন কতকগুলি বিশেষ কার্যধারা আছে, যাতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি একটি সম্মানজনক স্থান লাভ করতে পারে এবং লাভ করবেই, তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষতিসাধন করে কুটির-শিল্পের উন্নয়ন-প্রয়াস হবে বিপজ্জনক।

১৯৫৫

১. "Credit", says an old proverb, "supports the farmer as the hangman's rope supports the hanged". But if credit is sometimes "fatal", it is often indispensable to the cultivator. An Indian proverb in verse tells him that only that village is fit to live in which has "a money-lender from whom to borrow at need, a Vaid to treat in illness, a Brahmin priest to minister to the soul and a stream that does not dry up in summer." Agricultural credit is a problem when it can't be obtained ; it is also a problem when it can be had—but in such a form that on the whole it does more harm than good. It may be said that, in India it is this two-fold problem of inadequacy and insuitability that is presented by agricultural credit.

একটি প্রাচীন প্রবাদে আছে, 'জল্লাদের দড়ি যেমন ফাঁসির আসামীর অবলম্বন, ঋণও তেমনি অবলম্বন চাষীর।' কিন্তু ঋণ অনেক সময় 'মারাত্মক' হলেও চাষীর পক্ষে প্রায়শঃ অপরিহার্য। কৃষকদের জন্যে একটি ভারতীয় শ্লোকে আছে, 'যে গ্রামে বিপদে টাকা ধার দেবার মতো মহাজন আছে, রোগের চিকিৎসা করবার মতো বৈদ্য আছে, আত্মার সদ্‌গতি করবার মতো ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছে এবং নিদাঘে শুকিয়ে না যাবার মতো নদী আছে', সেই গ্রামই বসবাসের উপযুক্ত। কৃষি-ঋণ পাওয়া না গেলে সমস্যা, পাওয়া গেলেও সমস্যা—পাওয়া গেলে মোটের ওপর ভালোর চেয়ে মন্দই হয় বেশী। কৃষি-ঋণ ভারতে চিরকাল অপ্রতুলতা ও অনুপযোগিতা—এই দ্বিমুখী সমস্যাই তুলে ধরেছে, একথা বলা যেতে পারে।

২. The unemployment problem is not new in West Bengal. But its magnitude and acuteness have largely increased in recent years on account of certain socio-economic changes. Firstly, West Bengal's economy has suffered dislocation on account of increasing growth of population on the one hand and increasing effect of the transition from the use of hand-driven to power-driven machines on the other. Secondly, the middle class economy in the state has been dislocated by the loss of its supports from land and by the distintegration of the joint family. Almost every family had a home and some income from land. This together with the joint family system provided insurance against sickness and unemployment. But it is common experience of all that under the stress of economic circumstances this joint family is breaking down fast and the family home and the family land are also disappearing quickly.

পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা নতুন নয়। কিন্তু কতকগুলি বিশেষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কারণে এর বিশালতা ও তীব্রতা সাম্প্রতিক কয়েক বছরে অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথমতঃ, একদিকে জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির ফলে এবং অন্যদিকে হস্তচালিত যন্ত্র থেকে শক্তিচালিত যন্ত্রে পরিবর্তনের ক্রমবর্ধিষ্ণু পরিণামে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির সন্ধি-চ্যুতি ঘটেছে। দ্বিতীয়তঃ, ভূমির অবলম্বন-চ্যুতি এবং একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙ্গনের ফলে এই রাজ্যের মধ্যবিত্ত সমাজের আর্থিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। প্রায় প্রত্যেক পরিবারের ছিল একটি বাড়ি এবং জমি থেকে কিছু রোজগার। অসুস্থতা ও বেকার অবস্থার জন্যে সেই আয় এবং একান্নবর্তী পরিবার-প্রথা করতো বীমার কাজ। কিন্তু সকলের সাধারণ অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে, অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে একান্নবর্তী পরিবার প্রথা দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছে এবং পারিবারিক গৃহ ও পারিবারিক জমিন দ্রুত অন্তর্হিত হচ্ছে।

১৯৫৬

১. Indian agriculture has been a gamble of rains. Every year the monsoon fails in some part of the country imposing untold sufferings on the poor peasants. The importance of irrigation cannot, therefore, be over-emphasised. Irrigation ensures regular water supply to agriculturists and protects them from the vagaries of the monsoon. It thus prevents famines and also helps to raise the yield from land. By diverting the flow of river waters it often prevents floods. The

prosperity of the agriculturists also confers benefits on the economy of the country as a whole. Because of the nature of the investment the financing of the construction of irrigation works cannot be entrusted or undertaken by private enterprise. The experiment was tried by the British Government under the regime of Lord Canning when two Canal Companies took up the Tungabhadra and Orissa Canal Projects, but it failed.

বৃষ্টির জুয়াখেলা হয়েছে ভারতীয় কৃষি। প্রতি বছরেই দেশের কোন না অংশে অনাবৃষ্টির ফলে দরিদ্র কৃষকদের ভাগ্যে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ ঘনিয়ে আসে। কাজেই জলসেচের গুরুত্বের ওপর আব অতি-গুরুত্ব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সেচ-ব্যবস্থা কৃষকদের নিয়মিত জলের যোগানের নিশ্চয়তা দান করে এবং তাদের রক্ষা করে মৌসুমীর খামখেয়ালের হাত থেকে। এইরূপে তা দুর্ভিক্ষের প্রতিরোধ করে এবং জমির উৎপাদনবৃদ্ধির করে সহায়তা। নদীর জল-স্রোতের গতি পরিবর্তন করে তা প্রায়ই বন্যা নিবারণ করে। চাষীর সমৃদ্ধি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিরও সমৃদ্ধি আনে। বিনিয়োগ-প্রকৃতির কারণবশতঃ সেচকার্যের নির্মাণ ব্যাপারে অর্থ সরবরাহ বেসরকারী উদ্যোগের হাতে তুলে দেওয়া যায় না বা সম্পাদিত হওয়া উচিতও নয়। লর্ড ক্যানিং-এর শাসন কালে ব্রিটিশ সরকার দুটি ক্যানেল কোম্পানীর হাতে তুঙ্গভদ্রা ও উড়িষ্যা খাল পরিকল্পনার ভার দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তা ব্যর্থতায় পর্যবসতি হয়।

২. The Defence expenditure of india has increased since Independence for various reasons. This increase is partly due to increased pay and allowances to Defence Services personnel and partly due to rise in prices that has followed Independence The partition of the country also necessitated the movement of troops and stores in connection with the reconstitution of the armed forces. The communal disturbances that took place in the Punjab and elsewhere also imposed additional expense on the army. The air-force and the army also helped in the evacuation of refugees from Pakistan. The partition of the country also deprived us of our greatest advantage in defence strategy of an impregnable land frontier. We have now a long frontier with no natural barriers in which large forces have to be employed for ensuring peace and safety.

স্বাধীনতার লাভের পর থেকে নানা কারণে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধি অংশতঃ প্রতিরক্ষা-কর্মীদের বর্ধিত হারে বেতন ও ভাতা দেওয়ার জন্যে এবং অংশতঃ স্বাধীনতার পর মূল্যবৃদ্ধির জন্যে। দেশ-বিভাগের ফলে সশস্ত্রবাহিনীর পুনর্গঠনের ব্যাপারে সৈন্যদল ও রসদ-সম্ভারের চলাচলের প্রয়োজন অনুভূত হয়। পাঞ্জাবে ও অন্যান্য স্থানে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্যে সৈন্যবাহিনীর খাতে অতিরিক্ত ব্যয় ধার্য করতে হয়েছে। বিমানবাহিনী ও সেনাবাহিনী পাকিস্তান থেকে বাস্তুহারাদের উদ্বাসনে সাহায্য করেছিল। আমাদের দুর্ভেদ্য স্থল-সীমান্তের যে সর্বশ্রেষ্ঠ সুবিধা ছিল, আমরা দেশ-বিভাগের ফলে তা থেকে বঞ্চিত হয়েছি। প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা-বিবর্জিত দীর্ঘ সীমান্ত এখন আমরা পেয়েছি, শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে সেখানে বিশাল বাহিনী মোতায়েন রাখা দরকার।

॥ দ্বিতীয় পর্যায় ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

● বাংলা থেকে ইংরেজি ●

১৯৫৭

রূপার হইতে নাঙ্গাল পর্যন্ত নূতন রেল লাইন স্থাপন করা হইয়াছে। বাঁধ অঞ্চল হইতে নাঙ্গাল উপনগর পর্যন্ত আরও একটি রেল লাইন নির্মাণ সমাপ্ত হইয়াছে। দুই কোটি টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত এই উপনগরে পনের হাজার লোকের বসবাসের জন্য গৃহ, বিশ্রামাগার, হাসপাতাল, গবেষণাগৃহ, আপিস, বিদ্যালয়, কল্যাণকেন্দ্র, শ্রমিকদের প্রমোদকেন্দ্র, ডাক ও তার বিভাগ, টেলিফোন আপিস, বাজার, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি ব্যবস্থা হইয়াছে।

এখানে যে কারখানা রহিয়াছে তাহাতে নূতন যন্ত্রপাতি তৈয়ারি ও মেরামত করা হইতেছে। সেখানে ইতিমধ্যে ছয় হাজার টন ইস্পাত তৈয়ারি করা হইয়াছে। প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য নাঙ্গালে পাঁচ হাজার কিলোওয়াটের বাষ্পচালিত যন্ত্র, পাঁচ শত কিলোওয়াটের দুইটি টার্বো সেট ও ডিজেল-চালিত যন্ত্র এবং ভাকরাতে

দুই হাজার চারিশত কিলোওয়াটের ডিজেল-চালিত বিদ্যুৎ-উৎপাদন যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। এই অঞ্চলের অভূতপূর্ব উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

সংকেত: স্থাপন করা হইয়াছে—Has been constructed. বাঁধ অঞ্চল—Dam area. নির্মাণ সমাপ্ত হইয়াছে—Construction has been completed. গবেষণা-গৃহ—Research centre. কল্যাণকেন্দ্র—Welfare centre. শ্রমিকদের প্রমোদকেন্দ্র—Recreation centre for labourers. ডিজেল-চালিত—Diesel propelled. অভূতপূর্ব—Unprecedented. অবশ্যম্ভাবী—Inevitable.

১৯৫৮

আমাদের ইহা দৃঢ় ধারণা যে আদ্রা-হাওড়া সেক্সনের মধ্যে বাঁকুড়া ষ্টেশন হইতে রেল কোম্পানীর যে আয় হয় সেরূপ আয় এই সেক্সনের মধ্যে অন্য কোন ষ্টেশনেই হয় না। কোম্পানীর হিসাবাদি দেখিবার সুযোগ আমাদের না থাকিলেও আমরা ইহা অনুমানের ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারি যে, প্রতি মাসে বাঁকুড়া ষ্টেশন হইতে সর্বরকমে রেল কোম্পানীর প্রায় ছয় লক্ষ টাকা আয় হইয়া থাকে। মাসিক এইরূপ আয় হওয়া কথার কথা নহে। অথচ ষ্টেশনের অবস্থা যাহা তাহা মেদিনীপুর পুরুলিয়া হইতে শতগুণে নিকৃষ্ট। ষ্টেশনে উচ্চ প্ল্যাটফর্ম না থাকার জন্য মহিলা, রুগ্ন, বৃদ্ধ ও শিশুদিগকে লইয়া যাত্রীদিগকে যে কি হয়রানিই হইতে হয় তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বিশ্রামাগারটি যখন সংস্কার করা হইল এবং অপর একটি নূতন শেড তৈয়ারি করা হইল তখন আশা হইয়াছিল যে এই সঙ্গে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম উচ্চ করা হইবে। এই অসুবিধার প্রতি কর্তৃপক্ষের নজর পড়ে নাই কেন?

সংকেত: অনুমানের......নির্ভর করিয়া—On assumption. সর্বরকমে—From all its sources. কথার কথা—A mater of joke. শত গুণে নিকৃষ্ট—Worse by hundred times. হয়রানি—Harassment. ভুক্তভোগী—sufferers. সংস্কার করা হইল—Was reconstructed. কর্তৃপক্ষ—Authority.

১৯৫৯

সাত বন্ধু বেকার এবং শিক্ষিত, তাহাদের তিনজন বিবাহিত। তাহারা চাকুরির জন্য নানাস্থানে দরখাস্ত করে, নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়ায়। চাকুরি কিন্তু হয় না। নিরাশ হইয়া তাহারা ঠিক করিল, চাকুরির খোঁজে আর নয়—অন্নাভাব ঘুচাইবার সত্যকার

পথের সন্ধানে এবার নামিতে হইবে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহারা কৃষিকার্যে নামিয়া পড়াই স্থির করিল। নিজেদের সোনা-রূপা বিক্রয় করিয়া, হাওলাত করিয়া এবং নানা-প্রকারে তাহারা ১০,০০০ টাকা জোগাড় করিল। কাজ সুরু হইয়া গেল। তাহাদের প্রাথমিক সম্বল চারিটি গাই—প্রতিদিন সকালে-বিকালে পনের-ষোল সের দুধ পাওয়া যায়। নিজেদের জন্য পাঁচ সের রাখিয়া বাকি দুধ তাহারা বিক্রয় করে। তাহাতে গড়ে রোজ আট টাকা রোজগার হয়। জলতোলা ও ধানভানা কল আসিল। যখন জল তুলিবার দরকার হয় না তখন ঐ কল দিয়া ধান ভানিয়া কিছু রোজগার হইতে লাগিল। ছয় ঘণ্টাতে গড়ে চব্বিশ মণ ধান ভানিয়া আঠারো টাকা মুনাফা আসিতে লাগিল।

সংকেত: অন্নাভাব......নামিতে হইবে—Must take to a real path to bring an end to starvation. হাওলাত করিয়া—By borrowing. জোগাড় করিল—Procured. প্রাথমিক সম্বল—Primary asset. জলতোলা ও ধানভানা কল—Water-pump and paddy-husking machine. ধান ভানিয়া—By husking.

১৬০

ভারতে স্বল্পবিত্তদের গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা ১৯৫৪ সালে গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৮ সালের শেষাশেষি সমগ্র ভারতে প্রায় ৩৫ হাজার বাসগৃহ নির্মিত হইয়াছে এবং আরো ১৪ হাজার বাসগৃহের নির্মাণ কার্য চলিতেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসের শেষাবধি, মোট প্রায় ২৯ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

ভারতে সহরবাসীদের অধিকাংশের আয় স্বল্প বলিয়া তাঁহারা সরকারী সাহায্য ব্যতীত নিজ নিজ বাসগৃহ নির্মাণ করিতে পারেন না। তাঁহাদের সাহায্যের জন্যই সরকার এই গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। বহু লোকেই এই পরিকল্পনার সুযোগ গ্রহণে ইচ্ছুক। কিন্তু জমির অত্যধিক মূল্য এবং ভাল জমির অভাবের জন্য, সকলের পক্ষে ইহার সুযোগ গ্রহণ [illegible] না। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে, বিভিন্ন রাজ্যের গৃহনির্মাণ-মন্ত্রীদের, এক সম্মেলনে, এই অসুবিধা সম্পর্কে, বিশেষ আলোচনার পর, স্থির হয় যে, পরিকল্পনা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত অর্থের একটা বড় অংশ রাজ্যসরকারসমূহ জমি সংগ্রহ ও উন্নয়নে ব্যয় করিবেন। উপরন্তু, অপর এক পরিকল্পনা অনুযায়ী, ভারত-সরকার রাজ্যসরকারসমূহকে, প্রকৃত বাসগৃহনির্মাতাদের মধ্যে বিনা-লাভ বিনা-ক্ষতি ভিত্তিতে জমি বণ্টনের উদ্দেশ্যে জমি সংগ্রহ ও উন্নয়নের জন্য অর্থ প্রদান করিবেন।

সংকেত : স্বল্পবিত্তদের গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা—Housing scheme for low income group. শেষাশেষি—Towards the end of. নির্মাণকার্য চলিতেছে—Under construction. শেষাবধি—To the end of. শহরবাসীদের—Townsfolk. বরাদ্দকৃত—Allocated. সংগ্রহ ও উন্নয়ন—Acquisition and development. বিনা-লাভ বিনা-ক্ষতি—No profit no loss.

১৯৬১

গ্রামীণ শিল্পের ক্ষেত্রে অনেক কারিগর পুরুষানুক্রমে পল্লীশিল্পে নিযুক্ত থাকলেও, কৃষিকাজ করে। তাতে জমির উপর আরও বেশী চাপ পড়ে। এই সমস্ত কারিগর আবার তাদের নিজেদের পৈতৃক ব্যবসায়ে ফিরে গিয়েছে ; অবশ্য, এজন্য তারা সরকার থেকে শিল্প-ঋণ পেয়েছে। এই ঋণ সুবিধামত কিস্তিতে শোধ করতে হয়। আবার অনেকে এই ঋণ নিয়ে বেশী পরিমাণে কাঁচামাল এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি কিনে রেখেছে। একথা সত্য যে, অনেক সময়ে এই ঋণ জমি পুনরুদ্ধারের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে অথবা কন্যার বিবাহে খরচ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যেখানে ঋণ সংগ্রহ করা খুবই দুষ্কর, সেখানে এই ধরনের ব্যয় অসম্ভব নয়। পল্লী অঞ্চলে হাজার হাজার নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। আর সেই বাবদ খরচের ব্যাপারেও পল্লীবাসীরা সাহায্য করেছে। পল্লীর জনসাধারণ পূর্বে একই পুকুরের জলে স্নান করত, কাপড়চোপড় কাচত, আবার সেই পুকুরের জলই তারা পান করত। কিন্তু এখন তারা নলকূপ থেকে বিশুদ্ধ জল পাচ্ছে।

সংকেত : পুরুষানুক্রমে—From generations to generations. নিযুক্ত—Engaged. পৈতৃক ব্যবসায়—Ancestral vocation. শিল্প-ঋণ—Industrial loan. সুবিধামত কিস্তিতে—In easy instalments. কর্মদক্ষতা—Efficiency of work. জমি পুনরুদ্ধারের কাজে—In reclamation of land. নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে—Tubewells have been sunk.

১৯৬২

কেন্দ্রীয় পূর্ত, গৃহ ও সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের সরবরাহ দপ্তর দেশী শিল্প উন্নয়নে উৎসাহদানের উদ্দেশ্যে মূল্য সম্পর্কে সুবিধা দান, দ্রব্য সরবরাহে দীর্ঘমেয়াদী ঠিকা ও দেশের কোনও দ্রব্যের সম্পর্কে যে অভাব আছে, সে সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ ক'রে থাকেন।

তা ছাড়া এই সংস্থা বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে ব্যবহারের জন্য দেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য কিনে থাকেন। দেশে নতুন নতুন পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে উৎসাহ

দেওয়া হ'য়ে থাকে। এই প্রচেষ্টার ফলে দেশীয় পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাতে বছরে প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা বেঁচে যাচ্ছে। রেলওয়ের প্রয়োজনীয় যে সব দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় এবং ভারতে যে সব দ্রব্যের অভাব রয়েছে, সেগুলির একটি তালিকা সরবরাহ দপ্তর প্রণয়ন করেছেন। এই তালিকা দেখে দেশী শিল্প উৎপাদকরা নতুন নতুন পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে উদ্যোগী হতে পারেন।

সংকেত: কেন্দ্রীয় পূর্ত গৃহ ও সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের সরবরাহ দপ্তর—The Supply Department of the Central Ministry of Public Works, Housing and Supply. দেশী শিল্প—Indigenous industries. দীর্ঘ মেয়াদী ঠিকা—Long-term contract. তথ্য—Information. প্রচুর পরিমাণ—In large quantities. বৈদেশিক মুদ্রা—Foreign exchange. প্রণয়ন করেছেন—Has prepared.

১৯৬২: কম্পার্ট

পশ্চিমবঙ্গে আমন ধানের ক্ষেতে চাস হয় বছরে পাঁচ থেকে ছ'মাস—বাকি সময়টা ক্ষেত পড়ে থাকে অনাবাদী অবস্থায়। চাষীরা অন্য কিছু বুনতে চান না। কারণ, তাঁরা আশঙ্কা করেন যে, এতে তাঁদের প্রধান শস্য আমন ধানের ক্ষতি হবে। কিন্তু তা হয় না। আমন ধানের ক্ষেতে রবি বা খারিফ শস্য বোনায় অসুবিধার কারণ আমন ধান চাষের সময়টা রবি ও খারিফ শস্য বোনার সময়ের অনেকটা জুড়ে থাকে। কিন্তু একথা সাদা পাট বোনার ক্ষেত্রে খাটে না।

একই ক্ষেতে দু'টি ফসল তুলতে হ'লে, আগে পাট এবং পরে আমন ধান বুনতে হয়। একটি যোগাবে খাদ্য, অপরটি আনবে টাকা।

কেন্দ্রীয় পাট কমিটি কৃষি ও আর্থিক গবেষণার ফলে এই মত প্রকাশ করেছেন যে, পশ্চিম বাংলার অনেক অঞ্চলে আমন ধানের নিচু ও মাঝামাঝি উঁচু জমিতে আমন ধানের আগে সাদা পাট বোনা উচিত।

সংকেত: আমন ধানের ক্ষেত—Aman paddy lands. অনাবাদী—Uncultivated. তাঁরা আশঙ্কা করেন—They are afraid. অসুবিধা—Disadvantage. রবি বা খারিফ শস্য—Rabi or Kharif crops. অনেকটা জুড়ে থাকে—Cover to some extent. কৃষি ও আর্থিক গবেষণা—Agricultural and financial research. আমন ধানের নিচু ও মাঝামাঝি উঁচু জমিতে—Low and medium high aman lands.

১৯৬৩

সমবায় ঋণ কমিটির সুপারিশ অনুসারে ভারত-সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া সমবায় ব্যাঙ্কগুলির ঋণদান-সীমা স্থিরীকরণের নিয়মাবলী শিথিল করেছেন। জামিন হিসেবে জমি বন্ধক না নিয়ে ৫০০ টাকা পর্যন্ত মাঝারি মেয়াদের ঋণ দেওয়া যেতে পারে, এবং ঋণ-গ্রহীতা জমি বন্ধক রাখলে ৫০১ টাকা থেকে ১,০০০ টাকা পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে।

প্রাথমিক সমিতি ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি যাতে সমাজের অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের উৎসাহদানে প্রেরণা পায়, সেজন্য তাদের সম্পূর্ণ সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজ্যের ১৯৬২-৬৩ সালের পরিকল্পনায় ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রাথমিক কৃষি-উৎপাদকের শক্তিবৃদ্ধির জন্য সমবায় বিপণন ও কৃষিজাত দ্রব্যের বিন্যাস একান্ত প্রয়োজন। আলোচ্য বৎসরে এই বিপণন ও বিন্যাসের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়।

১৯৬০ সালের ৩০শে জুন পযন্ত সমবায় সমিতি যে সব কৃষিদ্রব্যের বিপণন করেন তার মূল্য আনুমানিক ১৫৩ কোটি টাকা। প্রায় সকল রাজ্যে সমবায় সমিতিগুলি সম্পূর্ণরূপে রাসায়নিক সার বণ্টনের ভার গ্রহণ করেছেন। সেগুলি ক্রমশ উন্নত কৃষি-যন্ত্রপাতি, উৎকৃষ্ট বীজ, কীটনাশক দ্রব্য, চিনি, কেরোসিন এবং কৃষিকাজের উপযোগী লৌহ ও ইস্পাত বণ্টনের ভার নিচ্ছেন।

সংকেত : সমবায়······অনুসারে—On the recommendations of the Co-operative Credit Committee. ভারত সরকারের···অনুযায়ী—According to the decision taken by the Government of India. ঋণদান সীমা···শিথিল করেছেন—Has relaxed the regulations relating to the fixation of credit limit. জামিন—Security. বন্ধক—Mortgage. মাঝারি মেয়াদের ঋণ—Medium-term credit. ঋণ-গ্রহীতা—Debtor. অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের—The men in want. উৎসাহ দানে প্রেরণা পায়—Are stimulated to encourage. সমবায় বিপণন—Co-operative marketing. কৃষিজাত দ্রব্যের বিন্যাস—Gradation of agricultural commodities. রাসায়নিক সার—Chemical fertiliser. বণ্টনের ভার—Responsibility of distribution. উন্নত কৃষি-যন্ত্রপাতি—Improved agricultural machineries. উৎকৃষ্ট বীজ—Improved seeds. কীটনাশক দ্রব্য—Insecticides.

১৯৬৪

সমবায় ভাণ্ডার হ'ল ক্রেতাদের নিয়ে অর্থাৎ আমার আপনার মত যারা নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস বাইরের দোকান থেকে কিনে সংসার চালাই তাদের নিয়ে তৈরি একটা সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত দোকান বা ভাণ্ডার। সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস, যেমন ধরুন—চাল, ডাল, আটা, তেল, মসলা, কাপড়—এ ছাড়া আরও অনেক জিনিস সকলে বাইরের দোকান থেকে কেনেন। দোকানদার যে পরিমাণ লাভ রেখে জিনিস বিক্রি করে তা থেকে তার ঘর ভাড়া, কর্মচারীর বেতন, নিজের ভরণপোষণ ইত্যাদি নির্বাহ করবার পরও তার বেশ কিছু উদ্‌বৃত্ত আয় থাকে। ক্রেতারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যদি নিজেরাই সমবায় দোকান বা ভাণ্ডার স্থাপন করে এবং সেখান থেকে জিনিসপত্র কেনে তবে সে লাভ নিজেদেরই থেকে যাবে এবং সমবায় নিয়ম অনুসার সে টাকা নিজেদের মধ্যে ক্রয়ের উপর ছাড় বা রিবেট হিসাবে ভাগ ক'রে নিতে পারেন। তা ছাড়া আপনি জানেন যে, অনেক দোকানদার খারাপ জিনিস ভাল ব'লে চালায়; এবং অনেকেই কম ওজনের মাপ দিয়ে আপনাদের ঠকায়; আবার সুযোগ বুঝে সাময়িক ঘাট্‌তি অবস্থার সৃষ্টি ক'রে আপনাদের কাছ থেকে ইচ্ছে মত দাম আদায় ক'রে নেয়। সমবায় ভাণ্ডার স্থাপন ক'রে ক্রেতারা এ সবের হাত থেকে রেহাই পাবেন, কারণ সমবায় ভাণ্ডারের আদর্শ হ'ল ন্যায্য দামে ঠিক ওজনে ভাল ও খাঁটি জিনিস সরবরাহ করা।

সংকেত: সমবায় ভাণ্ডার—Co-operative store. বাইরের দোকান—Outside shops. একটা সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত দোকান বা ভাণ্ডার—A shop or store run on a co-operative basis. বেশ কিছু উদ্‌বৃত্ত আয় থাকে—There remains a surplus of returns to a great extent. ছাড় বা রিবেট—Discount or rebate. সাময়িক ঘাট্‌তি অবস্থার সৃষ্টি করে—Creating an occasional deficit situation. ক্রেতারা এ সবের···রেহাই পাবেন—The customers will get rid of all these. ন্যায্য দামে···সরবরাহ করা—To supply good and pure commodities at a fair price and in standard weights.

১৯৬২ [ত্রৈবার্ষিক]

কয়লাশিল্প ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। স্বভাবতঃই এই সময়ে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়, যেমন বাঙলা-বিহার কয়লাখনি অঞ্চলগুলি থেকে কয়লা প্রেরণে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সম্প্রতি খনিগুলিতে মজুত কয়লার পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু এজন্য হতাশ হবার কোন কারণ নেই। কারণ রেলওয়ে এ ব্যাপারে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করেছেন। দেশের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক ও দ্রুত অগ্রগতি ঘটছে। এর সঙ্গে সমান ভাবে ওয়াগন সরবরাহ কষ্টকর হ'য়ে উঠছে। তবে সকলেই নিজের নিজের নিম্নতম চাহিদা মেটাতে সক্ষম হচ্ছে। ইট তৈরির শিল্পগুলিরই সর্বাধিক উন্নতি হচ্ছে। অবশ্য কয়লা-ব্যবহারকারীদের মধ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই শিল্পের স্থান সর্বশেষে।

সংকেত : ক্রমোন্নতি—Steady progress. কয়লাখনি......হতে হচ্ছে—The transport of coal from coal-fields is facing various difficulties. মজুত কয়লা—The reserves of coal. ব্যাপক ও দ্রুত অগ্রগতি—Comprehensive and rapid progress. সমানভাবে......সরবরাহ—Supply of wagons at par. নিম্নতম চাহিদা—Minimum demand. ইট তৈরির শিল্পগুলির—Brick-manufacturing industries. অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে......সর্বশেষে—These industries occupy the lowest position in respect of priority.

১৯৬৩ [ত্রৈবার্ষিক]

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা কমিটিতে সম্প্রতি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জানান যে, সরকার কাঁচা পাটের মূল্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। গত বৎসর কাঁচা পাটের অভাবহেতু অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ বৎসর পাটের ফসল ভাল হয়েছে। সেজন্য মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর নজর রাখা আবশ্যক হয়েছে।

খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রীমহাশয় এই আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন ফসল উৎপাদনকারী চাষীদের স্বার্থরক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। গত কয়েক বৎসর ধ'রে পাটের অধিক ফসলের জন্য উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে পাটের উৎপাদন ১৯৪৭-৪৮ সালের ১৬ লক্ষ গাঁইট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬১-৬২ সালে ৬২ লক্ষ ৬৯ হাজার গাঁইট হয়েছে।

তিনি বলেন, অধিক ফলনের ফলে চাষীদের যাতে অসুবিধা না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে। জাতীয় স্বার্থেই তা করা প্রয়োজন। আশা করা যায়, পাটের মণ-প্রতি মূল্য সর্বনিম্ন ৩০ টাকার বেশী হবে।

কৃষি-সেক্রেটারী শ্রী জি আর কামাথ বলেন যে, পাট উৎপাদনের ব্যয় পর্যালোচনা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে ধানচাষের ব্যয়ের তুলনামূলক আলোচনা হবে। আশা করা যায়, ভারত-সরকার শীঘ্রই পাট উৎপাদকদের ন্যায্য মূল্য পাবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সমর্থ হবেন।

সংকেত : কেন্দ্রীয় খাদ্য......কমিটিতে—In the advisory committee of Central Ministry of Food and Agriculture. ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী—Minister in charge. সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন—Is keeping vigilant eyes. অস্বাভাবিক মূল্য—Abnormal price. মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি—Flactuation of price. আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন ফসল—Crop with international inportance. চাষীদের স্বার্থরক্ষার উপর—On the safeguard of the interests of the cultivators. গাঁইট—Bale. জাতীয় স্বার্থ—National interest পর্যালোচনা করা হচ্ছে—Is under review. তুলনামূলক আলোচনা—A comparative study. ন্যায্য মূল্য—Fair price.

১৯৬৪ [ত্রৈবার্ষিক]

গবাদি পশু থেকে দুধ, শ্রম এবং সার প্রভৃতির আকারে বিভিন্নভাবে উপকার পাওয়ার কথা সকলেই স্বীকার করবেন এবং এগুলি যে-কোন মিশ্র খামার-ব্যবস্থায় প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। সুতরাং এই জন্যই আমাদের সমগ্র মনোযোগ আমরা গৃহপালিত গবাদি পশুর উন্নয়নমূলক কাজে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করেছি।

সৌভাগ্যবশত আমাদের গৃহপালিত গবাদি পশুর সংখ্যা যথেষ্ট বেশী এবং অবিরতভাবে তা আরও বেড়েই চলেছে। এই প্রবন্ধের পরিশিষ্টেও তা দেখানো হয়েছে। নবম পঞ্চ-বাৎসরিক আদমসুমারিতে দেখানো হয়েছে যে প্রসূতি গাভীর সংখ্যা ৭·৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রসূতি মহিষীর ব্যাপারে সংখ্যাবৃদ্ধিটা আরও বেশী চমকপ্রদ এবং বর্তমানে প্রসূতি মহিষীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭৪·৫২ শতাংশ। কিন্তু গৃহপালিত গবাদি পশুর সংখ্যাবৃদ্ধিতে আত্মপ্রসাদ লাভ করার কোন হেতু নেই। শুধুমাত্র সংখ্যার পিঠে সংখ্যা হওয়াটাই বড কথা নয়, যদি না সেই সঙ্গে গবাদি পশুর উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। পশ্চিমবঙ্গের পশু-সম্পদ উন্নয়নের প্রধান কাজ এরই মধ্যে নিহিত। গবাদি পশুর উৎকর্ষ বৃদ্ধির ব্যাপারটা দুটো বড বড় জিনিসের ওপরে নির্ভরশীল, যথা—পশুর জাত বা বংশ এবং উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের সহজলভ্যতা।

সংকেত : গবাদি পশু থেকে—From cattle. দুধ, শ্রম এবং সার প্রভৃতির আকারে—In the shape of milk, labour and fertilizers. বিভিন্নভাবে...স্বীকার করবেন—Every body will agree to the various benefits. মিশ্র খামার ব্যবস্থায়—In the mixed farming system. গৃহপালিত গবাদি পশুর উন্নয়নমূলক কাজে—In the development works for the domestic animals like cattle etc. কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করেছি—Have attempted to concentrate on. এই

প্রবন্ধের পরিশিষ্টে—In the appendix of this essay. নবম পঞ্চ-বাৎসরিক আদমসুমারিতে—In the ninth five-year census. প্রসূতি গাভীর সংখ্যা—Number of the breeding cows. প্রসূতি মহিষী—Breeding buffaloes. চমকপ্রদ—Surprising. আত্মপ্রসাদ—Self satisfaction. পশুসম্পদ উন্নয়ন—Livestock improvement. পশুর জাত বা বংশ—Kind or heredity of animals. পুষ্টিকর খাদ্যের সহজলভ্যতা—Easy availability of nutritious food.

১৯৬৫ [ত্রৈবার্ষিক]—

কলিকাতার বাজারে উচিত মূল্যে আলু সরবরাহ সম্পর্কে কলিকাতার একটি দৈনিক সংবাদ পত্রের সাম্প্রতিক এক সংখ্যার সম্পাদকীয় স্তম্ভতে যে মন্তব্য করা হয়েছে, তার প্রতি পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। কৃষি ও সমষ্টি-উন্নয়ন বিভাগের আধিকারিকগণ সম্প্রতি এই বিষয়টি সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছেন। যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে তদনুসারে বিগত উদ্ভিদ-ক্ষয়কারী রোগের বিস্তারের দরুন কেবল পশ্চিমবঙ্গেই নয়, উপরন্তু পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের অংশ বিশেষেও চলতি বৎসরে উৎপন্ন আলুর প্রায় ৪০ শতাংশ নষ্ট হয়েছে। আলু উৎপাদনে এই বিপর্যয়ের ফলে বাজারে আলু সরবরাহ কমে গিয়েছে ও দ্রুত দাম বাড়ছে।

অবশ্য খুবই আশার কথা এই যে, স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত ২,০০০ থেকে ৩,০০০ মণ আলু ছাড়াও কলিকাতার বাজারে অন্যান্য রাজ্য থেকে ৩,০০০ থেকে ৪,০০০ মণ হিসাবে আলু আসতে আরম্ভ করেছে। ঐ সরবরাহের ফলে আলুর পাইকারী মূল্য মণপ্রতি ২০ টাকা থেকে ২৩ টাকার মধ্যে সুস্থিত আছে। অন্যান্য রাজ্য থেকে আলু আমদানিকারী ব্যবসায়ীরা রেলযোগে পরিবহণের ব্যাপারে কোনও অসুবিধায় পড়লে সরকার তাঁদের সহায়তা করবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সংকেত: উচিত মূল্যে—At a fair price. সাম্প্রতিক......করা হয়েছে—The comment made in the editorial column of a recent number. পশ্চিমবঙ্গ......হয়েছে—Attention of the West Bengal government has been drawn. কৃষি.........আধিকারিকগণ—Directors of Agriculture and Community Development. বিষয়টি.........করছেন—Are investigating the matter. যে রিপোর্ট......তদনুসারে—According to the report received. উদ্ভিদ-ক্ষয়কারী......দরুন—Due to the widespread of a crop-pest. চলতি বৎসরে—Current year. বিপর্যয়—Disaster. পাইকারী মূল্য—Wholesale price. সুস্থিত—Fixed. আমদানিকারী......প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—Has promised to help the businessmen who supply potatoes from other states in case of their any difficulty in the matter of transport by rail.

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৬১

নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি সবই নূতন-স্বাধীন-হওয়া দেশ, যাদের উপর পূর্বে সাম্রাজ্যিক এবং ঔপনিবেশিক শাসন এবং শোষণ বহুদিন ধরে চলে এসেছিল। আধুনিক বৈষয়িক দৃষ্টিতে এগুলি সকলেই কম বেশী অনুন্নত দেশ এবং ছোট হোক, বড় হোক, প্রত্যেকের সম্বন্ধেই এটা ধরে' নেওয়া হয়েছে যে বিদেশী সাহায্য ছাড়া এদের বৈষয়িক উন্নতি সম্ভব নয়। কিন্তু অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়নকল্পে যে সাহায্য আবশ্যক মনে করা হয়, তা যারা দিতে পারে তারা কিন্তু নিরপেক্ষ নয়।

সংকেত : নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি—Neutral states. সাম্রাজ্যিক এবং ঔপনিবেশিক শাসন এবং শোষণ—Imperial and Colonial domination and exploitation. আধুনিক বৈষয়িক দৃষ্টিতে—In the modern material outlook. বিদেশী সাহায্য ছাড়া—Without foreign aid. অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়নকল্পে—For the development purpose of the undeveloped countries. তারা কিন্তু নিরপেক্ষ নয়—Are not themselves neutral.

১৯৬২

১. ভারত সরকার বর্তমানে শিল্পে যে প্রকার বেপরোয়াভাবে অর্থ বিনিয়োগ করিতেছেন এবং তাঁহাদের শিল্পগুলি উৎপাদনের দিক হইতে বর্তমানে যেভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে তাঁহাদিগকে শিল্পপণ্য বিক্রয়ের জন্য বিদেশের বাজারের দিকে নজর দিতে হইবে। উহার একান্ত প্রয়োজনীয়তাও আছে। কারণ, স্বাধীনতা লাভের পর হইতে খাদ্যশস্যক্রয়, পরিকল্পনার রূপায়ণ ইত্যাদির জন্য ভারত সরকার ইতিমধ্যে বিদেশ হইতে যে বিপুল পরিমাণ ঋণ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও বেশী ঋণসংগ্রহে তাঁহারা যেভাবে উদ্যোগী হইয়াছেন তাহা সুদে আসলে পরিশোধের একমাত্র উপায় বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধি।

সংকেত : বেপরোয়াভাবে অর্থ বিনিয়োগ করিতেছেন—Are dauntlessly investing money. বিদেশের বাজারের দিকে নজর দিতে হইবে—Will have to cast eyes to the foreign markets. একান্ত প্রয়োজনীয়তা—Absolute necessity. পরিকল্পনার রূপায়ণ—Implementing the plans. বিপুল পরিমাণ ঋণ সংগ্রহ করিয়াছেন—Have procured loans in huge quantities. অদূর ভবিষ্যতে—In

near future. সুদে আসলে পরিশোধ—Paying off both the principal and the interest.

২. পশ্চিমবঙ্গে কৃষির উন্নতির ব্যাপারে গাফিলতি সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত নৈরাশ্যজনক। এই রাজ্য কৃষিজাত বহুপ্রকার পণ্যের ব্যাপারে পরনির্ভরশীল। পশ্চিমবঙ্গকে চালের জন্য উড়িষ্যার নিকট হাত পাতিতে হয়। গমের জন্য পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট ধরনা দিতে হয়। ডালের জন্য পশ্চিমবঙ্গ বিহারের উপর নির্ভরশীল। পশ্চিমবঙ্গে রান্নার কাজে ব্যাপকভাবে সরিষার তৈল ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এই সরিষা ও সরিষার তৈল আসে উত্তরপ্রদেশ হইতে। পশ্চিমবঙ্গের গুড ও চিনির অভাব মিটায় বিহার ও উত্তরপ্রদেশ।

সংকেত : কৃষির উন্নতির ব্যাপারে গাফিলতি—Neglect in the matter of the improvement of agriculture. নৈরাশ্যজনক—Disappointing. পরনির্ভরশীল—Dependent on others. ধরনা দিতে হয়—Has to pray to. রান্নার কাজে—For cooking purposes. সরিষার তৈল – Mustard oil, সরিষা—Mustard seed. অভাব মিটায়—Satisfies the wants.

১৯৬৩

১. বিগত বিশ বছর ধরে' আমরা লক্ষ্য করে' আসছি, দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে যে সব পণ্য অপরিহার্য, আমাদের দেশে সে সব পণ্যের ঘাটতি বিদ্যমান। উদাহরণ স্বরূপ আমরা দু'একটা পণ্যের উল্লেখ করছি, যেমন বস্ত্র, ঔষধ, পুষ্টিকর খাদ্য ইত্যাদি। পণ্যের ঘাটতির ফলে অসামরিক জনসাধারণের ন্যূনতম চাহিদাও মিটানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর উপর সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন মিটাবার জন্য যদি ঐ পণ্যের বিরাট অংশ নির্দিষ্ট করা হয়, তা হ'লে অসামরিক চাহিদা মিটানো স্বভাবতঃই আরও কষ্টকর হয়ে উঠবে। ফলে, পণ্যের দর চড়াবার জন্যও চেষ্টা সুরু হয়ে যাবে।

সংকেত : দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে—For daily life. অপরিহার্য—Essential. পণ্যের ঘাটতি—Deficit of commodity. পুষ্টিকর খাদ্য—Nutritious food. অসামরিক জনসাধারণ—Civil population. ন্যূনতম চাহিদা—Minimum demand. সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন—Necessity of the army. ঐ পণ্যের বিরাট অংশ—Huge portion of that commodity. অসামরিক চাহিদা মিটানো—To meet the civil demands. পণ্যের দর চড়াবার জন্যও—For increasing the price of goods.

২. কমন্ মার্কেটের সূচনা হয়েছে মাত্র পাঁচ বছর আগে। সদস্যরাষ্ট্রগুলির সম্মিলিত জাতীয় উৎপাদন ইতিমধ্যে শতকরা প্রায় বাইশ ভাগ বেড়েছে। বাণিজ্যের পরিমাণ বেড়েছে শতকরা তিয়াত্তর ভাগ। এ সব দেশের বৈষয়িক সমৃদ্ধি যে দ্রুত বাড়ছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। পরিসংখ্যান্ নিয়ে যাঁদের কারবার তাঁরা অনুমান করেছেন যে, আজ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে নব-ইউরোপ-এর রাষ্ট্রগুলি স্কুল, রাস্তাঘাট আর কল-কারখানায় আরও প্রায় বাড়তি চার লক্ষ টাকা ব্যয় করতে পারবে।

সংকেত ঃ কমন্ মার্কেটের সূচনা হয়েছে—The Common Market started. সদস্যরাষ্ট্রগুলির সম্মিলিত জাতীয় উৎপাদন—United national production of the member-states. বাণিজ্যের পরিমাণ—Volume of trade. বৈষয়িক সমৃদ্ধি—Material prosperity. বলাই বাহুল্য—Needless to mention. পরিসংখ্যান্ নিয়ে যাদের কারবার—Those who deal with statistics. নব-ইউরোপ-এর রাষ্ট্রগুলি—The Neo-European States, বাড়তি—Additional.

১৯৬৪

ভারতের অর্থনীতিতে ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়। প্রতি বৎসরই এই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারের বাজেট প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়া আছে ভারতের রেল বাজেট। ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে, সাধারণতঃ ফেব্রুয়ারীর শেষ দিনটিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট সংসদে পেশ করা হয়। ইহার কয়েক দিন পূর্বে বাহির হয় রেলপথের আয়ব্যয়ের হিসাব। আবার সঙ্গে সঙ্গে চলতি আর্থিক বৎসর, অর্থাৎ এপ্রিল হইতে মার্চ শেষ হওয়ার পূর্বেই বিভিন্ন রাজ্য সরকারের বাজেট উপস্থিত করা হয়। এই বাজেট হইতে আগামী বৎসরের আর্থিক অবস্থার ও বিনিয়োগ বাজারের সম্ভাব্য গতির নির্দেশ পাওয়া যায়।

সংকেত ঃ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়—Time momentous in particular. প্রকাশিত হয়—Is published. রেল বাজেট—Railway budget. সংসদে পেশ করা হয়—Is placed before the Parliament. আয়-ব্যয়ের হিসাব—Account of income and expenditure. চলতি আর্থিক বৎসর—Current financial year. উপস্থিত করা হয়—Is presented. আর্থিক অবস্থা—Financial condition. বিনিয়োগবাজার—Investment market. সম্ভাব্য গতির নির্দেশ—Hints on possible trend.

১৯৬৪ [ত্রৈবার্ষিক]

১. সকল সমস্যা আমাদিগকে এমন ভীষণ ভাবে ঘিরিয়াছে যে, তাহা হইতে মুক্তির কোন উপায় আমরা লক্ষ্য করিতেছি না। সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে এদেশে নূতন ধান উঠে বলিয়া ধান চাউলের দাম কমিয়া যায়। এ বৎসর ঠিক তাহার বিপরীত দেখা যাইতেছে। অগ্রহায়ণ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে চাউলের দাম বাড়িয়া •১০৲ টাকা মণের স্থানে ৪০৲ টাকা মণ হইয়াছে। মফঃস্বলে নূতন ধান ৮৲ মূল্য হইতে বাড়িয়া ১৮৲/২০৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে; ফলে মধ্যবিত্ত দরিদ্র ব্যক্তিগণের পক্ষে দুইবেলা ভাতের সংস্থান করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

সংকেত : [অনুবাদ অংশের ১০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।]

২. বাংলার চাষী দরিদ্র। সামান্য কয়েকখণ্ড জমির উপর তাদের সারা বৎসরের জীবিকা নির্ভর করে। আবহমানকাল থেকে তারা একই উপায়ে সেই জমি চাষ করে আসছে। বর্তমান যুগের সমুন্নত কৃষিবিদ্যা তাদের স্পর্শমাত্র করেনি। এই শতাব্দীতে কৃষি-বিজ্ঞানে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও উন্নতি হয়েছে, তার সাহায্যে ইউরোপ ও আমেরিকার কৃষক সম্প্রদায়ের অনেকেই প্রভূত সুখ ও সমৃদ্ধির অধিকারী হয়েছেন। কিন্তু আমাদের দেশের চাষী যে গরীব সেই গরীবই রয়ে গেছে।

সংকেত : সামান্য কয়েকখণ্ড জমি—A few plots of land. জীবিকা—Subsistence. আবহমানকাল থেকে—From time immemorial. সমুন্নত কৃষি-বিদ্যা—Improved methods of cultivation. তাদের স্পর্শমাত্র করেনি—They have not yet come in touch with. বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও উন্নতি—Revolutionary changes and developments. প্রভূত সুখ ও সমৃদ্ধি—Much happiness and prosperity. যে গরীব… …গেছে—Are poor as they were.

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৬৫

ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থার উপরেও টাকার গতিশীলতা অনেকটা নির্ভর করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা যখন উর্ধ্বগামী, তখন সকল শ্রেণীর মানুষকে অধিকতর উদার হইতে দেখা যায়। নানাবিধ পণ্য প্রস্তুত করিয়া দেশের সম্পদ গড়িয়া তুলিবার ভার যাহারা লইয়াছে, তাহারা যখন অপেক্ষাকৃত নির্ভয়ে অর্থব্যয় করিয়া নিজেদের ব্যবসায় ও কারবার সম্প্রসারণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহাদের নিয়োজিত শিল্পী ও শ্রমিক সকলেই সেই অর্থের ফলভোগী হইবার সুযোগ লাভ করে এবং মানুষের ব্যয়-বিমুখতা অনেকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি অধোমুখী হইলেই একটা ভীতির ও নিরাশার সঞ্চার হয় এবং এই সন্ত্রাসের ফলে চারিদিকে এইরূপ ব্যয়-সঙ্কোচ আরম্ভ হয় যে, তখন অর্থের ব্যবহার অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। যে অর্থ একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পঞ্চাশ হাত ঘুরিয়া পঞ্চাশটি কার্য সম্পন্ন করিতেছিল, তাহা হয়ত একই ব্যক্তির হাতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহার ফল ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে আরও ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়ায়—গত বিশ্বব্যাপী দুঃসময়ে হইয়াছিলও তাহাই।

সংকেত : গতিশীলতা—Circulation. উর্ধ্বগামী—Developing. নানাবিধ পণ্য……তুলিবার ভার—Responsibility of building up the wealth of a country by manufacturing varieties of goods. কারবার সম্প্রসারণ করিতে—To expand business. অর্থের……সুযোগ—Opportunity of enjoying the benefits of money. ব্যয়-বিমুখতা—Abstinence from expenses. ব্যবসা বাণিজ্যের…… হইলেই—As soon as there is a downward trend of trade and commerce. একটা ভীতির ও নিরাশার সঞ্চার হয়—A sense of fear and despair comes to prevail. ব্যয়-সঙ্কোচ—Curtailment of expenses. অর্থের ব্যবহার—Use of money. একটা নির্দিষ্ট……সম্পন্ন করিতেছিল—Performing various activities by its circulation through the hands of a number of people. একই ব্যক্তির……হইয়া পড়ে—Stands stagnant in the hands of an individual. গত বিশ্বব্যাপী দুঃসময়ে—In the past world-wide depression.

● ইংরেজি থেকে বাংলা ●

॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

১৯৫৭

১. It is sometimes stated that a man's wants are unlimited; that however much he has there is always something more that he desires to possess or in other words, that man is never completely satisfied. This is no doubt true in a general sense, but it is far too vague and needs a good deal of qualification. The wants we deal with in Economics are the wants which a person satisfies if he has the means of doing so; they are in fact the wants which give rise to *effective demands* which implies three things: the desire to possess a thing, the means of possessing it, and the willingness to use these means for this particular purpose.

সংকেত : Unlimited—অসীম। There is always……to possess—সর্বদা আরো কিছু থেকে যায়, যা সে পাবার আকাঙ্ক্ষা করে। Is never completely satisfied—কখনও সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয় না। Needs a good deal of qualification—যথেষ্ট বিচার-সাপেক্ষ। Effective demand—কার্যকরী চাহিদা।

২. Great Britain in 1890 passed its Old Age Pension Law. This provided free payment by the Government, as compared with the old-age insurance plan of Germany, in which employer, employee and Government all contributed. At the age of seventy a pension was to be paid to any needy individuals provided he or she had been a British subject for twenty years and had never been either a pauper or a criminal. The maximum pension was a little over a dollar a week. For many years old-age insurance programmes have been introduced in the United States for teachers and other Governmental employees.

সংকেত : Old Age Pension Law—বার্ধক্য ভাতা আইন। Free payment—নিঃসর্ত দান। Old-age insurance plan—বার্ধক্য বীমা পরিকল্পনা। Contributed—চাঁদা দিত। Needy individual—নিঃস্ব ব্যক্তি। Pauper—ভবঘুরে। Criminal—অপরাধী। United States—যুক্তরাষ্ট্র। Governmental employees সরকারী কর্মচারীগণ।

১৯৫৮

১. This first direct challange to the Government's declared determination not to give way to further wage claims by the nationalized industries has come from London's busmen, who have demanded a 25*s.* increase in their weekly pay. Nobody is in the least surprised. The demand was foreseen by most people last summer, when 1,77,000 provincial busmen were awarded an increase of 11*s.* a week—an award framed deliberately to reduce the differential between rates in London and the provinces. The Government's dilemma is apparent to all. To admit the London men's claim might simply mean that the whole process of "leap frogging" is set in motion again. Once that happens the flood-gates will be wide open.

সংকেত : The first direct challenge—প্রথম প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ। Government's declared determination—সরকারের ঘোষিত সংকল্প। Nationalized industries—রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পায়তনগুলি। Was foreseen—পূর্ব থেকে অনুমিত হয়েছিল। Framed deliberately—সুচিন্তিতভাবে রচিত। To reduce the differential—পার্থক্য হ্রাস করার উদ্দেশ্যে। Dilemma—সংকট। Apparent সুবিদিত। "Leap frogging"—"ভেক-লম্ফ"। Set in motion again—পুনঃ প্রবর্তিত করা। Flood-gates—বন্যানিয়ন্ত্রণের দ্বারগুলি।

২. Acharyya Vinoba Bhabe stated here today that the Gramadan movement and the land reforms contemplated by Governments were not opposed to each other. If that were so, he told Pressmen, that the Yelwal (Mysore) conference would not have accepted the ideal of Gramadan. The leaders who participated in the conference had agreed that the Gramadan movement would not come in the way of the Government's land legislation. The movement he had started was not idealistic but realistic. He was only propagating the demand of the time. Even Mr. Nehru had stated that the Gramadan movement had come to stay, and Mr. Nehru was a hard realist. Gramadan would not interfere with the ryot's initiative. If necessary, in a Gramadan village the available land could be cultivated on a co-operative basis or divided into blocks and then cultivated.

সংকেত : Gramadan movement—গ্রামদান আন্দোলন। Land reforms—ভূমি সংস্কার। Contemplated—পরিকল্পিত। Were not opposed to each other—পরস্পর-বিরোধী নয়। Pressmen—সাংবাদিকগণ। Yelwal (Mysore) conference—এল্‌বাল্ (মহীশূর) সম্মেলন। Would not……Gramadan—গ্রামদানের আদর্শ স্বীকার করতো না। That the Gramadan……land legislation—গ্রামদান আন্দোলন সরকারের ভূমি-সংক্রান্ত আইনের পথে এসে পড়েনি। Propagating—প্রচার করছিলেন। Had come to stay—স্থিতিলাভ করেছে। Ryot's initiative—রায়তদের আইনের অধিকার। Divided into blocks—ব্লকে ভাগ করে।

১৯৫৯

১. The newly formed Small Savings Board will meet at Lucknow to-morrow as a result of the substantial shortfall in the target of small savings, to which attention was recently drawn by the Standing Committee of the National Development Council. Importance will therefore attach to the decisions that the Board may take to simplify the procedure for sale, transfer and cashing of National Plan savings certificates and postal savings coupons for the small savings sectors will in future have to be relied on more and more to raise internal resources for the Second Five Year Plan. With the formation of this board all the agencies responsible for fostering small savings have been brought under unified control.

সংকেত : Newly formed—নব গঠিত। Small Savings Board—স্বল্প সঞ্চয় পর্ষদ। Substantial shortfall—পর্যাপ্ত কমতি। Attention was recently drawn—সম্প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। Standing Committee of the National Development Council—জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের স্থায়ী সমিতি। To simplify procedure—নিয়মাবলী সরল করে তুলতে। Cashing of National Plan savings certificates and postal savings coupons—জাতীয় পরিকল্পনা সঞ্চয় সার্টিফিকেট এবং পোস্ট্যাল সঞ্চয় কুপন ভাঙ্গানো। Small savings sector—স্বল্প সঞ্চয়ের ক্ষেত্রগুলি। Agencies—প্রতিষ্ঠান সমূহ। For fostering—উৎসাহিত করার জন্যে। Under unified control—সুসংহত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে।

২. Market was very much disturbed by the increased accumulation of cloth stocks with mills. The value of sold and unsold stocks with mills were placed around Rs. 57·2 crores at the end of September. Some idea of the magnitude of the problem could be had if one were to compare this figure with the paid-up capital of the industry which is placed around Rs. 115 crores. Reports are current in the market that the matter of giving relief in excise duty will be taken up when the Finance Minister returns. On the export front the industry has been doing well and during the first eight months exports amounted to 648·22 million yards as against 563·38 million yards during the corresponding period last year. But the export target of 1,000 million yards may elude the grasp of India in 1957 also.

সংকেত : Market was······disturbed—বাজারে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল। By the increased······mills—মিলে মজুত কাপড়ের বর্ধিত সঞ্চয়ের ফলে। Of sold······mills—মিলে বিক্রীত ও অবিক্রীত মজুতের। The magnitude of the problem—সমস্যার গুরুত্ব। Paid-up capital of the industry—শিল্পের আদায়ীকৃত মূলধন। Reports are······the market—বাজারের চালু খবর। Relief in excise duty—অন্তঃশুল্কের রেহাই। Export front—রপ্তানি ক্ষেত্রে। May elude the grasp—নাগালের বাইরে থাকতে পারে।

১৯৬০

১. India's exports were facing severe competition in overseas markets. In order that these might stand competition in both quality and price, per-unit productivity should increase. The importance of productivity at the present stage of industrial development should be realised by all concerned.

The primary aim of the national productivity movement was to stimulate productivity consciousness among employers and employees in all spheres of economic activity. Factors like outmoded plant and equipment, substandard raw material, faulty production techniques, lack of properly trained personnel and inefficient management contributed to the low level of production.

The object of the movement was to improve quality through improved techniques of production. It aimed at the optimum

utilization of available resources in men, machines, material, power and capital.

সংকেত : In overseas market—বৈদেশিক বাজারে। Per-unit productivity—একক-প্রতি উৎপাদন ক্ষমতা। At the present······development শিল্পোন্নয়নের বর্তমান অবস্থায়। All concerned—সংশ্লিষ্ট সকলের। To stimulate productivity consciousness—উৎপাদন সচেতনতাকে জোরালো করে তোলা। In all spheres···activity—অর্থনৈতিক ক্রিয়াশীলতার সকল ক্ষেত্রে। Outmoded plant and equipment—অপ্রচলিত যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম। Substandard—নিম্নমানের। Faulty production techniques—ত্রুটিযুক্ত উৎপাদন-রীতিসমূহ। Lack of······management—যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারীর অভাব ও অনিপুণ ব্যবস্থাপনা। Contributed to—দায়ী। Improved······production—উন্নত উৎপাদন-শৈলী। Optimum·········resources—লভ্য সম্পদসমূহের আদর্শ ব্যবহারীকরণ।

২. The managing agency system in India has contributed greatly to the industrial development of the country. There has, however, been a great deal of criticism against the alleged malpractices of some of the managing agents in the country, particularly in regard to funds of the companies managed by them and collecting excessive remuneration for services rendered.

A number of laws has been passed by the Government to regulate the functioning of the system, but it is felt in some quarters that even more stringent regulations are necessary to curb the power the managing agents wield over their companies.

The National Council of Applied Economic Research undertook a study of the managing agency system in India to examine its working and to see what prospects it has in India in the future.

সংকেত : Managing agency system—ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা। Alleged malpractices—অবৈধ কার্যকলাপসমূহ। Funds of the companies—কোম্পানীগুলির তহবিল সমূহ। Collecting······rendered—প্রদত্ত সেবার বিনিময়ে অতিরিক্ত দক্ষিণা আদায়। To regulate······system—এই প্রথার কার্যকলাপ নিয়মিত করবার জন্যে। More stringent regulations—কঠোরতর আইনসমূহ। To curb—সংযত করতে। Wield—প্রয়োগ করে। The National······Research—ফলিত অর্থনৈতিক গবেষণার জাতীয় পরিষদ। Prospects—প্রয়োজনীয়তা।

১৯৬১

১. High level consumer demand has provided the chief source of strength to the American economy in the year so far, says The Times' New York Correspondent. But there are a number of indications that the consumer is growing more cautious. Hire-purchase credit extensions no longer are rising even though personal income continues upward. Withdrawals of savings deposits and redemptions of savings bonds are declining for the first time in a year and a half. And a national survey finds a sharp curtailment of consumer buying plans for the rest of the year.

The survey, conducted by the National Industrial Conference Board and News week magazine, learnt that consumers planned to buy 10 to 20% fewer electrical appliances this year than last, 35% fewer used automobiles, 27% fewer new homes than early this year, and 21% fewer older homes. Only new automobile sales were expected to continue upward increasing 5%.

সংকেত : High level consumer demand—উচ্চ স্তরের ভোগ্যপণ্যের চাহিদা। Provided......strength—শক্তির প্রধান উৎস ছিল। New York Correspondent—ন্যুইয়র্কস্থিত সংবাদদাতা। Indications—লক্ষণসমূহ। Hire-purchase credit extensions—ঠিকা সওদার ঋণ সম্প্রসারণ। Withdrawals of savings deposits—সঞ্চয় আমানতগুলি থেকে টাকা তোলা। Redemption of savings bonds—সঞ্চয়পত্র পরিশোধ। National survey—জাতীয় জরীপ। A sharp......plans—ব্যবহারকারীদের ক্রয়-পরিকল্পনার তীব্র কাটছাঁট। National... Board—জাতীয় শিল্প সম্মেলন পর্ষদ। Electrical appliances—বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। Used automobiles—ব্যবহৃত মোটর গাড়ী।

২. To-morrow's Loka Sabha debate on oil will be held in the context of the oil companies' decision to keep the crude oil prices unchanged at the level to which they were reduced in July, in spite of a subsequent decline in the official "posted" prices in the Persian Gulf.

What this decision of the companies—conveyed to the Government on Friday—amounts to is that the prices at which the foreign refineries will now import crude oil from their principals will continue to be lower than the posted price, but the extent of reduction will now be much less.

When the oil companies gave the "special price concession" to India, the lower prices were announced by one major company as 12½% less than the posted price, and 26 cents less per barrel by the other. In both cases the posted price was the one in the force at that time.

সংকেত : In the context……decision—তৈল কোম্পানীগুলির সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে। Crude—অশোধিত। Subsequent decline—উত্তরকালীন হ্রাস। Official "Posted" prices—"সরকারী বাঁধা" দাম। In the Persian Gulf—পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে। Foreign refineries—বৈদেশিক পরিশোধনাগারগুলি। Principals—মূলকেন্দ্রসমূহ। Extent of reduction—হ্রাসের পরিমাণ। "Special price concession"—"বিশেষ মূল্যের সুবিধা"

১৯৬২

১. The shellac trade has come to a standstill in Calcutta. There has been virtually no business with foreign countries nor has any export been made during the past few weeks.

The stalemate has taken place due to official bungling. It may be recalled that the trade has formulated a new export scheme for shellac to replace the existing one by making export prices more flexible. The idea is that unless prices can be adjusted in line with supply and demand, trading will be hampered. The previous export scheme was rigid because maximum and minimum export prices were fixed.

The Government of India has, nevertheless, disapproved the new export scheme, but it has not made up its mind as to how the trade is to be regulated. As a result, export licenses, it is believed, have not been issued.

সংকেত : Shellac trade—পাত গালার ব্যবসায়। Standstill—অচলাবস্থা। Virtually—কার্যতঃ। Stalemate—অচলাবস্থা। Official bungling—সরকারী গাফিলতি। Has formulated……scheme—নতুন রপ্তানি পরিকল্পনা রচনা করেছে। More flexible—অধিকতর নমনীয়। Unless prices…and supply—চাহিদা ও যোগানের সঙ্গে মূল্যের সংগতি স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত। Disapproved—অনুমোদন করেন নি। Licenses—অনুমতি পত্রসমূহ। Have not been issued মঞ্জুর করা হয় নি।

২. The Company has a subscribed capital of Rs. 450 lakhs divided into ordinary shares of Rs. 10 each. It has now issued 1,95,000 ordinary shares of Rs. 10 each and 6,000 cumulative redeemable preference shares of Rs. 100 each carrying 9% interest, free of company tax, but subject to the usual tax deduction at source. Out of this issue 4,000 preference shares and 20,000 ordinary shares will be subscribed by Rajasthan Government. The 1,75,000 ordinary shares and 2,000 preference shares are being offered for public subscription at par. The lists are open next Friday.

The preference issue has been underwritten by the Life Insurance Corporation. The Industrial Finance Corporation has agreed to give a loan of Rs. 30 lakhs. The directors are hopeful about the future prospect and expect to pay reasonable dividends when production starts.

সংকেত: Subscribed capital—প্রতিশ্রুত মূলধন। Divided—বিভক্ত। Has issued—ছেড়েছে। Cumulative redeemable preference shares—ক্রমবর্ধিষ্ণু পরিশোধযোগ্য পক্ষপাতমূলক শেয়ারসমূহ। At par—সম মূল্যে। Has been underwritten—অবলিখিত হয়েছে। Life Insurance Corporation—জীবন-বীমা কর্পোরেশন। Industrial Finance Corporation—শিল্পীয় অর্থমঞ্জুরী কর্পোরেশন। Future prospect—ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। Dividends—লভ্যাংশসমূহ।

১৯৬২ [কম্পার্ট]

১. The Union Government has decided to set up five 'pilot goods transport societies, on a co-operative basis in the States. West Bengal will have one and some progress has been made in work in that connexion Under the scheme unemployed people who have passed the School Final or an equivalent examination will be given training in automobile engineering in the State Transport Corporation factory for about a year.

About fifty people have been selected to form the society in West Bengal. They will have to invest Rs. 1,000 each in shares in the proposed society. The Central Government will advance them loans up to Rs. 3,50,000 for the purchase of trucks. The society will carry on goods transport in and outside the State. A gazetted officer of the Directorate of Co-operation will act as the

manager-secretary of the society and the board of management will be headed by the Transport Commissioner.

সংকেত : Union Government—কেন্দ্রীয় সরকার। Pilot goods transport societies —পথ-প্রদর্শক মাল-পরিবহণ সমিতি। An equivalent examination —সমতুল পরীক্ষা। Training in automobile engineering—মোটরগাড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ। State Transport Corporation factory—রাজ্য পরিবহণ কর্পোরেশনের কারখানা। Proposed society—প্রস্তাবিত সমিতি। Trucks—লরী। Goods transport—মাল পরিবহণ। Directorate of Co-operation —সমবায় অধিকার। Manager-secretary—ব্যবস্থাপক-সচিব। Board of management—ব্যবস্থাপক পর্ষদ। Will be headed—নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। Transport Commissioner—পরিবহণ মহাধ্যক্ষ।

৫. The Reserve Bank's recent Notification regarding foreign accounts held by persons resident in India would not apply to U. K. nationals and other foreigners who are not domiciled.

Explaining the position, an officer of the Reserve Bank said that it would apply only to Indian nationals and others who have become Indian national by domicile.

Under the Exchange Control Regulation Act, the term 'residents' would cover foreigners who are in India for a sufficiently long time, engaged in various occupations here. The official said that these persons would not come under the purview of the Notification by the Reserve Bank.

Pointed attention was drawn to a line in the Notification which specially said, "all Indian nationals resident in India who have such accounts abroad" in currencies other than those of Burma, Ceylon and Pakistan should also report them."

সংকেত : Notification —বিজ্ঞপ্তি। Foreign accounts —বৈদেশিক হিসাব। Would not apply—প্রযুক্ত হবে না। Not domiciled—স্থায়ী বসবাস গ্রহণ করে নি। Officer—অফিসার, আধিকারিক। Domicile—স্থায়ী বসবাস। Exchange Control Regulation Act —বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইন। 'Residents'—'অধিবাসী'। Official —কর্মচারী। Purview—আওতা। Abroad in currencies বিদেশী মুদ্রায়।

১৯৬৩

১. The gloom which prevailed in the stock market earlier is vanishing steadily due to the fact that the economic situation has taken a turn for the better. Although the Aid India Club has not given India all the aid which is necessary during the second year of the Third Plan, New Delhi thinks that the gap in aid will be ultimately filled.

In spite of the improved prospects for aid, investors have been cautious. So turnover has largely been confined to speculative shares. Although bigger aid has been sanctioned, it is doubtful whether it can be of much use as far as the current working of industries is concerned. As most of the aid has been tied to various projects, India may have to obtain the foreign exchange for maintenance of imports out of export earnings. But the possibility of increasing exports to any great extent is being discounted. The various industries have suffered due to the shortage of raw materials, coal power and transport. The increase from 45 to 50% in the corporation tax has also squeezed industrial profits.

সংকেত ঃ Gloom—অবসাদ বা মন্দা অবস্থা। Stock market—শেয়ার বাজার, ফট্‌কা বাজার। Is vanishing steadily—ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হচ্ছে। Due to... the better—অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ভালোর দিকে পরিবর্তনের ফলে। Aid India Club—ভারত-সাহায্যদান সংঘ। Gap—ব্যবধান। Improved prospects—উন্নত প্রত্যাশা। Turnover—উৎপাদন, মোট বিক্রয় মূল্য। Speculative shares—ফট্‌কা শেয়ার। Current working—বর্তমান পরিচালনা। Maintenance of imports—আমদানি পোষণ। Export earnings—রপ্তানি আয়। Is being discounted—ছাড় দেওয়া হচ্ছে। Corporation tax—পৌর নিগম কর। Has also squeezed—চাপ দিয়ে আদায় করেছে।

২. The management of four establishments of Kilburn & Company's industrial estate at Majerhat, near Calcutta, declared a lock-out on Friday. About 500 employees were involved.

The lock-out followed a 13-hour demonstration by the employees within the factory premises which began at 4 P. M. on Thursday. The men demanded that the management should announce at a workers' gathering the date of the next meeting of the parties in dispute to negotiate a settlement. An earlier meeting had been held in the

middle of July. The management declined to do so on the ground that they had already informed the men's union of the date for the next meeting, which was August 6.

The police intervened early on Friday and the workers left the factory buildings at 5 A.M. The officers had stayed on in the establishments during the workers' stay-in strike.

সংকেত ঃ Establishments—সংস্থা সমূহ। Industrial estate—শিল্পতালুক। Lock-out—বহিষ্কার। Involved—জড়িত। Demonstration—বিক্ষোভ প্রদর্শন। Factory premises—কারখানার গৃহ-সীমানা। Gathering - জমায়েত। Parties in dispute—বিবদমান পক্ষগুলি। To negotiate a settlement—মীমাংসার জন্যে আলোচনা চালাতে। Management -ব্যবস্থাপক গোষ্ঠী। Men's union—শ্রমিক ইউনিয়ন। Intervened—হস্তক্ষেপ করেছিল। Factory buildings—কারখানা ভবন। Officers—আধিকারিকেরা। Stay-in strike— অবস্থান ধর্মঘট।

১৯৬৪

১. Efforts are being made to arrest the growth of slums surrounding the Durgapur steel project and the Durgapur thermal power station.

Comprehensive plans exist for the establishment of townships for various employees, but construction work has not kept pace with demand and low-paid staff, in particular, experience much difficulty in finding shelter. Many of them have been compelled to live in miserable huts in the slums which have sprung up. About 10% of total population of the steel plant live in these slums—within the plan area itself

According to a senior official of the Durgapur steel project, abortive attempts were made sometime ago to demolish the slums. Human considerations prevailed because the plant authority was unable to provide accommodation for its own men. Also the supply of milk to the township would be hampered if the Khatals in the slum areas were removed, he thought.

সংকেত ঃ To arrest the growth of slums—বস্তির প্রসার প্রতিরোধকল্পে। Durgapur steel project—দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা। Thermal power station —তাপ-শক্তি কেন্দ্র। Comprehensive plans—ব্যাপক পরিকল্পনাসমূহ।

Establishment of township—শহর পত্তন। Construction work……demand—গঠন কার্য চাহিদানুপাতিক হয়নি। Low-paid staff—স্বল্প বেতনের কর্মচারীবৃন্দ। Slums………sprung up—গজিয়ে-ওঠা বস্তি। Senior official—প্রবর আধিকারিক। Abortive attempts—ব্যর্থ প্রয়াস। Demolish—ভেঙে ফেলা। Human consideration—মানবিক বিচার-বিবেচনা। Plant authority—কারখানা কর্তৃপক্ষ। Provide accommodation—বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।

২. It has been a patchy week in the London short loan money market and on most days discount houses have been hard pressed in their search for funds. Rates have been high and at the more difficult periods $3\frac{3}{4}\%$ was paid for short-term loans. The position has been aggravated by holidays and by tax transfers. The shortage of credit on two days compelled a number of discount houses to borrow small amounts on Bank rate terms.

On Thursday the position eased considerably which was due mainly to dividend disbursements and flow of fresh money. was such that overnight loans were arranged at the unusually low rate of $1\frac{1}{2}\%$. Surplus funds were mopped up by the authorities.

On Friday the position was helped materially by the considerable application of money for the heavily over-subscribed Japanese loan.

Business in bills was very small on most days. At the weekly bill tender on the average rate came out at £ 3-13 9.73d%.

সংকেত : Patchy week—গোঁজামিল দেওয়া সপ্তাহ। Short-loan money market—স্বল্প ঋণের টাকার বাজার। Discount house—হুণ্ডি ভাঙ্গাবার কুঠি। Hard pressed—অত্যধিক চাপগ্রস্ত। The position……aggravated—অবস্থার অবনতি ঘটেছে। Tax transfers—কর হস্তান্তর। Shortage of credit—জমা হ্রাস। Bank rate terms—ব্যাঙ্কের হারে। Dividend disbursements—লভ্যাংশ ব্যয়ন। Surplus funds—অতিরিক্ত তহবিল। Were mopped up—নিঃশেষিত হয়েছিল। Was helped materially—বাস্তবরূপে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছিল। The considerable application of money—টাকার যথেষ্ট ব্যবহার। Over-subscribed Japanese loan—অতি-প্রদত্ত জাপানী ঋণ। Business in bill—হুণ্ডি ব্যবসায়। At the weekly bill tender on the average—গড়ে সাপ্তাহিক হুণ্ডি বায়না। At £ 3—13—9.73d%—৩ পা. ১৩ শি. ৯.৭৩ পে. % দরে।

১৯৬২ [ত্রৈবার্ষিক]

১. A Commonwealth common market and Commonwealth regional free trade area were suggested to-day at the Commonwealth Parliamentary Association Conference as alternatives to be considered if Britain decided not to join the European Common Market, says Reuter.

The suggestions came from a Nigerian Minister, speaking in the debate on economic affairs which was opened yesterday by the leader of the Australian delegation.

The debate will continue until midday to-morrow when the Lord Privy Seal and Minister in charge of Britain's Common Market negotiations will sum up.

A member of Parliament suggested that a Commonwealth representative should take part in the Common Market negotiations. That would give the Commonwealth a chance to see Britain's difficulties and envisage alternatives if the negotiations broke down.

সংকেত ঃ Commonwealth common market—কমনওয়েল্‌থ বারোয়ারী বাজার। Commonwealth regional free trade area—কমনওয়েল্‌থ আঞ্চলিক অবাধ বাণিজ্য এলাকা। Commonwealth Parliamentary Association Conference—কমনওয়েল্‌থ সংসদীয় সমিতির সম্মেলন। As alternatives—বিকল্প পন্থাসমূহরূপে। European Common Market—য়ুরোপীয় বারোয়ারী বাজার। Economic affairs—অর্থনৈতিক বিষয়াদি। Opened—উদ্বোধন করেছিলেন। Australian delegation—অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিদল। Lord Privy Seal—রাজমোহরধারী উচ্চ পরিষদের সদস্য। Minister...negotiations—ব্রিটেনের বারোয়ারী বাজার সংক্রান্ত আলোচনার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। Will sum up—সার সংকলন করবেন। Envisage—লক্ষ্য করে দেখা।

২ A container service between Howrah and Patna junctions has been introduced as an experimental measure for the transport of "smalls", consignments of selected items like medicine, electric goods, cycle parts, books, printing materials and tea, etc.

The new service, for which no additional fee is charged, is expected to minimize the risk of damage to goods while in transit.

Three containers, with a capacity of three tons each, have been put into service. These are being loaded in suitable wagons which

run to and *from Howrah on* a pair of Express goods trains. The delivery at destinations is intended to be offered on the morning of the third day from the date of the booking.

সংকেত : A container service—মালগাড়ির চলাচল। Has been introduced—চালু করা হয়েছে। As an experimental measure—পরীক্ষামূলক ব্যবস্থারূপে। Consignments—চালান। The new service—নতুন চলাচল ব্যবস্থা। Additional fee—অতিরিক্ত মাশুল। Risk of damage—ক্ষতির ঝুঁকি। In transit—বহন কালে। Express goods trains—এক্সপ্রেস (দ্রুতগামী) মাল গাড়িগুলি। On the morning .....booking—মালের টিকিট কাটার তারিখ থেকে তৃতীয় দিনের সকালে।

১৯৬৩ [ত্রৈবার্ষিক]

১. Jute shares have been hesitant and prices have drifted downwards. The easier trend is partly due to the general weakness in the stock market and partly because of the fall in gunny prices during the past few days.

Foreign inquiries for jute goods have become sluggish during the past couple of weeks. As stocks in the U. S. A. are sufficient, that country has not shown much interest. Inquiries from the Argentine have stopped due to the shortage of foreign exchange she is facing.

The trade is nevertheless optimistic about the outlook. Judging from present indications it looks as if the demand for jute goods has increased due to an expansion of international trade. As prices of gunnies have moved down to more reasonable levels, inqviries from overseas countries are expected to broaden. It is also hoped that the Government will meanwhile take steps to facilitate the shipment of goods by stopping harassment by the Customs authorities.

সংকেত : Hesitant—দ্বিধাগ্রস্ত। Have drifted downwards—নিম্নমুখী হয়েছে। Easier trend—সহজতর প্রবণতা। Fall in the gunny prices—চটের দামের মূল্যহ্রাস। Foreign inquiries—বৈদেশিক অনুসন্ধান। Jute goods—পাটজাত দ্রব্যসমূহ। Sluggish—মন্থর। Past couple of weeks—গত দু সপ্তাহ।

Optimistic about the outlook—ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাশীল। Indications—লক্ষণগুলি। Expansion of International trade—আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ। More reasonable levels—অধিকতর যুক্তিসঙ্গত স্তর। Overseas countries—সাগরপারের দেশগুলি (বিদেশ)। Shipment of goods—জাহাজে মাল প্রেরণ। Harassment—হয়রানি। Customs authorities—শুল্ক কর্তৃপক্ষগণ।

২. The substantial rise in the price of Indian Iron has been an outstanding feature of the stock market this week. The declaration of a taxable interim ordinary dividend of 8% for the year ended March 1962 has been the major stimulant. The directors have also decided to pay a final divided for 1961-62 when the accounts of the company are finally clos d after the announcement of the retention pric e of steel for the two years ended March 1962. Sentiment has been boosted by prospects of expansion in the activity of the company. There has been an increase in the production of the company during July.

Under the lead of Indian Iron, prices of other speculative shares have been marked up. At the settlement on Wednesday, the carry-forward charges were generally lower, indicating an oversold position. The bull support apart, bears have covered their open position in order to take profits.

সংকেত : Substantial rise—পর্যাপ্ত বৃদ্ধি। Outstanding feature—লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। Declaration—ঘোষণা। Taxable ... dividend—করযোগ্য অন্তর্বর্তীকালীন সাধারণ লভ্যাংশ। Major stimulant—প্রধান প্রেরণা-শক্তি। Final dividend—চূড়ান্ত লভ্যাংশ। Retention price রক্ষণ মূল্য। Sentiment—ভাবাবেগ। Has been boosted—জাগ্রত হয়েছে। Prospects of expansion—সম্প্রসারণের উচ্চাশা। Under the lead of—নেতৃত্বে। Speculative shares—ফট্‌কা শেয়ারসমূহ। Have been marked up—বৃদ্ধি চিহ্নিত হয়েছে। Carry-forward charges—জের টানার মাশুল। Indicating......position—অতি-বিক্রয় অবস্থার লক্ষণ প্রকাশ করে। The bull support apart—তেজিওয়ালা সমর্থন দূরে। Bears......position—মন্দিওয়ালারা তাদের শূন্যস্থান পূর্ণ করেছে।

১৯৬৪ [ত্রৈবার্ষিক]

১. Describing the Life Insurance Corporation authorities as "trustees of policyholders," the organisation chairman told a Press Conference in Calcutta on Wednesday that it was not interested in "backdoor nationalization" of private concerns in which it had invested. It was not concerned with any change of directors in them but sought to safeguard the policyholders' interest.

When a correspondent referred to apprehension in some quarters about such nationalization, the Chairman said the LIC certainly watched the dividends the investments brought. It invested only in good concerns, although it had inherited some bad investments from some of the insurance companies nationalized.

The Chairman repudiated another correspondent's suggestion that the sharp rise in investments in the private sector would indirectly lead to dangers of cartels and concentration of economic power in a few hands. The pattern of investment evolved during the past few years represented a happy blending of the conflicting views of the protagonists of the private and public sectors.

সংকেত : As "Trustees of policyholders"—"বীমাকারীদের অছি (ট্রাস্টী)" রূপে। Chairman—চেয়ারম্যান। Press conference—সাংবাদিক সম্মেলন। "Backdoor nationalization"—"গুপ্তদ্বার রাষ্ট্রায়ত্তকরণ।" Private concerns—বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ। To safeguard .....interest—বীমাকারীদের স্বার্থ রক্ষা করতে। Correspondent—সাংবাদিক। Apprehension in some quarters—কোন কোন মহলের আশঙ্কা। Inherited some bad investments—কিছু অলাভজনক বিনিয়োগ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। Insurance companies nationalized—রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা কোম্পানীসমূহ। Repudiated—প্রত্যাখ্যান করেন বা নাকচ করেন। Suggestion—ইঙ্গিত। Cartels and concentration of economic power—ব্যবসায়ী-জোট এবং অর্থনৈতিক শক্তির কেন্দ্রী-ভবন। Happy blending of the conflicting views—বিরুদ্ধ মতসমূহের প্রীতিকর সংমিশ্রণ। Protagonist—নায়কগণ (নাটকের)।

২. During the second day's inconclusive debate on the Warehouses Bill in the West Bengal Assembly on Wednesday, the State Minister for Agriculture said that priority would be given to co-operative

societies in building warehouses in villages to save farmers from economic exploitation.

This was in reply to opposition members who accepted the scheme on principle but felt that it would do more harm than good to farmers as they would be victims of unprincipled warehouse-owners. One of them even saw the hands of the Swatantra Party behind the move while another held that no assurance of an economic price for their crop had been given to farmers. Almost all of them either urged the Government to set up state warehouses or build them through co-operatives

The minister said that in many areas co-operative societies were yet to be set up and it was not possible to lay down a condition that only these societies would be entrusted with the job.

The Bill, he said, had been framed on the basis of a model submitted by the Reserve Bank of India, which was also followed by other States.

সংকেত ঃ Inconclusive debate -অসমাপ্ত বিতর্ক। Warehouses Bill—পণ্যাগার আইনের খসড়া প্রস্তাব। Assembly—বিধানসভা। State Minister for Agriculture - কৃষি-দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী। Priority—অগ্রাধিকার। Economic exploitation--অর্থনৈতিক শোষণ। In reply to..... members—বিরোধী পক্ষের সদস্যদের প্রশ্নের উত্তরে। Who accepted......principle—যাঁরা নীতিগতভাবে পরিকল্পনাটিকে গ্রহণ করেছিলেন। Would do harm than good—কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ বেশী করবে। Victims of unprincipled warehouse-owners—নীতিহীন পণ্যাগার-মালিকদের হাতে বলি। The hands of......the move—প্রস্তাবের পিছনে স্বতন্ত্র পার্টির হাত। Assurance of an economic price for their crop—তাদের ফসলের প্রকৃত মূল্যের আশ্বাস। Urged—সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন। State warehouse—সরকারী পণ্যাগার। Entrusted with the job—কাজের দায়িত্ব অর্পিত। On the basis of a model—একটি আদর্শের ভিত্তিতে।

১৯৬৫ [ত্রৈবার্ষিক]

১. Sometimes in the last few weeks the London Stock Exchange has focussed its attention on companies that rumour or reason has suggested will soon be the subject of a bid. This month it has turned its attention to companies whose shares will (presumably) rise strongly if the Conservatives win the general election a few weeks hence. The particularly relevant categories are steel companies and property companies. The procedure of "professionals" is not to buy actual shares but to buy "call options" entitling them to buy shares at a specified price three months hence. A three-month option will now cover the general election and the recent rise in the price of options, particularly for steel shares, reflects the growth of confidence (at least among these "professionals") in the Conservatives' ability to win it.

The economic problem is generally discussed separately from the political; for people who believe that the balance of payments is running into serious trouble believe that either a Conservative or a Labour Government will be compelled to correct it.

সংকেত : London Stock Exchange—লণ্ডন সংভার বিনিময় কেন্দ্র বা লণ্ডন শেয়ার বাজার বা লণ্ডন ফট্‌কা বাজার। Has focussed its attention—দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে; Rumour or reason—গুজব অথবা যুক্তি। Bid—নিলাম। Presumably—অনুমান-সিদ্ধরূপে। The Conservatives—রক্ষণশীল দল। Hence—আজ থেকে। Relevant categories—সংশ্লিষ্ট শ্রেণীগুলি। Procedure of "professionals"—"পেশাদারদের" কার্য পদ্ধতি। Actual shares—প্রকৃত শেয়ার। Call options—ক্রয়-মর্জির শেয়ার সমূহ। Specific price—নির্দিষ্ট মূল্য। Option—মর্জি। Reflects the growth of confidence—আস্থা বৃদ্ধিই প্রতিফলিত করে। Balance of payments—আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার সমতা। Serious trouble—জটিল সংকট। Labour Government—শ্রমিক সরকার।

২. Industrialisation which started at the beginning of the present century, but received a real spurt only under the three Five Year Plans, has undoubtedly led to the emergence of an industrial sector equipped with highly mechanised plants, organised on the most modern lines and characterised by the latest techniques of production,

research, and marketing. But even to-day the shadows of a bygone era are cast upon the majority of undertakings. Old and submarginal firms still constitute a sizable proportion of modern industry in India. One important consequence of this situation has been the reluctance of such firms to experiment with any scheme which is new and does not appear to confer immediate benefits. Schemes of worker participation are considered dangerous, not merely because of their novelty but also because they are supposed to quicken the transition to the socialist pattern of society. While the more enlightened employers and managers who have emerged during and after the Second World War are aware of the social obligations of the private sector, the same cannot be said of many others.

সংকেত : Industrialisation—শিল্পায়ন। A real spurt—প্রকৃত প্রেরণা, প্রকৃত উত্তেজনা। Emergence—আবির্ভাব, উদ্ভব। Industrial sector—শিল্পীয় ক্ষেত্র। Equipped with……and marketing—উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত, আধুনিকতম ধারায় সংগঠিত এবং উৎপাদন, গবেষণা ও বিপণনের সর্বশেষ প্রকরণের দ্বারা বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত। Shadows……era—অতীত যুগের ছায়া। Undertakings—উদ্যোগসমূহ। Submarginal firms—উপ-প্রান্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহ। Constitute—গঠন করে। Sizable proportion—বিরাট্ অংশ, বিরাট্ অনুপাত। Reluctance—অনিচ্ছা, অনীহা। Confer immediate benefits—আশু বা অবিলম্বিত মুনাফা দান করা। Schemes……participation—শ্রমিক অংশ গ্রহণ প্রকল্প। Novelty—নতুনত্ব। Quicken the transition—পরিবর্তন ত্বরান্বিত করা। The more……managers—অধিকতর আলোকপ্রাপ্ত মালিক এবং ব্যবস্থাপক। Who have emerged—যাঁরা আবির্ভূত হয়েছেন। Social obligations—সামাজিক কর্তব্য।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৬১

১. The budget of a country is the true index of its economic condition. For example, the budget of the United Kingdom shows a revenue of about Rs. 5,000 crores although in territory and size the Indian Union is twelve times of U. K. Even the municipal revenue of a single city like New York in the U. S. A. exceeds Rs. 300 crores, while the entire revenue of the Indian Union amounts to about Rs. 320 crores, out of which Rs. 170 crores are earmarked for military and defence so as to leave very little for nation building departments and plans of national progress.

সংকেত : Budget—আয়ব্যয়ক হিসাব, বাজেট। True index—প্রকৃত সূচক। Revenue—রাজস্ব। In territory and size—ভূখণ্ড ও আয়তনে। Municipal revenue—পৌর রাজস্ব। Earmarked for military and defence—সামরিক ও প্রতিরক্ষার জন্যে নির্দিষ্ট। Nation-building departments—জাতি সংগঠক বিভাগ সমূহ। Plans for national progress—জাতীয় প্রগতির উদ্দেশ্যে রচিত পরিকল্পনা।

২. The principle of equal opportunity does not, of course, presume equal development for all ; the levels of attainment naturally depend upon individual capacities. But in this principle is discovered one of democracy's unique contributions ; it conceded for the first time the equal right of self-realization to all the people, instead of limiting this right to those, who, by inherited or acquired power, could dominate the others.

সংকেত : Principle of equal opportunity—সম সুযোগের নীতি। The levels of attainment—সাফল্যের স্তর। Individual capacities—ব্যক্তিগত ক্ষমতাবলী। Democracy's unique contributions—গণতন্ত্রের অতুলনীয় দান। Conceded—সত্য বলে স্বীকৃতি দান করেছে। Self-realization—আত্মোপলব্ধি। By inherited or acquired power—উত্তরাধিকার শক্তিতে অথবা অর্জিত শক্তিতে। Dominate—প্রাধান্য বিস্তার করা।

১৯৬২

১. The share markets have been moving rather indecisively of late. Shortage of funds and tightness in money market have led to a shrinkage in the volume of business, with values of most counter tending to look down. A good portion of investible funds is tied up with new issues and the markets will continue to feel the acute need for funds until the excess over calls is released.

সংকেত: Share markets—শেয়ার বাজারগুলি, ফট্‌কা বাজারগুলি। Indecisively—অনিশ্চিতভাবে। Of late—সম্প্রতি। Shortage of funds—পুঁজির অভাব। Tightness in money market—টাকার বাজারের চাপা অবস্থা। Shrinkage—সংকোচন। Volume of business—ব্যবসার পসার। With values of most counter tending to look down—অত্যন্ত মূল্যাবনতি। Investible funds—বিনিয়োগযোগ্য তহবিল সমূহ। Is tied up with new issues—নতুন শেয়ারগুলিতে আটক হয়ে গেছে। Acute need for funds—পুঁজির তীব্র প্রয়োজন। Until the excess over calls is released—যতক্ষণ অতিরিক্ত চড়াদামে ডাকা শেয়ারগুলি ছেড়ে দেওয়া না হয়।

২. There are persistent reports suggesting the distinct possibility of block closure of jute mills for sometime with a view to conserving available raw jute supplies till the arrivals of the new season's crops which are expected to begin not earlier than the end of July or August. A delegation of the Indian Jute Mills Association led by the acting Chairman Mr. C.L. Bajoria, met the Union Commerce and Industry Ministry Officials at New Delhi again this week and sought official permission for block closure for a fortnight either next month or in July.

সংকেত: Persistent report—স্থায়ী সংবাদ। Distinct possibility—সুস্পষ্ট সম্ভাবনা। Block closure of jute mills—চটকলের অংশ বিশেষ বন্ধ করা। Conserving available ....supplies—লভ্য কাঁচাপাট যোগানের সংরক্ষণ। Delegation ....Association—ভারতীয় চটকল সমিতির প্রতিনিধিদল। Acting Chairman—অস্থায়ী চেয়ারম্যান। Union Commerce.........Officials—কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের আধিকারিকগণ। Official permission—সরকারী অনুমতি।

১৯৬৩

১. The proposals are considered as "loosely knit" and the Government of India seem to have appreciated the reason that motivated the Colombo Powers to leave certain parts imprecise. In order to understand definitely the outline of the proposals the Government of India sought clarifications and interpretations from the sponsors in regard to those imprecise aspects of the scheme. Within the frame-work of the clarifications the Government of India seem to feel that by and large their principal stand—that the Chinese should vacate the latest aggression—is uphold.

সংকেত : "Loosely knit"—"শিথিল বদ্ধ"। Have appreciated--উপলব্ধি করতে পেরেছেন। Motivated—প্ররোচিত করেছিল। The Colombo powers কলম্বো শক্তিবর্গকে। Imprecise—অস্পষ্ট। Clarifications and interpretations —সংশোধন ও ব্যাখ্যা। Sponsors—উদ্যোক্তাগণ। Frame-work of clarifications —সংশোধনের কাঠামো। By and large—সমস্ত দিক চিন্তা করে। Principal stand—প্রধান যুক্তি। Aggression – আগ্রাসন। Is upheld—সমর্থিত হয়েছে, তুলে ধরা হয়েছে।

২ Lately there have been some fears that the United States was promoting the Common Market at the expense of its own economic interests. Secretary of Agriculture Freeman has been particularly outspoken about Common Market discrimination against American agricultural products. The danger that the Common Market might become 'inward-looking' and the protectionist in character has been much discussed—but it was hoped that Britain's membership, in view of her world-wide interests, would be a safeguard against that.

সংকেত : Was promoting—উৎসাহিত করছিল। Economic interests-- অর্থনৈতিক স্বার্থ সমূহ। Secretary of Agriculture—কৃষি-সচিব। Has been outspoken—প্রবক্তা হয়েছেন। Discrimination—প্রভেদ, পার্থক্য। Agricultural Products—কৃষি উৎপাদন। 'Inward-looking'—'অন্তর্মুখী'। Protectionist in character—চরিত্রগতভাবে সংরক্ষণবাদী। Membership—সদস্যপদ। World-wide interest – বিশ্বব্যাপী স্বার্থ। Safeguard—রক্ষাকবচ।

১৯৬৪

১. The Calcutta stock market is now in its pre-Budget mood of caution, so a dull trend continues. Investors fear that the Union Finance Minister may have to put up tax rates to meet the growing costs of both development and defence, and he may even take stringent measures to trace "unaccounted money". It is unlikely, therefore, that the stock market will come back to life before Budget day. A particular class of shares which has suffered in recent weeks although for a different reason, is tea. The industry is expecting a smaller North Indian crop, and the average prices being realised at Calcutta auctions have been so far lower compared with those of the previous year.

সংকেত : Stock market—শেয়ার বাজার, ফট্‌কা বাজার। Pre-Budget mood of caution—প্রাক্‌-বাজেট সতর্ক অবস্থা। Investors—বিনিয়োগকারীগণ। To put up tax rates—কর-হার বৃদ্ধি করতে। To meet the growing costs—ক্রমবর্ধমান ব্যয়বহনের জন্যে। Stringent—কঠোর। Measures—ব্যবস্থাবলী। "Unaccounted money"—'হিসাব-বহির্ভূত অর্থ'। A particular class of shares—এক বিশেষ শ্রেণীর (ধরনের) শেয়ার। Auctions—নীলামের বাজার।

২. In order to meet the needs of an expanding population and raise the general stadard of living, it is necessary steadily to increase the production of goods and services. There are two practical means to accomplish this objective. One is to enlarge the productive facilities of the economy; the other is to increase the output of each worker by introducing better machinery and more efficient methods of production. The best results can be expected when the expansion of productive facilities is combined with an increase in worker productivity. The tremendous production of the American economy and the high standard of living of the American people are the result of a steady, conscious effort to combine expanding productive capacity with higher individual productivity.

সংকেত : An expanding population—ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা। General standard of living—জীবনযাত্রার সাধারণ মান। Goods and services—

পণ্য ও সেবা। Practical means—বাস্তব ব্যবস্থা। To accomplish this objective—এই উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্যে। To enlarge the productive facility —উৎপাদন সুযোগের সম্প্রসারণ। More efficient methods of production— উৎপাদনের অধিকতর কার্যকরী প্রকরণ। Expansion—সম্প্রসারণ। Worker productivity—কর্মী সাধারণের উৎপাদন-ক্ষমতা। Tremendous production— বিপুল উৎপাদন। Steady, conscious effort—দৃঢ় ও সচেতন প্রয়াস। Higher individual productivity—উচ্চতর ব্যক্তিগত উৎপাদন শক্তি।

১৯৬৪ [ত্রৈবার্ষিক]

১. In the textile, jute and sugar industries India has registered impressive progress. The textile trade has a pre-eminent position in the country and is the one big industry mainly controlled by the Indians. India has long excelled in the manufacture of textiles. Many people forget that until 1787 this country was exporting manufactured cotton goods to France, Britain and Holland. Indian silks and muslins were world famous.

সংকেত : In the textile, jute and sugar industries—বস্ত্র, পাট ও শর্করা শিল্পে। Has registered impressive progress—স্মরণীয় প্রগতির স্বাক্ষর রেখেছে। Textile trade—বস্ত্র-ব্যবসায়। Pre-eminent—প্রধান, শ্রেষ্ঠ। Has excelled in the manufacture of textiles—বস্ত্র শিল্পে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। World famous —বিশ্ব-বিখ্যাত।

২. With the war an era of industrial expansion dawned upon the country. The lessons taught by the war brought about a remarkable change in the indusrtial position of the country as also in the outlook of the businessman as compared with those of 1913. The Government experienced a great shortage of materials required for munitions and the industries were handicapped on account of interruptions in the supply of machinery and stores. The Munition Board was started with the object of applying the manufacturing resources of India to war purposes. But the industrial boom was shortlived.

সংকেত : [অনুবাদ অংশের ১৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।]

॥ গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় ॥

১৯৬৫

১. The cult of the hero is anarchic and retrograde and does not easily fit in with the needs of a scientific society. But there is an opposite tendency, which though also anti-democratic, is in line with the technical developments of modern industry. This is the tendency to attach importance neither to heroes nor to common men, but to organisations. In this view the individual is nothing apart from the social bodies of which he is a member. Each such body represents some social force, and it is only as part of such a force that an individual is of importance.

সংকেত : The cult of the hero—বীরের পদ্ধতি। Anarchic and retrograde—অরাজকতাপূর্ণ ও অধোগামী। Fit in with—খাপ খাওয়া। Scientific society—বিজ্ঞান-ভিত্তিক সমাজ। Opposite tendency—বিপরীত প্রবণতা। Anti-democratic—গণতন্ত্র বিরুদ্ধ। In line with the technical development—কারিগরী উন্নতির সহযোগী। Attach importance—গুরুত্বদান করা। Organisations—সংগঠনসমূহ। In this view—এই দৃষ্টিতে। The individual—ব্যক্তি। Social bodies—সামাজিক সংগঠনসমূহ।

২. The good husband is now the domesticated husband—the man who, when he has finished his work at the factory or the office, spends his evenings and his week-ends not with his workmates, but at home with his family, enjoying common fireside relaxations with them. Once he sought to escape from the crowded shabbiness of his home to the warmth and conviviality of the club-rooms, and inevitably in the process he developed social interests and wider loyalties. But now the man stays at home and is likely to find burden-some and repugnant any activities or interest that force him to leave the family circle and to forego part of his domestic privacy and comfort.

সংকেত : Good husband—আদর্শ স্বামী। Domesticated husband—ঘরকুনো স্বামী। Workmates -কর্ম-সঙ্গীগণ, কর্ম-সহচরগণ। Fire-side relaxations —আগুন-পোহানো কালীন আমোদ-প্রমোদ। Crowded shabbiness—ক্ষুদ্রতার ভিড়। Conviviality of the club-rooms ক্লাবঘরের আমোদপ্রিয়তা। Inevitably

……loyalties—এইভাবে সে সুনিশ্চিতরূপে সামাজিকতা ও বৃহত্তর আনুগত্য গড়ে তুলতো। Burden-some and repugnant any activities or interest—কষ্টকর ও অপ্রীতিকর কোন কাজ বা মনোযোগ। Family circle—পারিবারিক গণ্ডী। To forego—ত্যাগ করতে। Domestic privacy and comfort—পারিবারিক গোপনীয়তা এবং আরাম।

৩. Cultivated people are a drop of ink in the ocean. They mix easily and even genially with other drop, for those exclusive days are over when cultivated people made only cultivated friends, and became tongue-tied or terror-struck in the presence of any one whose make up was different from their own. Culture is no longer a social asset; it can no longer be employed either as a barrier against the mob or as a ladder into the aristocracy. This is one of the few improvements that have occurred in England since the last war—an improvement marked by the decay of smartness and fashion as factors in social life and the growth of the idea of enjoyment.

সংকেত: Cultivated people—সংস্কৃতিবান বা কৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা। Genially—সানন্দে। Exclusive days—অসামাজিক দিনগুলি। Tongue-tied—নির্বাক। Terror-struck—ভীতি-বিহ্বল। Make up—গঠন বা প্রকৃতি। Social asset—সামাজিক সম্পত্তি। A barrier against the mob—জনতার বিরুদ্ধে বাধা। A ladder into the aristocracy—আভিজাত্যের সিঁড়ি। Marked by the decay of smartness and fashion—চটপটে ভাব ও পোশাকীয় আড়ম্বর হ্রাসের দ্বারা চিহ্নিত।

॥ তৃতীয় পর্যায় ॥

● বাংলা থেকে ইংরেজির জন্য ●

১. পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতিরই চরিতার্থ করিবার মত উদ্দেশ্য আছে, প্রত্যেকেরই প্রচার করিবার মত কিছু না কিছু শাশ্বত বাণী আছে এবং প্রত্যেক জাতিরই অনুসরণ করিবার মত একটি নিশ্চিত আদর্শও রহিয়াছে। অতএব প্রথমেই আমাদিগকে আমাদের জাতীয় আদর্শটি কি তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে।

আন্তর্জাতিক প্রগতির ক্ষেত্রে এই দেশ কোথায় স্থানলাভ করিবে এবং জাতীয় সমন্বয়ের ক্ষেত্রেই বা আমাদের কি বলিবার আছে তাহাও যথাযথভাবে অনুধাবন করিতে হইবে।

জগতের দুই প্রকার বিভিন্ন ভিত্তির উপর সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে—এক, ধর্ম ভিত্তির উপর; আর এক, সামাজিক প্রয়োজনের উপর। একটির ভিত্তি আধ্যাত্মিকতা, অপটি জড়বাদ।

বিশেষ সংকেত: উদ্দেশ্য—Mission. শাশ্বত বাণী—Eternal Sermon. আদর্শ—Ideal. জাতীয়……ক্ষেত্রে—In the field of national unity. ভিত্তি—Foundation. আধ্যাত্মিকতা—Spiritualism. জড়বাদ—Materialism.

২. স্বাধীনতার সূচনা থেকেই যে দু'টি মূলনীতি আমরা [illegible] চলেছি, তা হচ্ছে জাতীয় ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা এবং আন্ত[illegible]ক্ষেত্রে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা। আমাদের রাষ্ট্রের মূলনীতি কোন খেয়ালখুশি বা আবেগবশে নির্ধারিত হয় নি, এই নীতির ভিত্তি হচ্ছে আমাদের অতীত ইতিহাস ও চিন্তাধারা এবং জাতির মৌল স্বার্থ। এখন ভারতবর্ষের সবচেয়ে জরুরী কাজ হচ্ছে জন-সাধারণের জীবন ধারনের মান উন্নয়ন করা। এর জন্যে একদিকে যেমন চাই সমাজ-কাঠামোতে দ্রুততম সাংগঠনিক পরিবর্তন, অন্যদিকে তেমনি এই পরিবর্তনের পশ্চাতে বিপুলতম গণসমর্থন ও জনতার অংশ গ্রহণ। ভারতবর্ষের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ৪৫ কোটি; এবং ভোটাধিকারীর সংখ্যা ২০ কোটি; পৃথিবীর গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে জনসংখ্যার আয়তনে ভারতবর্ষই বৃহত্তম। গণতন্ত্রের নীতি ও পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত না হয়ে ভারতবর্ষ ইতিমধ্যেই অনেক আধুনিকীকরণেয় কাজে হাত দিয়েছে।

বিশেষ সংকেত: মূলনীতি—Fundamental principles. গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা—Non-alignment, খেয়ালখুশি বা আবেগ—Whim or sentiment. অতীত…চিন্তাধারা—History and thoughts of the past. মৌল স্বার্থ—Basic interest. সমাজ-কাঠামো—Social structure. সাংগঠনিক—Constitutional. আধুনিকীকরণ—Modernisation.

৩. ভারতে স্বনির্ভর চলমান অর্থনীতি গড়িয়া তুলিতে হইলে বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন একান্তই প্রয়োজন। আগে সরকারের কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল। আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা আগে দেশের যে-পরিমাণ ক্ষতি করিত, বর্তমানে সরকারের

কর্মক্ষেত্র ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করায় সেই ক্ষতির পরিমাণ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে-কোন অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা কার্যকর করিতে হইলে প্রথমেই প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সরকারী মালিকানার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে আমলাতান্ত্রিক গড়িমসির পরিমাণ আরও বাড়িয়া যাইতেছে। ইহা নিঃসন্দেহে ভারতীয় পরিকল্পনার সাফল্যের দ্যোতক নয়।

বিশেষ সংকেত: স্বনির্ভর—Self-dependent. চলমান—Dynamic. আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা—Bureaucratic procrastination. সরকারী মালিকানা—State ownership. রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প—State-owned industry. দ্যোতক—Indication.

৪. পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে মুখে যত কথাই বলুক না কেন, কার্যক্ষেত্রে একটুও নড়িয়া বসিতে বা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে তাহারা আদৌ রাজী নহে। নিরাপত্তা পরিষদে দক্ষিণ আফ্রিকা সংক্রান্ত বিতর্কে ইহা পরিষ্কার বোঝা গেল।

এশিয়া-আফ্রিকার ৫৭টি রাষ্ট্র দঃ আফ্রিকার বিরুদ্ধে যে অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলিয়াছিল, তাহা উপেক্ষা করিয়া নিরাপত্তা পরিষদ নরওয়ের প্রস্তাবটিই অনুমোদন করিতে চলিয়াছেন। নরওয়ের প্রস্তাবটিতে দঃ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের খুঁটিনাটি দিক বিবেচনা করিয়া আগামী মার্চ মাসের মধ্যে রিপোর্ট দিবার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটিকে বলা হইবে।

বিশেষ সংকেত: বর্ণ-বৈষম্য—Racial discrimination. খুঁটিনাটি দিক—Details. বিশেষজ্ঞ—Expert.

৫. গোষ্ঠীনিরপেক্ষতা আমাদের আন্তর্জাতিক নীতির একাংশ মাত্র। শুধু নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নয়, উপনিবেশবাদের অবসান, বর্ণ বৈষম্যের বিলোপ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এগুলিও আমাদের আন্তর্জাতিক নীতির অঙ্গ। কোন একটি বিশেষ সামরিক জোটের গাঁটছড়ায় বাঁধা না থেকে সব দেশের প্রতি বন্ধুত্বের মনোভাব পোষণ করাই আমাদের আচরিত নীতি। এই নীতির পিছনে যে বিশ্বাস ক্রিয়াশীল, তা হচ্ছে, পৃথিবীতে সর্বত্র ভালোমন্দ দুয়েরই অস্তিত্ব রয়েছে, এবং ফলে পৃথিবীর জাতিগুলিকে সাদা-কালোয় ভাগ করে সোজাসুজি নিন্দা বা প্রশংসায় ভাগী করা চলে না। একটি সামরিক জোটের বদলে আমরা যদি অন্য একটি জোটে যোগ দিই তাতে প্রধান প্রধান রাষ্ট্র-জোটের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা বাড়বে বই কমবে না।

গোষ্ঠীনিরপেক্ষতা স্বাধীনতারই অংশ, স্থান-কাল বিবেচনা করে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ কর্মনীতি নির্ধারণ করবার স্বাধীনতা।

বিশেষ সংকেত : গোষ্ঠীনিরপেক্ষতা—Non-alignment নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী—Negative outlook. উপনিবেশবাদ—Colonialism বর্ণ-বৈষম্য—Racial discrimination. সামরিক জোট—Military pact. নিন্দা বা প্রশংসা—Contempt Praise. সংঘর্ষ—Conflict. কর্মনীতি—Working policy.

৬. কাঁচা মালের অভাব, প্রয়োজন-অনুসারে যন্ত্রপাতি সরবরাহের অসামর্থ্য, পরিকল্পনার ত্রুটি এবং অভিজ্ঞ কারিগরের অভাব প্রায় প্রতিটি সরকারী সংস্থায় ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া তুলিতে সাহায্য করিতেছে। উৎপাদন বাড়িতেছে ঠিকই, কিন্তু ভারতের দরিদ্র করদাতাদের উপর নূতন বোঝা চাপাইয়া তবে ওই সব জিনিস বাজারে বিক্রয় করা সম্ভব হইতেছে। এই সব দেখিয়া বিশ্বাস করা কঠিন যে, এ দেশে গত তেরো বৎসর ধরিয়া পরিকল্পনা চলিতেছে, একটি পরিকল্পনা-কমিশন আছে এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নামে প্রতি পাঁচ বৎসরে কয়েক হাজার কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে। ঠিকমত পরিকল্পনা হইলে, প্রকল্পগুলি ঠিক সময়েই কার্যকর হইত, বার বার ব্যয়ের লক্ষ্য বদল করিতে হইত না বা কারখানা চালু হওয়ার পর কাঁচামাল, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অভিজ্ঞ কারিগরের অভাবে সরকারী সংস্থাগুলিকে বৎসরের পর কোটি কোটি টাকা লোকসান দিবার প্রয়োজন দেখা দিত না। উৎপাদন-ব্যবস্থায় সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি বসাইয়াও উৎপাদন-খরচ কমানো যাইতেছে না।

বিশেষ সংকেত : প্রয়োজন .... অসামর্থ্য—Inability in supplying essential machineries. অভিজ্ঞ কারিগর—Expert technicians. উৎপাদন-খরচ—Cost of production.

৭. ঘাটতি ব্যয়ের তাৎপর্য কি তাহা সকলেই জানেন। এক একটা দেশের সরকার যখন কর ও ঋণলব্ধ অর্থ দ্বারা নিজেদের অপরিহার্য ব্যয় সঙ্কুলান করিতে পারেন না, তখন তাঁহারা নোট ছাপাইয়া ঐ নোটের দ্বারা ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া থাকেন। এক কথায় উহাই ঘাটতি ব্যয়। নোট ছাপাইবার একমাত্র মালিক মূলত সরকার, এবং সরকার যত ইচ্ছা বেশী টাকার নোট আয়ত্তে আনিয়া, তাহার দ্বারা নিজেদের অপরিহার্য ব্যয় সঙ্কুলান করিতে পারেন। সাধারণতঃ যুদ্ধবিগ্রহের সময়েই বিভিন্ন সরকারকে এই পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারত সরকারকেও শেষ পর্যন্ত

এই পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে। অবশ্য এই পন্থা অবলম্বনের একটা বড় রকম বিপদ আছে। তাহা হইতেছে—মুদ্রাস্ফীতি অর্থাৎ পণ্যদ্রব্যের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি।

বিশেষ সংকেত ঃ তাৎপর্য - Significance. ব্যয় সঙ্কুলান করা—To meet expenses. এই পন্থার……করিতে হয়—Has to take recourse to this measure, বড় রকমের বিপদ — A great danger. মুদ্রাস্ফীতি—Inflation.

৮. শিল্প-বিমুখ বাঙালীকে শিল্পোদ্যোগে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে এ রাজ্যে পরিকল্পিতভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহার অর্থ এ নয় যে, সুতাকাটা অথবা তাঁতের কাপড় বোনা, কী বড় জোর দুই-চারিটা যন্ত্রাংশ তৈয়ারি করার আয়োজন করা। সমৃদ্ধিশালী দেশগুলিতে এক একটি বৃহৎ শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া অজস্র ক্ষুদ্র ও মাঝারি কারখানা গড়িয়া ওঠে, তাহাদের উৎপন্ন পণ্য পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করিবার জন্য জন্মলাভ করে বহু ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান। কাঁচামাল সংগ্রহ ও যন্ত্রাংশ উৎপাদন হইতে সুরু করিয়া পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় এবং প্রচারকার্য একই প্রতিষ্ঠান কোন দেশে করে না। কী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কী ব্রিটেন, কী জাপান, কী পশ্চিম-জার্মানি—শিল্পসমৃদ্ধ প্রত্যেকটি দেশেই একই ব্যবস্থা। ভারতবর্ষের পথই বা ভিন্ন হইবে কেন? বৃহৎ শিল্পের সহিত সংযোগ রাখিয়া পরিপূরক হিসাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং পাইকারী ও খুচরা দোকান যদি গড়িয়া তোলা যায় তাহাতে এক দিকে হইবে আর্থিক জীবনের ভিত্তি দৃঢ় আর এক দিকে বঙ্গসন্তানেরও কর্মসংস্থানের ও শিল্পায়নে যোগ দিবার প্রত্যক্ষ সুযোগ হইবে বহু-বিস্তৃত। এলোমেলোভাবে কাজ করিলে অথবা ভাবাবেগে অধীর হইয়া পড়িলে সমস্যা মিটিবে না। ইহার জন্য প্রয়োজন সামগ্রিক পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ।

বিশেষ সংকেত ঃ শিল্প-বিমুখ—Industrially indifferent. শিল্পোদ্যোগ—Industrial enterprise. সুতাকাটা - Spinning. কাপড় বোনা—Weaving. বড় জোর—At most. কেন্দ্র করিয়া—Centering round. জন্মলাভ করে—Emerge. শিল্প-সমৃদ্ধ—Industrially developed. পরিপূরক হিসাবে—Supplementary. এলোমেলোভাবে—In an unorganised way.

৯. খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার জন্য শাস্তিদানের ব্যবস্থাগুলি আরও কঠোর করার কথা আজ লোকসভায় প্রায় সব সদস্যই বলেন। কয়েকজন সদস্য বলেন, খাদ্যে ভেজাল দেওয়া বন্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

লোকসভা হইতে আজ খাদ্যে ভেজাল নিরোধ (সংশোধনী) বিলটি যুক্ত কমিটিতে পাঠান হয়। এই বিলে রাজ্যে খাদ্য পরিদর্শক নিয়োগ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

সদস্যরা সাধারণভাবে এই বিলটিকে স্বাগত জানান কিন্তু অনেকেই মনে করেন ব্যাপক ভেজাল বন্ধ করার জন্য এই বিল প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট দুর্বল। কয়েকজন সদস্য দুর্নীতির অভিযোগ করেন এবং পরিদর্শন ব্যবস্থা আরও জোরদার করিতে বলেন। অধিকাংশ সদস্যই বলেন, খাদ্যে ভেজালের বিরুদ্ধে আইনগুলি কার্যকরী করা হয় নাই।

বিশেষ সংকেত : খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার জন্য—For adulterating food. খাদ্যে……বন্ধ করার জন্য—To stop food-adulteration. প্রশাসনিক ব্যবস্থা—Administrative measures. খাদ্যে ভেজাল নিরোধ (সংশোধনী) বিল—Prevention of Food Adulteration (Revised) Bill. যুক্ত কমিটি—Joint Committee. ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে—Powers have been conferred on. দুর্নীতি—Corruption.

১০. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষির প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও নিত্যব্যবহার্য পণ্যের বিতরণের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। কিন্তু যুদ্ধের শেষে সমবায় সমিতির মারফত নিত্যব্যবহারের পণ্য বিতরণ প্রায় বন্ধই হইয়া যায়। অবশ্য কৃষির প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণের কাজ চলিতে থাকে। কেননা কৃষিঋণ সমিতির সহিত ঐগুলিও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। সমবায়ের উদ্যোগে কৃষি-দ্রব্যের বিপণনের কথা বলা যাইত না। অবশ্য গুজরাট, বিহার ও উত্তর প্রদেশে কয়েকটি বিপণন সমিতি ছিল। সাম্প্রতিককালে উত্তর প্রদেশ অবশ্য প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, বিপণন সমিতির মাধ্যমে সমবায় আন্দোলন সর্বাধিক অগ্রগতি লাভ করিতে পারে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষার্ধে উত্তর প্রদেশে প্রাথমিক কৃষি বিপণন সমিতি গঠনের ব্যাপক প্রচেষ্টা শুরু হয়। অল্পদিনের মধ্যে ঐ প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং রাজ্যের অধিকাংশ জেলাতেই কৃষি পণ্যের বিপণন সমবায় সমিতির মাধ্যমে সুরু হইয়া যায়। অন্যান্য রাজ্যে অবশ্য এখনও ইহা তেমন প্রসার লাভ করে নাই।

বিশেষ সংকেত : কৃষির প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী—Materials essential for agriculture. বিতরণ—Distribution. ঘনিষ্ঠভাবে—Closely. সমবায়ের উদ্যোগে—Through Co-operative enterprise. কৃষিদ্রব্যের বিপণন—Marketing of agricultural goods. ব্যাপক প্রচেষ্টা—Comprehensive attempt. প্রসার লাভ করে নাই—Has not been expanded.

১১. চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশে এ-সপ্তাহে যোজনা কমিশন কয়েকটি সিদ্ধান্ত লইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। জানা গিয়াছে, কমিশন এ বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা, ভূমি সংরক্ষণ, সার উৎপাদন ও বণ্টন, চারাগাছ রক্ষা ও বীজ উৎপাদনের ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে।

যোজনা কমিশনের বর্তমান চিন্তানুসারে চতুর্থ ও পঞ্চম যোজনায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার অন্তত বৎসরে শতকরা পাঁচ ভাগ হওয়া উচিত। সম্ভব হইলে শতকরা ছয় ভাগ বৃদ্ধির চেষ্টাও করা হইবে। খাদ্যশস্যে স্বয়ম্ভর হইবার জন্য ও শিল্পের অত্যাবশ্যক কাঁচা মালের চাহিদা মিটাইতে এবং বিদেশী মুদ্রা আহরণের সম্পদ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে ১৯৭১-৭৫ সালে কৃষি উৎপাদন দ্বিগুণ করিবার চেষ্টা করা উচিত।

খাদ্য, কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের পদস্থ অফিসারগণ পরিকল্পনা কমিশনের বৈঠকগুলিতে উপস্থিত ছিলেন। কমিশন ইহাতে সম্মত হইয়াছেন যে, চতুর্থ যোজনায় অতিরিক্ত এক কোটি যাট লক্ষ একর জমি ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার অধীনে আনা দরকার। ইহার জন্য পাঁচশত কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বিশেষ সংকেত : কৃষি………উদ্দেশে—With a view to increasing agricultural production. সিদ্ধান্ত—Decision. জানা গিয়াছে It is learnt. একমত—Unanimous. ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা—Minor irrigation. ভূমি সংরক্ষণ—Soil preservation. চারাগাছ রক্ষা—Plant protection. ব্যাপক কর্মসূচী—Extensive programme. স্বয়ম্ভর—Self-sufficient. বিদেশী মুদ্রা……সম্পদ—Wealth for earning foreign exchange. পদস্থ অফিসারগণ—Top-ranking officers. বৈঠকগুলিতে—In the meetings. ক্ষুদ্র সেচব্যবস্থার অধীনে—Under minor irrigation system.

১২. পশ্চিমবঙ্গের হিমঘরগুলির লাইসেন্স গ্রহণ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজ্য সরকার শীঘ্রই একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিবেন। বৃহস্পতিবার রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে প্রস্তাবিত অর্ডিন্যান্সের বিবিধ ধারা অনুমোদিত হয়।

রাজ্য সরকারের ধারণা, এই হিমঘরের মাধ্যমে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির কারসাজি আছে। পক্ষান্তরে, এই দিন কলিকাতার বিভিন্ন হিমঘরের মালিকেরা এক বৈঠকে মিলিত হইয়া সাংবাদিকদের জানান, মৎস্যমন্ত্রী কেন যে হিমঘরগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া ভয় দেখান, তাহা তাঁহারা

বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। সহজপাচ্য দ্রব্যাদি সংরক্ষণের ব্যাপারে ও জরুরী অবস্থার জন্য মজুত করার জন্য হিমঘরের প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। হিমঘর সম্পর্কে 'কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির' অভিযোগের কথা তাঁহারা সকলেই অস্বীকার করেন।

এই অবস্থায় উপযুক্ত আইনের অধীনে লাইসেন্স গ্রহণের মারফত হিমঘরগুলির উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করা দরকার বলিয়া সরকার মনে করেন। উৎপাদক ও ক্রেতা যাহাতে উপকৃত হয় এবং ব্যবসায়ীরাও যাহাতে তাঁহাদের ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত না হন, সে জন্যই তাঁহারা অডিন্যান্সটি প্রয়োগ করিয়াছেন।

বিশেষ সংকেত: হিমঘরগুলি—Cold rooms. জারী করিবেন—Will issue. প্রস্তাবিত—Proposed. বিবিধ ধারা—Different articles. অনুমোদিত—Approved. ধারণা—Impression. কারসাজি—Malpractices. সহজ পাচ্য দ্রব্যাদি সংরক্ষণ—Preservation of easily decomposable things. জরুরী অবস্থার জন্য মজুত করা—Storage for emergency. নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি—Control and supervision. বঞ্চিত—Deprived.

১৩. গত সপ্তাহে কলকাতার চায়ের বাজারে কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায় নি। সাধারণ ধরনের চায়ের মূল্য মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। উৎকৃষ্ট ধরনের দার্জিলিং এবং আসাম জাত চায়ের চাহিদা খুবই ভাল ছিল, কিন্তু মূল্যের বিশেষ কোনও হেরফের দেখা যায় নি। গুঁড়া চায়ের চাহিদা বেশ ভালই ছিল। উত্তরবঙ্গের চা-বাগানগুলির সমস্যা নিয়ে চা-কর সমিতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীমনুভাই শাহের নিকট থেকে কয়েকটি আশ্বাস পেয়েছেন। সমস্যা-জর্জরিত চা-বাগানগুলির অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছে এবং তার ফলে চায়ের উৎপাদন এবং বাগানগুলিতে নতুন চারা রোপণ অত্যন্ত ব্যাহত হচ্ছিল। চা-কর সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে বাগানগুলিকে অর্থ সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শ্রীশাহ বলেন যে, নতুন চারা রোপণের জন্যে ব্যয়িত অর্থ যাতে আয়কর থেকে রেহাই পায়, তার জন্যে ভারত সরকার একটা বিশেষ প্রস্তাব চিন্তা করে দেখছেন। আবগারী শুল্ক যাতে বাগানের উৎপাদনের উপর আরোপিত না হয়ে নীলামের স্তরে আরোপিত হয়, চা-কর সমিতির এই প্রস্তাবটিও ভারত সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। কিছুদিন পূর্বে এ সম্বন্ধে রিপোর্ট পেশ করার জন্যে ভারত সরকার যে কমিটি নিয়োগ করেছিলেন, সে কমিটিও অনুরূপ প্রস্তাব করেছেন। শ্রীমনুভাই শাহ বলেন যে, চা বোর্ড বাগানগুলিকে ১০

কোটি টাকা ঋণ দেবার ব্যবস্থা করেছেন এবং এর মধ্যে ৫'৯ কোটি টাকা বিলি হয়ে গেছে। এ ছাড়াও বাগানের যন্ত্রপাতি ক্রয় করবার জন্যে বোর্ড কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য ৩ কোটি টাকা ধার দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

বিশেষ সংকেত : স্থিতিশীল—Static. সাধারণ ধরনের—Of ordinary quality. উৎকৃষ্ট ধরনের—Of best quality. চা-কর সমিতি—Tea Revenue Society. বার্ষিক সম্মেলন—Annual Conference. অর্থ সাহায্য—Financial grants. আবগারী শুল্ক—Excise duty নীলামের স্তরে—At auction level. বিবেচনাধীন—Under consideration. বিলি হয়ে গেছে—Have been allocated. কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য—Repayable by instalments.

১৪। গত সপ্তাহে শেয়ার বাজার খোলবার মুখে কিছুটা তেজীভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল, এবং ফট্‌কা ও কয়েকটি পাঁচমিশালী শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছিল। অনেকে মনে করেছিলেন, হয়তো, নতুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠনের ফলে লগ্নীকারকদের মনে আস্থার ভাব ফিরে আসবে। ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং, বস্ত্রকল, মোটর, এ্যালুমিনিয়ম প্রভৃতি শেয়ারগুলির চাহিদা বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন থেকেই আবার বাজার-মন্দা নেমে আসে এবং সমস্ত ফট্‌কা এবং পাঁচমেশালী শেয়ারের বেচাকেনা মন্দা হয়ে যায়। বাজারের অবস্থা পর্যালোচনা করলে, কয়েকটি বিশেষ জিনিসের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। শাস্ত্রী মন্ত্রীসভা গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাজারের অবস্থার বেশ কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। শাস্ত্রীজী কংগ্রেসের ভেতরকার মধ্যপন্থী এবং তার নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রীসভা বর্তমান অর্থ নৈতিক কাঠামোর কোনও পরিবর্তন সাধিত করবেন না—এই চিন্তাধারায় লগ্নীকারদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল, কিন্তু গত কয়েক দিনের মধ্যে, খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবসা রাষ্ট্রীয়করণের জন্যে কংগ্রেসের উচ্চ নেতৃত্ব মহলে যে মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে, তার ফলে বাজারে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

বিশেষ সংকেত : তেজীভাব—Bull. ফট্‌কা—Speculation. পাঁচমিশালী—Miscellaneous. লগ্নীকারক—Investors. বাজার-মন্দা—Depression. পর্যালোচনা—Review. বর্তমান……সাধিত করবেন না—Will not bring about any change in the present economic structure. এই চিন্তাধারায়—On this understanding. উচ্চ নেতৃত্ব—High command. বিরূপ প্রতিক্রিয়া—Adverse reaction.

১৫. গত সপ্তাহে কলকাতায় কাঁচা পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের বাজার নরম ছিল। সামনের মরশুমে খুব ভাল ফসল পাওয়া যাবে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যাদের হাতে পুরনো মরশুমের পাট রয়েছে, তারা মাল বেচে ফেলবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করে। এর ফলে বাজার ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। তবে অবশ্য খুব উৎকৃষ্ট ধরনের পাটের মূল্য বেশ তেজী ছিল এবং চাহিদাও ছিল প্রচুর। পুরনো মরশুমের উৎকৃষ্ট ধরনের পাট বাজারে এখন নেই বললেই চলে। পাটজাত দ্রব্যের বাজারে বিদেশী চাহিদার অভাবে তেমন কোনও হেরফের দেখা যায়নি। মিলগুলির হাতে প্রচুর কাঁচা মাল ছিল, কিন্তু উৎপাদনে কিছুটা শৈথিল্য এসেছিল। সরকারের তরফ থেকে ভারী মালের চাহিদা কিছু এসেছিল, কিন্তু তাতেও এই মালের বাজারে তেজীভাব দেখতে পাওয়া যায়নি। বিদেশের বাজারে ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্যে একটি বিশেষজ্ঞ দল শিগ্‌গিরই পশ্চিম ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় যাচ্ছেন। এই দল প্রথমে যাবেন প্যারিসে; সেখানে ইউরোপীয় পাটকল ব্যবসায়ীদের একটা সভায় তাঁরা যোগদান করবেন। যদিও ইউরোপের পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদনকারীদের সঙ্গে ভারতের উৎপাদনকারীদের একটা সহজাত প্রতিযোগিতামূলক বৈরিতা রয়েছে, তবুও একটা ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে সলাপরামর্শ করবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে—সেটা হচ্ছে প্যাকিং-এর ব্যাপারে বিকল্প দ্রব্য-সমূহের আবির্ভাব। বিকল্প দ্রব্যগুলির ব্যবহার ক্রমেই এত বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনকারীদের সামনে এক বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে। এ ছাড়া ভারতীয় বিশেষজ্ঞ দল পাকিস্তানী পাট শিল্পের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের বাজার বাঁড়াবার সমস্যাও ভাল করে পরীক্ষা করে দেখবেন।

বিশেষ সংকেত : পাটজাত দ্রব্য—Jute manufactures. নরম—Dull. ভাল ফসল—Good crop. সামনের মরশুম—Coming season. পুরোনো মরশুম—Last season. ঠাণ্ডা—Depressed. তেজী—Brisk. পাটকল ব্যবসায়ী—Jute mill traders. সহজাত প্রতিযোগিতামূলক বৈরিতা—Inherent competitive tendency. সলাপরামর্শ করবার—To have discussions. বিকল্প দ্রব্যসমূহের আবির্ভাব—Emergence of substitute goods. ভারতীয় বিশেষজ্ঞ দল—Team of Indian experts.

১৬. পশ্চিমবঙ্গে সরষে উৎপন্ন না হবার ফলে তেলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। অন্যান্য রাজ্যে এবার সরষের মূল্য খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে। সরষে উৎপাদনকারী রাজ্যগুলিতে এতে কোনও সঙ্কটের সৃষ্টি হয়নি, কারণ সেখানকার অধিবাসীরা বড় একটা সরষের

তৈল খান না। ঐ সমস্ত রাজ্যগুলির পক্ষে অধিক মূল্যে সরষে বিক্রি করা একটা লাভজনক ব্যবসা। সেই জন্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের কাছ থেকে কোনও সাহায্য এবং সহানুভূতি পাচ্ছেন না। কিছুদিন হল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার অন্যান্য রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়েছেন। রাজ্য সরকার তাদের অনুরোধ করেছিলেন বিভিন্ন প্রকার সরষের একটা সর্বোচ্চ মূল্য বেঁধে দেবার জন্যে—কিন্তু তাঁরা এতে কর্ণপাত করেন নি। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে এই প্রকার অসহযোগিতার ভাব ক্রমেই যেন বৃদ্ধি পাচ্ছে, অথচ সমস্ত রাজ্যগুলি একযোগে একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করলে, এ সমস্ত তুচ্ছ সমস্যার সমাধান অতি সহজেই করা যেতে পারে। একটি সর্বভারতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হলে, রাজ্যগুলির মধ্যে সহযোগিতা ছাড়াও, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ থেকে, অবিলম্বে একটি নীতি ঘোষিত হওয়া উচিত—সেটা হ'ল, সরষের বীজের ওপর সমস্ত ব্যাঙ্ক দাদন বন্ধ করে দেওয়া।

দেখা গেছে, দিল্লী, হাপুর, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রধান প্রধান সরষে বিক্রয় কেন্দ্রগুলিতে এ ব্যবসায়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত বহু লোকের আবির্ভাব ঘটেছে। এরা ব্যাঙ্ক দাদনের সাহায্যে লক্ষ লক্ষ টাকার সরষে চাষীদের কাছ থেকে ক্রয় করে গুদামজাত করেছিল এবং চড়তি বাজারে আস্তে আস্তে মাল ছেড়ে বহু অর্থ রোজগার করে নিচ্ছে। এটা অবশ্য সাধারণভাবে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করবার একটা পন্থা। সমস্যার মূলে কুঠারাঘাত না করলে সরষের তৈলের মূল্য কমানো সম্ভব হবে না। এ ব্যাপারে ভারত সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে—রাজ্য সরকারের পক্ষে একা এত বৃহৎ সমস্যা সমাধান করা অসম্ভব।

বিশেষ সংকেত ঃ তৈলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে—The crisis of oil has come to prevail. লাভজনক ব্যবসা—A lucrative business. সর্বোচ্চ মূল্য বেঁধে দেবার জন্যে—To fix up ceiling price. এতে কর্ণপাত করেন নি—Paid no heed to it. অসহযোগিতার ভাব—Feeling of non-cooperation. তুচ্ছ সমস্যা—Minor problems. ব্যাঙ্ক দাদন—Bank advances. অপরিচিত বহু লোক—Many unknown faces. চড়তি বাজার—An easy market. সমস্যার মূলে কুঠারাঘাত না করলে—If the problem is not uprooted.

১৭. ভারতীয় দ্রব্যাদির রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের বিবিধ সুবিধা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। রপ্তানিকারকগণ রেলযোগে মাল প্রেরণের অসুবিধা সম্পর্কে অভিযোগ করিয়াছেন। ভারত সরকার অত্যন্ত দ্রুত প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, এবং বর্তমানে রেলওয়ে ওয়াগন বরাদ্দের ব্যাপারে রপ্তানি

বাণিজ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইতেছে। রেল পর্ষদ সকল রেল কর্তৃপক্ষকে স্থায়ী নির্দেশ দিয়াছেন যে, রপ্তানি দ্রব্যাদি একপক্ষকালের বেশী আটক পড়িয়া থাকিলে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়া সেগুলিকে গন্তব্যস্থানে প্রেরণ করিতে হইবে। বিভিন্ন বন্দরে রপ্তানি দ্রব্যাদি প্রেরণের সময় ওয়াগনে বিশেষ অগ্রাধিকারের লেবেল লাগানো হয়। ইহাতে দ্রুত মাল প্রেরণ সম্ভব হইতেছে।

মাল প্রেরণের ব্যয়ের উপর দ্রব্যমূল্য নির্ভর করে বলিয়া সরকার বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয়ের সুবিধার্থে মাল মাশুল সম্পর্কে প্রতিনিয়ত পর্যালোচনা চালাইয়া যাইতেছেন। আজ বহু দ্রব্যের ক্ষেত্রে মাল মাশুল ২৫ শতাংশ হইতে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হইতেছে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রেল মন্ত্রণালয় যুক্তভাবে এই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

বিশেষ সংকেত: বিবিধ সুবিধা—Various privileges. অত্যন্ত দ্রুত প্রতিকার ব্যবস্থা—Very quick proventive measures. বরাদ্দ—Allotment. অগ্রাধিকার—Priority. রেল পর্ষদ—Railway Board. স্থায়ী নির্দেশ—Standing order. সর্বাধিক অগ্রাধিকার—Top-most priority. বিশেষ......লাগানো হয়—Label of special priority is pasted. দ্রুত মাল প্রেরণ—Quick despatch of goods. মাল প্রেরণের ব্যয়—Despatch charges. মাল মাশুল—Freight প্রতিনিয়ত—Off and on. ছাড়—Rebate.

১৮. পরিকল্পনা কমিশন মহলের খবরে বলা হইয়াছে, মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা কতটা বজায় রাখা যায়, চতুর্থ যোজনায় শ্রম-সম্পর্কিত যে কোন নীতির সাফল্য তাহার উপরই নির্ভর করিবে। ত্রিপক্ষীয় বোঝাপড়া এবং পারস্পরিক সমঝোতার উপর বর্তমান শ্রমনীতির ভিত্তি স্থাপিত এবং ইহার ফলে কাজ ভালভাবেই চলিতেছে, যেহেতু পার্টির মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রধানতঃ ইহা স্থিরীকৃত হয়। আইনের উপর অযথা নির্ভর না করিয়া ত্রিপক্ষীয় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত শ্রমনীতি কাজকর্মের সুষ্ঠু সম্পাদনের সহায়ক হইতে পারে বলিয়া এই মহল মনে করেন।

কিন্তু উদ্বেগ দেখা দিয়াছে প্রকৃত আয়ের ক্ষেত্রে। খাদ্য ও অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির মূল্য ক্রমশ চড়িয়া যাওয়ার ফলে প্রকৃত আয় উবিয়া যাইতেছে। বলা হইয়াছে, পরবর্তী যোজনাকালে শ্রমিককে সন্তুষ্ট রাখিতে হইলে মূল্যমানের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ব্যাপারে আরও সতর্ক দৃষ্টি দিতে হইবে।

বিশেষ সংকেত: পরিকল্পনা কমিশন মহল—Planning Commission circle. মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা—Stability in the price-level: শ্রম সম্পর্কিত......সাফল্য

—Success of any policy relating to labour. ত্রিপক্ষীয়......সমঝোতা—
—Three-party understanding and mutual arbitration. সুষ্ঠু সম্পাদনের সহায়ক—Favourable to perfect execution. উদ্বেগ—Anxiety. প্রকৃত আয়—Real income. মূল্যমান—Price level. সতর্ক দৃষ্টি—Vigilant eyes.

২৯। বর্তমানে ভারতীয় শিল্পের প্রয়োজনীয় অনেক রকম পণ্যসামগ্রী ভারতকে বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইতেছে এবং এজন্য বহুল পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা খরচ হইতেছে। বিদেশী মুদ্রার এই খরচ কমাইবার জন্যও ভারতে অনেক নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। ভারত বর্তমানে খাদ্য ও শিল্পের অনেক কাঁচামালের জন্য পরনির্ভরশীল। এই পরনির্ভরতা দূর করিবার জন্য কৃষির উন্নতি আবশ্যক। কিন্তু ভারতের কৃষিজমিতে যে পরিমাণে রাসায়নিক সার প্রয়োগের প্রয়োজন, তাহা ভারতে উৎপন্ন হয় না। ভালভাবে জমি চাষ করিবার জন্য ট্রাক্টর ইত্যাদি যন্ত্রেরও প্রয়োজন। উহাও ভারতে উৎপন্ন হয় না। এ দেশে কীটপতঙ্গের উপদ্রবে কৃষিক্ষেত্রে বৎসর বৎসর প্রভূত পরিমাণে ফসল নষ্ট হইয়া যায়। এই কীটপতঙ্গের উপদ্রব নিবারণের জন্য যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজন তাহাও এখানে উৎপন্ন হয় না। কাজেই ভারতকে যদি খাদ্য ও শিল্পের কাঁচামালের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে হয় তাহা হইলে ভারতে রাসায়নিক সার উৎপাদন, ট্রাক্টর প্রভৃতি নির্মাণ এবং কীটপতঙ্গনাশক রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বহুপ্রকার শিল্পের প্রবর্তন করিতে হইবে।

বিশেষ সংকেত : বিদেশী মুদ্রা—Foreign exchange. পরনির্ভরশীল—Dependent on other countries. রাসায়নিক সার—Chemical fertilisers. কীটপতঙ্গের উপদ্রব—Attack of insects. স্বাবলম্বী—Self-sufficient. কীটপতঙ্গনাশক—Insecticides.

৩০। ইউনিট ট্রাস্ট পৃথিবীর উন্নততর দেশসমূহে অনেক দিন ধরিয়াই চালু হইয়াছে এবং উহা ব্যবসাক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছে। ভারতের মত দরিদ্র দেশে স্বল্প-আয়বিশিষ্ট লোকেরা নিজেদের আয় হইতে সমস্ত খরচ সঙ্কুলান করিয়া যে সামান্য অর্থ সঞ্চয় করেন তাহা লাভজনক পথে বিনিয়োগ করিতে সমর্থ হন না। অনেক সময়ে তাঁহারা দালালের ধোঁকায় পড়িয়া সঞ্চিত অর্থ বাজে কোম্পানির শেয়ারে দাদন করিয়া সর্বস্বান্ত হন। যাঁহারা বিচারবুদ্ধি খরচ করিয়া কোন্ কোম্পানির শেয়ারে অর্থ দাদন সব চেয়ে বেশী লাভজনক তাহা স্থির করিতে সমর্থ হন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকের পক্ষে বড় বড় কোম্পানির পাঁচ শত বা হাজার টাকা মূল্যের শেয়ার

ক্রয় করা সম্ভব হয় না। তাহা ছাড়া যে সমস্ত কোম্পানির ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল সেই সব কোম্পানি বাজারে শেয়ার বিক্রয়ের জন্য আবেদন করিলে কোম্পানি যত টাকার শেয়ার বিক্রয় করিতে চায় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকার শেয়ার ক্রয়ের জন্য আবেদন পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে যাঁহারা বেশী শেয়ারের জন্য আবেদন করেন· তাঁহারাই শেয়ার পান এবং যাঁহারা দুই-চারিটি শেয়ারের আবেদন জানান তাঁহাদের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়।

বিশেষ সংকেত : উন্নততর দেশসমূহ—More improved countries. সাফল্য অর্জন করিয়াছে—Has achieved success. স্বল্প-আয়বিশিষ্ট লোক—Low-income people. দালালের ধোঁকায়—At the persuation of brokers. বাজে কোম্পানি —Bad company. সর্বস্বান্ত—Penniless. বিচারবুদ্ধি খরচ করিয়া—Relying on own power of judgment. প্রত্যাখ্যাত হয়—Are rejected.

২১. সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত সংস্থাসমূহের জন্যে গঠিত সংসদীয় কমিটি প্রস্তাব করেছেন যে, তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনের উচিত স্বল্পতম সময়ে আরও তৈলক্ষেত্র আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে দৃঢ় প্রচেষ্টা চালানো এবং সম্ভাব্য তৈল-সমৃদ্ধ এলাকায় তৈল উত্তোলনের উপর গুরুত্ব আরোপ। তৈল ও তৈলজাত পদার্থ বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে আমদানি করা হচ্ছে, দেশে তৈলের চাহিদা বেড়েছে এবং আরও বাড়বে, তার উপর রয়েছে বৈদেশিক মুদ্রার অপ্রতুলতা। এ সব কারণেই কমিটি কমিশনকে ব্যাপকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে বলেছেন।

খনিজ তৈল আবিষ্কার এবং তা উৎপাদনে কমিশন যে কিছু কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, কমিটি তা উল্লেখ করেছেন। কমিশন যে সব সমীক্ষা চালিয়েছেন তার অগ্রগতি কমিটিকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তাঁরা মনে করেন যে, আরও দ্রুততার সঙ্গে সমীক্ষা শেষ করা যেত। সমীক্ষার পথে যে সব বাধা দেখা দিয়েছে তাও 'অনতিক্রম্য' নয় বলে কমিটি মনে করেন। কমিটি প্রস্তাব করেছেন যে, সমীক্ষা ও তৈল কল নির্মাণে কি আন্দাজ অর্থ ব্যয় করা হবে, কমিশনের তা স্থির করে দেওয়া উচিত। এবং কি কি সর্তে কমিশনকে অর্থ প্রদান করা হবে, সরকারের উচিত তাও অগ্রিম নির্ধারণ করা। কমিশন কমিটিকে জানিয়েছেন যে, অপরিশোধিত তৈল আর গ্যাস বিক্রয় করে আগামী বৎসর আয় হবে ১৫ থেকে ২০ কোটি টাকা।

দেরাদুনে কমিশনের সদর দপ্তর স্থাপন করায় কমিটি সমালোচনা করেছেন। তবে এখন আর তা স্থানান্তরের কোন প্রস্তাব করেন নি। কমিশনের কাজের অগ্রগতির পথে যে সব বাধা তা উপযুক্ত পরিচালন, সমন্বয়-সাধন এবং নিয়ন্ত্রণের দ্বারা অতিক্রম

করা সম্ভব বলে কমিটি মন্তব্য করেছেন। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে মুখ্য কর্মকর্তা হিসাবে সর্ব সময়ের জন্য একজন চেয়ারম্যান নিয়োগের জন্যে কমিটি প্রস্তাব করেছেন।

বিশেষ সংকেত: সরকারী.........কমিটি—Parliament's committee on Public Undertakings. স্বল্পতম সময়ে—In shortest time possible. আরও তৈলক্ষেত্র আবিষ্কার—To discover more oil-fields. দৃঢ় প্রচেষ্টা চালানো—To make determined efforts. সম্ভাব্য......গুরুত্ব আরোপ—Lay emphasis on rapid exploitation of areas known to be oil-bearing. তৈলজাত পদার্থ—Oil production. অপ্রতুলতা—Shortage. সমীক্ষা—Survey. 'অনতিক্রম্য'—'Insurmountable'. অপরিশোধিত তৈল—Crude oil. সদর দপ্তর—Head quarters. পরিচালনা—Management. সমন্বয় সাধন—Co-ordination. নিয়ন্ত্রণ—Control. ব্যবস্থাপনা—Management. মুখ্য কর্মকর্তা—Chief executive.

৯২/৮। ক্রেতা সমবায় সমিতিগুলির অর্থসঙ্গতি খুবই কম। অথচ এই শ্রেণীর সমিতির সাফল্যজনক পরিচালনার দ্বারাই এ দেশের ব্যাপক মুনাফাবৃত্তির প্রতিকার হইতে পারে। এজন্য, গভর্নমেণ্টের কর্তব্য, দেশের ক্রেতা সমবায় সমিতিগুলি যাহাতে (সরাসরি উৎপাদক ও আমদানিকারকদের নিকট হইতে) পণ্যদ্রব্য পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা, ইহাদের উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন দিয়া সাহায্য করা এবং যে সমস্ত বেসরকারী ব্যবসায়ী মুনাফাবৃত্তি রোধ হইতে দেখিয়া ক্রেতা সমবায় সমিতির উপর খড়্গহস্ত তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করা। নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশে সমবায়ের দ্বারা দেশের উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত হইতেছে এবং ব্যবসায়ীদের মুনাফাবাজির বিলোপ ঘটিয়াছে। ওই সব দেশে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা, ব্যাঙ্ক, কলকারখানা ইত্যাদি সমবায় প্রথায় চালিত হইতেছে। ভারতেও ব্যবসায়ীদের ব্যাপক মুনাফাবাজির এই উপায়ে বিলোপ সাধন করা যাইতে পারে। কিন্তু এজন্য গভর্নমেণ্টের সক্রিয় সাহায্য আবশ্যক।

বিশেষ সংকেত: ক্রেতা সমবায় সমিতি—Consumers' Co-operative Society. অর্থসঙ্গতি—Funds. সাফল্যজনক পরিচালনা—Successful management. মুনাফাবৃত্তি—Profiteering. (সরাসরি উৎপাদক ·····নিকট হইতে—Directly from producers and importers.) খড়্গহস্ত—Daggers drawn with. বণ্টন ব্যবস্থা—Distribution মুনাফাবাজির······ঘটিয়াছে—Profiteering has been eradicated. সক্রিয় সাহায্য—Active assistance.

২৩. বাজেটের অব্যবহিত পরে শেয়ার বাজারে যে চাঙ্গা ভাবের সৃষ্টি হয়েছিল, তা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী ছিল। যতই দিন যাচ্ছে, ততই লগ্নীকারক মহল খতিয়ে দেখছেন যে, বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের স্বার্থরক্ষার জন্যে বিশেষ কিছু করেন নি এবং সেই জন্যেই বাজারের অনিশ্চয়তা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। গত সপ্তাহে কলকাতার শেয়ার বাজারে বেশ মূল্য হ্রাস পায় এবং কোনও শেয়ারই এর হাত থেকে রক্ষা পায়নি। ইণ্ডিয়ান্ আয়রন্, হিন্দ্ মোটর, ইণ্ডিয়ান্ এ্যালুমিনিয়ম্, ডানলপ্ প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় শেয়ারের চাহিদা খুবই কম ছিল এবং এদের মূল্য হ্রাস পেয়েছিল। বাজেট্ বিতর্কে অর্থমন্ত্রীর ঝুলি থেকে কিছু বেরোয় কিনা, সেদিকে বাজারের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে। ইতিমধ্যে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির সভায় বাজেট্ সম্বন্ধে মৃদু আপত্তি উঠেছিল, কিন্তু সে আপত্তি ভারত সরকার গ্রাহ্য করবেন কিনা, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শিল্পপতিরা বহু আবেদন নিবেদন ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন ; তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে যে, এবারকার বাজেটে সাধারণ মানুষের জন্যে কিছু থাকলেও তাঁদের জন্যে কিছুই নেই এবং তার ফলে মূলধন জমাবার মত কোনও মনোভাবই সৃষ্টি হবে না। অন্য একটি কারণেও শেয়ার বাজারে মন্দাভাবের সৃষ্টি হয়েছে—সেটা হচ্ছে, ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক বর্ধিত হারে সুদ দেবার সিদ্ধান্ত। ছোট ছোট লগ্নীকারকরা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে অনিশ্চিত শেয়ার বাজারে অর্থ লগ্নী করা অপেক্ষা এখন ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখা বেশ লাভজনক। শেয়ারের মূল্য-স্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চিত না হলে, এঁরা এ ক্ষেত্রে টাকা লগ্নী করতে চাইবেন না বলেই মনে হয়।

বিশেষ সংকেত : বাজেটের অব্যবহিত পরে—Immediately after the budget. চাঙ্গা ভাব—Bullish condition. লগ্নীকারক মহল—Investors circle. খতিয়ে দেখছেন—Are examining. বেসরকারী.........স্বার্থরক্ষার জন্যে—To safeguard the interests of the private industrial undertakings. মূল্য হ্রাস—Fall in price. দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে—Attention has been concentrated on. মৃদু আপত্তি—Mild protest. মূলধন জমাবার মত—Favourable to capital formation. মন্দাভাব—Depression. বর্ধিত হারে—At enhanced rate. ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখা—To deposit money in banks. বেশ লাভজনক—More lucrative. মূল্য-স্থিতি—Stability in prices.

২৪. কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রণালয় স্থির করিয়াছেন যে, ১৯৪৮ সালের কারখানা আইনের ব্যাপক সংশোধন করা হইবে।

ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংশোধন এই যে, পদত্যাগ করিবার সময়ে শ্রমিক প্রাপ্য ছুটির পরিবর্তে বেতন দাবী করিতে পারিবে। জরুরী অবস্থার সময়ে বিভিন্ন ফ্যাক্টরীকে এই আইনের আওতা হইতে রেহাই দিবার জন্য রাজ্য সরকারের উপর যে ক্ষমতা দেওয়া আছে, উহা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। বিভিন্ন শিল্পসংস্থায় নিরাপত্তার উন্নততর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বর্তমানে কোন শ্রমিককে বরখাস্ত করা হইলে অথবা কর্ম হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া হইলে সে যেদিন পর্যন্ত কাজ করিয়াছে, ঐদিন পর্যন্ত বেতন পাইতে পারে। কিন্তু কোন শ্রমিক কর্মত্যাগ করিলে তাহাকে এই সুবিধা দেওয়া হয় না।

আইনের ৭৯ নং ধারা পরিবর্তন করার প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং সংশোধিত ব্যবস্থা অনুযায়ী কোন শ্রমিক কর্মত্যাগ করিলেও ছুটি ও বেতন সংক্রান্ত সুবিধা পাইবে। এই সকল ক্ষেত্রে ছুটি দেওয়ার সুবিধা না থাকায় ছুটির পরিবর্তে বেতন দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

বিশেষ সংকেত : ১৯৪৮ সালের... ...সংশোধন—Extensive amendment of the Factories Act, 1948. প্রাপ্য ছুটির .....করিতে পারিবে – Will be able to claim remuneration in lieu of leave due to him. জরুরী অবস্থার সময়ে—During emergency. এই আইনের আওতা হইতে—From the jurisdiction of this act. নিরাপত্তার উন্নততর ব্যবস্থা—More improved measures for security. সংশোধিত—Revised. ছুটি ও বেতন সংক্রান্ত সুবিধা—Benefits regarding leave and remuneration.

২৫. গত বৎসর চাল ও পাটের উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ রেকর্ড করেছে। ঐ বৎসর চাল ও পাটের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫৭ লক্ষ টন এবং ৪২ লক্ষ গাঁইট। ভারতের যে কোন রাজ্যের তুলনায় এই উৎপাদন বেশী।

আরও জানা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে 'অধিক শস্য ফলাও' অভিযানে তৃতীয় যোজনার গত তিন বৎসরে ৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। পঞ্চম অর্থাৎ শেষ বৎসর এ জন্যে ব্যয়ের সিদ্ধান্ত হয়েছে ৯ কোটি টাকা। প্রকাশ যে, রাজ্যের কৃষি উন্নয়নে তৃতীয় যোজনার শেষে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ২৬ কোটি টাকা।

উন্নত ধরনের সার ও বীজ সরবরাহ, সেচ, চারা ও ফসল সংরক্ষণ প্রভৃতি বিবিধ উন্নয়ন কাজে ঐ অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে।

বিশেষ সংকেত : 'অধিক শস্য ফলাও' অভিযানে—'Grow more food' Campaign. উন্নত ধরনের সার ও বীজ সরবরাহ—Supply of improved fertilisers

and seeds. চারা ও ফসল সংরক্ষণ—Protection of plants and crops. বিবিধ উন্নয়ন কাজ—Miscellaneous development works.

২৬. ভারত আগামী দুই বৎসরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে দেড় কোটি টন খাদ্যশস্য আমদানি করিবে বলিয়া আজ এখানে জানা গিয়াছে। আজ সন্ধ্যায় বিষয়টি সর্বোচ্চ-স্তরে আলোচিত হয়। ইতিপূর্বে খাদ্য সম্পর্কে মন্ত্রিসভার সাব-কমিটি খাদ্যশস্য আমদানির এই লক্ষ্য অনুমোদন করেন। এই আমদানিকৃত খাদ্যশস্যের মধ্যে ৫০ লক্ষ টন গম ও দশ লক্ষ টন চাউল আপৎ-কালের জন্য মজুদ করিয়া রাখা হইবে।

বর্তমানে ভারত ৫০ লক্ষ টন গম ও ৩ লক্ষ টন চাউল আমদানি করে। নূতন চুক্তি আগামী জুলাই মাস হইতে কার্যকরী হইবে। আজ লোকসভায় অর্থমন্ত্রী বলিয়াছেন, এ বৎসর দেশে ৮ কোটি ৭০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হইবে। পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় ভারতের কৃষি-উৎপাদন ভাল।

বিশেষ সংকেত : সর্বোচ্চ স্তরে—Top level. আপৎ-কালের জন্য—For emergency. কার্যকরী হইবে—Will be put in force. পৃথিবীর......ভাল—Agricultural production of India is good in comparison with other countries of the world.

২৭. নিউজ্ প্রিন্ট্ আমদানি সম্পর্কে নতুন সরকারী আদেশে পূর্বের মতই সংবাদপত্র শিল্পকে পঙ্গু করে রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে। এ কথা সত্য, গত বৎসর শতকরা পাঁচ ভাগ নিউজ্ প্রিন্ট্ হ্রাস করবার যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু নিউজ্ প্রিন্ট্ বরাদ্দের মধ্যে হোয়াইট্ প্রিন্ট্ অন্তর্ভুক্ত করে ঐ আদেশের সঙ্গে যে একটি ক্ষতিকর অংশ জুড়ে দেওয়া হয়েছে তাতে অবস্থার আরও অবনতি হবে।

বর্তমানে যে ব্যবস্থা আছে তাতে যে সংবাদপত্র বার্ষিক ৫০০ টনেরও বেশী নিউজ্ প্রিন্ট্ ব্যবহার করবে, তার জন্যে যে বিদেশী নিউজ্ প্রিন্ট্ ও নেপা নিউজ্ প্রিন্ট্ বরাদ্দ রয়েছে, সেই বরাদ্দ থেকে শতকরা পাঁচভাগ নিউজ্ প্রিন্ট্ হ্রাস করার ব্যবস্থা আছে। নতুন আদেশে বরাদ্দ হ্রাস না করে তার পরিবর্তে শতকরা ১২½ ভাগ হোয়াইট্ প্রিন্ট্ ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ সংকেত : নতুন সরকারী আদেশ—The new Government order. পঙ্গু করে রাখবার—To keep in a crippling grip. প্রত্যাহার করা হয়েছে—Has

been withdrawn. বরাদ্দ—Quota. অন্তর্ভুক্ত করে—Incorporating. একটি ক্ষতিকর অংশ—A pernicious feature. বর্তমানে যে ব্যবস্থা আছে—Under the existing system. হোয়াইট্ প্রিন্ট্ ব্যবহার – Consumption of white print.

১৮. ভারতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানি বৃদ্ধি সমধিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহে নূতন নূতন শিল্পোদ্যোগ আরম্ভ করা হইতেছে বলিয়া মূলধনী যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ আমদানির জন্য সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রার উপর প্রচণ্ড চাপ পড়িতেছে। যতদিন পর্যন্ত ভারতেই এই সকল মূলধনী যন্ত্রপাতি নির্মিত না হইতেছে ততদিন এই চাপ ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া চলিবে। বৈদেশিক মুদ্রা পরিস্থিতির এই সকট কাটাইয়া উঠিবার জন্য সরকার বিবিধ উপায়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তন্মধ্যে রপ্তানি বৃদ্ধি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সরকার রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদির উৎপাদকগণকে বিভিন্ন কর সম্পর্কে সুবিধা, মাশুল ছাড় এবং অর্থ সাহায্য দিয়া নানাভাবে উৎসাহিত করিতেছেন।

প্রায় এক বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে রপ্তানি উন্নয়ন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাইবার জন্য ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্য সংস্থা গঠন করেন। এক বৎসরে এই সংস্থা বিভিন্ন শিল্পের কর্মকর্তাদের বিশেষ শিক্ষাদান, রপ্তানি শিল্পের গবেষণা-সমস্যা এবং বিপণন সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছেন।

বিশেষ সংকেত: রপ্তানি বৃদ্ধি—Import promotion. শিল্পোদ্যোগ—Industrial undertakings. মূলধনী যন্ত্রপাতি—Capital plants. সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রা—Foreign exchange accumulations. প্রচণ্ড চাপ—Tremendous pressure. বৈদেশিক মুদ্রা......উঠিবার জন্য—To get over this crisis of foreign exchange situation. বিভিন্ন কর সম্পর্কে.........সাহায্য দিয়া—Granting various tax-reliefs, freight rebate and financial assistance. সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা—A consorted effort. বৈদেশিক বাণিজ্য সংস্থা—International trade corporation. রপ্তানি-শিল্পের......গবেষণা—Research problems of export industries and research relating to marketing.

২৯. কলকাতা মেট্রোপলিটন্ জেলার জলসরবরাহ, জল-নিকাশি এবং ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর ভার গ্রহণের জন্যে বিধিবদ্ধ সংস্থা গঠনের কাজ আরও এক ধাপ এগিয়ে এসেছে।

তিনজন ডিরেক্টর ও ২৫ জন সদস্য-বিশিষ্ট একটি পর্ষদ গঠন করার কথা সম্প্রতি একটি খসড়া বিলে বলা হয়েছে। মন্ত্রিসভার সাধারণ অনুমোদনের পর আইন বিভাগ এখন খসড়াটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খতিয়ে দেখছেন। তাঁরা হয়ত কোন পরিবর্তন সুপারিশ করতে পারেন।

রাজ্য সরকার বিধানসভার জুলাই অধিবেশনেই বিলটি আনতে চান। ১৯৬৩ সালেই এই সংস্থা গঠনের কথা ছিল। রাজ্য সরকার দুবছর সময় বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। বাঁশবেড়িয়া থেকে উলুবেড়িয়া এবং বজবজ থেকে কল্যাণী পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চারশ বর্গমাইল বিস্তৃত কলকাতা মেট্রোপলিটন্ জেলার জলসরবরাহ, জল-নিকাশি এবং ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর এই সর্বাত্মক প্রকল্প রূপায়ণের জন্যে বিশ্ব-ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা সাহায্য করতে ইচ্ছুক। এ জন্যে প্রায় দুই শত কোটি টাকা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাঁরা পরিকল্পনা রূপায়ণের উপযোগী বিধিবদ্ধ সংস্থা গঠনের কথা বার বার বলে আসছেন।

বিশেষ সংকেত : কলকাতা মেট্রোপলিটন্ জেলা—Calcutta Metropolitan District. জল-নিকাশি—Water-drainage ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী—Underground sewerage. বিধিবদ্ধ সংস্থা—Incorporated organisation. পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খতিয়ে দেখছেন—Have been examining minutely কোন পরিবর্তন……করেন —May recommend some amendments এই সর্বাত্মক… ..রূপায়ণের জন্য—For the implementation of this multi-purpose scheme আন্তর্জাতিক সংস্থা—International organisations.

৩০। বিশ্বব্যাঙ্ক কলকাতায় গঙ্গার উপর দ্বিতীয় সেতু নির্মাণে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা ঋণ দিতেও তাঁরা তৈরী। কিন্তু প্রকল্পটিকে অনুমোদন দিতে কেন্দ্রীয় সরকার কেবলই গড়িমসি করছেন।

সম্প্রতি বিশ্ব-ব্যাঙ্কের এক প্রতিনিধি দল কলকাতায় এসে এই সেতু সম্পর্কে সরেজমিনে বিস্তৃত অনুসন্ধান করে গিয়েছেন। তারপর এক পত্রে কেন্দ্রকে জানান হয়েছে যে, বিশ্বব্যাঙ্ক এই প্রকল্পের জন্য বিদেশী মুদ্রা ঋণ মঞ্জুর করতে পারেন। কবে নাগাদ তাঁদের কাছে নিয়ম-মাফিক দরখাস্ত পাঠান হবে?

রাজ্য সরকার প্রকল্পটিকে চতুর্থ যোজনার অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে তাঁদের স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেছেন। চতুর্থ যোজনায় যাতে কাজ সুরু করা যায় সেজন্যে তৃতীয় পরিকল্পনার অবশিষ্ট সময়ের মধ্যেই বিস্তৃত নক্সা, টেণ্ডার আহ্বানের প্রয়োজনীয়

নথিপত্র ঠিক করা দরকার। রাজ্য সরকার এই প্রাথমিক কাজগুলো সুরু করার জন্যে কেন্দ্রের অনুমোদন চেয়ে পাঠান।

বিশেষ সংকেত ঃ তাঁরা তৈরী—They are prepared. গড়িমসি করছেন—Is delaying. এক প্রতিনিধি দল—A team of delegates. সরেজমিন—On-the-Spot. নিয়ম মাফিক—As per rule. বিস্তৃত নক্সা—Detailed plan. টেণ্ডার আহ্বানের......নথিপত্র—Files essential for calling tenders. আগাম কাজগুলো ..... সুরু করার জন্যে—To start the preliminary works.

৩১. চতুর্থ যোজনাকালে পূর্বের মত কয়লা প্রকল্পের জন্য যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থান সম্ভবপর হইবে না বলিয়া সরকার ঐ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম এ দেশেই নির্মাণে উৎসাহ দানে ইচ্ছুক। ঐ সব যন্ত্রপাতির নক্সা তৈরী করা ও নির্মাণকার্যে সহায়তা করার জন্য সরকার বিশেষজ্ঞ সংস্থা গঠনের কথা চিন্তা করিতেছেন।

দেশে কয়লা খনি শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের চাহিদার অধিকাংশই দুর্গাপুর কয়লাখনি যন্ত্রপাতি কারখানা সরবরাহ করিবে। বাকীটুকুও যাহাতে এ দেশেই উৎপন্ন হয় সরকার তাহাই চাহেন।

বিশেষ সংকেত ঃ কয়লা প্রকল্পের জন্য—For the coal scheme. যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম—Machineries and, equipments নক্সা তৈরী করা—To prepare designs. নির্মাণকার্যে··· করার জন্য—To assist the production. বিশেষজ্ঞ সংস্থা—An organisation of experts. দুর্গাপুর কয়লাখনি যন্ত্রপাতি কারখানা—Durgapur factory for colliery machineries.

৩২. দেশের বাজারে চিনির চাহিদা থাকা সত্ত্বেও ভারত সরকার 'বহু কোটি টাকা ক্ষতি স্বীকার করে বিপুল পরিমাণ চিনি বিদেশের বাজারে রপ্তানি বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

চিনির উৎপাদন ও বিশ্বের বাজারে তার সরবরাহ বৃদ্ধি, চাহিদা হ্রাস এবং সম্প্রতি দর হঠাৎ পড়ে যাওয়ার ফলে ভারতের চিনি রপ্তানি ব্যবসায় এক মহাসঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে।

অভিজ্ঞ মহল মনে করেন, বিদেশী মুদ্রার সংকট যথাসম্ভব কাটিয়ে ওঠার আশাতেই ভারত সরকার ঐ ক্ষতি স্বীকারের সংকট বরণে পিছ্‌পা হননি। কারণ বিদেশী মুদ্রা অর্জন দেশোন্নয়ন পরিকল্পনার সাফল্যের জন্যে একান্ত প্রয়োজন।

বিশেষ সংকেত : দেশের বাজারে—Internal market. বহু কোটি টাকা ক্ষতি স্বীকার করে—At a loss of crores of rupees. চাহিদা হ্রাস—Fall in demand. সম্প্রতি দর হঠাৎ পড়ে যাওয়া—Abrupt decline in recent price. চিনি রপ্তানি ব্যবসায়—Sugar export trade. মহাসঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে—Is facing a great crisis. অভিজ্ঞ মহল—Experienced circle কাটিয়ে ওঠার আশাতেই—With the hope of getting over. সঙ্কট বরণে—To welcome the crisis পিছ্‌পা হননি—Did not fall back.

৩৩. সরকারের সংশোধন অনুযায়ী বোনাস কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যে পরিণত করার জন্য শীঘ্রই একটি অর্ডিনান্স জারী করা হতে পারে।

সরকার সংসদের গত অধিবেশনে বোনাস বিলটি উত্থাপন করবেন বলে ঠিক করেছিলেন। কিন্তু কর্মী ও মালিকপক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে মতৈক্যের অভাবে বিলটির চূড়ান্ত রূপ দেওয়া যায়নি। বিশেষ করে প্রদেয় বোনাসের পরিমাণ ও প্রচলিত সুবিধাগুলি সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেবার প্রশ্নে তাঁরা একমত হতে পারেননি। সরকারের প্রচলিত সুবিধাগুলি বন্ধ করে দেবার ইচ্ছা নেই। চলতি ভিত্তির অথবা নতুন সূত্রের ভিত্তির মধ্যে যেটা বেশী, শ্রমিকরা যাতে সে মতো বোনাস পান এই অর্ডিনান্সে তার ব্যবস্থা থাকবে।

বিশেষ সংকেত : একটি অর্ডিন্যান্স......হতে পারে—An ordinance may be issued. গত অধিবেশনে—In the last session. উত্থাপন করবেন বলে—To present. কর্মী ও মালিক পক্ষে......অভাব—For the want of consensus among the representatives of labourer and owner parties. প্রদেয়—Payable. প্রচলিত সুবিধাগুলি—Coventional benefits তাঁরা একমত হতে পারেননি—They could not come to an agreement of opinion. চলতি—Current. নতুন সূত্র—New formula তার ব্যবস্থা থাকবে—Provisions will be made.

৩৪. কিছু রদবদলসহ বোনাস কমিশনের সুপারিশসমূহ (কার্যকর করার উদ্দেশ্যে) রাষ্ট্রপতি আজ অর্ডিন্যান্স জারী করেছেন।

গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, প্রতি হিসাবনিকাশের বৎসরে বণ্টনযোগ্য উদ্বৃত্ত অর্থের শতকরা ৬০ ভাগ কর্মচারীদের বোনাস হিসাবে দিতে হবে। তবে বিদেশী কোম্পানির ক্ষেত্রে এর পরিমাণ হবে শতকরা ৬৭ ভাগ।

২০ জন বা তার চেয়ে বেশী কর্মচারী কাজ করে এমন সমস্ত কারখানা ও সংস্থাগুলিকে তাদের কর্মীদের ন্যূনতম বোনাস দেওয়ার বিধানও অর্ডিন্যান্সে রয়েছে।

সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত সমস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকেও তাদের কর্মচারীদের বোনাস দিতে হবে। তবে ঐ ধরনের যে সব প্রতিষ্ঠান বিভাগীয় দপ্তর দ্বারা পরিচালিত হয় এবং শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত বেসরকারী উদ্যোগের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তাদের কর্মচারীদের বোনাস দিতে হবে না। এই অর্ডিন্যান্সের আওতা থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, আমানত বীমা কর্পোরেশন, শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, কৃষি অর্থসংস্থান কর্পোরেশন, ইউনিট ট্রাস্ট, শিল্পীয় অর্থসংস্থান কর্পোরেশন ও রাজ্যের অর্থ কর্পোরেশনসমূহকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ সংকেত : কিছু রদবদল সহ—With some amendments. কার্যকর করার উদ্দেশ্যে—With a view to implementing. বিজ্ঞপ্তি—Notification. প্রতি হিসাবনিকাশের বৎসরে—In every accounts year. বণ্টনযোগ্য—Allocable. ন্যূনতম—Minimum. বিধান—Provision. সরকারী উদ্যোগে......প্রতিষ্ঠান সমূহ—Public undertakings. বেসরকারী উদ্যোগ—Private undertakings. আওতা—Juriediction. আমানত বীমা কর্পোরেশন—Deposit Insurance Corporation. কৃষি অর্থসংস্থান কর্পোরেশন—Agricultural Finance Corporation. বাদ দেওয়া হয়েছে—Have been exempted.

৩৫. স্বেচ্ছায় হিসাবের বাইরে কালো টাকার কথা ঘোষণা করার জন্যে কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তর যে সুযোগ দিয়েছিলেন, ৩১শে মে তারিখেই তার মেয়াদ শেষ হয়। এই একদিনেই পশ্চিমবঙ্গে পাঁচ কোটি ছাব্বিশ লক্ষ টাকার কথা স্বেচ্ছায় ঘোষিত হয়।

এ টাকা থেকে কেন্দ্রীয় রাজস্ব তহবিলে ১২ কোটি টাকা আয়কর হিসাবে জমা হবে। বাকি টাকাটা ঘোষণাকারীরা ফেরত পাবেন। গত তিন মাসে মোট ৪২৯ জন মাঝারি ও মোটামুটি বড ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকেরা এ কালো টাকার কথা কলকাতায় আয়কর বিভাগকে জানান এবং বিঘোষিত অর্থের অর্ধেক নগদে বা চেকে আয়কর বিভাগে অথবা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা দেন। বাকি অর্ধাংশ নভেম্বর মাসের মধ্যে জমা দিতে হবে। ঐ দিন রাত্রি ৮টা পর্যন্ত তিন মাসে ১লা মার্চ থেকে কলকাতায় মোট ২০ কোটি ২৬ লক্ষ গোপন টাকার কথা জানান হয়।

আয়কর বিভাগের একজন মুখপাত্র বলেন যে, কালো টাকার কথা যাঁরা জানিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে খুব বড ব্যবসায়ী কেউ নেই। অবশ্য এমন কয়েকজন ব্যবসায়ী আছেন যাঁরা [illegible] লক্ষেরও বেশী কালো টাকার কথা ঘোষণা করেছেন। যাঁরা এভাবে কালো

টাকার কথা জানিয়েছেন, আয়কর বিভাগ কিন্তু তাঁদের সকলেরই আয়কর নিরূপণ করেছিলেন। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, আয়কর কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁরা হিসাব গোপন রেখেছিলেন।

বিশেষ সংকেত: হিসাবের বাইরে কালো টাকা—Unaccounted black money. ঘোষণা করার জন্যে—To declare. মেয়াদ শেষ হয়—The term expired. ঘোষণাকারীরা—The Confessors. নিরূপণ করেছিলেন—Assessed.

৩৬. বৈষয়িক উন্নয়নের সময় দেশের আর্থিক ব্যবস্থার গঠনতান্ত্রিক পরিবর্তন হয়ে ওঠে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর্থিক অগ্রগতির জন্যে কেবল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ যথেষ্ট নয়। উন্নয়নের গতি বাড়িয়ে তুলতে হলে এবং তা বজায় রাখতে গেলে বড়ো রকমের গঠনতান্ত্রিক পরিবর্তন দরকার।

বৈষয়িক অগ্রগতির সময় দেখা গেছে, কৃষি ও খনির উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু কারখানা-শিল্প ও নির্মাণ-কার্য বেড়েছে এবং অর্থনৈতিক কাঠামো সংস্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবহণ, বাণিজ্য প্রভৃতি কাজ মোটামুটিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে কৃষি কারখানা-শিল্পের সঙ্গে সমানতালে অগ্রসর হতে না পেরে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। এখন কৃষির উন্নয়নের দিকে মন দিতে হবে। কৃষির গঠনতান্ত্রিক এবং উৎপাদনের প্রকরণগত পরিবর্তন সাধনের জন্যে খুব দেরী হয়ে গেছে। এখন অবস্থা এমন এক স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে যে, অবিলম্বে কৃষি উন্নয়নের দিকে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে না পারলে সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থা এক জটিল সংকটের সম্মুখীন হবে।

বিশেষ সংকেত: গঠনতান্ত্রিক পরিবর্তন—Constitutional changes. অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের সম্প্রসারণ—Extension of economic activities. উন্নয়নের গতি—Progress of development. কারখানা-শিল্প—Factory industries. নির্মাণ কার্য—Construction works. কাঠামো – Structure. উৎপাদনের প্রকরণগত পরিবর্তন—Technical changes of production. উৎসাহ-উদ্দীপনা—Impetus. জটিল সংকট—A bewildering crisis.

● ইংরেজি থেকে বাংলার জন্যে ●

১. The history of organised industry in India can be traced to 1854 when the real beginnings of the cotton mill industry were made in Bombay with predominantly Indian capital and enterprise. The foundations of jute industry were laid near Calcutta in 1855, mostly with foreign capital and enterprise. Coal-mining had also progressed around this time. These were the only major industries which had developed substantially before the first world war. During and after World Wars I and II, new conditions were created and somewhat more liberal policies adopted by the authorities, such as the discriminating protection policy introduced in 1922, which gave impetus to industrial development. Several industries rapidly expanded and a number of new industries came up, such as steel, sugar, cement, some engineering, glass, industrial chemicals, soap, vanaspati, and so on. But their production was neither adequate in quantity for meeting even the low level of internal demand nor diversified in character.

বিশেষ সংকেত : Organised industry—সংগঠিত শিল্প। Predominantly—প্রধানতঃ। Enterprise—উদ্যোগ। Substantially—বাস্তবিকই। Liberal Policies—উদার নীতিসমূহ। Discriminating protection—বিভেদাত্মক সংরক্ষণ। Impetus—প্রেরণা। Diversified—বৈচিত্র্যমণ্ডিত।

২. The decline in agricultural production and the consequent scarcity of supplies of consumables had begun to exert upward pressure on prices during the early months of 1963. The tendency continued throughout the year: even normal seasonal tendency for wholesale prices in general to decline over the second half of the fiscal year was not in evidence. The rise in the price level has thus been a matter of major concern.

The Government sought to meet the situation by limiting the scale of deficit financing and avoiding large increases in indirect taxation, in the 1963-64 budget, on domestically produced items of mass consumption. The compulsory deposit scheme was withdrawn from September 1963 in the case of non-income tax payers. Pensions were increased and the terms of Family Pension Scheme for Government employees were liberalised in addition to compensation for rise in the cost of living. Apart from these, larger imports of

rice were arranged, and larger quantities of rice and wheat were released from central stocks to scarcity-affected states, and the number of fair price shops was increased.

বিশেষ সংকেত : Decline—হ্রাস। Consumables—ভোগ্যপণ্যসমূহ। Tendency—প্রবণতা। Normal seasonal—স্বাভাবিক মরশুমী। Fiscal year—আর্থিক বৎসর। In evidence—প্রত্যক্ষ। A matter of major concern—বিশেষ উদ্বেগের বিষয়। Domestically produced items—স্বদেশে উৎপন্ন পণ্যসমূহ। Of mass consumption—বহুল ভোগ্য। Compulsory Deposit Scheme—অবশ্য সঞ্চয় প্রকল্প। Pensions—অবসর-বৃত্তি, উত্তর-বেতন। Fair price shops—ন্যায্য মূল্যের বিপণিসমূহ।

৩. Some of the multi-purpose schemes completed or under construction include inland navigation as one of the objectives. The recently completed 85-mile long left bank main canal of the Damodar Valley project, from Durgapur to Tribeni, has been designed as irrigation-cum-navigation canal. It links the lower Raniganj coalfields with Calcutta via the Hoogly. Its utilisation for transport of coal is being considered. The condition of the Mahanadi river from Dholpur to Cuttack has been considerably improved as a result of regular discharges from Hirakud dam reservoir. Recent surveys reveal that it may be possible to introduce navigation of this river by shallow-draft power crafts with proper conservancy works. The left bank low level canal of the Tungabhadra project on the Mysore side is also designed to serve the needs of navigation.

বিশেষ সংকেত : Multi-purpose schemes—বহুমুখী প্রকল্পসমূহ। Under construction—নির্মীয়মাণ। Inland navigation—অন্তর্দেশীয় নৌপরিবহণ। Irrigation-cum-navigation—সেচ ও নৌপরিবহণ। Coalfields—কয়লা-খনি অঞ্চলসমূহ। Regular discharges—নিয়মিত জল-নিক্ষেপ। Reservoir—জলাধার। Shallow-draft power crafts—অগভীর জলে চলাচলের উপযোগী শক্তি-চালিত নৌকা সমূহ। Conservancy works—নদী সম্পর্কে সরকারী তত্ত্বাবধান।

৪. In formulating the import policy for April 1963—March 1964, the Government were guided by the prevailing foreign exchange position and the priorities called for by the Emergency,

so as to serve the needs of both defence and industrial development. Accordingly, import of a number of low priority items and of items where indigenous production has increased, was reduced. A committee set up in the Planning Commission on import and export substitution has been assigned the task of keeping a watch on continuous reduction or deletion of imports of the goods which are indigenously produced or which could be substituted by indigenously available materials. Raw materials needed for production of less essential or non-essential items were banned or allowed on a restrictive scale.

বিশেষ সংকেত : In formulating—রচনায়। The priorities............ Emergency—জরুরী অবস্থার প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার। Low priority items—স্বল্প অগ্রাধিকারযুক্ত পণ্যসমূহ। Substitution—প্রতিকল্প। Deletion—একেবারে বন্ধ করে দেওয়া। On a restrictive scale— সীমিত পরিমাণে।

৫. In a democratic country food production and distribution is a major topic in political campaigns. It is unfortunate that such a vital thing should be a topic of controversy, thus preventing an united humanistic stand in the face of calamities, which in a monsoon country are bound to recur at short intervals.

The most regrettable thing is inter-State non-cooperation which by mid-1964 reached its high watermark. Fearing local shortages and in face of wild allegations from opposition legislators many States from which West Bengal, for instance, normally gets her supply of rice, dal, fish etc. refused to supply essential things at the critical hour. As the wholesale trade is expected, unavoidably, to be increasingly taken over by the State Government or the newborn Foodgrains Trading Corporation, inter-State understanding and administrative ability of anticipation must be developed along scientific lines.

A very large portion of the wholesale trade will certainly remain on the hands of our morally bankrupt traders. No Government will ever be able to punish them sufficiently in spite of open violation of Government orders, because just before elections all political parties have to go to them with begging bowls.

বিশেষ সংকেত : In political campaigns—রাজনৈতিক প্রচার অভিযানে। A topic of controversy—বিতর্কের বিষয়। United humanistic stand—

মানবতাপূর্ণ সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ। The most regrettable thing—সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয়। Inter-State non-cooperation—আন্তঃরাজ্য অসহযোগিতা। High watermark—সর্বোচ্চ জলাঙ্ক বা জল-রেখা। Wild allegation—তীব্র দোষারোপ। Opposition legislators—আইন সভার বিরোধী সদস্যগণ। Foodgrains Trading Corporation—রাষ্ট্রীয় খাদ্যশস্য কর্পোরেশন। Understanding—সমঝোতা। Anticipation—পূর্বানুমান। Scientific lines—বৈজ্ঞানিক ধারা। Morally bankrupt—নৈতিক ক্ষেত্রে দেউলে। Open violation—প্রকাশ্যভাবে অমান্য করা। Begging bowls—ভিক্ষাপাত্র।

৬. While there is acute foreign exchange shortage, the Union Food Ministry is going to pay about Rs. 25,000 in foreign currency to the U. S. Government because an American food ship was detained at Calcutta port for three days beyond the scheduled time for unloading. The Food Department failed to unload the wheat from the ship in time. The demurrage charge a day is $. 1,400.

In a letter to the Union Food Directorate the local agent of the ship is reported to have stated that despite repeated requests the stevedor failed to take prompt steps to unload the ship within the scheduled time.

The agent also stated that a few other food ships were due in Calcutta very soon and asked the Food Department to see that those ships were unloaded in time.

বিশেষ সংকেত : In foreign currency—বৈদেশিক মুদ্রায়। Beyond the scheduled time for unloading—মাল খালাসের নির্দিষ্ট সময়ের পরে। Demurrage charge—বিলম্ব শুল্ক। Stevedor—পণ্যাবতারক।

৭. Disagreeing with those who predict a slowdown in the United States economy late this year or early next, most Wall Street firms, judging by their recent activity in the market see no end yet to the long boom.

Though some leading dealers express anxiety, most expect the recent peak in New York Stock Exchange prices to be repeated over the next six months—and perhaps even on into the later part of 1966.

When the Dow Jones index of industrial shares hit a new all-time height of 938'87 on May 13, several analysts on the Street

predicted it would reach 1,000 before the end of this year. Other forecasts, though less assured, speak of a possible further climb after that of up to 70 points in 1966.

Most of the analysts emphasise that the present tone of the market is not that of a recklessly soaring boom. They see the rise —just over 8 per cent since the start of the year—one of steady expansion on continually increasing business activity, virtually shrugging off the normally deterrent effect of an adverse situation overseas.

বিশেষ সংকেত :—Disagreeing—একমত না হয়ে। Slowdown—ক্রমাবনতি। Boom—তেজী বাজার। Leading dealers—শীর্ষ স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ। Peak—সর্বোচ্চ বৃদ্ধি। All-time height—সর্বকালিক উচ্চতা। Analysts—বিশ্লেষকগণ। Tone—মর্জি। Recklessly soaring boom—বেপরোয়াভাবে ঊর্ধ্বমুখী চড়া বাজার। Steady expansion—সুস্থির সম্প্রসারণ। Continually......activity—ক্রমবর্ধমান ব্যবসায়িক কার্যকারিতা। Shrugging off—কাটিয়ে ওঠা। Deterrent—প্রতিবন্ধক ফল। Overseas—সাগরপারের।

৮. The West Bengal Government in a Press Note refers to reports in the Press saying that the State Government was thinking of banning outsiders from holding office in trade unions. The State Government's Labour Department, says the Press Note, has no proposals whatever regarding the banning of outsiders on executive committees of trade unions. In this connection, it points out that the State Government is guided by decisions taken by the Union Government on the recommendations of the Indian Labour Conference.

The State Government is, however, examining the questions of allowing Government employees, who are governed by the Government Servants' Conduct Rules, to have outsiders as office-bearers in their trade unions.

বিশেষ সংকেত : Press note—প্রেস নোট, সরকারী বিজ্ঞপ্তি। Banning—নিষিদ্ধ করে। Outsiders—বহিরাগতগণ। Indian Labour Conference—ভারতীয় শ্রমিক সম্মেলন। Government Servants' Conduct Rules—সরকারী কর্মচারীদের আচরণবিধি। Office-bearers—কার্য-নির্বাহকগণ।

৯. The union Minister for Steel, Mr. Sanjeeva Reddy, thinks that the controversy over the location of the fifth steel plant in the

public sector will end by the middle of June by which time the Anglo-American consortium will have submitted its report on the selection of the site.

A technical team of the consortium is now studying the feasibility of reports in respect of five likely sites in the Visakhapatnam-Bailadilla and the Goa-Hospet areas. This study was undertaken following an agreement between the Union Government and the consortium in the last week of January.

Mr. Reddy said in Calcutta on Friday that the consortium was expected to take, from the date of submission of its recommendations in regard to the selection of the site, nine months to prepare the detailed project report and a financial plan. This would be followed by submission of price quotations by the consortium for the machinery and equipment necessary for the plant. Before accepting these quotations, the Steel Ministry would check them with other manufacturers and suppliers.

The steel works is expected to have an initial capacity of about 1·5 million tonnes, depending on the product pattern. It will have provision for expansion to produce 4 million tonnes ultimately.

Meanwhile, Russia has agreed to associate Indian engineers with the preparation of the project report for the fourth steel plant in the public sector at Bokaro. Some Indian technicians have already joined Russians in the preparation of the report which is now expected at the end of this year.

বিশেষ সংকেত : Controversy—বিতর্ক। Location—স্থান-নির্বাচন। Public sector—সরকারী ক্ষেত্র। Anglo-American Consortium—ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠী। Technical team—কারিগর দল। Feasibility—সম্ভাব্যতা। Following an agreement—চুক্তি অনুসারে। Quotations—মূল্য-জ্ঞাপন। Initial capacity—প্রারম্ভিক উৎপাদন-ক্ষমতা। Provision—ব্যবস্থা। Technicians—যন্ত্রবিদ্গণ।

১০. The Haldia refinery had been planned to be established by the middle of 1968, said the annual report of the Ministry of Petroleum and Chemicals, report U. N. I. and P. T. I.

The report which was released today said, offers of collaboration had been invited for the refinery.

The commissioning of the first stage of the Barauni refinery in Bihar, the discovery of large crude oil reserves in Assam and trial production of crude oil in Kalol in Gujarat were among the important developments in the sphere of petroleum industry during the past year.

India's securing of exploration rights in the off-shore area of Iran and the conclusion of the agreement with Iranian oil combine to build the Madras refinery would improve the availability of crude for Indian refineries.

A significant achievement of the year under review was the laying of groundwork for extensive development of the petroleum industry in the public sector.

বিশেষ সংকেত : Refinery—শোধনাগার। Was released—প্রকাশিত হয়েছে। Collaboration—সহযোগিতা। Commissioning—কার্যভার অর্পণ। Securing of......rights—আবিষ্কার-যাত্রার অধিকার লাভ। Conclusion of the agreement - চুক্তি সম্পাদন। Uuder review—সমীক্ষ্য। Groundwork—ভিত্তি।

১১. The Sindri fertiliser factory has been suffering a daily loss of Rs. 15,000 since 1959 because of delay in allocation of foreign exchange for additional machinery worth Rs. 20 lakhs.

The foreign exchange was released only last July, though the actual order had been placed in September and an expert committee had recommended the installation of such machinery as far back as 1961. The additional equipment is now expected to be commissioned in the second quarter of 1966.

Meanwhile, the loss of production due to non-availability of sufficient coke oven gas and lack of equipment amounted to approximately 1,27,000 tonnes of ammonia, worth about Rs. 10 crores till March, 1964.

বিশেষ সংকেত : Delay in allocation—বণ্টনে বিলম্ব। Installation—স্থাপনা। As far back as—বিগত। Equipment—সরঞ্জাম। Is expected to be commissioned—নিয়োগ করা হবে বলে আশা করা যায়। Second quarter—দ্বিতীয় চতুর্থাংশ। Non-availability—অপ্রাপ্যতা। Coke oven gas—পোড়া-কয়লা চুল্লীজাত গ্যাস।

১২. The Kosi project is designed to stabilize the course of the Kosi river and thereby make available thousands of acres of arable land to thousands of residents on both sides of the India-Nepal border. The project is near the border.

The river Kosi originates in the high altitude of the Himalayas in Tibet at a height of nearly 18,000 feet, passes to the territory of Nepal and joins the Ganga in the plains of India. Known as Bihar's "River of Sorrow", the Kosi has been continuously changing its course and in the process causing immense damage to people and property. A major river valley undertaking, the Kosi project seeks to tame the river and make it flow through a controlled channel.

বিশেষ সংকেত :—The Kosi project—কুশী পরিকল্পনা। Stabilize—স্থায়িত্ব দান করা। Course—গতিপথ, ধারা। Arable—কর্ষণযোগ্য। Altitude—উন্নতি। Territory—রাজ্য। Immense damage—প্রভূত ক্ষতি। Controlled channel—নিয়ন্ত্রিত খালপথ।

১৩. It must be remembered however that finance is not the only problem so far as big irrigation projects are concerned. More than Rs. 400 crores could not be spent during the Second Plan and projects formulated under it had to be held over for inability to implement them. What is more tragic is that a substantial part of the irrigation potential created under the Plans is going unutilized. It is estimated that some 3 to 4 million acres of land could be irrigated by this unused potential. So in spite of so much expenditure on irrigation during the past decade and a half the area irrigated is hardly 14 to 15 per cent of the total area under cultivation.

While allocating funds the Central Government should take steps to ensure that these are properly utilized, and the projects aided are implemented in time. Machinery should be set up to supervise the execution of the special 'aided' irrigation projects in different States Steps must also be taken beforehand to construct field channels and courses so that irrigation water may find its way to distant villages. Proper drainage should also be ensured to prevent water logging. The Union Minister of Irrigation and Power has stressed in a note that the big projects if completed within the

optimum period, will result in a significant increase in foodgrains. Greater care should be taken to execute them within the scheduled time.

বিশেষ সংকেত :—So far..... concerned—বৃহৎ সেচ-প্রকল্পের ব্যাপারে। Projects .....under it—এতে রচিত প্রকল্পগুলি। To implement—রূপায়িত করতে। More tragic—আরো বিয়োগান্ত। A substantial .... potential—জলসেচ ক্ষমতার উল্লেখযোগ্য অংশ। While allocating funds—অর্থবণ্টন কালে। The projects aided—সাহায্যকৃত প্রকল্পগুলি। Field channels—ক্ষেত্র খাল। Courses—গতিপথসমূহ। Drainage—জল নিষ্কাশন। Water logging—জলমগ্নতা। Optimum—বাঞ্ছিত। Scheduled time—নির্ধারিত সময়।

১৪. An increasingly crucial element in the developing country's efforts to increase exports earnings is their production of semi-manufactures and manufactures and the need for these products to have reasonable access to world markets.

A number of developing countries is in a position to produce semi-manufactures domestically from their own materials and is being increasingly encouraged to do so through public and private investment and so on. This is an obvious step forward as the diversification of the economies of these countries proceeds. Such processing, however, has traditionally been largely undertaken in industrialised countries. While the tariffs of these countries have been liberal as regards raw materials, this has been less so in the case of products which have undergone processing; even where the tariff on these products is low, this can still represent a significant barrier. Here too, however, the problem is not a simple one, since the existing tariff protection in industrialised countries is directed mainly against imports from other industrialised countries.

বিশেষ সংকেত : Increasingly crucial element—ক্রমবর্ধমান সংকটময় উপসর্গ। Developing country—উন্নয়নশীল দেশ। Semi-manufactures—অর্ধোৎপাদিত পণ্যসমূহ। Access—প্রবেশ। Domestically—ঘরোয়া ভাবে। Obvious step—সুস্পষ্ট পদক্ষেপ। Diversification—বৈচিত্র্যায়ণ। Processing—আকারণ। Traditionally—গতানুগতিকভাবে। Tariffs—শুল্কসমূহ। Liberal—উদার। Which have ... ...processing—যারা আকারণ প্রাপ্ত হয়েছে। Barrier—প্রতিবন্ধক।

১৫ Over 400 MW of power will be generated from eight to ten stations that are proposed to be built in the Umiam-Umtru system in the next decade.

When completed the system will make the most intensive use of hydel resources anywhere in India ; because this bulk generation will be secured from the tapping of small rivers whose aggregate catchment area will be less than 600 sq. miles. Since the annual rainfall is less than 100 inches, the ratio of power generation to the total precipitation will be 7 KW. per inch of rain.

This high rate of generation will be possible only through using the same water over and over again for power generation by placing power houses in a step like arrangement at different altitudes between Umtru about 1,000 ft. above sea level and Umiam, about 5,000 ft. above sea level, and creating through tunnels a line of flow through the power houses cutting across the natural drainage. The artificial line of flow will cross four streams and pick water from all of them.

বিশেষ সংকেত : Over 400 MW—চারশো মেগা ওয়াটেরও বেশী। Will be generated—উৎপন্ন হবে। In the next decade - পরবর্তী দশকে। Hydel resources – জলবিদ্যুৎ সম্পদসমূহ। Bulk generation—প্রচুর বা বহুল উৎপাদন। Aggregate catchment area—মোট ধারণ-ক্ষেত্র। Precipitation—ধারা-পতন। Altitudes—উন্নতি। Cutting across—আড়াআড়ি ভাবে ভেদ করে। Pick—সংগ্রহ করা।

১৬. The vast network of co-operative marketing societies in the country is being galvanised to assist the Food Corporation of India in procuring foodgrains and building up buffer stocks at the Central and State levels.

Until June 1964, co-operatives had marketed agricultural produce worth Rs. 225 crores, representing an increase of Rs 63 crores over the previous year. Cash crops like sugar, arecanut etc. accounted for Rs. 185 crores, while foodgrains accounted for the remaining Rs. 40 crores. Various steps were taken last year to promote marketing in foodgrains. The outright purchase scheme has been taken up in over 200 primary marketing societies and it is expected that co-operatives will market foodgrains worth Rs. 85 crores in 1964-65.

The State Governments have also taken numerous steps to enable co-operatives to play an increasingly important role in the marketing of foodgrains.

Since the Second Five Year Plan, nearly 2,300 primary marketing societies have been organised. 125 new primary marketing societies are proposed to be established during 1965-66 to step up the programme. It is expected that by the end of the Third Plan all important secondary markets will be covered by marketing societies. Apart from these societies there are over 500 specialised commodity societies dealing in cotton, arecanut, tobacco, cocoanut, vegetables etc.

বিশেষ সংকেত : Network—জাল। Is being galvanised—অতিরিক্ত শক্তি সংযোজিত হচ্ছে। Buffer stocks—মধ্যবর্তী মজুত-ভাণ্ডার। Cash crops—বাণিজ্য শস্য। Arecanut—সুপারী। To promote—বৃদ্ধি করা। Outright—সরাসরি। To step up—সম্প্রসারিত করতে। Secondary—অপ্রধান।

১৭. For the second year in succession world rice production will probably be larger this year than the previous one, according to the latest estimates of the Food and Agriculture Organisation.

Excluding People's China, North Korea and North Vietnam, world's output of rice is expected to reach 165 million tons in 1964-65, an increase of 2 million tons compared with 1963-64, which in turn had registered a rise of 11 million tons over the preceding season.

The F.A.O. experts point out that demand was so brisk last year that there are practically no substantial stocks left with producers to-day. World exports of rice in 1964 were slightly higher than during the previous record year, when they totalled 68 million.

বিশেষ সংকেত : In succession—পর পর। In turn—পর পর বা পর্যায়-ক্রমে। Had registered—লিপিবদ্ধ করেছে। Preceding season—পূর্ববর্তী মরশুম। Brisk—তেজী বা গরম। Substantial stocks—পর্যাপ্ত মজুত। Record year—রেকর্ড-বর্ষ।

১৮. The twelfth meeting of the Aid India Consortium under the auspices of the World Bank will be held in Washington to-day to

consider the foreign exchange help to India for the fifth year of her Third Five Year Plan, reports PTI.

Members of the club had met last month in Paris where they heard the Indian request for nearly $1,250 million by way of aid. It is expected that India will probably get as much as last year's amount $1,028 million. However, it is believed, there have been one or two last minute hitches that have arisen.

India has so far obtained for four years of the Third Plan about $4,445 million from the club.

As in last year, it is believed a substantial portion of the aid will be in the form of untied credits that could be used by India for importing goods in general rather than those tied to particular projects.

বিশেষ সংকেত : Aid India Consortium—ভারত সাহায্য-দান গোষ্ঠী। Under the auspices of—উদ্যোগে। Last-minute hitches—শেষ মুহূর্তের বাধা। Untied credit—নিঃসর্ত ঋণ। Tied to particular projects—নির্দিষ্ট প্রকল্পগুলির সহিত সম্পর্কিত সর্ত-সাপেক্ষে।

১৯. To be sure, no one would tolerate the prevalence of anti-social elements in society. But it would seem that certain spokesmen of the Government are currently making much unnecessary ado about it—only to irritate the business community further. It is well-known that in the post-war period anti-social elements have grown to a degree unprecedented in history. These elements prevail not merely in the private sector but also in the public sector. So if one is to take a non-partisan view of it, then one is naturally prompted to ask: what effective measures the Government has taken to eradicate the evil from the public sector? Indeed if the Government cannot eradicate the evil from the sphere over which it has direct control, how can it possibly hope to eradicate it from the private sector by mere cajoling appeal to "the better section of the businessmen and their organization". It will merely irritate the better section of the businessmen who are already annoyed with other things. The appeal may be an apposite one, but it loses its moral overtone when one considers that the Government itself is unable to clean its own Augean stable.

বিশেষ সংকেত : To be sure—ধরে নেওয়া যাক, নিশ্চয়ই। Prevalence—সর্বব্যাপিতা। Spokesmen—মুখপাত্রগণ। Ado—হৈ-চৈ। Irritate—বিরক্ত করা। In the post-war period—যুদ্ধোত্তরকালীন। Unprecedented—নজীরবিহীন, অভূতপূর্ব। Non-partisan—নিরপেক্ষ। Is prompted—উৎসাহিত হয়। To eradicate—মূলোৎপাটন করা। Cajoling appeal—তোষামোদী আবেদন। Apposite—উপযুক্ত। Moral overtone—নৈতিক গৌরব। To clean...... stable—তার নিজের বহুকালের রাশীকৃত ময়লা সাফ করতে।

২০. The money intended for research has been invested by the Indian Council for Agricultural Research in securities, over a number of years, according to the findings of the Public Accounts Committee, report PTI and UNI.

The latest report of the Committee was presented to the Lok Sabha by its Chairman, Mr. R. R. Morarka to-day.

The committee said it was a matter of concern that the Ministry of Food and Agriculture continued to give grants to the Indian Council for Agricultural Research year after year, without considering the financial position of the Council or even properly scrutinising the schemes, with the result that the Council did not spend the money for the purpose for which it was allotted but went on investing it in securities.

The Committee regretted that the estimates of expenditure on research schemes were not framed realistically by the Council.

বিশেষ সংকেত : Indian Council for Agricultural Research—ভারতীয় কৃষি-গবেষণা পর্ষদ। Securities—ঋণপত্রসমূহ। Findings—অভিমত, সিদ্ধান্ত (রায়)। Latest report—সবশেষ প্রতিবেদন। Matter of concern—উদ্বেগের বিষয়। Scrutinising—সম্যক্‌ভাবে পরীক্ষা করে। Was allotted—বণ্টিত হয়েছিল। Were not framed realistically—বস্তুনিষ্ঠভাবে রচিত হয়নি।

২১. The opening of the new bridge over the Teesta two miles upstream from the town of Jalpaiguri is of significance from the point of view of defence of this border region as well as its economic uplift. The necessity of direct road links between the split parts of the district separated by the Teesta was felt long before partition of the country. But for some reason or the other

in certain quarters isolation of the tea-growing areas in the Dooars from the rest of the district was deemed desirable. The realization is growing now that the development of the potentialities of the area cannot be achieved with the old outlook. There must be greater and more frequent traffic between the district headquarters and the outlying areas.

বিশেষ সংকেত : The opening—উদ্বোধন। Upstream—উজানে। Uplift—উন্নয়ন। Direct road links—সরাসরি সড়ক-যোগাযোগ। Split parts—বিচ্ছিন্ন অংশগুলি। In certain quarters—কোন কোন মহলে। Isolation—বিচ্ছিন্নতা। Was deemed desirable—কাম্য মনে করা হয়েছিল। Potentialities—সম্ভাবনাসমূহ। Traffic—যাতায়াত। Headquarters—সদর। Outlying—দূরবর্তী।

২২. The members of Anglo-American consortium for the fifth steel plant have almost completed their tour of five possible sites, reports INFA. They are expected to submit their report by the end of May. The consortium is expected to recommend two alternative sites and make detailed proposals for Indian engineering participation. A final decision on site rests with the Government of India. The five sites inspected by the consortium are Visakhapatnam, Bailadila, Goa, Hospet and Salem.

A reference to the fifth plant was made at a meeting yesterday of the Parliament's Informal Consultative Committee on Steel and Mines. Under the agreement signed between the Government of India and the consortium—which includes four U. S. firms and three from U. K.—will make a three-stage proposal to the Government. In the first stage the consortium will recommend a site and make proposals for Indian engineering participation, in the second stage it is expected to furnish a detailed prospectus and plans. The third stage will primarily deal with the construction of the plant. The plant is expected to have an initial capacity of about 1·5 million tonnes with expansion up to about four million tonnes.

বিশেষ সংকেত : Anglo-American Consortium—ইঙ্গ-মার্কিন সংঘ। Alternative—বিকল্প। Participation—অংশগ্রহণ, যোগদান। Reference—প্রসঙ্গ। Informal consultative.........and Mines—ইস্পাত ও খনি[illegible]পর্কে

সংসদের বেসরকারী উপদেষ্টা কমিটি। Three-stage—ত্রি-পার্বিক। Prospectus—অনুষ্ঠানপত্র। Initial capacity—প্রারম্ভিক ক্ষমতা।

২৩. It must be conceded that the Finance Minister has taken a very pragmatic approach to the problem of unaccounted money by making provision in the Finance Bill, 1965 for enabling voluntary disclosure of unaccounted money. The disclosure scheme has come at a time when due to intensive raids and searches carried out by the Income Tax department, there is a psychological fear and apprehension in the minds of tax-evaders regarding being caught and prosecuted. It must be, however, admitted that searches and raids can only unearth a part of the unrecorded gains as the scare created by the raids has already put the people on guard and not much can be expected as a result of raids and searches. But the coercion and fear that the undisclosed income will not be allowed to be enjoyed with impunity will induce people to come forward and disclose their unaccounted money voluntarily. The Finance Minister has made it clear that those who do not come forward to declare unaccounted money will be liable to severe penalties and prosecution, if they are later on discovered in possession of unaccounted money. This should work as a sufficient deterrent that leniency will not be shown after the expiry of the prescribed period of disclosure. The scheme offers an opportunity to those who wish to turn a new leaf. The question, however, arises whether the scheme as announced by the Finance Minister will prove successful in bringing out a sizeable amount of unaccounted money which is believed to exist.

বিশেষ সংকেত :—It........conceded - সত্য বলে স্বীকার করতে হবে। Pragmatic approach—প্রায়োগিক পদ্ধতি। Unaccounted money—হিসাব-বহির্ভূত অর্থ। Disclosure scheme—প্রকাশ প্রকল্প। Intensive.. ......searches—গভীর হানা ও অনুসন্ধান। Apprehension—আশঙ্কা। Tax-evaders—কর ফাঁকিদাতারা। Prosecuted—অভিযুক্ত। Unearth—আবিষ্কার করা। Unrecorded gains—অনথিভুক্ত মুনাফা। Scare—আতঙ্ক, তাড়া। Put the people on guard—লোকদের সাবধান করে দিয়েছে। Coercion—বল প্রয়োগ। With impunity—মুক্ত অবস্থায়, স্বচ্ছন্দ্যে। Deterrent—নিবর্তক। Leniency—শৈথিল্য। Sizeable—বিশাল।

২৪. The problem of agriculture in India is complex. Many factors technical, administrative and social are involved. But none is so important as the human motivation, which has suffered most since ages. Our planning has done precious little to change the conditions. Most plan programmes are mere extensions of the schemes started during the British Rule. And the new names under which they operate have rather misdirected human motivations by raising unwarranted expectations. There appears to be belief among the policy-makers that by changing the names of schemes great originality can be established.

The unsatisfactory administrative and organisational procedures and the unsuitable functionaries (lacking a missionary zeal and training), in the field, is one of the important factors responsible for inadequate progress in the sphere of agricultural production.

বিশেষ সংকেত :—Complex—জটিল। Technical—কারিগরী। Administrative—প্রশাসনিক। Motivation—প্রেরণা। Misdirected—ভ্রান্তপথে চালিত করেছে। Unwarranted—অনিশ্চিত। Policy-makers—নীতি-রচয়িতাগণ। Great originality—বিরাট মৌলিকত্ব। Procedures—কার্য-প্রক্রিয়া। Unsuitable functionaries—অনুপযুক্ত কৃত্যক বা কর্মচারীগণ। Lacking .....and training—আদর্শনিষ্ঠ উৎসাহ ও প্রশিক্ষণহীন।

২৫. The Committee of Public Undertakings has called for an immediate downward revision of life insurance premium rates since the mortality rate has gone down. It feels that the premium rates, fixed in 1956, are on the high side and, therefore, has suggested that a committee of experts should be appointed to review the rates. The committee is to consist of Controller of Insurance, representatives of the Life Insurance Corporation and independent actuaries. Another suggestion is that the present zones of L.I.C. should be constituted into completely independent corporations, if the standard of efficiency is to be improved.

Since such a major reorganisation would involve the amendment of the statute and may take some time, the committee suggested that the present zones, in the meanwhile, should be made fully autonomous by setting up separate boards of management and making each Zonal Manager the Chief Executive Officer of his Zone.

বিশেষ সংকেত :—Undertakings—উদ্যোগ। Has called for—তলব করেছেন। Downward revision—নিম্নমুখী সংশোধন। Premium—চাঁদা। Mortality rate - মৃত্যু-হার। Controller নিয়ন্ত্রক ; নিয়ামক। Actuaries—বীমা গাণিতিকগণ। Autonomous—স্ব-শাসিত। Boards—পর্ষদসমূহ। Zonal Manager—আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক। Chief Executive Officer—মুখ্য নির্বাহক।

২৬. It is understood that numerons amendments are likely to be made in the Finance Bill of the year. Though most of these amendments are meant for simplification of the tax-structure, yet real relief also comes to the tax-payer under several heads. In the first place in regard to the industries eligible for additional rebate on tax as named in part III of the First Schedule the same has now been extended to include motor trucks and buses, agricultural implements, soda ash. pesticides, automobile ancillaries, seamless tubes, gears, bull roller, and tapered bearings, and cotton seed oil.

বিশেষ সংকেত : Finance Bill—অর্থবিল। Tax structure—কর-কাঠামো। Real relief—যথার্থ লাঘব। Tax-payer—করদাতা। Several heads—কতকগুলি বিষয়ে। Additional rebate—অতিরিক্ত ছাড়। Soda ash—ক্ষার ভস্ম। Pesticides—শস্যরোগের ঔষধ। Automobile ancillaries—মোটর গাড়ির যন্ত্রপাতি। Seamless tubes জোড়বিহীন একটানা নল। Tapered—ছুঁচোলো।

২৭. The opening of the broad gauge rail on Sunday from Raninagar in West Bengal to Jogighopa in Assam is an important landmark in the development of communications in the north-eastern part of India. This line of 162 miles connects the district of New Jalpaiguri with Bongaigaon in Assam and goes further off to Jogighopa on the bank of the Brahmaputra. After partition the Government of India hurriedly set up the Assam Railway link. But it had many draw-backs. It was also inadequate for the growing transport needs. This made the establishment of an alternative railway route to Assam an imperative necessity. The last Chinese aggression added a new urgency to the question.

বিশেষ সংকেত : Landmark—স্মরণীয় ঘটনা। For the growing...... need—পরিবহণের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের পক্ষে। The establishment......route

—বিকল্প রেলপথ স্থাপন। An imperative necessity—জরুরী প্রয়োজন। Urgency—জরুরী প্রয়োজনীয়তা।

২৮. The West Bengal Cabinet decided at its to-day's meeting here to rush rice to deficit areas in the interior of North Bengal without delay. The Cabinet discussed the general food situation in North Bengal. It will take up further consideration of the State's food problem on May 24.

A spokesman of the State Government said that a sifting inquiry would be made to find out why prices were not coming down in areas where rice had already been despatched.

According to reports, rice prices are still high in certain pockets of Jalpaiguri and Cooch Behar districts.

বিশেষ সংকেত : To rush—দ্রুত প্রেরণ করতে। In the interior of—অভ্যন্তরে। Spokesman—মুখপাত্র। Food situation—খাদ্য-পরিস্থিতি। Shifting inquiry—তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা। Pockets—অঞ্চল।

২৯. The suggestions made by the Reserve Bank recently regarding advances to industry during the slack season May to October, 1965, if acted upon by the scheduled banks, will have serious repercussions on productive activity. This is the view taken by the Committee of the Indian Chamber of Commerce, Calcutta, in a communication to the Government of India.

The Reserve Bank is reported to have suggested that during the slack season the scheduled banks should invest Rs. 200 crores in fixed interest bearing short-term Treasury Bills. It has been further proposed to break up the overall credit limit to industry into sub-limits in respect of raw materials, finished goods and so on, and that banks should avoid excesses under any one of these heads.

The Chamber feels that drastic reduction and curtailment of credit for productive purposes will restrict production and lead to further rise in prices. It will not be practicable for industry to compartmentalise the loan amounts in the manner suggested or to reduce inventories, it says.

বিশেষ সংকেত : Suggestions—প্রস্তাবগুলি। Advances—দাদনসমূহ। Slack season—শিথিল মরশুম। If acted upon—যদি কার্যে পরিণত করা হয়।

Indian Chamber of Commerce—ভারতীয় বণিক সংঘ। Communication—পত্রালাপ। In fixed interest......Treasury Bills—নির্দিষ্ট সুদে স্বল্প-মেয়াদী সরকারী হুণ্ডিতে। Overall—সর্বসমেত। Credit limit—ঋণ-সীমা। Sub-limit—নিম্নসীমা। Drastic—প্রচণ্ড। Curtailment of credit—ঋণ-সংকোচ। Practicable—সহজ। Compartmentalise—গণ্ডীবদ্ধ করা। Inventories—তালিকা সমূহ।

৩০. Prices of hardware have considerably gone up within the last few months. While businessmen complain of Government duties, others attribute the price-rise to 'large-scale' hoarding.

Whatever be the reason, Calcutta retailers seem to be having a good time. Old stocks bought at cheaper rates are being sold at prices which, according to one, are the highest in recent years. And the chances of any reduction in prices in the near future are remote.

Whereas the prices of brass fittings have gone up by nearly 26 per cent, those of metal fittings other than brass have risen by 10 per cent and of pipes by 5 per cent. Screws, hinges and nails are selling at prices which are 15 per cent higher than those prevailing only a few months ago.

বিশেষ সংকেত : Hardware—লৌহদ্রব্য। Considerably—প্রচুর পরিমাণে। Attribute—আরোপ করেন। 'Large-scale' hoarding—'বহুল' মজুত। Chances—সম্ভাবনা। Are remote—দূর-অস্ত্। Fittings—সাজসরঞ্জাম। Screws—প্যাঁচকল। Hinges—কব্জা বা হাঁসকল।

৩১. Sixteen-bogie diesel-driven trains for long-distance routes from Howrah are being introduced by the railway authorities to relieve the over-crowding problem.

The switch-over to diesel traction will enable the authorities to add three bogies to the trains which mean additional accommodation. If those extra bogies are utilized for sleepers, it would straightway add about 120 sleeper-seats therein.

Platforms at 14 important stations between Howrah and Waltair on the South Eastern Railway's Howrah-Madras route are now

being extended to 1,225 feet length for handling the new longer trains. The S. E. Railway's Up and Down Howrah-Madras mail trains are already being hauled by diesel engines on their run between Howrah and Bhadrak. It has now been decided that Howrah-Madras mail will be hauled by the diesel engines on its entire 1000-mile run.

বিশেষ সংকেত : Sixteen-bogie diesel-driven—ষোলবগী-বিশিষ্ট ডিজেল-চালিত। Over-crowding problem—অতিরিক্ত ভিড়ের সমস্যা। Switch-over—পরিবর্তন। Sleepers—নিদ্রামগ্ন ব্যক্তিগণ। Sleeper-seats—নিদ্রামগ্ন ব্যক্তিদের আসন। Platform—স্টেশন-প্রাঙ্গণ বা প্লাটফর্ম। Up and down—উচ্চ-নীচ বা আপ-ডাউন। Hauled—বাহিত। Run—ভ্রমণ।

৩২. What is described as lack of adequate response by the coal industry to the utilisation of World Bank's assistance for modernisation and mechanisation of mines has created new problem, it is learnt. Not only has the financial assistance given by the World Bank not been fully utilised but also some of the machineries imported against the loan are lying idle because the collieries have not taken delivery.

Since August 1961 when the World Bank loan of Rs. 16·67 crores was sanctioned for starting new projects, expanding existing mines and replacing equipment, the industry has so far utilised only Rs. 8·67 crores. The loan was sanctioned by the World Bank when there was shortage of coal in the country. Since then the position has improved considerably and there is in fact some surplus.

At present, mining equipment and machinery worth Rs. 29 lakhs which were imported by the collieries against import licences remain to be lifted.

The situation is understood to have recently been discussed by the Ministry of Steel and Mines with the Ministry of Finance. It has been decided that this machinery may be released to other colliery companies who will otherwise be eligible for the grant of import licence against the World Bank loan.

বিশেষ সংকেত : Lack of adequate response—যথেষ্ট সাড়ার অভাব। Modernisation—আধুনিকীকরণ। Mechanisation—যান্ত্রিকীকরণ। Because the

collieries......delivery—কয়লাখনিগুলি সরবরাহ গ্রহণ না করায়। Replacing equipment—সরঞ্জাম প্রতিস্থাপনা। Against import licenses—আমদানি অনুজ্ঞা-পত্র ক্রমে। Remain to be lifted--উত্তোলনের অপেক্ষায় আছে।

৩৩. Irregular price movements characterized the trading on Dalal Street last week. Popular scrip moved both ways depicted no definite trend. Leading operators preferred to mark time pending a clearer picture of Indian economy. The decision by the Resources Committee of the National Development Council not to prune the size of the Fourth Plan and its suggestion of extra budgets by States and more taxes in coming months damped the market sentiment. Fears of a severe cut in industrial production because of import bans on various raw materials also affected the sentiment.

The market turned somewhat panicky and refused to look up despite the news that the Reserve Bank had modified its deposit system for importers and had allowed imports of capital goods without the deposit of 25%. Century came down from Rs. 520 to Rs. 513 and National Rayon from Rs. 383 to 373.

বিশেষ সংকেত : Characterized—বিশেষ বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখেছে। Leading operators—প্রধান প্রধান দক্ষ ব্যক্তিগণ। To mark—লক্ষ্য করা। Resources Committee—পুঁজি সমিতি। To prune—কাট-ছাঁট করা। Damped—নিরুৎসাহিত করে দিয়েছে। Market sentiment—বাজারের ভাবপ্রবণতা। Panicky—আতঙ্কগ্রস্ত।

৩৪. Reports from Delhi suggested that India was seeking moratorium of payment of her foreign debts. In addition, there were rumours of a devaluation of the Indian rupee in the near future. On this background the news that the International Development Association would give another loan of $100 million to India to meet her import bills failed to impress the market The recovery towards the end of the week was purely technical. The money market continued to be easy with the inter-bank call rate remaining mostly unchanged around 4%. The demand for funds was fully met by banks.

The market for Government securities anxiously awaited the announcement regarding the new State Loans for the current year.

Unlike the last year, the State Government were expected to enter the market individually to collect about Rs. 100 crores. In view of higher coupon rates offered by the Centre, it was believed that the States too would have to raise their rates from $4\frac{3}{4}\%$ to about $5\frac{1}{2}\%$ for medium-term loans maturing in 1977. Maharastra, Gujarat and West Bengal were expected to issue loans at par while others might issue them at a discount varying from 50 paise to Rs. 1·50.

বিশেষ সংকেত : Reports from Delhi suggested—দিল্লী থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে ইংগিত পাওয়া গেল। Was seeking—পেতে চেষ্টা করছে। Recovery—পূর্বাবস্থা প্রাপ্তি। Technical—প্রায়োগিক। Easy—অনুকূল। Inter-bank—আন্তঃব্যাঙ্ক। Call rate—ডাকের হার। Securities—ঋণপত্রসমূহ। Higher coupon rates—উচ্চতর কুপন হার। Medium-term—মাঝারি মেয়াদী।

৩৫. Business in oils and oilseeds came virtually to a standstill. No forward business was possible because both castor and linseed September contracts pierced the weekly ceilings at Rs. 89 and Rs. 110·30 per quintal respectively. The spot market continued to show buoyant conditions with castor Madras quality going up from Rs. 89 to Rs. 90 and linseed bold variety from Rs. 120 to Rs. 124 per quintal.

The bulls tightened their grip over the market and pushed up groundnut Nizam quality from Rs. 134 to Rs. 139 per quintal. The prolonged absence of rains in Western India and limited arrivals from terminal markets enabled bulls to exploit the market. Groundnut oil looked up from Rs. 28·24 to Rs. 29·15 per 10 kilograms while castor oil B. S. S. variety gained 40 paise at 19·30 per 10 kilograms. The last day, however, saw a mild recession in prices following the news of favourable rains in Gujarat and Maharashtra.

বিশেষ সংকেত : Virtually—কার্যতঃ। Standstill—অচলাবস্থা। Forward business—আগাম ব্যবসা। Linseed—তিসিবীজ। September contracts—সেপ্টেম্বর চুক্তি। Pierced—ভেদ করে গেছে। Ceilings—সর্বোচ্চ সীমা। Spot market—সাময়িক বাজার। Buoyant—অনুকূল। Castor Madras quality—মাদ্রাজী রেড়ি। Bold variety—মোটা ধরনের। Tightened……

over—শক্ত মুঠিতে ধরেছিল। Groundnut Nizam quality—নিজামী ধরনের চীনাবাদাম। Prolonged absence—দীর্ঘায়ত অনুপস্থিতি। Terminal markets প্রান্তস্থিত বাজার সমূহ। Mild recession—স্বল্প হ্রাস।

৮৬. The Government of India announced its decision to continue all export promotion schemes, as they are. But exporters in all cases will get import entitlements only after production of a banker's certificate showing foreign exchange realized. This is intended to correct the lag in remittances, which has been a major worry in the last few months. Previously, in some of the export promotion schemes, an exporter could get his import entitlements on his giving a legal undertaking that he would produce a banker's certificate within six months of shipment of goods. Among other important decisions announced is the increase in steel export target from 200,000 to 300,000 tonnes. Similarly, the target for export of sugar has been raised from 250,000 to 350,000 tonnes. All important licenses of over Rs. 5,000 under free foreign exchange will henceforth be utilized in two halves with a view to regulate the outflow of foreign exchange in a phased manner. The deadline for the utilization of the first half is January 31, 1966

বিশেষ সংকেত : Export promotion schemes—রপ্তানি-বৃদ্ধি প্রকল্পসমূহ। Import entitlements—আমদানি অধিকার। Lag—দীর্ঘসূত্রিতা। Remittances—প্রেরণ। Legal undertaking—বৈধ উদ্যোগ। Shipment of goods—জাহাজে মাল প্রেরণ। Outflow—বহিঃপ্রবাহ। In a phased manner—ধাপে ধাপে, ক্রমে ক্রমে। Deadline—শেষ সীমা।

বাণিজ্য বিচিন্তা

পরিভাষা

"দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন্ কাজ হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।"

—বঙ্কিমচন্দ্র

বাণিজ্য বিচিন্তা

প্রস্তাবনা

"কঠিন পবিভাষা ব্যবহার না করে সাধারণে বুঝতে পারে, এমন পরিভাষা ব্যবহার করাই বিধেয়।"

—পরিভাষা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী নীতি।

'Technical terms'-কে বাংলায় পরিভাষা বলা হয়। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কতকগুলি নির্দিষ্ট বস্তু বা চিন্তা বোঝাতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়। সেই শব্দ বা শব্দগুচ্ছের সাধারণভাবে আভিধানিক অর্থ থাকতে পারে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ বিষয়ে সেগুলি নির্দিষ্ট কতকগুলি বস্তু বা চিন্তাকে দ্যোতিত করে। কাজেই সাধারণ অর্থ-দ্যোতক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ পরিভাষা নয়। বিশেষ অর্থ-দ্যোতক শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে পরিভাষা বলা হয়।

পরিভাষা শাস্ত্র (Terminology) ইংরেজিতে যতখানি সমৃদ্ধ এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচিত, পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় তা ততখানি সমৃদ্ধ নয়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচিতও নয়। তাছাড়া বাণিজ্যিক পরিভাষা বণিকবুদ্ধি-সম্পন্ন ইংরেজ জাতির মতো অন্য কোন জাতির নেই। আধুনিক ভারতে দীর্ঘদিন ইংরেজ জাতির প্রভুত্ব থাকায় এবং এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান রশি-গাছি তাদের হাতে থাকায় আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে বহু ইংরেজি পারিভাষিক শব্দ প্রবেশাধিকার লাভ করেছে।

বর্তমানে বাংলা ভাষার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হতে আরম্ভ করেছে। বিশেষতঃ সরকারী ভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ায় বাংলা ভাষার গুরুত্ব আরো বেড়ে গেছে। কেবল সরকারী কার্যে নয়, ব্যবসা-বাণিজ্যে আজ বাংলা ভাষার নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কিন্তু অসুবিধে হচ্ছে, যেসব বিশেষ বিশেষ স্থানে ইংরেজি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেখানে উপযুক্ত বাংলা শব্দ বা শব্দগুচ্ছের ব্যবহার নিয়ে। সেইজন্যেই বাংলা পারিভাষিক শব্দের গুরুত্ব এখন বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান লেখকের জনৈক বন্ধু একজন সরকারী গেজেটেড্ অফিসার। তিনি কয়েকদিন Casual leave নিয়েছিলেন। দরখাস্ত দিতে হবে। বাংলায় দরখাস্ত লিখেছেন। কিন্তু casual leave-এর বাংলা প্রতিশব্দ তাঁর জানা নেই। দরখাস্ত হাতে নিয়ে তিনি

অফিস যাবার আগে ছুটে এসেছেন বর্তমান লেখকের কাছে। 'Casual leave-এর বাংলা কি হবে?' বললাম—'নৈমিত্তিক ছুটি।' তিনি সন্তুষ্ট হয়ে অফিসে চলে গেলেন।

সম্প্রতি বাংলা পারিভাষিক শব্দের যে গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, তা আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। কাজেই তার জন্যে বাংলা ভাষায় উপযুক্ত পরিভাষা-গ্রন্থ রচিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তেমন গ্রন্থ পাবো কোথায়? পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়েকজন জ্ঞানী, গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি পরিভাষা কমিটি গঠন করেছেন। তাঁরা 'সরকারী কার্যে ব্যবহৃত পরিভাষা' গ্রন্থও প্রকাশ করেছেন। তাতে সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য লক্ষণীয়। যে সমস্ত বাংলা শব্দ বা ফারসী শব্দ আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে প্রচলিত আছে, সেগুলিও গৃহীত হওয়া দরকার। সেই সব শব্দ দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে বাঙ্গালীর কাছে শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো সহজ হয়ে গেছে। সেগুলির স্থানে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের আত্যন্তিক ব্যবহার অনুচিত। যে সব বস্তু বা চিন্তা নবাগত, সেগুলির ক্ষেত্রে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার চলতে পারে। আবার যে সমস্ত ইংরেজি শব্দ দীর্ঘদিন আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে চলে আসছে, কোন রকম গোঁড়ামিবশে সেগুলিকে পরিত্যাগ করারও কোন অর্থ হয় না।

পরিভাষা সম্পর্কে সরকারী নীতিতে বিঘোষিত হয়েছে যে, কঠিন পরিভাষা ব্যবহার না করে সাধারণে বুঝতে পারে, এমন পরিভাষা ব্যবহার করাই বিধেয়। সেই নীতির ওপর ভিত্তি করে পশ্চিমবঙ্গ পরিভাষা কমিটিও পরিভাষাকে অযথা দুর্বোধ্যতার হাত থেকে মুক্ত করে সহজ করে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। একথাও সত্য যে, পরিভাষার এই আপাত-দুর্বোধ্যতা চিরস্থায়ী হবে না। কারণ আজ যে সব শব্দ দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে, ক্রমশঃ ব্যবহারের ফলে সেগুলিই সহজ হয়ে যাবে।

বি. কম. পরীক্ষায় ইংরেজি পারিভাষিক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দের জন্যে ১০ নম্বরের বরাদ্দ আছে। পাঁচটি পরিভাষার বাংলা প্রতিশব্দ শুদ্ধভাবে লিখতে হবে। ভুল দুদিক দিয়ে হতে পারে: প্রথমতঃ, প্রতিশব্দটি অনেক সময় যথাযথ হয় না; দ্বিতীয়তঃ, ব্যাকরণগত ভুল অর্থাৎ বানান, উপসর্গ ও প্রত্যয় ইত্যাদির ভুল। পরীক্ষার্থীকে এবিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

পরিভাষার বাংলা প্রতিশব্দগুলিকে মুখস্থ করে আয়ত্ত করা ঠিক হবে না; ওগুলিকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। তার জন্যে প্রথমতঃ পারিভাষিক শব্দটি যে বস্তু বা চিন্তার দ্যোতনা করে, তা উপলব্ধি করতে হবে। পরে বাংলা প্রতিশব্দটি আয়ত্ত করতে হবে। বাংলা শব্দটিকে আয়ত্ত করবার সময় শব্দটির গঠন এবং তার অর্থ-দ্যোতনা লক্ষ্য করতে হবে। এমনি ভাবে একে একে পরিভাষার বাংলা প্রতিশব্দগুলি আয়ত্ত হয়ে

যাবে। যেমন ধরা যাক্, 'Demurrage' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে 'বিলম্ব-শুল্ক', 'গুণাগার', 'গহিরি', 'হর্জানা'। এমনিতে কথাগুলি মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু 'Demurrage' কথাটির প্রকৃত অর্থ যদি আগে জানা যায়, তবে অসুবিধে হবে না। কথাটির অর্থ হলো, 'জাহাজে বা রেলগাড়িতে চুক্তিমতো মাল তুলতে বা খালাস করতে বিলম্বের জন্যে যে অতিরিক্ত মাশুল।' এবার 'Demurrage' কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ শেখার চেষ্টা করলে মনে রাখা সহজ হবে। 'বিলম্ব-শুল্ক', 'গুণাগার', 'গহিরি' বা 'হর্জানা' শব্দগুলি এবার থেকে অনায়াসে মনে থাকবে।

'বাণিজ্য বিচিন্তা'য় যে সব পারিভাষিক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ লেখার নির্দেশ বিভিন্ন বি. কম. পরীক্ষায় এসেছে, সেগুলির পাশে সাল-সমেত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম সংক্ষেপে প্রদত্ত হলো। তাতে পরীক্ষার্থীরা অনুমান করতে পারবে, কোন্ বিশেষ শব্দগুলি তাদের পরীক্ষার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলি বাম পাশে বিশেষ চিহ্নের (*) দ্বারা চিহ্নিত হলো। তাছাড়া যে সব গুরুত্বপূর্ণ শব্দ পরীক্ষায় আসতে পারে, অথচ এতদিন আসে নি, সেগুলিও বিশেষ চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত হলো। কিন্তু মনে রাখা দরকার, পারিভাষিক শব্দগুলির প্রতিশব্দ সমূহ নানা দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কি অনুবাদে, কি বাণিজ্যিক পত্র-বিনিময়ে, কি প্রবন্ধ রচনায় প্রতিশব্দগুলির ব্যবহার বিশেষভাবে অনুভূত হতে পারে।

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৬৫ সালের বি. কম. পরীক্ষায় পারিভাষিক শব্দগুলির টীকাসহ প্রতিশব্দ লেখার নির্দেশ এসেছে। এতে পরীক্ষার্থীর জ্ঞানের গভীরতা বিচার করা সহজ হয়। কেবল গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়েই এই প্রশ্ন-ধারা সীমিত না-ও থাকতে পারে। কাজেই, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের সেজন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। তাই পরিভাষা অংশের শেষের দিকে কিছু পারিভাষিক শব্দের টীকা দেওয়া হলো, তাতে প্রতিশব্দগুলি এমনিতে আয়ত্ত করা সহজ হবে।

মোটের ওপর, পরীক্ষার্থীদের জন্যে যত প্রকার সুবিধে থাকা দরকার, এই গ্রন্থে সমস্তই করা হলো। কোন ত্রুটি রাখা হয় নি। যদি কোন ত্রুটি থেকে থাকে, তা নিতান্তই অনিচ্ছাকৃত। এবার পরীক্ষায় ভালো করবার সামগ্রিক প্রয়াস কিন্তু পরীক্ষার্থীদের। আশা করি, তারা ভালোই করবে।

● ইংরেজি বাণিজ্যিক ও অর্থ নৈতিক সংজ্ঞাসমূহের বাংলা প্রতিশব্দ ●

A.

*Abatement—ছুট, বাদ।
*Ab initio—প্রারম্ভ হইতে।
Abortive—লুপ্ত।
Abrasion—মুদ্রায় ধাতুক্ষয়।
Absolute—পরম।
Abstinence—ভোগবিরতি।
*Abstract Book—চুম্বক খাতা।
Acceleration—ত্বরণ।
Acceptance—স্বীকার, স্বীকৃতি, সাকরাণ।
*Acceptance charge—স্বীকৃতি-দক্ষিণা।
Acceptance, conditional—সর্তাধীন স্বীকৃতি।
" , General—সাধারণ "।
" , Qualified—বিশেষিত স্বীকৃতি।
Acceptance of Bills—হুণ্ডি স্বীকার, হুণ্ডি সাকরাণ।
*Accepting House—হুণ্ডি স্বীকৃতি কুঠি, হুণ্ডি সাকরাণী কুঠি।
*Accessio—আকস্মিক মূল্য বৃদ্ধি, মূল্যপ্লাবন।
Accessory—অতিরিক্ত, আনুষঙ্গিক।
Accommodation—উপযোজন।
*Accommodation Bill—উপযোজক হুণ্ডি।
Account—হিসাব, খাতে।
Account book—হিসাব বহি।
*Account of profit and loss—লাভ-লোকসানের হিসাব।
Account, Advertisement—বিজ্ঞাপন খাতে।
*Account, Bad debts—কু-ঋণ খাতে, অশোধ্য ঋণ খাতে।
" , Capital—মূলধন খাতে।
" , Cash—রোকড় খাতা।

Account, Consignment—মাল প্রেরণ খাতে, চালান-বিক্রয় খাতে।
" , Cost—আসল খরচ খাতে।
" , Current—চলতি হিসাব।
" , Current Credit—চলতি ধারের হিসাব।
" , Dead—তামাদি হিসাব। ব. বি. '৬২
" , Deposit—আমানত খাতে।
" , Drawing—ব্যক্তিগত টাকা তোলার হিসাব। ক. বি. '৫২
" , Fixed—স্থায়ী হিসাব।
" , Imprest—জিম্মা খাতে।
" , Joint—যৌথ হিসাব।
" , Permutation—অদল-বদল খাতে।
" , Postage—ডাক খাতে।
" , Pro-forma—নকল হিসাব, খসড়া হিসাব। ব. বি. '৬২, '৬৪
" , Sales—বিক্রীর হিসাব, বিক্রয় বিবরণী। ক. বি. '৪৩
" , Suspense—স্থগিত হিসাব, বিচারাধীন হিসাব, কান-টোকা হিসাব।
" , Transfer—পালটা জমা-খরচ।
" , Travelling—রাহা খরচ খাতে।
" , Wages—মজুরী খাতে।
*Accounts Clerk—হিসাব-করণিক, গণন-করণিক।
Accountant—গাণনিক, হিসাব-রক্ষক।
Accountant General—মহাগাণনিক।
Accrued—উপার্জিত।

Accumulation—মজুত, সঞ্চয়।
Acknowledgement—প্রাপ্তি স্বীকার।
Acquisition—অর্জন, গ্রহণ, আহরণ।
Acquittance—ফারখতি, দায়মুক্তি।
Act—আইন, বিধি, বিধান।
*Actuals—প্রকৃত, বাস্তব।
*Actuary—বীমা গণিতজ্ঞ, বীমা গাণিতিক।
Address Book—ঠিকানা বহি।
Ad hoc—তদর্থক।
*Ad interim—অন্তর্বর্তীকালীন, মধ্যকালীন। ব. বি. '৬২. '৬৪
Adjournment—স্থগিত, মুলতুবি।
Adjudication Order—আদালতী হুকুম।
Adjustment of Accounts—হিসাব-মীমাংসা, হিসাব-মিল।
Administration—প্রশাসন।
Administrative service—শাসন-কৃত্যক।
Adulteration—ভেজাল, অপমিশ্রণ।
Advance—দাদন, আগাম, অগ্রিম, বায়না।
*Ad valorem duty—মূল্যানুসার শুল্ক, মূল্যানুযায়ী শুল্ক। ক. বি. '৪৭, '৫৯; ব. বি. '৬৩, '৬৪; গৌ. বি. '৬৫
*Affidavit—শপথপত্র, হলফনামা।
Afforestation—বনীকরণ।
Agency—এজেন্সী, আড়তদারী, প্রতিনিধিত্ব।
Agency House—কুঠিওয়ালা।
Agenda—কার্যক্রম, কার্যসূচী।
Agent—এজেন্ট, প্রতিনিধি, নিযুক্তক।
*Agio—মুদ্রাবাট্টা।
Agrarian—কৃষিভূমি-বিষয়ক।
Agreement—চুক্তি, সংবিদা।
*Agriculture, Extensive—ব্যাপক কৃষি।
", Intensive—নিবিড় কৃষি।
*Agricultural Credit Society—কৃষি ঋণদান সমিতি।
*Agricultural Economy—কৃষি অর্থনীতি। ক. বি. '৫৩
" Marketing—কৃষিপণ্য বিপণন।
Aid India Club—ভারত-সাহায্যদান সংঘ।
Alias—ওরফে।
Alienated Land—হস্তান্তরিত ভূমি।
*All Rights Reserved—সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
*Allocation—বিভাজন, বণ্টন। ক. বি. '৫০
*Allotment of Shares—শেয়ার আবণ্টন, শেয়ার বিলিকরণ।
*Allowance, Compensatory—ক্ষতি-পূরণ ভাতা।
" , Conveyance—যান-বাহন ভাতা।
" , Dearness—মাগ্‌গি ভাতা, দুর্মূল্য অধিদেয়।
" , Halting—বিরাম ভাতা।
" , Travelling—রাহা খরচ।
Alloy—খাদ, সঙ্কর ধাতু।
Alluvial Soil—পাললিক মৃত্তিকা।
*Amalgamation—একত্রীকরণ, সংমিশ্রণ।
Ambassador—রাষ্ট্রদূত।
Amendment—সংশোধন।
Ammunition—যুদ্ধোপকরণ, গোলাবারুদ।

*Amortisation—ক্রমশোধ।
Amount—পরিমাণ।
Anarchist—নৈরাজ্যবাদী।
*Ancillary—সহায়ক।
Annuity—বার্ষিক বৃত্তি।
*Annuity Fund—বার্ষিক বৃত্তি তহবিল, বার্ষিকী তহবিল। ক. বি. '৪৯, '৫৯
*Anti-corruption—দুর্নীতি-নিরোধ, অপচার-নিরোধ।
Application—দরখাস্ত, আবেদনপত্র, প্রয়োগ।
Appraisal—মূল্য নির্ধারণ।
Appreciation of Money—অর্থের মূল্য-বৃদ্ধি।
Apprenticeship—শিক্ষানবিশী।
Approximation—সন্নিকর্ষ।
Arable—চাষযোগ্য।
*Arbitrage—পরোক্ষ বিনিময়, অন্তর পণন।
*Arbitral—মধ্যস্থ।
*Arbitration—মধ্যস্থতা, সালিশী।
Arbitrator—মধ্যস্থ, সালিশ।
Aristocracy—অভিজাততন্ত্র, অভিজাত সম্প্রদায়।
Armament—যুদ্ধোপকরণ।
Article—অনুচ্ছেদ।
*Articles—নিয়মাবলী।
*Articled Clerk—শিক্ষানবীশ করণিক।
Arts and Crafts—চারু ও কারু শিল্প।
*As per—অনুযায়ী।
Assay—যাচাই, পরখ।
Assembly—সংসদ, সভা।
" , Legislative—আইন সভা, বিধান সভা।
*Assessment of Taxes—কর নির্ধারণ।
Asset—সম্পত্তি, পরিসম্পদ।
*Assets and Liabilities—পরিসম্পদ ও দায়, দেনা-পাওনা।
*Assets, Circulating—প্রচলিত পরিসম্পদ।
* " , Fixed—স্থাবর সম্পত্তি।
* " , Floating—প্রবাহী পরিসম্পদ।
* " , Liquid—নগদ সম্পদ।
Assignee—স্বত্বনিয়োগী।
*Assignment—স্বত্ব নিয়োগ।
Association—সমিতি, সংঘ।
*Assort—বাছাই করা।
Assurance—বীমা।
Attachment—ক্রোক।
*Attestation—প্রত্যায়ন।
*Attested Copy—প্রত্যায়িত অনুলিপি।
Attesting Officer—প্রত্যায়ন আধিকারিক।
Attorney, Power of—আমমোক্তার নামা।
Auction—নীলাম।
*Auctioneer—নীলামকারী, নীলামদার। ক. বি. '৪৫
*Audit—হিসাব পরীক্ষা, হিসাব নিরীক্ষা। ক. বি. '৫৫
*Auditor—হিসাব পরীক্ষক, হিসাব নিরীক্ষক। ক. বি. '৬২
*Authorisation—প্রাধিকার অর্পণ।
Autocracy—স্বৈরতন্ত্র।
Automatic—স্বয়ংক্রিয়, স্বয়ংচল।
Automobile—মোটর গাড়ি।
Autonomy—স্বায়ত্তশাসন, স্ব-শাসন।
Average—গড়, গড়পড়তা।
Average Price—গড়পড়তা মূল্য।
*Average, Successive—পৌনঃপুনিক গড়। ক. বি. '৫০

*Aviation, Civil—অসামরিক বিমান চলাচল। ক. বি. '৪৮

Avoidance of Tax—কর পরিহার।

B.

*Back a Bill—হুণ্ডি পিছসহি করা।

Back Freight—অতিরিক্ত মাশুল।

*Bad debts—অশোধ্য ঋণ, কু-ঋণ।

*Bail Bond—জামিননামা।

Bailor—জামিনদার।

*Balance Certificate—উদ্বৃত্তের প্রত্যয়পত্র।

* „ Sheet—স্থিতিপত্র, পাকামিল।

* „ in Hand—রোকড় বাকি।

* „ of Accounts—হিসাব-নিকাশের জের।

* „ of Payments—আন্তর্জাতিক দেনাপাওনার সমতা, ক. বি. '৫১

*Balance of Trade, Favourable—অনুকূল বৈদেশিক বাণিজ্য উদ্বৃত্ত।

*Balance of Trade, Unfavourable—প্রতিকূল বৈদেশিক বাণিজ্য উদ্বৃত্ত।

Balance, Cash—নগদ উদ্বৃত্ত।

* „ , Credit—জমা বাকি।

* „ , Closing—অবসান-স্থিতি, সমাপন-স্থিতি।

„ , Debit—খরচের জের, ফাজিল বাকি। ক. বি. '৬২

* „ , Opening—প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত।

* „ , Outstanding—অনাদায়ী উদ্বৃত্ত, বাজার বাকি।

* „ , Trial—রেওয়া মিল।

„ , Unclaimed—অপ্রার্থিত উদ্বৃত্ত।

Bank—ব্যাঙ্ক, অধিকোষ।

*Bank Balance—ব্যাঙ্ক জমা।

* „ Charge—ব্যাঙ্কের দক্ষিণা। ক. বি. '৪৬

* Bank Draft—ব্যাঙ্কের হুণ্ডি। ক. বি. '৬০

* „ Note—ব্যাঙ্কের বরাত চিঠি।

* „ Rate—ব্যাঙ্কের বাট্টার হার। ক. বি. '৫৮

*Bank, Agricultural—কৃষি ব্যাঙ্ক।

„ , Central—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক।

„ , Chartered—সনদপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক।

* „ , Commercial—বাণিজ্য ব্যাঙ্ক।

„ , Co-operative—সমবায় ব্যাঙ্ক।

„ , Exchange—বিনিময় ব্যাঙ্ক।

„ , Indigenous—দেশীয় প্রথায় কারবারী ব্যাঙ্ক।

* „ , Industrial—শিল্প ব্যাঙ্ক।

„ , Joint-Stock—যৌথ ব্যাঙ্ক।

„ , Land Mortgage—জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক।

„ , Postal Savings—ডাক বিভাগীয় সঞ্চয় ব্যাঙ্ক।

„ , Reserve—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

* „ , Rural—গ্রামীণ ব্যাঙ্ক।

* „ , Scheduled—তালিকাভুক্ত (বা তপশীলী) ব্যাঙ্ক।

Banker—মহাজন, কুঠিয়াল, সাহুকার, শেঠ, পোদ্দার।

*Barter—বিনিময়, বস্তু বিনিময়, বদলাই। ক. বি. '৫১

*Bear—নিম্নগ, মন্দিওয়ালা।

Bench Clerk—পেশকার, ব্যবহার-করণিক।

*Betterment Fee—উন্নয়ন দক্ষিণা। ক. বি. '৫৫

Betting tax—পণকর।

*Beverage—পানীয় ।
*Bill after Sight—মুদ্দতী হুণ্ডি ।
* „ at Sight—দর্শনী হুণ্ডি ।
ক. বি. '৫৭
„ for Collections—আদায়ী বিল ।
Bill Market—হুণ্ডির বাজার ।
* „ of Entry—দাখিলী পণ্যদ্রব্যের তালিকা, আগম পত্র । ব. বি. '৬৪
* „ of Exchange—বিনিময়পত্র, ব্যবসায়ী হুণ্ডি । ক. বি. '৫৯
* „ of Lading—বহনপত্র, (রেল বা জাহাজের) চালানী রসিদ ।
ক. বি. '৪৪, '৪৯, '৫৮, '৬০
„ of Parcels—মূল্য সংবলিত চালান তালিকা।
„ of Right—অধিকার পত্র ।
* „ of Store—শুল্ক ছাড়পত্র, ভাণ্ডার পত্র । ক. বি. '৬৩
*Bill on Demand—দর্শনী হুণ্ডি ।
Bill, Clean—শুদ্ধ বিল ।
* „ , Dishonoured—প্রত্যাখ্যাত হুণ্ডি ।
„ , Documentary—মিশ্র হুণ্ডি ।
„ , Duplicate—পৈট ।
„ , Export—রপ্তানি হুণ্ডি ।
* „ , Honoured—স্বীকৃত হুণ্ডি ।
* „ , Treasury—সরকারী হুণ্ডি ।
„ , Triplicate—পর-পৈট ।
*Bimetallism—দ্বিধাতুমান ।
Black-mail—ভয় দেখাইয়া অসদুপায়ে গৃহীত অর্থ ।
Black-marketing—চোরা কারবার ।
*Black money—কালোটাকা ।
Black out—নিষ্প্রদীপ করণ, অপ্রদীপ ।
*Blast furnace—মারুত চুল্লী ।
Block—সুংলগ্ন গৃহপুঞ্জ ।
Blockade—অবরোধ ।
*Blue Book—সরকারী বিবৃতি ।
*Blue Print—খসড়া । ক. বি. '৬২
Board—বোর্ড, পর্ষদ, মণ্ডলী, সংঘ ।
„ of Adjustment—মীমাংসা-পর্ষৎ ।
„ of Directors—পরিচালক-সংঘ, পরিচালক-মণ্ডলী ।
Board of Revenue—মালগুজারী (বা রাজস্ব) পর্ষৎ ।
„ of Trade—বাণিজ্য পর্ষৎ ।
„ of Trustees—অছিপর্ষৎ ।
Board, Arbitration—সালিশী বোর্ড ।
* „ , Licensing—অনুজ্ঞাপত্র পর্ষৎ ।
ক. বি. '৬৪
Bodna fide—আসল, প্রকৃত, অকৃত্রিম, বিশ্বস্ত ।
Bona fides—বিশ্বস্ততা ।
Bond—তমস্থক, পাট্টা, খত ।
*Bond, Active—সক্রিয় তমস্থক, চলৎ-পাট্টা ।
* „ , Fidelity—দায়িত্ব স্বীকারপত্র ।
* „ , Gold—কাঞ্চনপত্র ।
* „ , Indemnity—খেসারৎ নামা, ক্ষতিপূরণ পত্র ।
* „ , Personal—মুচলেখা ।
„ , Registered—রেজিস্ট্রীকৃত পাট্টা ।
Bonded goods—শুল্কাধীন পণ্য ।
* „ Godown—শুল্কাধীন পণ্যাগার ।
* „ Warehouse—শুল্কাধীন পণ্যাগার । ক. বি. '৪৭
Bonus—অধিবৃত্তি ।
Book-keeping—গাণণিক্য, হিসাব-রক্ষণ পদ্ধতি ।
Booking Office—টিকিট ঘর ।
*Boom—চড়া বাজার, তেজী বাজার, গরম বাজার, ধুম ।

*Bounty—সরকারী সাহায্য, রাজবৃত্তি।
Boycott—বর্জন, বয়কট্।
Brassage—মুদ্রানির্মাণ বানি।
Breach of Agreement - চুক্তি ভঙ্গ, সংবিদ লঙ্ঘন।
* „ of Contract—চুক্তিভঙ্গ।
„ of Peace—শান্তিভঙ্গ।
„ of Trust—বিশ্বাসভঙ্গ।
*Broadcast—সম্প্রচার, বেতারপ্রচার। ক. বি. '৫০
*Broker—দালাল, ফড়িয়া। ক. বি. '৫৪
Brokerage—দালালী।
Brought Forward—জের।
*Budget—বাজেট, আয়ব্যয়ের বরাদ্দ, আয়ব্যয়ক। ক. বি. '৬৪
*Budgetary Surplus—বাজেট উদ্বৃত্ত, আয়ব্যয়ক উদ্বৃত্ত। ক. বি. '৫৬
*Buffer Stock—মধ্যবর্তী সম্ভার।
*Bull—ঊর্ধ্বগ, তেজিওয়ালা।
Bulletin—ইস্তাহার, বুলেটিন।
*Bulk Purchase—বৃহৎ ক্রয়, একজোট খরিদ।
*Bullion—থাম, পিণ্ড। ক. বি. '৪৩
Bureaucracy—আমলাতন্ত্র।
*Business cycle—কারবার চক্র।
Busy season—কারবারের মরশুম।
Bye-law—উপবিধি।
*Bye-product—উপজাত।

C.

Cabinet—মন্ত্রীপরিষদ, মন্ত্রীমণ্ডলী।
Calculation—গণনা, হিসাব।
*Call of more—অধিক ক্রয়ের অধিকার।
*Call Money—তলবী অর্থ।
Campaign, Grow More Food—অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলন।
*Canal Tolls—খালকর।
Cancellation—বাতিলকরণ।
Candidate—প্রার্থী, পদপ্রার্থী।
*Canons of Taxation—করনীতির সূত্রসমূহ।
*Canvassing—উপার্থন।
*Capital Expenditure—মুখ্য ব্যয়, প্রধান খরচ। ক. বি. '৫৬, '৬০
* „ Formation—মূলধন গঠন। ক. বি, '৫৩
* „ Geared—সংলগ্ন মূলধন।
* „ Goods—মূলধনী পণ্য।
* „ Outlay—মূলধন বিনিয়োগ। ক. বি. '৪৪
*Capital, Authorised—অনুমোদিত মূলধন।
* „ , Circulating—চলতি মূলধন। গৌ. বি. '৬৫
* „ , Floating—চলতি মূলধন।
* „ , Fixed—স্থায়ী মূলধন।
* „ , Foreign—বৈদেশিক মূলধন।
* „ , Issued—বিলিকৃত মূলধন।
* „ , Paid up—আদায়ীকৃত মূলধন। ক. বি. '৪৬, '৫৪
* „ , Subscribed—প্রতিশ্রুত মূলধন।
* „ , Sunk—ব্যয়িত মূলধন।
* „ , Working—কার্যকরী মূলধন। ক. বি. '৪৩
Capitalism—ধনতন্ত্র, পুঁজিবাদ।
Capitalist—পুঁজিপতি, ধনপতি।
Caption—শীর্ষলিপি।
*Carat—স্বর্ণবর্গ, বিশুদ্ধ স্বর্ণের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ।
*Cargo Book—জাহাজী মালের হিসাব বই।
*Carry Forward—জের টানা।

*Cartel—বিক্রয় জোট, শিল্প সংঘ, উৎপাদন সংঘ, মূল্য নিয়ন্ত্রণ সংঘ।
Cash a Bill—হুণ্ডি ভাঙ্গান।
Cash Book—রোকড় বই, জমা-খরচের বহি।
„ Credit—নগদ লেনদেন।
* „ Crop—বাণিজ্যিক শস্য, বাণিজ্য-শস্য। ক. বি. '৬৫
* „ Deposit - নগদ আমানত।
* „ Entry —রোকড় বন্দ।
* „ Memo—নগদ বিক্রয়ের রোকা, ক্যাশ মেমো।
*Cash, Hard—নগদ পুঁজি।
* „ , Imprest—স্থায়ী আমানত। ক. বি, '৬০
*Casting Vote—(সভাপতির) নির্ণায়ক মত, চূড়ান্ত ভোট। ব. বি. '৬৩
*Casual Labour—সাময়িক শ্রম।
* „ Leave—নৈমিত্তিক ছুটি।
*Caution Money—জামানতী টাকা।
*Caveat Emptor—খরিদ্দার সাবধান, ক্রেতা সতর্কীকরণ।
*Cease fire—অস্ত্র সংবরণ।
*Ceiling Price—সর্বোচ্চ দর। ক. বি. '৪৪, '৬১, '৬২ ; ব. বি. '৬৪
Censor—(দোষগ্রাহী) প্রহরী।
*Census—আদমসুমারি, জনগণনা।
Certificate—প্রশংসাপত্র, প্রমাণপত্র।
*Certificate of Damage—ক্ষতির প্রমাণপত্র।
* „ of Identity—অভিজ্ঞাপত্র।
„ of Insurance—বীমার অভিজ্ঞা-পত্র।
* „ of Origin—প্রভব লেখ, উৎপাদন নিদর্শনপত্র। ক.বি.'৪৭
* „ of Posting—ডাকের প্রেরণপত্র।
*Certificate of Registration—নিবন্ধন-পত্র।
* „ of Registry—পঞ্জীভুক্তি প্রমাণপত্র।
*Certificate, Sale—বয়নামা। ব. বি. '৬৪
Certified Copy—প্রমাণিত প্রতিলিপি।
*Chamber of Commerce—বণিক সভা, বণিক সংঘ।
*Charge, Overhead—উপরি ব্যয়, উপরি খরচ। ব. বি. '৬২
*Cheap Money Policy—সুলভ মুদ্রানীতি। ক. বি. '৫৬
*Cheque, Crossed—রেখাঙ্কিত চেক।
* „ , Dishonoured—প্রত্যাখ্যাত চেক।
„ , Order—বরাতি চেক।
* „ , Out of date—খারিজ চেক।
* „ , Post-dated—মেয়াদী চেক, পরতারিখী চেক, উত্তর-তিথি চেক। ক. বি. '৬১; ব. বি. '৬৩
Chief Accountant—মুখ্য গাণনিক।
„ Engineer—মুখ্য বাস্তুকার।
„ Executive Officer—মুখ্য নির্বাহক।
„ Whip—মুখ্য প্রচেতক।
Circular—পরিপত্র।
*Circular Letter—প্রচারপত্র। ব. বি. '৬৪
*Circulation of Money—মুদ্রা প্রচলন।
*Circulation, Active—সক্রিয় প্রচলন।
* „ , Velocity of—প্রচলন গতি।
*Civil Supply—জন সংভরণ।
* „ War—গৃহযুদ্ধ, অন্তর্বিপ্লব।
*Claim, Preferential—সর্বাগ্রগণ্য দাবি।

Clear Day—মাল-নিকাশী দিন।
*Clearance of Goods—মালের নিকাশ।
„ Sale—নিকাশ বিক্রয়।
*Clearing Bank—চেক চুকানী ব্যাঙ্ক।
* „ House—নিকাশ-ঘর।
*Clerk, Audit—নিরীক্ষা করণিক।
* „ , Bank—ব্যাঙ্ক করণিক।
* „ , Confidential—আপ্ত করণিক।
* „ , Correspondence—পত্র-করণিক। ক. বি. '৬৪
* „ , Establishment—সংস্থা করণিক। ক. বি. '৬৪
* „ , Filing—নথিপত্র করণিক। ক. বি. '৬৫
* „ , Head—প্রধান করণিক।
Code—সংকেত।
Co-existence—সহ-অবস্থান।
*Coin, Base—হীনমুদ্রা। ব. বি. '৬২
* „ , Subsidiary—সহায়ক মুদ্রা। ক. বি. '৫৭
„ , Token—নিদর্শন মুদ্রা।
*Collective Bargaining—যৌথ সওদা।
Collective Security—যৌথ নিরাপত্তা।
*Colonial Preference—ঔপনিবেশিক পক্ষপাত।
Combination—জোট।
* „ Horizontal—সমশিল্প জোট।
* „ Vertical—ভিন্নশিল্প জোট।
*Commercial Crisis—বাণিজ্যিক সংকট।
* „ Depression—বাণিজ্যিক মন্দা।
Commission—দস্তরি।
* „ Sale—দস্তরি প্রথায় বিক্রয়।
Commissioner of Excise—অন্তঃশুল্ক মহাধ্যক্ষ।
Commissioner of Police—নগরপাল।
*Committee, Executive—কার্যনির্বাহক সমিতি।
*Commodity Taxation—পণ্য শুল্কারোপ। ক. বি. '৫৫
Common Wealth—কমন ওয়েল্থ্।
Communalism—সাম্প্রদায়িকতা।
Communique—ইস্তাহার, প্রচারণ।
Communism—কমিউনিজ্ম্, সাম্যবাদ।
*Community Development—সমাজ উন্নয়ন। ক. বি. '৫৩, '৫৪
Commutable—পরস্পর বিনিময়যোগ্য।
*Commutation—নিষ্ক্রয়ণ, লঘূকরণ, পরিবর্তন।
Commutative Law—বিনিময় নিয়ম।
*Commuted value—লঘূকৃত মূল্য, নিষ্ক্রীত মূল্য।
*Company, Joint-Stock—যৌথ কারবার, যৌথ মূলধন সংঘ।
* „ , Limited—সসীম দায়বদ্ধ কারবার।
*Compensation, Workmen's—শ্রমিক ক্ষতিপূরণ। ক. বি. '৫৪
*Compensatory Allowance—পূর্তি অধিদেয়, ক্ষতিপূরণ ভাতা।
Compound Rate—চক্রবৃদ্ধি হার।
* „ Interest—চক্রবৃদ্ধি সুদ। ব. বি. '৬৪
Confederation—সন্ধিবদ্ধ রাষ্ট্র-সম্মেলন।
Conference, Peace—শান্তি সম্মেলন।
Confidential—সংগুপ্ত।
Confirmation—সমর্থন।
Confiscated—বাজেয়াপ্ত।
*Consensus—মতৈক্য, ঐকমত্য।

*Consideration—ক্ষতিপূরণ, পণ, প্রতিলাভ। ক. বি. '৪৭

Consignee—প্রাপক।

*Consignment—চালান, প্রেরিতক। ক. বি. '৪৫, '৬১

Consignor—প্রেরক।

Consolidation of debt—ঋণ একত্রীকরণ।

Consolidation of Land holdings—জোতের চকবন্দীকরণ।

*Consortium—গোষ্ঠী, সংঘ, সমিতি।

Constituency—নির্বাচন কেন্দ্র, নির্বাচক মণ্ডলী।

Consumer—পণ্য ব্যবহারকারী।

*Consumer's Surplus—ভোগোদ্বৃত্ত। ক. বি. '৬৩

Consumption—ভোগ।

* „ , Current—চলতি ভোগ। ক. বি. '৫৩

*Contango—হর্জানা, ব্যাজ, ক্ষতিপূরণ।

*Contingency—সম্ভাব্য ক্ষেত্র।

Contingencies—সম্ভাব্য ব্যয়সমূহ।

*Contingent Bill—সম্ভাব্য মূল্যপত্র।

Contingent charges—সম্ভাব্য ব্যয়।

*Contraband—নিষিদ্ধ পণ্য, বে-আইনী কারবার, চোরাই চালান। ক. বি. '৬৫

*Contrabandist—শুল্ক-প্রতারক, চোরাই চালানের কারবারী।

Contract—চুক্তি, ঠিকা।

„ , Breach of—চুক্তিভঙ্গ।

* „ , Forward—আগাম চুক্তি, আউতি চুক্তি। গৌ. বি. '৬৫

Contract of Hire—ভাড়ানামা।

„ of Indemnity—খেসারৎ-নামা।

*Contra-entry—পাল্টা হিসাব। ক. বি. '৬২

Controller—নিয়ন্ত্রক, নিয়ামক।

Conversion—রূপান্তর, পরিবর্তন।

*Convertible paper money—পরিবর্তনযোগ্য পত্রমুদ্রা।

Co-ordination—সহযোজন।

Co-operative Movement—সমবায় আন্দোলন।

*Co-operative Credit Society—সমবায় ঋণদান সমিতি।

*Copyright—মুদ্রণাধিকার, প্রতিলিপ্যধিকার

Core Projects—প্রয়োজনীয় প্রকল্পসমূহ।

*Corporate Body—আইনগঠিত সমিতি।

„ Management—যৌথ পরিচালন।

Corporation—পৌরনিগম, বিধিবদ্ধ যৌথ-প্রতিষ্ঠান।

*Corporation Tax—নিগম কর। ক. বি. '৫৬

Corner—একচেটিয়া।

Cornering a market—বাজার একায়ত্ত করা।

Corvee—বেগার।

*Cost, Establishment—সরঞ্জামী ব্যয়, স্থাপন ব্যয়।

* „ , Marginal—প্রান্তিক ব্যয়।

* „ , Supplementary—অনুপূরক ব্যয়।

* „ , Overhead—উপরি ব্যয়, উপরি খরচ। ক. বি. '৪৫

Cost of Living—জীবনযাত্রার ব্যয়।

* „ „ Production—উৎপাদন ব্যয়।

Cost Price—ক্রয়মূল্য।

Cost Sheet—উৎপাদন ব্যয়ের হিসাব।
*Costing Process—প্রসর হিসাব অঙ্কন। ক. বি. '৬৫
Cottage Industry—কুটির-শিল্প।
Counter Balance—সমভার (করা)।
Counter Signature—প্রতিস্বাক্ষর।
Counter Foil—প্রতিপত্র।
Craft—কারু-শিল্প।
*Craft Guild—কারিগর সংঘ। ক. বি. '৫১
Credit—ধার।
*Credit Entry—জমার দাখিলা।
* „ Balance—উদ্বৃত্ত তহবিল।
„ Sale—ধারে বিক্রয়।
„ Note—খরচ চিঠি।
„ Purchase—ধারে ক্রয়।
* „ Voucher—জমা পত্র। ক. বি. '৬৫
Creditor—উত্তমর্ণ।
Criterion—নির্ণায়ক।
*Cultivation, Extensive—ব্যাপক চাষ।
* „ , Intensive—আত্যন্তিক চাষ, নিবিড় চাষ।
„ , Terrace—সোপান চাষ।
Cum-Dividend—লভ্যাংশসহ।
Currency—মুদ্রা।
*Currency Note—পত্র-মুদ্রা।
„ , Contraction of—মুদ্রা সংকোচন।
* „ , Deflation of— „
* „ , Devaluation of—মুদ্রা মূল্য হ্রাস।
* „ , Inflation of—মুদ্রা স্ফীতি।
* „ , Hard—দুর্লভ বৈদেশিক মুদ্রা।
* „ , Soft—সুলভ মুদ্রা। ক. বি. '৫৭, '৫৯ ; ব. বি. '৬৪
*Custom Duty—বহিঃ শুল্ক।
* „ House—মাশুল ঘর, শুল্কাগার।
*Customs Clearance—শুল্কাগারের মাল নিকাশ। ক. বি. '৬৫
* „ Entry—শুল্ক বিবরণ।
*Cycle of Trade—ব্যবসায় চক্র।

D.

Dam—বাঁধ।
Damages—ক্ষতি।
Data—উপাত্ত।
*Date of Maturity—(হুণ্ডি) ভাঙানোর তারিখ।
*Days of Grace—রেয়াতীকাল, অনুগ্রহ মেয়াদ। ক. বি. '৪৬
Dead Account—অচল হিসাব।
Dead Letter Office—অবিলি পত্রের দপ্তর।
„ Lock—স্থগিত অবস্থা।
Dead Loss—পুরা লোকসান।
„ Rent—সর্বনিম্ন কর।
„ Stock—অবিক্রেয় সম্ভার।
Dealer—ব্যাপারী।
„ , Retail—খুচরা বিক্রেতা।
„ , Wholesale—পাইকার।
Dealing Assistant—নির্বাহ-সহায়ক।
*Death duty—মৃত্যুকর। ক. বি. '৪৬, '৫৪
Debenture—ঋণপত্র।
* „ , Naked—বন্ধকহীন তমসুক। ক. বি. '৪৭
* „ , Mortgage—বন্ধকী ঋণপত্র।
* „ , Redeemable—পরিশোধ্য ঋণপত্র।
Debit—খরচ।
*Debit and Credit—জমা খরচ।

*Debit balance—ফাজিল বাকি, বিকলন-স্থিতি।
* „ note—খরচ চিঠা, ধার চিঠা। ক. বি. '৪৭, '৬১
„ side—খরচ খাতে।
* „ Voucher—খরচ চিঠা, ধার চিঠা।
*Debt, bad—অশোধ্য ঋণ, কু-ঋণ
„ , Conciliation of—ঋণ মীমাংসা
„ , Floating—চলতি ঋণ, অল্পকালীন ঋণ।
* „ , Liquidation of—ঋণ পরিশোধ।
* „ , Redemption of—ঋণ-মুক্তি।
* „ , Repudiation of—ঋণ অস্বীকৃতি।
*Debtor—অধমর্ণ।
Decentralisation—বিকেন্দ্রীকরণ।
Declared value—ঘোষিত মূল্য।
*Decreasing Return—হ্রাসমান আগম।
Deed—দলিল।
* „ of Agreement—চুক্তি পত্র।
* „ of Acquittance—মুক্তি পত্র।
„ of Gift—দান পত্র।
* „ of Lease—পাট্টা।
* „ of Mortgage—বন্ধকী পত্র।
* „ of Partition—বণ্টন নামা, অংশ নামা, বাঁটোয়ারা নামা।
„ of Partnership—অংশীদার পত্র।
„ of Sale—কবালা।
De facto—কার্যতঃ।
Defalcation—তহবিল তছরূপ।
*Deferred payment—বিলম্বিত পরিশোধ। ক. বি. '৬০
„ shares—বিলম্বিত শেয়ার।
Deficit—ঘাটতি, উনতা।
*Deficit financing—ঘাটতি ব্যয়। ক. বি. '৫৬, '৫৮, '৬০ ; গৌ. বি. '৬৫
*Deflation—অবসার, সংকোচন। ক. বি. '৪৮
De jure—আইনতঃ, বিধানতঃ।
Del credere commission—আশ্বাস দস্তুরি।
Deforestation—নির্বনীকরণ।
Delivery—প্রদান।
*Delivery Book—বিলি বহি, মাল খালাস বহি।
* „ , Express—দ্রুত বিলি।
*Demand draft—দর্শনী হুণ্ডি।
*Demand, Active—তেজী চাহিদা।
* „ , Alternative—বিকল্প চাহিদা।
* „ , Competitive—প্রতিযোগিতামূলক চাহিদা।
„ , Composite—মিশ্র চাহিদা।
„ , Continuous—অবিরাম চাহিদা।
„ , Definite—নিশ্চিত চাহিদা।
„ , Derived—উদ্ভূত চাহিদা।
„ , Elastic—পরিবর্তনশীল (বা স্থিতিস্থাপক) চাহিদা।
„ , Elasticity of—চাহিদার নম্যতা।
„ , Expansion of—চাহিদার প্রসারণ।
„ , Extension of—চাহিদার বিস্তার।
„ , Genuine—অকৃত্রিম চাহিদা।
„ , Inelastic—অনম্য চাহিদা, অস্থিতি-স্থাপক চাহিদা।
„ , Joint—সম্মিলিত (যুগ্ম) চাহিদা।

Demand, Marginal—প্রান্তিক চাহিদা।
„ , National—জাতীয় চাহিদা।
„ , Prospective—প্রতিশ্রুতিশীল চাহিদা।
„ , Reciprocal—পারস্পরিক চাহিদা। ক. বি. '৫৭
Democracy—গণতন্ত্র।
Democracy, Direct—প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র।
„ , Indirect—পরোক্ষ গণতন্ত্র।
„ , Representative—প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র।
*Demonetisation—মুদ্রাবিচ্যুতি, বিমুদ্রীকরণ। ব. বি. '৬২
Demonstration—প্রদর্শক, ব্যাখ্যাতা।
*Demurrage—গুণাগার, গহিরি, হর্জানা, বিলম্ব শুল্ক, ডেমারেজ। ক. বি. '৪৩, '৪৪, '৪৭, '৬১, '৬২; ব. বি. '৬৩
*Denomination of Value—মুদ্রা-মূল্য।
Denominator of value—মূল্য পরিমাপক।
Density of Population—লোকসংখ্যার ঘনত্ব।
*Department, Civil Supplies—জন সংভরণ বিভাগ।
„ , Finance—অর্থবিভাগ।
„ , Home—স্বরাষ্ট্র বিভাগ।
Departmental Store—বিভাগীয় বিপণি, বিভাগীয় ভাণ্ডার।
Depopulation—জনশূন্যকরণ, বিরল বসতি।
*Deposit—আমানত।
*Deposit insurance—আমানত বীমা।
*Depreciation—অবচয়।
Depreciation Fund—অবচয় পূরক তহবিল।
*Depression—মন্দা, অবনতি।
Depression of Market—বাজার মন্দী।
„ of Trade—ব্যবসায় মন্দী।
Deputation—প্রতিনিধিদল, প্রতিনিধ্য।
Deputy Director of Agriculture—উপ কৃষি-অধিকর্তা।
Deputy Magistrate—উপশাসক।
*Deputy Secretary—উপসচিব।
*Despatch—প্রেরণ।
Detention—নিরোধ, অবরোধ।
Devaluation—মূল্যহ্রাস। ক. বি. '৬০
Development—উন্নয়ন, বিকাশ, সম্প্রসার। ক. বি. '৫৩
„ Land—ভূমি-উন্নয়ন।
„ Loan—উন্নয়ণ-ঋণ।
„ Rural—পল্লী উন্নয়ন, গ্রামোন্নয়ন।
Differential Duties—ভেদাত্মক শুল্ক।
Dies Non—ছুটির দিন।
*Differential Duties—বিভেদাত্মক শুল্ক।
Diminishing Point—ক্রমহ্রাসমান বিন্দু।
„ Productivity—ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনশীলতা।
„ returns—ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন।
„ utility—ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতা।

Direct demand—প্রত্যক্ষ চাহিদা।
" tax—প্রত্যক্ষ কর।
" charge—প্রত্যক্ষ ব্যয়।
Director—পরিচালক, ডিরেক্টর।
" , Managing—কর্মাধ্যক্ষ।
Director Board—পরিচালক সংঘ।
Directors, Board of—পরিচালক সংঘ।
*Disarmament—নিরস্ত্রীকরণ।
*Disability Insurance—অসামর্থ্য বীমা। ব. বি. '৬২
*Disbursement—ব্যয়ন।
*Disbursing officer—ব্যয়নাধিকারিক।
Disbursement account—ব্যয়ের হিসাব।
Discharge—কার্যচ্যুতি, বরখাস্ত।
Discount—বাট্টা, ব্যাজ।
*Discount, Trade—কারবারী বাট্টা। ক. বি. '৬১, '৬২
*Discounting of Bills—বাট্টায় হুণ্ডি ভাঙান। ক. বি. '৪৪
*Dividend Warrant—লভ্যাংশপত্র।
*Dividend, Accumulated—সঞ্চিত লভ্যাংশ।
*" , Announced—ঘোষিত লভ্যাংশ।
* " , Interim—অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ।
" , National—জাতীয় লভ্যাংশ।
" , Non-Cumulative—অবর্ধমান লভ্যাংশ।
* " , Paying—প্রদায়ী লভ্যাংশ।
" , Unclaimed—অপ্রার্থিত লভ্যাংশ।
*Division of Labour—শ্রমবিভাগ।
Division of Labour, Territorial—আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ।
Dock Warrant—ডকের ক্ষমতাপত্র।
Dock Yard—পোতাশ্রয়।
Dockage—ডাক শুল্ক।
Doctrine—মতবাদ।
Document—দলিল, নথিপত্র।
Document of Title—স্বত্বাধিকার-পত্র।
*Dollar Reserve—ডলার সঞ্চয় [তহবিল]। ক. বি. '৫৮
*Domestic System—ঘরোয়া পদ্ধতি।
Double Account System—দো-তরফা হিসাব পদ্ধতি।
" Cropped Land—দোফসলী জমি।
" Dealing—দ্বৈত কারবার।
" Standard—দ্বিমান।
" Taxation—দ্বৈত কর।
*Draft—হুণ্ডির খসড়া।
*Drawback—ফেরত শুল্ক। ক. বি. '৪৩
*Drawee—হুণ্ডি গ্রাহক।
Drawer—হুণ্ডি প্রেরক।
Drive, Cloth—বস্ত্র অভিযান।
* " , Food—খাদ্য অভিযান।
Dry Farming—শুকনা চাষ-আবাদ।
Dumping—বিদেশে সস্তায় মাল রপ্তানি করা, ক্ষতি স্বীকার করিয়া বিদেশে মাল চালান।
Duplicate—প্রতিরূপ।
" Copy—অনুলিপি।
Duty—শুল্ক।
Duty, Ad valorem—মূল্যানুসার (বা মূল্যানুযায়ী) শুল্ক। ক. বি. '৪৭, '৫৯ ; ব. বি. '৬৩, '৬৪ ; গৌ. বি. '৬৫
* " , Customs—বাণিজ্য শুল্ক, বহিঃশুল্ক।

*Duty, Differential—বিভেদাত্মক শুল্ক।
* „ , Discriminating—প্রভেদাত্মক শুল্ক।
* „ , Death—মৃত্যুশুল্ক, মৃত্যুকর। ক. বি. '৪৬, '৫৪
„ , Estate—সম্পদ শুল্ক।
* „ , Excise—উৎপাদন শুল্ক, অন্তঃশুল্ক। ক. বি. '৪৯, '৫৮, '৬২, '৬৪, '৬৫
* „ , Export—রপ্তানি শুল্ক।
* „ , Import—আমদানি শুল্ক।
* „ , Preferential—পক্ষপাতমূলক শুল্ক। ক. বি. '৫৯
* „ , Probate—মৃত্যুপত্র শুল্ক।
„ , Productive—উৎপাদক শুল্ক।
* „ , Protective—সংরক্ষণ শুল্ক।

E.

Ear marked—নির্দিষ্ট।
*Earned Income—অর্জিত আয়।
Earned Leave—অর্জিত ছুটি।
*Earnest Money—বায়না, দাদন।
Easy market—অনুকূল বাজার।
Economic—আর্থিক, অর্থনৈতিক।
„ activity—আর্থিক প্রযত্ন।
* „ holding—স্বয়ংপূর্ণ জোত।
* „ Planning—অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।
* „ Rehabilitation—অর্থনৈতিক পুনর্বাসন। ক. বি. '৫৬
* „ structure—অর্থনৈতিক কাঠামো।
* „ welfare—আর্থিক কল্যাণ।
*Education, Commercial—বৈষয়িক (বা বাণিজ্যিক) শিক্ষা।
Education, Industrial—শিল্পশিক্ষা।
* „ , Technical—কারিগরি শিক্ষা।
Effect—প্রভাব, ফল।
Efficiency—দক্ষতা।
* „ Bar—নৈপুণ্য ধাপ।
* „ of Labour—শ্রমিকের কর্মকুশলতা, শ্রমপটুতা।
* „ of Money—অর্থের পটুতা।
*Ejectment—উচ্ছেদ।
*Elasticity of demand—চাহিদার স্থিতি-স্থাপকতা।
Electorate—নির্বাচক মণ্ডলী।
*Embargo—রোধ, আটক, নিষেধাজ্ঞা, বাণিজ্যাবরোধ। ক. বি. '৫০, '৬৩
*Embarkation permit—আরোহ পত্র।
*Emergency—জরুরী, সংকট, অত্যয়, আপৎকাল।
* „ Certificate—অত্যয় প্রমাণপত্র।
*Emigrant—প্রবসিত।
*Emigration—প্রবসন। ক. বি. '৬১
Employee—কর্মচারী।
*Employees' Provident Fund—কর্মচারীদের ভবিষ্য নিধি। ক. বি. '৫৪
*Employment Bureau—নিয়োগ সংস্থা।
*Employment, Full—পূর্ণ নিয়োগ। ক. বি. '৫০
*En bloc—একযোগে।
Endorse—পিছসহি করা, পৃষ্ঠাঙ্কিত করা।
*Endorsee—স্বত্বগ্রহীতা।

*Endorsement—স্বত্বান্তরকরণ, পৃষ্ঠাঙ্কন, পিছসহি। ক. বি. '৪৬

Endorser—সহিদাতা।

*Endorsement, Restrictive—নিয়ন্ত্রিত স্বত্বান্তরকরণ, প্রতিবন্ধকযুক্ত স্বত্বান্তরকরণ। ক. বি. '৫২

" , Special—বিশেষ স্বত্বান্তরকরণ।

*Endowment Assurance—মেয়াদী বীমা।

Enfranchisement—নির্বাচনাধিকার প্রদান।

Engineer, Civil—বাস্তুকার।

" , mechanical—যান্ত্রিক, যন্ত্রবিৎ।

Enterprise—উদ্যোগ, প্রচেষ্টা।

*Entertainment Tax—প্রমোদ কর। গৌ. বি. '৬৫

Entrepreneur—উদ্যোক্তা।

Entry—লেখ, দাখিলা।

* " , Contra—পালটা দাখিলা। ক. বি. '৬২

" , Single—একহরা বা একবারগী লিখন।

" , Double—দোহরা বা দ্বিবারগী লিখন।

Equitable Asset—ন্যায়ানুকূল সম্পদ।

Equipment—সরঞ্জাম।

*Excess profit tax—অতিরিক্ত মুনাফা কর। ক. বি. '৪৫

Establishment—সংস্থা, স্থাপন।

" Charges—সংস্থা ব্যয়াদি।

" Cost—বেতন-ব্যয়, সরঞ্জামী খরচ।

Estimate—অনুমান, প্রাক্কলন।

* " , Budget—আয়ব্যয়ক অনুমান।

*Estimate, Revised—সংশোধিত অনুমান।

* " , Supplementary—পরিপূরক অনুমান।

*Estimated Value—অনুমিত মূল্য।

Evacuation—উদ্বাসন।

Evacuee—উদ্বাস্তু।

*Evaluation—মূল্য নির্ধারণ।

*Evasion of Tax—কর ফাঁকি।

*Eviction—বহিষ্কার।

*Exchange, Foreign—বৈদেশিক বিনিময়। ক. বি. '৪৬

" , Produce—পণ্য বিনিময় কেন্দ্র।

*Exchange Rate—বিনিময় হার। ক. বি. '৪৯, '৫৯

" Ratio—বিনিময় অনুপাত।

Executive Engineer—নির্বাহী বাস্তুকার।

*Exemption—মুক্তি।

Ex-officio—পদ-হেতু, পদাধিকার বলে।

Ex parte—একতরফা, বাস্তকার।

Expenditure—ব্যয়।

* " , Recurring—আবর্তক ব্যয়।

Exploitation—শোষণ।

Export—রপ্তানি।

External trade—বহির্বাণিজ্য।

F.

*Face value—অভিহিত মূল্য, লিখিত মূল্য। ক. বি. '৫২

Facsimile—প্রতিরূপ।

Factory—কারখানা।

" Act—কারখানা আইন।

Fair—মেলা, উচিত, ন্যায্য।

" cash book—পাকা রোকড় বই।

Fair dealing—ন্যায্য লেনদেন।
„ ledger—পাকা খাতা।
„ price—ন্যায্য মূল্য।
„ Rent—ন্যায্য খাজনা, ন্যায্য ভাড়া।
Family Budget—পারিবারিক আয়ব্যয়।
„ Earnings—পারিবারিক রোজগার।
„ , Joint—যৌথ পরিবার।
* Famine Relief—দুর্ভিক্ষ ত্রাণ।
* Farming, Collective—যৌথ খামার।
* „ , Co-operative—সমবায় খামার।
„ , Mixed—মিশ্র খামার।
* Federal Finance—যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যবস্থা। ক. বি. '৫৫
* Feeder—উপনদী, উপবর্ত্ম, ভোজন-দাত্র।
Fertilizer—সার।
* Feudal System—সামন্ত প্রথা।
Fibres—তন্তু, আঁশযুক্ত মাল।
Fiduciary Issue—প্রত্যয়ী মুদ্রা। ক. বি. '৫৭
* „ Paper Money—দৃঢ়-প্রত্যয়ী পত্র-মুদ্রা।
Finance Act—অর্থ আইন।
„ Bill—অর্থ বিল।
„ Commission—রাজস্ব কমিশন।
„ Corporation—অর্থ নিগম।
„ Minister—অর্থমন্ত্রী।
* „ , Public—রাজস্ব বিজ্ঞান।
Financial Adviser—আর্থিক উপদেষ্টা।
„ Control—আর্থিক নিয়ন্ত্রণ। ক. বি. '৫৫

Financial Crisis—আর্থিক সংকট।
* „ House—অর্থ সংক্রান্ত বাণিজ্যাগার।
Financial Year—আর্থিক বর্ষ।
* Fiscal Policy—রাজস্ব নীতি।
Fiscal reliefs—করভার হ্রাস।
* Floating charges—চলতি সম্পদ বন্ধক।
* Floating of a Company—কোম্পানীর পত্তন।
Flow of Capital—পুঁজির প্রবাহ।
* Fluctuation—উঠানামা, সংকোচ-প্রসার।
Folio—পত্রাঙ্ক পৃষ্ঠা।
* Forced Currency—অস্বাভাবিক অধিকার বলে প্রচলিত মুদ্রা।
* „ Labour—বাধ্যতামূলক শ্রমদান, বেগার।
Forecast—পূর্বানুমান।
* Fore closure—স্বত্ব রহিতকরণ। ক. বি. '৬৪
Foreign Affairs—বৈদেশিক ব্যাপার।
Foreman—অধিকর্মিক।
Forest, Coniferous—সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন।
* „ , Reserve—সংরক্ষিত অরণ্য।
Forester—বনকর্মী।
Forfeiture—বাজেয়াপ্ত করণ।
Forgery—জাল করণ।
Form—প্রপত্র, ফরম, ফর্মা, আকার।
Formal—নিয়ম মাফিক।
Forum—সভা, বিচারালয়।
* Forward Exchange—অগ্রিম বিনিময়, আউতি বিনিময়।
* „ Exchange Contract—বিনিময়ের আউতি [অগ্রিম] চুক্তি।

Forward Purchase—আউতি [অগ্রিম] সওদা।
*Fragmentation of Holdings—জোতের খণ্ডীকরণ।
Free Competition—অবাধ প্রতিযোগিতা।
„ Delivery – অবাধ অর্পণ।
„ Mintage—অবাধ মুদ্রা ঢালাই।
„ Trade—অবাধ বাণিজ্য।
*Free port—পণ্যশুল্কহীন বন্দর, অবাধ বন্দর।
*Freight—মালের ভাড়া, মালের মাশুল। ক. বি. '৪৬
„ Note—চালানী রসিদ।
* „ , Pro Rata—সমানুপাতিক মাশুল। ক. বি. '৬৫
Fund—তহবিল, কোষ, নিধি।
*Fund, Annuity—বার্ষিক বৃত্তি তহবিল। ক. বি. '৪৯, '৫৭
* „ , Consolidated—একত্রীকৃত তহবিল। ক. বি. '৬৭
* „ , Contingency—নৈমিত্তিক তহবিল। ক. বি. '৫৬, '৫৮
* „ , Provident—ভবিষ্য নিধি।
* „ , Reserve—সংরক্ষিত তহবিল।
* „ , Redemption—ঋণমুক্তি তহবিল।
* „ , Sinking—কর্জশোধ তহবিল, ঋণ-শোধক তহবিল। ক.বি '৫২.'৬৩
Funded debt—স্থায়ী ঋণ।
*Future Transaction—মুদ্দতী লেনদেন।
*Futures—আউতি [অগ্রিম] কেনাবেচা।

G.

Gain—লাভ।
Gambling—জুয়া।
General Acceptance—সর্তহীন সাকরাণ।
* „ Manager—সাধারণ কর্মাধ্যক্ষ।
„ Meeting – সাধারণ অধিবেশন।
* „ Price Level—সাধারণ পণ্যের মূল্যস্তর। ক. বি. '৪৮
Genuine Demand—প্রকৃত চাহিদা।
*Gilt-edged—স্বর্ণ তুল্য।
* „ Bill- সাহুকারী হুণ্ডি।
* „ Security - সর্বোত্তম ঋণপত্র।
*Glut of Capital—পুঁজির প্রাচুর্য।
Godown—গুদাম।
*Gold Bullion Standard—স্বর্ণপিণ্ড মান।
* „ Bond—কাঞ্চন পত্র।
Gold Currency—স্বর্ণমুদ্রামান।
* „ Exchange Standard— স্বর্ণ-বিনিময় মান।
* „ Reserve Fund—স্বর্ণ সংরক্ষণ তহবিল।
* „ Standard—স্বর্ণমান। ক. বি. '৫৮
*Gold Standard Reserve— স্বর্ণমান সংচিতি। ক. বি. '৪৮
*Goods, Bonded—শুল্কাধীন মাল।
„ , Consumers'—ভোগ্য সামগ্রী।
* „ , Economic—অর্থনৈতিক মাল।
„ , Finished—তৈরী মাল, পাকা মাল।
„ , Free—নিঃশুল্ক মাল।
„ , Manufactured—শিল্পজাত বস্তু।
*Goods, Productive—উৎপাদক মাল।

Goods, Unproductive—অনুৎপাদক মাল।
Governing Body—পরিচালক বর্গ।
*Government Paper—সরকারী কাগজ।
Government, Central—কেন্দ্রীয় সরকার।
" , Federal—যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার।
" , Interim—অন্তর্বর্তী সরকার।
" , State—রাজ্যসরকার।
" , Unitary—কেন্দ্রীভূত সরকার।
Gradation—পর্যায়ক্রম, ক্রমায়ণ।
Graded—পর্যায়িত।
*Grading—পর্যায় করণ।
*Graduated Tax—ক্রমবর্ধমান কর।
Granary—শস্যাগার, শস্যভাণ্ডার।
Grant—অনুদান।
" , Supplementary—পরিপূরক অনুদান।
*Grant-in-aid—সহায়ক অনুদান।
*Gratuity—আনুতোষিক।
*Ground Ranching—পশুপালন ক্ষেত্র।
Gross Produce—মোট উৎপাদন।
" Profit—মোট মুনাফা।
Guarantee—প্রত্যাভূতি
*Guild—সংঘ। ক. বি. '৬৪
" Socialism—শ্রেণীগত সমাজতন্ত্র।
Gunny Bag—থলে বস্তা।

H.

Halting Allowance—বিরাম অধিদেয়।
Hand bill—ইস্তাহার।
*Handicraft—হস্তশিল্প।
ক. বি. '৪৫ ; ব. বি. '৬২
*Hand loom—হস্তচালিত তাঁত।
" note—হাত-চিঠা।
Hawker—ফেরীওয়ালা।
Haves—বিত্তশালী।
Have-nots—নিঃস্ব।
Head quarters—মুখ্যস্থান, সদর।
*Hereditament—মৌরস, পৈতৃক বিত্ত।
Higgling—দর কষাকষি।
*Hire purchase ঠিকা সওদা।
ক. বি. ৪৮, '৪৯
*Hire purchase system—ঠিকা সওদা পদ্ধতি। গৌ. বি. '৬৫
Holding—জোত।
*Home charges—বিলাতের দক্ষিণা।
ক. বি. '৪৮
* " consumption—দেশের উপভোগ।
*Honorarium—দক্ষিণা।
House building society—গৃহ নির্মাণ সমিতি।
Husbandry—কৃষিকর্ম।
Hush money—ঘুষ।
*Hydro-electric—জলবিদ্যুৎ।
*Hypothecation—বন্ধক। ক. বি. '৬৪
" , Letter of—বন্ধকপত্র।

I.

Identity—পরিচয়।
Identification—সনাক্তকরণ।
Illegal contract—অবৈধ চুক্তি।
*Immigration—অভিবাসন।
Immovable—স্থাবর।
*Immunity—অব্যাহতি।
*Immunity from Taxation—কর-অব্যাহতি
*Impact of taxes—কর সংঘাত।

*Imperial preference—সাম্রাজ্যিক পক্ষপাত।

Import - আমদানি।

* „ duty—আমদানি শুল্ক।

* „ quota আমদানি বরাদ্দ। ক. বি. '৫১।

Import Gross—মোট আমদানি।

*Imports, Development—উন্নয়ন-মূলক আমদানি।

* „ , Maintenance—সংরক্ষণ-মূলক আমদানি।

Imported—আমদানিকৃত।

*Imprest account—অগ্রদত্ত অর্থের গণিতক।

*Imprest money—অগ্রদত্ত অর্থ, স্থায়ী জিম্মার অর্থ।

*Imprest Stock—জিম্মা-মজুত।

Incentive—প্রয়োজক।

*Incidence (of tax)—করভার।

*Incidental—আনুষঙ্গিক, প্রাসঙ্গিক।

Income—আয়।

* „ and expenditure—আয়-ব্যয়ের হিসাব।

„ tax—আয়কর।

*Income, per capita—মাথা পিছু আয়।

„ , National—জাতীয় আয়।

„ , Annual—বাৎসরিক আয়, সালিয়ানা।

„ , Net—নীট আয়।

„ , Real—খাঁটি আয়, বাস্তব আয়।

„ , Unearned অনুপার্জিত আয়।

Inconvertible Paper Money—অবিনিমেয় পত্র-মুদ্রা, অপরিশোধনীয় পত্র-মুদ্রা।

Incorporated—বিধিবদ্ধ, নিগমবদ্ধ।

Increasing Return—ক্রমবর্ধমান আগম।

Increase of Demand—চাহিদা বৃদ্ধি।

„ of Supply—যোগান বৃদ্ধি।

*Increment, Unearned—অনুপার্জিত আয়বৃদ্ধি বা অনুপার্জিত মূল্য-বৃদ্ধি। গৌ. বি. '৬৫

Indemnity—খেসারত, ক্ষতিপূরণ। ক. বি. '৬১, '৬২; ব. বি. '৬৩

„ Bond—ক্ষতিপূরণ পত্র।

*Indent—সংভৃতিপত্র, সংভৃতক।

„ , Direct—সরাসরি মাল চালান।

„ , Pending—বিলম্বিত মাল চালান।

*Index Number—সূচক সংখ্যা, মূল্য-সূচী। ক. বি. '৫১; ব. বি. '৬১, '৬৪।

„ Register—সূচী-নির্বন্ধ।

Indigenous Bank—দেশীয় ব্যাঙ্ক।

„ Capital—দেশীয় মূলধন।

Indirect Tax—পরোক্ষ কর।

„ Utility—পরোক্ষ উপযোগিতা।

Indo-British Agreement—ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্য-চুক্তি।

Indorse a Bill—হুণ্ডিহস্তান্তর করণ।

Idorsement—পিছসহি।

Industrial—শিল্পবিষয়ক।

Industrial Committee—শিল্প-সমিতি।

Industrial Crisis—শিল্প-সংকট।

* „ Depression—শিল্প-মন্দা।

„ Efficiency—শিল্প-দক্ষতা।

„ Expansion—শিল্প-প্রসার।

„ Bank—শিল্প-ব্যাঙ্ক।

„ Housing—শিল্প-শ্রমিকের গৃহ নির্মাণ। ক. বি. '৫৪; ব. বি. '৫৩

Industrial Revolution—শিল্প-বিপ্লব।
" Tribunal—শিল্প-আদালত, শিল্প-ন্যায়পীঠ। ক. বি. '৪৯, '৫৮
Industrialisation—শিল্পায়ন; শিল্প-যোজন।
Industrialist—শিল্পপতি।
Industrialised—শিল্পায়িত।
Industry—শিল্প, শ্রমশিল্প।
*Industry, Basic—মূল শিল্প।
" , Chemical—রসায়ন শিল্প।
" , Complementary—অনুপূরক শিল্প।
" , Cottage—কুটির-শিল্প।
" , Home—গৃহশিল্প।
" , Infant—শিশুশিল্প।
" , Key—মূলশিল্প, বনিয়াদী শিল্প
" , Large Scale—বৃহদায়তন শিল্প।
" , Small Scale ক্ষুদ্রায়তন শিল্প।
" , Subsidiary—গৌণ শিল্প।
" , Supplementary—পরিপূরক শিল্প।
Inefficient Labour—অনিপুণ শ্রম।
Inelastic Demand—অনম্য চাহিদা।
" Supply—অনম্য যোগান।
Inequality of Wealth—সম্পদের অসাম্য, আর্থিক বৈষম্য।
Infant Mortality—শিশু মৃত্যু।
*Inflation—উৎসার, সম্প্রসারণ, মুদ্রাস্ফীতি। ক. বি. '৪৫, '৫৪
" of Currency—মুদ্রাস্ফীতি বা সম্প্রসারণ।

Informal—অনুপচারিক।
Informer—গুপ্তচর।
Ingot—ধাতুপিণ্ড।
Inheritance—উত্তরাধিকার, দায়।
Inhibition—নিষেধ।
Initials—সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর।
Injunction—নিষেধাজ্ঞা।
Inland—অন্তর্দেশ, অন্তর্দেশীয়।
Innovation—নব পরিবর্তন।
Insatiable Want—অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা।
*Insolvency Act—দেউলিয়া আইন।
Insolvent—দেউলিয়া।
*Instalment—কিস্তি।
*Installation—স্থাপন, স্থাপিত-যন্ত্র।
*Insurance Policy—বীমাপত্র।
Insurance, Accident—দুর্ঘটনা বীমা।
* " , Disability—অসামর্থ্য বীমা। ব. বি. '৬২
" , Endowment—মেয়াদী বীমা।
" , Fire—অগ্নিবীমা। ক. বি. '৪৬
" , Indemnity—ক্ষতিপূরণ বীমা।
" , Marine—নৌবীমা, সামুদ্রিক বীমা। ক. বি. '৪৪, '৬১
" , Old Age—বার্ধক্য বীমা।
" , Whole Life—আজীবন বীমা।
" , Workmen's—শ্রমিক বীমা।

Intake—অন্তঃগ্রহণ।
Intensity of demand—চাহিদার প্রাবল্য।
" of supply—যোগানের প্রাবল্য।

*Inter alia—সংযোগে।
Interest—সুদ, কুসীদ।
, compound—চক্রবৃদ্ধি।
ক. বি. '৬২, '৬৪
, gross—মোট কুসীদ।
, landed—ভূসম্পত্তিজড়িত-স্বার্থ।
, vested—কায়েমী স্বার্থ।
, net—নীট সুদ।
*Interim Dividend—মধ্যবর্তীকালীন লভ্যাংশ।
Internal Trade—অন্তর্বাণিজ্য।
Inter-state Trade—আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য।
Integral—অখণ্ড।
Integrity—অখণ্ডতা, ঐক্য।
*Intrinsic value—স্বকীয় মূল্য, নিহিত মূল্য।
Inundation canal—বন্যাপুষ্ট খাল।
*Inventory—তালিকা, দফাওয়ারী ফর্দের তালিকা। ক. বি. '৬৪
Inverse ratio—বিপরীত হার।
*Investment—বিনিয়োগ, লগ্নী।
ক. বি. '৫০
Investment of capital—মূলধন বিনিয়োগ, মূলধন নিয়োগকরণ।
Investigation—অনুসন্ধান, গবেষণা।
*Invoice—চালান, জায়।
Irrigation dept—সেচ বিভাগ।
Irrigation—জল সেচ, সেচ।
*Irrigation project—সেচ পরিকল্পনা।
Issue—প্রেরণ, প্রচার।
Issued capital—বিলিকৃত মূলধন।
Item of expenditure—ব্যয়পদ, খরচের দফা।

J.

Jailor—কারাপাল, কারাধ্যক্ষ।
Jeweller—মণিকার, জুয়েলার।
Jobber—ঠিকাদার, দালাল।
Job work—খুচরা কাজ।
„ printing—খুচরা ছাপাই।
Joint—যৌথ, মিলিত, সংযুক্ত, এজমালী।
„ Account—সম্মিলিত হিসাব, যৌথ হিসাব।
„ Adventure—যৌথ উদ্যোগ।
„ Demand—সংযুক্ত চাহিদা।
„ Efforts—সংযুক্ত প্রয়াস।
„ Estate—এজমালি সম্পত্তি।
„ Family—একান্নবর্তী পরিবার।
„ Liability—যৌথ দায়িত্ব।
„ Life Annuity—সম্মিলিত আজীবন সালিয়ানা।
„ Owners—সহ-মালিক।
„ Ownership—যৌথ মালিকানা, সহমালিকানা।
* „ Stock Company—যৌথ কারবার, যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠান।
*Journal—জাবেদা খাতা।
Judgment Creditor—ডিক্রী পাওনাদার।
„ Debtor—ডিক্রী দেনাদার।
*Jurisdiction—অধিকার ক্ষেত্র, এলাকা। ব. বি. '৬১
*Jute Future Market—পাটের মুদ্দতী বাজার, পাটের আখের বাজার। ক. বি. '৪৪

K.

*Kartel—বণ্টন জোট, মূল্য নিয়ন্ত্রণ সংঘ, কার্টেল।

*Keelage—বন্দরস্থ জাহাজী শুল্ক।
*Keeper of Records—লেখ্যপাল, মোহাফেজ।
*Kind, Payment in—বস্তু বিনিময়।
*Kite—সুপারিশী হুণ্ডি।
*Kite Flying—সুপারিশী হুণ্ডি কাটা।

L.

*Labour—শ্রম, শ্রমিক।
* " Bureau—শ্রমিক সংস্থা।
* " Dispute—শ্রমিক বিরোধ।
* " Union—শ্রমিক সংঘ। ক. বি. '৫২
* " Welfare—শ্রমকল্যাণ। ক. বি. '৫৪
* " Saving machine—শ্রম লাঘব যন্ত্র।
" , Productive—ফলপ্রসূ শ্রম।
" , Unproductive—নিস্ফল শ্রম।
" , Skilled—দক্ষ শ্রমিক।
*Laisseze faire—অবাধ-বাণিজ্য নীতি, অবাধ নীতি।
*Land Acquisition Collector—ভূমিগ্রহ সমাহর্তা। ব. বি. '৬১
" Alienation Act—ভূমি হস্তান্তর আইন।
*Land Policy—ভূমি নীতি। ক. বি. '৫৩
" Revenue—ভূমি রাজস্ব।
" Survey—জরীপ।
" Mortgage bank—জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক।
" Tax—ভূমি কর।
" Tenure—প্রজাস্বত্ব।
" , System—প্রজাস্বত্ব প্রথা।
" , Arable—কর্ষণযোগ্য জমি।
Land, Barren—অনুর্বর জমি।
" , Boggy—জলা জমি।
" , Cultivated—আবাদী জমি।
" , Fallow—পতিত জমি।
" , Fertile—উর্বরা জমি।
" , Irrigated—জলসেচপ্রাপ্ত জমি।
* " , Nationalisation—জমির রাষ্ট্রায়ত্ত করণ।
" , Rent-free—নিষ্কর জমি।
" , Waste—পতিত জমি।
Landed Interest—ভূমি স্বার্থ।
Landing—মাল নামান, অবতরণ।
*Landing permit—অবরোহ পত্র।
Lapsed—বাতিল, খেলাপ।
*Lapsed Policy—বাতিল বীমাপত্র।
*Large Scale Production—বহুল উৎপাদন।
Law of Supply and Demand—যোগান ও চাহিদা-বিধি।
" " Derived Demand—উদ্ভূত চাহিদা-বিধি।
" " Diminishing Demand—ক্রমহ্রাসমান চাহিদা-বিধি।
* " " Diminishing Return—ক্রমহ্রাসমান আগম-বিধি।
* " " Diminishing Utility—ক্রমহ্রাসমান উপযোগ-বিধি।
" " Increasing Return—ক্রমবর্ধমান আগম-বিধি।
" " Increasing Utility—ক্রমবর্ধমান উপযোগ-বিধি।
*Laws of Marginal Utility—প্রান্তিক উপযোগ-বিধি।
Law, Civil—দেওয়ানী আইন।
" , Commercial—বাণিজ্যিক ব্যবহারশাস্ত্র, সওদাগরী আইন।

Law, Company - কোম্পানী আইন।
" , Criminal—ফৌজদারী আইন।
" , International—আন্তর্জাতিক বিধি।
" , Martial—সামরিক আইন।
" , Tenancy—প্রজাস্বত্ব আইন।
League of Nations—জাতি সংঘ।
Lease—ইজারা, লীজ, পাট্টা।
Ledger—খতিয়ান বহি।
* " Folio—খতিয়ান পত্রাঙ্ক।
* " Entry—খতিয়ানের দাখিলা, খতিয়ানের হিসাব তোলা।
*Legal Tender—বিহিত মুদ্রা, বৈধ মুদ্রা।
Legislative Assembly—বিধানসভা।
" Council—বিধান পরিষদ।
Leisure class - শ্রমবিমুখ গোষ্ঠী।
*Letter of Allotment—বিলিকরণ পত্র, অংশবণ্টন পত্র।
" " Attorney—আমমোক্তার-নামা।
* " " Credit —আকল পত্র, প্রত্যয় পত্র। ক. বি. '৪৫
" " Guarantee—জামিন-পত্র।
* " " Hypothecation—বন্ধকী-পত্র। ক. বি. '৪৫
* " " Indemnity—খেসারত-পত্র।
Letter of Indication—অভিজ্ঞান-পত্র।
" " Instruction - নির্দেশপত্র।
* " " Introduction—পরিচয়-পত্র।
* " " Licence—অনুমতি-পত্র।
" " Renunciation—স্বত্বত্যাগ-পত্র।

*Levy—উদ্‌গ্রহণ, আরোপণ।
Liability—দায়, দেনা।
" , Contingent—সম্ভাব্য দায়।
* " , Limited—সীমাবদ্ধ দায়।
" , Unlimited—সীমাহীন দায়।
" , Outstanding—অপরিশোধিত দেনা।
Liaison Officer—সংযোগাধিকারিক।
License—অনুজ্ঞাপত্র।
Licensee—অনুজ্ঞাধারী।
Licensing officer—অনুজ্ঞাপত্র আধিকারিক।
Lien—পূর্বস্বত্ব।
*Life Annuity—আজীবন বার্ষিক বৃত্তি। ক. বি. '৫০
" Assurance—জীবন বীমা।
Liquidation—অবসায়ন, কারবার গুটান।
*Liquidator—অবসায়ক, দেউলিয়া নিকাশকারী। ক. বি. '৪৩, '৪৫
*Livestock—পশুসম্পদ, পশুধন।
Living, Cost of—জীবনযাত্রার ব্যয়।
Loan, Capital—ঋণকৃত পুঁজি।
" , Long term—দীর্ঘমেয়াদী ঋণ।
" , Short term—অল্পমেয়াদী ঋণ।
" , Public—রাষ্ট্রীয় ঋণ।
" , Secured—নিরাপদ ঋণ।
* " , Unsecured—বন্ধনহীন ঋণ। ক. বি. '৫২, '৬১
Lobby—উপশালা।
Localisation—একদেশতা, স্থানীয়করণ।
" of industries—শিল্পের একদেশতা।
*Lockout—বহিষ্কার, কারবার স্থগিত।
Loco price—উৎপাদনস্থানে পণ্যমূল্য।
Loss, Consequential—পরোক্ষ ক্ষতি।

M.

Machinery—কলকব্জা।
Magnitude—মান, পরিমাণ, মাত্রা।
Mail Order Business—ডাকে কারবার।
Maintenance cost—পোষণ ব্যয়।
Mala fide—প্রবঞ্চনামূলক।
Maldistribution of Wealth—সম্পদের বণ্টন বৈষম্য।
*Malfeasance—সরকারীকার্যে ত্রুটি।
Malpractices—অনাচার, অসদুপায় অবলম্বন, অবৈধ কার্যকলাপ।
Management—পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা।
* „ , Corporate—যৌথ পরিচালনা, সংঘবদ্ধ পরিচালনা। ক. বি. ৫২
Manager—ব্যবস্থাপক।
*Managing Agent—নির্বাহী নিযুক্তক। ক. বি. '৬২
„ Committee—পরিচালন সমিতি।
„ Director—নির্বাহী পরিচালক।
*Manifest—জাহাজের মালের চালান।
Manifesto—ঘোষণা পত্র।
Manipulation of Accounts—হিসাবের কারসাজি, কৌশলে হিসাবের হেরফের।
Manorial System—মহলওয়ারী প্রথা।
Manufacture—নির্মাণ, উৎপাদন, শিল্পজাত পণ্য।
Margin of Profit—মুনাফার সীমা, লাভের পরিমাণ।
Marginal—প্রান্তিক, প্রান্তীয়, সীমান্ত।
Marginal Cost—প্রান্তিক ব্যয়।
Marginal Price—প্রান্তিক মূল্য।
* „ Profit—প্রান্তিক মুনাফা।
* „ Productivity—প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা।
„ Utility—প্রান্তিক উপযোগ।
Market—বাজার, হাট।
*Market Fluctuation—বাজারের উঠা-নামা।
„ Price—বাজার দর।
*Market, Active } তেজী বাজার,
* „ , Brisk } গরম বাজার।
* „ , Depressed } নরম বাজার
* „ , Dull }
„ , Easy—অনুকূল বাজার।
* „ , Money—হুণ্ডির বাজার, টাকার বাজার। ক বি. '৫১
*Market, Sagging—দমে-যাওয়া বাজার।
* „ , Tight—চাপা বাজার।
*Marketable Goods—পণ্য সামগ্রী, ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য বস্তু।
Marketing—বিপণন।
Mass Deputation—গণ-প্রতিনিধ্য।
*Master Plan—শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা, বিশাল পরিকল্পনা।
Material Prosperity—পার্থিব উন্নতি।
Maturity of Bill—হুণ্ডির মেয়াদ পূর্তি।
*Maturity, Date of—মুদ্দতী হুণ্ডির মেয়াদী তারিখ।
*Mean, Arithmetic—যোগোত্তর মাধ্যম।
* „ , Geometric—গুণোত্তর মাধ্যম।
Means of Subsistence—জীবিকা।
„ of Transportation—পরিবহণ ব্যবস্থা।

Mechanical—যান্ত্রিক, যন্ত্রীয়।
Medium—মাঝারি, মাধ্যম।
*Medium of Exchange—বিনিময়ের মাধ্যম। ব. বি. '৬১
*Memo—খোকা, স্মার, স্মারক।
*Memorandum—স্মারক লিপি।
" of association—পরিমেল-বন্ধ।
Mercantile Agent—বাণিজ্য প্রতিনিধি।
* " Marine—পণ্যবাহী নৌবহর।
Merchant Vessel—পণ্যবাহী জাহাজ।
Merchant, Export—রপ্তানিকারক সওদাগর।
" , General—সাধারণ সওদাগর।
" , Import—আমদানিকার সওদাগর।
"Metropolitan Scheme—মহানাগরিক পরিকল্পনা।
*Migration of Labour—মজুরের স্থানান্তর গমন।
*Milling—মুদ্রার কিনারায় খাঁজকাটা।
Minimum Wage—নিম্নতম মজুরী।
* " " Act—নিম্নতম মজুরী আইন।
Minister in charge—ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।
Minister, Cabinet—পূর্ণ মন্ত্রী।
" , Chief—মুখ্যমন্ত্রী।
" , Deputy—উপমন্ত্রী
" , Prime—প্রধান মন্ত্রী।
" , State—রাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী।
Ministry of Agriculture—কৃষিমন্ত্রক।
" of Commerce—বাণিজ্যমন্ত্রক।
" of Defence—প্রতিরক্ষা (বা দেশরক্ষা)-মন্ত্রক।

Ministry of Education—শিক্ষামন্ত্রক।
* of External Affairs & Commonwealth Relations —পররাষ্ট্র ও কমনওয়েল্থ্ মন্ত্রক
" of Finance—অর্থমন্ত্রক।
" of Health—স্বাস্থ্যমন্ত্রক।
* " of Home Affairs—স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।
* " of Industries & Supplies শিল্প ও সংভরণ মন্ত্রক।
* " of Information and Broadcasting—তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক।
* ,, of Labour—শ্রমমন্ত্রক।
,, of Law—আইনমন্ত্রক।
,, of Railways—রেলযানমন্ত্রক।
,, of States—রাজ্যমন্ত্রক।
Ministry of Transport—পরিবহণমন্ত্রক।
*Mintage—টাঁকশালী শুল্ক।
*Mint par—টাঁকশালী দর।
*Minute Book—কার্যবিবরণী বহি।
Misappropriation—আত্মসাৎকরণ।
*Misfeasance—বৈধ ক্ষমতার অপব্যবহার।
*Mobilisation—সৈন্য যোজন।
*Modus operandum—কার্য প্রণালী।
Money market—টাকার বাজার। ক. বি. '৫১
,, order—অর্থ প্রেরণ।
Money, Appreciation of—অর্থের অপচয়।
" , Consideration—প্রতিলাভ অর্থ।
* ,, , Convertible—পরিবর্তন-যোগ্য মুদ্রা। ক. বি. '৬০

*Money, Cheap—সুলভ মুদ্রা। ক. বি. '৫৫

* ,, , Depreciation of—অর্থের অপচয়।

* ,, , Earnest—বায়না।

* ,, , Fiat—অবিনিময় পত্র-মুদ্রা।

,, , Hard—কাঁচা মুদ্রা।

,, , Paper—কাগজী মুদ্রা।

,, , Ready—নগদ টাকা।

,, , Token—নিদর্শক মুদ্রা।

,, , in circulation—চলিত অর্থ।

*Monometallism—একধাতুমান।

*Monopoly—একচেটিয়া। ক. বি. '৬২

* ,, , Absolute—পূর্ণ একাধিকার।

Monopoly, Price—একচেটিয়া মূল্য।

Moratorium—সাময়িক ঋণ-রেহাই, বাণিজ্যিক লেনদেন বিরতি। ক. বি. '৫২

Mortgage—বন্ধক।

Mortgage debenture—বন্ধকী ঋণপত্র।

Mortgagee—বন্ধক গ্রাহী।

Mortgagor—বন্ধকদাতা।

Motivation—প্রেষণা।

Multipurpose—সর্বার্থসাধক।

" Co-operative Society—সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি।

" River Schemes—বহুমুখী নদীপ্রকল্পসমূহ। ক. বি. '৫৫

*Multi-lateral Trade—বহুমুখী বাণিজ্য।

Municipality—পৌরসভা।

*Munition—সমর-সামগ্রী।

*Mutation—নামজারি করা, নামান্তর করণ।

*Mutation clerk—নামান্তর করণিক, নামজারি করণিক, দাখিল খারিজ করণিক।

*Mutual Agreement—পারস্পরিক চুক্তি।

N.

*Naked Debenture—বন্ধকহীন ঋণপত্র।

Name Day (Stock Exchange)—টিকিট দিন।

*National Debt—জাতীয় ঋণ।

* " Defence Fund—জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল। ব. বি. '৬৩

" Demand—রাষ্ট্রীয় চাহিদা, জাতীয় চাহিদা, জাতীয় দাবী।

" Economy—রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা।

" Expenditure রাষ্ট্রীয় ব্যয়।

* " Income—জাতীয় আয়।

National Income calculation—জাতীয় আয় পরিগণনা।

" Labour—জাতীয় শ্রম।

" Prosperity জাতীয় সমৃদ্ধি।

* " Savings Organisation—জাতীয় সঞ্চয়-সংস্থা।

* " Wealth—জাতীয় সম্পদ।

*Nationalisation—রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, রাষ্ট্রীয় করণ। ক. বি. '৫৫

* " of Land—ভূসম্পত্তির রাষ্ট্রায়ত্ত করণ।

* " of Industries—শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্ত করণ। ক. বি. '৪৯

Natural—প্রাকৃতিক।

" Goods—প্রাকৃতিক বস্তু।

* " Resources—প্রাকৃতিক সম্পদ।

Naturalisation—নাগরিককরণ, দেশীয়করণ।

Navigable—নাব্য, নৌপরিবহণশীল।

Navigability—নাব্যতা, নৌপরিবহণশীলতা।

Navigation—নৌপরিবহণ।

Navigation canal—নাব্য খাল।
* " Establishment—নৌ-সংস্থা।
* " Law—সমুদ্র বিধি।
*Navigation, Inland—আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ।
Necessaries—আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি।
*Negotiable Instrument—সম্প্রদেয় পত্র। ক. বি. '৪৬, '৫৭; ব. বি. '৬৪
*Negotiable Instrument Act—সম্প্রদেয় পত্র আইন। ক. বি. '৬২; ব. বি. '৬৩
*Negotiate a Bill—হুণ্ডি ভাঙ্গানো।
Negotiator—কথাবার্তা-চালক।
Net—নীট্, আসল, পাকা।
Neutral—নিরপেক্ষ।
*Neutrality Pact—নিরপেক্ষতা চুক্তি।
Nomination—মনোনয়ন।
*Non-acceptance—অস্বীকৃতি।
*Non-alignment—নিরপেক্ষতা।
*Non-business day—ছুটির দিন।
Non-feasance—কর্তব্য-ত্রুটি।
Non-metallic—অধাতব।
*Non-productive—অনুৎপাদক।
*Non-recurring Expenditure—অনাবর্তক ব্যয়।
*Non-transferable—অহস্তান্তরযোগ্য।
*Notary Public—লেখ্য প্রামাণিক।
Note Sheet—মন্তব্য পত্র।
Note, Bank—ব্যাঙ্ক নোট।
* " , Govt. Promissory—সরকারী ঋণপত্র।
Notice—নোটিশ, বিজ্ঞপ্তি।
Notification—বিজ্ঞপ্তি, প্রজ্ঞাপত্র।
Notify—বিজ্ঞাপ্তিত করা।
Novice—নবীশ।
*Null and void—বাতিল ও বে-আইনী।
Nullify—বাতিল করা।

O.

Oath—শপথ।
Objective Value—ব্যবহারিক মূল্য।
Obligation—ঋণ, দায়, বাধ্যবাধকতা
Obsolescence—পুরাতন যন্ত্রের মূল্যহ্রাস (নূতন যন্ত্র আবিষ্কার হেতু)।
*Occupancy Right—দখলীস্বত্ব, মৌরসীস্বত্ব।
Occupant—দখলীকার।
Occupation—পেশা, উপজীবিকা।
*Octroi Duty—চুঙ্গি, দ্বারাদেয় শুল্ক। ক. বি. '৫৮, '৬০; ব. বি.'৬১
Office—করণ, কার্যালয়, অফিস, পদ।
*Officer-in-charge—আযুক্ত বা ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক।
*Officer, Administrative—প্রশাসন আধিকারিক।
* " , Disbursing—ব্যয়নাধিকারিক।
* " , Gazetted—ঘোষিত আধিকারিক।
* " , Public Relations—গণসংযোগ আধিকারিক।
* " , Rationing—সংবিভাগ আধিকারিক।
Officer, Special—প্রাধিকারিক।
" , Transport—পরিবহণ আধিকারিক।
*Official Assignee—সরকারী তত্ত্বাবধায়ক। ব. বি. '৬২
*Officiating—স্থানাপন্ন।
On Approval—পরীক্ষার্থ।

*On Cost—পরোক্ষ পড়তা।
Open Market—খোলাবাজার।
*Optimum—বাঞ্ছনীয়তম, কাম্য।
Optimum Population—কাম্য জনসংখ্যা।
*Option, Call—ক্রয়-মর্জির শেয়ার।
Order, Conditional—সসর্ত আদেশ।
„ , Verbal—মৌখিক আদেশ।
*Ordinance—অধ্যাদেশ, ফরমান, বিশেষ ক্ষমতাযুক্ত অস্থায়ী আইন।
Outgrowth—উপবৃদ্ধি।
Outlay—বিনিয়োগ।
Output—উৎপাদ, উৎপন্নবস্তু।
*Out-turn—উৎপত্তি, উৎপন্ন দ্রব্যজাত।
*Over-Capitalisation—অতিরিক্ত পুঁজি নিয়োগ। গৌ. বি. '৬৫
*Over-draft—অধিবিকর্ষ, জমাতিরিক্ত টাকা তোলা। ক. বি. '৫২, '৫৯
*Overdraw a Bill—হুণ্ডি-নির্ধারিত টাকার অতিরিক্ত গ্রহণ।
Over-due—মেয়াদ অতীত।
Over-estimation—অতিমান।
*Over-invoice—অতি-চালান, অতিরিক্ত চালান।
Over-population—অতিপ্রজনতা, অতিপ্রজনন, জনাধিক্য।
*Over-production—অত্যুৎপাদন।
Over-ruled—রহিত, বাতিল।
Over-stock—অত্যধিক মাল রাখা।
Over-supply—অতি-যোগান।
*Over-time work—অধিকাল কর্ম। ক. বি. '৬২
Over-trading—অতি-ব্যবসায়।
Overseer—উপদর্শক।
*Overseer, Public Works—পূর্তকর্ম উপদর্শক।
*Overture—প্রস্তাব।
Over-valued—অতি-মূল্যায়িত।
Ownership—মালিকানা, মালিকী স্বত্ব।
Ownership, Private—বেসরকারী মালিকানা।
* „ , Public—সরকারী মালিকানা।

P.

Paid in full—পরিদত্ত।
*Paid-up capital—আদায়ীকৃত মূলধন। ক. বি. '৫৪, '৬৪
Paper Currency—পত্র-মুদ্রা।
*Paper Currency Standard—পত্রমুদ্রা মান।
*Par, Above—অতিরিক্ত মূল্যে, অধিহারে, অধিমূল্যে। ব. বি. '৬২
* „ , At—সমমূল্যে, সমহারে। ব. বি. '৬৩
„ , Below—উনমূল্যে, উনহারে।
„ , Mint—টাঁকশালী হার।
Partner—অংশীদার।
„ , Quasi—বেনামা অংশীদার।
Partnership—অংশীদারী।
* „ Agreement—অংশীদারী চুক্তি-পত্র।
*Parity of Exchange—বিনিময়সমতা, বিনিময়ে সমমূল্য।
„ „ Prices—দামের সমতা।
*Parity, Purchasing Power—ক্রয়শক্তির সমতা।
Parliament—সংসদ।
*Part-time—খণ্ডকাল।
*Passing (of a Bill)—গ্রহণ।
*Passport—ছাড়পত্র, নিষ্ক্রম পত্র।
*Pay Bill—বেতন দেয়ক।
Day—বেতন দিবস।

Pay Roll—বেতন পত্র।
„ of Establishment—সংস্থা-বেতন।
*Payable at sight—দর্শনমাত্র দেয়।
Payment, Part—আংশিক পরিশোধ।
„ , On account—অগ্রিম প্রদান।
Payment of balance—হিসাব শোধ।
Payee—প্রাপক।
*Pegging of exchange—বিনিময় হারবদ্ধকরণ।
Pending List—অপেক্ষ্য সূচী।
Per capita—মাথাপিছু।
Permit—আজ্ঞাপত্র, অনুমতি পত্র।
*Per pro—আমমোক্তার সহি।
*Personal Assistant—স্বকীয় সহায়ক।
* „ Security—প্রত্যয়-প্রতিভূতি, ব্যক্তিগত জামিন।
Petty Cash Book—খুচরা নগদান।
*Piece goods—কাপড়।
„ Wages—ফুরান মজুরী।
* „ Work—ঠিকা কাজ।
*Pilot Scheme—পথ-প্রদর্শক পরিকল্পনা।
*Pilot project—পথ-প্রদর্শক প্রকল্প।
Planned Economy—পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা।
*Planning, Economic—অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা।
Plant—স্থায়ী যন্ত্রসামগ্রী, সাজসরঞ্জাম।
Policy—বীমাপত্র, নীতি।
Policy-holder—বীমাকারী, বীমাদার।
Insurance Policy / Policy of Insurance—বীমাপত্র। ক. বি. '৬২
*Policy, Floating—চলতি জাহাজী বীমাপত্র।
„ , Lapsed—বাতিল বীমাপত্র।
Policy, Matured—পাকা বীমাপত্র।
„ , Open—অমীমাংসিত বীমা-পত্র।
* „ , Paid-up—হারাহারি বীমাপত্র।
„ , Unvalued—অমূল্যায়িত বীমাপত্র।
„ , Valued—মূল্যায়িত।
Political Economy—অর্থশাস্ত্র, অর্থনীতি-বিজ্ঞান।
Political Science (Politics)—রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, শাসনবিজ্ঞান।
Polity—শাসন-পদ্ধতি।
Poll—ভোটগ্রহণ।
Polytechnic—বহুশিল্পবিদ্যাত্মক।
*Pool—ব্যবসায়িক জোট।
Pool, Blind—অন্ধকূপ।
* „ , Market—বাজার-চাহিদা সংঘ।
„ , Output—উৎপাদন সংঘ।
* „ , Profit—মুনাফা সংঘ।
*Portfolio—দপ্তর।
Power-loom—শক্তি-চালিত তাঁত।
Power installation—শক্তিযন্ত্র স্থাপন।
*Preamble—প্রস্তাবনা, মুখবন্ধ, ভূমিকা।
*Pre-emption—অগ্রক্রয়াধিকার। ক. বি. '৬৩
Preference—পক্ষপাত, সর্বাগ্রগণ্যতা।
„ Bond—পক্ষপাতমূলক খত।
* „ Share—সর্বাগ্রগণ্য অংশ (শেয়ার)। ক. বি. '৪৩, '৪৪, '৬২
„ Stock—সর্বাগ্রগণ্য সংভার।
„ System—সর্বাগ্রগণ্য (পক্ষপাতমূলক) পদ্ধতি।
*Preference, Colonial—ঔপনিবেশিক পক্ষপাত।
„ , Compulsory—আবশ্যিক পক্ষপাত।

Preference, Imperial—সাম্রাজ্যিক পক্ষপাত।

*Preferential Share—অগ্রাংশ।

*Premium—(বীমার) কিস্তি, চাঁদা।

Prerogative—বিশেষাধিকার।

*Presiding officer—অগ্রাধিকারিক।

Price—দাম, মূল্য, দর।

„ Fluctuation—দামের ওঠানামা।

* „ Level—মূল্যস্তর, দামের স্তর। ক. বি. '৫১

„ List—দামের তালিকা।

„ Movement—দামের গতি।

„ Preference—দামের পক্ষপাত।

Price, Actual—প্রকৃত মূল্য।

„ , Average—গড়পড়তা দাম।

* „ , Ceiling—সর্বোচ্চ দর। ক. বি. '৫৯

„ , Closing—শেষ বাজারের দাম।

„ , Current—চলতি দাম।

„ , Demand—চাহিদা দাম (মূল্য)।

„ , Equilibrium—সাম্য দর (মূল্য)।

„ , Fixed—এক দর।

„ , Floor—সর্বনিম্ন দাম। ব. বি. '৬২

„ , Gross—মোট দাম।

„ , High—চড়া দাম।

„ , Long Period—দীর্ঘকালীন দাম।

„ , Market—বাজার দর।

„ , Net—নীট দাম।

„ , Nominal—নামমাত্র দাম।

„ , Normal—স্বাভাবিক দর।

„ , Preferential—পক্ষপাতমূলক দাম।

„ , Real—প্রকৃত দাম।

„ , Reserve—ন্যূনতম দাম।

Price, Selling—বিক্রয় দাম।

„ , Short Period—স্বল্পকালীন দাম।

„ , Supply—যোগান দাম।

*Prime Cost—প্রাথমিক খরচ।

*Priority—পূর্বিতা।

Private Company—ঘরোয়া কোম্পানী, ব্যক্তিগত কোম্পানী।

Private Secretary—একান্ত সচিব।

Privilege—বিশেষাধিকার।

*Probationer—অবেক্ষাধীন ব্যক্তি।

*Process Costing—প্রসর হিসাব অঙ্কন। ক. বি. '৬৫

Procurement—আসাদন।

Produce Exchange—পণ্য-বিনিময় কেন্দ্র।

*Producer's Monopoly—উৎপাদক-একাধিকার।

Producer's Rent—উৎপাদকের কর।

* „ Surplus—উৎপাদকের উদ্বৃত্ত।

Product, Finished—তৈয়ারী মাল, পাকা মাল।

*Production, Large Scale—বহুল উৎপাদন। ব. বি. '৬১

„ , Mass—ব্যাপক উৎপাদন।

* „ , Small Scale—লঘু উৎপাদন, স্বল্প মাত্রায় উৎপাদন।

*Productive Consumption—উৎপাদক উপভোগ।

„ Goods—উৎপাদক বস্তু।

„ Labour—উৎপাদক শ্রম, সফল শ্রম।

„ Work—উৎপাদক নির্মাণ, ফলপ্রসূ কার্য।

Profit—লাভ, মুনাফা।

Profit and Loss Account—লাভ-লোকসান হিসাব।
*Profit Sharing Scheme—লাভবণ্টন ব্যবস্থা।
*Profiteer—মুনাফাখোর। ক. বি. '৪৫
*Pro forma Account—নমুনা হিসাব, দর্শনার্থ গণিতক।
*Pro forma Invoice—নমুনা চালান।
*Pro forma Defendant—গৌণ প্রতিবাদী।
Programme—কার্যক্রম, কার্যসূচী।
Progress—উন্নতি, প্রগতি।
Progression—প্রগতি।
* „ , Arithmetic—যোগোত্তর প্রগতি।
Progression, Geometric—গুণোত্তর প্রগতি।
„ , Harmonic—সমন্তর প্রগতি।
Progressive Principle—প্রগতিশীল নীতি।
„ Tax—ক্রমবর্ধমান কর।
Prohibited Goods—নিষিদ্ধ মাল।
Prohibition—নিষেধ, প্রতিষেধ।
Project—প্রকল্প, পরিকল্পনা।
Proletariate—সর্বহারা, নির্ধন শ্রমজীবী।
Promissory note—প্রত্যর্থ পত্র।
*Prospectus of a company—যৌথ কারবারের অনুষ্ঠান-পত্র। ক. বি. '৫০
*Protection—সংরক্ষণ। ক. বি. '৫০
*Provident Fund—ভবিষ্য নিধি।
* „ „ , Employee's—কর্মচারীদের ভবিষ্য নিধি। ক. বি. '৫৪
*Provision—বিধান, ব্যবস্থা।
*Proviso—অনুবিধি।
Proxy—প্রতিনিধি, প্রতিপত্রী।

Public—সর্বজনীন, সরকারী।
Public Debt—সরকারী ঋণ। ক. বি. '৬২
* „ Finance—জাতীয় অর্থব্যবস্থা।
„ Health—গণস্বাস্থ্য।
* „ Opinion—জনমত।
* „ Revenue—জাতীয় আয়।
* „ Service—সরকারী চাকুরী।
„ „ Commission—কৃত্যক নিয়োগাধিকার, রাষ্ট্রনিয়োগাধিকার।
* „ Works—পূর্তকার্য, সরকারী নির্মাণ কার্য, বাস্তুকর্ম।
*Purchasing Power—ক্রয়শক্তি। ক. বি. '৫১
*Put and Call—শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় অধিকার।
*Put of More—অধিক বিক্রয়ের চুক্তি।
Put up Slip—স্তম্ভপত্রী, পেশপত্রী।

Q.

Qualification—গুণ, যোগ্যতা।
*Qualified Acceptance—সর্তাধীন স্বীকৃতি।
„ Distribution—গুণানুসার বণ্টন।
Quantitative—মাত্রিক, পরিমাণবাচক।
Quantity—পরিমাণ।
„ Theory—পরিমাণবাদ।
„ Theory of Money—অর্থ-প্রসারবাদ, অর্থের পরিমাণবাদ।
*Quantum—পরিমাণ।
*Quid pro quo—পরিবর্ত দ্রব্য।
*Quinquennial—পঞ্চবার্ষিক, পাঁচশালা। ব. বি. '৬৪

Y

Year Book—বর্ষপঞ্জী।
*Year ending—আখেরী, সালতামামী।
Yeoman—কৃষক।
Yeomanry—কৃষক সম্প্রদায়।
Yield—উৎপাদন।

Z

*Zamindary System—জমিদারী প্রথা।
Zone—অঞ্চল।
Zone, Temperate—নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল।
" , Tropical – উষ্ণ অঞ্চল।
Zonal—আঞ্চলিক।

বাণিজ্য বিচিন্তা
পরিভাষা পরিচিতি

নতুন সংস্করণে এই অংশটি সংযোজিত হলো। পরিভাষাগুলির মধ্যে যেগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আপাত-দুরূহ, সেইগুলিই বিশেষভাবে নির্বাচিত করে তাদের সংজ্ঞা ও পরিচিতি এই অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে। উদ্দেশ্য : না বুঝে মুখস্থ না করে, বুঝে অন্তরস্থ করতে ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করা। আমার স্থির বিশ্বাস, এতে তারা উপকৃত হবে। তাছাড়া, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ বিশেষ পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা লিখতে নির্দেশ দিচ্ছেন। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ-সূচীও সেইভাবেই রচিত। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় যদি অনুরূপ নির্দেশ দেন, তবে বিস্মিত হবার কিছু নেই—কিংবা হতাশ হবার কোন কারণ নেই। সে বিষয়ে উপযুক্ত প্রস্তুতির জন্যে এবং দুরূহ পারিভাষিক শব্দ ও শব্দগুচ্ছের মর্ম-গ্রহণে সাহায্য করবার জন্যে এই অংশের সংযোজন। আশা করি, এই সংযোজন সফল হবে।

A.

Abatement—ছুট, বাদ। নির্ধারিত মূল্যের একাংশ ছাড়, দেওয়া। বাজার সৃষ্টির জন্যে কিংবা বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করবার জন্যে কিংবা দ্রুত বিক্রয়-মূল্য আদায় করবার জন্যে বিক্রেতা তাঁর পণ্যের চিহ্নিত মূল্যের একাংশ ছেড়ে দেন। এই ছাড় অংশকেই ছুট বা বাদ বলা হয়।

Above Par—অধিমূল্য, অধিহার। শেয়ার বাজারের অতি-প্রচলিত একটি কথা। চিহ্নিত মূল্যের চেয়েও অতিরিক্ত মূল্যে শেয়ার বা স্টকের বেচাকেনা হলে তাকে অধিমূল্য বা অধিহার ক্রয়-বিক্রয় বলা হয়।

Abstinence—ভোগবিরতি। ভোগ-ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ভোগ-সন্তুষ্টি বিধান থেকে বিরত হওয়ার নাম ভোগ-বিরতি। অপরের ভোগ বিধান করবার জন্যে নিজের ভোগ-ক্ষমতার কিয়দংশ অন্যকে ঋণ-স্বরূপ দেওয়া যায়। সেরূপ ক্ষেত্রে অধমর্ণ উত্তমর্ণকে সুদস্বরূপ যে অর্থ দেয়, তা প্রকৃতপক্ষে উত্তমর্ণের ভোগবিরতিই মূল্য।

Acceptance—স্বীকার, স্বীকৃতি, সাকরাণ। ঋণ-ভিত্তিক ব্যবসায়ে ধারে বিক্রীত পণ্যের সঙ্গে প্রেরিত চুক্তিপত্রে ক্রেতাকে স্বাক্ষর দিতে হয়। এই স্বাক্ষর-দানকে বলা হয় স্বীকার, স্বীকৃতি বা সাকরাণ।

***Acceptance House**—**হুণ্ডি স্বীকৃতি কুঠি, হুণ্ডি সাকরাণী কুঠি।** ব্যাঙ্কের মতো হুণ্ডি সাকরাণী কুঠি সুনাম-সম্পন্ন ক্রেতাদের ঋণের জামিন-স্বরূপ দাঁড়ায়। সাকরাণী কুঠির স্বাক্ষরিত হুণ্ডি সহজেই হস্তান্তরযোগ্য।

***Accommodation Bill**—**সুপারিশী হুণ্ডি, উপযোজক হুণ্ডি।** কোন ব্যবসায়ী অন্য কোন ব্যবসায়ীকে সাময়িক অর্থ-সাহায্য করার উদ্দেশ্যে উক্ত ক্রেতার ধারে-ক্রীত পণ্যের হুণ্ডিতে স্বাক্ষর দান করতে পারেন। সেই হুণ্ডি ভাঙিয়ে বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান মূল্যশোধ করে নিতে পারেন। এইরূপ হুণ্ডিকে সুপারিশী হুণ্ডি বা উপযোজক হুণ্ডি বলা হয়।

***Actuary**—**বীমা গণিতজ্ঞ, বীমা গাণিতিক।** বীমা-সম্পর্কিত যাবতীয় হিসাবে বিশেষভাবে পারদর্শী গণিতজ্ঞকে বীমা গণিতজ্ঞ বা বীমা গাণিতিক বলা হয়। বীমাকারীর পক্ষ থেকে প্রদেয় চাঁদার হার এবং বীমা-কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে দাবী ও দায়িত্বের পরিমাণ নির্ধারণ করা বীমা গণিতজ্ঞের কাজ।

***Ad valorem duty** [গৌ. বি '৬৫]—**মূল্যানুসার শুল্ক।** স্বদেশে উৎপন্ন বা বিদেশ থেকে আমদানি-কৃত পণ্যের উপর আরোপিত মূল্যানুপাতিক শুল্ককে মূল্যানুসার শুল্ক বলা হয়। শতকরা ১০ টাকা হারে মূল্যানুসার শুল্ক নির্ধারিত হলে ১০৪০৲ টাকা মূল্যের পণ্যের উপর ১০০৲ টাকা মূল্যানুসার শুল্ক আরোপিত হবে।

***Agio**—**মুদ্রাবাট্টা।** মুদ্রা-বিনিময়-কালে পুরাতন মুদ্রার পরিবর্তে নতুন মুদ্রা গ্রহণ করতে গেলে কিছু অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়। মুদ্রার ধাতুক্ষয়-জনিত মূল্যহ্রাস এইভাবে পরিপূরিত হয়। নতুন মুদ্রা গ্রহণ করবার জন্যে পুরাতন মুদ্রার সঙ্গে যে অতিরিক্ত মূল্য দান করতে হয়, তাকেই বলা হয় মুদ্রাবাট্টা।

***Amortisation**—**ক্রমশোধ।** এই পদ্ধতিতে কোন প্রতিষ্ঠান ঋণশোধের নির্দিষ্ট তারিখের পরেও ধীরে-সুস্থে ঋণ শোধ করতে পারেন। বৎসরান্তে আয়ের একটা অংশ সেই প্রতিষ্ঠানকে পৃথক খাতে রেখে দিতে হয়। এবং সেই অর্থ শেয়ার বা স্টকে কিংবা সরকারী ঋণপত্রে বিনিয়োগ করা হয়। ঋণশোধের সময় তা বিক্রী করে ঋণ শোধ করা হয়। এই ব্যাপারে ক্রমশোধের সঙ্গে কর্জশোধ তহবিলের (Sinking Fund) কার্যক্রমের সাদৃশ্য আছে। তবে আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে কর্জশোধ তহবিলের সঙ্গে ক্রমশোধ পদ্ধতির পার্থক্য আছে। 'কোন সম্পত্তি, কোন যৌথ

প্রতিষ্ঠান বা কোন দাতব্য-প্রতিষ্ঠানকে চিরদিনের জন্য দান করাকে Amortization বলে।'

/ *Arbitrage—পরোক্ষ বিনিময়, অন্তর পণন। কোন পণ্য একই সময়ে মন্দাবাজার থেকে স্বল্পমূল্যে কিনে চড়া বাজারে অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রী করে মুনাফা করাই অন্তর পণনের লক্ষ্য। সাধারণতঃ এই ব্যবসা বৈদেশিক মুদ্রা এবং বৈদেশিক স্টক ও শেয়ার বাজারে চলে বেশী। প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত শোধ করতে হলে সংশ্লিষ্ট পাওনাদার রাষ্ট্রের মুদ্রায় শোধ দিতে হয়। তখন দেনাদার রাষ্ট্রের মুদ্রার মূল্য আনুপাতিক হারে কমে যায়। অন্য কোন দেশে হয়তো উক্ত দেনাদার রাষ্ট্রের মুদ্রার মূল্য অধিক। এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে অন্তর-পণনের ব্যবসায়ীরা। তারা পাওনাদার দেশের মুদ্রায় উক্ত দেনাদার দেশের, মুদ্রা ক্রয় করে তৃতীয় রাষ্ট্রের অধিক মূল্যের বাজারে তা বিক্রী করে অত্যন্ত লাভবান হয়। সাম্প্রতিক কালে দেশে-দেশে বিনিময় মূল্য-নিয়ন্ত্রণের ফলে এই ব্যবসায় ক্রম-সংকোচনশীল।

Arbitration—মধ্যস্থতা, সালিশী। দুই বিবদমান পক্ষের মধ্যে বিরোধের অবসানকল্পে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি বা দল প্রেরিত হন। এই ব্যক্তি বা দলের কাজকে বলা হয় মধ্যস্থতা বা সালিশী।

/ ***Assignment—স্বত্ব-নিয়োগ, হস্তান্তরকরণ।** নিজের স্বত্ব অন্য ব্যক্তিকে দান করার নাম স্বত্ব-নিয়োগ বা হস্তান্তরকরণ। এই স্বত্বান্তরকরণ একটা দলিলের মারফত করা হয়। সেই দলিলকেও স্বত্ব-নিয়োগ বলা হয়।

/ ***Authorised Capital—অনুমোদিত মূলধন।** নিবন্ধনকালে পরিমেল-বন্ধে উল্লিখিত মূলধনকে অনুমোদিত মূলধন বলে।

B.

Back a Bill—হুণ্ডি পিছ সহি করা। ঋণ-ভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয় হুণ্ডির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সেরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতার ঋণের জামিন প্রয়োজন হয়। হুণ্ডির পিছনে সেরূপ একাধিক জামিনদারের স্বাক্ষরের প্রয়োজন। ক্রেতা ঋণ-শোধে অপারগ হলে বিক্রেতা জামিনদারদের কোন একজনকে দায়ী করতে পারেন। ক্রেতা ছাড়া হুণ্ডির পিছনে জামিনদারদের এই স্বাক্ষর করার রীতিকে হুণ্ডি পিছ সহি করা বলা হয়।

Bad debt—অনাদায়ী দেনা, অশোধ্য ঋণ, কু-ঋণ। অধমর্ণের কাছ থেকে উত্তমর্ণ যে ঋণের আদায়ের আশা একেবারে পরিত্যাগ করেছেন, সেই ঋণকে বলা হয় অনাদায়ী দেনা, অশোধ্য ঋণ বা কু-ঋণ।

Balance certificate—উদ্বৃত্তের প্রত্যয়-পত্র। অবণ্টিত শেয়ার বা স্টকের জন্যে যে প্রত্যয়-পত্র প্রদত্ত হয়, তাকে উদ্বৃত্তের প্রত্যয়-পত্র বলা হয়।

Balance of Payments—আন্তর্জাতিক দেনাপাওনার সমতা। 'দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেনের সংতুলনকে' আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার সমতা বলা হয়। এই হিসেবের মধ্যে উভয় দেশের দৃশ্য ও অদৃশ্য আমদানি এবং রপ্তানি ধরা হয়।

Balance of Trade—বৈদেশিক বাণিজ্য উদ্বৃত্ত। কেবলমাত্র দৃশ্য আমদানি ও রপ্তানির ব্যবধানকে বৈদেশিক বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বলা হয়। আমদানি-মূল্যের চেয়ে রপ্তানি-মূল্য বেশী হলে ঘটে অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত। আর রপ্তানি-মূল্যের চেয়ে আমদানি-মূল্য বেশী হলে ঘটে প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত।

Bear—নিম্নগ, মন্দিওয়ালা। ভবিষ্যতে শেয়ার বা স্টকের মূল্যাবনতির আশংকায় যে ফটকা-কারবারী শেয়ার বা স্টক বিক্রির জন্যে চুক্তি করে, তাকে বলা হয় নিম্নগ বা মন্দিওয়ালা। এরূপ কারবারীকে Lame Duck-ও বলা হয়ে থাকে।

Betterment Fee—উন্নয়ন দক্ষিণা। কোন স্বায়ত্ত-শাসিত প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন-মূলক কার্যের ফলে কোন ব্যক্তির সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি হলে উক্ত বর্ধিত মূল্যের একাংশ উন্নয়ণ দক্ষিণা রূপে উক্ত স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানকে দিতে হয়।

Bill of Entry—দাখিলী পণ্য-দ্রব্যের তালিকা, আগম-পত্র। শুল্ক প্রাধিকারের কাছে আমদানিকারককে আমদানি করবার জন্যে পণ্য-দ্রব্যের তালিকা ইত্যাদি দাখিল করতে হয়। তাকেই আগম-পত্র বলা হয়।

Bill of Lading—বহনপত্র। জাহাজে মাল বোঝাই করে জাহাজ কোম্পানীর কাছ থেকে যে স্বাক্ষরযুক্ত চুক্তিপত্র গ্রহণ করা হয়, তাকে বহনপত্র বলা হয়। বহনপত্র দুদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ: এক, মাল বহনের চুক্তি; দুই, মাল প্রাপ্তির স্বীকৃতি।

Bill of Store—ভাণ্ডার-পত্র। বিদেশে রপ্তানি-কৃত পণ্য-দ্রব্য পাঁচ বছরের মধ্যে বিনাশুল্কে যাতে স্বদেশে ফিরিয়ে আনতে পারা যায়, তার জন্যে ভাণ্ডার-পত্র গ্রহণ করতে হয়।

Bonded Warehouse—শুল্কাধীন পণ্যাগার। আমদানিকারক আমদানি-শুল্ক দিতে অসমর্থ হলে সরকারের সঙ্গে চুক্তিবলে শুল্ক-পরিশোধ-সাপেক্ষে উক্ত পণ্য গুদামজাত করা হয়। এরূপ গুদামকে শুল্কাধীন পণ্যাগার বলা হয়। এগুলি হয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান; কিন্তু তদারকীর ভার থাকে সরকারের উপর। অবশ্য ঐ অবস্থায় আমদানিকারক পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করলে তাকে ক্রমায়ণ (gradation) ইত্যাদির সুযোগ দেওয়া হয়।

Boom—চড়া বাজার, তেজী বাজার, গরম বাজার। ব্যবসা-বাণিজ্যে স্বল্পকাল স্থায়ী চাহিদা ও মূল্যবৃদ্ধির অবস্থাকে চড়া বাজার, তেজী বাজার বা গরম বাজার বলা হয়। এই অবস্থায় দ্রুত লেনদেন ও ক্রয়-বিক্রয় চলে।

Buffer Stock—মধ্যবর্তী সম্ভার। উৎপাদন ও মূল্য-হ্রাসবৃদ্ধি প্রতিরোধ করবার জন্যে এবং সকল রাজ্যে পণ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা বজায় রাখবার জন্যে সরকারী নীতির রূপায়ণকল্পে মজুত-রাখা দ্রব্য-সম্ভারকে মধ্যবর্তী সম্ভার বলা হয়।

Bull—ঊর্ধ্বগ, তেজিওয়ালা। ভবিষ্যতে শেয়ার বা স্টকের মূল্যোন্নতির আশায় যে ফট্‌কা কারবারী শেয়ার বা স্টক দ্রুত ক্রয় করতে থাকে, তাকে বলা হয় ঊর্ধ্বগ বা তেজিওয়ালা।

C.

Call Money—তলবী অর্থ। যে কোন সময় বিনা নোটিশে পরিশোধ করতে হবে—এই সর্তে ব্যাঙ্ক-প্রদত্ত ঋণকে বলা হয় তলবী অর্থ।

Call of More—অধিক ক্রয়ের অধিকার। কোন ফট্‌কা কারবারী এই মাত্র যে পরিমাণ শেয়ার ক্রয় করেছে, ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট মূল্যে তার সম-পরিমাণ শেয়ার ক্রয়ের জন্যে চুক্তিবদ্ধ হলে, তার সেই অতিরিক্ত ক্রয়ের ক্ষমতাকে অধিক ক্রয়ের অধিকার বলা হয়।

Cartel —বিক্রয়জোট, শিল্প-সংঘ, উৎপাদন সংঘ, মূল্য নিয়ন্ত্রণ সংঘ। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে একাধিক স্বাধীন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান জোটবদ্ধ হলে তাকে বিক্রয় জোট বা শিল্প-সংঘ বা উৎপাদন সংঘ বা মূল্য নিয়ন্ত্রণ সংঘ বলা

হয়। এভাবে জোটবদ্ধ হলেও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির স্বতন্ত্র সত্তা বিলুপ্ত হয় না।

Caveat Emptor—খরিদ্দার সাবধান, ক্রেতা সতর্কীকরণ। বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে ক্রেতা দেখে-শুনে নিজের দায়িত্বে দ্রব্য-সম্ভার ক্রয় করবে। তাতে বিক্রেতার কোন দায়িত্ব থাকবে না। এরূপ নির্দেশ দানকে বলা হয় খরিদ্দার সাবধান বা ক্রেতা সতর্কীকরণ।

Certificate of Origin—প্রভব লেখ, উৎপাদন নির্দর্শন-পত্র। ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে পণ্য আমদানির ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন হারে আমদানি শুল্ক দিতে হয়। কাজেই উৎপাদক দেশ বা রপ্তানিকারক দেশ সম্বন্ধে শুল্ক প্রাধিকারকে অবহিত করার জন্যে উৎপাদকের বা তার প্রতিনিধির বা উক্ত দেশের বণিক-সংঘের কোন সদস্যের স্বাক্ষরিত পত্র আবশ্যক হয়। ঐ পত্রকে বলা হয় প্রভব লেখ বা উৎপাদন নির্দর্শন-পত্র।

Cheap Money Policy—সুলভ-মুদ্রা নীতি। বাজার থেকে সরকারের প্রয়োজনীয় ঋণ সংগ্রহে যদি সরকারকে চড়া-হার সুদের সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে সরকারকে এমন নীতি গ্রহণ করতে হয়, যাতে সুদের হার হ্রাস পায় এবং টাকার যোগান বৃদ্ধি পায়। ঐ নীতিকে বলা হয় সুলভ-মুদ্রা নীতি।

Circulating Capital [গৌ. বি. '৬৫]**—চলতি মূলধন।** যে সব দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত, অথচ একবার ব্যবহারের পর তাদের মূল্য নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং আর ব্যবহার করা যায় না, তাদের বলা হয় চলতি মূলধন।

Contango—হর্জানা, ব্যাজ, ক্ষতিপূরণ। নির্দিষ্ট দিনে শেয়ারের ক্রেতা মূল্য-পরিশোধে অসমর্থ হলে ক্রয়-মূল্যের উপর ক্ষতিপূরণ দিয়ে ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট দিনে মূল্য শোধের জন্যে সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। ঐ ক্ষতিপূরণকে বলা হয় হর্জানা বা ব্যাজ।

Contraband—নিষিদ্ধ পণ্য, বে-আইনী পণ্য। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে সরকার-বিঘোষিত বে-আইনী পণ্যকে নিষিদ্ধ পণ্য বলা হয়। কেবলমাত্র বিশেষ শুল্কের বিনিময়ে এই জাতীয় পণ্য আমদানি রপ্তানি করা যায়।

Credit Voucher—জমা-পত্র। ক্রেতা কোন পণ্য ফেরৎ পাঠালে বা তাকে কোন রকম ছুট, বাদ বা কমি দিলে তা তার হিসাবে জমা করে বিক্রেতা ক্রেতাকে যে পত্র দেয়, তাকে জমা-পত্র বলা হয়।

D.

Death Duty—মৃত্যুকর। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার-সূত্রে উত্তরাধিকারী যে সম্পত্তি পায়, তার একটা অংশ সরকারকে কর-স্বরূপ দান করতে হয়। ঐ করকে মৃত্যুকর বলা হয়।

Debit Note—খরচ-চিঠা, ধার-চিঠা। মাল কোন কারণে গ্রহণযোগ্য না হলে ক্রেতা তা ফেরৎ দিয়ে বিক্রেতার হিসাবে ধার লিখে বিক্রেতাকে যে পত্র দেয়, তাকেই বলা হয় খরচ-চিঠা বা ধার-চিঠা।

Deficit Financing—(গৌ. বি. '৬৫) **ঘাটতি-ব্যয়।** সরকারী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে কোন ধনতান্ত্রিক দেশে পূর্ণ নিয়োগাবস্থা সৃষ্টিকল্পে অতিরিক্ত পত্র-মুদ্রা ছাপিয়ে সরকারকে বেকার-সমস্যা ইত্যাদির সমাধানে অগ্রসর হতে হয়। এই ব্যবস্থাকে ঘাটতি-ব্যয় বলা হয়। কিন্তু ঘাটতি-ব্যয়ের পরিণামে মুদ্রাস্ফীতি ও তজ্জনিত নানা বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

Delivery Book—বিলি বহি, মাল খালাস বহি। মাল পাঠাবার সময় যে বইতে মালের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়, তাকে বিলি বহি বা মাল খালাস বহি বলা হয়।

Demurrage—গুণাগার, গহিরি, হর্জানা, বিলম্ব-শুল্ক। জাহাজ বা রেলে মাল-বোঝাইতে অথবা মাল-খালাসে চুক্তির অতিরিক্ত বিলম্বের জন্য দেয় শুল্ক বা জরিমানাকে গুণাগার বা গহিরি বা বিলম্ব-শুল্ক বলা হয়।

Drawback—ফেরত শুল্ক। আমদানি-কৃত শুল্কাধীন পণ্য অবিক্রীত অবস্থায় আবার বিদেশে রপ্তানি করা হলে শুল্ক ফেরত দেওয়া হয়। এই শুল্ককে ফেরত শুল্ক বলা হয়।

Dumping—বিদেশে সস্তায় মাল রপ্তানি করা, ক্ষতি স্বীকার করে বিদেশে মাল চালান। স্বদেশে মূল্য বৃদ্ধি করে সস্তায় বিদেশে কোন পণ্য চালান দেওয়ার নাম ডাম্পিং। বিদেশের বাজার দখলের জন্যে বা প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করবার জন্যে বা বৈদেশিক মুদ্রা-সংকট উত্তীর্ণ হবার উদ্দেশ্যে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্যে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। ভারত বর্তমানে চিনি ও কাপড় রপ্তানিতে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে।

E.

Earnest Money—বায়না, দাদন। বেচাকেনার মৌখিক চুক্তিকে বলবৎ করবার জন্যে ক্রেতা বিক্রেতাকে পণ্য-মূল্যের একটা অংশ অগ্রিম দেয়। এরূপ অগ্রিম দেওয়াকে বলা হয় বায়না বা দাদন।

Embargo—রোখ, আটক, নিষেধাজ্ঞা, বাণিজ্যাবরোধ। যুদ্ধের সম্ভাবনায় অথবা শান্তিকালে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বন্দর থেকে জাহাজের বহির্গমন সেই দেশের সরকার নিষিদ্ধ করে দেন। এই ব্যবস্থাকে রোখ বা আটক বা নিষেধাজ্ঞা বা বাণিজ্যাবরোধ বলা হয়। কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইন-সংক্রান্ত ব্যবস্থা গৃহীত হলে তার সম্পত্তি স্থানান্তর করার বিরুদ্ধে আদেশ জারী করা হলে সেই আদেশকেও ঐ নামে অভিহিত করা হয়।

Endorsement—স্বত্বান্তরকরণ, পিছসহি। বিনিময় পত্র, প্রত্যয় পত্র, চেক ও বহনপত্র ইত্যাদির পেছনে মালিকের স্বাক্ষর থাকলে, তবেই ঐ সকল দলিল হস্তান্তরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। নচেৎ ঐ সকল দলিল মূল্য আদায়ের অযোগ্য বলে পরিগণিত হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় স্বত্বান্তরকরণ বা পিছসহি।

Entertainment Tax [গৌ. বি. '৬৫]—**প্রমোদ কর।** সিনেমা-থিয়েটার ইত্যাদির প্রদর্শনীতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আনন্দ উপভোগের বিনিময়ে প্রকৃত প্রদর্শনী মূল্যের অতিরিক্ত প্রমোদকর স্বরূপ সরকারকে প্রদান করতে হয়। ঐ অর্থ টিকিটের মূল্যের সঙ্গে প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষ দর্শকের কাছ থেকে আদায় করে থাকেন।

Establishment Charges—পরোক্ষ পড়তা, সংস্থা ব্যয়াদি। উৎপন্ন পণ্যের প্রতি এককের মূল্য নির্ধারণে যে সকল আনুষঙ্গিক ব্যয়কে হিসাবের মধ্যে ধরা হয়, তাদের বলা হয় পরোক্ষ পড়তা বা সংস্থা ব্যয়াদি।

Excess Profit Tax—অতি-মুনাফা কর। অতিরিক্ত চাহিদাবৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত মুনাফা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হলে সরকার স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফার ওপর যে করারোপ করেন, তাকে অতি-মুনাফা কর বলা হয়।

F.

Fiat Money—অবিনিমেয় পত্র-মুদ্রা। সমমূল্যের স্বর্ণ-রৌপ্যাদি কোন মূল্যবান ধাতু জমা না রেখে যে পত্র-মুদ্রা ছাপানো হয়, তাকে বলা হয় অবিনিমেয় পত্র-মুদ্রা। এই মুদ্রা অপরিবর্তনীয়, কিন্তু বৈধ।

Forward Contract—[গৌ. বি. '৬৫] **আগাম চুক্তি।** পণ্য-উৎপাদনের পূর্বে বা আমদানির পূর্বে কিংবা ফসল ওঠার আগে একটি নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত মূল্যে পণ্য-বিক্রয়ের জন্যে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হলে তাকে আগাম চুক্তি বলা হয়। চুক্তি অনুসারে উৎপাদক বা আমদানি-কারক নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রয়ে বাধ্য থাকে।

Forward Exchange—অগ্রিম বিনিময়, আউতি বিনিময়। ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট তারিখে বিলি করার সর্তে বিদেশী মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিকে অগ্রিম বিনিময় বা আউতি বিনিময় বলা হয়।

Freight—মালের ভাড়া, মালের মাশুল। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মাল বহনের জন্যে যে ভাড়া দিতে হয়, তাকেই মালের ভাড়া বা মালের মাশুল বলা হয়।

Futures—মুদ্দতী ক্রয়-বিক্রয়। ভবিষ্যতে কোন এক নির্দিষ্ট তারিখে বিলি করার সর্তে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিকে মুদ্দতী ক্রয়-বিক্রয় বলে।

G.

Gift Tax—দান কর, খয়রাত কর। নির্দিষ্ট মূল্যাতিরিক্ত মূল্যের সম্পত্তি দান করলে দাতাকে এক প্রকার কর দিতে হয়। সেই করকে দান কর বা খয়রাত কর বলা হয়।

Gilt-edged Security—সর্বোত্তম ঋণপত্র। যে ঋণপত্রের বাজার দর কখনই লিখিত মূল্যের কম হবার সম্ভাবনা নেই, তাকেই বলা হয় সর্বোত্তম ঋণপত্র। এই ঋণপত্র ক্রয়ে ক্রেতার ঝুঁকি একেবারেই থাকে না।

Grading বা **Gradation—ক্রমায়ণ।** মূল্য নির্ধারণ ও ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধার জন্যে সমজাতীয় পণ্যের বিভিন্ন শ্রেণীতে পর্যায়িত করার নাম ক্রমায়ণ। তাতে ক্রম বা পর্যায়ের নাম অনুসারে পণ্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিচার করা চলে।

Graduated Tax -**ক্রমবর্ধমান কর।** আয়-বৃদ্ধির হারের চেয়ে কর-বৃদ্ধির হার অধিক হলে তাকে ক্রমবর্ধমান কর বলা হয়।

Guild—**সংঘ।** মধ্য যুগে সমব্যবসায়ীদের সংঘকে গিল্ড্ বলা হতো। Merchant Guild-কে বলা হতো ব্যবসায়ী সংঘ এবং Craft Guild-কে বলা হতো কারিগরী সংঘ। বর্তমান কালে কোন সহরে ব্যবসায়ী বা কারিগরেরা সমস্বার্থে সম্মিলিত হয়ে অনুরূপ ভাবে সংঘ গড়ে তুলতে পারেন।

H.

Hard Currency—**দুর্লভ বৈদেশিক মুদ্রা।** বৈদেশিক বাণিজ্যে কোন দেশের প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত দেখা দিলে অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের দেশের মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সেই মুদ্রা দুর্লভ হয়ে পড়ে বলে তাকে দুর্লভ বৈদেশিক মুদ্রা বলা হয়।

Hire Purchase [গৌ. বি. '৬৫]—**ঠিকা সওদা।** কিস্তিবন্দীতে পণ্য-মূল্য শোধের দীর্ঘ-মেয়াদী রীতিকে ঠিকা সওদা বলা হয়। ঠিকা সওদার সঙ্গে কিস্তিবন্দী ক্রয়ের (Instalment Purchase) পার্থক্য আছে। কিস্তিবন্দী ক্রয়ে চুক্তির পরে পণ্যের মালিকানা ক্রেতার হয়ে যায়। কিন্তু ঠিকা সওদায় চুক্তির পর ক্রেতা পণ্যের ভোগাধিকার পায়; মূল্য শোধ না হওয়া পর্যন্ত মালিকানা পায় না।

Home Charges—**বিলাতের দক্ষিণা।** ব্রিটিশ-শাসিত ভারতকে ইংলণ্ডের ভারত-সচিবের অফিসের সমস্ত ব্যয় বহন করতে হতো। সেই ব্যয়কে বিলাতের দক্ষিণা বলা হতো।

I.

Impact of Taxes —**কর-সংঘাত।** করদাতার উপর আরোপিত কর যদি অন্যের উপর অপসারিত করা যায়, তবে তাকে বলা হয় কর-সংঘাত। যেমন বিক্রয়-কর। বিক্রেতাকে বিক্রয়-কর দিতে হয়। কিন্তু সেই কর সে ক্রেতার কাছ থেকে আদায় করে। ফলে বিক্রেতার ওপর আরোপিত কর ক্রেতার ওপর অপসারিত হয়।

Imprest Fund—**জিম্মা তহবিল।** নগদ ব্যয় মেটাবার জন্যে মোট নগদ-তহবিল থেকে এক প্রকার পৃথক তহবিল রাখা হয়। তাকেই বলে জিম্মা তহবিল। জিম্মা তহবিলের যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়, আবার নির্দিষ্ট সময়ের

মধ্যে সেই পরিমাণ অর্থ জমা দিতে হয়। ফলে জিম্মা তহবিলের অর্থের পরিমাণ পূর্ববৎই থাকে।

Indent—সংভৃতি পত্র বা **সংভৃতক**। বিদেশস্থিত কোন ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানের কাছে বা নিজস্ব প্রতিনিধির কাছে লিখিত কোন নির্দিষ্ট পণ্য প্রেরণের নির্দেশ-পত্রকে বলা হয় সংভৃতি পত্র বা সংভৃতক। বিপরীতক্রমে, বিদেশস্থিত ক্রেতা বা নিজস্ব প্রতিনিধির লিখিত কোন নির্দিষ্ট পণ্য প্রেরণের নির্দেশ-পত্রকেও সংভৃতি পত্র বা সংভৃতক বলা হয়।

Index Number—সূচক সংখ্যা। কোন দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরবার জন্যে যে বিশেষ পরিসংখ্যান্ পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করা হয়, তাকে বলা হয় সূচক সংখ্যা।

Inflation—মুদ্রাস্ফীতি, উৎসার, সম্প্রসারণ। বাজারের পণ্যের পরিমাণের তুলনায় টাকার যোগান বৃদ্ধি পেলে যে অর্থনৈতিক অবস্থার উদ্ভব হয়, তাকে বলা হয়, মুদ্রাস্ফীতি। এই সময় স্বল্প পরিমাণ পণ্যের পেছনে অধিক পরিমাণ অর্থ ছুটে বেড়ায় এবং টাকার দাম যায় কমে।

Inheritance Tax—উত্তরাধিকার কর। উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির জন্যে উত্তরাধিকারীকে যে কর দিতে হয়, তাকে উত্তরাধিকার কর বলা হয়।

Inventory—তালিকা, দফাওয়ারী ফর্দ। দফাওয়ারী দ্রব্য-তালিকাকে বলা হয় তালিকা বা দফাওয়ারী ফর্দ। এই ফর্দে দ্রব্যের পরিমাণ ও মূল্য প্রদর্শিত হয়।

Investment—বিনিয়োগ। সরাসরি অভাব পূরণ করতে পারে না, অথচ অভাব পূরণক্ষম দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, এমন দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যয় করাকে বলা হয় বিনিয়োগ।

Invoice—চালান। বিক্রেতা যে পত্রে বিক্রীত পণ্যের নাম, পরিমাণ, মূল্য ইত্যাদি বিশদভাবে উল্লেখ করে ক্রেতার কাছে পাঠায়, তাকেই চালান বলা হয়। চালান-পত্রের দ্বারাই রেল বা জাহাজ থেকে মাল খালাস করা হয়।

K.

Key Industry—মূল শিল্প, বনিয়াদী শিল্প। যে শিল্পের প্রসার দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ রচনায় বিশেষ সহায়ক হয়, তাকেই মূল শিল্প বা বনিয়াদী শিল্প বলা হয়। সেইজন্যে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকে ঐ নামে অভিহিত

করা হয়ে থাকে। আবার যে সব শিল্প রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব-সম্পন্ন দিক থেকে এবং দেশের অর্থনীতিতে বিশেষভাবে প্রভাবশীল, তাদেরও বলা হয় মূল শিল্প বা বনিয়াদী শিল্প।

Kite flying –সুপারিশী হুণ্ডি কাটা। Accommodation Bill দ্রষ্টব্য।

L.

Letter of Allotment—বিলিপত্র, আবণ্টন পত্র। যৌথ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার-ক্রয়েচ্ছুর দরখাস্তের প্রত্যুত্তরে যে পত্রের দ্বারা তার ক্রয়-কর্ম স্বীকৃত হয়, তাকে বলা হয় বিলিপত্র বা আবণ্টন পত্র। এই পত্রে শেয়ারের পরিমাণ উল্লিখিত থাকে।

Letter of Credit—প্রত্যয় পত্র, প্রতিশ্রুতি পত্র। বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে প্রত্যয় পত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুন আমদানিকারকের অবস্থা যদি রপ্তানিকারকের জানা না থাকে, তবে আমদানিকারকের পরিচিত কোন ব্যাঙ্ক কিংবা রপ্তানিকারকের কোন প্রতিনিধি প্রত্যয় পত্রের সাহায্যে আমদানিকারকের ঋণ শোধের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন।

Letter of Hypothecation—বন্ধকী পত্র। ব্যাঙ্কের কাছে আমদানিকৃত পণ্য বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণের চুক্তিপত্রকে বন্ধকী পত্র বলা হয়।

Letter of Indemnity—খেসারত পত্র। যে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রেরিত ক্ষতিগ্রস্ত পণ্যের ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দান করে থাকেন, তাকে খেসারত পত্র বলা হয়।

Liquid Asset—নগদ সম্পদ। যে সম্পদ বিনা ক্ষতিতে অনায়াসে বিক্রয়যোগ্য, সেই সম্পদকে বলা হয় নগদ সম্পদ।

Liquidation—কারবার গুটান, অবসায়ন। রেজেস্ট্রীভুক্ত কোন যৌথ প্রতিষ্ঠান কারবার বন্ধ করে দিলে তাকে কারবার গুটান বা অবসায়ন বলে। সেরূপ ক্ষেত্রে একজন অবসায়ক নিযুক্ত করতে হয়, যিনি পাওনা আদায় করে পাওনাদারদের দেনা মেটাবেন।

Lock-out—বহিষ্কার, কারবার স্থগিত। মালিক-শ্রমিকের বিরোধে শ্রমিক-পক্ষের ওপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি করে মালিক-পক্ষের প্রস্তাবিত মতে মীমাংসায় বাধ্য করবার জন্যে মালিক-পক্ষ সাময়িকভাবে ব্যবসা বন্ধ করে দেন। সেই অবস্থাকে বলা হয় বহিষ্কার বা কারবার স্থগিত।

M.

Marginal Cost—প্রান্তিক ব্যয়। প্রতি-একক উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্যে একক-পিছু উৎপাদন-ব্যয়কে প্রান্তিক ব্যয় বলা হয়।

Marginal Productivity—প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা। উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যে-কোন একটির নিয়োগ বৃদ্ধি করে যে অতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়া যায়, তাকে ঐ উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা বলা হয়।

Merchant Guild—বণিক সংঘ। Guild দ্রষ্টব্য।

Moratorium—সাময়িক ঋণ-রেহাই, বাণিজ্যিক লেনদেন বিরতি। জা' সংকট কালে সরকার বাণিজ্যিক লেনদেন বন্ধ করার যে আদেশ দেন, তাকেই সাময়িক ঋণ-রেহাই বা বাণিজ্যিক লেনদেন বিরতি বলা হয়। দেশে আর্থিক সংকটাবস্থা দেখা দিলে সরকার আদেশবলে ব্যাঙ্কের আমানত গ্রহণ ও ফেরত দানের অধিকার বন্ধ করে দিতে পারেন। তাকেও সাময়িক ঋণ-রেহাই বা বাণিজ্যিক লেনদেন বিরতি বলা যায়।

N.

National Debt—জাতীয় ঋণ। চলতি আয় দিয়ে সরকারের প্রয়োজনীয় ব্যয় সংকুলান সম্ভব না হলে সরকারকে বাধ্য হয়ে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। তাকেই বলে জাতীয় ঋণ।

National Income—জাতীয় আয়। কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন দেশের পণ্য ও সেবা উৎপাদন থেকে উদ্ভূত আয় এবং বৈদেশিক বাণিজ্য-লব্ধ নীট আয়ের যোগফলই সেই দেশের জাতীয় আয়।

Nationalisation—রাষ্ট্রায়ত্তকরণ। কোন শিল্পে ব্যক্তিগত মালিকানা লুপ্ত করে সরকারী ব্যবস্থাপনা ও মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে তাকে বলা হয় রাষ্ট্রায়ত্তকরণ। ভারতে বিমান, রেলপথ ও জীবনবীমাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে।

Naturalisation—নাগরিককরণ, দেশীয়করণ—কতকগুলি সর্ত পূরণের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে কোন বিদেশীকে নাগরিক অধিকার দান করা হলে তাকে নাগরিককরণ বা দেশীয়করণ বলা হয়।

O.

Octroi Duty—চুঙ্গি, দ্বারাদেয় শুল্ক। বাহির থেকে কোন শহরে প্রবেশকালে পণ্যের উপর এক প্রকার শুল্ক আদায় করা হয়, তাকে চুঙ্গি বা দ্বারাদেয় [দ্বার+আদেয়] শুল্ক বলা হয়। একে নগর শুল্কও বলা হয়।

Over Capitalisation [গৌ. বি. '৬৫]—**অতিরিক্ত পুঁজি নিয়োগ।** কোন ব্যবসায়ে আয়ের অনুপাতে যে পরিমাণ পুঁজি বিনিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন, তার অতিরিক্ত পুঁজি বিনিয়োগ করা হলে তাকে অতিরিক্ত পুঁজি নিয়োগ বলা হয়।

Overdraft—জমাতিরিক্ত টাকা তোলা, অধিবিকর্ষ। ব্যাঙ্কে যে পরিমাণ টাকা জমা আছে, তার অতিরিক্ত টাকা তোলার নাম জমাতিরিক্ত টাকা তোলা বা অধিবিকর্ষ।

Over-Production—অত্যুৎপাদন। বাজারে চাহিদার চেয়ে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে বাজারদর নিম্নমুখী হয়। এই অবস্থাকে অত্যুৎপাদন বলে।

P.

Paid-up Capital—আদায়ীকৃত মূলধন। যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের বিক্রীত শেয়ার-সমূহের মূল্য যতখানি আদায় হয়েছে, তাকেই আদায়ীকৃত মূলধন বলে।

Pegging of Exchanges—বিনিময় হারবন্ধকরণ। কোন কৃত্রিম উপায়ে মুদ্রার বিনিময়-হার অবিচল রাখার প্রয়াসকে বিনিময় হারবন্ধকরণ বলা হয়।

Pool—ব্যবসায়িক জোট। বিশেষ উদ্দেশ্যে একাধিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সংঘবদ্ধ হওয়ার নাম ব্যবসায়িক জোট।

Preference Share—সর্বাগ্রগণ্য অংশ। যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের সাধারণ শেয়ার-সমূহের লভ্যাংশ বিতরণের পূর্বে যে শেয়ারে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ বিতরণ করতে হয়, তাকে সর্বাগ্রগণ্য অংশ বলা হয়।

Prime Cost—প্রাথমিক খরচ। পণ্য-উৎপাদনে যে ব্যয় হয়, তার মধ্যে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ মজুরি ও প্রত্যক্ষ আনুষঙ্গিক ব্যয় ধরে যে ব্যয়ের অঙ্ক স্থির করা হয়; তাকে বলে প্রাথমিক খরচ।

Process Costing—প্রসর হিসাব অঙ্কন। মূল উৎপন্ন দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণে উৎপাদন-পদ্ধতির প্রতি উৎপাদন-স্তরের উৎপাদন-ব্যয় ধরতে হয়। মূল্য নির্ধারণের এই পদ্ধতিকে প্রসর হিসাব অঙ্কন বলা হয়।

Profit Sharing Scheme—লাভ-বণ্টন ব্যবস্থা। ধনতান্ত্রিক শিল্প-ব্যবস্থায় শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতি বিধান করে শ্রমিকদের নৈপুণ্য বৃদ্ধি করবার জন্যে বছরের শেষে মোট মুনাফার অর্থ নির্দিষ্ট হারে শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করে দেবার রীতিকে বলা হয় লাভ-বণ্টন ব্যবস্থা।

Pro forma Invoice—নমুনা চালান। দূরস্থিত কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পণ্য-ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে বিক্রেতার কাছ থেকে চালানের নমুনা দাবী করে। তদনুসারে রচিত চালানকে নমুনা চালান বলা হয়।

Progressive Taxation—ক্রমবর্ধমান কর। Graduated Tax দ্রষ্টব্য।

Protection—সংরক্ষণ। বিদেশী পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যাতে স্বদেশজাত পণ্য জয়লাভ করতে পারে, তার জন্যে বিদেশী পণ্যের ওপর যখন আমদানি-শুল্ক আরোপিত হয়, তখন তাকে বলা হয় সংরক্ষণ।

Public Works—পূর্ত কার্য, সরকারী নির্মাণ-কার্য, বাস্তুকর্ম। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের একক প্রচেষ্টায় অসাধ্য জনকল্যাণমূলক বিরাট্ কর্ম সরকারী প্রচেষ্টায় সম্পাদিত হয়। যেমন, সড়ক ও সেতু নির্মাণ, খাল খনন, সেচকার্য ইত্যাদি। এগুলিকে বলা হয় পূর্ত কার্য, সরকারী নির্মাণ-কার্য বা বাস্তুকর্ম।

R.

Rationalisation of Industry [গৌ. বি. '৬৫]—**শিল্পের সুসংবদ্ধ সংস্কার।** শিল্পের ব্যবহৃত উপাদান-সম্ভার থেকে সর্বাধিক ফল-লাভের উদ্দেশ্যে পুরাতন যন্ত্রপাতির স্থলে আধুনিকতম যন্ত্রপাতির প্রয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে পরিকল্পিত উপায়ে যে যুগোপযোগী সংস্কার সাধন করা হয়, তাকেই শিল্পের সুসংবদ্ধ সংস্কার বলা হয়।

Reclamation—উদ্ধার। অব্যবহার্য প্রাকৃতিক সম্পদকে বৈজ্ঞানিক উপায়ের দ্বারা ব্যবহারোপযোগী করে তোলার নাম উদ্ধার।

Redeemable debenture—পরিশোধযোগ্য ঋণপত্র। কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে হবে বলে যে ঋণপত্রে উল্লেখ থাকে, তাকে বলা হয় পরিশোধযোগ্য ঋণপত্র।

Repatriation—প্রত্যাবাসন। অন্যদেশে বিনিযুক্ত মূলধন তুলে এনে স্বদেশে বিনিযুক্ত করার নাম প্রত্যাবাসন।

Royalty—স্বামিত্ব, নজরানা, সেলামী। কয়েকটি বিশেষ অধিকার ভোগের বিনিময়ে যে মাশুল মূল্য প্রদান করতে হয়, তাকেই বলা হয় স্বামিত্ব বা নজরানা বা সেলামী। পুস্তকের অভিহিত মূল্যের যে অংশ গ্রন্থকারকে প্রদত্ত হয় তাকেও বলা হয় স্বামিত্ব বা নজরানা বা সেলামী। কয়লা খনির মালিককে উত্তোলিত কয়লার টন-প্রতি একটা নজরানা বা সেলামী সরকারকে দিতে হয়।

S.

Sinking Fund—কর্জশোধ তহবিল। ঋণ পরিশোধ করবার জন্যে কিংবা সম্পদ পরিপূর্তির জন্যে যে তহবিল গড়ে তোলা হয়, তাকে বলা হয় কর্জশোধ তহবিল।

Soft Currency—সুলভ মুদ্রা। বৈদেশিক বাজারে যে দেশের মুদ্রার চাহিদা হ্রাস পায় সেই দেশের মুদ্রাকে বলে সুলভ মুদ্রা। যে দেশের ভাগ্যে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত দেখা দেয়, সেই দেশের মুদ্রার চাহিদা সাধারণতঃ হ্রাস পায়।

Speculation—ফট্‌কা, ঝুঁকিদারী অনুমানন। ভবিষ্যতে কোন পণ্যের মূল্য-বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলে, লাভের প্রত্যাশায় পূর্ব থেকে সেই পণ্য ক্রয় করে ফেলার নাম ফট্‌কা বা ঝুঁকিদারী অনুমানন।

Surcharge—অতিরিক্ত কর। কোন অর্থপ্রাপ্তির ওপর বা আয়ের ওপর স্বাভাবিক আয়করের অতিরিক্ত যে কর আরোপিত হয়, তাকেই বলা হয় অতিরিক্ত কর।

Surrender Value [গৌ. বি. '৬৫]—**প্রত্যর্পণ মূল্য।** সাধারণতঃ দু বছর চাঁদা দেওয়ার পর বীমাপত্রের প্রদত্ত চাঁদার সমপরিমাণ অর্থ লাভ করবার অধিকার জন্মে। সেই প্রাপ্য অর্থকে বলা হয় প্রত্যর্পণ মূল্য। এরূপ ক্ষেত্রে বীমাপত্রের মালিক বীমা-কর্তৃপক্ষের কাছে চুক্তিকৃত বীমার স্বত্ব পরিত্যাগ করেন।

T.

Time Bill—মেয়াদী হুণ্ডি। ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত যে হুণ্ডি বা বিনিময় পত্রের মেয়াদ থাকে, তাকে বলা হয় মেয়াদী হুণ্ডি।

Time Deposit—মেয়াদী আমানত। ব্যাঙ্কের যে আমানতের উত্তোলন নোটিশ-সাপেক্ষ, তাকে মেয়াদী আমানত বলা হয়।

Trade Cycle—ব্যবসায়-চক্র। অর্থনৈতিক কার্য-কারণে বাণিজ্য-জগতে তেজী-মন্দীভাব পরিলক্ষিত হয়। সেই অর্থনৈতিক কারণের বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, বাণিজ্য-জগতের তেজী-মন্দীভাব প্রায় চক্রবৎ বিঘূর্ণিত হয়। বাণিজ্যিক পরিস্থিতির এই আবর্তনকে ব্যবসায়-চক্র বলা হয়।

Trade Union—শ্রমিক সংঘ। কোন বিশেষ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংগঠিত সংঘকে বলা হয় শ্রমিক সংঘ।

Treasury Bill—সরকারী হুণ্ডি। সরকারী আয়ের চেয়ে সরকারী ব্যয় অধিক হলে সরকারকে স্বল্প মেয়াদী ঋণ গ্রহণ করতে হয়। সরকার যে হুণ্ডির দ্বারা সেই ঋণ সংগ্রহ করেন, তাকে বলা হয় সরকারী হুণ্ডি।

Trial Balance—রেওয়া মিল। দোহারা হিসাবে লেনদেন প্রবিষ্টি নির্ভুল হলে উভয় হিসাবের জমা-খরচের তুলনও সমান হবে। উভয় হিসাবের মধ্যে কাঁচা হিসাবকেই বলা হয় রেওয়া মিল। রেওয়া মিল দিয়ে হিসাবের নির্ভুলতা পরীক্ষা করে দেখা হয়।

Turnover—আবর্তন, হস্তান্তর, মোট বিক্রয়-মূল্য। পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের গতিকে আবর্তন বা হস্তান্তর বলা হয়। আবার কোন নির্দিষ্ট সময়ে অন্তর ফেরতা বাদ দিয়ে যে মোট বিক্রয়-মূল্য পরিমাণ দাঁড়ায়, তাকে মোট বিক্রয়-মূল্য বলা হয়।

U.

Ultra Vires—অধিকার-বহির্ভূত। যদি বলবৎ চুক্তি বা প্রশাসনকে অমান্য করে কোন কাজ করা হয়, তাকেই বলা হয় অধিকার-বহির্ভূত।

Underwriter—অবলেখক, দায়গ্রাহক। সামুদ্রিক বীমায় বীমাকারী বীমাপত্রের নিম্নে স্বাক্ষর করে বীমাকৃত মালের ক্ষতি-জনিত ক্ষতিপূরণের দায় গ্রহণ করেন ; তাঁকেই বলা হয় অবলেখক বা দায়গ্রাহক।

Underwriting—অবলিখন, দায়গ্রহণ। কোন কোন যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানে দস্তুরির বিনিময়ে শেয়ার বা অংশপত্র বিক্রী করে দেবার, অন্যথায় ক্রয় করবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তাকেই বলা হয় অবলিখন বা দায়গ্রহণ।

Unearned Increment [গৌ. বি. '৬৫]—**অনুপার্জিত বৃদ্ধি।** দৈহিক শ্রম কিংবা অর্থব্যয় ছাড়াই যদি সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি পায়, তবে তাকে অনুপার্জিত বৃদ্ধি বলা হয়।

V.

Velocity of Circulation—**মুদ্রার প্রচলন গতি।** যে গতিতে মুদ্রা হস্তান্তর হয়, তাকে বলা হয় মুদ্রার প্রচলনগতি।

Vertical Combination—**ভিন্ন-শিল্প জোট।** কোন পণ্যের উৎপাদনে যে ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে, সেই ভিন্ন ভিন্ন স্তরের শিল্প প্রতিষ্ঠান একত্রিত হয়ে একটি মাত্র শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে তাকে ভিন্ন-শিল্প জোট বলা হয়।

W.

Way Bill—**লোক ও মালপত্রের তালিকা।** স্থলপথে লোকজন বা মালপত্র প্রেরিত হলে প্রেরণকালে প্রেরককে যে রসিদ দেওয়া হয়, তাকে বলা হয় লোক ও মালপত্রের তালিকা।

Winding up—**কারবার গুটানো।** ব্যবসায়ী স্বেচ্ছায় বা আদালতের নির্দেশে ব্যবসার সকল প্রকার লেনদেন বন্ধ করে দিলে তাকে বলা হয় কারবার গুটানো।

Window Dressing—**প্রচার-চাতুর্য।** জনসাধারণকে আকৃষ্ট করবার জন্যে ব্যবসার প্রকৃত অবস্থা গোপন করে তার সমৃদ্ধতর অবস্থা প্রদর্শন করলে তাকে প্রচার চাতুর্য বলা হয়।

Working Capital—**কার্যকরী মূলধন।** ব্যবসার চলতি লেনদেনে ব্যবহৃত পুঁজির পরিমাণকে বলা হয় কার্যকরী মূলধন। মূলধনের যে অংশ ব্যবসাতে পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হয়, তাকেই বলা হয় কার্যকরী মূলধন।

Work Relief—**কর্ম-সাহায্য।** জনসাধারণের কর্মাভাব বা আর্থিক সংকটকালে সরকার নানা জনহিতকর কার্যে (যেমন পথ নির্মাণ ও মেরামত, খাল ও কূপ খনন ইত্যাদি) লোক-সাধারণের কর্ম-সংস্থান করে দেন। এভাবে কর্ম-সংস্থানের মাধ্যমে আয়ের সুযোগ সৃষ্টিকেই বলা হয় কর্ম-সাহায্য।

অনুসরণী

১. সংজ্ঞা লিখ: গৌ. বি. '৬৫

Ad valorem duty, Circulating Capital, Forward contract, Over Capitalisation, Rationalisation of industry, Surrender.

Value, Deficit financing, Entertainment Tax, Unearned increment, Hire Purchase System.

২. টীকা লিখ :

Assignment, Balance of Payment, Bill of Entry, Bill of Store, Boom, Certificate of Origin, Credit Voucher, Debit Note, Embargo, Indent, Letter of Indemnity, Liquid Asset, Liquidation, Moratorium, Naturalisation, Octroi, Overdraft, Over-Production, Pool, Process Costing, Sinking Fund, Trial Balance, Turnover, Velocity of Circulation, Vertical Combination, Window Dressing.